

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

—•—

কলিকাতা,

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, দ্বন্দ্বস্তরী প্রিম মেশিন বস্ত্রে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদারের দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

—
সন ১৩১১ সাল ।

দ্বিতীয় খণ্ডের

সূচী।



বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কুরুক্ষেত্র	১০৬১
ধর্মক্ষেত্র	১০৬১
জীবন সঙ্গীত	১০৬২
নারী বর্ষ	১০৮২
মাতা পুত্র	১০৯২
ভাতা ভগিনী	১১০৩
কুরুক্ষেত্রে পুতুলখেলা	১১১৪
দাবায়ি	১১২৮
হৃদযুখী	১১৩৮
কৃষ্ণনাম	১১৫৪
ব্যাধ	১১৭২
মৃগশিক্ত	১১৮৬
সুখতত্ত্ব	১২০৭
সুখমগন	১২২০
বিদায়	১২৪৮
শোকে শাস্তি	১২৮৮
মহাভারত	১৩০৩



বিষয়

২। প্রভাস:

ছায়া	১৩২-
অভিশপ	১৩৩
দুই তগিনী	১৩৫.
যোগানল	১৩৬
মহাপান	১৩৮৩
প্রতিজ্ঞা	১৪...
লীলাশেষ	১৪১৩
মহাপ্রস্থান	১৪২৮
বীণা পূর্ণতান	১৪৩৯
প্রায়শ্চিত্ত	১৪৫১
স্বর্গারোহণ	১৪৬৭
কর্মফল	১৪৮২
ভবিষ্যৎ	১৪৯৭

৩। অমিভাত

অবতার	১৫২৩
শুভকল্প	১৫২৪
ভবিষ্যৎ	১৫২৭
কৈশোর	১৫৩৮
অশোকোৎসব	১৫৪৭
বিবাহ	১৫৫১
গাথা	১৫৬৪
বৈরাগ্য	১৫৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহানির্দেশ	১৫৬৪
বিদায়	১৫৭১
মহানিক্রমণ	১৫৭৫
নবীন সন্ন্যাসী	১৫৮১
যোবনে যোগিনী	১৫৮৬
প্রজ্ঞা	১৫৯৬
সাধনা	১৬০৭
সিদ্ধি	১৬১৯
প্রচার	১৬২৭
সংসার অশান	১৬৩৯
মোক-শিক্ষা	১৬৫০
মহানির্বাণ	১৬৬২

৪। স্বর্গ	১৬৮২
৫। ভানুমতী	১৭৩৭
৬। প্রবাসের পত্র	১৮৬৬

দার্জিলিং	১৮৬৬
বৈষ্ণবনাথ	১৮৬৭
শ্রদ্ধাগ	১৮৮৮
কানপুর	১৮৯৯
মক্কো	১৮৭৮
কলিক	১৮৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিহু	১৮৮৩
লাহোর	১৮৮৩
অমৃতসার	১৮৮৩
ইন্দ্রপ্রস্থ	১৮৮৩
পুরাতন দিল্লী	১৮৮৫
বর্তমান দিল্লী	১৮৮৮
আগ্রা	১৯০৭
জবপুর	১৯১২
পুঙ্ক	১৯২২
চিতোর	১৯২৭
যোধপুর	১৯৩২
বরদা	১৯২৬
বোম্বাই	১৯৪০
পুনা	১৯৪৭
দণ্ডকারণ্য	১৯৫১
নর্মদা	১৯৫৫
ভারত রমণী	১৯৬০

৭।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৯৭৫
৮।	{ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	২০৬৯
	{ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী	২০৮৭

আমার

সরলা স্নেহময়ী শোকসন্তপ্তা

স্বর্গীয়া জননীর

পবিত্র চরণাঙ্কুশে

সদৃশ-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে

এই শোক-কাব্য

উৎসর্গ করিলাম।

১৭৮৫টি, ৩০ শে বৈশাখ,

১৩০০ সাল।

}

নবীন।

—

নিবেদন।

—*—

‘কুরুক্ষেত্র’ স্বতন্ত্রকাব্য হইলেও ইহার উপাখ্যান ভাগ্যকাক্স
পরিমাণে ‘রৈবতকের’ সঙ্গে গাঁথা। ইহার অনেক চরিত্রে
উল্লেখ ‘রৈবতকে’। অতএব ‘রৈবতক’ না পড়িলে ‘কুরুক্ষেত্র’
সম্যক্ কাব্যরস উপলব্ধি হইবে না। ~~রৈবতকে~~ ভিত্তিভূমি
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ী, ‘কুরুক্ষেত্রের’ ভিত্তিভূমি তাঁহার
অনন্তকালম্পর্শী মথালীলা।

আমার পুত্রপ্রতিম

ভাগিনেয়

৩. কামিনীকুমুদ সেন

প্রাণাধিক,

তোমার বড় আদরের কুরুক্ষেত্র,—না না কারুকার্যে খচিত
করিয়া মুদ্রিত করিবে বলিয়া তুমি যে ‘কুরুক্ষেত্রের’ মুদ্রাক্ষন হই
বৎসর বাবৎ স্মৃতিত রাখিয়াছিলে,—তুমি বোগ-শযায় শায়িত
হইলে বৈ ‘কুরুক্ষেত্রের’ অভাবগহীন মুদ্রাক্ষন আরম্ভ হইয়াছে
তুমি এত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলে,—আজ সে কুরু-
ক্ষেত্রের মুদ্রাক্ষন শেষ হইল, আর তুমি কি আজিই একটি পবিত্র
পুণ্যস্থলের মত অন্তর্হিত হইলে? তুমি যে একবার মুদ্রিত কুরুক্ষেত্র
দেখিয়াও গেলে না আমার এ দুঃখ কোথায় রাখিব? আমি
একটি শিশু-শোক-স্মৃতির সহিত ‘কুরুক্ষেত্র’ আরম্ভ করিয়াছিলাম,
জানিতাম না তোমার শোক-স্মৃতি ইহার শেষের সহিত জড়িত
হইয়া থাকিবে। ভগবানের যে শোক আমি কল্পনায় অনুভব
করিয়াছিলাম, জানিতাম না যে সেই শোক ‘কুরুক্ষেত্রের’ মুদ্রাক্ষনের
শেষের সহিত মূর্তিমন্ত হইয়া আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে। জানি-
তাম না যে, যে মহাচিতা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার
হৃদয়ে চিরজীবনের জন্ত জলিবে। তথাপি আমার দুঃখ নাই।
তোমার জীবনে বৃদ্ধি জন্মান্তরের কিঞ্চিৎ কৰ্ম্মছায়া ছিল, ২৩
বৎসর কাল পরাধামে থাকিয়া তাহা অপসারিত করিয়া, তোমার
চরিত্রের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও দেবত্ব কোনরূপে কলুষিত হইবার

পূর্বেই তুমি আজ পবিত্র ব্রাহ্মমূর্ত্তে প্রকৃতির শাস্তিময়ী মূর্ত্তি
দেখিতে দেখিতে "নীরবে শাস্ত্যভাবে" দেবলোকে চলিয়া গেলে।
বাও বৎস ! আমিও পুণ্যভারতী শৈলজার মত দেখিতেছি——

“ওই সর্ব-শোক-নিবারণ

দাড়াইয়া নারায়ণ শাস্তিপ্ৰসবণ।”

আমিও শৈলজার মত সেই——

“শান্তির ত্রিদিব-বৃকে”

পূর্বে সমৃদ্ধি স্নেহে,

করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,

গাব স্নেহে কৃষ্ণনাম জুড়ানু জীবন।”

রাণাঘাট, ৩০ শে বৈশাখ,

১৩০০ সঙ্গ।

তোমার শোকে সন্তপ্ত

নবান্ন।



কুরুক্ষেত্র ।

প্রথম সর্গ ।

ধর্মক্ষেত্র ।

“নীরবেজ্জপ্রতিম নীল নিম্নল আকাশ,
শরতের শেষ মেঘে উড়ে তরঙ্গিত,—
নীরব, নিষ্পন্দ, ভীত । নিম্নে তরঙ্গিত
চতুর্দিকে, বণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
গর্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভাবতের
মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ! সাক্ষ্য রবিকরে
দেখাইছে রক্তমেঘে প্রতিবিম্ব তার,
নীরব নিষ্পন্দ ভীত, বিশ্বচরাচরে ।
ছুই প্রান্তে সংখ্যাতীত সজ্জিত শিবির,

তরঙ্গিত বেগা যেন ঝর্ণ-পয়োধির।—
 কহিলেন দৈপায়ন শিষ্য আপনার
 দাড়াইয়া দূরে বট-বিটপি-ছায়ায়,
 কহিলেন—“দেখ বৎস ! পৃথিবী আবার
 হইতেছে সিক্ত জীব-শোণিত-ধারায় !
 কতরূপ মৃত্যুজিহ্বা অস্ত্র ভয়ঙ্কর
 উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন,—
 অসংখ্য বিদ্যুৎগতি তীব্র বিষধর
 খেলিতেছে শমনের কি ক্রীড়া ভীষণ !
 অস্ত্রের নিশ্বন উর্কে, ঘাত প্রতিঘাত,
 কালানল উদ্গীরণ ; নিম্নে হাহাকার
 মিশি সিংহনাদ সহ, অশনি সম্পাত
 কোদণ্ড-টঙ্কার ঘোর, শ্রবণে আমার
 লাগিতেছে যেন দূর সমুদ্র হুকার
 বাতক্ষুর, সহ ঘন অশনিঝঙ্কার।”

কহিল বিনীত শিষ্য ভয়ে ব্যাকুলিত—
 “কি ভীষণ দৃশ্য, প্রাণ কাপে থরথর !
 নরকের দৃশ্য যেন সমুখে বিস্তৃত !
 বীরেরা মানব নহে, শমনকিঙ্কর !
 এই পাপ দৃশ্য প্রভু ! দেখিলেও হায় !
 হয় চিত্ত কলুষিত । নিষ্ঠুর মানব
 এইরূপে নিরমম হিংস্র জন্তু প্রায়
 নাশে কি হে পরম্পরে—একি অসম্ভব !
 মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরিণত, হায় !
 পাপক্ষেত্রে, এ নরকু দেখা নাহি যায়।”
 মহর্ষি ঈষৎ হাসি উত্তরিল। ধীরে—

“পাপপুণ্য, ধর্ম্যধর্ম, জগতের নীতি,
 রুড়ই চক্রহ তব্ব । সেই রক্তচয়
 অনন্ত তিমিরগর্ভে । হিংসা আর প্রীতি
 ঘটনার চক্রে করে স্থান বিনিময় ।
 নিশ্চয় নিষ্ঠুর এই পাপ অভিনয়ে
 শীর্ষ অভিনেতা যিনি নিষ্ঠুর হৃদয়,
 দয়ার সাগর তিনি, পুণ্য-পারাবার ।
 নিরস্ত বসিয়া কক্ষ অর্জুনের রণে
 সাশিষ্টেন স্থির চিত্তে কল্পিত বিনাশ,
 নাশিষ্টেন প্রিয়জন-দেখ কত মতে,
 হাহাকারে পূর্ণ করি আপন আবাস ।
 যথা কক্ষ তথা ধর্ম, সেইখানে জয়,—
 সত্যী গান্ধারীর কথা সত্য নিঃসংশয় ।”

বিশ্রমে কহিল শিবা,—“হায় ! যদি প্রভু ।
 এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম, অধর্ম কি আর ?
 এই হত্যাকাণ্ড ধর্ম !—হৃদয়েতে কভু
 নাহি পায় স্থান, এই হিংসা পারাবার !
 না পারিবুঝিতে কিছু । নর-নারায়ণ
 কেশব করুণাসিদ্ধ বিষ্ণু অবতার,—
 জীবে দয়া, বিশ্বহিত, ধর্মসংরক্ষণ,
 ২° মহা ধর্মনীতি,—এই কার্য তাঁর ?
 যেই অধাকর অধা করিবে বর্ষণ,
 সে কি এই হলাহল বর্ষিছে ভীষণ !”

দ্রোণ । সংহার স্রষ্টার নীতি, সৃষ্টির কারণ,
 জড়ে ও অজড়ে বৎস সিসর্গের সমান ।
 সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখ চক্রেব মতন

ঘুরিতেছে বিশ্বে, নাহি তিলার্দ্ধ বিশ্রাম,
 ধ্বংস বিনা সৃষ্টিস্থিতি, বৎস ! অসম্ভব ।
 ক্ষুদ্র, তবু না মরিলে ওই তৃণগণ,
 নাহি সাধ্য তৃণ অল্প হইবে উদ্ভব ;—
 না পারিবে স্থিতি লাভ করিতে কখন ।
 রুদ্ধ কক্ষ মৃত্যুদ্বার, হইয়া বর্ধিত
 জীবসংখ্যা আত্মঘাতী হইবে নিশ্চিত ।

শিষ্য । মানিলাম ধ্বংসনীতি । স্বজন পালন
 যার মায়া, মানিলাম ধ্বংসও তাঁহার ।
 না পারি একটি বালি করিতে স্বেচ্ছন,
 আমার তাহাতে কিবা আছে অধিকার,
 আমি কে ?

ব্যাস । তাঁহার অন্ত । সৃষ্টিস্থিতিলয় ।
 যেই নীতিচক্রে নিত্য হতেছে সাধিত,
 তুমি-পরমাণু তার ; সেই নীতিচক্রে
 সকলের কক্ষক্ষেত্র আছে নিয়োজিত ;—
 স্বয়ং নিলিপ্ত তিনি । এই নীতিবলে
 শাঙ্গুল নাশিয়া, বৎস ! ক্ষুদ্র প্রাণী যত,
 পড়িছে শাঙ্গুলাধিক কালের কবলে ;
 নাশিছে এ বৃক্ষ দেখ তৃণ ছায়াগত ।
 আংশিক এ ধ্বংসনীতি করিতে সাধিত
 জীবদেব হিংসাবৃত্তি দত্ত বিধাতার ।
 এই নীতি অহুসরি যদি নিয়োজিত
 কর তাহা, কেন পাপ হইবে তোমার ?
 গোড়ায় অনল যদি, ডুবায় সলিল,
 বল কি তাদের পাপ হয় একতিল ?

নিগূঢ় সংসার-তত্ত্ব । হায় ! কুরু নর,
কেমনে বুঝিবে তাহা, কে বুঝাবে তারে ?
ব্যাস ! মহাকাব্য বিশ্বগ্রন্থ—তত্ত্ব-বক্তাকর ।

ভাসি এই অনন্তের মহা পারাবারে,
মহাধ্যানে লভিতেছে মহাজ্ঞানগণ
এই মহা অনন্তের যেই ক্ষুদ্র জ্ঞান,
ধর্মশাস্ত্র নাম তার । শাস্ত্র-অধ্যয়ন,
যোগবল, মানবের শিক্ষার সোপান ।
বিপ্রব-ঝটিকা-গর্ভে জন্মি অবতার
করেন জগতে ধর্ম-যুগের সঞ্চার ।
তুনিয়াছি ধাপবেতে কৃষ্ণ অবতার ।

এই ধ্বংস-যজ্ঞ প্রভু ! ধর্মশিক্ষা তাঁর ?
জীবে দয়া,—জীবহিংসা ? সর্বজীবহিত,
সর্বজীবের বিনাশ ? এই মহারণ,—
কুরুক্ষেত্র,—ধর্মক্ষেত্র ? প্রভু ! উৎপাটিত
করিলে কি, এই তরু হবে সংরক্ষিত ?
এই ধ্বংস-যজ্ঞ, ধর্ম । কর দরশন

সর্বত্র ধর্মের মানি, অধর্ম প্রবল,
সাধুদের হাহাকার, হৃদয় হৃদয়
বসিতেছে নিরন্তর পাপ-হলাহল ।
অধর্মের অভ্যুত্থান, এই পাপভার,
করিতে মোচন বৎস ! করিতে প্রচার
মহারাজ্য ধর্মরাজ্য, করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত,—কৃষ্ণ অবতার ।
অপূর্ব জীবনলীলা ! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে রাজ্যদান, অশ্বনির্যাসন

নিবান্ধিতে অশ্রুশ্রোত সমুদ্রের পার ।
 সেই জরাসন্ধ-বধ, অদ্ভুত কোশল,—
 কারামুক্তি, রাজমেধ যজ্ঞ-নিবারণ !
 রাজহৃদয়ে পাণ্ডবের সাত্রাজ্য-প্রবল
 বিনা যুদ্ধে কি কোশলে হইল স্থাপন !
 সর্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্বত্র নিকাম,
 সর্বত্রই দয়াধর্ম আদর্শ মহান ।
 ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধর্মরাজ্য তাঁর
 জান যে অধর্ম্যে তাহা হ'লো অপহৃত !
 জান সভা মধ্যে সেই খেদ্র অত্যাচার
 সভা দ্রোপদীর প্রতি, নরক-অতীত !
 বাল-নির্ধাতন ; জতুগৃহের দ্যুতন ;
 ত্রয়োদশ বৎসরের ঘোর বনবাস ;
 সন্ধি তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি নির্ধাতন
 পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করি হইলা নিরাশ ।
 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—
 ওনিয়াছ লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ ।
 সাধুদের পরিভ্রাণ হৃদ্যতদমন,

সাধিব্যারে অনিবার্য হ'ল ধর্মরণ ।

শিষ্য । মানিলাম হৃদ্যোধন পাপী হর্ষিনীত ;
 কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতিমণ্ডল ?—

ব্যাস । পাপের প্রেম-দাতা,—অধর্ম্যে পতিত,—
 জলাইল সবে এই সমর-অনল ।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কণ পঞ্চপাল যত
 অসংখ্য বীরেন্দ্র-বৃন্দ না হ'লে সহায়,
 হইত কি হৃদ্যোধন এই পাপে রত ?

নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি, হায় !
 কি অধর্ম অভ্যুত্থান ক্ষত্রিয়-জগতে
 ঘটিয়াছে, বৎস ! এই ভীষণ সময়
 না হইতে নির্দোষিত, হায় ! কত মতে
 দেখিবে তাহার আরো চিত্র ভয়ঙ্কর ।
 অধর্ম-অকলে, বৎস ! পদ্মপাল মত
 হইবে ক্ষত্রিয়জাতি ভাঙ্গে পরিণত ।

শিষ্য । কিন্তু পাণ্ডবের পক্ষ বীরেন্দ্রমণ্ডল
 মরিভেছে কোন্ পাপে ?

ব্যাস । মৃত্যু অনিবার ।

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
 ক্ষত্রিয়ের মহাধর্ম,—জিদিব তাহার
 দীরব্রতে ধর্মরগে জীবন-অর্পণ ।
 মানবসমাজ-রক্ষা হয় নিরন্তর
 এইরূপে ; জান বৎস ! নিলিপ্ত ঈশ্বর ।

শিষ্য । বোরতর কর্মলিপ্ত অবতার তাঁর
 দেখিতেছি ভগবন্ ! বুঝিব কেমনে
 ঈশ্বর নিলিপ্ত তবে ?

ব্যাস । কি ভ্রান্তি তোমার !

কর্মত্যাগ নিলিপ্ততা ভাবিও না মনে ।
 ভগবান্ কর্মরত । বিপুল সংসার
 কর্মক্ষেত্র ; নাহি কারো তিলার্কি বিশ্রাম ।
 জগতের সুখমাত্র সুখ আপনার,
 আমি জগতের অংশ—এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
 যার কর্ম-মূলে ; কর্মফলে কদাচন
 নাহি ক্ষুদ্র স্বার্থ যার ; নিলিপ্ত সে জন ।

নিকাম বা নির্ভিষ্টের আদর্শ উজ্জল
 মহিমা-মণ্ডিত ওই সম্মুখে তোমার,—
 কৃষ্ণের জীবনচিত্র পবিত্র নিশ্চল !
 আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার ?
 নারায়ণ, নারায়ণী, সেনা আপনার,
 দেব প্রতিকূল পক্ষে ! সমগ্র ক্ষুদ্র
 সমবেত যেই ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র কীট ছার
 যশোলোভে মত্ত যথা, বীর আত্মীয়
 ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরুত্তর আপনি !
 সারথির ব্রতে ব্রতী ! শৃগালের ব্রতে
 ব্রতী সিংহ ; খড়্গোৎব্রতে ব্রতী দিগম্বরী !
 জগত তাঁহার রথ ; অনন্ত তাঁহার
 কুরুক্ষেত্র ; শক্তি অস্ত্র ; অনন্ত সময়,—
 সৃজন পালন লয় ; অনন্তে সঁতার
 দিতেছে সে মহাবথ কল্প কল্লাস্তর !
 কাতর অর্জুনে সেই যোগেশ্বর হরি
 যেই ধর্ম-গীতামৃত করিয়া পান
 করিলা স্বধর্মের রত, যোগধ্যান ধরি
 করিয়াছি সঙ্কলন,—পরিতৃপ্ত প্রাণ !—
 সেই গীতা উত্তরীয়-অঞ্চলে তোমার ।
 ষাণ্ড, বৎস ! পুণাতোয়া হিরণ্য-তীরে
 এখনি সায়ংসন্ধ্যা করি সমাপন
 যাব আমি । গিয়া তুমি পাণ্ডব-শিবিরে
 স্তম্ভদ্রাব করে গ্রন্থ কর সমর্পণ,
 রম আশীর্বাদ সহ । শান্তনুতনয়
 এই গীতামৃত তরে অকুল হৃদয় ।

কহিও ভদ্রবরে—“যেই ধর্ম মূর্তিমান
 “সুভদ্রে ! তোমাতে নিত্য, যে ধর্ম্যে দীক্ষিত
 “তব পতি বীরবর পার্থ মহারথী,
 “এই গ্রন্থে সেই ধর্ম ভাষায় চিত্রিত ।
 “বিরাজিত যেই চক্রে, স্থধার আধার,
 “তুর বক্ষে, এই গীতা জ্যোৎস্না তাহার ।”
 যাও বৎস ! যাও চলি । যথা-অবসর
 করিব যতেক শিষ্যে এ অমৃত দান ।
 মিলিষ্ঠাছে মোক্ষস্থখা, যুগ যুগান্তর
 যার তরে ষোগিগণ করিতেছে ধ্যান ।
 মানবের কর্মাকাশে ধর্ম-ধ্রুবতারা
 জানিলাম এত দিনে হ’ল সমুদিত ;
 অনন্ত কালের তরে অন্ধ দিক্‌হারা
 দেখিবে গন্তব্য পথ মানব পতিত ।
 গীতার এ রঙ্গভূমি, মহাতীর্থ মত,
 কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে হবে পরিণত ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

জীবন-সঙ্গীত ।

ষাটকাবিক্রম মত্ত বিধ্বনিত
 পারাবার-গর্ভে মরকতসুর

শোভে বরুণের, শাস্তির আধার,—
 বরুণ বারুণী কি চিত্র মধুর !
 রণ-ঝটিকায় মত্ত বিক্ষোভিত
 কুরুক্ষেত্র-গর্ভে শোভার আধার
 শোভিছে শিবির—শাস্তির ত্রিদিব
 প্রীতিপূর্ণ—অভিমুখ্য উত্তরার ।
 প্রীতির স্বপন প্রতিমা যুগল,
 সুখশাস্তি হাসি জ্যোৎস্না মুখে ।
 প্রীতির স্বপন নয়নে তরল,
 সুখশাস্তি ভরা জ্যোৎস্না বুকে ।
 ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল নিরমল
 বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া
 সৃজিলেন বিধি মূর্তি উত্তরার,
 অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া ।
 আনন্দনিষ্য ব উচ্চলে হৃদয়ে,
 আনন্দনিষ্য'র নয়নতারা,
 আনন্দনিষ্য'র ক্ষুদ্র রক্তাধার
 চালে অবিরল আনন্দধার ।
 সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
 কাদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে ;
 অভিমানভরে থাকে যদি বালা,
 কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে ।
 যথায় উত্তরা তথা উচ্চহাসি,
 তরঙ্গে তরঙ্গে বাশরীষকার ।
 যথায় উত্তরা তথা উচ্চভাষা—
 কিশোরীর ? না না, স্বর্গীয় বীণার ।

হাসিতে ভাবিতে, কিবা মুর্ছনায়
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল ;
চঞ্চলার মত মাইতে ছুটিয়া,
না ছোঁয় ধরণী চরণ চঞ্চল ॥
এই হাসিরাশি-কুসুমকাননে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ ।
কহিছে যৌবন—“উত্তরা যুবতী ।”
কৈশোর কহে—“না, কিশোরী এখন ।”

বসি অভিমুখ্য বিচিত্র আসনে
সুবর্ণে নির্মিত, রতনে খচিত,
আকিছেন চিত্র ;—বীর-অবয়ব
সুবর্ণে নির্মিত, রতনে ভূষিত ।
আকর্ণ বিশ্রান্ত যুগল নয়ন,
আকর্ণ নিবিড় যুগল ভুরু ,
বিশাল ললাট, বিশাল উরস,
ক্ষীণ কটা, কিবা বিশাল উরু !
গবাক্ষের তলে হিরণ্যভীজলে,
জলে ধক্ ধক্ পশ্চিম রবি ;
গবাক্ষ সম্মুখে প্রশস্ত ললাটে
জলে ধক্ ধক্ প্রতিভাছবি !
এই বীরত্বের মহারাজত্বে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ ।
কহিছে কৈশোর—“এখনো কিশোর ।”
“মিথ্যা কথা”—গর্জে কহিছে যৌবন ।

চিহ্নিছেন অভিমুখ্য একমনে
“ভীষ্ম-শয্যা” আনত মুখে ;

আসি চুপে চুপে আসন্নপশ্চাতে
কহিলা বিরাট-বালা কৌতুকে,—
“কিহে বীরবর ! আজি যে সকালে
রণ-ক্ষেত্র হ’তে দিলে পিটটান ?
জীব-হত্যা-রঙ্গে হ’ল কি অপ্রীতি ?
কত শত আজি দিলে বলিদান ?”

অঁাকিতে অঁাকিতে কহে অভিমত্যা—
যথার্থ উত্তরে ! দিয়োছি পিটটান ।
যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
‘কার হাসি টুকু, কার মুখখানি ।’

“দেখি দেখি”—কহি স্বকোমল কবে
আদরে উত্তরা তুলিলা মুখ ।
হাসি অভিমত্যা কহিলা আদরে—
“এই মুখ বটে, এ হাসি টুক !”

অধরে অধর হইল মিলিত ;
অধরে অধর রহিল গাঁথা ।
অধরে অধর কি স্থখা ঢালিল,—
নির্মীলিত চারি নয়ন-পাতা ।
নরহত্যা করি মিটেনি কি শাখ ?
নারী-হত্যা কেন একপে আবার ?
মুহুর্তে মুহুর্তে করে নর-হত্যা
যে জন, এ কথা সাজে কি তার ?
তবে নর-হত্যা যানি শ্রেষ্ঠ তব,
মারিয়া বাঁচাও দিনে শত বার ।
ইচ্ছা, থাকি প্রেম-অনন্তস্থগনে
ওই বৃকে মরি, জাগি না আর ।

উত্তরা । থাক মেনে থাক, তব ভালবাসা ।
 সে ছাই বীরত্বে কাটি সারাদিন
 ফিরিলে শিবিরে, চিত্রে নিমগন ;
 নহে কবিতায় থাক উদাসীন ।
 গাইয়ে বাজিয়ে কাটাইব দিন
 ভাকি মনে মনে, তাও সাধ্য কার ?
 ওই দেখ ওই শিবিরকোণায়
 আদরের যন্ত্র সব স্তূপাকার ।
 বাধিতেছি বীণা, কর্ণে এক কর,
 অস্ত্র কর তারে,—ছাড়িল হুকার
 সেই পোড়া অস্ত্র,—কি নাম তাহার ?
 চমকিল কর, ছিঁড়ে গেল তার !
 আর সাজ করি বাজাতেছি যদি,
 সেই হুম্‌হাম্—কি নাম তাহার ?
 বীর সিংহনাদ ! তাহার উপর
 ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক সেই কোদণ্ড-টঙ্কার !

অভি । উত্তর গোংগ্‌হে যে বীরত্ব ভাই
 দেখাইল, ইহা পরিশিষ্ট তার !

উত্তরা । ছাই শত্রুরের মুখে রাশি রাশি ।
 মল্ল বুঝি সেই বীরত্ব দাদার ?
 কেমন অকৃত শরীরে ফিরিয়া
 আসিল, আনিল কতই ভূষণ ।
 কতই পুতুল করিহু নির্মাণ
 সে বীর-রসনে মনের মতন ।
 কেহ'না মরিল, কেহ না কানিল,
 পতিহীনা নাহি হ'ল কারো দারা,

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

ক'রো শিশু নাহি হ'ল পিতৃহীন,

না হইল কোন মাতা পুত্রহারা।

“অদ্ভুত বীরত্ব !”—পিতার বীরত্বে

পুত্রের হৃদয় উঠিল ভরি,—

ক'হি অভিমত্যা, রহিলা নীরব,

চিত্রবৎ শূন্ত দরশন করি।

চুপে চুপে চুপে তুলিটি লইয়া

চুপে চুপে গেল উত্তরা সরিয়া।

“চোর ! চোর !”—বলি হাসিতে হাসিতে

গেলা অভিমত্যা পশ্চাতে ছুটিয়া।

ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গিনী মত

ঘুরিছে ফিরিছে বিরাটবালা ;

হাসিয়া হাসিয়া ছুটিছে বালিকা,

হাসির ঝলকে শিবির আলা।

ক্রীড়ারত বন-কুরঙ্গের মত

পশ্চাতে পশ্চাতে কিশোর ধায়,—

মুখভরা হাসি, প্রেমভরা আঁখি,

ছইটি বিদ্রোহ খেলিয়া যায়।

এবার মুবক ধরিল সাপটি,

“হি-হি” উচ্চ হাসি হানিছে বালা—

কর হ'তে তুলি লইল কাড়িয়া

চাপিয়া হৃদয়ে কুহুমমালা।

ছুছিল সে হাসি আবার আবার,

হাসিতে স্নানর মিশিল হাসি।

নিপীড়িত যুগ কুহুমস্তবক

তালিল হৃদয়ে অমৃতরাশি।

যুবকের বাম প্রকোষ্ঠে বামায়
 শোভিছে বদন মুক্তকেশাবৃত,
 শ্রমে পদপূর্ণ-কপোল যুগলে
 ভাসিছে গোলাপ সত্ত্ব বিকসিত ।
 শোভিছে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যুবায়
 ক্ষীণ কটি ; চারু কুসুম-দাম,
 জ্যোৎস্নার লতা, উত্তরীয় মত
 শোভিতেছে বক্ষে,—মোহিত প্রাণ ।
 চুম্বিছে যুবক আবার আবার
 ফুলে ফুলে সেই পুন্নিতা লতা ।
 আবার আবার হাসির তরঙ্গ,
 কি ভাষা হাসির ! মরি কি কথা ।
 সাঙ্গ হ'ল রণ ; আবার আসনে
 বসিল যুবক আঁকিতে ছবি ।
 কহিল—“পাগলি ! দেখ লো চাহিয়া
 জগতে অতুল বীরত্ববি !
 দেখ ভীষ্মদেব প্রসন্ন বদনে
 গুইয়া কেমন শবের শব্দায় !
 বীরের পিপাসা নিবারিতে বীর
 স্বেচ্ছাচেন উৎসাক স্তম্ভর হায় !
 বামপার্শ্ববিক্র-শায়কে শায়িত ;
 ঘন অস্ত্রাঘাতে উরস-অধর
 আচ্ছন্ন কিংতকে বীরত্ব-আধার ;—
 নাহি পুষ্ঠে ক্ষুদ্র একটি আঁচড় ।
 বিস্মিত পাণ্ডব, বিস্মিত কৌরব,
 বিস্মিত ধরার বীরেন্দ্রমণ্ডল,

দাঁড়ায়ে নীরবে শ্লথধনু করে
 দেখিছে এ দৃশ্য অশি ছন্ ছন্ ।
 ধাতুক্ষেত্রে ছিন্ন তৃণবাশি মত
 চারি দিকে অস্ত্র পড়ি স্তরে স্তরে ;
 চারি দিকে হত চতুরঙ্গ দল,
 স্বীপ-মালা যেন শোণিত-সাগরে ।”

মুহূর্ত্ত বালিকা দেখিল সে চিত্র
 দক্ষ তুলিকার উজ্জ্বল চিত্রিত ।
 চাহিয়া চাহিয়া অধর টিপিয়া
 উত্তরিল, চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত,—
 “কি নিষ্ঠুর দৃশ্য ! দেখা নাহি যায়
 বীরত্বের হায় ! এই পরিণাম !
 শুইত যে নিত্য কুহুম-শব্দায়,
 অসংখ্য শব্দাগ্রে অর্জু সে শয়ান !
 হরি ! হরি ! হরি ! মানুষে মানুষ
 কেমনে এমন করে প্রহার ?
 হায় ! সকলের একই পরাণ,
 প্রাণে প্রাণ-ব্যথা বুকে না আর ?”

অকিশোর পানে চাহিয়া চাহিয়া
 কহে অভিমত্যা গভীর মুখে—
 “বড়ই কঠোর বীরদর্শ এই !
 কি পাবাণ চাপা বীরের বুকে ।—
 সত্য লো উত্তরে ! ভাবি যবে মনে,
 ইচ্ছা নাহি হয় ধ্বংসে শত্রু ;
 করি রণ যেন কলের পুতুল,
 শিবিরে ফিরিয়া আসি সৈন্য ।

বিনা ভীষ্ম দ্রোণ কর্তৃক রূপ আর,
দেখি সব ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত ।
নাহি দেখি কেহ অস্ত্রযোগ্য মম,
কাদে প্রাণ দেখি ক্ষুদ্র মৈত্রী হত ।

বজ্র অস্ত্র যার, হয় কি, উত্তরে !

পিপীলিকা-বধে প্রবৃত্তি তার ?

উত্তালভরঙ্গ-সঙ্কুল-পর্যোধি

ডুবাতে কি চাহে পতঙ্গ ছার ?

হায় ! বিধাতার স্রষ্টার সংসার,

মৌল্য-ভাণ্ডার। হৃদয়ভরা ।

হায় ! কেন নর হিংসি পরস্পরে

এমন নরক করে এ ধরা !

কি যে বীরধর্ম না'হ বৃষ্টি, প্রিয়ে !

নরনারায়ণ জনক মাতুল

যেই পথগামী, ধর্মপথ তাহা

এই বালকের পবিত্র, অতুল !

বীরধর্ম পুণ্য নিয়তি আমার ।

মাগ প্রিয়তমে ! এ বর কেবল, -

হেন শরশয্যা লভি রণক্ষেত্রে

কুম্ভার্জুন-মুখ করি সমুজ্জল ।”

“ওই ছাই কথা শুনিব না আমি”—

কহি সব তুলি ফেলিল ছুড়িয়া ।

কুড়াইতে গেলে বিরক্তে যুবক,

ছাবটি লইয়া ছুটিল হাসিয়া ।

“এখন উননে করি সমর্পণ

এ সাধের ছবি করিব ছাই ।

নবানুচিন্তের গ্রন্থাবলী ।

ফেলিয়া সে ছাই হিবুণ্ণ তীজলে,
দিব করতালি তাই, তাঁই, তাই ।”—

কুসুমকোমল কক্ষ-গালিচায়

কুসুমিত লতা ঢলিয়া পড়ি,

কাম-স্বপ্ন-শয্যা পুষ্পিত উরসে

হাসিছে ছবিটি চাপিয়া ধরি ।

আপদচুষিত দীর্ঘ কেশবাশি

আবরি স্তন স্তবর্ণলতা,

আবরি গালিচা,—শোভিছে স্ততরী.

কানন-অধারে জ্যোৎস্না যথা ।

মৃগপ্রাণ যুবা চাহিয়া চাহিয়া,

ঈষদ্ ঈষদ্ করে পরশন

স্বক্ৰিম গ্রীবা স্তগোল সুন্দর,

পার্শ্ব ব্রীড়ালয় মার্জিত বাকন ।

দিয়া গড়াগড়ি হাসিতেছে বাংলা,

লহরে লহরে ছুটিছে হাসি.

বিকাশিছে মরি উন্মেষ ঘোবন

লহরে লহরে কি রূপবাশি !

দিয়া গড়াগড়ি হাসিতে হাসিতে

চিত্র হ’তে চিত্র পড়িল সদিয়া ;

এক চিত্র করে, অস্ত্র চিত্র বক্ষে,

হাসিয়া যুবক লইল তুলিয়া ।

প্রাণেশের করে ক্ষীণ কটি থানি,

বেন ফুলধনু হুগিয়া পড়ি ।

আনু থানু কেশে, আরক্ত বদনে,

আয়ত নয়নে, কি ক্রীড়া মরি !

অশ্রাস্ত হাসিয়া আবেশ নয়নে
পতিমুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
বাড়াইছে কর ধরিতে সে ছবি,—

খেলে ছই পদ্ম কি লীলা করিয়া !

কি লীলা করিয়া দোলে কর্ণজল !

কি লীলা করিয়া খেলিছে বলয় ।

দোলে মুক্তাহার কি লীলা করিয়া !

শিঞ্জিনী-শিঞ্জিন কিবা লীলাময় !

আবার আবার সহস্র চুষন,

চুষন সহস্র আবার আবার ;

হাসির লহরে সহস্র সহস্র

কুসুমবর্ষণ কিবা অনিবার !

বাসলা যুবক আঁকিতে সে ছবি ;

কক্ষতলে বালা বসিল মানে,

বাতিভরা মেঘ বিস্তৃত নয়নে,

ছল ছল চাহি গালিচাপানে ।

কহে অভিমত্যা—“দেখ, এসে দেখ ।

কেমন সুন্দর ফলেছে রঙ্গ ।”

মাথা নাড়া দিয়া কহে ক্রোধে বালা—

“নাহি চাহি ভালবাসার ঢং ।

বড়ই আমার লেগেছে বিষম ।”

হাসি কহে যুবা—“লেগেছে কোথায়—

শরীরে, মনে, কি নাকের আগায় ?

দিতেছি ঔষধ আয় কাছে আয় ।”

“আয় কাছে আয়”—মাথা হেলাইয়া

হাসিকান্না-মুখে কহিল উঠি ।

নবীনচন্দ্রের ব্রাহ্মবিলা ।

উঠিল যুবক ; ছুটিল যুবতী—
 উড়ে কেশভার চরণে লুটি ।
 আঁকিতে লাগিল যুবা পুনঃ ছবি ;
 চুপে চুপে বালা ফিরিয়া আসি,
 ধীরে ধীরে ধীরে বীণাটী লইয়া
 ঢালিতে লাগিল অমৃতরাশি ।
 সেই বীণা তানে প্রাণেশের প্রাণে
 বহিতে লাগিল কি সুধাধারা !
 আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর
 কি আঁকে না জানে,—আপনানাহারা !
 মিশিল বীণায় কণ্ঠ উত্তরার,
 বীণায় জীবন্ত বীণার লয় !
 ভরিয়া শিবির সঙ্গীত-তরঙ্গ
 হল, অপরাহ্ন-গগনময় ।

“ওই যা ! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি !
 উত্তরে ! উত্তরে ! পায়ে পড়ি তোরে”—
 কহে অভিমত্যা—অন্ন আছে বাকি,
 এই করি শেব, মাথা খাস মোর ।”
 “এ রাগিনী ভাল নাহি লাগে যদি
 বাজা’তেছি অন্ন”—উত্তরিল বালা,
 ছড়ের আছাড়ে, ঝন্ ঝন্ ঝন্,
 কার সাধ্য বসে কাণ ঝালাপালা ।
 এক করে টিপি কপোলযুগল,
 অন্ন করে বীণা লইয়া কাড়ি
 কহে অভিমত্যা—“এই দেগ তবে
 সাধের এ বীণা ভাঙ্গি আছাড়ি ।

হি-হি-হি-হি হাসি—“দাইয়া ! দাইয়া !”

উঠিল চীৎকার উপরে চীৎকার,

গর্জি বেগে স্থলোচনা ঠাকুরাণী,

নামিয়া আসরে দিলেন বার ।

অস্তুরাল হ’তে খাত্তী স্থলোচনা

দেখি অভিনয় মোহিত মনে,

এবে ছল-বোষে রাঙ্গাইয়া অধি

কহিল গর্জিয়া অকুটী সনে

স্থলো। কি হয়েছে বল ?”

উত্তর। মেয়েছে আমার ।

স্থলো। কে মেয়েছে ? অভি ?

অভি। দাইয়া ! অভাগী

মিছে কথা কহে ।

স্থলো। চোরের বেটা চোর,

চোরের ভাগিনা ! কি বলিলি কি ?

দাইয়া অভাগী ? ভদ্রা কৃষ্ণাঙ্কন

ধান করে যার মহিমা অপার ?

অভি। না দাইয়া ! আমি আঁকিতেছি ছবি,

শুধু জালাতন করে বার বার ।

স্থলো। বটে হুঁষ্ট মেয়ে ।

উত্তর। জানি লো, জানি লো,

তুই ওর দিকে টানিস্ সতত ।

ইহবে বাবার সমক্ষে বিচার,

মার কাছে হবে উচিত মত ।

স্থলো। কে রে তোরা বাবা ? কি বলিলি তুই ?

দিলিরে আমার বিচার দোষ ?

আমার উপরে কে সে বিচারক !
চল দেখি যাই ।

করি মহারোষ,
ছুটে বালিকায় অন্ধেতে লইয়া,—
হাসে পুষ্পরাশি সে পুষ্পদোলায় ।
চুখিয়া চুখিয়া সেই হাসিরাশি
হাসিতে হাসিতে স্নুলোচনা যায় ।
ভাবে অভিমন্যু—“দাই মা এ কাষ
করিল কি ভাল ? হৃদয়ে অম্মার
রাখি মেঘ, গেল বিজলি চলিয়া,
আজি ছবি আঁকা হবে না আঁক

তৃতীয় সর্গ ।

—:~:—

নারী-ধর্ম ।

—•—

“অভাগি ! এরূপে কি মো অনিষ্টায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?”—
কহে স্নুলোচনা খেদে,—সুভদ্রা শিবিরে ফিরি,
গ্লান দেহ ক্লাস্তির আধার
রাখিয়া শস্যার হবে হইলা অর্ধশায়িতা,
অবসন্ন মূর্ত্তি করণ্যর ?

শ্রুত গ্রন্থি গেল ধূসি, ধূসরিত কেশরাশি
শূলামাথা পড়িয়া শয্যায় ।

পাশে বসি হুলোচনা চাকু স্বকোমল করে
ধীরে ধীরে বিনাইছে তায় ।

অলো ! অভাগি ! একুপে কি লো অনিদ্ৰায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?

নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার ।

শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রুষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার ।

রঙ্গিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
শূণ্য ধূসর কেশভার ।

আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া বণ,
দেখি নাই তব হাসি মুখ ।

এইরূপে রাত্রি দিন মরিয়া যড়ার তরে
নাহি জানি পাণ্ড কিসা সুখ

সুত । অত্যধিক রমণীর আছে কিবা সুখ ।

রোগে শান্তি, হুঃখে দয়া, শোকের্তে সাহসনাছায়া
দিদি ! এই ধরাতলে রমণীর বুক ।

এতাদিক রমণীর আছে কিবা সুখ !

বেষতি অনল জল স্বজিলেন নারায়ণ,
স্বজি সেইরূপ দিদি ! যোগ, শোক, হুঃ,

স্বজিলা অনন্ত প্রেম-পূর্ণ নারীবুক ।

অহুঃ আর কিবা সুখ, দায় । এইরূপে যদি,

চালিয়া অমৃত মূর্তে, শান্তি যন্ত্রণায়,

রমণী জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায় !

ওই দেখ নিত্য দ্বিত্য কেতই পুরুষরত্ন
পালিয়া স্বধর্ম কিবা ত্যজিছে জীবন !
পালিতেছি আমিও কি স্বধর্ম তেমন ?

স্বলো । মানিলাম নারী-ধর্ম আর্ন্ত আহতের সেবা,

কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন ?

তাহাদের মড়া নিয়া তাহারা মরুক গিঁধা,

তোব কেন মাঁধাবাধ্য হেন ?

স্বভ । শত্রু !—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত ?

রক্ত মাংস নাহি কি তাহার ?

তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?

এক জল, ভিন্ন জলাধার ।

তাও এক ধাতুময়, অস্ত্রে একরূপে হয়

সর্ব দেহ ক্ষত ও বিক্ষত ;

সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যুমুখে

শত্রু মিত্র হয় নিপতিত ।

শত্রু !—এক ভগবান সর্ব দেহে অধিষ্ঠান,

সর্বময় এক অদ্বিতীয় !

কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা ?

কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?

স্বলো । শত্রুকেও তাহা বলি করিব কি মিত্র জ্ঞান ?

মিত্র ওই কর্ণ হুর্যোধান ?

হুর্জনের (ও) হুঃখে হুঃখী হইব কি ? সমভাবে

বিষমৃত করিব গ্রহণ ?

স্বভ । যেই জন পুণ্যবান, কে না তারে বাসে ভাল ?

তাহাতে মহত্ব কিবা আর ?

পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তাহে,

সেই জন প্রেম-অবতার ।
 অগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
 দেখ অন্ধে মাতা বহুধার !
 সমুজ্জল রত্ন সহ অনন্ত বালুকারাশি
 বহিতেছে গর্ভে পারাবার ।
 জগতের সামানীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
 মানবের কি শিক্ষার স্থান ।
 সর্বত্র সমান প্রেম, সর্বত্র সমান দয়া,
 সর্বত্র কি একত্ব মহান !
 না, দিদি !—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
 আমাদের শত্রু মিত্র নাই
 বরিবার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
 সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই !
 মিত্রকে যে ভালবাসে, সন্ধ্যা সে ভালবাসা,
 সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার !
 শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
 সেই জন দেবতা আমার !
 জনকজননীমুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
 শিশু কিছু নাহি জানে আর
 ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে
 ভ্রাতাভগ্নী-পূর্ণ এ সংসার ।
 পতি পত্নী প্রেমরঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
 আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন ।
 ক্রমে সন্তানও স্নেহ দেখায় অনন্তমুখ,—
 পুণ্যতীর্থ সাগর-সঙ্গম !
 অথবা এই, দাদা ! কালি কৃষ্ণার্জুন মত

দেখিতাম সকল সংসার ।
 মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
 অতিমহা উত্তরা আমার ।
 পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, পতি, পুত্র, মহাবিশ্বে,
 এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায় ।
 অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি কি ফে লো অনন্ত আছে
 প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায় ।
 সরিল না কথা আর ; নিশ্চল প্রতিমা মত
 হই জন রহিল চাহিয়া
 সেই অনন্তের পানে, সেই অনন্তের ধ্যানে,
 প্রেমানন্দে হৃদয় ভরিয়া ।
 “আমিও তেমতি বোন ! এক সত্যভামাময়” —
 চাপি হাসি কহে স্নুলোচনা —
 “দেখি জীবগণ যত ; ইচ্ছা সফলের সঙ্গে
 ঝগড়া করি পুরিয়া বাসনা ।
 দাবকা ছাড়িয়া যেন আসিয়াছি কত যুগ ।
 মরি জিহ্বাকণ্ঠগনে হায় !
 তোব কাছে আসি যদি বিজি বিজি কি বকিস
 গুনি মম হাড় জ'লে যায় ।
 যাই উত্তরার কাছে, তার সেই হিহি হাসি,
 একেবারে কাণ কালাপালা ।
 পোড়া শাওড়ীর মুখে চিরদিন চাপা হাসি,
 বউটী ফুটন্ত হাসিডালা !
 গালি পাড়, — তাও হাসি, মার, — অনর্গল হাসি,
 হাসির কিছুতে নাহি শেষ ।
 বুড়িয়া ঝগড়া করি, হাসিতে ঝগড়ার কোঁক

ভেসে যায়,—এ ত জ্ঞানী বেশ !

ছল্লভ রমণীজন্য লভিয়া, ঝগড়া যদি

না করিল, জীবন বিকল ।

তাই, লো বিরলে বসি, সত্যভামা উদ্দেশেতে

ছাড়ি শব্দভেদী শরদল ”

স্বভা। সত্য নৌ উত্তরা, দিদি ! ফুটন্ত হাসির ডালা,

জ্যোৎস্না-প্রাবিত পুষ্পবন ।

সদয়ের জ্যোৎস্নায় নাহি সংসারের ছায়া,

নির্মল আনন্দ-প্রস্রবণ ।

সেই হাসি, সেই ভাষা, সে আনন্দ, ভালবাসা,

কিবা স্বর্গ, সরলতাময় !

সরলা আনন্দময়ী আমার উত্তরা, দিদি !

এই জগতের ঘেন নয় !

কৃষ্ণার্জুন শিষ্য শিষ্যা উভয়ের সংমিলন—

মিলন সৌন্দর্য্য প্রতিভার !

ঘুমন্ত প্রতিভা-অঙ্কে ফুটন্ত সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন ;

কি সংযোগ শশাঙ্ক সূধার !

স্বলো। হউক তা, কিন্তু মেনে না জানে ঝগড়া ছুঁড়ী,—

কমলা কণ্টকে মনোহর !

স্বভা। কেন, হু'জনে ত দিদি ! কবে ঝগড়া অহরহ ;

সে কোন্‌ল কতই সুন্দর !

স্বলো। মুখ হুই শিক্ষকের শিক্ষার অভাব টুক

চাহিতেছি করিতে পূরণ !

কিন্তু সে হাসির স্রোতে সকল ভাসিয়া যায়,

হইতেছে পণ্ড মম শ্রম ।

স্বভা। দিবসান্তে কৃষ্ণার্জুন আসিলে লিবিবে ফিরি

১০৮৮ . নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

ঝগড়া ত বাদি তব নাই ।

তাতে কি উদর তোর নাহি ভরে, পোড়ামুখি !

শিশু হুটী নিয়ে মর তাই !

স্বলো । হরি ! হরি ! এ কি কথা ! মিটল না সাধ যার

সত্যভামা-কোন্দলসাগরে,

কিসে সে গণ্ড-জলে বাঁচিবে হ, —এত দিনে

স্বলোচনা পড়িল ফাফুরে !

স্বভ । কোন্দল-রোগের তোর করিতেছি প্রতিকার,—

সঙ্গে মম থাকি নিরন্তর

করিবি আহত-সেবা, পালিবি রমণী-ধর্ম,

আয়, দিদি ! এই সত্য কর ।

স্বলো । তোর নারী-ধর্ম নিয়া মরু শিষ্য মড়া ঘাটি,

আমার তাহাতে কাষ নাই ।

আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণাঙ্কন, অত

আহত সেবিতে আমি যাই !

উত্তরা ও বলিমহু, —তুই পুত্র কল্পা মম—

থাকিব লইয়া আমি বুকে ।

এই মম নারী-ধর্ম ; থাকে যদি ধর্ম আর,

যারি শত ঝাটা তার মুখে ।

এই ব্যঙ্গ আবরণে কি হৃদয়-মেহোচ্ছ্বাস !

পরশিল মরম ভঙ্গার ।

তুই আখি ছল ছল চাহি শূত্র, কহিলেন—

মেহময়ী মৃতি করুণার—

“আপন পুত্রের মাতা, আপন মাতার পুত্র,

যে হয়, কি মহত্ব তাহার ?

পুত্রের মাতা, পুত্রের মাতার পুত্র,

যে হয়, সে পুণ্য-পারাবার !”

“জয় ! সুভদ্রার জয় ! অৰ্জুনমহিষী জয় !”—

কে গাইল বাঁশরীর স্বরে ?

হলো। আ মলো ! কে কালামুখি ! “জয় সুলোচনা জয়”—

তোর বুঝি কঠে নাহি সরে ?

“জয় পাণ্ডবের জয় ! জয় কোরবের জয় !”—

ভনে ভনে হাড় আলাতন :

“জয় ! সুভদ্রার জয় !”—তাহার উপরে কেন

কাটা ঘাঁয়ে নুন বরিষণ ।”

মহার্ষি শিবির-দ্বারে ব্যাস-শিষ্য এক জন”—

সখী অগতরা কহে আসি ।

বাস্তে ভদ্রা কহে—“আন পাণ্ড অৰ্ঘ্য দিয়া তাঁকে ।”

সুলোচনা ক্রোধে অগ্নিরাশি ।

জানি সেই বুড়া বিনা এমন বেহুদ আর

তালকাণা কেহ কি লো হয় ?

খেটে খুটে সাগাদিন লজ্জিতেছি এ আরাম,

এলো কি না—“সুভদ্রার জয় !”

এখনই সে অহুত ঘট, পট, সৰ্বভূত,

খোলা যাবে কত শাস্ত্র-হাঁড়ি ।

গাই উত্তরার কাছে, হাসির তরঙ্গে তার

যদি ভূত নামাইতে পারি ।”

শিবির-হাযারে আহা ! ও কি মূর্তি মনোহর !

সখীর না চলিল চরণ ।

নৌলোৎপল প্রতিমায় আগিতেছে ঘোবনের

কি মধুর শ্রুতম স্বপন !

স্বপ্নর গৈরিকে ঢাকা অপরাজিতার রাশি

সুকুমার দেহ মনোহর ।

ললাটে চুড়ার মত বেণীবন্ধ কেশরাশি,

অমার্জিত ধূলায় ধূসর ।

সুগোল কোমল মুখে যুগল নয়ন ভাসে,

আকর্ণবিস্তৃত ছল্ ছল্ ।

ভাসিছে যুগল তারা, নীলিম প্রভাতাকাশে

ভূই সুখতারা সমুজ্জ্বল ।

কি তারায়, কি নয়নে, শাস্ত স্থির সে বদনে,

কুজ সেই অধর কোণায়,

কি ত্রিদিব-কোমলতা, কি ত্রিদিব-স্নেহকণা

জদয়ের, ভাসিতেছে হায় !

প্রণমিতে পার্থ-প্রিয়া উঠিলে, নিবারি যুবা

কহিল.—কি কণ্ঠ সুকুমার !—

“যে ধর্ম্মে দীক্ষিত আমি, তুমি প্রতিমূর্ত্তি তার,

দেবি ! তুমি নমস্তা আমার ।

যে ধর্ম্মের আত্মা রুক্ষ, বাহুবল ধনঞ্জয়,

জ্ঞানবল রুক্ষদৈপায়ন,

দেহ যার মূর্ত্তিমতী আপনি সুভদ্রা তুমি,

পুণ্যময়ী প্রেম-প্রসবণ,

এ পবিত্র মহাগীতা তার সুধাময়ী ভাষা,

আশীর্বাদ সহ উপহার

বিশ্বারাধ্য গুরুদেব অর্পিলেন তব করে,

স্বধাকরে সুধার ভাণ্ডার ।

মানব-অদৃষ্টাকাশে বিরাজিয়া পুণ্যবতী,

গীতামৃত করি বিকীরণ,

সুশীতল জ্যোৎস্নায় জুড়াও, জগতারাধ্যো !

• জগতের তাপিত জীবন ।”

উদ্দেশ্যেতে বৈপায়নে প্রণমিয়া ভদ্রাদেবী,

শিরে গ্রহ করিয়া ধারণ,

পার্বস্থিত পুষ্পাধারে রাখি শূন্তপানে চাহি

বহিলা বসিয়া শূন্তমন ।

অলৌচনা চিত্রবৎ তপস্বীর ক্ষুদ্র মুখ ।

স্থিরনেত্রে রয়েছে চাহিয়া ।

সেই তীব্র দৃষ্টিতলে, চাহি ধরণীর পানে

আছে যুবা সলজ্জ বসিয়া ।

সেই কণ্ঠ, সেই ভাষা, দ্বিতীয়ের সে মূর্ছনা,

স্থতির কি সঙ্গীত অতীত,

যেন স্তম্ভার কাণে, যেন স্তম্ভার প্রাণে,

বাজিল মধুর স্বপ্ন-গীত ।

বহুক্ষণ অস্থায়ী বসি ভদ্রা ধীরে ধীরে

বহিলা মধুরে—“তপোধন

আছিলেন প্রতিশ্রুত পবিত্রিতে কুরুক্ষেত্র

পুনর্বার কার পদার্পণ ।”

উত্তরিল শিবা ধীরে—“সাক্ষাকৃত্য করি শেষ

করিবেন শুভ আগমন ।

গোধূলিরে পরধূলি দিয়া উদিবেন, দেবি !

ঋষিকুল নক্ষত্র প্রথম ।”

উভয় নীরব পুনঃ, উভয়ের হৃদয়েতে

ভাসিয়াছে কি যেন উজ্জ্বল ।

দেখিল তপস্বী, নেত্র ছল ছল স্তম্ভার,

কি করুণা করিছে বিকাশ ।

সবিল না কথা আর, বিদায় হইয়া যুবা

ধীরে ধীরে ত্যজিল শিবির,
কহে স্নলোচনা — “এর স্বধিপনা বল, ভদ্রা,
করি আমি এখনি বাহির ।
এ যদি সে শৈল নহে, নহি আমি স্নলোচনা,
জ্ঞানে ছুঁ ডি ছদ্মবেশ কত ।
অপরাজিতার আহান মরি মরি ! কি পুতুল !
ভস্মভ্রা নীরব চিত্রমত ।

চতুর্থ সর্গ ।

—:~:—

মাতা-পুত্র ।

—:~:—

“মা ! মা ! ওমা ! মা, মাযার !” — উচ্ছ্বসিত প্রাণে
ডাকি অভিমুখ্য আসি বসিয়া গলায়
অননীর, চাহি মার ব্ৰহ্মপুত্র পানে,
রাগে যুগ মার বৃকে ক্ষুদ্র শিশু প্রায় । —
উপধানে অবসন্ন অঙ্গ আরোপিয়া
এখনো স্নতঙ্গ দেবী বসিয়া শিবিরে ।
অনন্বে হৃদয়-নিধি হৃদয়ে লইয়া,
অসংখ্য চুষন স্নেহে বরষিলা শিরে ।
আসি গরজিয়া মস্তা মাতঙ্গিনী মত
স্নলোচনা ক্রোধভরে লইল কাড়িয়া

মাতৃ-বুক হাতে পুত্র সীতঙ্গিনী মত
কহিল কৃত্রিম ক্রোধে ঘন গরজিয়া—

“হারে রে ! কৃতঘ্ন ছেলে ! উহারে না বলিতে মা
কতবার করিয়াছি মানা ।

বল আমাকেই মা,—“মা” ! বল আরবার মা,—“মা

ডাক আরবার বলি মা,—“মা” !

আটিয়া ধরিয়া বুকে . . . চুম্বি মুখ স্নলোচনা

যত কহে, হাসি থল থল

তত ডাকে: “মম” বলিয়া . . . চাহি তার মুখপাটে .

চারি চক্ষু স্নেহে ছল ছল !

“বল, নহে স্নভদ্রা মা” . . . উত্তর—“স্নভদ্রা মা

পড়িল অমনি গালে চড় !

“বল, নহে স্নভদ্রা মা” — “স্নভদ্রা আমার মা” —

পুনঃ চড় স্নেহ-পুষ্পশর !

স্নলো। হাঁরে ! কৃতঘ্নের ছেলে এই ধর্ম্য তোব !

আমি পালিলাম, তুই পুত্র হলি ওর ?

অভি। আমার যুগল মাতা স্নেহ-নির্ঝরিণী,

তুই লো শূলীমা, আর স্নভদ্রাজননী !

স্নলো। “শূলীমা ! শূলীমা !” — আচ্ছা আশুক এগন

তোব সে যুগল পিতা, -- নর নারায়ণ !

কেমন শূলী রে আমি যাবে আজ জানা,

দেখি হৃৎজনের আছে কাণ কল্পখানা ।

অভি। গালি দিস্, তোরে লাহি মা ডাকিব আর ।

আচ্ছা সত্য কথা তবে বলি এইবার ।

আমার যুগল মাতা, করুণার ছবি,

স্নভদ্রা ও স্নলোচনা— দেবী ও মানবী

সুভদ্রা মায়েব স্নেহ স্বর্গ নিরদল,

সুলোচনা মার স্নেহ ধরণী শীতল ।

সুলো। সারাদিন মড়া ঘেঁটে মরে ওই পোড়ামুখী,

তোরে নাহি দেখে একবার,

‘দেবী মা’ হইল রে সে, ‘মানবী’ হইলু আমি,

সে স্বর্গ লো, আমি মাটি ছার ?

অভি। আমাকে দেখিতে, ‘মা গো, আছে ত মা সুলোচনা,

হৃদয় স্নেহের পারাবার ।

তাদের দেখিতে বল কে আছে মম ! রণক্ষেত্রে ?

তাদের মা জননী আমার ।

সে দিন মা ! রণক্ষেত্রে প্রথর ববির

জলিতেছে মস্তক উপর ।

জলিছে প্রথরতর চারি দিকে যুদ্ধানল,

পিপাসায় হইলু কাতর ।

সারথি আনিল বারি, আগ্রহে মা পানপাত্র

লইয়াছি করিবারে পান,

দেখিলু অদূরে মা গো ! পড়িয়া সৈনিক এক

অস্ত্রাহত, কণ্ঠগত-প্রাণ ।

মৃত্যু-মুখে পিপাসায় রয়েছে চাহিয়া হায় !

মম পানপাত্র, নেত্রস্থির ।

ছুটে গিয়া কাছে তার, কহিলাম—“পান কর,

আনিয়াছি শুলীতল নীর !”

কহিল সে ক্ষীণবর্ণে—“কুমার ! বালক তুমি,

আপনি কাতর পিপাসায় ;

এখন মরিব আমি, নিবিবে পিপাসা মম,

পান করি কি হইবে হায় !”

কাঁদিয়া তাহার শির' রাখিয়া অঙ্কে আমার,
 কহিলাম—“পিপাসা আমার
 কিছু আর নাহি ভাই। তুমি নাহি কর পান,
 এট জল ছুঁইব না আর।”
 বাম করে খুলি মুখ দিলাম ঢালিয়া বারি,
 পান করি কহিল আবার,—
 “এমন না হবে কেন, অভিমত তুমি পুত্র
 আমাদের মাতা স্তভদ্রার।”
 বহিল মুগ্ধ ধারা হৃৎ-ঘনে, ছুই তারা
 ক্রমে ক্রমে অপলক স্থির;
 মাতার পবিত্র নাম থাকিতে অধর-প্রান্তে
 বীর-স্বর্গে চলি গেল বীর।
 সেই জগতের মাতা আমার স্তভদ্রামাতা—
 ছাড়ি গলা স্নলোচনা মার,
 গলায় মা স্তভদ্রার পড়ি, কহে— “মা ! মা ! ওমা !
 জগতজননী মা আমার !”
 স্নেহভরা মুগ্ধখানি স্তভদ্রা লইয়া বৃকে
 চুস্বিলেন আবার আবার,
 কহিলেন,—“সত্য বৎস ! তুচ্ছ ভদ্রা, স্নলোচনা,
 জগতজননী মা তোমার।
 মাতৃ-প্রেম-পূর্ণ বৃকে দেখিয়া তাঁহার মুখে
 পরিপূর্ণ অখিল সংসার,
 ঢালিও এ প্রেমধারা, তখন দেখিবে মাতা
 তই নহে, অসংখ্য তোমার !”
 ছয় চকু ছল ছল যেন পুষ্প-পাত্রেওৎপল !
 কি সঙ্গীত জগৎ প্লাবিত।

হৃদয়ের যন্ত্রে এবে " বাঁজিতেছে একতানে !

তিন জন রহিলা শুনিয়া !

"এ কি গ্রন্থ ?"—কহে যুবা, ল'য়ে প্রসারিয়া কর,—

"ভগবদগীতা" কি মা ! কবি কে ?"

সুভ !

মহর্ষিবর ।

পড়িতে লাগিলা পুত্র হইয়া নিবিষ্টমন,

শুনিতে লাগিলা মাতা গীতামৃত-প্রস্রবণ ।

প্রথম অধ্যায় শেষ করি উচ্ছ্বসিত মনে

কহিতে লাগিলা যুবা, ভ্রমিয়া অধোবদনে,—

"বুঝিলাম এতদিনে, না হয় প্রবৃত্তি মম

কেন এই মহাযুদ্ধে ? যথায় ক্ষত্রিয়গণ

জগতের এক ক্ষেত্রে হইয়াছে সমবেত,

সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত !

কেন সিংহাশু আমি, শুনি বীর-সংহনাদ

না নাচে হৃদয় মম । পাছে হয় অপবাদ

কেন শুধু যত্নমত কমি যুদ্ধে যোগদান,

কেন স্লথ করে আমি ছাড়ি লক্ষ্যহীন বাণ ।

'কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হটতেছে রোমাঞ্চিত ;

প'ড়ছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত ।

'কি কাজ রাজো, গোবিন্দ ! কি কাষ ভোগে, জীবনে ?

যাদের কারণ

'চাহি রাজ্য ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে

তাজিতে জীবন ।

'হই বা নিহত যন ইহাদের করে আমি.

হে মধুহৃদন !"

‘তুচ্ছ মহী, ইহাদেবের গী ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে
বধিতে কখন ।’—

কি গভীর কাতরতা, মা গো ! পিতার আমার !
হৃদয় কি প্রেম-স্বর্গ, কিবা দয়া-পারাবার !
কি দেবহৃদয়ে ! অহো ! কি বাড়ব প্রস্রবণ !
কি প্রেম-সলিলে ভাসে কিবা বীৰ্য্য-হতাশন !
কি ধর্মভীরুতা সহ কিবা বীর-পৌরুষতা !
কি বীরত্ব-পারিজ্বাতে কি স্নেহ-ত্রিদিবলতা !
পিতার এ ভাব যবে, মা গো ! কি বিশ্বয় তবে,
অযোগ্য পুত্রের তার হৃদয়ে এ ভাব হবে ?

‘হায় মা ! তথাপি পিতা করুণহৃদয় মম,
কেন করিছেন বল এই মহাপাপ বণ ?
স্বয়ং নারায়ণ কেন, হইয়া সারথি তাঁর,
করিছেন এইরূপে সংহার মা ! এসংসার ?
ভক্তিতে পড় বৎস ! এই গ্রন্থ জ্ঞানাদার,
বুঝিবে বহুশ্রু তুমি পাইবে উত্তর তার ।

স্বভূ ।

তখন বসিয়া যুবা লাগিলা অনন্ত মনে
পড়িতে সে মহাগ্রন্থ, অতুলিত ত্রিভুবনে ।
শ্লোচনা কাছে বসি হাই তুলি কিছুক্ষণ,
চলি গেল ব্যাসদেবে করি মিষ্ট সম্ভাষণ ।
সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, অধ্যায়ে অধ্যায়ে যত
পড়িতে লাগিল পুত্র, জননী জলের মত
লাগিলেন বুঝাইতে সেই ধর্মতত্ত্বরাশি,—
নিতা, সত্য, সনাতন,—ভক্তির উজ্জ্বল ভাসি
উজ্জ্বল উজ্জ্বল যুবা রাখি’ স্ত কখন

অনন্ত যুগে, হিহব অনন্ত

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

ক্রমে একাদশ সর্গ — কিবা দৃশ্য ! বিশ্বরূপ !

বিরাট ও বিশ্বময়, চিন্তাতীত, অপরূপ !

সর্বদেহ বোমাঞ্চিত, পড়িয়াছে গ্রহ খসি,

চাহি শূন্য পানে যুবা বিস্থিত শুভিত্ত বসি !

অভি ।

এক কৃষ্ণ রূপে ব্যাপ্ত দেখি বিশ্ব চরাচর,

অনাদি অনন্ত কিবা বিরাট পুরুষবর !

সংখ্যাতীত সৌর বাজ্য, চন্দ্র, তারা, প্রভাকর,

ঝলসি সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর !

সংখ্যাতীত ধূমকেতু, সৌর অগ্নি অস্ত্রমত,

অনন্ত পুরিয়া স্বনে ছুটিয়াছে অবিরত !

ছুটিয়াছে মহামল্ল মেঘবৃন্দ অগগন

বিক্ষেপিয়া তাড়িতাঙ্গ ধন বজ্র বিভীষণ !

এতহু গ্রহে বিধূনিত সংখ্যাতীত পারাবার,

বহিতেছে সংখ্যাতীত নদ নদী অনিবার ।

অসংখ্য ভূধরমালা, অগ্নি-গিরি অগগন,

সধুম্ন গৈরিক-রাশি করিতেছে উদ্গিরণ ।

মুহুমুহু কত গ্রহ, অগ্নি-উজ্জ্বল বিকীর্ণিত

করিয়া, বিরাট শব্দে হইতেছে বিচূর্ণিত !

স্বাবর জঙ্গম সব হইতেছে অবিরত

সৃষ্ট, স্থিত সীন দেহে, জলে জলবিধ মত ।

অনন্ত করাল-মুক্তি করিছে বিশ্ব সংহার,

উঠিয়াছে গ্রহে গ্রহে কি ভীষণ হাহাকার !

করণানিধান কৃষ্ণ, মা গো ! জগন্নাথ হরি,

কেন নাশিছেন বিশ্ব এ ভীষণ রূপ ধরি ?

অস্থিতীয়, সর্বময়, সর্বভূত-মুলাধার

যদি বৎস ! বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব তব রূপ তাঁর ।

জ্ঞানাতীত বিশ্বনাথে মাম্বের বুঝিবার
বিশ্ব ভিন্ন নাহি বৎস ! সোপান দ্বিতীয় আর ।
দেখিলে এ বিশ্বরাজ্য, অভিন্ন চেতনে জড়ে,
নির্মম সংহার নিত্য সর্বত্র নয়নে পড়ে ।
নহে নির্দয়তা, বৎস ! ধ্বংসনীতি দয়াধার ।
ধ্বংস বিনা এ জগতে উঠিত কি হাহাকার !
রুদ্ধ কর ধ্বংসদ্বার ; মুহূর্ত্তে জীবগণ
অগ্ন্যভাবে, স্থান্যভাবে, করিবে কি বিভীষণ
দাক্ষিণ্যমুদ্রণাভোগ ! মাগিবে দয়া মৃত্যুর
কাতরে, সলিল যথা মরু-দগ্ধ তৃষ্ণাতুর ।
রুদ্ধ কর ধ্বংস-দ্বার, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান
করিবে ভারত মত, জগত মহামুশান ।
কৌরবের লোভ হ'তে করিতে বিশ্ব-উদ্ধার,
ধ্বংস বিনা বল, বৎস ! আছে কি উপায় আর ?
পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত ।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরমা বন অনল ও হলাহল ।
নির্লিপ্ত পরমব্রহ্ম, নিত্য, সত্য, সনাতন ;
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে নীতিচক্রে বিচরণ ।
সংখ্যাণীত ধ্বংস বধা, সৃষ্টি তথা সংখ্যাণীত
হতেছে মুহূর্ত্তে, স্থিতি এক্রপে হয় সাধিত ।
সর্বভূতহিত তবে ধ্বংস নির্মূল্যতা নয় ;
দগ্ধ করে বৈদ্যনর, তবু অগ্নি দয়াময় ।
ধ্বংসনীতি ধর্ম্মনীতি, ধ্বংসরূপী নারায়ণ ।
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, ধর্ম্মযুদ্ধ এই রণ ।

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

আবার আবার পুত্র পিতার সে মহাধ্যান
 পড়িল বিহ্বল চিত্তে, অতঙ্কপূরিত প্রাণ
 করি পাঠ সমাপন, শিবির-গবাঙ্কপথে ।
 চাহি আকাশের পানে রহিল, জ্ঞানের রথে
 স্তুতিত বিস্মিতমন হইয়া যেন উখিত
 কি অনন্তে, কি আলোকে, গান্ধীর্ষ্যে তন্ননাভীত,
 হইল বিলীন ক্রমে; ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে।
 মিশাইল বারিবিষ যেন মহাপারাবারে।
 অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রমে, কক্ষে কক্ষে ধীরে ধীরে,
 প্রবেশিল অভিমুখা অপূর্ব মহামন্দিরে—
 অতল, অনন্ত-স্পর্শী ; পশি কক্ষে উদ্ধতম
 দেখিল কি মহাদৃশ্য—গঙ্গাসাগরসঙ্গম !
 জাহ্নবী জড়প্রকৃতি চেতন পুরুষবক্ষে
 মিলিয়াছে, মহাগীত উঠিতেছে কক্ষে কক্ষে,—
 “আমা হ’তে পরতর নাহি কিছু, ধনঞ্জয় !
 আমাতে গ্রথিত বিশ্ব, সূত্রে যথা মণিচয় ।”
 চাহি উর্দ্ধ পানে স্থির শুনিতেছে এই গীত
 জ্ঞানস্বরূপিণী মাতা কুমার প্রতিভাবিত ।
 কি আনন্দ-মন্দাকিনী বহে উভয়ের চক্ষে !
 কি পূর্ণ আনন্দসিদ্ধ উচ্ছ্বসিছে হই বক্ষে !
 প্রদোষ অক্ষুটালোক ধীরে ভক্তি ভরে আসি,
 এ আনন্দে, এ উচ্ছ্বাসে, চালিছে গান্ধীর্ষ্যরাশি !
 কুমার অক্ষুটালোকে ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
 গান্ধীর্ষ্যপূর্ণ ধনয়ে শিবিরে, আনতশিরে ।
 জননী প্রকুলমুখে কহিলা প্রকুলস্বরে,—
 আসল পূরবী সাক্ষা-সমীপে ভক্তিভরে—

“বুঝিলে কি, অভিমত!”—অব্যক্ত ব্রহ্ম পরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন ।

কল্পক্ষেত্রে সর্বভূত তাঁহার প্রকৃতি পায় ;

কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি হয় পুনরায় ।

এইরূপে চরাচর জন্মি জন্মি হয় লয় ;

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বৎস ! একরূপে সাধিত হয় ।

‘যথা আকাশেতে নিত্য সর্বগামী মহাবায়ু
করে অবস্থান’,

সেইরূপে সর্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত,—

• • তিনি ভগবান ।

• নিলিপ্ত স্মৃতা হেতু সর্বব্যাপী সর্বগত

আকাশ যেমন,

সর্বদেহে অবস্থিত নির্বিকার পরমাত্মা

নিলিপ্ত তেমন ।

নবের কৰ্ত্ত্ব, কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম-ফল কদাচিত

না সৃজন বিভূ, জীব স্বভাবেতে প্রবর্তিত !

কিবা জীব, কি উদ্ভিদ, চেতন, অজড়, জড়,

সকলই নিজ নিজ স্বতন্ত্র প্রকৃতিপর ।

স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বয়ং যবে নারায়ণ

নিলিপ্ত কৰ্ম্মেতে বত,—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন—

স্বপ্রকৃতি অনুসারে নিলিপ্ত কৰ্ম্মসাধন

মানবের একমাত্র মহাধৰ্ম্ম সনাতন ।

ব্রহ্মে সমর্পিয়া কৰ্ম্ম নিকাম যে কৰ্ম্মে বত,

না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্বপজে জল মত ।

সর্বভূতস্থিত ব্রহ্ম ; সাধ সর্বভূত-হিত,

হইবে তোমার কৰ্ম্ম ব্রহ্মে তবে সমর্পিত ।

জলধির হিত যাহু, তাহা জলবিন্দুহিত,
 জগতের হিত, বৎস ! তোমার হিত নিশ্চিত ।
 অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত,
 জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
 স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম কর পালন,
 এইরূপে কর্মফল ব্রক্ষে করি সমর্পণ ।
 ফলিয়া অনন্ত তরু, বরষিয়া মেঘদল,
 সাধিছে কি স্বার্থ ? বিশ্ব আদর্শ নিকাম ।
 আপন প্রকৃতি মতে ফলে তরু, বর্ষে ঘন,
 জগতের হিতে সাধি স্বধর্ম মোক্ষ পরম ।
 বীরত্বপ্রকৃতি তব, স্বধর্ম যুদ্ধ তোমার ;
 ধর্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয়ঃ ক্ষত্রিয়ের নাহি আর ।
 সুখে দুঃখে অনাসক্ত, লাভালাভে জয়াজয়,
 কর যুদ্ধ তুমি, বৎস ! যথা কক্ষ ধনঞ্জয় ।
 বুঝিলে কি অভিযম্য ! গীতামৃত করি পান,—
 নিবারিতে ধর্ম-গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান ;
 সাধুদের পরিজ্ঞান, বিনাশ ছুক্তদের,
 করিতে সাধন ;
 স্থাপন করিতে বৎস ! জগতে ধর্ম-সাম্রাজ্য,—
 এই মহারণ ?”

“বুঝিলাম,—জননীর পদতলে পড়ি
 কহে গলদগ্ধ যুবা,—“বুঝিছ আমার
 মাতা দেবী, পিতা দেব, আমি নারায়ণ,
 আমি তোমাদের মা গো ! পুত্র নরাধম ।
 বুঝিলাম ক্ষুদ্র উক্তি জন্মে বন্ধাকরে ;
 কুফল অন্তরে, বটে ; তুণ মহীধরে ।

দিলে আছি পুত্রে তব জন্ম শ্রেষ্ঠতর,
 শিরে দিয়া ছই হাত আশীর্বাদ কর,—
 স্বধর্ম পালনে মা গো ! করি প্রাণদান,
 জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান ।”
 দেব পুত্রে দেবী মাতা লইয়া হৃদয়ে
 স্তুতিমুখী, চুসি সেই সিক্ত কুবলয়ে,
 কহিলা উচ্ছ্বাস-কণ্ঠে ভকতিপূরিত,
 মাতৃ-স্নেহে ছই ধারা করি বিগলিত—
 “লও আশীর্বাদ—করি স্বধর্মপালন,
 গীতার সান্নাধ্য কর জগতে স্থাপন ।
 কৃষ্ণের ভাগিনা তুই, অর্জুন-তনয়,
 তোর মাতা,— হ’ক মম এই পরিচয় ।”

পঞ্চম সর্গ ।

ব্রাতা ভগিনী ।

হেমন্তশৈবসঙ্ক্যা ধীরে বিষাদিনী
 উত্তরিলা কুরুক্ষেত্রে ; উত্তরিলা ধীরে
 অদূর দক্ষিণারণ্যে, বসিয়া যথায়
 সন্ন্যাসিনী জয়ংকার সঙ্ক্যাস্বরূপিণী ।

অপরায় হ'তে বাক্য বসি একাকিনী
 বনপ্রান্তে, দূর পথ চাহি অবিরাম,
 কহিল—“গিয়াছে আশা । এইরূপে হায় !
 যাইবে জীবন কি লো ? সূর্য্য অন্তর্মিত ;—
 যেই সন্ধ্যা-ছায়া হায় ! ভাসিতেছে এবে
 জীবনে এ ছাঃখিনীর, নিবিড় নিশীথে,
 তাও অভাগিনীর কি হবে পরিণত ?
 রমণীর স্মৃৎসূর্য্য, রমণীর প্রেম,
 ডুবিয়াছে বহুদিন । হয় ত উদয়
 অন্তরবি, অন্তঃপ্রেম ফিরে না কি আর ?
 ভ্রাতার সাম্রাজ্য আশা এক ক্ষীণালোক
 সঞ্চারিয়া সেই ঘোর নিরাশা-আঁধারে,
 করিয়াছে সন্ধ্যাময় জীবন আমার
 এইরূপে, এইরূপে সেই ক্ষীণালোক,—
 হা বিধাতঃ ! এইরূপে যাবে কি নিবিয়া ?”

হেমন্ত-শৈশব-সন্ধ্যা ধীরে ছায়ায়ময়ী
 উত্তরিয়া কুরুক্ষেত্রে, ঢালিল শাস্তির
 শীতল বিষাদ ছায়া সমর-অনলে ।
 দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল ;
 দিবসের শেষ মৃত চুখিল ভূতল ;
 শেষ সিংহনাদ, শেষ কোদণ্ডটঙ্কার,
 মিশাইল সন্ধ্যানিলে । শেষ শব্দনাদে
 দিবসের রণ-শাস্তি ঘোষিয়া গম্ভীরে,
 যোদ্ধা গণ দুই স্রোতে চলিল শিবিরে,—
 অনন্ত বলাকামালা দুই স্রোতে যেন
 চলিল কাকলীকণ্ঠে প্লাবিতা গগণ ;

হুই প্রাতঃকালানিলে চলিল ছুটিয়া
 ফেনিল তরঙ্গমালা মহাপারাবারে ।
 নিবিল ঝটিকা, ঘোর শব্দের নিনাদ,
 সমর-নির্বোধ,—মত্ত জলধি উজ্জ্বাস,
 সন্ধ্যালোক সহ ধীরে । মহর্ষি দুর্কীসা
 বনান্তর হইতে ধীরে হইলা বাহির,
 বিশ্ব হইতে যেন তীর বিষধর ।
 এখন (৩) যুবতী বসি চাহি পথপানে
 বিবশা, আপনা-হারা, না দেখে নয়নে
 বর্ণক্ষেত্র, বনক্ষেত্রে না শুনে কাকলী ।
 কিছুক্ষণ ভ্রমি ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
 ডাকিল—“মনসে !” বামা শুনি ন না কাণে,
 চিত্রিত প্রতিমা মত রহিল বসিয়া ।
 “পাপীয়সি !”—স্বপ্নোথিতা, চমকিয়া বামা
 দেখিল ফিরিয়া ঋষি । “পাপী-পাপীয়সি !”—
 ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর,
 —“নিয়ত আমায় তুচ্ছ ! নিয়ত এখানে
 থাকিস্ বসিয়া ; নিত্য একই ভাবনা !”
 কাতরে কহিল কারু,—“সংসার-বন্ধন
 একে একে হায় ! প্রভো ! হিঁ ডোঁছি সকল ;”
 —মুখ ফিরাইয়া পুনঃ চাহি পথপানে,—
 “একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
 উদাসিনী পত্নী তব । স্নেহ-পারাবার
 ভাতা সে বন্ধন তার । সেই এক বৃন্তে
 শুক ফল সম এই হৃদয় আমার
 ঝুলিছে সংসার-বৃক্ষে ; কাঁটিও না তারে,

শুক ফল হয় ! প্রভু ! পড়িবে ঝরিয়া ।
 জগতে এমন ভাই কোথা আছে আর ?
 শৈশবে এ অভাগীবে গেলেন ছাড়িয়া
 জনক জননী । হয় ! পিতৃব্যভগিনী—
 বিশ্বাসঘাতিনী শৈল ! হারা'ল শৈশবে
 জনক জননী তার । দুইটি বাড়িকা
 বন বল্লরীর মত পালিলা আদরে ।
 অঙ্গে অঙ্গ জড়াইয়া, অঙ্গ মিশাইয়া,
 কল্লতরু নাগরাজ । প্রভু ! আমাদের
 নাগরাজ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহচর ।
 শুনিয়াছি মহাবনে আছে তরুবর,
 কঠিন কঠোর দেহ, হৃদয় তাহার
 দুখে ভরা । সেই তরু মম সহোদর,—
 শিলারোধে অবরুদ্ধ স্নেহের সাগর ।
 মুখে মুখে বকে বকে অনাথা হু'জনে
 বিহঙ্গ-শাবক মত করিলা পালন
 কত হুখে, কত স্নেহে ; কতই আদরে
 শিখালেন অস্ত্রবিদ্যা, শিল্প, ও সঙ্গীত ।
 আমি উগ্র, শৈল শাস্ত ; স্নেহে সহোদর
 কহিত তপতী আমি, শৈলজা নন্দদা ।
 বনে বনে, পর্য্যটনে, আমরা হু'জনে
 থাকিতাম অঙ্গে লাগি ; গলায় গলায়
 হু লিতাম, পড়িতাম অঙ্গে ঘুমাইয়া ।
 করে নাই আমাদের, করিনি আমরা
 সহোদরে, মুহূর্ত্তেক নয়ন-অন্তর ।
 ছায় ! অভাগিনী শৈল, বিশ্বাসঘাতিনী

পুড়ি মনস্তাপানলে,—জগতে এমন
নাহি বুঝি দুঃখ আর !—ছাড়ি মর্ত্যলোক,
ওই বুঝি আকাশেতে রয়েছে কুটিয়া
সেই ক্ষুদ্র মেহকুল ! এই দীর্ঘকাল
নাহি জানি ভাই কোথা ।”

কঁাদিল রমণী,
দর দর ছুই ধারা বহিল নয়নে ।
দুর্কীসা । পতিচিন্তা, একমাত্র স্ত্রী রমণীর
মহাধর্ম, অল্প চিন্তা মহাপাপ তার ।
নারীর আবার কে বা পিতা, মাতা, ভ্রাতা ?
তাহার সর্বস্ব স্বামী । বিবাহের সনে
ছাড়ি পিতৃকুল, পতিকুলেতে স্থাপিত
হয় অরুণতী মত । হ’লে বৃক্ষান্তর,
ভাগিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার ?
“ভ্রাতার সাম্রাজ্য-সাধ যাক্ রসাতলে ।
ইচ্ছা—এই দণ্ডে পোড়া যজ্ঞকাষ্ঠখানি
ভাগি ঝড়রূপ ধরি, করি খণ্ড খণ্ড
কুঠারে অস্থিপঞ্জর”—কহিছা স্বগত,
কহিল কাতর-কণ্ঠে শিহরি রমণী—
“শিব ! শিব ! একি কথা ! ইহা যদি, প্রভু !
নারীধর্ম আর্ষ্যদের, অনার্য্যা এ দাসী
পারিবে না তাহা কভু করিতে পালন ।
বিবাহের পরে থাকি অনার্য্যা আমরা
পিতৃবাসে, পিতৃকোলে, জননীর বুকে,
ভ্রাতা ভগ্নীগণ সঙ্গে গলায় গলায় ।

ছাড়ি সেই স্বর্গ, ছাড়ি পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
ছিন্ন করি সে অনন্ত মেহের বন্ধন,
কীটিতে অনাৰ্য্য লতা পারে না কখন।

মানব-হৃদয় সিদ্ধনদ শতমুখ ;—

কত আশা, কত তৃষা, কত ভালবাসা !

অবরুদ্ধ সর্বশ্রোত মম হৃদয়েব । ..

এক শ্রোতে হায় ! আমি দিয়াছি ঢালিয়া

এ জীবন, এ হৃদয় ; সহোদর-মেহ

সেই শ্রোত, সেই স্বর্গ । জীবন-প্রবাহ,—

অম্লানবদনে পারি বোধিতে তাহা ;

এ প্রবাহ, অভাগিনী পারিবে না, হায় !

দাসী বন-নিবাসিনী ; বন-বিহঙ্গিনী

কাটিবে পিঞ্জর, নহে তাজ্জিবে জীবন

অনাহারে অভাগিনী, তথাপি কখন

কাটিবে না মেহময়ী মেহের বন্ধন

ওকি দেখা যায় ওই ! আসিলা আমার

ওই বৃষ্টি দাদা ! ওই!—দাদা ! দাদা দাদা !”

যেমতি পিঞ্জর-মুক্ত বন-বিহঙ্গিনী,

ছুটিয়া রমণী বেগে আনন্দে অধীরা,

পড়িল বাহুকি বক্ষে । গলা জড়াইয়া

কহিল কাঁদিয়া—“দাদা ! ছাড়িয়া আমারে

কেমনে রহিলে তুমি বল এত দিন ?

তুমি বিনা এ জগতে কি আছে আমার ?”

উচ্ছ্বাসে লইয়া বৃকে চুষিয়া আদরে,

কহিলা বাহুকি, নেত্র মেহে ছল ছল,—

“কারু ! কারু ! পাগলিনি ? আসিতে আমার

হইল বিলম্ব কিছু ; ছিলাম ব্যাপ্ত
 নানা কার্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া,।
 কেবল দেখিতে তোরে, লইতে রে বৃকে
 কোমল মুখানি তোর ; জুড়া'তে জীবন,—।
 হরাকাত্‌মরীচিকা,—তোর স্নেহাসারে ।
 না দেখি অমরে তোর যত কাদে প্রাণ,
 কাদে মম ততোধিক ; সংসার-মরুতে
 একমাত্র তুই মম স্নেহ-মন্দাকিনী ।”
 আবার আবার স্নেহে চুষিয়া বদন,
 স্নাত কুল নীলোৎপল, জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
 “কেমন আছিলি কহ ।”

উত্তরিল হাসি

ধীরে অধোমুখী বামা—“আছিলাম,—আছি
 আশ্রিত পাদপ-চ্যুত লতিকার মত ।
 ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লতিকার,
 পদাঘাতে বিদলিত ; মরে না তথাপি,
 স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
 পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি ।

“নরাধম ! ছরচোর !”—লোহ দৃঢ়তম
 আঘাতিল শিলা দৃঢ় । অগ্নির ক্ষলিঙ্গ
 ছুঁটিল বাসুকিচক্রে । “পাপী ! নরাধম !—
 ধর্ম-ব্যবসায়ী, জ্ঞানী, অসভ্য ইহারা ।
 আমরা অনায়াগণ অসভ্য বর্কর ।
 লাতা ও ভগিনী” ; —চাহি আকাশের পানে,
 ভগিনীকে লয়ে বৃকে কহিলা কাতরে,—
 “ভাগ্য হই জন । না জানি এমন

আছে কি জগতে আর । নিরাশা-অনলে
 হায় রে ! জলিতেছিল দুইটি হৃদয় ।
 ডুবিলু আপনি, আর ডুবাঁইলু তোরে,
 অনাধ্যের রাজ্যোদ্ধার দুরাশা-নাগরে,
 নিবাইতে সেই জালা,—সে ভীষণ জালা
 রাজ্যভাণ্ডে পারে, যদি, পারি নিবাইতে !—
 হ, য ! যদি বণরঙ্গে, শত্রুর শোণিতে,
 প্রতিহিংসা-স্ববাস্ততে নিবে রে সে জালা ।
 বুঝিলাম আশা মত্ত আমরা দুজন
 অস্ত্রথা বাসুকি তোর তিল স্থ গরে,
 তুচ্ছ কথা ধরারাজ্য, স্বরাজ্য পারে
 ফেলিতে চরণে ঠেলি অমান বদনে ।
 কিন্তু তোর অপমান, এ ঘোর নিগ্রহ !
 হা বিধাতঃ ! বাসুকির স্নেহের মৃগালে
 একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে,
 কুটিল, তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি !
 ফেলিলে আনায়ে এই বনের শাদ্দুল,
 করিলে নির্বীৰ্য্য হেন, রয়েছে চাহিয়া
 ভগিনীর অপমান ।”—

বহিল নয়নে,

বিদ্যুৎ-বিক্ষেপী মেঘে, সলিলের ধারা ।
 কাতরে কহিল কার,—“এ কি কথা, দাদা !
 বাসুকির ভগ্নী আমি, নাগেন্দ্রনন্দিনী,
 কি সাধ্য একটি দীন ঋষি ছরাতার
 করে মম অপমান ? একটি পতঙ্গ
 কি সাধ্য নিগ্রহ, দাদা ! করে সিংহিনীর ?

একটি ক্ষমল ক্ষুদ্র তুলিতে কণ্টক
জ্ঞান ত সহিতে হয় ! সামান্য নিগ্রহ
সহিতে না পারি যদি, বীরেন্দ্র ! কেমনে
একটি বিশাল রাজ্য করিব উদ্ধার ?
দাঁড়াইয়া ঋষিবর দেখিতেছিলেন
এই দৃশ্য, ভাবিতেছিলেন, মনে মনে—
“সংসারবন্ধন যদি মোহের বন্ধন,
মোহ তবে কি মধুর ! কি স্বর্গ সুন্দর,—
ভ্রাতা ও ভগিনী ওই গলায় গলায় !
জরংকারু—জরংকারু ! কিবা মূর্ত্তিখানি !
কিবা মুখ ! কিবা রূপ ! রূপের সাগরে
থেকে কি তরঙ্গ ভঙ্গ সঞ্চারি আবেগ
যজ্ঞকুণ্ড সম মম যোগীন্দ্রহৃদয়ে !

নার্যা ; অঙ্গ-বাতাসেও তার
হৃদ দেহ কলুষিত আমি ছন্ডাসার ;
স্বণায় শিহরে অঙ্গ । কিন্তু কি করিব
স্বাক্ষণের আধিপত্য রক্ষিত বর্দ্ধিত
করিতে লয়েছি ব্রত । তার উদ্‌ঘাপন
না হইবে যত দিন, হইবে সহিতে
অনার্য্য-সংসর্গ-পাপ, এই বিড়ম্বনা !”

প্রথমিল নাগরাজ । আশীষিয়া ঋষি
জিজ্ঞাসিলা—“কহ, শু'ন শুভ সমাচার ।”
উত্তরিল নাগরাজ ছাড়িয়া নিশ্বাস—
“অসংখ্য অনার্য্য জাতি হইবে গ্রথিত
একতার সূত্রে, ঋষি ! অসম্ভব কথা ।
হই চারি জন যদি হয় অগ্রসর,

তুই চারি শত যায় পশ্চাৎ সরিয়া ।
 অসংখ্য নক্ষত্রাবলি ওই আকাশের
 গাঁথিলে গাঁথিতে পার,—হায় ! আমি এই
 ছরাকাজ্জল-সমুদ্রের নাহি দেখি কূল ।”
 অঙ্গুলি নির্দেশ করি কুরুক্ষেত্র-প্রতি,
 জীবৎ হাসিয়া—সেই হাসিতে কি বিষ !—
 উত্তরিল ঋষিবর,—“ওই দেখ কূল !”

দাম্ভিকি । কূল !—কূল নহে ঋষি ! ঘোর প্রতিকূল !
 ভীষ্ম অর্জুনের যেই বীরত্বের গীত
 জনরব শত মুখে করিছে প্রচার,
 প্লাবিয়া ভারতভূমি পশিয়াছে বনে
 সে অপূর্ব বীর-গাথা । করেছে সঞ্চার
 কি যে ত্রাস হৃদয়েতে বনপুত্রদের
 কহিতে না পারি আমি । জিজ্ঞাসে সকলে—
 ‘কে ধরিবে অস্ত্র বল ইহাদের আগে ?’
 আছি ভাল সুশীতল কানন-ছায়ায়
 মাতা বনদেবী-অঙ্কে জালি দাবানল,
 কি ফল লভিব বল পুড়িয়া মরিয়া ?”

চর্যাসা । জরৎকার ঋষিশ্রেষ্ঠ যথা যজ্ঞাগারে
 কাষ্ঠের অগ্নিতে কাষ্ঠ করে ভস্মীভূত,
 ক্ষত্রিয়-অগ্নিতে তথা সমগ্র ক্ষত্রিয়
 পোড়াইছে এই দেখ ! আত্ম দাবানল
 নিভিবে ক্ষত্রিয়হীন করিয়া ভারত ।
 শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্ম ওই দেখ, ওই,
 মৃত সজ্জার মত পড়িয়া ভূতলে !

৭ম স্তম্ভকর । বীৰ্য্যে, অহঙ্কারে,

ধরা ভাবিতেন সরা ; বুঝেছেন এবে
সার্কি তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিবীর
হয়েছে গর্কিত শৌর্য্য বীৰ্য্য পরিমিত,—
ভীষ্ম ও ভীষ্মর শেষে এক পরিমাণ !
ওই ষণ্ড, রাজস্বয় যজ্ঞে মহাদর্পে
বাড়াইয়া গোপহৃতে করিল প্রহার
ব্রাহ্মণের শিরে অসি । বিধম্মী পামর
প্রাণভয়ে অর্জুনের সাজিয়া সারথি,
উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছে তাহার,—
ওই ভীষ্মদেব, পড়ি মণ্ডকের মত !

বীরত্বের এ বিক্রমে অঙ্গ বাসুকির
উঠিল অলিয়া ক্রোধে—“যজ্ঞব্যবসায়ী
কাপুরুষ তুমি ঋষি ; বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ ; এই বীরত্বের
কেনে বুঝিবে তুমি অতুল মহিমা,—
মুখিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গোরব
ভীষ্মের পতনে শুক কোরবের পতি
করে যদি সন্ধিভিক্ষা,—জান তুমি চাহে
পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা ভাই পঞ্চজন !
কিংবা যেই পক্ষ জয়ী এই মহারণে
হইবে, তাহার কীর্ত্তি ছুঁইবে আকাশ ;
অনার্য্য কি কেহ তার দাঁড়াবে সম্মুখে ?
অসম্ভব কথা ঋষি !”

মাসা ।

‘অসম্ভব’ কথা

জরৎকারু মহর্ষির নাই অভিধান ।
না হইতে প্রভাকর উদয় আবার,

ক্ষত্রিয়-অদৃষ্ট-গ্রহ যোগবলে আমি
ফিরাইব যেই মতে হেলা'য়ে তর্জনী,
নিশ্চয় হইবে তাহে সন্ধি অসম্ভব,
ভস্মিবে উভয় পক্ষ শিমুলের মত ।

জয়ী পক্ষ এই রণে, বাহুকি! আমরা !

নীরবে চিন্তিয়া ঋষি কহে অধোমুখে—

“কর্ণের শিবিরে গিয়া কহিবে গোপনে
নাগেন্দ্র ! আসিতে হেথা গভীর নিশীথে—”

জরৎকা । না, দাদা ! একে ত ক্লান্ত হইয়াছ তুমি
দীর্ঘ পথ পর্যাটনে । অবসন্ন দেহ
কাতরে মাগিছে শ্রান্তি, পড়িছে ভাঙ্গিয়া
মূলশূন্য তরু যেন । তাহাতে তোমায়
দেখে যদি কোন জন, চিনে যদি কেহ,
হইবে শত্রুর মনে সন্দেহ বিষম ।
মহা-স্বক্কাবে নাহি পারে লুকাইতে
মহীকহ, ক্ষুদ্র লতা অলক্ষিতা সদা ।
নহে তুমি, যাব আমি ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

—*—

কুরুক্ষেত্রে পুতুল খেলা ।

—*—

সুবর্ণ প্রদীপ সুগন্ধ-বিতরি,
সুমন্দ আলোক সহ,
আলোকিছে চারু পার্থের শিবির,
বহে ধীরে গন্ধবহ ।

তুই পর্য্যঙ্কেতে, শুয়ে তুই জন—

ধনঞ্জয়, জনাঙ্গিন ।

সুভদ্রা কৃষ্ণের, উত্তরা পার্থের,

ঔষধ অঙ্গে লেপন

করিছে অঙ্গরে,— বিষাদিত মুখ

মেঘমাখা চন্দ্র যথা ৷

ক'হছেন হর্ষে শ্রান্ত কৃষ্ণাঙ্কুর

দিবসের স্বপ্ন-কথা ।

উত্তরা না শুনে সেই বীর-গাথা

তা'তে তার নাহি প্রীতি ।

নীরবে তাহার নয়নের ধারা

পড়িছে কপোল তিত্তি ।—

“সর্ব অঙ্গ ক্ষত ! কেমনে মাহুদ

এমন নিষ্ঠুর হয় ?

বীরের কি, বাবা ! থাকে না হৃদয় ?

তুমি ত করুণাময় !”

ওদেখিলা অঙ্কুর কাঁদিছে উত্তরা,—

অশ্রু নহে স্নেহাসার ;

চুষিয়া সুখানি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে

কহিলা—“বাছা আমার !

বীর-ধর্ম্ম যুদ্ধ, এ ত আর তোমার

নহে পুতুলের রণ ।

বীর-বালা তুই, দেখি অস্ত্র-লেখা

কাতরা কেন এমন ?”

“না না বাবা ! আমি না পারি বুঝিতে,

পোড়া বীর-ধর্ম্ম ছাই

সংসার ছাড়িয়া যাক্ যমপুরে
 লইয়া সর বালাই ।
 একটি কণ্টক চরণে তোমার
 ফুটিলে উত্তরা তব
 না পারে সহিতে ; নিত্য এত ক্ষত
 কেমনে পরাণে সব ?
 কেন এই রণ ? কেন দেব-অঙ্গ
 এই রূপে কর ক্ষত ?
 কে আছে জগতে তোমাদের মত ?
 কে স্থগী আমার মত ?”
 স্রবর্ণ দর্পণ সে ক্ষুদ্র ললাটে
 আদরে বুলায়ে কর,
 কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া ধীরে,
 উত্তরিলা বীরবর—
 “পিতৃরাজ্য বাছা ! করিব উদ্ধার,
 রাজ্য হবে অভি যম ;
 ভুই হবি রাণী বসি বামে তার,
 উল্লপাশে শচী সম !”
 অধোমুখী বামা, কণ্ঠ ছল ছল,
 কহিল বীণার স্বরে
 কণ্ঠমুচ্ছনায় নারী-হৃদয়ের
 অমৃত বর্ষণ করে—
 “বেই তিন রাজ্য পাইয়াছি আমি,
 রাজ্য কি বা আছে আর ?
 তোমার, মাঘের, নারায়ণ পদ,—
 স্বর্ণ-রাজ্য উত্তরার ?

আমার সমান ভাগ্যবতী, বল,
 কে আছে জগতে আর ?
 তোমাদের মেহ, ক্ষুদ্র হাসি টুক,
 স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার !
 এ পোড়া ধরার রাজ্যে কিবা সুখ ?
 নিত্য এই কাটাকাটি ;
 কে করে মারিয়া কে করে খাইবে,—
 এ সংসার কান্নাহাটি ।
 করে পুত্রহীনা মাতা হাহাকার,
 • • পতিহীনা কত নারী
 কাদিছে অনাথ শিশু ল'য়ে বুক,—
 প্রাণে না সহিতে পারি !
 এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই বনে,
 বাধিয়া কুটার ঘর,
 তোমাদের পদ সেবিবৈ উত্তরা,—
 সে রাজ্য কি সুখকর ।
 পার্থ, কেশবের, মাতা সুভদ্রার,
 ছয় চক্ষু ছল ছল ;
 অর্জুন আবার চুখিলা উচ্ছ্বাসে
 বিষম কুল কমল ।
 ক্ষুদ্র মুখ ধানি রাখিয়া হৃদয়ে,
 —নীলাকাশে যেন তারা,—
 গদ গদ কণ্ঠে কহিলা অর্জুন
 উচ্ছ্বাসে আপনাহারা—
 “আশীর্বাদ করি,— এ কোরব-কুল
 মহা হিমাচল সম,

শোভে শিরে যেন বীররত্ন-কৈলাস

বাছা অভিমত্ব মম ।

তুই মা আমার যাইবি বহিয়া,

জননী জাহ্নবী জিনি,

সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত,

করুণার মন্দাকিনী !

আমার মতন নিশ্চয় পাবাণ,

হয় যেন মুক্ত নৈহেতে তোর ।

তোম্ন স্নেহমুখ চাহিয়া চাহিয়া

জীবনের স্বপ্ন হয় মা ! ভোর !”

সকলি নীরব ; কি যেন কি স্বর্গ,—

জোছনার স্বপ্ন প্রায় !

কেবল সে স্বর্গে অনন্ত করুণা

উছলি উছলি ধায় ।

ভাবিলেন কৃষ্ণ— “ধর্ম শাস্ত্ররাশি

কি ছাই ধাঁড়িয়া মরি !

সরলা বালার পবিত্র হৃদয়ে

কি স্বর্গ দর্শন করি !

ভক্তি-উজ্জ্বলিত রমণী-হৃদয়

যে স্বর্গে লইয়া যায়,

কত সাধনায় ধর্মশাস্ত্র তার

ছায়া মাত্র দেখে, হয় ।”

জিজ্ঞাসিলা ভদ্রা— “দাদা ! জ্ঞানযোগ,

কর্মযোগ, কিছু নয় :

ভক্তি কাছে যেন ; ভক্তিই তোমার,

ভক্তের তুমি নিশ্চয় ।”

“সকলের মূলে ভকতি, ভগিনি।

না থাকে ভকতি যদি,

পাইতে আশায় চাবে কেন তুমি।

জ্ঞানে কৰ্মে নিরবধি ?

জ্ঞান পুর্বে পদে পতঙ্গের মত

যেখানে যাইতে চায়,

ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও সেখানে

উচ্ছ্বাসে উড়িয়া যায়।”—

অতঃমনে কৃষ্ণ করিয়া উত্তর

• • রহিলেন চিন্তাকুল।

ভাবিলেন মনে কংস-নিহন—

“হ’তেছে বড়ই ভুল।

একে ত কোমল পার্থের হৃদয়,—

বীরত্ব আর্জ দয়ায় ;

বালিকার এই করুণা-উচ্ছ্বাসে

বুঝি গীতা ভেসে যায়।”

বুঝিল উত্তরা পার্থের হৃদয়

হয়েছে কাতর অতি,

কিঞ্চিৎ ভাবিয়া অশ্রুতে হাসিয়া

কহে প্রত্যাশপন্নমতি—

“হে বাবা ! ত তুমি বহু দিন ধরি

পুতুলগুলি আমার

দেখ নাই, আজি আনি গিয়া সব,

দেখিবে কি একবার ?”

ছুটিল বালিকা বিজলীর মত,

আনিল ডরিয়া ডালা।

কতই পুতুল হাসিতে হাসিতে,—

পুতুল বিরাট-বালা !

এমন সময়ে শিবিরে বিরাট

হইলেন উপনীত,

ছুটিয়া উত্তরা

ছড়িল গলায়

যেই স্বর্ণ উপবীত ।

হাসিয়া হাসিয়া কহিলা বিরাট—

“এ কোতুক মন্দ নয়,

কুরুক্ষেত্রে এই পুতুলের নাচ ।”

“দার্শনিক মহাশয় !

না হ’লে বিরাট মূর্থ হেন কথা

কে বলিতে পারে আর ?

বানরে না বুঝে,

রক্তরস বিনা

নাহি চলে এ সংসার ।

বীর-নাচ, আর

পুতুলের নাচ,

দেখি হাড় জ্বালাতন ।

বানরের নাচ

আজিকার মত

দেখিব ভরি নয়ন ।—

হাসিতে হাসিতে

মস্থর গতিতে

স্বলোচনা দিলা বার,—

বিরাট । ও কেও ? কে ? তুমি !

স্বলো ।

পদ-চতুষ্টয়ে

করে দাসী নমস্কার ।

বিরাট ।

না দেখি তোমায়,

ভেবেছিলাম মনে

কাটাৰ সন্ধ্যাটি আজি
গল্প কৰি শুখে, লাগিলে কি তুমি ?
লাগ তবে ।

মুলো ।

একি পাজি !

যাই, কেৰা মৰি শূকৰে মুকুতা,
অৱসিকে দিয়া প্রাণ ?

বিৰাট । পায়ে পড়ি তোৰ, দেখ মেয়ে কাছে,
ছাড় বস্ত্ৰ অভিমান ।

ওই ঔষধিৰ পাতাটি লইয়া
আয় দেখি, আয় কাছে ।

দ্রোণ-অস্ত্ৰে আজি ক্ষত সৰ্ব্ব অঙ্গ,
তিলাক্ষ না স্থান আছে ।

পাতাটি লইয়া হাসিটি চাপিয়া,—
“ফিৰ”—সখী কহে ধীৰ ।

বিৰাট ।

ফিৰিব কেন লা ?

মুলো ।

জানি আমি ভাল,

তুমি যে বিৰাট-বীর,

বুক পাতি বণ কাৰো সনে তুমি
কৰিবাব পাত্ৰ নয় !

অস্ত্ৰ-লেখা কিছু থাকে অঙ্গে যদি,
পিঠে তা আছে নিশ্চয়

মুভ ।

ক্ষমা কৰ দিদি ! পায়ে পড়ি তোৰ,

কাতৰ বিৰাটেস্বৰ

দিবসেৰ বণে; ঔষধটি অঙ্গে
দিদি লো ! লেপন কৰ !

নয়ন মুদিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া,
 ধসিয়া বিরাটপতি,—
 “আহা ! উহ ! মরি ! আহা ! কি আরাম !
 ঔষধ স্নিগ্ধ অতি
 ততোধিক স্নিগ্ধ স্নলোচনা তোর
 স্নকৌমল হাত খানি,
 জিহ্বাটিতে শুধু এত কেন ঝাল,
 বুঝিতে না পারি, আমি ।—
 বাবা গো ! বাবা গো ! গেছি রে ! গেছি রে !
 দূর লক্ষ্মীছাড়ী ! ছাড় !
 বড়ই লেগেছে !”

স্নলো । কমলেতে কাঁটা ?

আছে, কি জান মা আর ?

কৃষ্ণ । কই লো মা তোর পুত্র কয় জন ?

স্নভ । বল মা ! তাদের নাম ।

উত্তরা । বল না দাই মা এইটি—

স্নলো । অর্জুন ।

উত্তরা । এটি ?

স্নলো । বোকা ভগবান !

গালে ক্ষুদ্র চড় পড়িল অমনি ।

সখী বাড়াইল কব.

বানরের মূর্তি তুলিয়া কহিল—

“এইটি বিরাটেশ্বর ।”

উত্তরা । দূর পোয়া মুখি । তা কেন লা হবে ?

এই ত বাবা স্নন্দর !

এইটির সঙ্গে দিব বিয়ে তোব,—

হলো । • বিরাট পাবে দোসর !

উত্তরা । এই তিম পুত্র ।

ভদ্রা । কত্যা মা ! ক'জন ?

উত্তরা । এই কত্যা পঞ্চজনা—

তুমি মা, হুকত্যা দ্বারকায়,—

হলো । আর ?—

উত্তরা । • পোড়ামুখী স্নলোচনা ।

মঃ । আমি মঃ ! না হব ছেলে তোর কঃ

• • দেখ বেশি অলঙ্কার

দিয়াছিস্ তুই খণ্ডরে মা ! তোর,

বিমাতা তুই আমার !

উত্তরা । না বাবা ! তোমায় দিব আমি কাল

• অলঙ্কার রাশি রাশি ।

অর্জুন । তা হইলে আমি নিশ্চয় তোমারে

ডাকিব—“উত্তরা মাসী ।”

উত্তরা । না বাবা ! তোমায় সকলের বেশি

দিব আমি আভরণ ।

শৈশব হইতে উত্তরা যে বাবা !

তোমার মেহের ধন ।

ধরিয়া বালিকা অর্জুনের গলা

কহিল এ কটি কথা ।

পুনঃ অর্জুনের আঁখি ছল ছল

চুষিলা সে মেহলতা ।

“আয় মা ! আয় মা ! আয় মা ! আমার,

আয় দেখি একবার ।”—

মুখানি ধরিয়া কহিল কেশব—

“ক’ বাপ কহ তোমার ?”

উত্তরা । এ বাপ, ও বাপ, ওই বাপ আর—

কৃষ্ণ । শুনিলে বিরাটরাজ !

বিরাট । মা কটি মা ? তোর ?

উত্তরা । মা আমার পাঁচ ।

বিরাট । বেয়াই ! কে জিতে আজ ?

স্নলো । স্বামী পাঁচ জন তা তো হয় জানি,

মাও এবে শুনি পাঁচ ।

সংখ্যা শুনিলাম, সংজ্ঞা এবে শুনি

দেখি কার কিবা হাঁচ !

উত্তরা । এক মা বিরাটে, ওই মাতা আর,

ছই মাতা দ্বারকায় ।

স্নলো । ছই ছই চারি, তার পর শুনি ?

উত্তরা । শূলিমা বাপের পায় ।

বিরাট । বাবা গো ! বাবা গো ! মরেছি এবার !

মেরেছে ঘায়ে কি খোঁচা !

স্নলো ! শূলিমার শূল লাগিল কেমন

আমার গোধন ওঁচা ?

উত্তরা । আমাকে মারিস, মারিস বাবাকে,

ঝগড়া তোর দিন বাতি ।

কালামুখি । সব এখনি বাগারে

দিব কয়ে পাতি পাতি ।

দেখ বাবা দেখ, শূলিমা আমায়

আজ মারিয়াছে বড়,

আরো তোমাদের কত দেয় গালি,
বাবা গো বিচার কর ।

অর্জুন । ই রে হুলোচনা । আমাদের গায়ে
ঝারি জিহ্বা দিন রাত

মিটে না কি সাধ ? মেয়েটির শেষে
ঝগিলি দেখাতে হাতু ?

কণা । হরি ! হরি ! হরি ! কি সাধ সকল !
ঝগড়া কারো নাহি জানা ।

আমি কালামুখী ন পোড়ামুখী আমি !
আঁর মুখ চাঁদ-পাণা ।

ঐ যে সারা দিন শুনি বণ-ক্ষেত্রে
হৃদলেতে হাঁকাহাঁকি—

কুটুম্বিতা সব ! লোকে কাটা কাণ
বলে চুল দিয়া ঢাকি !

করু সারা দিন মন্দানি গুঁদানি,
বণক্ষেত্রে ঘুরি ঘুরি,

গৃহক্ষেত্রে কিছু না রাখ থবর,
কি করে যে এই ছুঁড়ী ।

সারাদিন তার পুতুলের বিয়ে,
হলুধনি, উচ্চহাসি,

হ'টিতে মিলিয়া করে কাড়াকাড়ি,
ঝগড়া করে বাশি বাশি ।

কণা যদি কহি, মাথা ধরে মোর—
শতরের মুখে চূণ ।

নিজা যাই যদি, হাসি ও চীৎকার—
ভেঙ্গে যায় কাঁচা ঘুম ।

সাপুর বেটী সাধু ! আমি কালামুখী ?

আচ্ছা যাইতেছি আমি,

দিব চূণ তোর বাপের মুখেতে ;

এই আমি সাক্ষী আনি ।

ছুটিগ যুবতী, ছুটিগ উত্তরা,—

অর্জুন ধরিলা হাসি ।

“ছেড়ে দাও বাবা !”—কহে হেট-মুখে—

“ছেড়ে দাও, যাই,—আসি ।”

ছুটি অভিমত্যা পশিল শিবিরে,

প্রণমিয়া গুরুজন,

কৃষ্ণপদতলে বসে আনু পাতি ।

জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ—

“কহ বাবা ! গুনি, কার কার সনে

করেছিলে আজি রণ ?”

“না মামা ! যুদ্ধেতে—” হাসিয়া কিশোর—

“আজি না লাগিল মন ।

কেবল মাতুল হৃদিকোর সনে

করেছিল কোলাকুলি,

পিসা জয়দ্রথ — হয়ে অগ্রসর

দিয়া গেলা পদধূলি ।

মাতামহ শল্য আসিয়া তখন

আরস্ত্রিলা মহা রক্ত,

না হ’তে রগড় ছোট জেঠা আসি

করিলেন রস ভঙ্গ ।”

এ কোতুকে ঢাকা বীরত্ব অতুল

বুঝিলা শক্রহীন;

চুখিলা ললাট লয়ে গর্বে থুকে—

শৈলে শৈলে সম্মিলন !

“থাক রক্তরস”— ধরি এক কাণ

উঠাইল স্থলোচনা—

“তিন কুল চোর, তোমার লাগি আমি

সহি রে এত গঞ্জা !”

তোলে অস্ত্র করে . . ধরি এক কাণ

বিরাট রাজকুমারী,—

“বল দেখি অঁভি ! তোমার সঙ্গে আজ

. . কে করিল কাড়াকাড়ি ?”

ছই গালে চড় পড়ে ছই দিকে,

আদরে যে দিকে চায় ।

“দেখ তবে এই দেই আনুপনা

বিরাট বীরের গায় ।”

• ঔষধির পাতা ছুটি তীর বেগে

পড়িল রাজার মুখে,

চুণ কালী যেন মেশামিশি করি

শোভিল মুখে ও বুকে ।

হাসিলা অর্জুন, হাসিলা কেশব

হাসিলা কিশোর কিশোরী যুগল ।

চাপা হাসি আর না পারি রাখিতে

হাসেন সুভদ্রা চাহি ধরাডল ।

কহে স্থলোচনা— হাসি নাহি মুখে,

—বিরাট-নৃপতি ক্রোধে গড় গড়—

“আচ্ছা বল দেখি, হেন লক্ষ্য শুদ্ধ

চলে কি কখনো তোমার শর ?

সখের সময় | বিরাট রাজ্যের,

বসনে কখন লাগে না দাগ ।”

মুখ চেয়ে দাগ | লেগেছে বসন্ত,

বিরাট রাজ্যের এই ত রাগ ?”

না থামিতে হাসি, কৌরব-শিবিরে

উঠে জয়ধ্বনি মেঘমল্ল জিনি ।

চমকিলা সব, পশিল উত্তরা

সুভদ্রার বকে ভীতা কুরঙ্গিণী ।

বেগে রাজদূত পশিয়া শিবিরে

কহে,—“দ্রোণাচার্য্য করেছেন পণ,—

কালি মহারণে করিবেন হত

পাণ্ডবের মহারথী একজন ।”

• সপ্তম সর্গ ।

—*—

দাবাগ্নি ।

—*—

কুরুক্ষেত্র !—ক্রীড়াক্ষেত্র হায় দুর্বাশার !

অভীত প্রহর নিশি ! কৃষ্ণা অষ্টমীর

নিবিড় তিমিরে এবে আচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ ।

উপরে নক্ষত্ররাশি জলিছে কেবল

ব্যাপি ঘনকৃষ্ণ নভঃ ; জলিছে কেবল

অনন্ত আলোকরাশি শিবিরে শিবিরে

ধনকঙ্ক কুরুক্ষেত্রে ; জলিছে কেবল
 দুরাশার ক্ষীণালোক হৃদয়ে হৃদয়ে
 ধনকঙ্ক বিষাদের ঘোর অন্ধকারে ।
 অবাদের প্রতিমূর্তি, জালিয়া হৃদয়ে
 দুরাশার ক্ষীণালোকে, চলিয়াছে কারু
 পাণ্ডব-শিবিরস্থে ধীরে বিষাদিনী,
 ছাড়ি অলক্ষিতা অঙ্গপতির শিবির ।
 শবে, ভগ্ন রথ-কাঠে, স্থলিত চরণ
 হইতেছে পদে পদে,—নাহি জানে বামা ।
 ছুটিতেছে চারিদিকে নৈশ-পর্যটক
 মাংসাহারী হিংস্র পশু, না দেখে নয়নে ।
 বিকট চীৎকার স্থানে স্থানে পশুদের,
 বীর-কণ্ঠ, উচ্চহাসি, উচ্ছ্বল গীত
 সৈনিকের স্থানে স্থানে, উঠিছে ভাসিয়া
 নৈশ নীরবতা বন্ধে রহিয়া রহিয়া—
 না শুনে শ্রবণে বামা । থর চিন্তাস্রোতে
 ছিন্ন লতা সম কারু চেষ্টেছে ভাসিয়া ।

নীরবে এসেছে বামা, যাইছে নীরবে,—

চিন্তাকুলা, অশ্রুমনা ; জলিছে হৃদয়ে
 দুরাশার ক্ষীণালোক নিরাশা আঁধারে,
 নৈশ অন্ধকারে ক্ষীণ তারালোক যথা ।
 ভাবিতে লাগিল কারু—“বুঝেছিলু আগে
 ছদ্ম নাম জরৎকার, সেই প্রবঞ্চনা,—
 সেই রুদ্র দরশন,—করেছিল মনে
 ক্ষীণ সন্দেহের ছায়া অস্পষ্ট সঞ্চার ।
 কিন্তু সহোদর মম ; সরল-হৃদয় ;

ওই নিরমল নভঃ হৃদয় তাঁহার,
 বিভাসিত পুণ্যলোক-নক্ষত্র-মালায় ।
 পাপময় পৃথিবীর কুটিলতা ছায়া
 পড়ে না সে পুণ্যাকাশে; পড়িলা অস্ত্রাতে
 পতঙ্গের মত এই উর্গনাভ-জ্বালে ।
 এই প্রবঞ্চনা যদি বুকে ঘৃণাকরে,
 সিংহ পরাক্রমে এই প্রবঞ্চনা-জাল
 ফেলিবে ছিঁড়িয়া; কিন্তু লভিব কি ফল?
 এই জীবনের মত গিয়াছে ত হায় !
 প্রেম আশা; রাজ্য-আশা ভুবিবে অতলে ।”
 নীরবে চলিল বামা নক্ষত্র-চিহ্নিত
 নব-শিত নিরমল আকাশের পানে
 চাহিয়া চাহিয়া, ধীরে ধীরে চিন্তাকুলা ।
 “গিয়াছে ত প্রেম-আশা; হা হত বিধাতঃ !
 কিন্তু কি গিয়াছে প্রেম ? যায় কি তা’কভু ?
 যায় আশা,—আকাজ্জিত যায় না কখন !
 ভ্রাতার বিরহ-চিন্তা কিছুদিন হ’তে
 করেছিল আকুলিত রমণী-হৃদয়
 জাগাইয়া পূর্বস্মৃতি । ধীরে সরাইয়া
 যৌবন-জলদজাল, দেখাইতেছিল
 জীবনের কি সুন্দর প্রকৃত প্রভাত,
 স্নেহালোকে, আশালোকে, শান্ত সমুজ্জল ।
 বহুদিন রুদ্ধ এক কক্ষের অর্গল
 সরাইয়া হৃদয়ের, দেখাইতেছিল
 কি শোকের দৃষ্ট ! যেই স্বর্গীয় আলোকে
 ছিল কক্ষ সমুজ্জল, গিয়াছে নিভিয়া ;

ছিল পুষ্পকৌণ যেই স্বর্গীয় কুহুমে,
গেছে শুকাইয়া ; যেই স্বর্গীয় সৌরভে
ছিল সুবাসিত, তাহা গিয়াছে ভাসিয়া ।
কিন্তু সেই গন্ধে, পুষ্পে, দীপে, যে মূর্তি
হইত পূজিত,—সেই হৃদয়ের দেব,
কারুর হৃদয়নাথ,—রয়েছে জ্বাপিত
কারুর প্রণয়-পদে সেই মত হায় !

সেই রুক্ম-রুক্ম-দ্বারে দ্বাদশ বৎসর
করেনি আঘাত কেহ ; জগতে দ্বিতীয়
নাহি কেহ, পারিবে যে করিতে আঘাত
সেই দৃঢ় রুক্ম দ্বারে ; খোলেনি কখন
সেই রুক্ম-দ্বার এই দ্বাদশ বৎসর ।

স্বতি কুহকিনী হায় । অজ্ঞাতে কেমনে
গুলিয়া সে রুক্ম-দ্বার, জালাইয়া দীপ,
বুড়াইয়া শুক কুল, ঢালিয়া সুবাস,
আরন্তিল প্রেবারতি ; রমণী-হৃদয়
আবেশে আবেগে হায় ! হইল আকুল ।

পর্ষতনিব'রে শুক বহিল ছুটয়া

ঘোর বরিষার বজ্রা প্রাবিয়া হুকুল,
ভাসি সেই স্রোতোবেগে আকুলা রমণী
আসিলায় কুরুক্ষেত্রে । কুরুক্ষেত্রে, যথা
বিরাজিছে অভাগীর হৃদয়-ঈশ্বর ।

অঙ্গের বাতাস তাঁর, অঙ্গের সুবাস,

সেই কুল-কঙ্ক-কণ্ঠ,—বহুদিন শ্রুত

নিশীথ-নির্জনে দু' বাণেশীর রব,—

ভেবেছিহু মনে, বহি নৈশ সমীপে

জুড়াইবে হায় ! এই প্রাণের উচ্ছ্বাস ।

সম্মুখে পথিক এক ; জিজ্ঞাসিল কার

মুহুর্তে—“কোথায় কহ কক্ষের শিবির ?”

কহিল পথিক—“ওই নীল সূর্য্য মত

জলিছে আলোক ঘেই শিবিরের দ্বারে

কক্ষের শিবির উহা ।”

ওই নীলালোক !

সম্মুখে শিবির !—হায় ! রমণীর আর

চলিল না পদ । বলে চাপিয়া উচ্ছ্বাস

উদ্বেলিত, অককায়ে পাদপের মূলে

হেলাইয়া বাম অঙ্গ, অবশ মস্তক,

আশ্রিতা লতিকা যেন বসিল রমণী—

বিহ্বলা, বিবশা, দীনা, রহিল চাহিয়া

অনিমেঘনেত্রে সেই আলোকের পানে ;

সেই নীলালোকে যেন নিরখিছে কার

শিবিরের অন্তঃস্থল ; নিরখিছে যেন

সুবর্ণপর্য্যাক-অঙ্কে শায়িত শিবিরে

নীলমণিময় কিবা মূৰ্ত্তি স্নন্দর ।

দেখিল জলধি যেন পূর্ণ শশধর ;

উনমত, উচ্ছ্বসিত, ছুটিল বহিয়া ।

“মরি ! মরি ! কি স্নন্দর !”—

ভাবিতে লাগিল কার,—

“কিবা রূপ নয়ন মোহিয়া,

প্রাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিছে মম,

প্রাণে প্রাণে অমৃত ঢালিয়া ।

কিবা অজডঙ্কিয়ায় মহিমা ভাসিয়া যায় !

- কিবা বক্ষ মহিমা-পূরিত !
 মহিমা নয়নে ভাসে, মহিমা অধরে হাসে,
 বীর-বর্ষ মহিমা-সঙ্গীত !
 পূর্ণচন্দ্র বিভাসিত সুনীল আকাশ সম,
 কি লীলাট মহিমা-দর্পণ !
 ঘোবনের পূর্ণতার উজ্জ্বলিছে মহিমায়
 রমণীর কি স্বর্ণ স্বপন !
 • তরাকাঙ্ক্ষা কুহকিনী বলেছিল একদিন,
 এই স্বর্ণ হইবে আমার ;
 আমি দীনা কাঙ্ক্ষালিনী পাইব হীরকখনি,
 চকোরী পাইবে সুধাধার ।
 যদি নাহি পাইলাম, কেন নাহি মরিলাম
 • হায় ! নাথ চরণে তোমার ?
 জীবন স্বপন সহ জীবন না পোহাইল,
 জ্যোৎস্না হইলে অন্ধকার ?
 রমণীর অভিমান হৃদয়েতে চাপিলাম ;
 বিচূর্ণিত হইল হৃদয় ।
 • তরঙ্গে তরঙ্গে আসি স্মৃতির-দলিল-রাশি
 আজি বেলা ভাসাইয়া বয় ।
 উত্তাল এ সিদ্ধ মাঝে ছিল মৈনাকের মত
 অভিমান হৃদয় চাপিয়া ;
 স্মৃতির নিখাসে ক্ষুদ্র, এত দীর্ঘকাল পরে,
 হায় ! তাহা গেল কি উড়িয়া ?—
 এ ভগ্ন হৃদয় হায় ! অব্যাহত প্রেম-স্রোতে
 একুণে কি চলিল ভাসিয়া ?
 একি দেখি । একি দেখি । ছিল একমাত্র চিত্র

হৃদয়ের দর্পণে বিস্তৃত ।

বিচূর্ণিত দর্পণেতে আজি সেই প্রতিবিম্ব

দেখিতেছি শত সংখ্যাতীত ।

ব্যাপিয়াছে বিশ্ব যেন এ ভগ্ন-হৃদয়,

সেই প্রতিবিম্ব আজি দেখি বিশ্বময় ।

মরি মরি কিবা রূপান্তর !

রূপান্তর কত মনোহর !

মোহিল যে অষ্টমীর শশী

এ কিশোরী চকোরীর মন,

সেই শশী পূর্ণচন্দ্র আজি,

এ চকোরী যুবতী এখন ।

বনবালা কিশোরীর প্রেম

গিরিসুতা ক্ষুদ্রা নিঝরিণী,

হইয়াছে আজি প্রাণনাথ !

মহানদী ধরাবিপ্লাবিনী !

বনবালা কিশোরীর হায় !

সে আকাজকা বাঁশের আগুন,

হইয়াছে অকরণ ! আজি

পিপাসার দাবায় দারুণ ।

ছিল যে পাতাল স্বর্গ মম,

তব স্মৃতি অমৃতে মগ্নিত,

হইয়াছে আজি মরুভূমি,

তব স্মৃতি-দহনে দাহিত ।

সাজিলার যৌবনে যোগিনী,—

তব প্রেমে উদাসিনী আমি ।

আরাধ্য দেবতা মম ভূমি,

একমাত্র তুমি মম স্বামী ।
 হুর্কাসা আমার নহে পতি,
 আমি পত্নী নহি হুর্কাসার ;
 উভয় উভয়ে মাত্র দেখি—
 উভয়ের সেতু আকাজ্জার ।
 পারিব না হুর্কাসা কখন
 পরশিতে এ দেই আমার ।
 দেব-পদে নিবেদিত বাহা,
 চিরদিন রবে দেবতার ।
 বুঝিয়াছি তুমি নহে নব,
 বুঝিয়াছি তুমি নারায়ণ ।
 কারুর হৃদয়নাথ তুমি,
 তুমি জগন্নাথ সনাতন ।
 যেই প্রেম-উৎস বৃন্দাবন,
 ভাসাইছ যে প্রেমে ধরাস ;
 সেই প্রেম কারুর হৃদয়ে
 উথলিছে মত্ত সিন্ধু প্রায় ।
 না না, নাথ ! তুমি মম স্বামী,
 আমি অমরণ তব দাসী ;
 চরণে ঢালিব আজি তব,
 প্রক্ষুত্তি এই পুন্নাগশি ।
 এ শিবির ত্রিদিব আমার,
 তুমি মম আরাধ্য ঈশ্বর,
 পড়িব চরণে আজি তব,
 পিপাসায় পুড়িছে অন্তর ।”
 দাড়াইল উন্মাদিনী ; গেল ছুটি পদদ্বয় ;

ছিন্ন লতা মত ঢলি পড়িল ভূতলে ।
 মাটিতে রাখিয়া বুক, কাঁদিতে লাগিল বামা,
 স্নেহময়ী বহুক্লরা তিতি নেত্রজলে ।
 “অভিমান ! অভিমান ! ওরে !

একি কথা, একি কথা তোরা ?—
 ‘পাবি না রে পাবি না রে স্থান ;
 মরীচিকা হইবে রে ভোর ।’
 নাহি পাই, নাহি পাই যদি
 তাঁহার চরণে আমি স্থান,
 লইয়া হৃদয়ে পা হু’খানি
 তেয়াগিব এ নিরাশ প্রাণ ।
 হায় নাথ ! যেই জলধর
 ঢালে বিধে অমৃত-আসার,
 একটি তাপিতা লতা বৃকে
 সে কি বজ্র করিল প্রহার ?
 যেই দিনমণি বিশ্বময়
 খোলে নিত্য শোভার ভাণ্ডার ;
 সে কি এই কুমুদিনী প্রাণে
 করে এই মরু আবিষ্কার ?
 যেই অগ্নি পতিত-পাবন,
 জগতের আনন্দ-বর্ধন,
 পতিতা এ পতঙ্গিনী তরে
 সে কি হায় ! কেবল দাহন ?
 গুনি তুমি দয়া-পারাবার,
 গুনি তুমি প্রেম-অবতার ;
 পতঙ্গেও পায় তব দয়া,

আমি মাত্র অযোগ্য তাহার ?

হায় মাতঃ বহুকরে হৃদয়ে তোমার
দেও স্থান দুঃখিনীরে ! দয়াময়ী তুমি,
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি ।

এ হৃদয়-মরুভূমি কর যা ! গ্রহণ,
জুড়াও দুঃখিনী তব কঙ্কার জীবন ।”

স্বতিতে কাতর, প্রেম-উচ্ছ্বাসে বিহ্বল,

“রমণীর হৃদয়েতে তীব্র অভিমান
দংশিল নৃশিচক সম ; ছটফট করি
কাঁদিতো লাগিল বামা চাপিয়া হৃদয়
ধরাতলে, বাণবিক্র বন-কপোতিনী ।
অতীত প্রহর নিশি । নীরব প্রাঙ্গণ ।
প্রাঙ্গণস্থিত শিবিরের অসংখ্য আলোক
আসিছে নিভিয়া ক্রমে । আসিছে নিভিয়া
ক্রমে দূর নর-কণ্ঠ ; উঠিছে ভাসিয়া
নীরব শরীরী-বক্ষে নর-মাংসাহারী
কুকুর-শৃগাল-কণ্ঠ কর্কশ কঠোর ।
স্বপ্ত-উত্তিতার মত উঠিয়া রমণী
যন্তের পুতুল যেন চলিল সবেগে
কিছু দূর,—ওকি কণ্ঠ !

ত্রিদিব-সঙ্গীতে

প্রাঙ্গণ হইল পূর্ণ ; নৈশ সমীরণ
পারিজাত-পরিমলে হইল পূরিত ;
কৌমুদী-প্রাবিত ফুল মন্দাকিনীতীরে
কি স্বর্ণ খুলিয়া গেল, শাস্ত স্নগীতল !
কি অমৃতে ঢল ঢল হইল সংসার ।

সে সঙ্গীত, সে সৌরভ, স্বর্গ নিরমল ;—
মুচ্ছিতা হইয়া বামা পড়িল আবার ।

অষ্টম সর্গ ।

—:~:—

স্বর্গামুখী ।

—*—

নির্মলা নক্ষত্রময়ী কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি ;
স্বচ্ছ সলিলের মত স্বচ্ছ অরুণকার ।
অনন্ত নক্ষত্ররাশি ফুটেছে নির্মলাকাশে,
কুটিয়াছে হিরণ্যুতি ! বক্ষেতে তোমার ।
বসিয়া রমণী এক নীরব আনতমুখী ।
দ্বিতীয়া শায়িতা অন্ধে, নীলাজের হার,
মুচ্ছিতা, মুদিত-নেত্রা ; পার্শ্বে এক বীরোত্তম
জাহ্নু পাতি ভূমে ; মুখে কথা নাহি কার ।
অঞ্জলি করিয়া বারি বর্ষিছেন বীরবর,
নিমীলিত নেত্রে, চারু ললাটে বামার ।
কুন্তল আলুলায়িত পড়িয়াছে ধরাতলে,
অষ্টমীর অরুণকার করিয়া আঁধার ।
নিমীলিত নীলোৎপল ধীরে ধীরে উন্মেষিল
একবার আত্মহারা চাহি শূন্য পানে,
আবার মুদিল আঁখি কি সুখের স্বপ্নে যেন,
কি সুখ-মদিরা যেন পশিয়াছে প্রাণে ।
আবার আবার বামা মুদ্রিয়া মেলিয়া আঁখি,

নিরখিয়া শেষে সেই অবনত মুখ,
 ভাবে মনে মনে কারু—“মরি, মরি ! একি মুখ !
 দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পর ছথ !”
 অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশ হইতে যেন
 নামিয়া নক্ষত্র এক শীতল উজ্জল,
 রহিয়াছে স্থিরভাবে বামার বদন’পরে,
 প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহি ছল ছল ।
 অরংকার কিছুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে
 চাহি সেই মুখ, সেই করুণার ছবি,
 জিজ্ঞাসে বিষয়ে বামা, ক্ষীণ অক্ষুটিত কণ্ঠে,—
 “কে তুমি রমণী ? তুমি দেবী, কি মানবী ?”
 ভগিনি ! রমণী আমি, স্তভদ্রা আমার নাম”—
 • উত্তরিলা ভদ্রা—“কথা कहিও না আর ।”
 জ্যোৎস্নামধীর কণ্ঠে বাসন্তী জ্যোৎস্না যেন
 বরষি অমৃত প্রাণে পশিল বামার ।
 স্তভদ্রা !—চমকি কারু, আবার রহিল চাহি
 সেই মুখ পানে, স্থির বিস্মিত অন্তরে ।
 নিরখিল সেই মুখ শোভিতেছে অন্ধকারে,
 ফুল অববিন্দ যথা নীল সরোবরে ।
 আঁধারে অক্ষুটতায় শোভিছে দ্বিগুণতর,
 সে মুখের কি মহিমা, কিবা মধুরিমা ।
 নিরমল জ্যোৎস্নায় নিরমিত মুখখানি
 শান্তির ত্রিদিব কিবা নয়ন-নীলিমা ।
 যেই অন্ধ-উপধানে রয়েছে অবশ শির,
 বুঝিল রমণী নহে অন্ধ রমণীর ;
 ত্রিদিব-কুহুম-রাশি স্তবকে স্তবকে যেন,—

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

সুশীতল সুকোমল স্বর্গ অবনীৰ ।

কোমল কোমল কর বুলাইতেছিলা দেবী

ললাটে, কপোলে, সিক্ত কেশে রমণীর,

কোমল—কোমলতর—স্বপনে কোমলতার,

বুঝিল সে কর কারু নহে মানবীর ।

হায় রে ! বুঝিল কারু এত দিনে বাহুকির

সে দারুণ নিরাশার তীব্র দাবানল ।

বুঝিল, এ রূপ নহে, ভূতলে রূপের স্বপ্ন ;

বুঝিল, হইল হুই চক্ষু ছল ছল ।

“ভ্রাতা যথা নরোত্তম”—ভাবিতে লাগিল কারু—

“হায় রে ! ভগিনী তথা রমণীর মণি ।

ভ্রাতা দেব, ভগ্নী দেবী, কি অপূৰ্ণ সম্মিলন !

ইহাদের পদস্পর্শে পবিত্রা ধরণী !

তেমতি আমরা হায় ! ভ্রাতা ভগ্নী হুই জন,

হতভাগ্য এমন কি আছে ধরাতলে ?

কাননের তরুলতা নন্দনের পারিজাত

চাহিলাম, মরিলাম পুড়ি বজ্রানলে ।

হতভাগ্য বাহুকির গলায় শোভিত যদি

হা হত বিধাতঃ ! এই পারিজাতমালা,

নিরখি তাহার সুখ, নিরখি এ দেবী-মুখ,

ছুড়াতেম মকু-দণ্ড জীবনের জালা ।

সেই মুখ, সেই বুক, সেই চক্ষু, সেই নাশা,

সেই মহিমা, সে ভগ্নিমা, শোভা নিকপমা !

উভয়ের কিবা রূপ ! অনন্ত হৃদয়প্রাণী !

কিবা শোভা উভয়ের—আ বাণ, জ্যোৎস্না !

ইহাকে লইয়া বৃকে, জবি এই কৃষ্ণ ময়,

পাইতাম কিবা সুখ সে ভ্রান্তিস্বপনে !
 ইহার সুরভি শ্বাস, ইহার কোমল কণ্ঠ,
 আগাইত কি উজ্জ্বল মরমে মরমে ।”
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, চাপিয়া বিষাদ কারু
 জিজ্ঞাসে—“কেমনে আমি আসিলাম এখানে ?”
 ধীরে ধীরে অতিধীরে, কহিলা সুভদ্রা, যথা
 কহে নৈশ-সমীরণ কুসুমের কাণে ;
 “হত ও আহতদের করিয়া সৎকার সেবা,
 ভীষ্মদেব পাদপদ্ম করি প্রদক্ষিণ,
 শিবিরে বাইতেছিলাম ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন,
 দেখিলাম আধারে কি হইল পতন ।
 কাছে গিয়া দেখিলাম নিরাশ্রিতা লতা মত
 রয়েছে ভগিনি ! তুমি পড়িয়া ধরায়—
 মূর্ছিতা, ধূলি-লুপ্তিতা ; দয়াময় ভ্রাতা মম
 তোমায় লইয়া অন্ধে আনিলা হেথায় ।
 “ভ্রাতা কে ?”—জিজ্ঞাসে কারু ; কহে ভদ্রা—“বাহুদেব ।”
 সুখ ফিরাইয়া কারু করিল দর্শন ।
 সে মূর্তি মহিমাময়, দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে,
 নীরবে চাহিয়া আছে তাহার বদন ।
 অষ্টমীর অন্ধকারে অশ্রুট অশ্রুট মাত্র
 ভাসিয়াছে সেই দেব মূর্তি মনোহর ।
 তথাপি দেখিল কারু যেন অন্ধকার পটে
 বেখেছে আঁকিয়া কোন দক্ষ চিত্রকর ।
 কতদিন কত বর্ষ, কত বর্ষ, কত যুগ,
 এই রূপ জরৎকারু দেখে নি নয়নে !
 চেয়ে আছে অভাগিনী,—নিদাঘ-বিদগ্ধ-ধরা

কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নব ঘনে ।
 কত দিন, কত বর্ষ, কত বর্ষ কত যুগ,
 এক দিনে কত যুগ হইয়াছে গত
 যে রূপ করিয়া ধ্যান ; আজি সেই রূপ ওই !—
 কারুর হইল বোধ স্বপনের মত ।
 শুধু তাহা : হে, আজি কারুর জীবন-স্বপ্ন
 কারকে লইয়া অন্ধে আনিলা হেথায় ।
 লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ, লাগিয়াছে, হায় কার !
 হৃদয়ে হৃদয় বুকি । শিঁইরিল কায় ।
 অঞ্জলি-বারিতে তাঁর ভিজিছে ললাট মুখ,—
 লাগিয়াছে অঞ্জলি কি কপোলে তাহার,—
 নীলোৎপলে রক্তোৎপল ? আর না, হইল বামা
 সেই স্মৃতিস্বপ্নাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার ।
 হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ভদ্রা করে ;
 বাসুদেব দ্রুত করে আনি নদী-জল
 ধরিলেন মুখে চক্ষে ; এবার কাঁপিল কর,
 হইল ক্রোধের দুই চক্ষু ছল ছল ।
 পুষ্পমুখী ভদ্রা ধীরে পুষ্পনিভ কম করে
 মুঁছছেন পুষ্পমুখ স্তম্ভা রমণীর ;
 প্রভাতসমীরে খেলি পুষ্পে পুষ্প আলিসিয়া
 সরাইছে যেন ধীরে নিশির শিশির ।
 দেখিছেন স্তম্ভীর আঁধারেও যেই শোভা
 ভদ্রা দেবী, সে কি শোভা !—রূপ-পারাবার ।
 পুষ্পিতা বাসন্তী নিশি রূপের স্বপন খুলি,
 শাস্তিতা নিদ্রিতা যেন অচেত্রে তাঁহার ।
 রমণী মেলিল আঁধি,—সরিয়া গেলেন কক্ষ,—

'সুভদ্রার মুখপানে রহিল চাহিয়া ।
 খেত নীলাবুজ ছুটি—যেন এক বৃন্তে ফুটি,
 চেয়ে আছে পরস্পরে মোহিত হইয়া ।
 ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
 আসিল কিরিয়া, বামা ভাবে মনে মনে—
 "হায় ! নিদাকুণ নাথ ! যেই অঙ্গ-আলিঙ্গন
 দিলে মূর্ছিতায়, তাহা পাব কি জীবনে ?
 মূর্ছায় পাইলু যাহা, মরিলেও পাই যদি,
 লও, পদে সমর্পিব ছঃখিনীর প্রাণ ।
 লহিতে না পারি আর, এবে দয়া কর নাথ !—'
 ফিরাইল মুখ বামা ; কৃষ্ণ অন্তর্ধান ।
 "চিনিতেও ছঃখিনীরে হা নাথ । পারিলে না কি ?"
 বহিতে লাগিল নারী-অশ্রু অবিরল ।
 কিশোরীর প্রত্যাখ্যান, যুবতীর এ যন্ত্রণা,
 জ্বালাইল অভিমান প্রচণ্ড অনল ।
 তীরবৎ উঠি বামা বসিল ; সুভদ্রা করে
 ধরিয়া কহিলা—“এ কি ! কি কর ভগিনি !
 হতেছে কি কষ্ট তব শুইয়া অন্ধেতে মম ?”
 “কষ্ট !”—কহে গদ গদ নাগেন্দ্রনন্দিনী,
 “এমন পবিত্র স্বর্গে অনার্য্য বনবাসিনী
 নাহি জানি কোন পুণ্যে করিলু শয়ন ।
 এই দয়্য, এই স্নেহ, ইন্দ্রাণীর স্বপ্ন-শয্যা
 এই অঙ্গ, আমি নাহি ভুলিব কখন !
 কি ভাগ্য আমার । আমি ভগিনী হইব তব,
 হবে হীনা বনলতা ওয়ী মাধবীর ।
 যদি জন্ম-জন্মান্তরে তোমার ভগিনী হই,

নচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

সার্থক হইবে সেই জন্ম হুঃখিনীর ।
তুমি ত মানবী নহ, অপরিচিতায় হায় !
এই দয়া, এই মেহ, মানবের নহে ।
নহে রূপ মানবীর, মানবীর প্রাণে হায় !
কোথা এইরূপ দয়া-মন্দাকিনী বহে ?”
“সে কি কথা ?”—কহে ভদ্রা—
“মুচ্ছিতা আমার পথে
পাইলে ভগিনি ! তুমি যেতে কি কেলিবা ?
একটি হরিণী হায় । একপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া ?”
“পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্যা, আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যায় !
পশু, পক্ষী, যেই দয়া, পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্যা নাহি পাই বিন্দু তার ।
হায় ! নাথ ! তুমি পিতা’—চাহি আকাশের পানে
কাতরে, ককণ-কণ্ঠে, কহে নাগবালা—
“হায় নাথ ! তুমি পিতা নহে কি অনার্য্যদের,
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা ?
মানব তাহারা নহে যদি নাথ ! তবে কেন
এক রূপ রক্ত মাংস করিলা সৃজন ?
কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম,
প্রেমেতে নিবাশা দিলে গভীর এমন ?”
দয়াময়ী সৃষ্টার হই অঁখি ছল ছল ;
অন্তবালে অঁখি ছল ছল নারায়ণ ।
করুণার এ উচ্ছ্বাস পরশি উভয় প্রাণ
কাদাইল এক তান বীণার মতন !

“না বোন ! অনাৰ্য্য আৰ্য্য” কহিতে লাগিল ভদ্রা —

“একই পিতার পুত্র কন্তা সমুদয় ।

এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের

এক আত্মা ; এক জল, ভিন্ন জলাশয় ।

দ্বান-ভেদে কাল-ভেদে, কৰ্ম্মভেদে, জন্মে জন্মে,

কোথায় পঙ্কিল জল, কোথায় নিম্নল ।

সঞ্চারিয়া জ্ঞানালোক এই মলিনতা কৰ্ম্মে

কর অপনীত, হবে যে জল সে জল !

মানুষ কে গুণবলে অগ্র জীব হ’তে শ্রেষ্ঠ,

মানুষের মনুষ্যত্ব সেই গুণচয়

করিছে ধারণ, ভগ্নি ! উহাই মানব-ধৰ্ম্ম,

সে গুণের মহাদর্শ সৰ্ব্ব বিশ্বময়

বিরাজিত নারায়ণ, অনন্ত, অপরিজ্ঞাত !

আমরা মানব ক্ষুদ্র নোকাবাতিগণ,

ভাসি এই গুণস্রোতে, চলেছি অনন্ত পথে ;

এই যাত্রা মানবের ধৰ্ম্ম সত্যতন ।

যেই জন, যেই জাতি, যতদূর অগ্রসর

এই মহাধৰ্ম্ম পথে, তত নিরমল

আত্মা তার, তত শ্রেষ্ঠ তার ধৰ্ম্ম—মনুষ্যত্ব ;

এই মনুষ্যত্বে নর বিভিন্ন কেবল ।

এই ধৰ্ম্মে, মনুষ্যত্বে, আৰ্য্য জাতি শ্রেষ্ঠতর ;

অনাৰ্য্য হইল হীন এই হীনতায় ।

তথাপি আৰ্য্যের ধৰ্ম্ম অপূর্ণ, অপূর্ণতার

জলন্ত প্রমাণ এই কুরুক্ষেত্র হায় !

নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণ, তীক্ষ্ণ অসি দুই ধার,

অপরের প্রতি তুমি কর সকালন,

পাৰে তুমি প্রতিবাত,—প্রতিবাত কি ভীষণ !

দেখ তার সাক্ষী এই করুক্ষেত্রণ !

মানুষ মানুষে ঘৃণা করিলে, জানিও মনে

উভয়েই মানুষাষে হয়েছে পতিত ।

প্রস্তরে ও পরস্পরে আঘাতিলে, দেখিয়াছ

কেমন উভয়ে হয় চূর্ণিত, ধ্বংসিত ।

তাজ ভয়ি ! পরিতাপ ! ঘৃণিয়া অনার্য্যগণে,

আজি পরস্পরে ঘৃণা করিছে কেমন

ওই দেখ আৰ্য্যজাতি । দেখ মহা আত্মহতা,

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের পতন !

ঈশ্বর মঙ্গলময় ! এই ঘোর অমঙ্গলে

কি মঙ্গল নীতি তাঁর আছে বিদ্যমান !

এই ঝটিকার শেষে কিবা শান্তি বিরাজিবে !

করিবে মানবজাতি কি অমৃত পান !

অবতীর্ণ নারায়ণ ! ভস্মিয়া অধর্ম্ম যবে

এ মহাশ্মশান হয় ! হবে নির্বাপিত ;

প্রেমময় পুণ্যময়, শান্তিময় সুধাময়,

কি মহান ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপিত !

তখন অনার্য্য আৰ্য্য” চাহি আকাশের পানে.

বহে আনন্দাশ্রুধারা মাতা সুভদ্রার ।

বহে আনন্দাশ্রুধারা গোবিন্দের হৃদয়ে ;

চাহি আকাশের পানে লাক্ষ চিত্রাকার !

“তাজ ভয়ি ! পরিতাপ ! তখন অনার্য্য আৰ্য্য,

ভাই ভগ্নী, মিলি সব করিব প্রহান

সে অনন্ত সুখপথে, অনন্ত কালের তরে,

গাইয়া তারকব্রহ্ম-মন্ত্র কৃষ্ণনাম ।

অগ্রবর্তী আর্ঘ্যগণ, অনার্য্য পশ্চাৎগামী
 শ্রীতির দক্ষিণ কর করি প্রসারিত
 আনন্দে লইয়া সঙ্গে, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ধ্যান
 করি, মনুবাহু-পথে হইবে ধাবিত ।

বুঝিবে মানবগণ,—সর্বজীবে নারায়ণ,
 সর্বজীব-হিত মহাধর্ম নিরমল ।

এই নব ধর্মে, ভয়ি ! হবে ক্রমে পরিণত
 মানব দেবত্বে, স্বর্গে এই ধরাতল ।”

কাকুর পড়িল মনে একপ পাতালে ব'সে

গাইত কিশোর কেহ, বহু বর্ষ গত,

এইরূপ স্বর্গ-গীতি মোহি কিশোরীর মন,—

কাকুর সে সুখ আজি স্বপ্নে পরিণত !

সেই কৃষ্ণ, সেই কাকু,—কাকুর হইল ভ্রম

সে রূপ পাতালে যেন বসিয়া হু'জন ।

জীবনের সে প্রভাত, সে প্রভাতে সেই স্বর্গ,

খুলিয়া মুহূর্ত্ত যাহা হইল স্বপন,—

কাকুর পড়িল মনে । সেই স্মৃতি স্মৃথে হু'থে,

তরঙ্গে, প্রতি তরঙ্গে, হায় রে ! বামার

কি দারুণ বেদনায় হইল অধীর প্রাণ,

ভাবিল হু' হাতে চাপি হৃদয় তাহার,—

“গাইয়া সে কৃষ্ণনাম, করি কৃষ্ণপদ ধ্যান,

পাবে নর হু'থে শান্তি, পাবে পরিজ্ঞান,

সেই নামে, সেই পদে সর্বস্ব অর্পণ করি

লভিল কি দাসী, নাথ ! এ মহাশ্মশান ?”

অধীরা রমণী কহে বিকলিত কণ্ঠে—“দেবি !

বাড়িছে রজনী, চাহি চরণে বিদায় ।

এ দয়ার প্রতিদান নাহি সাধ্য দিব আমি,
 পূজিবে এ দাসী নিত্য হৃদয়ে তোমায় !”
 হুই করে হুই কর, কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
 চারি বস্তু কমলের কিবা সন্মিলন—
 “যাইবার আগে ভাষি ! দেও আত্ম-পরিচয়
 কে তুমি রমণীরত্ন ? হেথা কি কারণ ?”
 নিশ্চয় কি কৃষ্ণ তবে কারুকে পারেন নাই
 চিনিতে ? কারুর বুক পড়িল ভাঙ্গিয়া ।
 মনেতে করিল স্থির নাহি দিবে পরিচয়,
 কহিতে লাগিল তবে অবনী চাহিয়া,—
 “নাগকন্যা, ঋষিপত্নী, মনসা দাসীর নাম,
 দারুণ কপালগুণে যৌবনে যোগিনী ।
 বেড়ায় সে বনে বনে, শৈলে শৈলে নিরঙ্কনে,
 বনমাতা প্রকৃতির প্রেমে উন্মাদিনী ।
 যথায় ঝটিকা গর্জে করি বন বিলোড়িত,
 করিয়া তরঙ্গভঙ্গে সিদ্ধু বিধূনিত ;
 যথায় জলদগুকে দৃপ্ত বজ্র বিক্ষুরিত
 ঘন দীপ্ত দিগন্তল, ধরা প্রকম্পিত,
 তথায় বেড়াই আমি । প্রকৃতির মহাপটে
 হৃদয়ের প্রতিকৃতি নিরখি আমার
 পাই বড় শান্তি মনে,—আসিয়াছিলাম তাই
 দেখিতে এ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-পারাবার ।
 দেখিতে দেখিতে, দেবি !—বীরপত্নী জান তুমি
 কি বিজলী নারী-প্রাণে করে সঞ্চালিত
 বীরবে,—বীরবে মুগ্ধা বাইতেছিলাম চলি,
 পথশ্রমে অবসরা হইল মুচ্ছিত ।”

আবার কারুর কব ধরি ছই করে ভজা
 জিজ্ঞাসিলা,— সেই কণ্ঠ সিক্ত করুণায়,—
 “কি দারুণ মনস্তাপ বহিছে হৃদয়ে আহা !
 কহিবে কি ? ভগ্নী আমি, কহ না আমায় ?
 জান, এক নদীশ্রোত বহিলে দ্বিতীয় পথে,
 হয় পূর্ব শ্রোতোবেগ মূহ, মূহুতর ।
 হুঃখের করিলে অংশী হয় হুঃখ প্রশমিত,
 শোকে সম-হৃদয়তা বড় শাস্তিকর ।
 রমণীর প্রাণে, প্রাণ মিশাইব রমণীর,
 তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ ।
 হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে
 এক বিন্দু, হবে মম সার্থক জীবন ।”
 কারুর হৃদয় দৃঢ় শিলা-বাঁধা সরোবর
 পরশিল এই স্নেহ, তুলিল উষ্ণাস ;
 অন্ধকারে অশ্রুধারা বহে বেগে অবিরল,
 কহিতে লাগিল কারু ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
 “ভগিনি ! তোমার স্নেহ, তোমার পরশ-সুধা,
 যেন মরুভূমে হয় ! জল স্রুশীতল,
 পশিছে হৃদয়ে মম ; কিন্তু এই মরুভূমে
 প্রবেশি হইবে তুমি উত্তপ্ত কেবল ।
 ভগিনি ! আমার হুঃখ, রমণীর মর্মব্যথা,
 রমণীর প্রাণে নাহি সহিবে তোমার ;
 ভগিনি ! আমার হুঃখ রমণীর মহাহুঃখ,
 ততোধিক রমণীর হুঃখ নাহি আর !
 সংসারের বত হুঃখ—যোগ ভিক্ষা, উপবাস,
 পদাঘাত, অসিধার, রমণীর প্রাণ

সহিবে প্রফুল্লমুখে,— প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা,
 যতক্ষণ নাহি হয় দিবা অবসান,
 সহে ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি ; সেই দিবা, সেই স্বর্গ,
 রমণীর প্রেম, আহা ! রমণীর প্রাণ ।
 সেই প্রেমে, সেই প্রাণে, রমণী প্রাণের প্রাণে ;
 নিরাশার কীট হায় ! পাতিলৈ আসন,
 হউক কুবেরপত্নী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা,
 জগতে চুঃখিনী নাহি তাহার মতন ।
 কৈশোর নিশির শেষে দেখিলাম সুখ তারা
 হৃদয়-আকাশে মম শান্ত সমুজ্জ্বল,
 যৌবন-প্রভাতে মম হইল সে অন্তর্মিত ;
 কি মকতে আজি সেই আকাশমণ্ডল
 হইয়াছে পরিণত, নিরাশা রবির করে !
 প্রেমে মুকুলিত অ-হা কি নিকুঞ্জ বন
 হইয়াছে বনভূমি ! সেই বিবরুক্ষ-বনে
 আজি জলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ !
 অভিমান শিলাখণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হতাশন
 চাপিঘাছিলাম এই দ্বাদশ বৎসর ।
 উড়াইয়া শিলাখণ্ড, হকারিয়া হৃদয়েতে
 আজি গর্জিতেছে কিবা আশ্রয় ভূধর ।
 “নাগবালা ! ঋষিপত্নি ।” কহিতে লাগিলা ভদ্রা,
 জ্বরংকর উচ্চ হাসি কহিল হাসিয়া—
 “ভগিনি ! বলিতে আর পারিলে না পাপিনীয়ে ।”
 গেল সুভদ্রার মুখ লজ্জায় ছাইয়া ।
 “না না, ভগ্নি ! পাপিনী যে তাকে সমধিক ভাল
 বাসি আমি, তার তরে কাঁদে এ মরম ।

অনন্ত মানবধর্ম, কে পারে তাহার অন্ত,

কে পারে করিতে পূর্ণ স্বধর্ম পালন ?

হৃদয় হইতে এই করাল কামনা-ছায়া

মুছে ফেল, পাবে শান্তি হৃদয়ে তোমার।

তুমি আমি, কে আমরা ? যিনি করিলেন সৃষ্টি,

তিনি করিবেন পূর্ণ কামনা তাহার।

অনন্ত নক্ষত্ররাশি আকাশে ফুটিয়া ওই,

আপনার কি কামনা করিছে সাধন ?

চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, তারা, মস্তক পাতিয়া ধরা,

মঙ্গলকামনা তাঁর করিছে পালন।

মুছে ফেল, মুছে ফেল, করাল কামনা ছায়া !—

আশায় নিরাশা ফলে, দুঃখ কামনায় ;

রমণী স্বজনে তাঁর আছে যে মঙ্গল নীতি,

জীবন অর্পণ কর তার সাধনায়।”

“মুছিব কি ? মুছবে কে ? রমণী”—

কহিল কারু—

“পারে কি প্রেমের ছবি মুছিতে কখন ?

অনন্ত সিদ্ধুর বক্ষে ভাসে স্বধাকর-ছবি,

সিদ্ধুও তা পারে না তা মুছিতে কখন !

তুল্যা তুমুল ঝড়, প্রসারি তরঙ্গ-কর,

ডুবাইতে ছবি সিদ্ধু চাহে যদি আর,

এক ছবি হয় শত, হয় শত সংখ্যাতীত,

শত গুণ উদ্বেলিত করে পারাবার।

যাহার স্বজন আমি, আমার কামনা, দেবি।

নহে কি স্বজন তবে সেই বিধাতার ?

পতঙ্গ স্বজিলা যিনি, অনলেতে অগ্নরাগ

নবীচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

পতঙ্গের নহে কি লো সৃজন তাঁহারি ?
চাতকীর বিধাতায় অতৃপ্ত পিপাসা তার
নাহি কি মেঘের তরে করিলা সৃজন ?
মানবের এত আশা হইবে নিরাশ যদি,
নিষ্ফল আশার সৃষ্টি কেন নিরমম ?
“কেন ?”—কহিলেন ভদ্রা—“জগতের এই ‘কেন’ ?
কি সাধ্য বন্ধিব বগ ক্ষুদ্র নহনারী ।
কেন এ অনন্ত সৃষ্টি ? ববি শশী গ্রহ তারা ?
কেন ক্ষুদ্র বালুকা ?—কে বহিতে পারি ।
আছে বিশ্ব নীতিরাজ্য, সে নীতি মঙ্গলময়,
সেই নীতি জগতের ধর্ম-সনাতন ;
মানবের আশা যত সেই নীতি অমুগত,
মানব-নিরাশা সেই নীতির লঙ্ঘন ।
তৃণটি পারিবে কেন সিদ্ধস্রোত প্রতিকূলে
করিতে আপন ক্ষুদ্র বলে সস্তরণ ?
সিদ্ধস্রোত প্রতিকূলে ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীধারা
বহিতে পারিবে কেন ? পারে কি কখন ?
জগতের সুখনীতি, সুখনীতি আমাদের,
মানবের সুখ, সুখ তোমার আমার ।
সেই মহাসুখ-স্রোতে, যাই তুমি আমি ভানি,
পাইব অনন্ত সিদ্ধ, সুখপারাবার ।
কেমনে জানিলে তুমি, এ কামনা-লতিকায়
ফুটিত ফলিত সুখ ছঃখ কি তোমার ?
এ আশায়, নিরাশায়, কেমনে জানিলে নাহি
মানব-মঙ্গল কোন নীতি নিয়ন্তার ?
এ তীব্র কামনা কেন, হায় ! মানবের তরে ?

চাহ রূপ ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর ?
 এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা যাহার অনন্ত রূপ,
 সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কি স্মন্দর ?
 চাহ গুণ ? এই বিশ্ব ধীর গুণ-লীলাভূমি,
 সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার ?
 চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব ধীর প্রেম পারাবার,
 সেই প্রেমময় হরি, হৃদয়ে, তোমার ।
 সেই প্রেমপারাবারে ঝাপ দেও নাগবালা,
 এই প্রেমস্বরীচিকা কর নিমজ্জিত !
 অনন্ত প্রেম-পিপাসা মানবের, মানবে কি
 পূরাইতে, জুড়াইতে পারে কদাচিত ?”
 আকাশের পানে চাহি হ’নয়নে প্রেমধারা
 বহিতেছে হৃদয়ার পবিত্র শীতল ।
 “হায় ! এক বিন্দু বারি”—নাগেন্দ্রনন্দিনী কহে
 . চাহি আকাশের পানে হৃদয় বিহ্বল,
 “হায় ! এক বিন্দু বারি দেখিল না যেই জন,
 সে কেমনে বৃষ্টিবেক মহাপারাবার ?
 হায় রে ! যাহার প্রেম অন্ধুরে পুড়িয়া গেল,
 সে অনন্ত প্রেমে দিবে কেমনে সঁাতার ?”
 চমকি কহিল ভদ্রা—“সে কি কথা স্মৃতিরাজে ?
 ঋষিপত্নী তুমি, তব পতি শ্রেষ্ঠতম ।
 তাঁর প্রেম-নিরঝরে ভাসাইয়া ময়ীচিকা,
 যাও বহি, যথা প্রেমমাগর-সঙ্গম ।”
 জরৎকার উচ্চ হাসি হাসিল, বিদারি গিরি
 নিরুদ্ধ গৈরিক যেন উঠিল গগনে ।
 “আগুণ ঋষির মুখে ! পতি মম সেই জন—

জীবনে যরণে মম জনমে জনমেণ
 তুচ্ছ ঋষি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবগণ (৩) পারিবে না ।
 জীবন্তে কখন ছায়া ছুঁইতে আমার ।
 অভাগিনী সূর্য্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
 অস্ত্র দিকে তবু নাহি দেখে এক বার ।
 হায় ! সূর্য্যমুখী মত চাহি সেই রবিপানে
 এক্ষণে জীবন-বুস্তে যাব শুকাইয়া ।
 আর,—নাগবালা আমি দংশিমা তাহার বৃকে
 মারিব, মরিব তাকে এ বৃকে লইয়া ।”
 বৃকে করি করাঘাত, হাসি পুনঃ উচ্চ হাসি,
 উন্মাদিনী বনমধ্যে চলিল ছুটিয়া ;
 ছুটিলা, ডাকিলা কৃষ্ণ বারেক অক্ষুটে—“কারু !”
 গেল বামা উক্সা যেন আঁধারে মিশিয়া ।

নবম সর্গ ।

কৃষ্ণনাম ।

এক পবিত্র তীর্থ ! মহীকহ-সমাবৃত
 হিমাক্রি-চূড়ার মত পড়িলা যথায়
 বর্ণক্ষেত্রে ভীষ্মদেব, বীরেন্দ্রকেশরী,
 শরসমাবৃত অঙ্গে, শবের শয্যায়,
 তথায় শিবির চাক হয়েছে স্থাপিত ।

শিবিরে শান্তনু-সুত, বীরমূর্ত্তি ক্ষত,
 অসংখ্য জবায় যেন পুষ্পিত, পুষ্পিত,
 শোভিতেছে অন্তগামী দিনকর মত !
 বীরত্বের কি পবিত্র তীর্থ সেই স্থান !
 সে শিবির কাল-বক্ষে মৈনাক মহান ।
 অতীত-প্রহর নিশি, ব্যাস, বাসুদেব
 সে শিবিরে ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ ।
 জলিতেছে দীপাবলী হেমদীপাধারে ;
 দেখিলেন-ভৈরব করি নয়ন উন্মেষ ।
 কহিলেন—“বড় ভাগ্য আসন্ন সময়ে
 দেখিলাম মহর্ষির চরণশঙ্কজ ।”
 লইলেন পদধূলি বাড়াইয়া কর,
 ধরিলেন শিরে সেই পুণ্য পদরজঃ ।
 ভক্তভরে বাসুদেব নমিলে চরণে,
 কহিলেন গদগদ কণ্ঠে কুরুপতি,—
 “কে নমে কাহারে ? হার এ লীলা তোমার,
 কেমনে বুঝিব হায় ! আমি অল্পমতি ।
 কে নমে কাহারে ? হায় ! আবির্ভাবে যার
 তুচ্ছ যত্নকুল, নরকুল পবিত্রিত ;
 যার আবির্ভাবে, এই জগতের হায় !
 তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত ;
 যার পদতরী ভর করি যুগে যুগে
 সংসার-অর্ণবযাত্রী দাবে যোকধাম ;
 পাপের ঝটিকা ছঃখ-তরঙ্গ ভীষণ
 উত্তরিবে করি যার নামামৃত পান ;
 নারায়ণ ! একি লীলা-রহস্য তোমার,

সেই কৃষ্ণ প্রণমিছে চরণে আমার !
 ভক্তিবিগলিত হই নয়নধারায়
 বীরের ভিজিতেছিল অস্ত্র-উপধান !
 কহিলেন কৃষ্ণ—“আর্য্য! একি কথা হৃদ
 জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম ?
 পবিত্র জীবন ষাঁর, বীরস্বের গাথা,
 জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত,
 দশ দিবসের যুদ্ধ শর-শয্যা ষাঁর
 করিবে মানব জাতি বিশ্বয়ে পুণিত ;
 পিতৃভক্তি ষাঁর এই আত্ম-বিসর্জন,
 প্রতিজ্ঞা, জ্বিতেন্দ্রিয়তা হইবে ঘোষিত
 অনন্ত কালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
 মানবের কর্মপথ করি আলোকিত ;
 মানব-জগতে রবে হিমাদ্রির মত
 বিরাট গগনস্পর্শী মূরতি ষাঁহার ;
 তাঁর পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিয়া হায় !
 নমিব মানব আমি চরণে কাহার ?”

ভীষ্ম । মানব !—মানব তুমি !—তুমিও মানব !
 দেবতার উদ্দেশে তবে মানবের স্থান !
 রবি শশী, বালুকণা ! পারাবার কূপ !
 বন্দীকের স্তূপ তবে গিরি হিমবান !
 ভীষ্ম কি এতই পাপী হা কৃষ্ণ ! একপে
 আসন্ন কালেও তুমি বন্ধিবে তাহার ?
 সেই রাজহৃদয়জ্ঞে সর্বোত্তম কেশব !
 চিনিয়াও না চিনিলা ভীষ্ম কি তোমায় ?
 এই মাত্র অভিমত্যা,—আহা ! বৎস মন
 কোরব-খনির শিশু মণি সর্বোত্তম !

এই বাল-শশী হবে পূর্ণিত যখন
 তাহার আলোকে ধরা হবে স্বর্গোপম ।
 মাতা পুত্র দুই জন আজি দুই দিন
 কি অমৃত ক্ষত দেহে বর্ষিছে আমার ।
 হইয়াছে শর-শয্যা স্বর্গশয্যা মম
 স্নেহ গুণবায়ু অভিমন্যু স্নেহদ্রাব্য !—
 এই মাত্র অভিমন্যু গীতীর বাক্যে
 শুনাইল কি স্বর্গীয় গীতা স্নেহাময় !
 সর্গে সর্গে কিবা স্বর্গ জ্ঞানের নয়নে
 প্লিলিল, হইল আত্মা কি অনন্তে লয় ।
 কৃষ্ণের গগনব্যাপী জ্ঞান উচ্চতম,
 মহাবীর স্নানলিত ভাষা নিরুপম,—
 হিমাদ্রিশেখরস্থিত স্নেহা স্নানীতল
 পতিতপাবনী গঙ্গা করিয়া বহন
 অবতীর্ণা ধরাতেলে, ধর্মের পিপাসা
 জুড়াইতে, মানবের পুরাইতে আশা ।

ব্যাস । আমি মাত্র মালাকার । জ্ঞানের উজ্জানে
 কুটিয়াছে গোবিন্দের, যে ফুলনিচয়
 গাঁথিয়াছি গীতাহার তুলি সেই ফুল,—
 চিরসুবাসিত, পুণ্য-পরিমলময় ।

কৃষ্ণ । ব্যাসদেব মালাকার ! জ্ঞানের উজ্জানে
 গোবিন্দের ! এ রহস্ত বড় হস্তকর ।
 কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুসুমকানন ?
 কার সৃষ্টি সে কাননকুসুমনিকর ?
 কার পদতলে বসি সংহিতা বেদের
 পড়িলাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল ?

কাহার অনন্ত জ্ঞান কৃষ্ণের নয়নে
উন্মেষিল এ বিশ্বের রহস্য অতল ?
শিষ্যের উদ্ভান, আর গুরু মালাকার,—
বড় অসঙ্গত কথা ! এই পুষ্পবন

তোমাৰি সজ্জিত প্রভু ! রচনা তোমার,
তোমাৰি কুসুম তুমি করেছ চষন ।

জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর !

আমি মাত্র তবালোকে দীপ্ত শশধর ।

ব্যাস । যেই আলোকেব বংস ! তুমি অবতার,

যে আলোক পূর্ণ প্রতিকলিত তোমায়,

আমি এক ক্ষীণ রশ্মি সেই আলোকেব

অনন্ত, খণ্ডোত ক্ষুদ্র তার তুলনায় ।

হইয়া অতল সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত

তুলিব অবিক্র রত্ন, কি সাধ্য আমার ?

আমি ক্ষুদ্র মীন, তাসি উপর সলিলে,

সি সাধ্য বুঝিব সিন্ধু-বহন অপার ?

করিয়াছি সত্য আমি বেদ সঙ্কলিত,

করিয়াছি বহু ক্ষুদ্র শাস্ত্র প্রণয়ন,

অনন্ত সমুদ্রবক্ষে পাতি ক্ষুদ্র জাল,

তুলেছি শঙ্করাশি ভাবিয়া রতন ।

মানবের মোক্ষস্থধা চন্দ্রনিকেতন,

কেমনে পাইবে হায় ! দরিদ্র বামন ?

ভীষ্ম । যথায় ব্যাসের এই ভাবা আশ্রয়ানি,

যে অনন্ত কাছে ব্যাস এত ক্ষুদ্র হায় ।

পশুবলে বলীয়ান আমরা সকল,

সেই অনন্তের জ্ঞান পাইব কোথায় ?

তথাপি পতঙ্গ মত উড়ি হই হাত
 ভাবিতাম এ অনন্ত করায়ত্ত মম,
 আজি এই মহাগীতা শুনিয়া বিশ্বয়ে
 বুঝেছি পতঙ্গ আমি কত ক্ষুদ্রতম ।
 বড় শুভদিন আর্ধ্য ! আজি মানবের !
 মানবের অন্ধকার অদৃষ্ট-গগনে
 কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রূপে সূর্য্য শশধর
 এত দিনে সমুদিত পবিত্র কিরণে !
 বড় শুভদিন আর্ধ্য আজি মানবের !
 মানব ভাসিতেছিল সংসারসাগরে
 দিকহীন, লক্ষ্যহীন, আশ্রয়বিহীন ;
 মানব ডুবিতেছিল মহাপাপভরে ।
 বড় শুভদিন আজি ! অদৃষ্টে তাহার
 মিলিয়াছে এত দিনে আলোক যুগল !
 মিলিয়াছে এত দিনে গীতার তরণী !
 লক্ষ্য,—নারায়ণ ; পথ,—প্রশস্ত, উজ্জল !
 উপজিল যথা সুধা সমুদ্রমহন,
 উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্ররণ ।
 মহাযোগী যেইরূপে ধরি মহাধ্যান,
 জীবাত্মা পরমাত্মায় করি নিমজ্জিত,
 কহিলা এ মহাধর্ম্য পার্শ্বে পুণ্যবান,
 করিলা এ মহাধর্ম্য-যুদ্ধে নিয়োজিত,
 মহর্ষির মহাবীণা গগনে উঠিয়া
 সেইরূপে এই গীতা না করিলে গান,
 পারিত কি ভবিষ্যৎ যুগযুগান্তর,
 এই নব ধর্ম্মায়ত্ত করিবারে পান ?

কবির কি উচ্চাশন ! যে কাল-তরঙ্গ
উজ্জ্বলতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি লহরী খেলিয়া
কবির চরণাঙ্কুরে করিয়া প্রণাম ।
কোথা সত্য ত্রেতা যুগ ! নাহি নিদর্শন
কোথায় কালের স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া ।

এখনও গায় ঋক-গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাজীকির জগত মোহিয়া ।
দ্বাপর হইবে স্বপ্ন ; এই রক্ষভূমি
কুরুক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে হবে পরিণত ;
মানব অনন্তকাল করিবেক পান
মহর্ষির গীতামৃত আনন্দে সতত ।
কবির কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক ;
শিক্ষা, সাক্ষী, বেদ সত্যবৃগের সরল ;
কে গুনিত রামসীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল ?
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য জগত নশ্বর,—
কবিতা অমৃত, আর কবির অমর ।

ব্যাস ।

মহাকবি মহেশ্বর ! বিশ্বচরাচর
মহাকাব্য ! কবিত্বের মহাপারাবার
অনন্ত অতল ! কিবা কবিত্ব সুন্দর
অক্ষরে অক্ষরে করে অজস্র প্রচার !
যে পারে পড়িতে এই কাব্য চিন্তাতীত,
অনন্ত সঙ্গীত পারে করিতে শ্রবণ ;
খেলে প্রতিবিম্ব যার হৃদয়দর্পণে
এ অনন্ত কবিত্বের,—কবি সেই জন !

এই কবিত্বই ধর্ম ; ধর্মশাস্ত্র আর
এই কাব্য ; এক ক্ষুদ্র অক্ষর মানব ।
মানব কে, নিয়তির কবিত্ব তাহার,—
যে পারে বুঝিতে, কবি, সেই বীরবর্ষভ !
মানবের এই ধর্ম, কবিত্ব তাহার,
আশ্রয় মানব কবি বুঝিতে কাতর ;
জালিয়া খণ্ডোতালোক নিয়তি তিমিরে
থুঞ্জেছে মানব কত কাল নিরন্তর ।
সফল ত্রিযুগ-শ্রম ; কৃষ্ণ অবতার
ঐহিকবি, গীতা সেই ধর্মের আধার ।

কৃষ্ণ ।

কীণা শ্রোতস্বতী, প্রভু ! সিদ্ধ অভিমুখে
যত হয় অগ্রসর, হইয়া মিলিত
ক্রমশঃ সলিল রাশি বেগ, পরিসর,
ক্রমে ক্রমে তটিনীর করিয়া বর্ধিত,
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে উপজিত ;—
বিবশা তটিনী তাহে হয় নিমজ্জিত ।
এ জীবন-শ্রোতস্বতী, অনন্তের মুখে
যত হয় অগ্রসর, বেগ ও বিস্তার
বাড়াইয়া ক্রমে তত ঘটনানিচয়
স্থানে স্থানে ঘূর্ণাবর্ত্ত করে আবিষ্কার ।
মানব সে ঘূর্ণাবর্ত্তে হইয়া পতিত,
হয় এক চিস্তাতীত শক্তির অধীন
অজ্ঞাতে আপনাহারা ; মানব তখন
হয় পূর্ণরূপে সেই শক্তিতে বিলীন ।
কুরুনাথ । বৃন্দাবনে বালকের প্রাণে
কি আলোক জ্ঞানাতীত ভাসিত সতত ।

কি শক্তি শরীরে, মনে, করিত সঞ্চীর !

চালা'ত শিশুকে ক্রীড়াপুতুলের মত !

সে আলোকে সে শক্তিতে হইয়া চালিত

নাচিতাম, হাসিতাম, করিতাম রণ ;

হইয়া প্রেমেতে মুগ্ধ, ভক্তিতে বিহ্বল,

নাচিত, হাসিত গোপ, গোপাঙ্গনাগণ ।

বৃন্দাবনে গোচারণে বসি নিরঞ্জে

শুনিতাম, যেন দূর সমুদ্র পর্জন,

ভারতের কি বিরাট হাহাকার ধ্বনি

অশান্তির, অধর্মের, প্রাবিছে কানন ।

বন-অন্তরালে বসি দেখিতাম হায় !

অশান্তির, অধর্মের, শিখা প্রধূমিত,

মিশি ঘোর জীৱ-ঘাতী যজ্ঞ-ধূমসহ,

করিতেছে কি ভীষণ মেঘ সঞ্চারিত !

শুনিতাম গোপমুখে বসি নিরঞ্জে

মথুরার নিদারুণ শোক সমাচার ।

পীড়িতের আর্তনাদ, হৃৎখীর বোদন,

কোমল কিশোর প্রাণে সহিল না আর ।

প্রধূমিত অগ্নিমাঝে,—করিলাম স্থির,—

দিব ঝাঁপ, ধর্মবারি করিব সিক্তন ;

সেই মহাশক্তি বলে ঝটিকা তুমুল

নিবারিব,—মহা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভীষণ

সামুদ্রের পরিজ্ঞাপ, বিনাশ ছক্কুতলের করিব সাধন ।

স্থাপন করিব ধর্ম,

এক মহা ধর্মরাজ্য

করিয়া সৃজন ।

বধিলাম কংসবাজে, করিলুম মথুরা

রাহুযুক্ত, শান্তি-শগী হাসিল আবার ।
 হইতেছি লক্ষ্যলষ্ট, পড়িছ নরিয়া
 বিমুখি মগধ-পতি সপ্তদশ বার ।
 পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন,
 লইলাম মহাবীর চরণে শরণ ;
 দিয়া প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি সুভদ্রার করে,
 পাণ্ডবের ভুজবল করিছ বরণ ।
 জ্ঞানবল, ভুজবল করিয়া আশ্রয়
 হইলাম কুরুক্ষেত্রে ধীরে অগ্রসর ;
 বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থ করিয়া বিজয়,
 করিছ পাণ্ডব শক্তি, শান্তি, দৃঢ়তর ।
 দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে জরাসন্ধে করিয়া নিধন
 নিবারিছ রাজমেধ, ঘোর পাপাচার ।
 করিল বিমুক্ত, বশী, নৃপতিমণ্ডল
 রাজহুয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রচার ।
 আনন্দে ভরিল প্রাণ ; বসি বৃন্দাবনে
 গোচারণে যেই ধর্ম-সাম্রাজ্য স্বপন
 সতত দেখিত শিশু, হইল স্থাপিত ;—
 এক বিন্দু রক্ত নাহি হইল পতন !
 আনন্দে ভরিল প্রাণ ; যে শক্তি অকুর
 সুভদ্রার স্বয়ংবরে হইল রোপিত,
 রাজহুয়ে মহাবুদ্ধে ছাইয়া অম্বর,
 করিল ভারতবর্ষ ছায়াসমাবৃত ।
 অস্তর-বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত ভারত,
 করাল কামনা-বন্ধ, কাম্যকর্মে হায় !
 উৎপীড়িত, প্রতারণিত, সতপ্রমত্তিত,

জাতীয় বিদ্বেষ বিধে জর্জরিত কায় ;—

ইহার ছায়ায় শান্তি পাবে নিরমল,

লভিবে অনন্তকাল মোক্ষস্থখফল ।

সাম্রাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, করিয়া সঞ্চার

নিকামত্ব, দেখাইয়া সর্ব্বভূতময়

নারায়ণ কি নিকাম, করিব সংসার

প্রীতিময়, শান্তিময়, সর্ব্বস্থখালয় ।

আবার অশান্তি-শিখা পশ্চিম ভারতে

দেখা দিল ; করিতেছি যবৈ নিকৰ্ণাপণ,

হায় ! মূষিকের মত পাপিষ্ঠ শকুনি

সেই মহীকহমূল করিল ছেদন ।

হইল নিশ্চীলাকাশে অশনির মত

পাণ্ডবের বনবাস মন্তকে পতন ;

বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, কম্পিতহৃদয়ে

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিলু ভীষণ ।

বুঝিলাম যে অধর্ম্মে আছন্ন ভারত,

যে অধর্ম্ম নরমেধ যজ্ঞে পরিণত,

হৃদয়ে পড়িল ছায়া, বুঝি সে বাকস

নরমেধ যজ্ঞ ভিন্ন হইবে না হত ।

গেল পাণ্ডবেরা বনে ; রয়েছে তথাপি

রাজহৃদয়ে যে সাম্রাজ্য হইল স্থাপিত ।

পালিছে নৃপতিগণ আনত মন্তকে

রাজহৃদয়ে যেই মন্ত্রে হইল দীক্ষিত ।

ভারত কভিছে শান্তি ; নাহি অরাসক

ভারতের শান্তি-বিস, নাহি শিশুপাল ।

থাক কর্ণ হুর্যোধন তরু নব মূলে,

আছে তথা ভীষ্ম, দ্রোণ, বহু মহীপাল !
 এইরূপে এই ভিত্তি হবে দৃঢ়তর
 ত্রয়োদশ বর্ষ ; শক্তি করিয়া সঞ্চয়,
 ত্রয়োদশ বর্ষ পরে করিব নিশ্চয়
 ধর্মরাজ্য-অট্টালিকা, অমর, অক্ষয় ।
 ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত
 আকাশ হইতে ভূমে হইল পতিত ।
 ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি হইতে অতীত,
 বিরাট-বিজয়ে চক্ষে করিল দর্শন
 অধর্ম করিতেছে শক্তির সঞ্চয়,
 ধর্মের সহিত হায় ! অনিবার্য্য রণ ।
 কি যত্ন না করিলাম ! পঞ্চখানি গ্রাম
 চাহিল এ নরমেধ করিতে বারণ ।
 “বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী”—
 শুনিলাম অধর্মের প্রতিজ্ঞা ভীষণ !
 দ্রবিলে না শিলা, নাহি কর বিচূর্ণিত ;
 বিবরুদ্ধমূলে কর অমৃত সিঞ্চন,
 তথাপি সূক্ষ্ম নাহি ফলে কদাচিত ;—
 অধর্মের শেষ ধ্বংস নিয়তি ভীষণ ।
 বাজিল সমরভেরী যুড়িয়া ভারত
 শুনিলাম দেখিলাম পঙ্গপালমত
 ছুটিল নৃপতিবৃন্দ মরিতে পুড়িয়া,—
 বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছা ধ্বংসব্রত ।
 ভাঙ্গিয়া পড়িল বুক, কাঁদিল পরাণ,—
 করিলাম দ্বারকা শোকেতে প্রস্থান ।
 হইলে আহুত যুদ্ধে, ধর্ম কজ্রয়ের

পালিলাম, করিলাম যুদ্ধে যোগদান
 নিরস্ত্র ও নিরপেক্ষ ; স্বধর্ম-পালন
 করিতে অশক্ত নহে পাণ্ডবরূপাণ ।
 ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত সমরে
 হই মহা অনীকিনী ; করিয়া দর্শন,
 স্বজন উভয় সৈন্তে, করণ হৃদয়ে
 কহিলেন পার্থ,—“আমি করিব না রণ !”
 শিহরিবু একি কথা !—“করিব না রণ !”
 আশৈশব নির্যাতন, ঘোর পাপাচার,
 সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
 সে কপট দাত-ক্রীড়া, ক্রপদ-বালাও
 সেই অপমান লোমহর্ষণ ভীষণ,
 পুনঃ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হায় !
 সর্ব শেষ বিনিময়ে সেই সাত্রাজ্যের
 সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি মিলিল ভিক্ষায় !—
 থাকে যদি অধর্মের এই অভূতান
 অক্লুগ, হা ধর্ম ! তব কে লইবে নাম !
 পার্থ করিবে না রণ ! করিবে গ্রহণ
 কোরব-অধর্ম তবে ধর্মের আসন ;
 অধর্ম-অশান্তি-শিখা জ্বলিবে এমন ;
 আমার সে ধর্মরাজ্য হইবে স্বপন !
 একদিকে বর্তমান ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
 অত্র দিকে ভবিষ্যৎ অনন্ত বিস্তার ;
 এক দিকে কোরবেবা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম,
 অত্রদিকে সংখ্যাতীত মানব অপার ।
 অধর্মের এ আদর্শে ক্ষুদ্র বর্তমান

করিবে অনন্ত ভবিষ্যত কলুষিত ।
 কোরবের এ আদর্শে মানব দুর্বল
 করিবে অনন্তকাল পাপে প্রবলিত !
 জগতের এ অশান্তি হবে চিরদিন !
 অন্তর-বিগ্রহানল জলিবে এমন !
 ধর্মের এ দুর্বস্থা, দুঃখ মানবের,
 নারায়ণ । পারিক না করিতে মোচন ?
 কর্ম,—যাগযজ্ঞ । জ্ঞান,—সংসারবর্জন !
 বৈদিক ধর্মের এই ঘোর পরিণাম !
 কত দিন আত্মজাতি রহিবে জীবিত
 নিরন্তর করি এই মহাবিষ পান ?
 যেই ধর্মামৃত পানে পাবে মোক্ষ নর,
 না পাইল এক বিন্দু সেই শাস্তিজন,
 আমার জীবন-ব্রত চলিল ভাসিয়া ;
 জীবনের শ্রম যম হইল বিফল ।
 সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন,
 হইল না ; হইল না ধর্মের স্থাপন ।
 পড়িলাম ঘূর্ণাবর্তে ; দেখিলাম হায় !
 এক দিকে অধর্মের স্বচ্ছ অন্ধকার,
 অত্র দিকে ধর্মরাজ্য-জ্যোতি নিরমল,—
 হইল জীবনে ব্রহ্মমূর্ত্ত সঞ্চার ।
 সে আশায়, নিরাশায়, আলোকে, অাধারে,
 কহিল কি চিন্তাতীত শক্তির অধীন ।
 কহিল অর্জুনে এই ধর্ম সনাতন
 হইয়া সে জ্ঞানাতীতে যোগস্থ, বিলীন ।
 গায়ক সে নারায়ণ ; এই গীতা তাঁর ;

ভীষ্ম ।

আমি ও মহর্ষিমাত্র নিমিত্ত ইহার ।
মানব—মানব তুমি ! মানবজীবন
এই লীলা ! মানবের এ অনন্ত জ্ঞান !
আজি দুই দিন কৃষ্ণ ! এ শরশয্যায়
অপূর্ব চরিত তব করিয়াছি ধ্যান ।
সামান্য মানব তুমি নহে কদাচন
বুঝিতাম, বুঝি নাই অকাল-বিস্তার
বিশ্বব্যাপী এই ব্রত । আসন্ন শয্যায়
আজি কি খুলিল ক্ষুদ্র নগ্নন আমার ?
আজি তব বিশ্বরূপ দেখিতেছি হায় !—
অনন্তের গর্ভে যেন,—হৃদয়ে তোমার—
ভাসিছে অনন্ত বিশ্ব ; বুঝিতেছি হায় !
তোমার জীবন-ব্রত জগত উদ্ধার ।
তব কুরুক্ষেত্র বিশ্ব ; জীবাত্মা অর্জুন ;
ধর্ম্মাধর্ম্মে পাপ পুণ্যে বাজিয়াছে বণ !
হইয়া সারথি যুদ্ধে জীবাত্মার জয়
সাধিতেছ, নবরূপী তুমি নারায়ণ ।
এ ধর্ম্মসাম্রাজ্য-পথে ভীষণ কণ্টক
হইল কি ভীষ্ম ? হায় ! ভীষ্ম হরাচার
ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্মকে করিয়া আশ্রয়
করিল কি সংখ্যাভীত জীবের সংহার ?
বান্ধদেব ! বনমাগি ! কৃষ্ণ ! নারায়ণ !
ভীষ্মের কি গতি হবে কহ জনাৰ্দন !

কৃষ্ণ । হে রাজর্ষি ! বৃথা এই অমৃতাপ তব ।

মানুষ কালের ক্রীড়া । কাল-শ্রোতঃ হায় !

যখন যে পথে বহে, সে পথে ভাসিয়া

বীর নরগণ, তৃণসমষ্টির প্রায় ।
 অধর্মের কি প্রাধনে প্রাবিত ভারত ।
 অস্ত্রের কি কথা, ভীষ্ম দ্রোণ পৃথ্বীতম
 ভাবেন অধর্মে ধর্ম, কুস্মাটিকা মত
 ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয় । তাঁদেরও নয়ন ।
 অনিবার্য হ'লে যুদ্ধ, ছিল এক আশা—
 ভীষ্ম দ্রোণ, কদাচিত্ত করিবে না রণ ।
 কোরব পাণ্ডব তুল্য তাঁদের নয়নে,
 রহিবেন অস্ত্রহীন আমার মতন ।
 সে আশাও গেল ভাসি অধর্মের স্রোতে ।
 কোরবের আশৈশব জ্বর ব্যবহার,
 সেই জতুগৃহ-দাহ, সেই বনবাস,
 সে কপট দ্রুতক্রীড়া, দ্রুপদ-বাণার
 সভাস্থলে নিরমম সেই নির্যাতন,
 “না দিব হৃদ্যাগ্র স্থান”—প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
 ভুলিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, মোহের আবেশে ।
 “স্বতরাষ্ট্র অগ্নে প্রতিপালিত আমরা,
 হইবে অধর্ম”—মনে করিলেন স্থির,—
 “কোরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ ।”
 অধর্মের অভ্যুত্থান হয় ! কি গভীর !
 অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্তিত,
 হইতে হইবে তবু সহায় তাহার ।—
 ধর্ম কি অধর্ম হয় ! বলিব ইহায়ে ?
 পাপের প্রশ্রয় দেব ! নহে পাপাচার ?
 অন্নদাতা হয় যদি পাপে প্রবর্তিত,
 নিবারণ যথাসাধ্য করি প্রাণপণ ;

না পারি, রহিব দূরে ব্যথিত অন্তরে ;—

ইহা কৃতজ্ঞতা, ইহা ধর্ম সনাতন ।

আর সেই অর,—অর্ক নহে কি তাহার

পাণ্ডবের ? অর্ক-রাজ্য পাণ্ডবের নয় ?

এই ভাস্তি ঘটাইল এই মহারণ,

করিল ভারত-ভাণ্ডা চির ছায়াময় !

ভীষ্ম, দ্রোণ, অস্ত্র নাহি করিলে গ্রহণ,

হইত কি দুর্ঘোষন রণে অগ্রসর ?

হইলে, এ কুরুক্ষেত্র হইত নিশ্চয়

উত্তর গোগৃহ,—সেই ক্রীড়া হাস্যকর !

কিন্তু অধর্মের ধ্বংস হইত কি হয় !

থাকিতে অধর্মী এই ক্ষত্রিয় নিচয় ?

থাকিতে প্রোচীর, স্তম্ভ, আশ্রয় প্রবল,

নাহি পড়ে অট্টালিকা, নাহি হয় লয় !

এই মহারণ-প্রোতে যেতেছে কি ভাসি

যুগের অধর্ম ? তব মহিমা অপার

কি বুঝিব নারায়ণ ! আমি ক্ষুদ্র নর !

এই বুঝি,—তুমি সর্ব মঙ্গল আকর ।

ভীষ্ম । কি বুঝিব আমি তবে নর ক্ষুদ্রতম !

এই বুঝি,—তুমি কৃষ্ণ নর-নারায়ণ ।

নাশিয়া তুচ্ছত, সাধু করিয়া উদ্ধার,

স্থাপন করিতে ধর্ম তব আগমন ।

বিপুল পৃথিবী ; মহাকাশ অন্তরীণ ;

অনন্ত মানবজাতি ; মুষ্টিমেয় তার,

অষ্টাদশ অকোহিণী, মানব মঙ্গল

রোধিতেছে,—কুরুক্ষেত্র ককণা অপার !

মানবের ভবিষ্যত কি আনন্দময় !
 দেখিতেছি কুরুক্ষেত্রে করি আত্মক্ষয়
 অধর্মের ঘনঘটা, হিংসা বজ্রানল
 নিবিল ; উঠিল কিবা ধর্ম-সুধাকর !
 পুণ্যভ্যোন্মায় হাত অনন্ত মানব
 লভিতেছে কিবা সুখ যুগ যুগান্তর !
 ভূতল আনন্দরাজ্য ! বিস্তৃত ত্রিপথ
 হইয়াছে এক মহা বেদিমূলে লয় ।
 ত্রিধ্বথে ত্রিঐজয়ন্তী উড়িছে শূন্য—
 “জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—কিবা স্বর্গ শোভাময় !
 সোর-সরসিঙ্গ বক্ষে উল্লে নারায়ণ
 বসি কৃষ্ণরূপী, মুক্তি পূর্ণ মহিমায় ।
 • মধুর বাণরীষরে ডাকিছে—“মানব !
 আইস যে পথে পার, পাইবে আমায় !”
 দেখিতেছি ছুটিয়াছে ত্রিপথে মানব
 চারু বৈজয়ন্তীজয় করিয়া আশ্রয় ;
 স্মমধুর কৃষ্ণনাম, ভূতল গগণ
 করিতেছে কি পবিত্র, কি আনন্দময় !
 গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্তি, হৃদয়ে হৃদয়ে ।
 মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, যুগ যুগান্তর !
 দেখিতেছি পাপতাপ-পূর্ণ ধরাতল
 হইতেছে ক্রমে স্বর্গ, স্বর্গ উচ্চতর ।
 নারায়ণ ! জনার্দন !”

—চাহি বীরধ্বজ

কৃষ্ণপানে ভক্তিপূর্ণ সজলনয়নে—

“ভীষ্ম মহাপাপী নাহি পাইল কি স্থান

সে আনন্দরাজ্য-স্বর্গে, হায় । এ জীবনে ?
 জন্ম জন্মান্তরে তাবে, ভকতবংশল !
 সেই স্বর্গে, পদাঙ্ক-প্রান্তে, দিও স্থান !
 দয়াময় । ছিন্ন এবে সংসারবন্ধন,
 দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম ।
 আমি নহি ভীষ্ম ; তুমি নহ বাহুদেব ।
 আমি ভক্ত ; দেখিতেছি 'তুমি ভগবান,
 শঙ্খচক্র-ধর হরি ; পতিতপাবন ।
 দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম ।"
 বহিতেছে প্রেমধারা বাহিয়া কপোল,
 আকুল হৃদয়ে ভীষ্ম বাড়াইয়া কর ।
 বিহ্বল হৃদয়ে কৃষ্ণ পড়িলা হৃদয়ে,—
 বিরাজিলা বৈকুণ্ঠেতে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 ভক্তিতে বিহ্বল ব্যাস, আকুলিত প্রাণ,
 পাইতে লাগিলা প্রেমকণ্ঠে কৃষ্ণনাম ।

দশম সর্গ ।

—:—

ব্যাধ ।

—:—

কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি অতীত প্রহর ।
 অদূরে অরণ্যে পত্রপল্লবকুটীরে
 বসিয়া ছল্লাসা, কর্ণ, চিন্তাকুল মন ।
 দূর প্রান্তরের শেষে চিত্তাশ্রয় মত

অজিতেছে কাষ্ঠধুনি অলিয়া নিবিয়া !
জপিছেন ঋষিগণ কুজাক্ষের মালা
ধীরে ধীরে ; বনরাজি নীরব, নিৰ্জ্জন ।

কর্ণ । দশদিন মহারথী করি মহাদণ,
বিনাশি অসংখ্য সৈন্ত, চতুরঙ্গদল,
লিখিয়া অক্ষয় কীর্তি কালের হৃদয়ে
অস্ত্রমুখে, রণক্ষেত্রে কুশিরপ্লাবিত,
সিন্ধুগর্ভে অর্পমান অংশমালীমত,
ভীমকর্মা ভীষ্মদেব শর-শয্যাগত !

দ্রুপদা । উত্তম ! ক্ষত্রিয়-ক্ষয় হয়েছে সার্বিত
সংখ্যাতীত একদিকে, হত অন্তদিকে
ক্ষত্রিয়ের শীর্ষ ভীষ্ম কৃষ্ণ-উপাসক ।
রাজহুয় যজ্ঞে এই বিধর্মী পামর
বেদ-দেবী কৃষ্ণে অর্ঘ্য করিয়া প্রদান
ব্রাহ্মণধর্মের মূলে করিল প্রহার
প্রথম কুঠার তীক্ষ্ণ ; নিবারিতে দণ
কত ধর্ম-তর্কজাল করিল বিস্তার ।
উত্তম, সে বাছ, জিহবা, নড়িবে না আর !
তুমি ?

কর্ণ । ধরে নাই অস্ত্র প্রভুর আদেশে
দাস এই দশ দিন, উপদেশ মত
সজিয়া কলহ-ছল ভীষ্মের সহিত ।

দ্রুপদা । উত্তম ! সন্ধ্যান্তে আজি কি আনন্দধ্বনি
হইল কোরব সৈন্তে ?

কর্ণ । প্রতিকৃত দ্রোণ
বধিবেন কালি যুদ্ধে করি ঘোর রণ

পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথী এক জন ।
 হুঁসীসা । উত্তম, উত্তম ! আর সংসপ্তকগণ ?
 কর্ণ । প্রভুর মন্ত্রণা দাস করেছে পালন ।
 তাহার কৌশলে প্রভু ! সংসপ্তকগণ
 করিয়াছে ধনজয়ে যুদ্ধে আবাহন,
 হইতেছে সংসপ্তকে ধনজয়ে রণ
 ঘোরতর !

হাসি ঋষি—“অতীত উত্তম ।
 মন্ত্রযুদ্ধে জয়ী বৎস ! হইলে আমরা,
 তব করে স্নাতাহতি করিয়া প্রদান
 কোরবের রাজ্যলোভে, করিলে বিফল
 পঞ্চগ্রাম-ভিক্ষা-চক্র গোপ পামরের,—
 নিবারিতে এই বৃদ্ধ, শাস্তির কমল
 ফুটাইয়া ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপন
 আপনার বেদ-ধেয়ী, কতই কৌশল
 করেছিল ছরাচার ! অজস্র শিশির
 বরষিয়া তব করে করিলে নির্মূল
 অঙ্কুরে সে শতদল, গেল দ্বারিকার ।
 রহি নিরপেক্ষ চক্রী ভেবেছিল মনে
 রক্ষিবেক এই মহাকল্পিত খাণ্ডবে
 আপনার কুলজয় । দেখিলাম আমি
 দিবা চক্রে, থাকে যদি পশ্চিম ভারতে
 এ বিশাল কুলজয়, ধর্ম ব্রাহ্মণের,
 ব্রাহ্মণের আধিপত্য, হবে না কখন
 নিরঙ্কুশ ; সেই হেতু আদেশি তোমায়
 পাঠাইয়ু হুয়োধনে দারকানগরে ।

নিশ্চয় পাণ্ডব তবে যাবে দ্বারকায়
 দেখিলাম দিব্যচক্ষে, বুঝিলাম আর
 হইলে আহুত যুদ্ধে চক্রী নিরপেক্ষ
 অনিচ্ছায় দুইপক্ষ করিবে গ্রহণ,—
 পাড়িয়াছে উর্ণনাভ আপনার জালে !
 সারথ্য করিয়া আজি দেখ নারায়ণ
 নাশিছেন নারায়ণী সেনা আপনার,—
 কণ্টকে কণ্টক দিব্য হতেছে উদ্ধার !
 কাপুরুষ কঁচাইতে আপনার প্রাণ
 করিয়াছে নীচকর্ম সারথ্য গ্রহণ ।
 দুর্কীসার যোগ-মন্ত্র কাল সেই প্রাণে
 করিবেক বজ্রাঘাত অমোঘ সন্ধানে ।
 সবাসাচী সংসপ্তকে হ'লে কাল রণ,
 রবে একমাত্র যোদ্ধা পাণ্ডব শিবিরে
 দ্রোণ-কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী, রক্ষিতে পাণ্ডবে
 হইবেক মহারথী যুদ্ধে অগ্রণর,
 তাহাকে বধিতে কালি হইবে নিশ্চয় !”

কর্ণ । কে সে প্রভো !

কাণে কাণে কহিলা দুর্কীসা ।

অঙ্গপতি বীর অঙ্গ উঠিল শিহরি ।

দুর্কীসা । পাণ্ডবের দুই ভুজ—রুম্ব, ধনঞ্জয় ।

ক্রোধে শোকে দুই ভুজ হইয়া অধীর,

উন্নত, কটাক্ষে করি ধ্বংস কুরুকুল,

বিষক্রাস বজ্রাঘাতে তৃণরাশি যথা,

হইবেক অবসন্ন । কাটিবে হেলায়

সপাণ্ডব এক ভুজ হুঁমি পষাক্রমে ;

নিষ্কপিব অস্ত্র ভুজ পশ্চিম সাগরে ।
 অব্যর্থ তপস্তা মম ;—হুই দিন আর
 বেদ ত্রাক্ষণের শত্রু যাবে রসাতল ;
 কর্ণের সাত্রাজ্য-ধ্বজা উড়িবে উজ্জল ।
 ও কি !!

চমকিলা ঋষি—“কি যেন নড়িল !
 আইস দেখিয়া,” কর্ণ কহিলা ফিরিয়া—
 “কিছুই না, আঁধারের পশ্চাতে আঁধার ।”

বসিলেন পূর্বাসনে চিন্তাকুল মনে ।
 কর্ণ । এ দ্বাদশ দিন সে ত করে নাই রণ,
 রণক্ষেত্র তার যেন ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ !
 আসিলে সে রণক্ষেত্রে, মহারথী কেহ
 যদি হয় সমুদান, অপূর্ব কৌশলে
 পরাভবি যায় শিশু উপহাস করি ।
 স্থির চিত্ত যদি রণে হয় অগ্রনর,
 সহজে জিনিবে তারে দ্রোণ কি কর্ণের
 নাহি সাধ্য, সিংহ-শিশু সিংহ-পরাক্রম ।
 হউক যতই ক্ষুদ্র ভীম বজ্রানল,
 মহামহীকহ নাহি সবে তার বল ।

হর্কাসা । একা কর্ণ, একা দ্রোণ, নাহি পারে যদি,
 দ্রোণ-কর্ণে মিলি তবে করিবে সমর ।
 নাহি পারে এক রথী, সমুদরথী মিলি
 বধিবে তাহারে রণে ; বধে যেই যতে
 যুগেযুগে ফেলিয়া জালে বনে ব্যাধগণ,
 আনন্দের কোলাহলে পূরিয়া গগন ।
 কর্ণ । এই ব্যাধ-বৃন্তি প্রভু ! বীরধর্ম নয় ।

পারিবে না দ্রোণ কর্ণ ।

হর্কাসা ।

না পারুক দ্রোণ ।

অবশ্য পারিবে কর্ণ ।

কর্ণ ।

পারিবে না দাস ।

হর্কাসা ।

হেলায় গুরুর আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন !

কর্ণ ।

অনুমতি কর গুরো ! যত্নস্বীকার করে

জায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রণ,—
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী ! আসুন আহবে
বজ্রপাণি, শূলপাণি, দেব-পেনাপতি,
পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সময় ।
হানিয়াছিলাম খড়্গা তোমার আজ্ঞায়
পুত্র বৃষকেতু শিরে ; আজ্ঞা কর যদি
হানিধি আপন শিরে, কাটি এই শির
গুরুভক্তি উপহার দিব পদাধুজে ।
এক মাত্র চাহি ভিক্ষা—বীরত্বে কর্ণের
করিও না এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ ।

হর্কাসা ।

নিজ পুত্র হইতে কি তবে প্রিয়তর

শত্রুপুত্র ? তার বধে পাপ সমধিক ?

কর্ণ ।

প্রতিশ্রুত ছিল দাস পাদপদ্মে তব,—

গুরু, বিপ্রে, যেই ভিক্ষা চাহিবে যখন

অম্লান বদনে তাহা করিবে প্রদান ।

আপনি চাহিলে ভিক্ষা ; তুলিলাম অসি

পুত্রশিরে ; ভাবিলাম রহিবে জগতে

দাতাকর্ণ নাম যম, রবে ভবে আর

পুত্রত্যাগী গুরুভক্তি আদর্শ অতুল ।

হুর্কাসা । আশিও চাহি এ ভিক্ষা ।

কর্ণ ।

দিবে ভিক্ষা দাস ;

কালি কর্ণ তার সনে করিবে সংগ্রাম
ঘোরতর । হা অদৃষ্ট ! ভয়, পরাজয়,
কর্ণের কলঙ্ক মাঝ ঘটাবে, উভয় ।

হুর্কাসা ! দ্রোণ, কর্ণ, উভয়ের নেহ-শ্লথ কর
পারিবে না স্বন্দর্য্যকে । বহুবধী মিলি,
জায়া কি অস্তায় যুদ্ধে, বধিবে তাহারে—
হুর্কাসা চাহিছে ভিক্ষা ।

কর্ণ ।

হা পুত্র আমার !

কুরুক্ষেত্রে প্রকলিত হিংসা-মরু মাঝে
কি অমৃত বাছা মম করে বিকিরণ !
কি কোরব, কি পাওব, উভয় শিবিরে
বেড়ায় মনের সুখে ; কৈশোর উজ্জ্বলসে
পরিপূর্ণ বুক তার, পরিপূর্ণ মুখ ।
শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ে সমান ভক্তি, প্রীতি সমতুল ;
আকাশের সুধাপূর্ণ সুধাকর সম
সর্বত্র বরষে সুধা অজস্র ধারায় ।
শিশুরা সকলে ভাই : পিতৃব্য আমরা
সকলেই ; পত্নীগণ সকলি জননী ;
সমস্ত জগত তার প্রেমের নিবাস ।
বৃষকেতু পাশে বসে বসে গলা ধরি,
গলা জড়াইয়া মম “তাত ! তাত !” বলি
কহে যবে স্নেহকথা হাসি হাসি মুখ,
বাসি ভাল পুত্রাধিক ! ইচ্ছা হয় মনে

চিরিয়া হৃদয় তায়ে রাখি সেই খানে,
সে নহে এই জগতের কর্কশ বন্ধুর ।
ইচ্ছা হয় তাজি এই ছদ্ম অভিনয়,
ধনুর্বাণ করে নাশি কোরব পাণ্ডব,
ভারত সাম্রাজ্যে তায়ে করি অধিষ্ঠিত ;
জুড়াক্ জগত, শাস্তি লভুক মানব ।
দেব পিতা, দেবী মর্তা, দেবতা মাতুল ;
জগতের এ দেবজ্ঞ করিব নিশ্চল !
এ অধর্মের নিপতিত করো না দাসেরে !
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায় !

ক্ষুদ্র জতুগৃহ যেন উঠিল জলিয়া
অকস্মাৎ ! উঠি বেগে ক্রোধাক্ত হুর্দ্বাসা
কহিলা বর্ণের শিরে করি পদাঘাত—
“নবোধম ! ককলন্ততি সম্মুখে আমার ।
জমদগ্নি-স্মৃত কাছে সূত্রধর-স্মৃত
ক্ষত্রিয় বলিয়া যবে দিল পরিচয়,
সে ছলনা সমর্থন করিল হুর্দ্বাসা,
কোথা ছিল ধর্ম তোর গুরে দুরাচার ?
গুরুদেব ! গুরুদেব ! নাহি জানি কেন
শিথিরাংরে যুদ্ধ বিজ্ঞা আছিল পিপাসা
আটশপদ ; কৃপা করি করিলে পূরণ ।
কিশোর জীবনে সেই হইল সঞ্চার
ক্ষুদ্র পাপ ! সেই পাপে আনিয়াছে কোথা ?
তোমার আদেশে প্রভু ! জীড়া বজ্রভূমে
প্রবেশিল কোরবের বৈদ্যমানর রূপে,
ভস্মিতে ক্ষত্রিয়কুল অনন্ত নিগ্রহে ।

সে অবধি হায় ! তব অঙ্গুলি নির্দেশে,
 তব করধৃত জড় পুস্তলিকা মত,
 করি ছদ্ম অভিনয় কোরব সভায়,
 জালাইলু প্রভু ! এই মহা দাবানল !
 কোন পাপে আত্মা নাহি করিলু দীতিত !
 নির্কোষ অদূরদর্শী যেই হৃষ্যোধন
 হৃতপুত্রে দিল অঙ্গ-রাজ্য-সিংহাসন,
 করিতেছি ভঙ্গ্য তাবৈ স্বকুল সহিত !
 পুড়িতেছি হায় ! হীন পতঙ্গের মত
 ক্ষত্রিয় বীরেন্দ্র-গ্রাম জগতগোরব,
 নররক্তে করিতেছি পৃথিবী প্রাবিত !
 ভঙ্গ্য হইতেছে মহা মহীকহ চয় ;
 শিশু তরুগণে কর দয়া ! নররক্তে
 লোহিত এ কর, দয়া কর, কমা কর,
 শিশুরক্তে কলঙ্কিত করিও না আর !
 দাতাকর্ণ নাম যার, বিশ্বাসঘাতক
 নর-হস্তা আততায়ী সেই হুঁরাচার !
 গুরুদেব ! গুরুদেব ! কমা কর এবৈ
 ধরি, তব পায়—

“পাপি ! বিশ্বাসঘাতক !”

গার্জ্জনা হুঁসাসা পুনঃ করি পদাঘাত ।
 আসি এত দূর মূৰ্খ ! এইরূপে তুই
 হুঁসাসার মনোরথ করিবি বিফল !
 করিবি বিশ্বাস ভঙ্গ গুরু-জনকের !
 জনকের !

বপ

হুঁসাসা ।

জনকের ! বিশ্বত নয়নে

বিশ্ময়ে চাহিলা কর্ণ ঋষিযুগ পানে
বিকৃত বিবর্ণ ক্রোধে । পড়িল ভাবিয়া
পর্যন্তের চূড়া যেন মন্তকে নিমিষে ।
নিমিষে হইল যেন ভীষণ নিনাদে
বিদারিত বিচূর্ণিত পুণ্ড্রবীমণ্ডল,
বীর বক্ষ ছরু ছরু উঠিল কাঁপিয়া ।

দুর্কীশা ।

শুন তব কলঙ্কার !

শিষ্য কুস্তিভোজ
করেছিল কত্যা কুস্তী আদেশে আমার
নিয়োজিত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-সেবায়,—
পুত্রাখী । একদা আমি হইনু অতিথি
ভোজগৃহে ; পরিচুষ্ট হইয়া সেবায়;
শিখাইনু কুমারীকে মন্ত্র অভিচার ।
আকর্ষিল মন্ত্রবলে কুস্তী সবিতায়,
জনম হইল তোমার । পাপীয়সী মাতা
নির্দয়া সলিলে তোরে করিল নিক্ষেপ ;
শিষ্য বাবা সযতনে করিল পালন ।
ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় সমূলে
বিনাশিতে, অশাণিত ক্ষত্রিয়রূপাণ
দেখিলাম যোগবলে হবে প্রয়োজন ।
পরশুরামের করে সেই হেতু তোরে
ক্ষত্রিয়-নন্দন বলি করিহু অর্পণ
শিক্ষার্থে । দুর্কীশা কভু নহে মিথ্যাবাদী,
কুস্তীর নন্দন তুই, মন্ত্র-পুত্র মম ।
হৃতেব নন্দন নহে মহর্ষি দুর্কীশা
শিখায় কি ধনুর্ধ্বজ ? হৃতেব নন্দনে

ভারত সাম্রাজ্য চাহে করিতে প্রদান
 হুসীসা ? বানরে চাহে দিতে ইন্দ্রপদ ?
 রে কৃতঘ্ন কুসন্তান ! গুরুর, পিতার,
 আজীবন ব্রত তুই করিবি বিফল ?
 যে চাহে সাম্রাজ্য-তোরে করিছে প্রদান,
 তার প্রতি তোব এই তীব্র তিরস্কার ?
 কি দারুণ কৃতঘ্নতা ! কহে যেই কর
 তোর মুখে হুয়াচাৰ। অহা, প্রদান,
 দাহন করিবি তুই এই ভীতানগে ?
 যা রে চলি কুলাঙ্গার ! একটি অক্ষর
 মম আদেশের যেন না হয় লঙ্ঘন ।

স্তুম্ভিত, বিস্মিত, ভীত কর্ণ রুদ্ধধ্বাসে
 চসিলা মহর্ষি পদে করিয়া প্রণাম
 চিস্তাকুল আশ্র-ভাবা। চলে না চরণ,
 বসিলা কানন-প্রান্তে অবসন্ন মনে ।
 কৃষ্ণ নবমীর চক্রে উঠিতে লাগিল
 হাসাইয়া বহুকরা, ধীবে, ধীবে, ধীবে ।
 গাহিয়া উদযমান সুধাকর পানে
 কহিতে লাগিলা কর্ণ—“এইরূপে হায়া
 আমার জীবন বাজো ধীবে, ধীবে, ধীবে
 হইতেছে সঞ্চাৰিত আলোক উজ্জল ।
 বুকিলাম এতদিনে সূত-নন্দনের
 কেন এই ভুঞ্জে বল ; কেন হৃদয়েতে
 বাজ্য আশা ; এ দ্বিগীবা পিপাসা দারুণ
 এ দারুণ অভিমান, কোন আকর্ষণে
 চসিয়াছে এতদিন যজ্ঞের মণ্ডন

হুঁসার ক্রুর করে । হায়, আমি তবে
 কুন্তীর কানীন পুত্র, পুত্র হুঁসার !
 যার মন্ত্রণায় কুন্তী, কুন্তীপুত্রগণ,
 ভুঞ্জিছে দুর্গতি এত, কুন্তীর তনয়
 সেই পাপী, সহোদর পঞ্চ পাণ্ডবের !
 ক্ষত্রিয় সে ! অসম্ভব । না না এত নীচ
 নহে বক্তৃক্ষত্রিয়ের ! কুন্তী পুণ্যবতী ;
 তাঁর গর্ভে এ পাপীর জন্ম অসম্ভব !
 সুরভির গর্ভে নাহি জনমে শার্দূল
 বিনাশিতে জননীকে সহ বৎসকুল ;
 সিংহিনীর গর্ভে নাহি জনমে শৃগাল ।
 ক্ষত্রিয় যে বীর, ব্যাধ নহে কদাচন !
 বীরত্ব,—ক্রুরত্ব নহে,—ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ।
 ক্ষত্রিয়ের শর ছোটে সরল রেখায়
 দিগালোকে, অক্লকারে ব্যাধ পাতে জাল ।
 হৃদের নন্দন আমি, পিতা অধিরথ,
 মাতা রাধা । না, হুঁসার নহে মিথ্যাবাদী,
 কুন্তীর তনয় আমি । কিন্তু যে জননী
 নিক্ষেপিল জলে সদ্যঃপ্রহৃত সন্তান,
 মাতা নহে, রাক্ষসী সে । তার পুত্রগণ
 পিতৃ শত্রু, শত্রু মম, নহে সহোদর ।
 অবশ্য করিব বণ ।

উঠিয়া সবেগে

আক্ষালিয়া হই ভুজু কহিলা গর্জিয়া—

“অবশ্য করিব বণ । আইস অর্জুন ।

আমি অভিমন্যু !—কিন্তু অস্ত্র পড়ে না যে মনে ।

গ্রাসিছেন রথ-চক্র মাতা বহুবল
 এ পাপীর । ধনঞ্জয় ! ছাড় তীক্ষ্ণর
 ক্ষিপ্ত করে বজ্রনাদে ! নাহি জান তুমি
 তব সহোদর কর্ণ । হায় ! পিতঃ ! তুমি
 আজি হ'তে অন্তহীন করিলে কর্ণেবে,
 হরিলে বাহুর বল, রাজ্যের পিপাসা !
 তথাপি তোমার আজ্ঞা করিব পালন ।
 কাটিলেন অস্ত্রগুরু জননীর শির
 পিতার আদেশে ; আমি পিতার আজ্ঞায়
 কাটিবনা কেন হেন রাক্ষসী মাতার
 পুত্রদের শির তবে ?—যে পিতা আমার
 পালিল বর্জিত সন্তঃশ্রুত কুমার,
 দিল জ্ঞান, অস্ত্র শিক্ষা, যাহার ক্রপায়
 কর্ণ আজি কর্ণ, কর্ণ অঙ্গ-অধিপতি ?
 এই চলিলাম মাতঃ ! নিক্ষেপিলে জলে
 যেই পুত্র, পুত্রহীন করিয়া তোমাঘ
 ভাসাইবে অকুল মা শোকের সাগরে ।
 মুদ অঁধি চন্দ্রদেব ! তব বংশধর
 চলিল নির্মূল বংশ করিতে তোমার !”
 ছুটিলেন বৈকর্তন । হাসি উচ্চ হাসি,
 বৃক্ষ অন্তবাল হ'তে হইয়া বাহির
 কহিতে লাগিল কারু —“সহোদর মম
 সরল শিশুর মত, ক্রান্ত পথশ্রমে
 নিজা বাইতেছে স্নেহে আপন কুটীরে ।
 কিন্তু আমি পোড়ামুখী শুনিব যখন
 হইবে মরণা গুপ্ত কর্ণের সহিত

কুরাংগেএ ।

মহীষির, পোড়া চক্ষে আসিল না ঘুম ।
কিন্তু আমি জাগ্রত কি ? জাগিয়া মানুষ
এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কি কখন ?
আমি কে ? কারু কি ? ধর্মপত্নী হুর্কাসার ?
না কি স্বপ্ন রাজ্যে আমি কারুরূপী কেহ ?
এ হাত ? কারুর বটে । কদম্ব দারিদ্ৰ ?
কারুর । এ ক্ষীণ কটি ? তাহাও কারুর ।
শ্রোণী ভারে আর এই অঙ্গস গমন ?
কারু সুন্দরীর তাও । সর্বশেষ এই
মার্জিত শাণিত বুদ্ধি ? মনসা বিহনে,
হুর্কাসার প্রাণেশ্বরী সম্ভবে কাহার ?
কর্ণ হুর্কাসার পুত্র, স্বপ্ন নহে তবে ।
পুত্র নহে মন্ত্র-পুত্র ! ভোজ নৃপতির
নাহি ছিল মৃত্যু আর, কুমারী কল্যাণ
করেছিল নিয়োজিত হুর্কাসা সেবাঘ ।
সেবাঘ হইয়া তুষ্ট মহর্ষি গোপনে
দিল মন্ত্র ব্যভিচার, না না, অভিচার ।
কুমারী টানিল স্বর্ঘ্য, নামিল ভাস্কর
ছাড়ি আকাশের কাজ, জন্মিল কুমার !
গিলে কি হে আৰ্য্যজাতি এই ভস্ম ছাই
অকপটে ? হরি ! হরি ! এ কি ব্যভিচার ?
কি করিবে কৃপাপাত্রী কুন্তী অভাগিনী ?
শিষ্য পিতা ; হুর্কাসাও ঋষি ধুরন্ধর,
অভিশাপে ভরা পেট, ক্রোধে গড় গড় !
পাইতাম আমি যদি মন্ত্র অভিচার,
না টানি পিতাঘ অগ্নি-পিণ্ড ভয়ঙ্কর

নবানন্দ্রের অহাংলা ।

হস্ত, পদ হীন, টানি তনয়ে তাহার
চাপিতাম মহর্ষির মস্তক উপর ।
তার পরে এতদূর নাহি গিয়া আর,
এই কুরুক্ষেত্র হ'তে আনিতাম টানি
আনার হৃদয় চোরে, এই জ্যোৎস্নায়
হইত কি অভিসার—না না,—অভিচার !
কিবা ঘোর ষড়যন্ত্র ! অসাধ্য ঈহার
নাহি বুঝি কোন পাপ অবনীয়গুণে ?
কিন্তু ব্যাধ পড়িয়াছে আপনার জালে ।
দুরাবে কর্ণের লীলা হুই দিনে আর ,
নিজা বাণ্ড নাগরাজ ! সাত্ত্বাজ্যে তোমার ।

একাদশ সর্গ ।

—:~:—

মুগ-শিশু ।

—:~:—

স্ববন্ধিম শশধর কৃষ্ণা নবমীর

কুটিতেছে ধীরে ধীরে দূর-বনরাজি শিবে,

ধীরকের অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্রি ধরাভল

উজ্জলরক্ততালোকে তরল নীতল ।

চাহি সে কুটস্থ শশী, শিবির গবাক্ষে বসি

উত্তরা ও অভিমুখ্য ; গাইছে উত্তরা,

বাজে কুমারের কবে বীণা সপ্তমরা ।

রহিয়া রহিয়া স্থখে প্রেম-উজ্জ্বলিত বৃকে
 গাইতেছে অভিমত্যা, সুধা বরষিয়া
 জ্যোছনায় তিন বীণা উঠিছে ভাসিয়া ।
 সুস্বর-ত্রিবেণীধারা উদারা, যুদারা, তারা
 খেলিয়া আশ-পথে উঠিছে কখন,
 তারায় তারায় করি সুধা বিকিরণ ।
 কভু নামি ধরাত, হিরণ্য-নীলজলে,
 হিল্লোল কোমল মৃগ্য করিছে চুষন,
 কহি প্রকৃতির কাণে প্রীতির স্বপন ।
 প্রীতির স্বপন মত শুনিতেছে নিজাগত
 কুরুক্ষেত্র সে সঙ্গীত ; নরকে হিংসার
 প্রীতির ত্রিদিব যেন হতেছে সঞ্চার ।
 উঠিলেন শশধর ; ধীরে সঙ্গীতের স্বর
 জ্যোৎস্নার সহ যেন গেল মিশাইয়া,—
 আত্ম-হারা দুইজন রহিয়া চাহিয়া ।
 অভি । দেখ লো ঈত্তরে ! চাহি, বহুকরা অবগাহি
 জ্যোছনায় উঠিছেন দেব শশধর,
 পাপীর হৃদয়ে যেন পবিত্র ঈশ্বর ।
 এ সৌন্দর্য্য মনোহর, এ কবির মুগ্ধকর,
 পারে লো বর্ণিতে বর্ণে কোন চিত্রকরে ?
 পারে কোন কবি বল চিত্রিতে অঙ্করে ?
 ঈত্তরা । পারে আনি একজন ।

“কে উত্তরে ?”—অজ্ঞমন

জিজ্ঞাসি অভিমত্যা : অবরে তখন

আদরে বিদ্যা-শালা কবিল চুষন ।

“আমি !” যুবা কহে হাসি “তবে যে বে অগ্নিগাশি

করিস্ ব্যবস্থা মম চিত্র, কবিতার ?”

উত্তর। তারা কেন প্রতিযোগী হইবে আমার ?

নিম্নে চিত্র কবিতায় থাক সদা, উত্তরায়

দিব্বে থাক সে কালের কতটুকু ভাগ ?

তাহাতে কি মানুষের নারী হয় রাগ ?

অভি। না উত্তরে। তাহা নয়, মম চিত্র কাব্য চয়

তব অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্যই কেবল।

কুতূহলের প্রাণমিকে ! ধরু সই মঙ্গল !

উত্তর। কেন ? নিজে নারায়ণ প্রশংসা ত সর্বক্ষণ

করেন চিত্রের তব, তব কবিতার ।

অভি। তেমন করেন নাকি চিত্রের তোমার ?

উত্তর। লুকাইয়া একখানি এঁকেছিহু ছবি আমি,

দাইয়া পোড়ারমুখী দেখি অকস্মাৎ

লইয়া ছুটিল, আমি ছুটিহু পশ্চাৎ ।

বলে—“ভদ্রা দেখ ! দেখ ! আনিয়াছি ছবি এক,

শাওড়ীর চুবি বিত্তা শিখিয়াছে বউ ।

ওমা ! এ ছুঁড়ীর পেটে এত বিত্তা, হাঁ ?”

মা বাবা হাসিয়া কত প্রশংসা করিল শত ;—

মাথের অঞ্চলে আমি লুকায়ে লজ্জায় ।

কহিলেন মাতা যেন, গলিয়া মায়ায়,—

“কহিবি অভিরে, দিদি ! আমার অঞ্চল-নিধি

রাখে ঘেন তার পার্শ্বে অঁাকি এই পটে ।”

তখন সে পোড়ারমুখী কহে হাসি,—“বটে ?”

আমি তবে দিব অঁাকি, অভির এ অঙ্ক ঢাকি,

কুতূহলম অভি, মম অঞ্চলের ধন,

ছুটার চক্রেব কোলে নক্ষত্র বতন ।”

কহে বারা উচ্চ হাসি— “আমি ভবে দিব আসি

একটি উত্তরা ক্ষুদ্র আঁকি পাশে তার ।”

শ্রুণী কহে—“বরকথা তোমার আমার ?”

মা কহিলা হাসি—“তবে দ্বিতীয় গোগৃহ হবে

বুঝিতে তোমার পুনঃ, মনের মতন

যোগাইতে পুতুলের বসন ভূষণ !”

শ্রুণীমার মুখে ছাই, হাসি কহে—“তাই, তাই,

শ্রলোচনা হবে তবে সৈরিন্ধী আবার

বিরাট,—কীটক, ভীম,—অটিকা আমার ।”

চাহি ফুল চন্দ্র পানে নীরব উভয় ।

হইতেছে চন্দ্রে ধেন সেই অভিনয় ।

সেই জ্যোৎস্নার উৎসে জনক জননী,

পিতা নীলশ্রব, মাতা জ্যোৎস্না বরণী—

দেখিছেন ছবি বসি আনন্দে অধীর,

দাঁড়াইয়া শ্রলোচনা বদন গম্ভীর ।

চাহি সেই দৃশ্য পানে অখি ছল ছল,

লজ্জায় কুঞ্চিত নেত্র, ভক্তিতে সজল ।

অভি । ভাগ্যবীন ভাগ্যবতী আমাদের মত

আছে কি জগতে আর ?

না জানি, উত্তরে ! আহা ! অন্য জন্মান্তর

করিয়াছি কত পুণ্য, অক্ষয় অতুল,

ভদ্রার্জুন মাতা পিতা, গোবিন্দ মাতুল ।

উত্তরা । এই পোড়া যুদ্ধ নাথ ! কত দিনে আর

কুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার ?

ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,

যাই কোন মনোহর অবগোতে চলি ।

মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,

কাদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে ।

নিশ্চাইয়া তথা পুষ্প-কুটার স্তম্ভর

জনক জননী পদ সেবি নিরন্তর ।

কানন কপোত, বন কপোতিনী মত,

মুখে মুখে, বৃকে বৃকে, থাকি অবিরত ।

অভি ।

স্বামীয়া হবে না সঙ্গে ?

উত্তর ।

নিবীনা তাহায়,

পোড়ামুখী নিত্য গালি দেয় বাপ মায় ।

না নিলেও অভাগী যে যাইবে মরিয়া

না পারে থাকিতে এক তিল না দেখিয়া ।

মুহূর্তেক যদি আমি থাকি লুকাইয়া,

বৎসহারা গাভী মত মরে গরজিয়া ।

আমিও যে পারিব না, কি যে সৰ্ব্বনাশী,

এত দেয় গালি তবু কত ভাল বাসি !

স্বামীয়াও যাবে সঙ্গে ; তা হইলে আর,

রহিবে না কোনো হুঃখ তব উত্তরার ।

কিন্তু——

অভি ।

কিন্তু কি লো ?

উত্তর ।

কিন্তু, পুত্রত আমার

হবে রাজা ?

উচ্চ হাসি হাসিলা কুমা—

উত্তর ।

পুতুল লইয়া খেলা করিতাম যবে

পিঞ্জালয়ে, প্রাণনাথ ! নাহি বুঝি ভবে

এমন সুখের দিন ।

সখীদের পুত্রগণ মন্ত্রী কর্মচারী ।

হইত আমার পুত্র রাজা ছত্রধারী ।
 সে উত্তর গোগৃহের ভূষণে নিশ্চিত
 পুত্র পুত্রবধূ মম আছে সুরক্ষিত ।
 বাবা মা বড়ই ভাল বাসেন ছাটরে ;
 হাসিয়া কহেন হরি—“নাতি নাতিনীরে
 —কৌরবের ভূষণেতে নিশ্চিত, ভূষিত,—
 কৌরবের সিংহাসনে করিব স্থাপিত ।”

অপূৰ্ণ পুংল ছটি কুরু সিংহাসনে,
 যার তার এই মহা কুরুক্ষেত্রে প্রাণ ।—
 উচ্চ-হাসি অভিমত্যা হাসিলা এবার ।
 উত্তরাও উচ্চ-হাসি হাসিল এবার ।

অভি । কি সূতের ছবি আঁহা ! আঁকিলি, উত্তরে
 সেই বনবাসে ।

যায় তিন বর্ষ প্রায় এক দিন মুগয়ায়
 গিয়াছি মলয়াচলে কৈশোর উল্লাসে ।
 উল্লাসে উন্নত প্রাণ ; কি বিছাত খরশাণ
 বহে মুগয়ায় প্রিয়ে শরায় শিরায়,
 ছাড়াইয়া রক্ষিগণে, পশিহু নিবিড় বনে,
 অনুসারি মহা ব্যাঘ্র ভীম চিত্রকায় ।
 করি ঘোর গরজন কাপাইয়া সর্ব বন,
 কানন-আতঙ্ক ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন ;
 দেখিহু মন্তকোপরি প্রচণ্ড তপন ।
 ক্রান্ত প্রাণ পিপাসায়, হারায়েছি পথ তায়,
 দেখিহু তখন
 কি অপূৰ্ণ পুণ্যাশ্রম ! কিবা শান্তি-নিকেতন ।
 মরুভূমে চারু-মৃগ-ভূক্ষিকা স্বজন ।

কি সুন্দর সরোবর । কিবা বন যুগ্মমোহর !

চারি ধারে বনে কিবা কুটীর সুন্দর,—

লতা পুষ্পে সুসজ্জিত চিত্র মুগ্ধকর !

সে কুটীরে মুগ্ধকর মাতৃ-মূর্তি মনোহর,

জ্যোচ্ছনা-প্রদীপ্ত-নীল-আকাশ-নির্মিত,

কিবা স্নেহ, কিবা শান্তি, কি সুধা মণ্ডিত !

পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত, বেদি বক্ষে সুস্থাপিত

পিতার মৃণ্ময়-মূর্তি, সূচ্যাক্ষ-নির্মাণ,

মনোহর মৃগয়ার বেশে শোভমান ।

পুলকে ভরিল বুক,— গাইতেছে সারীশুক

জনকের দশনাম বিহঙ্গ নিচয়

স্থানে স্থানে পিঞ্জরায়, বন বিহঙ্গেরা গায়-

বক্ষে বক্ষে গুন সেই নাম পুণ্যালয় ;

নামের সঙ্গীতে বন প্রতিধ্বনিময় !

মুক্তকেশী উদাসিনী জননী বন-বাসিনী

সেই দশনাম প্রিয়ে । গাইলে আদরে,

শশক, ময়ূর, মৃগ, কুকুট স্বস্বরে

প্রাবিত করিয়া বন, কলকণ্ঠে হংসগণ,

আসি পালে পালে সেই বন মাতা পাশে,

নাচিতে লাগিল কিবা কানন উল্লাসে !

আনন্দে ভরিল প্রাণ, ছুটিয়া করি প্রণাম

জননীর পদাধুজে, কহিল—“যাহার

এ অপূর্ব পূজা, আমি কুমার তাঁহার ।

কে তুমি মা ? কহ. বড় কুতূহল মনে ।

কেন পূজ জনকেরে এ নিবিড় বনে ?”

কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে :

কি মধুর স্নেহ-স্রোত উঁহলিল বৃকে ।
 কি মধুর স্নেহ-স্বরে কহিলা—“বাছারে !
 বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমাতে ।
 সেই স্নহদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
 সেই স্নহদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব !
 অৰ্জুনের শ্রবণ, দেবীত ভদ্রার,
 তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর ?
 ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
 তাঁহাদের ‘পুত্র’ বিনা কে পাইবে আর ?
 পার্থ উপাসিকা আমি কেন পূজি তারে ?—
 কেন পূজে বংশ ! নর ওই সবিতারে ?
 ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, বীৰ্য্য—কে না পূজে বল ?
 করে দেবত্বের পূজা কি স্বর্গ ভূতল ।
 জগতে দেবত্ব ধর্ম্ম-ভক্তি-প্রস্রবণ ;
 হিমাচলে সিদ্ধ গঙ্গা লভেন জনম ।
 মম ভক্তি-হিমাচল জনক তোমার ।
 সেই ভক্তিবলে,
 পাইল তোমাধ আজি এই বনস্থলে ।
 এস বংশ ! এস বৃকে । তপস্তা আমার
 হইল সফল বৃক্ষি” ;—

সরিল না আর
 জননীর মুখে, লইয়া আমায় বৃকে,

চুখিলা যা কতই চুম্বন !
 কতই আনন্দ-অশ্রু করিলা বর্ষণ ।
 কোন রুদ্ধ প্রস্রবণ হ’য়ে অব্যাহত,
 আমায় করিল যেন স্নেহেতে প্লাবিত ।

কি সুখে কাটিল দিন, সন্ধ্যা আগমনে
 কাকলি কল্লোল কিবা উঠিল কাননে ।
 সেই কাকলির সনে কণ্ঠ মিলাইয়া
 বনপুল্ল পুত্রীগণ গাইয়া গাইয়া
 আসিতে লাগিল ; বন হইল পূরিত
 হাথারবে শঙ্খনিভ, বাঁশীর সহিত ।
 আসি দ্বারে জননীর গাভী 'পুণ্যবতী'
 "মা মা" বলি ডাকি, চাহি জননীর প্রতি
 স্নেহে নয়নে স্থির, সন্ধ্যার আঁধারে
 খেত কাদম্বিনী ঘেন শোভিল ছুয়ারে ।
 "মা মা" বলি স্নেহে মাতা করিলে দোহন
 করিল কি খেতামৃত অজস্র বর্ষণ !
 নেচে নেচে বন পুল্ল, বন বালাগণ,
 কত খাণ্ড জননীকে করিল অর্পণ ।
 তাহাদের "মা মা" কণ্ঠ, স্নেহ সন্তাবণ ;
 জননীর স্নেহভাষা, আদর, চুষন ;
 কেহ করে, কেহ কক্ষে, কেহ বা অঞ্চলে
 পরিয়া মায়ের, কেহ জড়াইয়া গলে,
 কেহ জড়াইয়া বাহ, কেহ জামু আর,
 কহিতেছে গোচারণ কত সমাচার ।
 বনপুষ্প সম বনপুল্ল কন্তাগণ ;
 পুষ্পিতা বল্লরী মাতৃ শোভা নিকরম
 জননীর ; সেই বন-স্নেহের কানন ;—
 কি বর্গ খুলিল শিশু-হৃদয়ে প্রথম !
 কহিল জননী তবে—"দেখ বাছাগণ !
 আসিয়াছে মম রাজ-পুল্ল একজন ।"

থামিল সে কোলাহল, বিশ্বয়ে সকল
 চাহিল আমার পানে, নেত্র অচঞ্চল ।
 চাহিয়া চাহিয়া মম বসন ভূষণ
 কহিল সঙ্কোচে—“মা গো ! বনপুত্রসনে
 খেলিবে কি রাজপুত্র, যাবে গোচারণে ?”
 মাতা মাতুলের সেই শিক্ষা প্রীতিময়
 তখন আমার মনে-হইল উদয় ;—
 “সকল পুরুষ পিতা, রমণী জননী,
 সকলের পুত্র কন্তা ভ্রাতা ও ভগিনী ।
 দেখিব সকল জীব আপনার মত,
 পরহিত প্রাণপণে সাধিব সতত ।”
 “খেলিব, যাইব”—আমি কহিমু উল্লাসে ।
 পুরিল প্রাঙ্গণ কিবা আনন্দ-উজ্জ্বলে ।
 আকাশে উঠিল চন্দ্র, চারু জ্যোৎস্নায়
 খেলিলাম কত খেলা আলোক ছায়ায় ।
 খাইলাম কত কিছু মিলি সবে সুখে,
 পড়িলাম ঘুমাইয়া জননীর বুকে !
 প্রভাতে বালকগণ খুঁজিয়া কানন,
 আনিল সঙ্গীর তব ! সজল নয়ন
 বিদায় দিলেন মাতা । সজল নয়ন
 গলা জড়াইয়া সেই ভ্রাতা ভগ্নী গণ
 কহিল—“আবার ভাই আসিবে কি বনে ?
 আমরা তোমাকে ছাড়ি থাকিব কেমনে ?
 সাজাইয়া বন ফুলে, পল্লব-মালায়
 আমাদের রাজা ভাই ! করিব তোমায়া ।”
 কাঁদিয়া কহিলা মাতা—“বন-জননীয়ে

পড়িবে কি মনে বাছা ! আসিবি কি ফিরে ?”

বড় কাঁদিলাম স্নেহ-বুকে জননীর ,

কাঁদিলাম গলা ধরি ভাই ভগিনীর ।

পথে পথে কত ফল, তুলি কত ফুল,

দিল তারা ! সে যে স্নেহ জগতে অতুল ।

জিজ্ঞাসে বিরাট-বালা সজ্জনঘননা—

“বন-বাসিনীর সেই চাকু উপাসনা

জানেন কি পিতা মাতা ?” সজ্জনঘনে

উত্তরিলা অভিমত—“নাহি লয় মনে ।

বিদায়ের কালে কোলে লইয়া আমারে

স্নেহ শোকোচ্ছ্বাসে মাতা কহিলা—‘বাছা বে

জনক জননী-কাছে বন-বাসিনীর

কহিও না কোন কথা ; এই তাপসীর

কহিলে তপস্তাব্রত হইবে বিফল ।

যথাকালে তাঁহাদের চরণ কমল

দেখিয়া সে চরিতার্থ করিবে জীবন,

তদবধি এ তপস্তা রহিবে গোপন ।

ক্ষুদ্র সূর্য্যমুখী কোথা পূজে সধিতারে,

কি কাজ জানিয়া তাঁর, জানাইয়া তাঁরে ।”

উত্তরা । গিয়াছিলে সেই বনে আর কি কখন

কি পবিত্র, কি সুন্দর, স্থান সেই বন

অভি । অধ্যয়ন অবসরে, অবসর মন,

কতবার সেই বনে করেছি গমন ।

সেই ক্ষুদ্র স্নেহ-স্বর্গে বনমাতারূকে,

কাটায়েছি কত দিন, কত নিশি, স্নেহে ।

সকল সঙ্গিনীর সঙ্গে কত দিবানিশি যঙ্গে

কাটাইয়েছি সেই বনে ক্রীড়া মৃগয়াব !
 কত গীত, কত নৃত্য, কানন ছায়ায়
 কত বন-সরোবরে, নীল সুধাময়,
 দিতাম সাঁতার ; কত নীল কুবলয়,
 —বন-বাগকের বন-বাগিকা বদন,—
 ভাসিত সে নীল জলে ; হংস হংসীগণ
 সাঁতারিত, উচ্চ হাসি ছিন্ন গীত তানে
 মিশাইয়া কলবর্ষ উল্লসিত প্রাণে ।
 হংসিনীর মৃত, ক্ষুদ্র তরুণী সকল
 সাজাইয়া পত্রে পুষ্পে, পতাকা উজ্জল
 উড়াইয়া, পত্রে পুষ্পে সাজিয়া আমরা,
 করিতাম জলক্রীড়া । তবী মনোহরা
 সঙ্গীতের তালে তালে নাচিত হিল্লোলে,
 নাচিত মরালগণ গাইয়া কল্লোলে ।
 সাজাইত পত্রে পুষ্পে আমাকে কখন
 বনরাজা ; চারু বনমালা এক জন
 সাজাইত বনরাণী ; পারিষদ চয়
 সাজি সবে করাইত রাজ্য অভিনয় ।
 পুষ্পবেদিকায়, কিবা পুষ্পিতা শাখায়,
 সিংহাসনে দেখি রাজারাণী পুষ্পকায়,
 কত হাসিতেন মাতা, চুষিতেন কত !
 কহিতেন—“বউ ত হয়েছে মনোমত ?”
 সত্য, ভাবিতাম আমি সে আমার রাণী ;
 সত্য সে ভাবিত মনে আমি তার স্বামী ।
 লইয়া ছটীকে মাতা কতই কোতুক
 করিতেন, হাসিতেন, চুষিতেন মুখ ।

“সতিনী ! সতিনী !”—বলি উদ্বিগ্ন হাসিয়া
উত্তরা—“আমার সেই পুতুলের বিষয়া !
থাক এই পোড়া যুদ্ধ, রাজ্যের পিপাসা !
প্রাণনাথ ! উত্তরার পূরাও এ আশা,—
চল সেই বনে নাথ ! চল একবার
সেই মত বনরাণী সাজিব তোমার ।
বসি সে মায়ের কোলে আনন্দে বিহ্বল,
সেই সতিনীর সঙ্গে করিব কোন্মল ।”

অভি । আমাৰো এ সাধ প্রিয়ে ! লুইয়া তোমাৰ
বণাস্তে যাইব সেই বনে হুজনায়ে ।
কি আনন্দ-অশ্রু মাতা করিবে বর্ষণ !
কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে কানন !
বড় সাধ মনে প্রিয়ে ! বণাস্তে সে বনে
সুন্দর আশ্রম এক সৃজিব হুজনে ।
দেখিয়াছি সিদ্ধতীরোশৈল মনোহর ;
নির্মলাইব সেই শৈলে আবাস সুন্দর ।
অৰ্দ্ধচন্দ্র, অষ্ট কোণ, চতুষ্কোণ আর,
শোভিবে অলিন্দ চারু চারি ধারে তার ।
শোভিবে অলিন্দে পুষ্প গুল্ম ধরে থর,
চারুপত্র গুল্ম সহ মিশিরা সুন্দর ।
স্বরঞ্জিত স্তম্ভ সারি বেষ্টি সুবিমল
শোভিবে পুষ্পিতা চারু লতিকা সকল ।
বিচিত্র বিহঙ্গগণ স্তম্ভ অবসরে
নাচিবে গাইবে স্তম্ভে সূচিত্র পিঞ্জরে ।
কুটীরের চারিদিকে চারি পুষ্পোদ্ভান
চম্রি ভিন্ন অবয়বে হবে শোভমান ।

শোভিবে উদ্যান-বক্ষ শ্রামল-প্রাঙ্গণ
 কারুকার্য-অলঙ্কৃত গালিচা যেমন ।
 প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে চম্পক, বকুল,
 সুবাসিত পুষ্প বৃক্ষ শোভিবে অতুল ।
 শোভিবে পর্বত পার্শ্বে, মূলে, মনোহর
 ফলিত, পুষ্পিত, ক্ষুদ্র কানন সুন্দর ।
 বনে নিঝরিণী এক গাবে অবিরত
 নিরঞ্জে, অস্ত্রপুণ্ড্রে উত্তরার মত !
 বেষ্টি গিরিমূল এক তড়াগে নিখিল
 তালিবৎ নিঝরিণী সুধা স্নানীতল,
 অভিমুখ-সদয়েতে ঢালে যেই মত
 উত্তরা শীতল প্রেম-অমৃত সতত ।
 নীলাম্বিতে ঢল ঢল সেই সরোবরে
 সুবর্ণ বজ্রত মীন সুখে ববিকরে
 খেলিবৎ শত শত ; ভাসিবে সতত
 মত্তরে মরাল-বধু, উত্তরার মত,
 স্বনাথ মরাল সহ । নানা জলচর
 নানা বর্ণ জলক্রীড়া করিবে সুন্দর ।
 কুরঙ্গ শশক শিখী প্রসারি পেশম
 বেড়াবে প্রাঙ্গণে, বনে ; কুহু কুহু
 উঠিবে পঞ্চমে কিবা রহিয়া রহিয়া !
 ক্রীড়াশীলা কুরঙ্গিনী ঘাইবে ছুটিয়া,
 বিলোল কটাক্ষময়ী, বিহাং আকার,
 ছুটে যথা ক্রীড়াশীলা উত্তরা আমার ।
 বনে বাথালের বাশী, কণ্ঠ সুপঞ্চম,
 করিবে সে নিরঞ্জে কি সুধা বর্ষণ ।

ডাকিবেক গাভীগণ রহিয়া রহিয়া,
গভীর সে কক্ষুর্থে কানন ভরিয়া ।
কুটীরের কক্ষচয় রবে স্নসজ্জিত,
মনোহর নানা উপকরণে খচিত ।
শোভিবে শয়ন-কক্ষে গোলাপী প্রাচীরে
উত্তরার নানা চিত্র । কোথা মানিনীরে
সাধিতেছে অভিমত্যা ; কোথায় ছুটিয়া
ধাইতেছে ক্রীড়াশীলা ঝলকে হাসিয়া,—
উড়িতেছে মুক্ত কেশ তরঙ্গ-খেলিয়া ;
কোথায় বিখ্যাত সেই পুতুলের বিয়া ।
কোথা বীণা করে বসি যেন বীণাপাণি,
কোথায় আমার বুকে রাখিয়া মুখানি,—
চন্দ্রের হৃদয়ে সুধা,—চাহি পরস্পরে
অনিমেব অবিশ্রান্ত অতৃপ্ত অন্তরে ।

বসিবার কক্ষে নীল আকাশপ্রতিম
প্রাচীরে শোভিবে চিত্র,—ভারত প্রাচীন
ইতিহাস অঙ্কে অঙ্কে রহিবে চিত্রিত,
আর্য্যদের শৌর্য্যবীৰ্য্য মহিমামণ্ডিত ।
কোথায় সরল সেই আর্য্য পিতৃগণ
রক্ষিছেন মেঘপাল ; করিছেন বণ
অনার্য্যের সহ ; কোথা বসি নদীতীরে
গাইছেন সামগান প্রভাতে গম্ভীরে ।
রামায়ণ অঙ্কে অঙ্কে রহিবে অঙ্কিত,
ধনুর্ভঙ্গ, বনযাত্রা করুণার গীত ।
বনবাস—পতি পত্নী প্রেম মনোহর ;
সে জীবন্ত ভ্রাতৃত্বভক্তি, চিত্তদ্রবকর ;

নরদেব পিতা মম, মামা নারায়ণ,
 প্রেমস্বরূপিনী মাতা পবিত্র বন্ধন
 উভয়ের ;—প্রেমে নর পায় নারায়ণ,
 নারায়ণ নর-দেহ করেন ধারণ ।
 বেদিমূলে এক পার্শ্বে মাতা স্থলোচনা ;
 অন্ত পার্শ্বে বনমাতা গৈরিক-বসনা ।
 অমল মার্জিত স্নেহ প্রাচীবে চিত্রিত
 হবে কৃষ্ণার্জুন লীলা, নরেন্দ্র অতীত ;
 সেই পূণ্য জন্মষ্টমী ; শিশু জ্যোতির্ষ্ময় ;
 প্রহরী নিদ্রিত, দ্বার-মুক্ত কারাগার ;
 যমুনা লজ্জন সেই নিশীথ সময়ে ;
 গোকূলে নন্দেব গৃহে শিশু বিনিময়,
 বৃন্দাবনে গোচারণে বীরত্ব অদ্বিত ;
 রাস বোল গোপবালা সহ গোপহৃত ;
 সভামধ্যে ত্বরাচার কংসের নিধন
 উগ্রসেনে মথুরার রাজত্ব বরণ ;
 সিন্ধুতীরে দ্বারাবতী ; মাতা সত্যভামা ;
 মাতা কল্মষীর সেই কুরু আরাধনা ;
 বানপ্রস্থে পিতামহ পবিত্র দর্শন ;
 পিতামহী মাদ্রীক সে চিতা আরোহণ ;
 হস্তিনায় সেই অশ্ব-পরীক্ষা স্থলদর ;
 মাতা দ্রৌপদীর সেই চাকু স্বয়ংবর ;
 একরথে যত্নকুল সহ সেই রণ,—
 জননীক সে বীরতা, অশ্ব-সঞ্চালন ;
 ষাণ্ডব দাহন, জরাসন্ধের নিধন
 করুণার দৃশ্য সেই কারা-বিমোচন ;

রাজহুয় যজ্ঞে শিশুপালের দলন ;
 দ্বাতে পাণ্ডবের ধর্ম-পরীক্ষা ভীষণ ;
 সেই বনযাত্রা ; শিকাগৃহ উত্তরার ;
 উত্তর গোগৃহে রণ, সেই উপহার ;
 সর্বশেষ এই মহাকুরুক্ষেত্ররণ,—
 কিবা শোভা এক রথে নর নারায়ণ !
 চাহি অন্তরের পানে মহিমামণ্ডিত
 দাড়াইয়া ছই বাছ করি প্রসারিত ,
 জগতের মহাধর্ম-গীতার প্রচার !
 সেই বিশ্বরূপ—মহাকাল অবতার !

পবিত্র ত্রিমূর্তি,—মাতা, পিতা, নারায়ণ—
 পূজিব, করিব পদে আশ্রয়-সমর্পণ ।
 তাঁহাদের পদমূলে, ভক্তি-পূর্ণ মন,
 করিব হৃদয়ে নিত্য গীতা অধ্যয়ন ।
 তাঁহাদের সুপবিত্র নাম স্তবাময়
 গাইবেক অবিরাম বিহীনচয়
 কুটীর করিয়া পূর্ণ ; নর-লীলা গীত
 গাইব আমিও ভক্তিকণ্ঠে পুলকিত ।
 সেই নাম-মন্ত্রে বন করিব দীক্ষিত,
 গাবে বনবাসী, বনপশু স্তলনিত
 শুনিবে সে নাম, তীর্থ হইবে কানন,
 নর জন্ম, পশু জন্ম হইবে মোচন ।
 কখন সাজিয়া যোগী, সাজিয়া যোগিনী
 বেড়াইব দেশে দেশে করি নাম ধ্বনি,
 গাইয়া সে লীলা গীত ; করিয়া প্রচার
 স্বাপনের ধর্ম—গীতা, কুরু,—অবতার ।

সাধুদের পরিজ্ঞান হৃদয়ত দমন
সাধিব, করিব ধর্ম সাত্বজ্য স্থাপন ।
কবির ভূতল স্বর্গ, নর দেবোপম,—
নারায়ণ । এ স্বপ্ন কি হইবে পূরণ ?

উত্তরা । আর সেই যোগী পিতা, যোগিনী মাতার
নিকটে আসিবে পুত্র নৃপতি ধরার,
চতুরঙ্গ দলে বলে, বউটী লইয়া,
হবে অভিনীত বনে পুতুলের বিয়া !
জড়ায়ে পতির গলা হাসে উচ্চ হাসি
বিরাট-নন্দিনী ; চুসি সেই হাসি রাশি
অভিমুখা উচ্চহাসি উঠিল হাসিয়া ;
জ্যোৎস্নায় দুই হাসি গেল মিশাইয়া ।

অভি । রবিকরে, জ্যোৎস্নায়, চাহি সিদ্ধ শোভা,
চাহি বন-প্রকৃতির শোভা মনলোভা,
গাঁথিব কবিতা-হার ; গাঁথিবে উত্তরা
কাছে বসি কুলমালা ; বীণা সপ্তস্বর
বাজাইবে, বীণা কণ্ঠে গাইবে কখন
পূরিয়া সুধায় সেই নির্জজন কানন ।
সঙ্গীত তরঙ্গে মুগ্ধ করনা আমার
স্বর্গে, মর্ত্যে, অন্ধে অন্ধে করিবে বিহার ।
বাসন্ত, শরদ, ফুল জ্যোৎস্না-মণ্ডিত
নীল বন-সরোবরে, তরী মনোহরা
ভাসাইয়া, নিরখিয়া জ্যোৎস্না-প্রাবিত
নীলাকাশ গাব আমি, পাইবে উত্তরা ।

উত্তরা । কি সুখের ছবি আঁহা । চল নাথ ! চল,
এই কল্পনার স্বপ্ন করিগে পূরণ ।

অভি । পুরাইব ; কিন্তু অগ্রে এই রণস্থল,
করিতে হইবে প্রিয়ে ! স্বধর্ম পালন ।

উত্তরা । স্বধর্ম !

অভি । স্বধর্ম ! প্রিয়ে ! এ সুখ স্বপন

ছি জীবনের মম আশা অতীতম ।

আজি সন্ধ্যাকালে বসি মায়ের চরণে

বুঝিয়াছি, দেখিয়াছি জ্ঞানের নয়নে,

অসার স্বপন নহে মানব-জীবন ।

মানব-জীবন কর্ম, স্বধর্ম পালন ।

ধর্ম-যুদ্ধ প্রিয়তমে ! স্বধর্ম আমার ।

এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার ।

কুরুক্ষেত্রে করি অগ্রে স্বধর্ম পালন,

করি ধর্মরাজ্য এই জগতে স্থাপন,

তবে পুরাইব শান্তি-স্বপ্ন আপনার,

নহে অগ্রে, পরে শান্তি যুদ্ধ বাটিকার ।

কালি হতে ধোরতর করিব সংগ্রাম,

অপি ধর্ম-রাজ্য ব্রতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ ।

উত্তরা । না, না, নাথ ! উত্তরার থাকিতে জীবন,

দিবে না তোমার যুদ্ধে করিতে গমন ।

যতক্ষণ থাক যুদ্ধে, প্রাণেশ আমার ।

জান না কি করে প্রাণ তব উত্তরার ।

স্বয়ং যত্ন করিছেন যবে,

কি কাজ তোমার বল গিয়া সে আহবে ?

বালক বালিকা নাথ । আমরা দুজন,

করিব তাঁদের সেবা,—স্বধর্ম পালন ।

অভি । উত্তরে । উত্তরে । ওই জনক আমার

করিয়াছেন কি ভীষণ যুদ্ধ অনিবার !
 কত অস্ত্রাঘাত, ভীম বজ্রাঘাত কত,
 সহিছেন অবিচল হিমাদ্রির মত ।
 তাঁহার তনয় আমি বমণী-অঞ্চল
 ধরিয়া রহিব এইরূপে অবিচল ?
 না, না, শ্রিষে ! কালি আমি প্রবেশিব বণ,
 দেখাইব অভিমত্যা অঙ্গুননন্দন
 বাঁচি যদি ধর্ম-রাজ্য করিয়া স্থাপন,
 সেই করনার স্বর্গে কাটিব জীবন ।
 মরি যদি, মহাযুদ্ধে তাজিয়া জীবন
 ওই চন্দ্রলোকে শ্রিষে ! করিব গমন ।
 অস্ত্রের অনন্ত সৃষ্টি ; গ্রহ তাবাগণ
 মনে হয় মানবের ভবিষ্য আশ্রম ।
 পুণ্য অমুসারে ওই গ্রহ তাবাগণ
 জন্ম জন্মান্তরে নর করে বিচরণ ।
 পুণ্যময় চন্দ্রলোকে ঘাইব আমরা,—
 পিতা, মাতা, পুত্র পুণ্য-জ্যোৎস্না উত্তরা
 নারায়ণ পদতলে বসিয়া সকলে,
 লভিব অনন্ত-শাস্তি অমরমণ্ডলে ।

বালিকার ক্ষুদ্র মুখ হইল গম্ভীর,
 পড়িল মেঘের ছায়া ঘেন জ্যোৎস্নায় ।
 চাহি চন্দ্র পানে, রাখি পতি-বুকে শির,
 রহিল নীরবে, নেত্র মুদিল নিদ্রায় ।
 চাহি চন্দ্রপানে অভিমত্যা কতক্ষণ
 রহিলা নীরবে বসি ; কতই ভাবনা
 হইল উদয় মনে, জাগিল তখন

প্রতিভা সিন্ধুর বক্ষে কতই কল্পনা ।
 নিদ্রিতা বালিকা স্বপ্নে করিয়া চীৎকার
 করিল,—“না নারায়ণ ! ছাড়ি উত্তরায়
 যাইও না তুমি, ক্ষুদ্র উত্তর। তোমার
 পারিবে না একা যেতে এত দূর হায় !”
 কুমারের দুই চক্ষু হইল সজল ।
 রহিল। চাহিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—
 জ্যোৎস্না প্লাবিত যেন সুদিত কমল !
 ধরি দুই করে পুষ্পনিভ দুই পাণি
 চুম্বি প্রেমভরে মুখ, রাখি উপধানে,
 জাহ্নু পাতি ভূমিতলে বসি ভক্তিভবে,
 চঞ্জিকা-শ্রীপু নীল আকাশের পানে
 চাহিয়া, করিল। কর-যোড়ে সকাতরে—
 “নারায়ণ ! এ স্বপ্ন কি তব মনস্কাম ?”
 দিও বালিকায় শাস্তি, পদাধুজে স্থান ।

দ্বাদশ সর্গ ।

—*—

সুখ তব !

—•—

কৃষ্ণ । গুরুদেব । বৃন্দাবনে, নিরঞ্জে গোচারণে,
 গুণিতাম কি স্বর্গ-সঙ্গীত ।
 কি যেন অপ্সরা-বর্গ গাইত আকাশে নিত্য
 মনপ্রাণ করিয়া মোহিত ।

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

গাইত—“অশান্তিপূর্ণ জগতের হাহাকার,

পশে না কি শ্রবণে তোমার ?

সাত্বাজ্যে, সমাজে, ধর্ম্মে, কোথাও না পাই শান্তি

জগত করিছে হাহাকার !

অস্তর-বিগ্রহ-বহি জলিতেছে রাঙ্কো রাঙ্কো,—

কিবা ঘাত, কিবা প্রতিঘাত !

অস্তর-বিগ্রহ-বহি জলিতেছে সমাজেতে,—

কি স্বার্থের ভীষণ সজ্জাত !

জলিয়, ব্রাহ্মণ, দুই বিহাৎ-অগ্নি পূর্ণ মেঘ

ছুটেছে কি বেগে খরতর

আঘাতিতে পরস্পরে, মত্ত আধিপত্য তরে,—

নিবারিতে বাড়া'বে না কর ?

ধর্ম্মেও মোহাক্ষ নর কামনার মরীচিকা

নিরস্তর করি অহুসার,

কি দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে নিরস্তর,—

কান্দে না কি হৃদয় তোমার ?

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম্ম ; যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম্ম ;

ধর্ম্ম ক্লম । সর্ব্বভূত-হিত ।

তাহার সাধন কর্ম্ম, নারায়ণে কর্ম্ম-ফল

ভক্তিভরে করি সমর্পিত ।

উত্তীর্ণ কিশোর তর, হও কর্ম্মে অগ্রসর,

জগত করিছে আবাহন

কাতর করুণ কণ্ঠে ; হও অগ্রসর, কর

জগতের দুঃখ বিমোচন !”

নীরবিলা বাহুদেব । নীরব শিবির ।

নীরবে মহর্ষি ব্যাস বসি অধোমুখে

চিন্তামগ্ন, চিত্তবৎ । নীরব নিশীথ ।
 নীরবে জলিছে ধীরে প্রবাস প্রদীপ ।
 নীরবে কেশব ধীরে আনত বদনে
 ভ্রমিছেন । শোভিতেছে পবিত্র গৈরিক
 পরিধানে, অংসোপরে উত্তরীয় মত ।
 নাহি অস্ত্র-চিহ্নমাত্র কৃষ্ণের শিবিরে ।
 শোভিতেছে একদিকে বসন ভূষণ
 সারথির, অতর্দিকে গ্রন্থ অগণন ।

কৃষ্ণ । অধ্যয়ন অস্ত্রশিক্ষণ অবসরে এইরূপে

তুনিতাম করুণ সঙ্গীত ।

কে গায়, কোথায় গায়, এইরূপে কিশোরের
 ক্ষুদ্রপ্রাণ করি আকুলিত ?

কে গায় ? কেমনে হায় ! করিবে রাখালশিশু
 জগতের দুঃখ বিমোচন ?

কেমনে পতঙ্গ ক্ষুদ্র বেদরূপী হিমাচল
 করিবেক করে উত্তোলন ?

বেদভারে প্রেপীড়িত, বজ্রধূমে মেঘাচ্ছন্ন,
 উজ্জ্বল-শোণিতে প্রাবিত,

• প্রদীপ্ত কামনানলে ভারতে করিবে হায় !

এই মহাধর্ম প্রচারিত ।

যে দিন মহর্ষি গর্গ সেই নিয়তির রেখা

অঁকিলেন অদৃষ্ট গগনে,*

সে দিন হইতে নিত্য এই নিয়তির গীত

তুনিলাম, ভাবিতাম মনে ।

কখনো বৈরাগ্য ঘোর ভাসিয়া উঠিত প্রাণে ;

ভাবিতাম ত্যজিয়ে সংসার

সন্ন্যাস গ্রহণ করি করিব নির্মাণ ছঃখ,

নব ধর্ম করিয়া প্রচার ।

কিন্তু দেখিলাম উদ্ভে, দেখিলাম চারিদিকে,

কি জগৎ অনন্ত বিস্তার"

স্থখ সৌন্দর্য্যেতে ভরা, কন্মের সঙ্গীতে পূর্ণ,

কি উচ্চ অচিন্ত্য লয় তার !

গগনেতে গ্রহ তারা, ধরতলে গিরি, গুহ,

তরু তৃণ নদী, পারাবার,

যেখানে সাহাব সৃষ্টি, সেইখানে কন্ম তার,

সেই কন্ম নিয়তি তাহার ।

কেবল মানব সৃষ্টি ভ্রম কি হে বিধাতার

জন্মক্ষেত্রে নাহি কন্ম তার ?

এ সংসার, এই গৃহ, পিতা, মাতা, পত্নী,

সকলি কি ভ্রম বিধাতার ?

হৃদয়ের উচ্চতম পবিত্র প্রবৃত্তিচয়

দূঢ় করে করিয়া ছেদন,

জন্মভূমি জন্মগৃহ ত্যজিয়া যাইব বনে,—

এই তব ইচ্ছা, নারায়ণ ?

পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, একটি মানব, হায় !

যদি ভাল নাহি বাসিলাম,

অনন্ত মানব জাতি কেমনে বাসিব ভাল,

অনন্ত অচিন্ত্য ভগবান

আপনার জন্মভূমি, জননীর স্নেহ কোড়,

রঙ্গভূমি কৈশোর ক্রীড়ার,

নাহি ভাল বাসি ; বিশ্ব কেমনে বাসিব ভাল,

অচিন্ত্য অতীত কল্পনার ?

ক্ষুদ্র নিৰ্বরিণী গর্ভে জনমিয়া ভাগীরথী

পায় তবে সাগর সঙ্গম ।

অক্ষুর হইতে ক্ষুদ্র জনমিয়া মহীকহ

করে তবে আচ্ছন্ন কানন ।

গৃহ ছাড়ি গেলে বনে, মনের কামনা শত

অনায়াসে হয় কি বিলাস ?

বিশাল কণ্টক শত্রু করিলে কি স্থানান্তর

হয় তাহা কণ্টকবিহীন ?

সংসারের প্রলোভন কামনা করে সজ্জন,

করিয়া ইন্দ্রিয় বিমোহিত ।

প্রবেশি নির্জল বনে ইন্দ্রিয় করিলে ধ্বংস,

কামাগ্নি কি হবে নির্দাপিত ?

অন্ধের কি দর্শনের, বধিরের শ্রবণের

নাহি থাকে কামনা প্রবল ?

চক্ষু হীন, কণ্ঠ হীন, হলে কি মানবজাতি

পরমার্থ লভিত কেবল ?

হরি । হরি । মানবের ধারণের,—ধরমের,—

এই পথ নহে কদাচিত ।

ধ্বংসের ও অধর্মের এই পথ ঘোরতর,—

দেখি প্রাণ হইল ব্যথিত ।

ইন্দ্রিয়, কামনা, ধ্বংস করি যদি, মানবের

মানবত্ব কিসে থাকে আর ?

পাদপের পাদপদ্ম থাকে কিসে, ফল পুষ্প,

শাখা, পত্র, করিলে সংহার ?

শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয় "

স্বথের ও শিক্ষার সোপান।

কামনা ইন্দ্রিয়-জাত মানবের স্বথ পথে

অদ্বিতীয় কর্মের নিদান।

অষ্টা কি কামনা-হীন ? চেয়ে দেখ মহাসৃষ্টি।

বিশ্ব-স্বথ কামনা তাঁহার "

ঘোষিতেছে মহাবিশ্ব, অনন্ত প্রাণিয়া বর্গে,—

এ কামনা অশ্রান্ত অপার !

এ কামনা-সিন্ধু গর্ভে, কামনা-জাহ্নবী নর

শত মুখে করিয়া বিলীন,

করি ক্ষুদ্র মানবের অতি ক্ষুদ্র আত্ম-স্বথ

জগতের স্বথের অধীন,

উন্মেষিয়া আত্মশক্তি-জগতের স্বথ পথে

যত নর হবে অগ্রসর,

আপন স্বথের তার সিন্ধুমুখী নদ মত

ক্রমশঃ বাড়িবে পরিসর।

কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,—

এক মাত্র ধর্ম সনাতন

মানবের গৃহে, বনে ; ধর্মক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর,—

বন নহে,—গৃহের প্রাঙ্গণ।

পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, গৃহ, এই ধর্ম-পথে

কিবা অবলম্বন স্মরণ !

তাহে ভর করি উঠি দেখে স্বথ-স্বর্গ নর,

নাবাচরণ স্বথের সাগর।

চলিলাম গৃহে, প্রভু ! মানবের ধর্ম-ক্ষেত্র

করি গৃহ অভ্যন্তরে বাস,

কামনা জগত-হিত, সাধনা জগত-হিত,

বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস ।

চলিলাম গৃহে, প্রভু ! গৃহ এই মহাবিশ্ব,

বিশ্ববাসী মহাপরিবার !

এক মহা প্রাণে অনুরূপিত অনন্ত বিশ্ব ;

* এক প্রাণ অনন্ত আধার ।

এক মহা পিপাসায় আকুল অনন্ত বিশ্ব ;

সুখ সেই পিপাসার ধন ।

কামনার পুষ্পেপুষ্পে মত্ত মধুকর মত

করে নর সুখ অন্বেষণ ।

জল-সিন্ধু সুখ যাহা, জল-বিন্দু সুখ তাহা,

নাহি সুখ দ্বিতীয় তাহার,—

এই মহা সুখ-ওষু না জানিয়া, হুঃখপূর্ণ

জগত করিছে হাহাকার ।

যে অনন্ত নীতিচক্রে মানুষের মনুষ্যত্ব

করিতেছে ধারণ, বর্জন,

তাহাই মানবধর্ম; তাহার শিক্ষক—শাস্ত্র,

কর্ম ধর্ম-শিক্ষা ও পালন ।

* এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনন্ত সিদ্ধু-মুখে !

সিদ্ধু—চিদানন্দ নারায়ণ ।

অনন্ত এ মনুষ্যত্ব, অনন্ত মানব সুখ,

মোক সেই সাগর-সঙ্গম ।

চলিলাম গৃহে প্রভু, এই মহা সুখ-ওষু,—

নব ধর্ম,—করিয়া প্রচার,

দেখাইয়া কুসুমধর্ম, ঘোর দুর্থাগর্ভ হ'তে

এ জগত করিতে উদ্ধার ।

কিন্তু কি হুহুহ ব্রত ! জানি নাহি কুরুক্ষেত্র
কর্ষক্ষেত্র হইবে আমার !

মানবের মুক্তিপথে এই দাবানল ঘোর !—

নারায়ণ কি লীলা তোমার !

ব্যাস ! বাহুদেব ! বজ্রঘাত, ঝটিকা ভীষণ,

মহাসংহারক মূর্তি ঘোর দাবানল,

প্রাবন ভীষণ, নিত্য করি দরশন

জগতের সাধিছে কি অচিন্ত্য মঙ্গল !

এই মহা বজ্রঘাত, ঝটিকা তুমুল,

করিবে ভারতাকাশ পবিত্র নির্মল ।

কু-বৃক্ষ কণ্টক বন দহিয়া আমূল,

উর্ধ্বর সুবৃক্ষ-ক্ষেত্র করিবে অনল ।

এ প্রাবনে প্রসারিয়া পবিত্র পগল,

সঞ্চারিবে নব শক্তি, নব ধর্ম বল ।

কৃষ্ণ । “মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত”—

মহর্ষির মহাবাক্য অব্যর্থ, অমর ।

মানব থগোত ক্ষুদ্র অনন্ত তিমিরে

অদৃষ্টের করে ক্রীড়া করে হাশ্বকর ।

কোথায় অনন্ত শাস্তি করিব স্থাপন,

কোথায় ঘটিল এই অনন্ত সময় ।

কোথায় হাসিবে শূন্তে শাস্তি সুধাকর,

কোথায় ঝটিকা এই বহে ভয়ঙ্কর !”

কোথায় করিব ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,!

কোথায় এ অধর্মের বিপ্রব ভীষণ !

দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার,।

কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে !

একাদশ দিন এই হত্যা, হাহাকাৰ,
সহিতেছি হায় । আমি অমান বদনে ।
আমি যেন অবিদীর্ণ আগ্নেয় ভূধর,—
সৌম্য মূৰ্ত্তি, বহি হৃদে কি গৈরিক ঝড় !

বাস । অনন্ত মঙ্গলময়, অনন্ত করুণালয়,
অনন্ত জ্ঞানের পারাবার,
বৎস ! যেই নারায়ণ, তাঁহার সৃষ্টিতে নিত্য
কত হত্যা, কত হাহাকাৰ !
তথাপি তাঁহার মুখ, কি প্রসন্ন প্রীতিময়,
কি অনন্ত প্রেমের দৰ্পণ ।
আপনি দেখিছ তুমি ; কে দেখিতে পায় আর
এ ভগতে তোমার মতন ?
ভবিষ্যত কণ্ঠ, প্লাবি বর্তমান হাহাকাৰ,
কবিতেন্ত্র আপনি শ্রবণ ;
দেখিতেছ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী পৃষ্ঠদেশে
কত অক্ষৌহিনী অগণন ।
গলদস্ত্র ছনয়ন কহিলেন নারায়ণ—
“দেখিতেছি সেই মুখ রূপায় তোমার ।
বসি অৰ্জুনের রথে কুরুক্ষেত্রে, গুরুদেব !
সেই মুখ বিনা কিছু নাহি দেখি আর ।
কিছু নাহি শুনি আর বিনা ভবিষ্যত-কণ্ঠ ;
অনন্ত নবের সেই গীত করুণার
কহিতেছে—‘দয়াময় ! দেখ ছঃখময় ধরা,
ধরায় এ ছঃখ-ভার কবিয়া মোচন
কর কৃষ্ণ ! আমাদের উদ্ধার সাধন ।
কি করুণ হাহাকাৰ !”—কাঁদিয়া কহিল হরি,

কাঁদিলেন নিজে বৈপায়ন,—

“জগতের এই হুঃখ !—বিদরের হৃদয়, নাথ

হইল না, হবে না মোচন ।”

ব্যাস । হতেছে, হইবে ; কৃষ্ণ আবির্ভূত ; দ্বাপর হতেছে শেষ ;

নব অবতার, নব যুগ ধর্ম, করিতেছে পরবেশ ।

সাধুদের জ্ঞান, হৃদয় দমন, অধর্ম হতেছে ক্ষয়,

এই কুরুক্ষেত্রে, ধর্মের সাম্রাজ্য, হইতেছে সমুদয় ।

এই নরমেধ করি সমাপন, সাম্রাজ্য করি স্থাপন,

অর্জুন-সারথ্য তাজিয়া জগৎ-সারথ্য কর গ্রহণ ।

কৃষ্ণ । হরি ! হরি ! কে জানিত ভীষ্ম দ্রোণ হায় !

হয়ে ঘোর অধর্মের সারথি এখন,

এইরূপ নরমেধ করি সংঘটন,

মানব-শোণিত-স্রোত ভাসাবে ধরায় ।

ভীষ্মের ভীষণ দশ দিবসের রণ,—

মৃত্যুর ভীষণ ক্রৌড়া,—করিলে অরণ

হৃদয় বিদরের শোকে ; আবার এখন

করিছেন জ্রোণাচার্য্য কি রণ ভীষণ !

রথী ধনঞ্জয়, আমি সারথি তাহার,—

ভেবেছিহু ছই দিনে এই বজ্রানল

নিবিবে, ভস্মিয়া মহা মহীকহচর

বিপক্ষের, রক্ষা পাবে ভৃগুশ্ল দল !

কিন্তু জানি নাহি হায় ! অর্জুন-হৃদয়ে

কি করুণা পারাবার ! বাড়বাগ্নি মৃত

যদিও ক্ষত্রিয় ধর্ম জলে নিরন্তর,

তথাপি পার্শ্বের কত করুণায় লুপ্ত ।

রূপে নবজলধর, বীরবেগে হায় !

নবজলধর পার্থ ! জীমূত-গর্জন

গাণ্ডীব-টঙ্কার, বজ্র সায়ক নিচয় ;
 করুণা-সলিলে সিক্ত শর, শরাসন ।
 নয়নে অনল, হৃদে জল স্নশীতল,
 বাহুতে অশেষ বল, হৃদয় হ্রস্বল ।
 যদি কোনো ঘটনার ভীষণ আঘাত
 নাহি করে এ হৃদয় কুলিশ কঠিন,
 এইরূপে দ্রোণাচার্য্য মৃত্যু-অভিনয়
 বিভীষণ, করিবেক আরো কত দিন !
 গুরুভক্ত ধনঞ্জয় করুণ-হৃদয়,
 করে গুরু সহ মাত্র রণ-অভিনয় ।

ব্যাস। প্রচণ্ড ঝটিকা, ক্রোধ ! প্রচণ্ড অনল,
 হয় আগু নির্ঝাপিত,—নীতি নিয়ন্তার ।
 এই মহা যুদ্ধানল,
 ভস্মিয়া অধর্ম্ম বল,
 নিবিবে অচিরে ; নব ধর্ম্ম-সুধাকর •
 উদিকে শীতল, শান্তি পাবে চরাচর

ক্রোধ । নাহি অত মেঘ ছায়া সম্মুখে কি আর ?

ব্যাস । আছে,—আছে মেঘমালা হর্ষাসাগ্রমুখ ।

এই দীর্ঘকাল আমি
 বেড়াইয়া স্থানে স্থানে
 দেখিয়াছি এই মেঘ হতেছে সঞ্চার
 ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে লভিছে বিস্তার ।
 উড়াইয়া ভৃগুচয়,
 বায়ু কোন দিকে বয়,
 চেয়েছি বৃষ্টিতে, আমি বুঝেছি নিশ্চয়
 এই শরভের মেঘ বহিবার নয় !

জগতের শীর্ষস্থল

ব্যাপি যেই হিমাচল—

অনন্ত গগনস্পর্শী—উঠিছে ভাসিয়া,

যে পুণ্য উত্তরানিল উঠিছে জাগিয়া,

পবিত্র নিশ্বাসে তার

সুশীতল পুণ্যাসার

তাপিত মানব প্রাণে করি বরিষণ,

নিবে উড়াইয়া মেঘ, রবে স্তম্ভকণ ?

কৃষ্ণ ।

নারায়ণ !

অর্জুন তোমার চক্রে, শঙ্খ দৈপায়ন ।

তব ধর্ম মন্দিরের

ধনজয় ভূজবলে

করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন ;

বিশ্বকর্মা দৈপায়ন

করিবেন জ্ঞান বলে

এই পরিখায় তব মন্দির সৃজন ।

মহর্ষির কঙ্ক কণ্ঠ

প্রাণিয়া অনন্ত কাল,

অনন্ত মানব যাত্রী করি আবাহন

ত্রিপথে, দেখাবে এই শান্তি নিকেতন ।

অর্জুনের কুরুক্ষেত্র

হইতেছে অন্তর্হিত ;

মহর্ষির কঙ্কক্ষেত্র, অনন্ত বিস্তার,

হইতেছে প্রসারিত ;

দ্রুত দমন ব্রত

অর্জুনের, মহর্ষির স্রুত উদ্ধার ।

তাহার গাণ্ডীব,—জ্ঞান ; অস্ত্র,—তত্ত্বরাশি ;

অক্ষয় কবচ,—গীতা, নিত্য অবিনাশী ।

সসৈন্তে মর্ষি এবে

হউন রণে অগ্রসর ;

চক্রে ওই অধর্মের করিছে সংহার ;

আনন্দে করুক শঙ্খ ধর্মের প্রচার ।

বাস ! তোমারই শঙ্খ, চক্র, কবচ তোমার ।

চালাইবে চক্র, শঙ্খ বাজাবে যেমন ;

চলিবে বাজিবে তথা ;

পার্থ, দ্বৈপায়ন,

তব করধৃত অস্ত্র, ঘুগল ভূষণ ।

তুনিলাম যেই দিন

অপূর্ব স্বর্গীয় শিশু

বৃন্দাবনে ইন্দ্র যজ্ঞ করেছে বারণ,

ভক্তিতে বিহ্বল গোপ গোপাক্ষনাগণ ;

দেবভাবে আকর্ষণ

করিতেছে প্রাণ মন,

পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান;

ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণ ।

বুঝিলাম সেই দিন

দ্বাপর হতেছে শেষ,

ক্লমতের নবযুগ হতেছে সঞ্চার,

আবির্ভূত বৃন্দাবনে যুগ অবতার ।

সেই দিন হ'তে বাস

তোমার মহিমাধ্যান

করিতেছে নিরন্তর, আত্ম সমর্পণ

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

করিয়াছে তব পদে, নর-নারায়ণ !

কেবল তোমার লীলা

করিবারে দরশন,

করেছে প্রভাস-তীরে দ্বিতীয় আশ্রম !

অদূরে কুটীর ক্ষুদ্র

করিয়াছে নিরমাণ

কুরুক্ষেত্রে তব লীলা; করিতে দর্শন ।

একমাত্র কৰ্ম্ম দ্বার,

না জানে দ্বিতীয় আর,

পাইবে ভক্তি ভরে তব ভাগবত ;

পাইবে মহিমাপূর্ণ এ মহাভারত ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

সন্মিলন ।

দ্বিতীয় গ্রহর নিশি ; নির্মল আকাশে

ভাসে নিরমল শশী নব হেমস্তের ;

ধীরে নব হেমস্তের বহে সমীরণ

শুশীতল ; কুরুক্ষেত্র নীরব নিদ্রিত ।

কি শক্তির মহামূর্তি—চাহি চক্স পানে

কহে বৈপায়ন-শিষ্য ভ্রমি ধীরে ধীরে—

“কি শান্তির মহামূর্তি অনন্ত আকাশ—
 নীরব, নিদ্রিত ! নীচে নীরব, নিদ্রিত
 কুরুক্ষেত্র কি বিরাট মূর্তি অশান্তির !
 বিরাট রাক্ষস-মূর্তি বীরত্ব ভীষণ
 ভারডের, দিবসেতে জীমূত নির্যোষে
 গরজি অসংখ্য কণ্ঠে, সংখ্যাতীত ভুজ
 গ্রহাবি অসংখ্য বজ্র, অসংখ্য চরণে
 বীর দর্পে বহুকরা করিয়া কল্পিত,
 যোজন যোজনান্তর বিরাট শরীরে
 ব্যাপি আত্মঘাতী এবে নীরব নিদ্রিত,—
 ঝটিকাস্তে স্তম্ভ মহা পারাবার মত !
 হায় মা ! হায় মা ! শিবে ! শান্তিস্বরূপিণি !
 দিবসে তুমি মা গোরী, মা গো রজনীতে
 ক্লক্কাভাগে তুমি কালী, শুক্কাভাগে শুভ্রা
 জ্যোৎস্না-বরণী মা গো তুমি সরস্বতী—
 সর্বত্র তোমার মুখ কি শান্ত সুন্দর !
 তবে কেন তব এই জগতে, জননি !
 এতই অশান্তি আহা ! এত বজ্র, ঝড় ?
 সর্বাণি ! সর্ব্বেশ ! সর্ব্বশক্তিসম্বিতে !
 জানি তুমি নিত্য, আর অনিত্য জগত !
 কিন্তু কবিলে না কেন জগত তোমার
 অনন্ত শান্তির ছায়া ? শান্তিতে জন্মিয়া,
 শান্তিতে এ পান্থশালা কাটিয়া হুদিন,
 বাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়া ?
 আপনি করণায়ী, সহ মা কেমনে
 জগতের এত হুঃখ ? এতও অনলে

পুড়িছ কেমনে হায় । পতঙ্গের মত
 বিপুল ক্ষত্রিয় কুল ? পুড়িছ বাহুকি,
 অভাগিনী জরৎকার ? পুড়িছ হুঁসীসা ?
 ঋষি কুলে ধূমকেতু, জলন্ত বিদেহ,
 মহাক্রোধ মূর্তিমন্ত, স্তম্ভিলে কেমনে ?
 ভীষ্মের শিবির দ্বারে দিলেন বিদায়
 মহর্ষি, যাইতেছিল আশ্রমে অদূরে,
 দেখিল যোগিনী এক কোরবু শিবিরে
 যাইতেছে, অলক্ষিতে চলিছে পশ্চাতে,—
 কি যে অমঙ্গল ছায়া পড়িল হৃদয়ে !
 একি দেখিলাম হায় ! একি শুনিলাম !
 কি স্বর্ণ ছায়ায় কিবা নবক ভীষণ !
 স্তম্ভদ্বার সেই দয়া, ধৈর্য্য গোবিন্দের,
 কারুর নিরাশা মরু, বড়যন্ত্র ঘোর
 নিশীথে নিবিড় বনে কর্ণ হুঁসীসার ;—
 আকাশ পড়িল ভাঙ্গি মস্তকে আমার ।
 বাছা ! তুই বারি বিন্দু ত্রিদিব প্রসৃত
 পড়েছিলি গ্রামি ক্ষুদ্র শুক্লির হৃদয়ে ।
 আমার হৃদয়-মুক্তা হৃদয় চিরিয়া
 নিতেছে কাড়িয়া হায় ! নির্দয় তন্তর,—
 সহিব কেমনে আমি ? হায় বাছা মোর ।—
 কাঁদিতে লাগিল শোকে উন্নত হৃদয়ে
 নীরব, নিদ্রিত, চন্দ্র-প্রদীপ্ত-প্রাস্তরে ।
 “যাব নারায়ণ কাছে ।— হায় হিমাদ্রির
 পদমূলে পিপীলিকা, সিদ্ধ পদতলে
 বালুকা, দুঃখের কথা কহিবে কেমনে ?

যিনি অন্তর্যামী, যার জ্ঞানের নয়নে
 জগতের তত্ত্ব রাশি মুক্ত, অব্যাহিত,
 এই বড়যন্ত্র হায় ! লুকাব কেমনে
 তাঁর কাছে ঢাকাসার ? হইলে প্রকাশ
 নাগরাজ্য উদ্ধারের ব্রত বাহুকির
 ভূবিষে অতল জলে সহ বাহুকির,—
 থাকিবে না অনাথ্যের একটি আশ্রয় !
 যাইব পার্থের কাছে—যাইব কেমনে ?
 তাঁর অনুতাপানল উত্তিবে জলিয়া
 দেখিলে আমারে, করুণ হৃদয়ে
 পাইবেন নাথ কিবা ব্যথা নিদাক্ষণ !
 যাব কুমারের কাছে ।—পারিব কি হায় !
 নিবারিতে তারে আমি ? তরুণ ভাস্কর
 উঠিছে ক্ষত্রিয়াকাশে আলোকে পূরিয়া
 দশ দিশ, নিবারিতে পারিব কি আমি ?
 দেখেছি নক্ষত্র মত, মত্ত মৃগয়ায়
 ঘোর বিপদের মুখে ঘাইতে ছুটিয়া
 হাসি উচ্চ বাল-হাসি । করিলে বারণ
 গলা জড়াইয়া ধরি কহিত হাসিয়া—
 ‘তুই মম বনমাতা ; কি ভয় আমার
 মৃগয়া আমার ক্রীড়া । দেখ্ দাঁড়াইয়া
 এখনি কেমন খেলা আসিব খেলিয়া ।
 হাস্ মা ! হাস্ মা ! তোর হাসি আদরের
 কি স্নানর ! কাঁদিবি ত দিব গালে চড় !’
 স্মৃতিতে ভিজিল চক্ষু । চিন্তি কিছুক্ষণ—
 “নিবারিতে নাহি পারি,—আশঙ্কা অজ্ঞাত

ছাইবে হৃদয়, বল হরিবে বাহর ;
 করিবেক সিংহ-শিশু বিষাক্ত হৃৎকল ।
 না, না, যাব দয়াময়ী স্তভদ্রার কাছে !
 মায়েব করুণ প্রাণ হইবে কাতর,
 করিবে বারণ, আশা হইবে সফল ।
 গুরুদেব ! পরীক্ষিতে হৃদয় আমার
 পাঠাইলে অপরাহ্নে ভদ্রার শিবিরে ?
 আনন্দে তোমার আজ্ঞা করিহু পালন
 ততোধিক গুরুতর পরীক্ষা কতিন
 লইব ; হৃদয় ! চল যাইব যথায়
 নিজিতা পার্থেব বক্ষে, ত্রিদিবে আমার,
 প্রেমময়ী ভদ্রা দেবী, নিজিতা এখন
 স্থিরা হিরণ্যতী বক্ষে জ্যোৎস্না ধেমন ।
 দেখিব একটি শিরা কাঁপে কি তোমার,
 পড়ে কি না অণুমাত্র ছায়া কামনার
 তোমার তরল বক্ষে । রমণী হৃদয়
 তরল সলিল মত ; সলিলের মত
 দেখিব হয় কি তাহা নিশ্চল, নিশ্চল ।

পার্থেব শিবির পানে ছুটিল সবেগে ।
 দ্বৈপায়ন শিষ্য !—দ্বার ছাড়িল প্রহরী
 সসম্মুখে ; প্রবেশিয়া শিবিরে তখন
 অপূর্ব যোগিনী বেশ করিল গ্রহণ ।
 জলিছে স্নগন্ধ দীপ স্তবর্ণ আধারে ।
 স্তবর্ণ পর্য্যঙ্ক অন্ধে স্তবর্ণ প্রতিমা
 স্তব্ধা স্তভদ্রা দেবী, নীলমণি ময়
 বীরমূর্ত্তি নিরুপম স্তব্ধ ধনঞ্জয় ।

শোভিতেছে সুভদ্রার অতুল বদন
 পতি বক্ষে, নীলাকাশে পূর্ণ শশধর,—
 মানস-সরসে যেন একটি কমল ।
 আলিঙ্গিয়া পরম্পরে, মেঘ জ্যোৎস্নায়,
 উভয়ে উভয় মুখ চাহিয়া চাহিয়া
 নিদ্রাগত । নিদ্রাতেও অধরে অধরে
 রয়েছে দ্বৈত হাসি চারু চিত্রাঙ্কিত ।
 আলিঙ্গি সৌন্দর্য্য শোখা, হিমালয় জাহ্নবা,
 স্বৰ্গ শিজিনী নীলমণি-শরাসন,
 দয়া ধর্ম্ম, পুণ্য প্রীতি, স্বৰ্গ মন্দাকিনী,
 উভয় উভয়-ধ্যানে মোহিত যেমন ।
 দ্বৈত কাঁপিল চক্ষু, সংঘত হৃদয়
 যোগিনীর, অলঙ্কিত কাঁপিল ভূতল
 অনন্ত ভূর ভারে স্থির অবিচল ।
 দুই হাতে চাপি বক্ষ, জাহ্ন পাতি ভূমে
 চাহি উদ্ধ পানে কহে—“হা হত হৃদয় ।
 একি কম্প কামনার ? না, না, প্রাণনাথ
 করিয়াছি চতুর্দশ বৎসর তোমার
 আরাধনা ; দেও শান্তি, শান্তি পূর্ণ বৃকে
 নিরখিব দেবমূর্ত্তি মম তপস্তার ।”
 উঠিল ; মুহূর্ত্ত বামা নয়ন ভরিয়া
 দেখিল যুগল রূপ । হৃদয় এখন
 ভক্তি ভরে অবিচল ; নীলাজ বদন
 শান্ত, স্থির ; আনন্দাশ্রু পূর্ণ ছনয়ন ।
 মুহূর্ত্ত,—মুহূর্ত্ত পরে কর-নীলোৎপল
 অরপিল বজ্রোৎপল ভদ্রার চরণে ॥

চমকি বসিলা ভদ্রা, রহিলা চাহিয়া
 উভয় উভয় পানে । উভয় মোহিতা
 উভয়ের দরশনে, চাহি পরস্পরে,—
 জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না-মাথা সবসী নীলিয়া ;
 জ্যোৎস্না প্রদীপ্তা স্থিরা জাহ্নবী যমুনা ;
 যোগিনী ও যোগায়াত্যা, শান্তি তপশ্চায়,
 বনদেবী গৃহলক্ষ্মী ; দধী দবিদ্রতা ।

চাহি পরস্পরে যেন প্রীতি নিষ্কামতা,
 প্রেমময়ী উদাসিনী, প্রতিভা করনা ।
 অধরে যোগিনী করি অঙ্গুলি নিবেশ
 করিলে সঙ্কেত,— ভদ্রা দেখিলা সে মুখ
 পুণ্যের পবিত্রাকাশ—জড়াইয়া তাহে
 আদরে লইয়া বক্ষে চলিলা বাহিরে,
 অদূরে জ্যোৎস্নাময়ী হিরণ্যভী তীরে ।

উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত ভদ্রার হৃদয়
 করুণার সিদ্ধ ; দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে
 লইয়া তাহায়ে ভদ্রা কাদিলা নীরবে ।
 কাদিল নীরবে সেই স্বর্গে তপস্বিনী
 লুকাইয়া মুখ । অশ্রু কত রূপান্তর !—
 শোকাশ্রু ভদ্রার, অশ্রু-অশ্রু যোগিনীর ।
 ভদ্রা চাহে বুক চিরি সেই মুখখানি
 রাখে বুক চিরদিন । চাহে তপস্বিনী
 চিরি বুক সেই বুক, মেহের ত্রিদিবে,
 পড়ে ঘুমাইয়া স্বখে চিরদিন তবে ।

স্নেহ-স্তরলিত কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে
 কহিলা উচ্ছ্বাসে ভদ্রা—“শৈলজে ! ভগিনি ।

চির অভাগিনি !—বথা সন্নিহ না আর ।
 কিছুক্ষণ পরে শৈল করিল উত্তর,
 বক্ষে লুকাইয়া মুখ—“সে কি কথা দেবি !
 ভদ্রার ভগিনী, স্নেহ ভাগিনী পার্থের
 অভাগিনী যদি, তবে স্নভাগিনী আর
 কে আছে জগতে, দিদি ! শৈলজা তোমার
 বড় ভাগ্যবতী, বড় ভাগ্যবতী যথা
 নির্গন্ধ অপবাসিতা দেবপদাশ্রিতা ।”
 অপরাজিতার সেই ক্ষুদ্র মুখখানি
 তুলিলেন ভদ্রা স্নেহে ; চন্দ্র করতলে
 দেখিলেন আনন্দাশ্রু যুগল নয়নে,
 স্নেহে আনন্দ হাসি ভাসিছে অধরে
 সেই মুখ শান্ত, শান্ত শোভিতেছে যেন
 চন্দ্রাভ আকাশ খণ্ড হৃদয়ে তাঁহার ।
 চুড়িলা অদরে ভদ্রা সেই মুখখানি !
 সে চুপনে কত স্নেহ ! কি সুধা শীতল
 বহিল ছইটী প্রাণে ! অতৃপ্ত নয়নে
 উভয় উভয় পানে রহিল চাহিয়া ।
 “শৈল ! শৈল !”—বলি ভদ্রা স্মৃতির উচ্ছ্বাসে
 আশ্রু-হারা চুপিলেন আবার আবার
 সেই ক্ষুদ্র মুখখানি,—শৈলের কি স্বর্ণ !
 কহিলেন—“বল দিদি ! থাকিবি একপে,—
 থাকিবি আমার বৃকে ;—ছাড়ি আমাদের
 আর যাইবি না ;—আমি দিব না যাইতে ।”
 চন্দ্রের আশ্রুণে বকুল তলায়
 প্রসারিত, ছইজন বসিয়া তথায়

আলিঙ্গিয়া পরস্পরে । বাম অংসোপরে
 স্নুভদ্রার অধোমুখ আছে শৈলজার ।
 চাহি শূত্র পানে ভদ্রা কহিতে লাগিলা—
 “চতুর্দশ বর্ষ আজি, প্রতিমা রে তোয়
 পূজিয়াছি নিবন্তর হৃদয়ে হুজনে ।
 স্মৃতিতে শোকাশ্রু কত করিয়া মিশ্রিত,
 কত বর্ণে সে প্রতিমা করেছি চিত্রিত ।
 কভু ভাবিতাম তুই অস্ত্রে বাহুকির
 নিহতা, আকুল প্রাণে কাঁদিতাম কত,
 বৎসহারা বন-মৃগ-দম্পতির মত ।
 পুনঃ ভাবিতাম নহে নিষ্ঠুর এমন
 নারায়ণ, এই বন-মল্লিকা তাঁহার
 করিয়া অদৃশ্যে পুণ্য-সৌরভ বিস্তার,
 তাপিত মানব প্রাণ করিছে শীতল ;—
 এ জীবনে এক দিন পাব দর্শন ।
 স্মৃতির আলেখ্য শৈল পরিয়া নয়নে,
 আঁকি তুই জনে তব চারু চিত্রপট,
 রাখিয়াছি শয্যাগৃহে । আঁকিতে সে ছবি
 কত অশ্রু তুই জন করেছি বর্ষণ ।
 সেই চিত্রে, এই চিত্রে কতই অন্তর !
 সে নীলাঞ্জলি আজি ফুটন্ত নলিনী ;
 সে পঞ্চমী আজি কিবা পূর্ণিমা রজনী !
 এই পবিত্রতা, শ্রেম, শান্তি, সন্ন্যাসতা,
 কে পারে চিত্রিতে,—এই প্রাণ-কোমলতা ।
 এ কোমল প্রাণে, এই কোমল শরীরে,
 বেড়াইয়া বনে বনে হায় । বাণ-বিক

বন-কুরঙ্গিণী মত, কি হৃৎ দারুণ
না জানি সহিলি বোন ! আয় বৃকে আয়,
ভদ্রার্জুন ক্ষতপ্রাণে ঢালি প্রেম ধারা
জুড়াইবে তোর প্রাণ, প্রাণ আপনার ।
বিদগ্ধ খাণ্ডব বন ; তব পিতৃ-ভূমি
সমুদৃত ; পিতৃ-পুত্রী তব পুরাতন
করিয়াছে নিরমাণ, পার্থের আদেশে,
তোমার পিতৃব্য ময় শিল্পি-চূড়ামণি ।

মরবত মূর্তি হয়েছে স্থাপিত
সে পৃথীতে ; সেই স্থান করিয়া গ্রহণ
পরিতাপ তুহানল কর নির্বাপিত
অৰ্জুনের স্মৃত্তকার । এই বৃক শেষে
কিংবা চল ইন্দ্রপ্রস্থে, চল প্রেমময়
অৰ্জুনের বৃকে, এই বৃকে স্মৃত্তকার ।”

আবার আঁটিয়া ভদ্রা গইলেন
বৃকে নাগ-নন্দিনীকে ; কাঁদিলো আবার
হই জন ; ভদ্রা শোকে, স্থখে নাগবালা ।
কিছুক্ষণ সেই স্বর্গে রহিয়া নীরবে
উত্তরিল শৈল ধীরে—“দিদি ! তোমাদের
চরণ যুগল স্বপ্ন-স্বর্গ শৈলজার ।
সকল তপস্তা তার । কিন্তু কহ হায় ।
কেবল কি বনে হৃৎ, গৃহে দিদি ! স্থখ,—
এই কুরুক্ষেত্র হায় ! প্রাঙ্গণে যাহার !”

কি প্রশ্ন ? ভদ্রার মুখ হইল গভীর ।
কেন শৈলজার মুখ শান্তির ত্রিদিব
বুঝিলা ঐধং । শৈল দেখিল নীরবে

অপূৰ্ণ শান্তি ছায়া চক্ৰ করতলে
 ছাইল দ্রাব মুখ । বিস্তৃত নয়ন
 অলৌকিক প্রতিভায় হইল উজ্জ্বল,
 ভাসিল জ্যোৎস্না যেন নীল সরোবরে ;
 ভজ্ঞা । শৈলজে । সুখের তরে আকুল জগত ।
 সুখ-অন্বেষণে,—স্থিতি, গতি, জগতের ।
 এ জগত সুখময়, নিত্য-সুখময়
 নিজ বিধাতার মত । অজস্র ধারায়
 করে সুখ জ্যোৎস্নায়, বহে ঝটিয়ায়,
 গাজে জীমূতমন্ডে, বর্ষে বরিষায়,
 গগন কোকিলের কণ্ঠে, শ্বাসে সুশীতল
 মনুষ্যের সমীরণে, ফলে তরু দেশে,
 ফুটে ফুলে, ভাসে জলে, হাসে দিবালোকে ।
 সুখ বনে, সুখ গৃহে, সুখ সর্বময় ।
 কেবল মানব নাহি পাইয়া সে সুখ
 করিতেছে হাহাকার ! মানুষের সুখ
 নহে গৃহে, নহে বনে ; বুঝে নাই, হৃদয় !
 নহে ধনে রাজ্যে সুখ, নহে তপস্তায় ।
 শৈ । বল দেবি । কিসে তবে সুখ মানুষের ?
 সু । জগত অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
 এক তানে,—বিহঙ্গের বিহঙ্গছে সুখ,
 পশুর পশুতে, সুখ পুষ্পে পুষ্পের ;
 মানুষ্যে তবে গোন ! সুখ মানুষের !
 শৈ । কারে বল মানুষ্যত্ব ?
 সু । চরিতার্থ গায়
 বিহঙ্গ-বৃন্তির বিহঙ্গত্ব বিহঙ্গের ।

মানুষ কি নিয়া বল মানুষ, ভগিনি ?—

আত্মা, মন, কলেবর। চরিতার্থতায়

এ তিনের মনুষ্যত্ব ! যেই নীতি চয়

শারীরিক, মানসিক, বৃত্তি আধ্যাত্মিক,

—মানবের মানবত্ব,— করিছে ধারণ,

তাহাই মানবধর্ম। স্বধর্ম পালনে,

স্ববৃত্তির অনাসক্ত চরিতার্থতায়,

যতই ম'নুষ্য ক্রমে হয় অগ্রসর,

লভে তত মনুষ্যত্ব স্থগ নিরমল।

পূর্ণ মনুষ্যত্ব,—ঈশ্বর-মুক্তি, নিরবাণ,

বৈকুণ্ঠ, পরম সুখ, স্বর্গ, ভগবান !

শৈ। ইহা কি বৈদিক ধর্ম ?

সু। বেদধর্ম, শৈল !

এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান :

শৈ। এই মনুষ্যত্ব,—এই স্বধর্ম,—স'ধন

হয় না কি বনে দেবি !

সু। ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর

এ ধর্মের গৃহ, দিদি। এ মহা ধর্মের

ভিত্তি লোকহিত, ভিত্তি সর্বভূত হিত।

শৈ। চল তবে বনে দিদি ! হায় ! ধরাতলে

এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র কোথা আছে আর

সাধিবারে লোকহিত ! এ ভারত ভূমি

যাহাদের পিতৃ-ভূমি, সে অনাৰ্য্য জাতি

আজি কোথা, দেখ আহা ! কি দশা তাদের !

রাজ্যহীন, গৃহহীন, আহার-বিহীন,

আজি তারা বনে, আজি পশু নির্কিশেষ।

সাম্রাজ্যে, সৌভাগ্যে, স্বখে আজি আর্ধ্যগণ
 দেবোপম, হায় ! দেবি ! আছে তাহাদের
 কত শাস্ত্র, কত ঋষি, কতই আশ্রম,
 সাধিতে অজস্র হিত ; আছে তাহাদের
 পার্থ ভূজাশ্রম, স্বর্গ ভদ্রার হৃদয়,
 সুখদাতা পরিত্রাতা নর-নারায়ণ ।
 হইয়াছে সূর্য্যোদয় আবির্ভাবে তাঁর
 আর্ধ্যের অদৃষ্টাকাশে, পূর্ব্বাহ্ন প্রভায়
 সমুজ্জল আর্ধ্য ভূমি ; অমাবস্যা ঘোর
 অনাখ্যের হায় ! দিদি ! রবে'কি এমন ?
 পতিত পাবন হরি,—এ পতিত জাতি
 পাবে না তাঁহার দয়া ? পাবে না তোমার
 কি কাতর কণ্ঠ ! কিবা কাতরতা মুখে !
 বহিছে কি কাতরতা যুগল ধারায়
 হনমনে ! তুলি মুখ, জিজ্ঞাসিল শৈল—
 “পাবে না তাঁহার দয়া ? পাবে না তোমার ?
 বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভদ্রা রহিলা চাহিয়া
 সে কাতর মুখ পানে । কি যেন কি মেঘ
 নয়ন হইতে গেল নিমিষে সন্নিহা,
 নিমিষে কি যেন স্বর্গ খুলিল নয়নে ।
 কহিলেন—“শৈল ! শৈল ! এ চৌদ্দ বছর
 কোথা ছিলি, কি করিলি, এই ভগিনীকে
 কহ দয়া করি ।” শৈল ক্রিয়ৎ হাসিয়া,
 —বরিষায় জ্যোৎস্না অশ্রুতে সে হাসি—
 চাহি সুভদ্রার মুখ কহিল মধুরে—
 “বড় স্বখে ছিলি দিদি ! শৈলজা তোমার ।”

শৈ । সুভদ্রার অংসে পুনঃ রাখিয়া বদন,
 ম্লানমুখে শূন্য-নেত্রে চাহি ধরাতল ।
 গুনিয়াছ কি নরক লইয়া হৃদয়ে
 এৎসহিনু রৈবতকে ।। কি স্বর্গ লইয়া
 প্রভুর চরণাঙ্গুজে হইল বিদায় !
 পশিলু নির্বিড় ধনে, ছায়ার মতন
 চলিলাম ; কোন পথে, যেতেছি কোথায়,
 কেন যাই,—নাহি জানি । উপরে আকাশ
 শুভ্র মেঘে ঢাকা মরুময় ; মরুময়
 নিম্নে ধরাতল ; হহ রবে সমীরণ
 যাইছে বহিয়া । এই মহা মরুভূমে
 একাকিনী অনাথিনী চলিয়াছি আমি,—
 আগে মরু, পিছে মরু, মরু চারিদিকে,
 হহ করিতেছে মরু আগের ভিতরে ।
 ক্লান্ত অবসন্ন বৃকে পড়িয়া ভূতলে
 পড়িলু বিস্মৃতি অঙ্কে,—নিদ্রা কি মুচ্ছায়
 নাহি জানি । ক্রমে ক্রমে উঠিল ভাসিয়া
 জগত আনন্দময়, শ্রাম শোভাময় ।

ফুটিল কুসুম, ছুটিল সৌরভ,

গাইল বিহঙ্গ স্তম্বে,

মুহুর কিরণে হাসিল ভাস্কর,

কি হাসি মানব মুখে ।

দেখিলাম পার্থ বসিয়া শিয়রে

রাখি অঙ্কে মুখ যম ;

পিছু-স্নেহ পূর্ণ কি ছুটা নয়ন—

পবিত্রতা প্রসবণ ।

কহিছেন—“তোর পিতার শ্মশানে,
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি,
হুহিতার মত পালিব রে তোরে,
জানেন অন্তরযামী ।

অন্তর অন্তরে স্বজিয়া প্রতিমা,
পুষেছি তোরে ‘মদাঘ’
হুহিতার মত,— এই মুহা পাপ
কেমনে করিব হায় !

দেখ পিতৃ-প্রেম অনন্ত বিস্তার
কি পবিত্র সুশীতল,
পতি-প্রেম তার কাছে তুচ্ছ কত,—
পূরিত কামনানল !”

ঈর্ষার নরক নিবিল, হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল ।

মেলিলু নয়ন, —বেলা অবসান,
শান্তি পূর্ণ ধরাতল ।

মস্তক উপরে আনন্দ কাকলি
গাইছে বিহঙ্গগণ ;

বসি চারি দিকে, কুরঙ্গ শশক
চাহিয়া স্নেহ মন ।

আশৈশব আমি ছায়ায় মগ্ন
ভ্রমিয়াছি বনে বনে ।

কুরঙ্গ কুরঙ্গী, শশক শশকী
ভয়ী যেন ভাবে মনে ।

কুরঙ্গশাবক যাইছে ছুটিয়া
ভ্রাণিয়া মুখ কখন,

খেলিতেছে স্নেহে, নাচিতেছে শিখী
আনন্দে ধরি পেখম ।

সেই বন-শান্তি, সেই বন-স্নেহ,
স্বপ্ন-স্মৃতি স্নেহনয়ী,

কি নব জীবন পাইলাম, যেন
অমি সেই শৈল নই ।

বসিরা আকাশ চাহি ভাবিতে লাগিছ,
কি করিব, কোথা যাব ? শৈশবে জনক
কহিতেন মার কাছে—“ধর্ম্মে প্রিয়ে ! স্থপঃ
ইন্দ্রিয় সংযম, সেই ধর্ম্মের সোপান ।

নাহি চাহি রাজ্যধন । শৈলজা আমার

হইবে ধর্ম্মের রাণী, ধর্ম্মের জননী

অনাথ্যের, বিলাইয়া হরিনাম স্তব

বাঁচাবে অনাথ্য জাতি । ধর্ম্ম বিনা আর

হইবে না কোন মতে অনাথ্য উদ্ধার ।”

কি করিব ? কোথা যাব !—পাইলু উত্তর ।

আকাশে কর্তব্য রেখা দেখিলু অঙ্কিত ।

জনক জননী মূর্ত্তি দেখিলাম আর

বিরাজিত সন্ধ্যাকাশে । অনাথিনী আমি,—

আশৈশব নিরঞ্জন বড় প্রিয় মম ;

বড় প্রিয় বনভূমি । বসি নিরঞ্জনে

দেখিতাম উজ্জ্বল নীল মণিময় পটে

স্নেহময়ী মা আমার, পিতা স্নেহময়—

স্নেহের ত্রিদিবে, স্নেহ-দেবতা যুগল ।

হায় । বৈবতকে দেবি ! আসিছ যে দিন

পাপব্রতে, পুণ্য ছবি দেখি নাই আর ।

আজি প্রেমময় মূর্তি দেখিয়া আবার
সুপ্রসন্ন, কি আনন্দে ভরিল হৃদয় !
যুগল শীতল ধারা বহিল নয়নে ।
বুঝিলাম দেব দেবী প্রীত মম ব্রতে ।
প্রণমি স'ষ্টে ভূমে, ডাকি ভক্তিভরে,
কহিলাম—“দেব ! দেবি ! দিয়া পদাশ্রয়
কন্তার বঠিন ব্রত করিও পূরণ ।”

কোথা ছিহু ? বিক্ষম্ভনে । কি কহিহু দেবি ?
পার্শ্বের প্রতিমা স্বজি, এ চৌদ বছর
পূজিয়াছি ভক্তিভরে ; এ চৌদ বছর
শৈল ক্ষুদ্র স্বর্ধ্যমুখী, পার্শ্ব প্রভাকর ॥
এ চৌদ বছর ক্রমে পূজিতে পূজিতে,
সেই পতিভাব দেবি ! হইল বিলীন
কি অনন্ত শাস্তিপূর্ণ প্রীতি পারাবারে,
সিদ্ধমুখী গঙ্গামত । এই চরাচর
হইল অর্জুনময়, হইহু তনয় ।

কভু পার্শ্ব পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্শ্ব পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা ।
কভু পার্শ্ব ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্শ্ব, আমি বাৎসল্যে পূরিতা ।
কভু পার্শ্ব সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্শ্ব প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধীনী ।
কভু আমি পার্শ্ব, পার্শ্ব শৈলজা আমার ।
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার ।

হ । কি স্বন্দর উপাসনা । কি প্রেম গভীর ।
উপাসক, উপাসিত, কি ধন্য উভয় ।

এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান ।
 এই প্রেমে মর্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান ।
 আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
 নাহি যার প্রেমে, সেই উপাশ্রু আমার ।
 শৈ । নহে বহুদিন গত, দিদি, একদিন
 আসিলেন দ্বৈপায়ন দাসীর কুটীরে,—
 বন অন্তরালে বেন দেব অংশুমালী ।
 ফলিল তৃপ্ততা মম । অন্তর্যামী প্রভু
 চিনিলেন এ দাসীয়ে, কহিলেন—“শৈল !
 সিদ্ধ তব পার্থ-পূজা পূজ তুমি এবে
 পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
 অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার ।
 থাকে যদি কণা মাত্র কামনা-উত্তাপ
 হৃদয়ে নিবিবে ; শান্তি পাইবে পদম ।”
 কহিলাম,—“চিন্তাভীত সেই ভগবান,
 বুঝিবে, পূজিবে, এই অবলা কেমনে
 জ্ঞানহীনা ?”

ব্যাস । “বুঝ, পূজ, ভক্তিভরে
 আদর্শ মানব কৃষ্ণ, যুগ-অবতার ।
 পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণ কর নারায়ণে লয়,
 এইরূপে পতঙ্গও উঠে হিমালয় ।
 কিন্তু বৎসে ! তব এই যোগিনীর বেশ,
 একি রৈবতকের সে ভূত্যা বেশ তব ?”
 “না, না, প্রভু !”—কহিলাম পড়িয়া চরণে—
 “এই বেশ জীবনের ব্রত এ দাসীর ।
 অনন্ত অমৃতপূর্ণ জ্ঞান সিদ্ধ তব,

পাইবে না অনার্যা কি বিন্দুমাত্র তার ?
 নারায়ণ ! এই নব জলধর-ধারা
 পাবে না কি এই বিশ্বে চাতক কেবল ?
 পাইবে না মরুভূমি ? দেহ এ দাসীরে
 এক বিন্দু, বিলাইয়া বনে বনে দাসী
 করিবে এ জীবনের ব্রত উদ্দাপন ।”
 কহিলা সজল কণ্ঠে,—“চন্দ্রচূড়-সুতে !
 গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও কন বনে
 —বেড়াইয়া মুগ্ধপ্রাণা বিহঙ্গিনী মত .
 পতিতপাবন নাম ; অনার্যা উদ্ধার
 হবে এই নামে ; মন্ত্র নাহি জানি আর ।”
 অশ্রুজলে প্রক্ষালিয়া চরণ যুগল
 কহিলাম,—“কর মন্ত্রে দীক্ষিত কথায় ;
 পদ কল্পতরুমূলে বন লতিকায়
 দেও স্থান ; নহে ভিন্ন করেছি শ্রবণ
 কৃষ্ণ-বাসুদেব আর কৃষ্ণ-দৈপায়ন ।”
 বহিল কি আনন্দাশ্রু মন্দাকিনীধারা
 প্রভূর নয়নে—তুই চক্ষু জগতের !
 আদরে লইয়া বক্ষে চুম্বিয়া ললাট
 কহিলেন,—“মা আমার ! নিরুপমা এই
 জলন্ত পাবক শিখা-পশিলে আশ্রমে
 পুড়িবে যে শিষ্যগণ, ভস্মিবে আশ্রম ।”
 “অর্জুনের ভৃত্য”—আমি কহিছ সলাজে—
 “হবে তব শিষ্য-পুত্র, সেবক তোমার”
 গুরুর চরণাশ্রমে পাইয়াছি স্থান ।
 দেও স্থান, দেবি ! আজি চরণে তোমার ।

পড়িল বিহ্বলা শৈল চরণে ভদ্রার ।
 আপনি বিহ্বলা ভদ্রা । বিহ্বলা বালায়
 আবার লইয়া বক্ষে, কহিল উচ্ছ্বাসে,—
 “শৈল ! শৈল ! পুণ্যবতি ! পদতীর্থ তোরা
 স্নভদ্রার যোগ্য স্থান । ধন্য নারায়ণ !
 হৃজ্জের তোমার লীলা, কি বিশ্বিবে নর
 গৃহমুখী পতি-প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা
 রুদ্ধ করি এইরূপে গর্ভিত-স্নেহ শৈলে,
 বহাইলে বনভূমি করিতে উদ্ধার
 এই মতে, এই পথে ! আয় দিদি ! আয় !
 দুইজনে গৃহে বনে গাব কৃষ্ণনাম ।
 এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিঙ্গনে
 বাঁধিব অনার্য্য আর্য্য । গাইবে জগত
 কৃষ্ণ নাম ; কৃষ্ণ প্রেমে ভাসিবে ধরণী
 কুরুক্ষেত্র ঐবাবত ভাসাইয়া বেগে
 ছুটিতেছে প্রেম-গঙ্গা পতিতপাবনী,
 আর্য্য ভূমি বনভূমি, কহিতে উদ্ধার ।”

স্নভদ্রার বক্ষে শৈল রাখিয়া মস্তক—
 কি দেখিছে ? “ওই দেখ ! ওই দেখ, দিদি !”—
 ছুটিয়া চলিল শৈল—“বসি চন্দ্রাসনে
 জনক জননী মম, কি প্রীতি বদনে !
 প্রসারিয়া কর মাতা কি কহিছ ?—মাতা ।
 কে মাতা ?—স্নভদ্রা ।” শৈল ফিরিয়া আবার,
 পড়িয়া ভদ্রার বুকে,—“ওমা ! মা আমার
 মাতৃ-হীনা বনভূমি,—শৈল মাতৃ-হীনা,—
 নারায়ণ ! এত দিনে পাইল জননী ।

পতিতপাবনী মাত ! পতিতা কণ্ঠায়
রাখিস্ চরণে তোর ।” হইল মূর্ছিতা ।

নীরব রজনী । চন্দ্র হাসিছে আকাশে
নীরবে, নিরখি কিবা স্বর্গ ধরাতলে !
মূর্ছিতা শৈলের মুখ অর্কে স্তম্ভদ্বার,
চন্দ্রকরে সমুজ্জল সিক্ত নীলাবুজ,
সন্নিহিত, স্নানিধি, শান্ত, চাহি চন্দ্রপানে
আত্মহারা ভদ্রা দেবী । কিবা দরশন
চন্দ্রে চন্দ্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে কিবা সম্ভাষণ
প্রীতিময়, ভাবময় ! বহিছে কপোলে
যুগল আনন্দ ধারা দর দর দর,—
কি পবিত্রা ধারা ! কিবা পুণ্য নিরন্তর !
তৃতীয় প্রহঃ নিশি, নব হেমস্তের
সুশীতল সমীরণ বহিতেছে ধীরে ।
ভাঙ্গিল শৈলের মূর্ছা । বাসয়া রমণী
ভদ্রার উরসে মুখ রাখিয়া আবার
কহিল,—“রজনী দেবি ! অবসান প্রায় ।
মানবের ভাগ্যাকাশে ভদ্রার মন্তন
ভাসিতেছে সুখতারা অনন্ত আকাশে,—
মানবেরো হৃৎক নিশি হতেছে প্রভাত ।
বিদায়ের কালে ভিক্ষা চাহে এই দাসী
তোমার চরণাবুজে,—কর এ প্রতিজ্ঞা
কালি রণে পুত্রে তব দিবে না যাইতে ;
রাখিবে বাঁধিয়া, মত্ত করি-সুত মত,
স্বদৃঢ় স্বর্গীয় মাতৃ-স্নেহের নিগড়ে ।”

শে ।

ওনিয়াছি কোরব-মঙ্গলা
অলক্ষিতে । বীর ধর্ম দিয়া বিসর্জন
কালি রণে ঘটাইবে ঘোর অমঙ্গল
কুমারের ; এইরূপে করিবে হরণ
দুর্জয় গাণ্ডীব বল ।

হ ।

অন্ধের সন্তান

হতভাগ্য কোরবের, অন্ধ চিরদিন ।
বুঝে নাই হায় ! তারা গাণ্ডীবের বল
নহে শিশু অভিমুখ্য । গাণ্ডীবের বল
জনর্দ্দন, গাণ্ডীবের বল নারায়ণ ।
ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম সনাতন,
জ্ঞান শৈল । ধর্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্ম্যে হইবে পতিতা
পার্থের বমণী, অভিমুখ্যর জননী ?
হইবে পতিতা আহা ! কুমোর ভগিনী ?

শে ।

ষোড়শ বর্ষীয় শিশু করিবে সমর,—
একি ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ?

হ ।

ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ।

কেশরীর ধর্ম, ধর্ম কেশরী-শিশুর ।
ষোড়শ বর্ষীয় যেই ক্ষত্রিয় সন্তান
বিরত সংগ্রামে, সেই ভীকু কুসন্তান
ক্ষত্রিয় কুলের মানি । ষোড়শ বর্ষীয়
পুত্র মম মহারথী । ক্রীড়ার অঙ্গন
যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্মের গ অঙ্গের ভূষণ ।
পিতা করুণার সিদ্ধ, পুত্র করুণার
নবঘন, শ্লথ করে করিতেছে রণ ।

কৃষ্ণ স্তম্ভদ্বার যত্ন যাইছে ভাসিয়া
সেই করুণার শ্রোতে । অস্তায় সমরে
করে অন্ধ কোরবেরা বজ্রাগ্নি সঞ্চার
সেই মেঘে, বাড়বাগ্নি উত্তাল সাগরে,
চক্ষুর নিমিষে ভস্ম হইবে কুরুকুল ।
আজি অপরাহ্নে শিরে দিয়া দুই কর
করিয়াছি আশীর্বাদ বীরে পুত্রে মম,
পালিয়া স্বধর্ম্য, করি এই ঘোর রণ,
ধরাতলে ধর্ম্য রাজ্য কীরিতে স্থাপন ।

“নর-হরি ! নারায়ণ ! বিপদতঞ্জন !
রক্ষিও বাছায় তবে !”—সবিল না আর
রুদ্ধ কণ্ঠ শৈলজ্ঞার,—বলিয়াছে বাছা
যাইবে আশ্রমে বন-মাতার তাহার,
যুদ্ধান্তে উত্তরা সহ ; হইবে উদয়
অরুণ উবার সহ আশ্রমে আমার,—
অধার হৃদয়ে মম । অনাথিনী-নাথ !
এই চির অনাথিনী চাহে নাহি আর,
—চাহিবে না,—দেও তারে এই ভিক্ষা, এই
একটা বাসনা কর পূরণ তাহা !”

নীলবিল শৈল । অশ্রু বহিল নীরবে
কপোলে, বহিল অশ্রু নয়নে ভদ্রার ।
কেন শৈলজ্ঞার এই নৈশ অভিযান
বুঝিলেন ভদ্রা । চুষি বদন তাহার
কহিলেন—“অলক্ষিতা থাকিয়া জগতে
ববসিতে স্নেহ স্তম্ভা জনম কি তোর
অভাগিনি ! কত স্নেহ এই ক্ষুদ্র বৃকে !”

শৈল । একটা হিল্লোলে আমি আকুল বাহার,
বহিছে সে মেহ-গঙ্গা হৃদয়ে তোমার
শান্তিময়ী, সুধাময়ী ! করিয়াছ তুমি
কি অনন্ত গর্ভে লীন ! বুঝিলাম, হায়,
এত দিনে কি কঠিন ধর্ম ক্ষত্রিয়ের ।
বুঝিলাম এত দিনে লক্ষ্মী অনার্যের
কেন আর্ঘ্য-পানতা । বুঝিলাম আর,
শৈলজার স্থান কেন পদে সুভদ্রার ।

সু । বড়ই কঠিন ধর্ম, শৈল ! ক্ষত্রিয়ের ।
বসুন্ধরা ক্ষত্রিয়ের পত্নী, পুত্র নর ।
ক্ষত্রিয়ার পুত্র নর, পতি বিশেষ্বর ।
সেই বসুন্ধরা আজি কি পাপ আধার ।
মানব সমাজ আজি হুঃখ পারাবার ।
হুঃখ নহে বিধাতার লিপি নিরমম,—
জগত আনন্দ রাজ্য, সুখ প্রস্রবণ ।
অনন্ত চাহিয়া দেখ গ্রহ উপগ্রহ
—অসংখ্য, বিরাট মূর্তি !— ভ্রমে অহরহ
কি ভীষণ বেগে,—গতি নর-চিন্তাতীত !—
পরস্পরে পরস্পর করি আকর্ষিত
কি অচিন্ত্য প্রেমে, কিবা চিন্তাতীত ব্রতে,
কি সুখে অচিন্তনীয় নিয়তির পথে ।
কি অনন্ত সৌন্দর্যের উঠিছে উজ্জ্বাস ।
কি সুখ সঙ্গীতে পূর্ণ অনন্ত আকাশ ।
কেবল মানব পথ-ভ্রষ্ট নিয়তির ।
তাই মানবের হায় ! এ হুঃখ গভীর !
মানবের সুখ পথে অধর্মের সৃজন

করিয়াছে মহাবন, করিতে দাহন
 সে পাণ্ডব, অনিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ,—
 শিবিরে বসিয়া ওই সাক্ষী নারায়ণ !
 শ্রুতদ্রাব পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ,
 করি এই হতাশনে পৃথিবী পাবক,
 করি ধরাতলে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন,
 মানবের সুখ পথ করে উন্মোচন ;—
 তবে শৈল ভাগ্যবতী ! পুণ্যবতী, আর
 কে আছে এ ধরাতলে মত শ্রুতদ্রাব ?
 বহিছে যুগল ধারা জগত-মাতার
 যুগল কপোলে মাতৃ-প্রেম-বিগলিত
 সস্তাপ-হারিণী । শৈল কহিল উচ্ছ্বাসে,—
 “পিতৃগণ ! দেবগণ ! কে আছ কোথায়,
 দেখ পুণ্যবতীর এ আত্ম-বিসর্জন
 মানব উদ্ধার ব্রতে ! এ পুণ্যে মাতার,
 করিয়া শৈলের স্নেহে, কবচ নির্মাণ
 সমরে করিও রক্ষা বাছায় আমার ।”

নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া
 কিছুক্ষণ হুইজন, চাহিল বিদায়
 নমিয়া চরণে শৈল । দাঁড়াইয়া ভদ্রা
 সন্নেহে ধরিয়া কয় কহিলেন ধীরে—
 “থাক্ মুহূর্ত্তেক শৈল মধ্যম পাণ্ডবে
 ডেকে আনি, ডেকে আনি নর-নারায়ণে,—
 আমার তোমার দেব, উপাশ্রয় যুগল !
 পাইবেন যেই সুখ দেখি তোর মুখ
 হুই জনে, পারিবে না কুরুক্ষেত্র-জয়

করিতে তুলনা তার ! ভগিনীর তোর
 রক্ষা কর অনুরোধ, এক দিন তার
 থাক্ বৃকে, লয়ে বৃকে অভি উত্তরায়,—
 কাটাবে একটা দিন স্বর্গে হুভদ্রায় ।”
 “না দিদি”—কহিল শৈল রাখিয়া মন্তক
 সেই প্রেম-পূর্ণ বৃকে,—“হয়নি এখনো
 শৈলজার সে যোগ্যতা, সিদ্ধি তপস্তার,
 কৃষ্ণার্জুন পদ-তীর্থ করিবে দর্শন ।
 আজিও কাঁপিল বৃদ্ধি হৃদয় আমার
 নিরখি পার্থের মুখ । হৃদয়-সংঘম
 প্রলোভনে,—সেই অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ,—
 যে পারে, সে দেবী ; দেবী হুভদ্রা সে জন ।
 শৈলের হৃদয়ে দিদি ! নাহি সেই বল ।
 নাহি শক্তি পতঙ্গিনী দেখিবে নয়নে
 কৃষ্ণপদ প্রভাকর, চিন্তায় যাহার
 আলোক সাগরে ডুবে পতঙ্গের মত
 তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র । পারিবে যে দিন
 নিষ্কম্প প্রদীপ মত হৃদয় আমার
 দেখিতে পার্থের মুখ ; করিতে দর্শন
 নারায়ণ পদাঙ্ক শাস্তি নিকেতন ;
 পারিব যে দিন মিলি ভগিনী হৃৎকনে,
 আৰ্য্য অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত,
 সেই মহা ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপিত
 —রাজ্য অভিমহ্য, রাণী উত্তরা তোমার,—
 সে মহা প্রয়াগ তীর্থ দেখিব যে দিন,—
 আৰ্য্য অনার্য্যের শক্তি, হুভদ্রা শৈলজা,

বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা,
 অভিন্না অনন্ত প্রেমে ভগিনী যুগল;
 সে দিন আশিবে শৈল চরণে তোমার !
 যত দিন এই স্বপ্ন ফলিবে না,—দেবি !
 কহ এই স্বপ্ন হায় ! ফলিবে কি কভু ?—
 তত দিন যেই উচ্চ ধর্ম রমণীর
 শিখিলাম, সেই ধর্ম করিব সাধন ;

তত দিন—

গৃহ ক্ষেত্র স্তম্ভদ্বার, শৈলজার বন ।

এখনো চাহিয়া

আকাশের পানে শৈল হইল নীরব,
 স্তম্ভদ্বার বৃকে মুখ, ধরিয়া গলায় ।
 স্তম্ভদ্বা চাহিয়া স্থিরা আকাশের পানে,
 চন্দ্রদীপ্ত অশ্রু-সিক্ত কপোল কমলে
 বহিছে সে প্রেমধারা : সিত চন্দ্রালোকে
 হেম নীলমণিময় মূরতি যুগল
 আলিঙ্গিয়া পরস্পরে স্বপ্নে মহিমার,
 মানবের উদ্ধারের স্বপ্নে নিমজ্জিত,—

• অপার্থিব, প্রেমময়, পরিভ্রতাময় ।

ধীরে ধীরে প্রসারিয়া নয়ন যুগল—
 আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্র,—প্রসারিয়া কর
 কহিতে লাগিল শৈল উন্মাদিনী মত,—
 “ওই দেখ ! ওই দেখ ! জনক জননী
 আবার বলিয়া ওই শশাকমণ্ডলে !
 কি হাসি বদনে, আহা ! কি প্রেম নয়নে !
 সকল হইবে স্বপ্ন ? একি দেখি পুনঃ

হইয়া যুগল রূপ ক্রমে রূপান্তর
 কি মূর্তি ভাসিল ওই,—সুভদ্রা অর্জুন !
 পিতা ধনঞ্জয়, মাতা সুভদ্রা আমার ।
 পিত ! পিত ! মুছে ফেল শোক হৃদয়ের ।
 এই দেখ শৈল আশ্রি হুহিতা তোমার ।
 সফল তপস্তা ; দেখ হৃদয় তাহার
 পিতৃপ্রেমে অবিচল, স্থির, অকম্পিত ।
 মা আমার ! মা আমার ! প্রেম মুখ তোর
 কি সুন্দর, কি ত্রিদিব ! কি দেখি আবার !—
 এক অঙ্গে দুই রূপ হইয়া বিলীন,
 কি মূর্তি মহিমাময়, নীল মণিময়,
 উঠিল ভাসিয়া শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল !
 বাসুদেব ! নারায়ণ !—

ধীরে ধীরে আসি

দাড়াইলা আগে ক্লম্ব ! হইল পতিতা
 শৈলজা সুভদ্রা পদে, উভয় মুচ্ছিতা ।
 চাহি আকাশের পানে, মহিমা মণ্ডিত
 দাড়াইয়া নারায়ণ, আপনি মুচ্ছিত ।

* * * *

দাড়াইয়া থাক নাথ !

নিরপি নয়ন ভরি ।

আর্য্য অনার্য্যের লক্ষি !

থাক মা চরণে পড়ি !

অনার্য্য-আর্য্য শক্তির

এইরূপ সংঘর্ষণ—

ভারত-নিয়তি যদি,

তব ইচ্ছা নারায়ণ !

এইরূপে পদতলে

হ'য়ে শেষে সম্মিলিত

উদ্ধারি পতিত, নাথ !

হয় যেন প্রবাহিত ।

থাক দাঁড়াইয়া নাথ !

নিরখি নয়ন ভরি ।

আর্য্য অনার্য্যের লক্ষ্মি !

থাক মা চরণে পড়ি ।

চতুর্দশ সর্গ ।

—:~:—

বিদায় ।

—:~:—

“উত্তরে । উত্তরে । কই অভিমত্ব্য কই !”—

উত্তরার শিবিরেতে উজ্জ্বলসে সুলোচনা

আসি উন্মাদিনী প্রায় কহে মেহময়ী—

“উত্তরে ! উত্তরে । কই, অভিমত্ব্য কই ?

গুনিয়াছি মহা-বণ করিতেছে দ্রোণ আজি,

উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার,

কই অভিমত্ব্য কই, উত্তরে । আমার ?”

ধরিয়া সখীর গলা কাঁদিয়া বিরাটবালা

কহে—“ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পাইয়া এখন, !

গিয়াছেন তথা ; কিছু নাহি জানি আর ;
 কাঁদিতেছে প্রাণ মা গো ! তোর উত্তরার ।
 গত নিশি চক্ৰ পানে চাহিয়া চাহিয়া
 হইলু নিদ্রিতা যবে, দেখিলু স্বপন
 ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দূল ভীষণ ।
 দাঁড়াইয়া দৃষ্ট সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
 পরাজিত সপ্ত শত্রু অপূৰ্ব্ব কোশলে ।
 শশাঙ্ক হইতে ধীরে নর-নারায়ণ,
 মনোহর পুষ্পরথে করি আরোহণ,
 নামিলেন ; নিরমল রথ জ্যোৎস্নায়
 আলোকিল রণক্ষেত্র অমৃত ধারায় ।
 অভিরে তুলিয়া রথে লইলা আদরে ;
 উঠিতে লাগিল রথ আকাশে মস্থরে ।
 কহিলাম,—‘দয়াময় ! নেও উত্তরায় ।’
 করুণ নয়নে চাহি কহিলেন হায় !
 জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দর দর—
 ‘না, না, বৎসে ! যাবে তুমি বৎসর অন্তর ।’
 কহিলু—‘না, প্রাণনাথ ! ছাড়ি উত্তরায়
 যাইও না তুমি ; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
 পারিবে না একা যেতে এত দূর হায় ।’
 জয়নাদে পূর্ণ হ’ল পৃথিবী গগন ।
 নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি তারাগণ ।
 কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায় !
 এ কি স্বপ্ন মা গো ? অভি গেল মা । কোথায় ?’
 হ । বাপ তোর পোড়া মুখ, স্বপ্ন পোড়া ছাই
 মুণ্ড তার, সাত বাঘ সগোষ্ঠী বিরাট ।

ননীচোরা চুরি করি আনিল বাছ'য়
কোলে মম, তোর বাপ পড়ে যেন পায়ে ।
কহিস অভিরে যদি এ পোড়া স্বপন
এখনি খাইবি মার ! চলিত্ব এখন,
আজি রণে যেতে তারে দিবনা কখন ।

অপূর্ব স্বপন ব্যাখ্যা ! হাসিল উত্তরা,
বরিষা-জ্যোৎস্না-খেলা,—নেত্র অশ্রুভরা ।

ভাবিল—“সুজিমা ওই বাঘিনীর মত
ছুটিয়াছে শিশুহারা, আজি রণে আর
পারিবে না যেতে, আর কি ভয় আমার ?
কেনইবা এত ভয় হবে আজি মনে,

থেকে থেকে কাঁপে বুক কেন অকারণে ?

গোবিন্দ মাতুল যার, সুভদ্রা জননী,
পিতা ধনঞ্জয়, নিজে বীরেন্দ্র আপনি
রথি-শ্রেষ্ঠ—মহারথী. সে যাইবে রণে,

তাতে কেন এত ভয় হবে মম মনে ?

হাসি মুখে নিত্য যায়, নিত্য করে রণ,

রণক্ষেত্র যেন তার খেলার প্রাঙ্গণ ।

আমিই কি ডরি রণে ? নহি কি ক্ষত্রিয়া ।

দ্বিরাটতনয়া আমি অভিমত্যা-প্রিয়া ?

অৰ্জুনের শিষ্যা আমি, সেই নাট্য ঘরে

শিখালেন অস্ত্র বিদ্যা কতই আদরে ।

দেখি অস্ত্র শিক্ষা মম, লইয়া হৃদয়ে

কহিতেন—‘হবে পতি অৰ্জুন-তনয় ।’

জানিত না অভি ; এক দিন দ্বারকায়

স্বজিল হৃর্ভেদ লক্ষ্য ; বিধিত্ব হেলায়

সে লক্ষ্য ; বিস্মিত বক্ষে লইয়া আমায়
 কি চুখন, কি প্রশংসা গলায় গলায় ।
 নাহি ডরি রণে, কিন্তু চক্ষের অন্তর
 হইলে মুহূর্ত, প্রাণ কাঁপে থর থর ।
 এত রূপ, এত গুণ, পারিজাত হার
 মিলিতাছে মম ভাগ্যে প্রত্যয় আমার
 নাহি হয় পোড়া মনে । জাগ্রতে নিদ্রায়
 হারালেম, হারালেম,—ভয় হয় মনে ।
 ইচ্ছা করে, রাখি সন্য নয়নে নয়নে,
 মিশাইয়া বৃকে বৃকে জীবনে জীবনে ।
 কেন এত ভালবাসি, কেন তার তরে
 প্রাণ মম নিরন্তর এইরূপে করে ?
 পিতা, মাতা, ভগ্নি ভ্রাতা, শাণ্ডী, স্বপুত্র,
 কারো তরে প্রাণ নাহি করে এত দূর ।
 ইচ্ছা করে চিরি বৃক বৃকের ভিতর
 রাখি মুখধানি, দেখি জন্ম জন্মান্তর ।
 তাহার বসনধানি, পাছকা তাহার,
 কি সুগন্ধ ! প্রতিদিন চুসি কতবার ।
 হইলে নিমেষ মাত্র চক্ষের অন্তর,
 ছুখানি পাছকা রাখি বৃকের উপর ।
 পদ-প্রক্ষালিত বারি-সুধা করি পান,
 প্রাণের পিপাসা মম করি নিরবান ।
 কি যে করিতেছে প্রাণ ! আঁজি কদাচিত
 যাইতে দিব না রণে, এ কথা নিশ্চিত ।
 কিন্তু এ বিলম্ব কেন ? পতি সঙ্গহীনা
 বন-বিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা

ছট ফট, শিবিরেতে উঠিয়া বসিয়া ।
 এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া ।
 গাইতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর ।
 এত যত্ন তবু বীণা বাজিছে বেহুৱ ।
 আবার বাঁধিতে বীণা ছিড়ে গেল তার ।
 দূরে নিক্ষেপিয়া যন্ত্র, খুলিল ভাণ্ডার
 পুতুলের,—ওকি দ্বারে অস্ত্র-ঝনংকার ।
 বাজিল সে শব্দ বেগে প্রাণে উত্তরার !
 যুদ্ধ বেশে অভিমুখ্য,—মস্তকে উষ্ণীয়,
 কক্ষে মণিময় অসি তীব্র আশীবিধ ।
 অঙ্গে বর্ম্ম, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, তুণ, ধনুর্ঝাণ,
 অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র, বক্ষে উরুজাণ ।
 খচিত আরক্ত নীল কোবিকে সুন্দর
 সমাবৃত দীর্ঘায়ত হেম কলেবর,—
 মেঘাবৃত হিমাঙ্গির কাঞ্চন শেখর ।
 মুহূর্ত্ত উভয় পানে চাহে আত্মহারা,—
 কৃষ্ণা-দ্বাদশীর চন্দ্র চাহি সুখতারা ।
 চিস্তার দ্বিবৎ মেঘে বদনে যুবার
 করিয়াছে অনুপম গান্ধীয়া সঞ্চার ।
 গেল সেই মেঘছায়া নিমিষে সরিয়া,
 হাসির জ্যোৎস্না মুখে উঠিল ভাসিয়া ।

অভি । উত্তরে ! কি ভাগ্য তোব । কি ভাগ্য আমার ।

ঘোড়শ বৎসর যম ; সেনাপতি-পদে
 করেছেন ধর্ম্মর জ এ দাসে বরণ
 আজি রণে । এই দেখ উষ্ণীষে আমার
 আশীর্বাদ, গলে বীর-বাহনীয় হার ।

দ্রোণ-প্রতিদ্বন্দ্বী আমি ! ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্র-ভার,
কোন ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন ক্ষত্রিয়ার ?
দে বিদায় হাসি মুখে ! খেল ততক্ষণ
পুতুল বইয়া তোর ; পুতুলের সনে
খেলিয়া আমার খেলা আসিব এখন !

উ । হইবে বিবাহ আজি কন্তার আমার ।
দেখ দেখি যেয়ে যম স্নন্দরী কেমন !
কেমন সোণার নাক, রূপার নয়ন !
দেখ স্বয়ংবর-সভা ! রাজা অগণন
বসিয়াছে চারিদিকে । বর-কর্তা তুমি,
তুমি গেলে, কে করিবে বর-অভ্যর্থনা ?
বিদ্যা ফেলি পাত্রী তবে যুড়িবে ক্রন্দন ।
কাঁদ পোড়া মুখী ।—

কন্তা কাঁদিতে লাগিল

“পিঁ পিঁ” রবে, অভিমত্যা হাসিয়া আকুল
অভি ! থাকিতে এমন বর,—রুধ, ধনঞ্জয়,
কাঁদিতে বরের তরে হইবে না তোর
উহিতার । যুদ্ধ-অস্ত্রে সায়াছে পূরণ
হবে স্বয়ংবর-সভা ; বিদায় এখন ।

ছুটি বিজলীর বেগে, শিবিরের দ্বার
রুদ্ধ করি দাঁড়াইল বালা আচম্বিত,
রুদ্ধ কবাটেতে পৃষ্ঠ করিয়া স্থাপিত ।
বাম পদে অগ্রে, করে কবাট চাপিয়া,
পটে ঘেন রতি-চিত্র উঠিল ভাসিয়া ।
আলু থালু বেণী, আলুগায়িত বসন,

কেশ-বাস-সমাচ্ছন্ন অরুণ বরণ ।
 বিস্তৃত বিশাল নেত্র, বদন গভীর,—
 নবীন অরুণ বক্ষে নীল সরসীর ।
 দাঁড়াইয়া হইজন, চিত্র নিরুপম,
 ধ্যান ভঙ্গ দিনে যেন রতি ও মদন ।

উ ।

না, না, নাথ ! আজি রণে যাইতে কখন
 দিবে না উত্তরা তার খাঁকিতে জীবন ।

যাবে যদি ওই বসন্ত,

হান উত্তরার বক্ষে !

পড়িবে উত্তরা তব চুম্বিয়া চরণ,
 লজ্জি মৃত দেহ তার করিও গমন ।

অভি ।

প্রাণাবিকে ! একি কথা ? বীরের হৃদিতা,
 বীরের বনিতা তুমি, এই কাতরতা
 সাজে কি তোমার, পুত্রবধু অর্জুনের ?

বড়যন্ত্র করি শত্রু সংশপ্তক মনে
 করিয়াছে পিতৃদেবে যুদ্ধে নিষোজিত

ঘোরতর একদিকে ; অস্ত্রগুরু দ্রোণ

অস্ত্র দিকে চক্রবৃহ করিয়া নিৰ্ম্মাণ

করিছেন মহারণ । শুন হাহাকার

করিছে পাণ্ডব সৈন্য । সঙ্কট ভীষণ

নেখিয়া পাণ্ডব-পতি করিলা বরণ

এই দাসে ; আজি আমি না করিলে রণ,

ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি করিবেন দ্রোণ ।

উ ।

এখনও পাণ্ডব পক্ষে আছে অগণন

রথী মহারথী ।

অ ।

আছে,— দ্রোণের বিক্রম

না জান বলিকা তুমি। প্রতিজ্ঞা তাঁহার
 গুন নাহি তুমি,—নাহি থাকে ধনঞ্জয়
 করিবেন ধর্মরাজে গ্রহণ নিশ্চয়।
 ইন্দ্রোপম পিতা বিনা কেহ নাহি আর
 পরাভবে দ্রোণে,—দ্রোণ সমরে হুঁসীর।
 উ। কীরিবে কেমনে তুমি পরাভব তাঁরে ?
 অ। অভিমত্যা আমি, আমি অর্জুনকুমার।

বাম করে শেল অসি করি নিক্ষেপিত
 অস্ত্র করে; শিবিরের চারু গালিচায়
 অসি অগ্রে চক্রবাহ করিয়া অঙ্কিত
 দেখাইলা,—বীর বক্ষ উৎসাহে পূরিত,—
 কোন্ রূপে চক্রবাহ করিয়া ছেদন
 পশিবেন দ্রোণ সৈন্তে। হানত বদন,
 উত্তরা চাহিয়া আছে জন্মের মতন।
 ধীরে ধীরে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে কেমনে
 অমঙ্গল অশ্রুবারি আসিছে নয়নে।
 তুলি মুখ অভিমত্যা কহিলা হানিয়া,—
 “এইরূপে চক্রবাহ করিব লজ্বল,
 লজ্বে যথা সিংহ-শিশু ব্যাধের বন্ধন।
 কিংবা লজ্জি অবরোধ মেঘপালকের
 পশে যথা মেঘপালে কেশরি-কুমার,
 প্রবেশিব কুরু-সৈন্তে ! দেখিবেন দ্রোণ
 আজি রণে অগ্নি-শিশু অগ্নি-পরাক্রম।
 দেখিবেন পিতৃ-গুরু, এ ভূজ বিশাল
 অর্জুনের, অর্জুনের এই বক্ষ মম,
 প্রদীপ্ত পার্শ্বের বীর্যো শোণিত আমার ;

এ ধনু গাওঁব শিশু, এ তুণীর মম
 অক্ষয় তুণীর-পুত্র, পূর্ণ বজ্র জালে,—
 অর্জুনের অস্ত্র-শিশু, বিষধর-শিশু
 পিতৃসম তীর বিষধর । দেখিবেন দ্রোণ
 এই ধনু, এ তুণীর, এই শরজাল,
 অর্জুনের পরাক্রম অরাতির কাণে
 পারে কহিবারে বজ্র নিখোঁষে ভীষণ ;
 পারে লিখিবারে উগ্র অনল অক্ষরে
 অরাতির বৃকে । নাহি থাকুন অর্জুন,
 দেখিবেন দ্রোণাচার্য্য, অর্জুনকুমার
 করিবে বিফল আজি প্রতিক্কা তাঁহার ।
 তুচ্ছ এক মহারথী, মহারথী দশ
 হয় যদি হত আজি, তথাপিও দ্রোণ
 ধর্ম্মরাজ-কেশাগ্রও ছুইতে কখন
 নাহি পারিবেন । শ্রিয়ে ! কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ
 একে একে আজি বণে করি পরাজিত,
 রাখিব ক্ষত্রিয় কূলে কীৰ্ত্তি অহলিত ।
 কিন্তু সাতজনে যদি করে আক্রমণ ?

অভিমন্যু উচ্চ হাসি উঠিলা হাসিয়া—

“এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ; জাতিতে কেশরী
 ক্ষত্রিয়েরা, এই নীচ বৃত্তি শৃগালের
 নহে কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের । আসে সপ্ত জন,
 আসে সপ্তদশ জন,—কি ভয় উদ্ভবে ?
 একা সিংহ নাহি ভরে শিবা অগণন ।”

বাজিল সমর বাজ বিজয় বাজারে
 শিবিরের দ্বারে । বেগে ছুটিয়া কুমার,

বাম করে শেল, ধরি প্রেম প্রতিমা
 হৃদয়ে দক্ষিণ করে চুইলা চুষন,
 প্রভাত নলিনী যেন চুইলা অরুণ ।
 মুহূর্তের সে চুষনে কি অনন্ত ভরা !
 কি অনন্ত প্রেম-তৃষ্ণা নীরব-মুখরা !
 কি অনন্ত সুখ দুঃখ, কি অনন্ত ভাষা !
 কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা !
 হুই হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র সন্নিগন,
 হুই সমুদ্রের ক্ষুদ্র অনন্ত সঙ্গম !
 সেই ক্ষুদ্র পথে কিবা উজ্জ্বল অপার,
 উভয়ে উভয় প্রাণে করিছে সঞ্চার ।
 উর্দ্ধ মুখে অধোমুখ—শোভিছে কেমন,
 চক্স জলধির যেন শেষ দরশন
 পূর্ণিমা উষায় ! ধীরে ধীরে উত্তরায়
 সরাইয়া অভিমুখ্য, যথা জ্যোৎস্নায়
 সরায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ পূর্ণিমা প্রভাতে,
 খুলিল শিবির দ্বার ছুটিলা কুমার,
 ছিড়িয়া অজ্ঞাতে কণ্ঠহার উত্তরার
 শেলাঘাতে । বজ্রঘাতে বুক উত্তরার
 হইল চূর্ণিত, বামা রহিল চাহিয়া
 বজ্রাহতা মত হিরা শূণ্য নিরখিয়া ।

সংশ্লুক যুদ্ধে গত বীরেন্দ্র কান্তিনি,—

খানদা হুভদ্রা মাতা বসিয়া পূজায়
 পতির মঙ্গল ব্রতে । পশিয়া কুমার
 সবেগে শিবিরে, হির রহিলা চাহিয়া
 মুহূর্ত মাঘের মূর্তি নয়ন ভরিয়া ।

ঘাটে বণ-বাণ, কক্ষে অস্ত্র স্বনংকার,—
 ভুল্লিত ভদ্রার দ্যান । রাখিয়া ঔষধীষ
 মায়ের চরণ তলে, প্রণমি কুমার
 কহিলা—“মা ! দ্রোণাচার্য্য ঘোরতর রণ
 করিছেন চক্রবৃহ করিয়া নিশ্চাণ ।
 পিতার অবিভ্রমানে, সেনাপতি পদে
 ধর্ম্মরাজ এই দাসে করিলা বরণ ।
 দেও মা ! বিদায় রণে, কর আশীর্বাদ,
 আছি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
 অর্জুনের পুত্র আমি সুভদ্রা-নন্দন,
 গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য । স্বধর্ম্ম পালন
 করি, ধর্ম্মরাজ্য আঁজি করিব স্থাপন ।”

গিয়াছেন পতি, পুত্র যাইছে, সময়ে
 দুর্জয় সঙ্কট পূর্ণ ; আগিছে হৃদয়ে
 শৈলজার প্রতিবেদ, অমঙ্গল ছায়া,
 স্থির সরোবর বক্ষে ছায়া জলদেব,—
 তথাপি একটি বেগা মুখে রূপান্তর
 হইল না সুভদ্রার । রহিলা চাহিয়া
 প্রাণাধিক পুত্র পানে স্নেহ ছল ছল,
 স্বর্ণ-দেবী-প্রতিমার মত অবিচল ।

বুকিলাম হইয়াছে পাণ্ডব বাহিনী,
 কৃষ্ণার্জুন বিনা, যেন বিপন্ন তরলী
 সিদ্ধগর্ভে ঝটিকাঘ নাবিক-বিহীন ।
 হইয়াছে পাণ্ডবের মহা সৈন্য হায় ।
 যেন মহারথ রথি-সারথি বিহীন ।
 রুকের ভাগিনা তুই, শিষ্য প্রিয়তম,

অর্জুনের পুত্র তুই, নিজে মহারথী,
 নির্ভয়ে ধরিয়া কণ, আরোহিয়া রথে,
 হেলায় সমর সিদ্ধ করি অতিক্রম,
 আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার !
 নারীকুলে ভাগাবতী কে আছে এমন
 তোর জননীর মত ? ভ্রাতা নারায়ণ,
 পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
 মহারথী, ধর্ম্য ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,
 জগতের এই মহাক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
 আজি পুত্র ক্ষেত্রপতি ! শোভিছে তাহার
 গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক !

আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
 বীর-জমনীর বক্ষে ; বহিতে লাগিল
 জীবন্ত ঔৎসাহ ধারা শক্তি-সঞ্চারিণী
 পুত্রের হৃদয়ে, পুত্র হইল বিহ্বল ।
 পুষ্পপাত্র হ'তে নিয়া চাক পুষ্পহার
 দিলা কুমারের গলে সন্মিত বদন ।
 কুমার মায়ের বৃকে রাখিয়া বদন
 রহিলা নীরবে, মাতা নীরব সজল,
 কি উচ্চ উচ্চাসে পূর্ণ হৃদয় যুগল !

সুভ । পিতৃ গুরু দ্রোণ, অতি সাবধানে

বাছা রে । করিস্ রণ ।

না করিস্ তুচ্ছ, হয় যদি শত্রু

অতি ক্ষুদ্র ভ্রূণোপম ।

করি আশীর্বাদ,— সুভদ্রার বৃক

হইবে কবচ তোর ;

সুভদ্রার অঙ্ক হবে তোর বথ ;

শত্রু শরজাল ঘোর

হবে সুকুমার যেন সুভদ্রার

মেহ মাখা পুষ্পহার ;

হৃদয়ে গোবিন্দ, বাহুতে অর্জুন,

লক্ষ্য নর-সমুদ্রার ।

সমর প্রাঙ্গণ স্বয়ংবর সভা

হইবে, যাহু অ্যমার !

জয় লক্ষ্মী আজি হইবে সপত্নী

মম বধু উত্তরার ।

চুম্বিলা ললাট আবার আবার

আদরে লইয়া বুকে ;

কি করিছে হায় । মাঘের পরাগ

চিহ্ন তার নাহি মুখে ।

মাঘের চরণে প্রণমি কুমার

চলিল সমরে স্তম্বে ;—

শিরায় শিরায়, কি অজ্ঞেয় বল,

কি বীৰ্য্য জলিছে বুকে ।

সুভদ্রে ! সুভদ্রে ! কই ? মম বাছা কই ?”

পাণ্ডব শিবির খুজি, খুজি অজ্ঞাগার,

সত্রাসে শিবির পুনঃ খুজি উত্তরার

উন্মাদিনী উর্দ্ধ্বাসে আসি স্থলোচনা

ধরিল কুমারে, অস্ত্রে পড়িল বননা ।

কহে গলা জড়াইয়া ধরি স্থলোচনা,—

“কোথায় বাবি রে যাহু ।”

“যাব না কোথায়”—

চাপিয়া কণ্ঠের বাষ্প, অশ্রু নয়নের,
বহে অভিমত্যা—“আমি যাব না কোথায় ।
তোরে ছেড়ে কোথাও কি পারি মা ! যাইতে ?
তোরে ছেড়ে যাই যদি, স্বর্গেও আমার
হইবে না সুখ, স্বর্গ কোথা আছে আর ?
তোর মুখ, তোর বুক, স্বর্গ যে আমার ।”

সুলো । তবে কেন বর্ণ-বেশ ?

অভি । . . . চাহি একবার

দেখাইতে দ্রোণাচার্য্যে স্তম্ভে স্থলিমার
কত শক্তি, কত শক্তি ক্ষীরে সরে তার ।

সুলো । না না, আজি রণে আমি প্রাণান্তে কখন
দিব না যাইতে তোরে । যাবি যদি আগে—
বসাইয়া অসি তোর স্থলিমার বৃকে
যা রে চলি ! যাবি যদি মরিবে নিশ্চয়
এ অভাগী, মাতৃহত্যা ঘটিবে রে তোর ।

অভি । ছি ! মা ! হেন অমঙ্গল কথা কদাচিত
আনিস্ না মুখে । তুই গেলে মা ছাড়িয়া,
কে দিবে রে সর ননৌ অভিরে মা । তোর ?
কে দিবে তাহারে অন্ন ? কে পূরিবে তারে
এত স্নেহ ? কে কাঁদিবে যুদ্ধযাত্রাকালে
পবিত্রিয়া বর্ণ-বেশ নয়নের জলে,
শত্রু-শরজাল ঘেন না পাবে ছুঁইতে ?
গলায় বরণ মালা, ললাটে তিলক,—
দেখ যা নয়ন ভরি ! কি গৌরব তোর,
পাণ্ডব সৈন্তের আজি সেনাপতি আমি !
কি গৌরবে আজি যম অসি সমুজ্জল ।

না যাই সময়ে যদি, কি কলঙ্ক মা গো
 রটিবে আচল্ল্য স্বর্ঘ্য ! সহিবি কেমনে ?
 অভিমন্যু পুত্র তোর সহিবে কেমনে ?
 স্থলো । আমার এ বাণস্বর্ঘ্যে কার সাধ্য করে

কলঙ্কের কালিমা অর্পণ ?

সহস্র কলঙ্ক যদি হয় তোর, হবে তাহা
 অভাগীর অঙ্গের ভূষণ ।

কহিস্ লোকের কাছে,— গোপকন্ঠা স্থলোচনা

সম্মল তাহার ননী সর,

সর ননী সম প্রাণ নাহি জানে বীর ধর্ম,

নাহি দিল করিতে সমর ।

বাক্ তার পোড়া মুখ আরো পুড়ি, তবু তুই

থাক বুক অঙ্ক যুড়ি তার ।

কলঙ্ক-ভঞ্জন কৃষ্ণ দিলা ঘাবে পদ-ছায়া,

কলঙ্কে মা ! কি ভয় তাহার ?

আছে দেবী সুভদ্রার দেব পতি, দেব ভ্রাতা,

কর্মক্ষেত্র অনন্ত সংসার ।

স্থলোচনা ছাঃধিনীর কে আছে, কি আছে আর ?

একা তুই সর্বশ্ব তাহার ।

তুই ধর্ম, তুই কর্ম, তুই প্রাণ, তুই মর্ম,

তুই অবলম্বন আমার ।

তোর চন্দ্রমুখ স্বর্গ, তোর গৃহ কর্মক্ষেত্র,

তুই মম সকল সংসার ।

আজন্ম অনাথা আমি, জানি কৃষ্ণার্জুন স্বামী,

সত্যভামা সুভদ্রা কঙ্গিণী

আমার ভগিনী তিন, তুই এক মাত্র পুত্র,
 আমি তোঁর যশোদা জননী ।
 বড় সাধ বৃন্দাবনে নিয়া তোঁরে সাজাইব
 বনমাল্যী গোপাল আমার ;
 হয়েছিল কৃষ্ণরূপে বিমোহিত বৃন্দাবন,
 গৌর রূপে মোহিত আবার ।
 কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবন কাদিতেছে নিরন্তর,
 গৌর রূপে উচ্ছ্বসিত প্রাণ
 হাসিবেক স্বর্ণ হাসি, ক'লিন্দী হইয়া গৌরী
 মন সুখে বহিবে উজান ।
 না, না, জদয়ের নিধি ! চিরি অভাগীর বুক
 আজি রণে যাইতে কখন
 দিব না দিব না তোঁরে, না জানি আমার প্রাণ
 আজি কেন করিছে এমন !
 অতি । কেন মা নিতা ত রণে যাইতেছি, কোন দিন
 করিস্ নি এমন বারণ ?
 স্নেহে । ছিল কৃষ্ণ ধনঞ্জয় করিবারে রণ-ক্ষেত্রে
 অভাগীর শবক বক্ষণ ।
 তাহাতে দ্রোণের আজি প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
 দুর্কিঞ্জয় চক্রবাহ, দুর্নিবার রণ ।—
 আজি রণে যেতে তোঁরে দিব না কখন ।
 অতি । অর্জুনেব পুত্র আমি, স্তভদ্রা-কুমার,
 কৃষ্ণের ভাগিনা শিষ্য, কি ঘৃণা মা ! তুই
 ভরিস্ ব্রাহ্মণ দ্রোণে । ভাবিস্ কেমনে
 সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ দ্রোণে ফেলিবে উপাড়ি
 এই শাল বৃক্ষ তোঁর পালিত বর্দ্ধিত ?

যাদব পাণ্ডব শক্তি, যমুনা জাহ্নবী,
 মিলি জননীর গর্ভে, প্রয়াগে যেমতি,
 বহিতেছে এই ভূজে ধারা সন্মিলিত,—
 দ্রোণের কি সাধা, গতি রোধিবে তাহার ?
 একা পার্থে, একা কৃষ্ণে, ডরে বৃদ্ধ দ্রোণ ;
 একাধারে কৃষ্ণার্জুন দেখিবেন আজি ।
 দেখিবেন পার্থ রথী, গোবিন্দ সারথী,
 একাধারে মম রথে ; এই ভূজে মম
 হর্জয় পার্থের বল, শিক্ষা গোবিন্দের ।
 তুচ্ছ দ্রোণ ; বিশ্বজয়ী পিতা ও মাতুল
 আসেন সমরে যদি, নাহি ডরি আমি ।
 একা পার্থ, একা কৃষ্ণ, পারে জিনিবারে
 ত্রিভুবন এক রথে, কে সহিবে তবে
 কৃষ্ণ-পার্থ-সন্মিলিত পরাক্রম মম ?
 তুচ্ছ চক্রবাহ, ওই বালির বন্ধন,
 উড়াইয়া মুহূর্ত্তে মা ! সিদ্ধ-পরাক্রমে
 প্রবেশিব দ্রোণ-সৈন্তে মহা সিদ্ধ বেগে
 উদ্বেলিত, ভাসাইয়া বালি তৃণ মত
 অরাতির অনীকিনী, রথী, মহারথী,
 দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য । করিব না আমি
 পিতার প্রতিজ্ঞা বার্থ, বধিয়া পরাণে ।
 মরণ অধিক বৃদ্ধে হইয়া লাক্ষিত
 পলাইবে দাঁতে তৃণ লইয়া কেমনে,
 গুনিয়া হাসিবি তুই, হাসিবে জগত ;
 অনন্ত কালের স্রোতে বহিবে সে হাসি ।
 ওই তনু । ওই তনু । ওই সিংহনাদ

কোরবের, পাণ্ডবের ওই হাহাকার ।

• ছেড়ে দে মা ! ছেড়ে দে মা !

ঘোর হাহাকার

উঠিল পাণ্ডব সৈন্তে,—“কুমার ! কুমার !

হায় ! হায় ! আজি দ্রোণ করিবে সংহার।

সমস্ত পাণ্ডব সৈন্ত।” নক্ষত্রের বেগে

ছাড়াইয়া ধাত্রী-কর ছুটিলা কুমার,

বাজিল সমর-বাণ বিজয় বঙ্কার ।

‘স্বলোচনা ভূমিতলে হইল পতিতা

বন্ধনবিহীনা স্বর্ণ-প্রতিমা, মূচ্ছিতা ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

—*—

বারের শোক ।

—*—

ভারতের—জগতের—এবে অবসান

মহাদিবা ।—কি শোকের কি স্বথের দিন ।

মানব পবিত্রকারী এই মহা শোক ;

এই শোক মানবের স্বথের সোপান ।

অবসান ? না না, এই দিবসের নাহি

অবসান । ব্যাপি চাতি যুগ, মহাকাল

নিবিড় তিমিরাক্ষয়, এই দিবালোক

অলিতেছে, অলিবেক ;—ঘোর অন্ধকার

কাননের পথে ফুল জ্যোৎস্নার হার ।

সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ

ফিরিতেছে ধীরে ধীরে ; শোকভারে রথ

ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয় ।

কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে

প্রশান্ত ললাট স্বর্গে, নাহি সেই ছায়া ।

পড়ে মেঘ-ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর ;

অতল জলধি বক্ষে ঘায় মিশাইয়া ।

“হা কেশব ! এ ছিল কি নিয়তি আমার !” —

বাপ্প-গদ-গদকণ্ঠে কহিলা ফাস্তনি,—

“তব নারায়ণী সেনা, অতুল জগতে,

এরূপে অর্জুন হয় ! করিবে সংহার !

সত্য, দেব বৈপায়ন ! বুঝিলু আবার—

মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার !”

“বৃথো অনুতাপ পর্থ !” প্রশান্ত বদনে

উত্তরিলা নারায়ণ,—“সেনা নারায়ণী

সাধিবারে নারায়ণ-কার্য্য ধরাতলে

হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ-কার্য্য

এই দীর্ঘকাল, আজি জলবিষ রাশি

মিশাইল মহাজলে ইচ্ছা তঁাহার ;—

গাণ্ডীবি গাণ্ডীব মাত্র করিতে তঁাহার ।

এখনো বুঝিলে নাকি, ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের,

কৌরব পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,

ইচ্ছা তাঁর । অধর্ম্মের যেই মহা বিঘে

ক্ষত্রিয়ের রক্ত মাংস মজ্জা অর্জুরিত,

কার সাধ্য সেই বিষ করিবে উদ্ধার ?

এখনো বুঝিলে নাকি, হায় ! ক্ষত্রিয়ের
ধ্বংস বিনা ধর্ম-রাজ্য হবে না স্থাপিত ;
নিম্ব বৃক্ষে আশ্রয় নাহি ফলিবে নিশ্চিত ।”

ধীরে চলিয়াছে রথ । নাহি ক্ষুদ্র পথ
কুরুক্ষেত্রে : মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানব শবে, - দৃশ্য করুণার !
কেহবা নিদ্রিত ঘেন, প্রশান্ত বদন, --
কেহ দস্তে*ওষ্ঠ কাটি, বর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে, মুণ্ডিবদ্ধ কর, --
কেহ দস্তে তৃণ কাটি আগিঙ্গি বনুধা—
পড়ে আছে স্থানে স্থানে শোণিত বর্ধমে !
কারো অস্ত্র-ক্ষতে হায় ! বলকে বলকে
এখনো শোণিতধারা বহিতেছে বেগে,
অঙ্গে অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিধিয়া ।
জীবিত আহত কোথা করি নিষ্পেষিত
ছুটিতেছে পড়িতেছে ক্ষিপ্ত অশ্ব গজ
অঙ্গহীন শত শত, পুরি রণ-স্থল
ভীম নাদে মহামুখে । কোথায় আহত
শত শত চাহিতেছে উঠিতে, চলিতে,
—হস্তহীন, পদহীন, ছিন্ন কলেবর,—
করিতেছে হাহাকার ব্যথায় ব্যাকুল ।
ছিন্ন হস্তে পদে শিবে, কবন্ধ শরীরে,
ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব গজে,
আচ্ছন্ন সমর-ক্ষেত্র ক্রোশ ক্রোশান্তর ।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
করি ঘোর কোলাহল করিছে তক্ষণ

অভিন্ন জীবিতে মৃত্যে । সায়াহু গগনে
 আহতের আর্তনাদ,—ডিঙ্কা করুণার,
 হিংস্র পশু পক্ষীদের ঘোর কোলাহল,
 ভীষণ চীৎকার ক্ষত গজ তুরঙ্গের,
 মিশি এক ঘোর রবে, বধে প্রলয়ের
 উঠিছে কি হাহাকার ! কিবা হাহাকার
 সায়াহুর সমীরণে যাইছে ভাসিয়া !

অবতারি স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
 আহতের ক্ষতে করি অমৃত সিঞ্চন,
 করি মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বরিষণ,
 চলিলেন অশ্রুজলে প্লাবিতা বদন ।
 সর্বত্র আহতগণ জিজ্ঞাসে ডাকিয়া—
 “আজি কোথা আমাদের স্বভদ্রা জননী ?
 যন্ত্রণায় যার প্রাণ ।” কহিলেন পার্থ—
 “কেন আজি স্বভদ্রায় সেবক, সেবিকা,
 সৈন্ত-চিকিৎসক সহ, না দেখি, কেশব !
 রণস্থলে ? প্রাণ বড় হয়েছে আকুল ;
 সত্বর শিবিরে চল, আসিব ফিরিয়া
 স্বভদ্রার সহ পুনঃ । কি যে ঘোর রণ,
 ধ্বংসের ভীষণ ক্রৌড়া, হইয়াছে আজি !—
 না পারি দেখিতে আর । পাণ্ডব-সৈন্তের
 এই দশা ! নাহি জানি সৈন্তে কোরবের
 হইয়াছে অস্ত্রে যম কি দশা ভীষণ !”

চলিতে লাগিল রথ । বসি অন্তর্যম
 উভয় সারথি, রথী ; অজ্ঞাতে কেমনে
 পড়িয়াছে চক্র এক দেহে অচেতন,—

অভাগা করুণ কণ্ঠে করিল চীৎকার ।
 উভয় করুণ কণ্ঠে করিয়া চীৎকার
 পড়িলেন ভূমিতলে, লইলেন তুলি
 রথে পুনঃ—অচেতন দেহ অভাগার ।
 “কোরব সে”—সৈন্ত কেহ কহিল বিষয়ে ।
 প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মুখে, কণ্ঠে করুণার
 কহিলেন কৃষ্ণ—“ভাই ! শত্রু বৃদ্ধকালে
 কোরবেবা, বৃদ্ধ অস্ত্রে ভাই পাণ্ডবেব ।
 ঋটিকায় যে তবঙ্গ উত্তাল ফেরিল
 মহাধন্বী, ঋটিকাস্ত্রে অভিন্ন সজিল ।”
 অবার চলিল রথ । নীরব উভয়
 রহিলেন কিছুক্ষণ । কি অজ্ঞাত শোকে
 ছুইটি হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, অচল ।
 সাক্ষ্যকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয়
 কহিল—“কেশব ! কেন হৃদয় আমার
 ভীত আজি, মরু সম বিগুহ্ব বদন,
 কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ ?
 বুঝিয়াছি নিঃকল্লিষ করিতে জগত
 জন্ম মম । করিয়াছি আত্মীয় বিনাশ
 সে নিয়তি অহুসরি ত্রয়োদশ দিন ;—
 হয় নাই প্রাণ মম কাতর এমন ।
 কি যে অমঙ্গল ধ্বনি বাজিছে শ্রবণে,
 অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস
 তৃষ্ণাতুর অবসন্ন পথিকের কাণে !
 কি যে অমঙ্গল দৃশ্য মনের নয়নে
 ভাসিতেছে, অবসন্ন নেত্রে পথিকের

অনন্ত উত্তপ্ত যেন মরু বিভীষণ !
 চক্রবাহ করি, হায় ! হর্ষিভয় দ্রোণ
 করিলা কি ধর্ম্মরাজে বন্দী আজি রণে ?
 কিংবা অভিমত্যা তব আছে ত কুশলে ?
 দেখিতে তাহার মুখ, প্রীতি পুষ্পবন,
 আজি কেন প্রাণ মম কাতর এমন ?
 চাপি অমঙ্গল চিন্তা স্থিরকণ্ঠে ধীরে
 কহিলেন বাসুদেব,—“আছেন কুশলে
 ধনঞ্জয় ! মহারাজ অমাত্য সহিত ।
 হর্ভাবনা কর দূর । মঙ্গল-নিদান
 করিবেন তোমাদের অজস্র কল্যাণ ।”

উত্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র । নক্ষত্রের বেগে
 চলিতে লাগিল রথ । দেখিলা অদূরে
 জুই জনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
 আভাহীন শোভাহীন বিজয়া-প্রদোষে
 যেন শূত্র পূজাগৃহ নিরানন্দময় ।
 আকুল হ্রদয়ে পার্থ কহিলা,—“কেশব !
 বাজে না মঙ্গলভূরী, হৃন্দুভি, পটহ ;
 নীরব মুরজ বীণা । পরাভবি সংশপ্তক
 আসিতেছি, কই নাহি গায় বান্দগণ
 অগ্রসরি স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল সঙ্গীত ।
 পুত্র-নারীগণ নাহি গবাক্ষ-ছায়া
 ঝাড়াইয়া শিবিরের দেয় হনুধ্বনি,
 করে পুষ্প বরিষণ । কই পুত্রগণ,
 কই অভিমত্যা কই, আসে না ছুটিয়া
 প্রীতিপূর্ণ মুখে করি প্রীতি সন্তাষণ ।

নারায়ণ !” — অর্জুনের ভিজিল নয়ন,—

“পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরঞ্জন !”

চক্রবাহ মহা ক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহা হর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ । জন-শ্রোত বেগে
ছুটিয়াছে একশ্রোতে সেই হর্গ পানে ;—
ছুটিল বিহ্ব্যৎবেগে, রণ সেই দিকে ।
কহিলা কেশব,—“পার্থ ! চক্রবাহ করি
আজি যুঝিলেন দ্রোণ ; সেই চক্রবাহ
হইয়াছে শব-বাহ দেখ কি ভীষণ !
স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর,—
রথের উপরে রথ, শব তত্পর,
হুর্ভেদ প্রাচীর মত শোভিছে কেমন !
কোন বীর-মণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্তিমালা পরিল গলায় !
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীৰ্য্য দেখিনি কখন ।”
আর চলিল না রথ ; পড়িলা ভূতলে
লক্ষ দিয়া হুই জন ; করিয়া লজ্বন
উদ্ধ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্তগণ উঠিল কাঁদিয়া ।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর ।

শব-চক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব সৈন্ত, উশ্মির মতন
উদ্বেলিত মহা শোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তুণ ।

রথী মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
 কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
 সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকর তলে ।
 বাণ-বিদ্ধ মীন যত পাণ্ডব সঙ্কল
 করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে ।
 মুচ্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ ।
 কেন্দ্রস্থলে অভিমুখ্য, শরের শয্যায়,—
 সিদ্ধকাম মহা শিশু ! ক্ষত কলেবর
 রক্তজবা সমাবৃত ; সন্নিহিত বদন
 মায়েব পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
 —সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
 নিজ্রা যাইতেছে স্বখে । বক্ষে স্থলোচনা
 মুচ্ছিতা ; মুচ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
 সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত ।
 কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
 এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
 এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
 সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা স্তভদ্রাব ।
 চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়েব হৃদয়ে
 দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
 যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
 আদর্শ-বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা ।
 নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র । থাকিয়া থাকিয়া
 কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়েব অধর
 গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম । মুচ্ছিত অর্জুন
 পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ-বাহু প্রসারিয়া ।

উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—“অৰ্জুন ! অৰ্জুন !
 আমরা বীরের জাতি বীর-ধর্ম রণ।
 অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
 করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
 এক বিন্দু শোক-অশ্রু। তুমি
 বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির বন্ধার।”
 মুহূর্ত্ত অগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত।
 হইয়া বিদীর্ণ তবে, মুহূর্ত্ত বর্ষিয়া
 তরল শোকাগ্নি, বেগে বসিতে লাগিল
 বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
 “অসি ! অসি !”—বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
 —বিদীর্ণ অগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক,—
 “বসাইব কার বকে কহ, মহারাজ ?
 অৰ্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বল ?—
 প্রহরিল এই বজ্র হৃদয়ে তাহার ?
 কেশব, পার্থে, আহা ! দেবী সুভদ্রার
 হৃদয় বিদীর্ণ করি, হৃদয়ের ধন
 কে হরিল এইরূপে ? দেব-প্রতিভায়,
 বিক্রমে, মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে, অভিমত্বে মম
 কেশবের সম সঙ্গ, রথি-গণনাথ
 আমার অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধগুণে ;
 হেন মহাবাহু পুত্রে কে জিনিল রণে ?
 ওই দেখ ভূপতিত আদিত্যের মত
 মণ্ডিত কিরণজালে, শোভে পুত্র মম
 বিমণ্ডিত শরজালে ! সন্মিত বদনে
 কুক্ষিত কেশান্ত মূঢ়, ক্রয়ুগ বক্ষিয,

স্থির নিমীলিত মৃগ-শাবক নয়ন,
 সমুন্নত কলেবর শালবৃক্ষ সম,
 মৃত্যুরো ছায়ায় দেখে শোভিছে কেমন !
 স্মদর্শন সংরক্ষিত অমৃত ভাণ্ডার
 হরিল কি মৃত্যু আজি ? হা পুত্র আমার ।
 তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরা,
 মৃত্যু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার ।
 জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
 হইল পূর্বাহ্নে অস্ত ? কবিতা জ্যোৎস্না
 অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায় ?
 নরলোকে নিকরপনা সঙ্গীতের বীণা
 নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্চ্বাসে ?
 প্রকৃতির অতুলিতা তুলী বিনোদিনী
 পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম অভাসে ?
 হায় ! মাত বশীকরে ! প্রকৃতি জননি !
 ক্ষত্রিয়ের কুল-লক্ষ্মি ! এ দারুণ শোক
 তোমরা পার্থের মত সহিবে কেমনে ?
 উঠ বৎস ! উঠ ! না, না, নাহি মৃত্যু তোমার ।
 দেবীপুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের,
 দেবশিশু তুই, ওরে করিতে প্রচার
 জগতে দেবত্ব তোমার জন্ম ধরাতেলে ।
 দেবতার নাহি মৃত্যু । উঠ বৎস ! উঠ !
 অচেতনা দেবীমাতা বসিয়া শিয়রে ;
 অভাগিনী স্নানোতনা বক্ষে অচেতনা ;
 অচেতনা পদতলে আনন্দ প্রতিমা
 আমার উত্তরা বধু । নিজে নারায়ণ

দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি,—
 কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটে বে তোর ।
 উঠ বৎস ! উঠ ! এই পাপ ধরাভলে
 এখনো ত ধর্মরাজ্য হয় নি স্থাপিত ।
 মানব-উদ্ধার বৎস ! হয় নি সাধিত ।
 উঠ বৎস ! উঠ ! চল পিতা পুত্র মিলি
 এখনি পশিব রণে, নিশীথ আইবে
 বিনাশিয়া কুরুকুল, অধর্ম-থাণ্ডব
 পোড়াইয়া অস্থানলে ;—ভীষণ কানন,—
 ধর্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে করিব স্থাপিত ।
 রাজ্যও সময় বাঙ ! সাজ সৈন্তগণ ।
 চল সখে ! পিতা পুত্র আজি এক রথে
 যুজিব, নাশিব শত্রু ; করিব স্থাপিত
 ধর্মরাজ্য ; উদ্ধারিব নর নিপতিত ।”
 শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় ঘাইতে ছুটিয়া
 অশ্রুফলি গাণ্ডীব অসি, ধরিতা কেশব,—
 জ্ঞানবক্ষে শোকবেগে হইল রোষিত ।
 “এই বিশ্ব লীলাভূমি”—গদ গদ স্বরে
 কহিলেন নারায়ণ,—“বিশ্বনিয়ন্তার,
 নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র । জড় ও চেতন
 আসে এই বস্তুভূমে, হয় তিরোধান,
 করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে ।
 জলিছে নিবিছে দীপ আলোকবিদ্যা গৃহ
 ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য্য গৃহস্থের,—
 আলোক প্রদান, পার্থ ! নিয়তি দীপের ।
 আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ ।

আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার ।
 জন্মিতেছি, মরিতেছি নিয়তি আমার ।
 পালিতেছি এই রূপে জন্ম জন্মান্তরে
 নারায়ণ লীলাভূমে, কুজ চক্র আমি
 সেই মহা লীলাযন্ত্রে, নিয়তি পালন
 সুখ মম, ধোর শোক নিয়তি লজ্বল,—
 ধনঞ্জয় ! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার ।
 দেখ বৎস সাধি বীর-নিয়তি তাহার
 মানব উদ্ধার ত্রতে, ত্রতে নিয়তার,
 লভিয়াছে সুখ-নন্দা কোলে জননী
 শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী । নহে শোক-অশ্রু
 ধনঞ্জয় ! আনন্দ-শ্রু কর বরিষণ ।
 তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রার
 সার্থক জীবন । আজি ধৃত জগতে
 দুই মহা কুল : দুই শক্তি স্রে তনুতী
 অভিমত্ব বীরদর্পে করি সম্মিলিত,
 করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত !
 কর শোক পরিহার ! করি অনুসার
 চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
 এইরূপে ! দুই জনে লভি নিঃবাণ ।*
 ধনঞ্জয় শোকবেগ করি সম্বরণ
 পুত্র-সারথির পানে চাহি ভিজ়া সীমা—
 *বহু স্মৃত ! কোন্ মতে করি মহারণ
 লভিল এ মহা শয্যা কুণ্ডল আমার ?
 “ওকি দেখা য'র !”—তন্তে কহিলা সারথি,
 চমকিল শ্রোতৃগণ আতঙ্কে বিম্বয়ে—

শুকি দেখা যায় ওই স্থির, বিভীষণ !—
 তুরঙ্গে বিনির্মিত, অঙ্গে ঝলসিত,
 কণ্টকিত যেন ঘন অটবী-সজ্জিত,
 ভাস্কর-প্রদীপ্ত দূর-অদ্ভি-শ্রেণী মত !
 ওকি চক্রবাহ ? মনে মানিয়া বিশ্বয়
 কহিলু,—“কুমার ! হ'য় ! লজ্জিবে কেমনে
 —এখনো বালক তুমি, এ বাহ ভীষণ !”
 হাসিয়া কেশরি-শিশু কহিলা নির্ভয়ে—
 ‘খেলিয়াছি এত দিন, করি নাই রণ।
 আজি সবিস্ময় হুত ! দেখিবে জগত
 “অৰ্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের ।”
 কালের প্রস্তর বক্ষে আজি অসিধারে
 লিখিব কোরব বক্ষে অমর-অক্ষরে,—
 অৰ্জুনের পুত্র আমি শিষ্য গোবিন্দের !
 লইলা রথের বশি করে আপনাব,
 ইরম্বদ বেগে রথ ছুটিল তখন ।
 দেখিলাম বজ্রাঘাতে মহা শৈলমালা
 হয় যথা বিচূর্ণিত, হইল চূর্ণিত
 কুমারের অঙ্গে চক্রবাহের প্রাচীর ।
 বিদারিয়া ছত্কায়ে শৈল অবরোধ
 ছুটি যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে,
 ফেনিল তরঙ্গে সিদ্ধ করি প্রকম্পিত,
 মুহূর্তে বিদারি চক্রবাহ পরাক্রমে,
 উড়াইয়া মহা বেগে, তৃণ-মুষ্টি মত,
 মত্ত করি সিদ্ধরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
 পশিল কুমার কুরু-সৈন্তের সাগরে

উৎকোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত,
 বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর ।
 শোভিতেছে চক্রাকারে চতুরঙ্গ বেলা
 মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথে, সৈন্তে স্তরে স্তরে,
 অচ্ছন্ন আয়ুধারণ্যে, ধ্বজ পতাকার
 কলসি মার্ভণ্ড করে বনরাজিলীলা ।
 বহির্দৃশ্য অন্তর্মুখে সৈন্ত দুই মুখে
 স্তম্ভজিত ; মহাবনে শৈলশৃঙ্গ মত
 মহারথে মহাবতী দর্পে স্থানে স্থানে
 রক্ষিতেছে মহা বৃহ ; হইতেছে রণ
 বহির্ভাগে ঘোরতর, হইতেছে আর
 পাণ্ডবের হাহাকারে বিদীর্ণ গগন ।
 মুহূর্তে অন্তর-সিন্ধু নীরব নিশ্চল ।
 মুহূর্তে কুমার-বীৰ্য্য প্রভঞ্জন দর্পে
 বহিল জলবিগর্ভে, জগধি-নির্বোধে
 ধ্বনিল বিজয় শব্দ, প্রতিধ্বনি তুলি
 শত শত মহাশব্দে কোরব-বেসার ।
 কোরবের সৈন্তারণ্যে উঠিল জলিয়া
 ছুছকারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের ;
 কোরবের হাহাকারে ছাইল গগন ।
 দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
 বৃহদল, ছশাসন, শল্য—একে একে
 করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্চিত,
 পলাইল বার বার শৃগালেব মত ।
 কোরব-ভ্রগতি দেখি কুমার লক্ষণ
 পশিলে আহবে, হাসি স্তম্ভদ্রা-নন্দন

কহিলিা ডাঁকিয়া স্নেহে,—ভাই রে লক্ষ্মণ !
 আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র নহে এ প্রাঙ্গণ !
 পিতার ছলান তুমি, আদরে পালিত
 স্নেহের শয়্যায়, শত সন্তোগের কোলে ।
 যে অনল দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা,
 না পারি সহিতে গেল পলাইয়া ত্রাসে
 বার বার, তুমি ভাই ননীর পুতুল
 কেন ঝাঁপ দিলে সেই ঘোর দাবানলে
 কেন তাত হৃষ্যোধন এইরূপে হায় !
 করিছেন আত্মঘাতী ক্ষত্রিয় জগত ?
 বিপুল পৃথিবী,—ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর ;
 বিপুল কোরব-রাজ্য ; কোরব পাণ্ডব
 ছুই ভাই ; এ ছয়ের হয় না কি স্থান
 এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে ছদিনের তরে ?
 নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার,—
 তুমি ভানুমতী-পুত্র আমি স্নভদ্রার ।
 এক ক্ষুদ্র আন্তরগে, গলাগলি করি
 থাকিতে পরম স্নেহে পারিব আমরা ;
 পারিব থাকিতে, স্বর্গে ইন্দ্রের মতন,
 মাতা ভানুমতী-অঙ্কে, মাতা স্নভদ্রার ।
 যাও সেই স্বর্গে, যাও শিবিরে তোমার !
 ‘ওরে ছুরাচার ! এত আশ্পর্কি রে তোর !’
 গর্জিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে তেয়াগিলা শর ।
 অনিচ্ছয়, অযতনে, কুমার তপন
 তেয়াগিলা প্রতি, অস্ত্র । কাটি অর্দ্ধ পথে
 লক্ষ্মণের শর, খেলি অগ্নি প্রতিঘাতে

ছুটিল আয়ুধ দৃষ্ট বিহাতের মত ।
 ডাকিলা কুমার ত্রাসে,—‘সম্বর লক্ষণ !’
 না পারিল সম্বরিতে দেখিলা যখন,
 আঁখি নাহি পালটিতে কাটিতে সে শর
 আপনি দ্বিতীয় অস্ত্র করিলা প্রেরণ ।
 প্রবেশিল পূর্ব শর লক্ষণ-গ্রীবায়
 যে মুহূর্তে, সে মুহূর্তে নিল উড়াইয়া
 সে শর দ্বিতীয় শর—কি শিক্ষা-কৌশল !—
 তবু ছিন্নগ্রীব ভূমে পড়িলা লক্ষণ ।
 এক লক্ষ্যে বধ হ’তে পড়িলা ভূতলে
 কে য’য় ছুটিয়া ওই ?—পার্থ । পুত্র তব ।
 পড়িলা লক্ষণ বক্ষে, শক্তিশেলে হত
 লক্ষণের বক্ষে যেন পড়িলা শ্রীরাম ।
 লক্ষণ ! লক্ষণ ! ভাই ! প্রাণের লক্ষণ !—
 শোকেতে অধীর শিশু কহিলা কাঁদিয়া,—
 ‘লও এই অসি ভাই ! হ’ন এই বৃকে,
 ছই ভাই এক সঙ্গে যাইব রে চলি,
 এক বৃন্তে ছই ফুল ফুটিব ত্রিদিবে
 নাশয়ন পদতলে ।’ মুছাইয়া অশ্রু,
 মৃত্যু-মুখে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলা লক্ষণ—
 ‘না না’ ভাই অভিমন্যু ! থাক তুমি ভাই
 নারায়ণ পদতলে ফুটিয়া এখানে
 পবিত্রিয়া।পিতৃ-কুল, মোহিয়া অগত ।
 হায় ! যেই পাপানলে ভস্মিছে কোরব,
 ভস্মিছে ক্ষত্রিয় জাতি, একটী পল্লব
 নাহি ছোঁয় যেন তব,—এই ভিক্ষা চাহে

নারায়ণ পদতলে মুমূর্ষু লক্ষ্মণ !'
 কুরুক্ষেত্র শোকক্ষেত্র । কিন্তু শোকতর
 দৃশ্য আরো ছিল ভাগ্যে ভাবিনি তখন ।
 বধিল শোকের বর্ষা ; জীমূত গর্জনে
 গর্জিছুঃশাসন আসি কহিল গর্জিয়া,—
 'ওরে কাপুরুষগণ । এখনো কি তোরা
 রেখেছিস এই পুত্র-হস্তায় জীবিত ?
 যা রে ছুরাচার শিশু ! যা রে রথে তোরা,
 লক্ষ্মণের সঙ্গী তুই হইবি এখন ।'
 আবার বাজিল রণ । দম্ভোলি-দর্শন
 ছুটিল আয়ুধরাশি । মুহূর্ত্তেক পরে
 নৈরব্বাপিত বজ্রমত গেল লুকাইয়া
 সংজাহীন দুঃশাসন । একে, একে,
 সপ্ত মহারথী পুনঃ পশিলা সংগ্রামে ।
 গর্জিয়া কহিলা কণ,—'কাপুরুষ-স্বত
 পিতা তোরা নগুংসক করিয়া আশ্রয়
 করে রণ লজ্জাহীন ; তোরা রণ-সাধ
 বড় হাশু কর । শুধু স্নেহেতে কেবল
 এতক্ষণ তোরা আমি রেখেছি জীবন
 যা চলি এখন আমি দিলাম অভয় ।'
 'তাত কণ ।'—হাসি শিশু কারল উত্তর,—
 'বড় দুঃখ, এ স্নেহের দিতে প্রতিদান
 অশক্ত এ ক্ষুদ্র শিশু । হইলে নিধন
 তোমরা আমার অস্ত্রে স্নেহ-বিনিময়ে,
 হবে পিতা পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
 তাই পলায়ন-পথ উন্মুক্ত এমন ।

'শিব না তরু আমি ; কিন্তু শাখাগণ
 তোমাদের কর রক্ষা,—পারিলে না হয় !
 রক্ষিতে লক্ষ্যে কেহ । দিতেছি প্রথম
 পিতৃ-নিন্দুকেরে দণ্ড, কর সম্বরণ ।'
 ছুটিল কাণক অস্ত্র কাক-পক্ষ-ময়,
 কুটিয়া কর্ণের কর্ণে অলক্ষিত বেগে
 রহিল ঝুলিয়া,—শল্য উঠিলা হাসিয়া
 অতঃপক্ষে কর্ণানুজ পড়িল ভূতলে ।
 শল্যানুজ এই রূপে শল্যের সম্মুখে
 হইল পতিত ; শেষে হইল পতিত
 মহারথী বৃহদ্বল ; ছয় রথী আর
 সিদ্ধু-বেলা-প্রতিহত লহরীর মত,
 দেখিলাম ক্রমে ক্রমে গেল লুচাইয়া
 তখন বাহিত নৈথে, ধন গীরজের
 বসিতে লাগিল মৃত্যু বরিবার মত,
 পড়িল কোরব-নৈথে মহা হাহাকার
 নিরুপায় সপ্তরথী একত্রে তখন
 —ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কাঁহিব কেমনে ?—

অক্রমল এক মাত্র শিশু অসহায়,
 অক্রমে নিষাদগণে শাদুল যেমতি
 জালাবদ্ধ,—বশুন্ধরে ! বাও রসাতল
 কর্ণ কাটিলেন ধনু ;—অশ্ব ভোজরাজ
 ছিন্নধনু, রথহীন, থল্লন চর্ম্ম ধরি
 রথ হ'তে লক্ষ্য দিয়া পড়িলে ভূতলে
 শত্রু মধো, মেঘ মধো ক্ষিপ্ত হিংহ যথা,—
 দ্রোণ অসি, কর্ণ চর্ম্ম, ফেলিলা কাটিয়া

তখন ধরিয়া চক্র, চক্রবৎ মত
 শোভিল কুমার তব । কাটিয়া অয়াতি
 আসিছে ফিরিষা চক্র করে কুমারের
 মুহুমূহ, খেলা করি বিছাতের মত ।
 বরষি অস্ত্র শর সপ্তংখী মিলি
 কাটিয়া সে মহাচক্র, বিধিলা শরীর
 ধীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন । সেই বীর-শোভা,
 পুষ্পিত কিংগুক সম কিঙ্কত মুরতি,
 কুকুটি-কুটিল-মুগ, আরক্ত নয়না
 আকর্ণ বিস্তৃত, উর্দ্ধ ঋত-চক্র বাহ,
 সপ্তংখী সম্বেষ্ট সে নির্ভীক বণ,
 বন বন সিংহনাদ, ঘোর অটুহানি,
 যে দেপেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের
 ভুলিবে না ইহ জন্মে । হিন্ন-চক্র, শিঙ
 তখন লইয়া গদা, গদাধর মত
 ছুটিল, পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাঅঙ্গ
 রথ হাতে তিন লক্ষ গেল পলাইয়া ।
 স্বেলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গাক্ষার,
 রথী সপ্তদশ, দশ যাতক বিনাশি,
 চূর্ণ করি অশ্ব রথ সারথি সহিত
 হঃশাসন তনয়ের, গদা যুদ্ধে ঘোর
 গদাঘাতে হই জন পড়িলা ভূতলে ।
 না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্ন প্রাণ
 বণ-শ্রেণে, বক্তপ্রাণে,—হঃশাসন সূত
 —কলকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,—
 প্রহারিল গদা অর্দ্ধ উত্তীর্ণ মন্তকে,—

ধনঞ্জয় । পুত্র তব উঠিল না আর ।
 ‘অধর্ম ! অধর্ম ! ঘোর’—ঘোর হাহাকার
 জলধি-কল্লোল মত উঠিল চৌদিকে ।
 অধোমুখে সপ্তরথী ফিরিলা শিবিরে,—
 রাধেয় মূর্ছিত রথে । নিষ্কোপিয়া দূরে
 কুরুদৈত্য অস্ত্র শস্ত্র, মুমূর্ষু বেড়িয়া
 তাঁহাদের লাগিল শোকে অশ্রু বারষণ
 কহিলা কুমার—‘স্বত । ললাটে আমার
 লেখ হৃদয়ের রক্তে, শরের জিহ্বায়,
 কৃষ্ণার্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার,
 লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার’
 খুলিলাম শিরস্ত্রণ, ছিড়ি উত্তরণ
 লিখিলাম,—হায় । লেখা যাইতেছে ভাসি
 অশ্রুজলে লেখকের । চাহি উদ্ধ পানে
 প্রীতি বিক্ষিপ্ত নেত্রে, গাইতে গাইতে
 পূণ্য নাম চতুর্দশ, কহিতে কহিতে—
 ‘নারায়ণ—ধর্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার’
 গুনতে গুনতে—‘জয় ! অভিমত জয় !’—
 অনন্ত কোরব কণ্ঠে, মুদিল নহন,
 বুনাইল শিত যেন কোলে জননীর ;—
 দেখিলাম দুই রবি গেল অস্তাচলে ।
 দেখ এই বীর-শয্যা ; এই দেখ আর
 মৃত-চক্র-বাহে কিবা বীরত্ব অপার ।
 দেখ কত কলেবর তব সারথির ।
 পুত্র-সারথির দেখ অক্ষত শরীর ।
 “অদ্বিত । অদ্বিত কথা এ নহে সম্ভব ।

পুত্রের যে এ বীরত্ব পিতার ছল্লভ ।”—
 ভ্রামি অধোমুখে ধীরে কহিলা ক্ষান্তনি ।
 “গুণিয়াছিলাম যেন কহিছে যুযুৎসু—
 ‘অধার্মিক রথিগণ ! এ অধর্ম ফল
 অর্জুনের অস্ত্রমুখে লভিবি অচিরে ।’
 নারায়ণ ! তুমি কি তা করনি শ্রবণ ?
 হায় ! হায় ! সুধৌতাগ্র সপ্তরথী শরে
 হইয়া পীড়িত নৃষি অসহায় শিশু
 স্মরিত—‘হা পিত ! কোথা, কোথায় মাতুল !’
 না না, সে যে পুত্র মম, ভাগিনা তোমার
 সুভদ্রার গর্ভজাত, এ বীরত্ব গাথা
 যে লিখিল কাল-বক্ষে, হেন আর্তনা
 সে কেন করিবে ? কিন্তু—ধিক্ ধর্মরাজ !
 ভ্রাতৃগণ ! সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল !
 এইরূপে ব্যাধগণ বধিল শিশুরে ।
 ছিলে কি নিদ্রিত সবে ? বর্ম, চর্ম, অসি,
 রমণী-ভূষণ মত কর কি ধারণ ?”

নত শিরে যুধিষ্ঠির বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
 কহিলা কাতর শোকে,—“ধনজয় ! তুমি
 জিজ্ঞাসিলে কার বৃকে বসাইবে অসি ?
 হান মম বৃকে, আমি পুত্রহস্তা তব ।
 প্রবেশিল অভিমন্যু আদেশে আমার
 চক্রবৃহৎ বজ্র বেগে, সার্থক জীবন
 দেখিলাম সে বীরত্ব মানব-অতীত ।
 দাড়াইল জয়দ্রথ, অবরোধি দ্বার
 হিমচল শৃঙ্গ সম, ট লাইতে তারে

না পারিল সমবেত পাণ্ডব পাঞ্চাল ।

“হা পুত্র !”—নিশ্বাসি দীর্ঘ বিধুমিত গিরি
করিতে লাগিল পুনঃ অগ্নি বরিষণ—

“হায় পুত্র ! মত্ত সিংহ-শাবকে একপে
লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া কোশলে,
ভুলিয়া সৌহৃদ মম, ভুলি প্রাণ-দান,
জয়দ্রথ করিল কি অবরুদ্ধ দ্বার !

জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ !”—কৌরব শিবির
চাহিয়া গর্জিলা ক্রোধে উন্নত অর্জুন,
কুরুক্ষেত্র থর থর উঠিল কাঁপিয়া ।

নিষ্কেপি গাণ্ডীব ধলু বামে ও দক্ষিণে

কাঁপায়ে কোদণ্ড-শব্দে কুরুক্ষেত্র পুনঃ
কহিলেন,—“ধর্মরাজ !

এ প্রতিজ্ঞা মম,—

না লয় আশ্রয় তব কালি জয়দ্রথ,

না লয় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আশ্রয়,

কালি জয়দ্রথে আমি করিয়া সংহার

বরষিব শাস্তি-বারি এই শোকানলে

আমাদের । নারায়ণ !”—পড়ি পদতলে

গোবিন্দের—“নারায়ণ ! এই পাদপদ্ম,

অর্জুনের শাস্তি-ধাম, করিয়া ধারণ,

চাহি পুত্র পানে বীর-শব্দে শাসিত,

করিলাম এ প্রতিজ্ঞা,—দেখিয়া জীবিত

জয়দ্রথ কালি রবি হয় অন্তমিত,

এইখানে হত্যাশন করি প্রজ্জলিত,

পিতা পুত্র এক চিতা করিবে প্রবেশ ।

৫ বুঝিবে তব লীলা । ঘোর অমঙ্গলে
 এইরূপে সাধ তুমি মানব-মঙ্গল !
 বুঝিলাম এই শোক শিক্ষা অর্জুনের ।
 অধর্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায় !
 এত দিনে, এত দূরে ; বুঝিলাম আর,
 ধনঞ্জয় শ্রবণ করে, আবৃত অসিতে,
 দুর্বিধা করিতেছিল বৃদ্ধি নর-মেধ,
 নানাবশে ভ্রান্ত মতি ; সপ্তরথী আজি
 খুলিল অসির সেই মেহ-আবরণ,
 শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
 শ্রবণ করে বিদ্যাতাগি, খুলিল নয়ন,—
 ‘ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র’ বুঝিছে এখন ।’
 উঠি বেগে নিষ্কোষিত করি ভীমা অসি,
 আফালি,—“এখন এই অসি অর্জুনের
 অজস্র শাণিত-উৎস করিবে খনন
 অধর্মী অরাতি-বক্ষে ; গর্জিবে গাভীর
 প্রলয়ের মেঘমল্লৈ ; ছুটিবে আঘাত
 কেল্লভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্য্যাগণ মত ।
 পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
 আজি ধর্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান ।
 বাজাও বিজয় শঙ্খ মহারথিগণ !
 কালি জয়দ্রথে বধি, বর্ষাহ অতীত
 না হইতে অরিকুল করি নির্মূলিত,
 আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত !”
 মহাশবে পাক্কজন্য উঠিল বাজিয়া
 দেবদত্ত শঙ্খ সহ ; বাজিল তখন

সহস্র সহস্র শব্দ ; ঝটিকা গর্জন

উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্ন গগন ।

ষোড়শ সর্গ ।

—*—

শোকে শান্তি ।

—*—

হত-বৎস-শাব্দুলের ভীষণ গর্জন মত
শোকে ক্রোধে নিনাদিত শব্দের বন্ধার
মূর্ছা বধু উত্তরার ভাঙ্গিল, উঠিয়া বাংলা
দাড়াইল উন্মাদিনী চিত্রিতা আকার ।
কুন্তল আলুলায়িত করিয়াছে বিমণ্ডিত
সোণার প্রতিমাগনি ; হাসি খল খল
কহে বাহু প্রসারিয়া,—“সুনিমা ! সুনিমা
চক্রবাহ জিনি আভি আসিছে রে, চল
আজি বীর-পত্নী মত রণজয়ী বীরে
চল যাই আবাহন করিব অভিরে
উঠ পোড়ামুপি ! উঠ ! তোম এই চিরকাল,—
শুধের সময়ে তুই কাঁদিস্ সতত,
সুখের সময়ে নিজা বাস এই মত ।
উঠ অভাগিনি ! উঠ !—কহে কয়ে ঠেলি ।

“নারায়ণ ! নারায়ণ !”—পড়িয়া গলায়
 গোবিন্দের কহে পার্থ —“এই দৃশ্য আর
 না পার্থ সহিতে, বুক বিদরিয়া যায় ।”
 “একি ? রক্ত ! একি ? অভি ! কোথা আমি ?”—
 চারিদিক চাহি উন্মাদিনী মত ঘূর্ণিত নয়নে,—
 “ও কে কাঁদিতেছে ? বাবা ! ও কে অধোমুখে ওই ?
 নারায়ণ ! কেন দেব ! বিষয় বদনে ?”
 ছুটি উন্মাদিনী গলা ধরি গোবিন্দের
 কহিল কাঁদিয়া,—“দেব ! কহ একবার,
 ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
 তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে, নাথ !
 কুৱাইল জীবনের খেলা কি তাহার ?
 ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?

মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীব-ধন্বা,
 জননী ব্রতদ্রাদেবী, এই দশা তার ?
 ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
 সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিড়িল হার,
 রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার,
 উত্তরা কি সেই হার পড়িবে না আর ?
 শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি,
 উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর ?

ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
 তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
 মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার
 ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?
 দেখিলাম স্বপ্নে আমি, আনি চক্ষু পুষ্পরং

আজি বুঝি সেই মতে চক্রবাহ একরথে :
 ভেদিয়া, করিয়া এই ভীষণ প্রলয়,
 —আমি যে অর্জুন যাহা আমার বিশ্বয়।—
 হাসি শিশু বল খল, উল্লাসে কহিল বুঝি,—
 ‘দেখ বাবা, মামা তুমি দেখ না আসিয়া,
 বার বার সপ্তরথী যায় পলাইয়া।
 ছিন্তা সংশ্লিষ্ট রণে না শুনিহু দুই জনে,
 সেই অভিমানে বুঝি শর-শয্যা করি
 বহিয়াছে ধরাডালে এইরূপে পড়ি।
 উঠ বাবা ! উঠ চল ! মনে বড় কুতূহল
 জনক মাতুল ভোর সেই মহারণ
 দেখিবে, করিবে আর সার্থক জীবন।
 উঠ ভদ্রা, উঠ দেবী, বীরজননীঃ মত
 সাজাইয়া বীরপুত্রে বীর আভরণে
 চল যাউ, এই রণ দেখি তিন জনে।
 পতি-রথ-রশ্মি ধরি দেখেছিলে একবার
 যে বীরত্ব, রথ-রশ্মি ধরি আরবার
 পুত্রের বীরত্ব দেখ কত কল্প শ্রেষ্ঠতর,
 কোথায় সবসৌ, আর পয়োধি ফেনিল !
 কোথায় ঝটিকা, আর মলয় অনিল !”
 “না না, ধনঞ্জয় !”—কৃষ্ণ কহিলা করুণ কণ্ঠে—
 “কুরুক্ষেত্র বর্ষক্ষেত্র, বঙ্গভূমি নয় :
 বড় ভাগ্য আমাদের, বড় ভাগ্য মানবের,
 এই মহা শর-শয্যা নহে অভিনয়।
 শুই শর-শয্যা পার্থ ! এই শর-শয্যা আর
 উভয় মহিমাময়। কিন্তু কত দূর

প্রোচের বীরভে, আর শূরভে-শিগুর !
 ভীষ্মদেব মরুভূমি ; অভিমত্যা উপবন ।
 নব কিসলয়ে পুষ্পে সুন্দর শ্রামল ।
 সে ভীষণ লবণাঙ্কু ; এ পবিত্র স্থধা সিন্ধু ।
 সে বন্ধুর বিদ্যাগির ; এই হিমাচল ।
 শিরে দেবী মন্দাকিনী স্তভজা-রূপিণী ওই,
 বহে বক্ষে ছই শাবা, জাহ্নবী যমুনা,
 পত্নী-প্রেম মাতৃ-প্রেম, উত্তর ও স্থলোচনা,
 বারাণসী-বক্ষে-যেন অসি ও বরুণা !
 সম্মিলিত এই শ্রোতে, বীরভের ব্রহ্মপুত্র
 মিশিমা করেছে কিবা তীর্থের সৃজন—
 এই শর-শয্যা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম !
 সেই সিন্ধু নারায়ণ । মাতৃ-প্রেম, ধাতৃ-প্রেম,
 পতি-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম আর,
 এই রূপে শত প্রেম, উপজিয়া শত ক্ষেত্রে,
 মিলি এক শ্রোতে,—নর-প্রেম ছনিবার,
 পশিয়াছে শত মুখে প্রেম-পারাবার ।
 কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র ; কিন্তু কত রূপান্তর,
 বীর ব্রতে প্রোচের সে সমর্পণ প্রাণ !
 নরহিতে শিগুর এ আত্ম-বলিদান !
 স্তভজে !”—ডাকিলা কৃষ্ণ উজ্জ্বল-কম্পিত কণ্ঠে ।
 পশে নাই যে কর্ণে শব্দের গর্জন
 শত শত, প্রবেশিল মূহ সম্ভাষণ ।
 ধীরে উদ্ধ-ছন্নন নামল, বহিল চাহি
 কেশবের মুখপানে, ভক্তি ছল ছল !
 “স্তভজে !”—কহিলা কৃষ্ণ —“নাহি আমাদের শোক,

গাও প্রেমপূর্ণ-স্বরে মানব-মঙ্গল ।
 যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
 কোন জননীর পুত্র লভেছে কখন ?
 আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
 একা অভিমুখা আজি করিল সাধন ।
 সকল জীবন-ব্রত, অর্থ্য হয়েছে হত,
 ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত ।
 গাইছে মানব জাতি কি যঙ্গল গীত !”

এতক্ষণে জননীর বহিল নুঘনে দুই
 নিরমল বারিধারা, নহে শোক-জল,
 আনন্দাশ্রু ভকতির আলোকে উজ্জল ।
 “দয়াময় ! নাহি শোক”—বাক্সিল ত্রিতন্ত্রী যেন
 ভকতির প্রশনে বরুণা হিল্লোলে,—
 “দয়াময় ! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্থ
 পুত্র যাব, তার শোক নাহি ধরাতলে ।
 কল্লিঘের গুরু দ্রোণ, ভূঙ্গলে তাঁর পণ
 ঘোল বৎসরের শিশু লজ্জিল যাহার,
 সেই বীর-জননীর শোক কি আবার ?
 কল্লিঘের শিরোমণি সপ্তরথী এক রথে
 ঘোল বৎসরের শিশু জ্বিলিল যাহার,
 সেই বীর-জননার শোক কি আবার ?
 লক্ষ্মিগিত সপ্তরথী সমুখি ভাদন্যাহবে
 এই শর-শয্যা শেবে হইল যাহার,
 তার জননার শোক সন্তবে কি আর ?
 ক্ষুদ্র লতা ছরবল, অসবি বৃহৎ ফল,
 তাপিত মানব প্রাণ বরে সুশীতল ;

তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
 প্রসবিয়া অভিমত্যা এই মহা ফল,
 সাধিয়াছে যদি দেব ! মানব-মঙ্গল,—
 লতার ত এই সুখ ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
 মাভূ-প্রেমে, পাদপদ্মে লগ্ন উপহার
 সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার ?
 সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমত্যা মম,
 আজি অভিমত্যা মম বিশ্ব চরাচর ।
 এক মর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিরাছি
 আজি কি মহান পুত্র অনন্ত অমর !
 বড় ভাগ্যবান পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ ।
 অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনো ভদ্রার,—
 ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয় নি প্রচার ।
 অনন্ত অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বৃকে
 এইরূপে, শিখাইব নাম নিরমল ;
 কুরুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
 শিখাইব সাধিবারে মানব-মঙ্গল !”
 নীরব নিশ্চল কৃষ্ণ, বিস্ফারিত হই নেত্রে
 চাহি আকাশের পানে শান্তির আধার ।
 শোক-ঝড়-বিলোড়িত হৃদয়েতে অজুনের,
 শান্তির অনীল ধীরে হইল সঞ্চার ।
 চাহি দ্বন্দ্ব শূন্য পানে অক্ষুট অক্ষুট যেন
 দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত অমর,
 ছুটিল হৃদয়ে মব প্রীতির নিব্বার ।
 মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণ ডাকিলেন—“স্বলোচনে !”
 শুনিলা না স্বলোচনা, শুনিবে না আর ।

পরশি লগাট কুম্ভ দেখিলেন, বহিলেন,
 চাহিয়া নীরবে, মুখ গাভীয়া আধার
 “না না, দেব ! নিজা তার”—কহিলেন ভজা দেবী—
 “না না, দেব ! নিজা তার ভাঙ্গিবে না আর ।
 তাহারো নিয়তি পূর্ণ, কি দয়া তোমার !
 তব পদ হিয়াচলে উপজি আনন্দ কলে
 যে অনন্ত নিরবিণী বহিল, ছুটিয়া,
 তার এক ক্ষুদ্র ধারা—পুণ্যময়ী স্থলোচনা—
 ভদ্রাঙ্কন প্রেম-স্রোতে গেল মিলাইয়া,
 অভিমত্যা পূজ্রে আজি হৃদয়ে লইয়া ।
 হাসে নাহি নিজ স্বখে, কানে নাহি নিজ হৃদে,
 চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মত
 আপন তরল প্রাণ পরে কদ্রিষাছে দান,
 স্থলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত ।
 তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেব ! কি গভীর
 কি নিকাম, নিরমল, কিবা পুণ্যাধার !
 অতি ক্ষুদ্র কৰ্ম্ম পথে, মানব ধাইতে পারে
 অনন্ত স্বথের পাব, বৈকুণ্ঠে তোমার,
 পুণ্যবতী স্থলোচনা আদর্শ তাহার ।
 যাও দিদি, যাও তবে, হায় ! অভিমত্যা সহ
 হইয়াছে পরিপূর্ণ নিয়তি তোমার ।
 অশীর্বাদ কর, যেন তুমি পুণ্যবতী মত
 পর-পুত্র বৃকে প্রাণ যায় স্তব্ধতার,—
 স্মরণ । পূর্ণ কর নিয়তি তাহার !”
 সঙ্গে শিষ্য দ্বৈপায়ন আসিলেন ধীরে ধীরে,
 উভয়ের উভনেত্র, উক বাহুদয়,

স্থপতি হরিনাম, উভয়ে করিছে গান,
 বিগলিত প্রেম-অশ্রু হন যনে বয় ।
 স্থির গাত্র উর্ধ্বনেত্রে, চিত্রাংকিত কুরুক্ষেত্র
 এ সন্নীত ভক্তিভরে করিল শ্রবণ ।
 চাহি অর্জুনের পানে শান্ত স্থির হন যনে
 কহিলেন দৈপায়ন উচ্ছ্বসিত মন,—
 “ধনজয় ! শোক তব কর পরিহার ।
 বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার ।
 এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত
 অত্রান্ত ভাষায়,—নাহি হইতে সজ্জিত
 ক্ষুদ্রতম জীব-বীজ, গিয়াছে বহিরা
 কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গাড়িয়া ।
 ছিল বত শত জীব, আজি নাহি আর ;
 কত শত নব জীব হইবে আবার
 কে বলিবে ! কিবা মহা কালের ছন্দার !
 উঠিছে-পশ্চাতে, আর সম্মুখে তোমার ।
 কালের তরঙ্গে য দ নেয় ভাসাইয়া
 মানব-জীবন-বীজ, দেয় মুছাইয়া
 পৃথিবীর বক্ষ হ’তে মানবের নাম,
 সর্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান,
 তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
 অনন্ত কালের গর্ভে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ।
 ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গাড়িছে নূতন,
 জগতের নীতি এই মহা বিবর্তন ।
 এই বিবর্তন গর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর,
 কেমনে রহিব স্থির, হইব অমর ?

পুত্র যাবে, পোত্র হবে, প্রপোত্র আবার,
 এই বিবর্তনে,— শোক কর পরিহার ।
 স্বজন, পালন, লয়, করিছে সাধন
 মুহূর্ত্তে অনন্ত এই নীতি-বিবর্তন ।
 কি সে নীতি, কে নিয়ন্তা, কিছুই না জানি ;
 আছেন উভয়, জানি ক্ষুদ্র নয় আমি ।
 চেয়ে দেখ বীণা যন্ত্র কত ভিন্ন তার ।
 আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার ।
 কিন্তু সর্ব তার হয় এক স্বরে লয়,
 সেই মূল স্বরে তার বাধা সমুদয় ।
 মহা যন্ত্র বিশ্ব-রাজ্য কর দরশন !
 চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন !
 আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল,
 নিত্য বিবর্তিত বিশ্ব তবু স্মৃশ্ৰুণ
 এক মহা নীতি বলে ; কি নীতি না জানি,
 কে নিয়ন্তা নাহি জানি, এই মাত্র জানি
 সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ
 বিশ্বের সে মূল নীতি, ধর্ম্ম সনাতন ।
 আর জানি সে নিয়ন্তা এই বিশ্ব-স্বামী
 তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি অন্তর্ধ্যামী
 তাঁহার নীতিতে বিশ্ব হতেছে চালিত
 কল কলান্তর, হ'য়ে ঘোর বিবর্তিত,
 অনন্ত উন্নতি পথে । এই বিবর্তনে
 করে যথা শোক-অশ্রু মানব-নয়নে,
 দুটে তথা স্মৃথ-হাসি মানব-বদনে ।
 কেন অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি ;

সকলি তাঁহার ইচ্ছা ; এই আমি জানি
 এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্তন-পথে
 ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে ।
 আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার ;
 আমি মার, মরে পুত্র, শোক কি আবার ?
 মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব !
 নাহি হয় উন্নতির তিলাঙ্ক লাঘব ।
 অলবিস্ব যায় পার্থ ! মিশাইয়া জলে ।
 একে ভাটা, অল্প দিকে জোয়ার উঠলে ।
 এই উন্নতিই স্বথ ; শোক, বিষ তার ।
 এ শোকে মানব আজি করে হাহাকার ।
 নর-শোকে পুত্র-শোক করি নিমজ্জিত,
 আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,
 তব বীর-পুত্র মৃত, হও অগ্রসর
 মানব-উন্নতি পথে । ওই শিরোপর
 নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি !
 চারিদিকে উন্নতির বিবর্তন-গতি
 বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
 কি প্রথর বেগে বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়িয়া !
 চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
 আনন্দে গাইয়া “হরে ! মুরারে” কেবল ।
 শিষ্য উদাসিনী স্থির দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
 উক্কনেত্রে আত্মহারা হৃদয় অচল ।
 জাহ্নু পাতি বসি ধীরে, মৃত কুমারের শিরে
 বধিল চুখন, হুই বিন্দু অশ্রুজল ।
 নীরবে উঠিয়া গিয়া পড়ি পার্থ-পদতলে,

কহিল—“চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
 তব পদতলে, পূর্ণ তপস্তা তাহার ।”
 “শৈলজে ! শৈলজে !”—পার্থ উচ্ছ্বাসে উন্নত প্রায়
 লইলা তুলিয়া বৃকে নীলাজ প্রভিমা,
 শোভিল স্বনীলাকাশে সন্ধ্যার নীলিমা ।
 “শৈলজে ! শৈলজে ! শৈল !”—সবিল না কথা আর
 শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে ছুটিল উচ্ছ্বাস,
 নাহি তার ভাষা, পার্থ স্থির চিত্তাক্ষিত প্রায়
 রহিলেন আত্মহারা চাহিয়া আকাশ ।
 শৈলজা পড়িয়া পুনঃ অর্জুনের পদতলে,
 চাহি শাস্ত হৃদয়ে, কহে পুনর্বার—
 “অজ্ঞানী মানব নাথ ! করনা করিয়া যৎ
 নারায়ণ রূপ, পূজা কার দেবতার,
 হৃদ পূর্ণ মনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
 দেখে শান্তি-সুখ-পূর্ণ জীবন-নির্ব্বার,
 অন্ত অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর ;
 তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়
 ক্ষুদ্র নিম্বতির রেখা করেছি দর্শন,
 পূজি নব, পাইয়াছি নব নারায়ণ ।
 পতিত-পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
 গুণিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
 আজ পুত্র পূণ্যবান দিবা আত্ম-বলিদান,
 লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয় ।
 চতুর্দশ বৎসরের তপস্তার পরে নাথ !
 ছিল যেই শুভ ছায়া প্রাণে কামনার,
 পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া,

পতি, পিতা, পুত্র, তুমি আজি শৈলজার ,
 পুণ্যবতী,—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার ।
 আমি তার বনমাতা, বনে তার কত ভ্রাতা
 করিবে বিরহে তার বনে হাহাকার,
 বনের আলোক আজি হইল আঁধার ।
 পুত্র-প্রেম-প্রস্রবণ, উদ্ধার করিতে বন,
 শৃংখ করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
 গেল উড়ি প্রেম-পাখী ; শৃংখ অঙ্কে—মুছ আঁখি—
 বন পুত্রগণে তব দেও অধিকার,—
 প্রেমময় ! পুত্রশোক রবে না তোমার ।
 উঠ মা ! উঠ মা !—শৈল ধরি সুভদ্রার কর
 কহিল—“উঠ মা ! না না, আমরা কখন
 করিব না আজি শোক-অশ্রু বরিষণ ।
 জগতে কাঁদিয়া আসি, এইরূপে গেল হাসি
 কাঁদায়ে জগত যেই শিশু দেবোপম,
 আমরা তাহার তরে কাঁদিব না, তার তরে
 করিবে অনন্ত কাল অশ্রু বরিষণ ।
 বসিব না অশ্রুবিন্দু আমরা কখন ।
 উঠ মা ! উঠ মা ! ওই সর্ব-শোক-নিবারণ
 দাড়াইয়া নারায়ণ শাস্তি-প্রস্রবণ ।
 শাস্তির ত্রিদিব বৃকে পুত্র সমর্পিয়া স্থখে,
 করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
 গাই কৃষ্ণনাম, মা গো ! জুড়াই জীবন !
 মেহের শৃঙ্খল তোর, মেহের শৃঙ্খল মোর,
 কাটিলেন বিধি যদি উদ্যোগ উড়িয়া
 তুই গৃহে, আমি বনে বন বিহঙ্গিনী মত,

গাব কৃষ্ণনাম মা গো ! বিশ্ব জুড়াইয়া ।”
 উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া অর্জুন লইয়া তুলি
 এক করে পুত্র, পুত্র-বধু অগ্র করে
 অর্পিলেন গোবিন্দের বক্ষে প্রেমভরে ।
 পুণ্যবতী স্নলোচনা পড়িয়া চরণতলে,—
 সেই পাদপদ্ম বিনা স্বপনেও আর
 জানে নাহি অনাথিনী জীবনে তাহার ।
 বসি পাদপদ্মতলে, শৈলজা, স্তম্ভজা, পার্থ,
 প্রীতির শান্তির তিন মুরতি সুন্দর ।
 এতক্ষণ স্তম্ভজার বহিল বৃগল নৈত্রে
 পতিত-পাবনী প্রীতিধারা দরদর ।
 এক করে মৃত-পুত্র, অগ্র করে পুত্রবধু
 মূর্ছিতা বিষমুগ্ধকেশী লইয়া হৃদয়ে
 দাড়াইয়া নারায়ণ ; কি মূর্তি মহিমা ময় !
 উর্ধ্বনেত্রে নিরমল প্রীতিধারা বয় ।
 উর্ধ্ববাহু বৈপাশন, উর্ধ্ববাহু কুরুক্ষেত্র,
 অশ্রুনেত্রে, প্রেমকণ্ঠে সায়াক্ষ-গগন
 পুরিয়া গাইল “হরে ! মুরারে !” তখন

সপ্তদশ সর্গ ।

—*—

মহাভারত ।

—*—

অতীত তৃতীয়-ধর্ম, নিবিড় নীরব নিশি
 আকাশ ও ধরা-ভল আঁধারে গিয়াছে মিশি ।
 জলিতেছে ক্ষীণালোক, নীরব শিবির তলে
 বসিয়া রমণী এক, শুষ্ক নয়নের জলে
 অঙ্কিত কপোল শুষ্ক, যেন দেবী নিশীথিনী
 হেমন্তের মূর্তিমতী, শিশিরাক্ত, বিবাদিনী ।
 পড়েছে গৈরিক ঢাকি ধূসরিত কেশভার,
 হেমন্তে বিষাদ-মাখা শিশিরাক্ত অঙ্ককার ।
 দক্ষিণ কপোল বামা রাখিয়া দক্ষিণ করে
 চেয়ে আছে অধোমুখে শোকের আবেগ ভরে ।
 শোভিতেছে অন্ধে স্তম্ভা মূচ্ছিতা রমণী আব,
 নিশীথিনী কোলে যেন বিগুপ্ত কুসুম-হার !
 আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধ পড়িয়াছে কেশাবলী,
 শৈবালে পড়িয়া যেন ছিন্ন কমলের কলি ।
 শোকে শুভ্র অর্ধ কেশ, নয়ন গিয়াছে বসি ;
 শোকে শুষ্ক দেহলতা, বরণ হয়েছে মসী ।
 বিগুপ্ত আরক্তাধর ; ক্ষীণ বহিতেছে শ্বাস ;
 নিদ্রা ঘাইতো ছ যেন ছিন্ন-বীণা-শোকোচ্ছ্বাস ।
 বহুকণ পরে বালা মেলিল নয়ন ধীরে ;

চাহি আত্মহারা মত স্থির নেত্রে রমণীরে
জিজ্ঞাসে—“কে আমি ?”

“তুমি উত্তরা মা ! আদরিণী !”

“উত্তরা কে ?”—“উত্তরা মা ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী

“উত্তরা ! উত্তরা আমি ! বিরাট-রাজ-নন্দিনী !”—

বিস্ময়ে কহিয়া, রহে শূন্যচাহি বিষাদিনী।

শিবির প্রাচীরে দীর্ঘ প্রশস্ত দর্পণ পানে

চাহিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ—“কারা বসি ওইখানে ?”

আত্মহারা বালিকার ভগ্ন-রুণ্ডে নারীপ্রাণ

উঠিল কঁাদিয়া, বামা করিল উত্তর দান,—

“কেহ নহে, দর্পণেতে প্রতিবিম্ব মা ! তোমার

দেখিতেছ, দেখিতেছ প্রতিবিম্ব মা ! আমার !”

“উত্তরা—উত্তরা আমি ! প্রতিবিম্ব উত্তরার !

উত্তরার শুভ্র কেশ ! ওই মুখ ! চোক আর !”

ভিজিল তাপসী অঁাখি,—ছয় দিনে উত্তরার

কি দারুণ শোকে শুভ্র হইয়াছে কেশ ভার !

“কে তুমি ?”—“শৈলজা আমি বনবালা উদাসিনী”

“না, তুমি মা ! স্বপ্ন-দেবী ! স্বপ্নে দেখিয়াছি আমি,

পূর্ণচন্দ্র বন্ধ হ’তে হায় মা ! পড়িছ আমি

অধার পাতালে, শৈলে,—কি কঠিন শিলাখানি !

চূর্ণত হইল দেহ, বিচূর্ণ হইল বুক ।

আসিলেন নারায়ণ,—কি করুণাপূর্ণ মুখ !

পাতাল হইল পূর্ণ কি আলোকে নিরমল,

কি মধুর হরিনামে পূর্ণ হ’ল রসাতল ।

চুষিয়া লগাট, করি সজীবনো সুখা দান,

ববিজ্ঞা দেবীর এক অঙ্কেতে দিলেন স্থান ।

তুমি কি সে স্বপ্ন-দেবী ? এবা কোন পুণ্যভূমি ?—
 স্বপ্ন-রাজ্য ? দেব-রাজ্য ?” — “তোমার শিবিরে তুমি”
 “শিবিরে ! শিবির কোথা ?” — “কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে”
 রহিল বালিকা শুনি চাহি শূন্যস্থির নেত্রে ।
 রুদ্ধপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চক্রে-কর-লেখা,
 যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
 স্মৃতির আলোক ধীরে মনে-বাচে উত্তরার
 ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম-ভ্রান্তি অন্ধকার ।
 অনেক দিনের দূর-বিস্তৃত সঙ্গীত মত
 পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত
 সুখপূর্ণ, শোকপূর্ণ ;—পিতৃগৃহ নাট্যালয়,
 বৃহন্নলা, সে অপূর্ণ উত্তর গোগৃহ-জয়,
 কোরবের বেশ ভূষা, আনন্দে পুতুল খেলা,
 পাণ্ডবের পরকাশ, বিবাহ—আনন্দ মেলা,
 ছয় মাস সুখস্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র মহারণ,
 এ শিবির, চক্রবাহ, হত-পতি-দরশন,—
 তার পর অন্ধকার, মনে পড়িল না আর ;
 পড়ে গেল সর্বানকা, রুদ্ধ নাট্যাগৃহ-দ্বার !
 স্মৃতির সমীপে ধীরে জ্বালাইল শোকানল,
 কাদিতে চাহিল বালা, কিন্তু কোথা অশ্রুজল ?
 শোকের সস্তাপে ভীত নয়নের নিরঙ্কর
 ।গদাছে শুকায়ে ; শুক ক্ষুদ্র মুখ ইন্দীবর
 লুপ্ত শৈলজা-বক্ষে ; হায় ! শৈলজার প্রাণ
 আবার উঠিল কাদি । করিতে চুপন দান
 উচ্চ হুই অশ্রুবিন্দু পড়িল বরিষা মুখে
 উত্তরার বিমলিন, শুক শতদল বৃকে

নিশির শিশির যথা ; বিষয়ে কহিল বালা,—

“কেন মা কাঁদিস্ তুই ? তোর বুকে এই জালা
কে জালিল ? বনমাতা তুই কি অভির হায় ?”

শৈলজার অশ্রুধারা বহিল বেগে ধারায় ।

“আমি তার বনমাতা, আমি সেই পুণ্যবতী ।”

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বামা কহিল কাতরে অতি—

“হায় মা ! হায় মা ! তোরো এ অমৃত প্রশ্রবণে
জালিল বাড়বানল বিধি অকারণ মনে !”

“না মা !”—উত্তরিল শৈল—“মরুভূমে অভাগীর,
দিয়া অল্প প্রাণ বাছা চালিয়াছে প্রেমনীড়

বরিবার মেঘ মত, সাহি বুকে বজ্রাঘাত ;

ধর্মরাজ্য তরে কবি এইরূপে প্রাণ পাত ।

বনমাতা হয় যেন হায় ! যোগা মাতা তার ।

স্বর্গে সে আসিবে তবে পুণ্য অঙ্কে শৈলজার ।”

“কালি নিশীথিনী-অঙ্কে”—মূর্ছাগতা উত্তবার
নাহি জ্ঞান ছয় দিন গিয়াছে বাহিয়া আর,—

“কালি নিশীথিনী-অঙ্কে, বসি এই বাতায়নে
নবোদিত চন্দ্র করে, প্রেম-উজ্জ্বলিত মনে

মা গো ! তোর প্রেম কথা গাইল সঙ্গীত মত,

অপূর্ক কল্পনী বলে সৃষ্টি স্বর্গ শত শত ।

ফলিল না একটাও ভাগো হায় ! উত্তবার,

অভাগিনী তার মত কে আছে জগতে আর ?

বালকের ধূলা সৃষ্টি একই নিশ্বাসে হায় !

নিল মা গো ! উড়াইয়া নিদারুণ বিধাতায় ।

বড় সাধ ছিল মনে যুদ্ধ অস্ত্রে অভাগীরে

নিষে যাবে বনে তোর, মা গো ! তোর বেহ-নীড়ে ।

ভাবে নাই, ভাবি নাই, হায় ! হেন অনায়াসে
 আসিব যা অন্ধে তোর !—রুদ্ধ শোক নিরঝরিত
 উথলিল যেই বেগে বক্ষে চক্ষে শৈলজার,
 বুঝিল বিরাটবালা, কথা কহিল না আর
 “রেখে গেছে অভিমতী ক্ষুদ্র প্রতীমূর্তি ওর”—
 চাপি শোক কহে শৈল—“মা গো ! পুণ্যগর্ভে তোর
 পুত্র কোলে করি’ তুই ঘাইবি আমার বনে ।
 এ অভির কন-খেলা নিরখিব তুইজনে ।
 গৃহভূমি, বনভূমি, বাণিজ্য প্রেম-বন্ধনে
 নিম্নাইব ধর্ম-রাজ্য, বসাইব সিংহাসনে
 পুত্রে তোর, রাজলক্ষ্মী হবি তুই মা আমার ।
 হায়, প্রজা হুখে, রহিব না শোক আর ।
 “রবি অন্ত গেলে হায় !”—ফেলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস,
 কহিতে লাগিল বালা চাপিয়া শোক-উচ্ছ্বাস,—
 “রবি অন্ত গেলে হায় ! দিবা কি থাকিতে পারে ?
 অন্ত গেলে লশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে ।
 পাদপ : ইলে ভয়, ছায়া কি থাকে কখন ?
 নিরঝর হইলে শুক ধারা হয় অদর্শন ।
 প্রদীপ হইলে ভয়, শিখা কি কখনো রয় ?
 বাচে কি নলিনী, যদি শুক হয় জলাশয়
 কুরুক্ষেত্র-সহায়কে তরু উত্তরাব হায় ।
 গিয়াছে ভাঙ্গিয়া যদি শুকাইয়া এ লতায়,
 আশীষদ কর মা গো ! সমর্পিয়া ফল তার
 কয়ে মাতা হৃদয়, স্থলোচনা, শৈলজার,
 তরু পদ মূলে যেন করে সমর্পণ প্রাণ ;
 আনন্দের সহ যেন হয় হাসি তিরোধান ।

তৃতীয়ার চক্ষ যদি হলো অন্তমিত হায় !
 অক্ষট জ্যোৎস্না যেন সঙ্গে মিশাইয়া যায় ।
 হায় মা ! হায় মা ! বিধি"—দৰ্পণে পড়িল আঁখি,
 মুহূর্ত্ত বিরাট-বালা নীরবে চাহিয়া থাকি—
 "হায় মা ! হায় মা ! বিধি সে আশাও উত্তরার
 বুঝি বিনাশিলা, মন কি কঠিন বিধাতার !
 ওই মুখ, ওই চোক, ওই গুরু কেশ, হায় !
 নিরখিয়া প্রাণনাথ চিনিধে কি উত্তরায় ;"
 উভয় নীরব রহে শোকবেগে কিছুক্ষণ ।
 উত্তরা কহিল পুনঃ পর-হৃৎথে আর্দ্র মন—
 "নাহি জানি কুরুক্ষেত্র—এই শোক-পারাবার—
 ভাসিবে কপাল মা গো ! আর কত উত্তরার !"
 "হইয়াছে যুদ্ধ শেষ ।"

"শেষ !"—চমকিল বালা ।

"শেষ"—উত্তরিল শৈল :ববাদিনী—"মহাজালা
 নিবিয়াছে জগত্তের ; ভাসিয়া ক্ষত্রি-বন
 নিবিয়াছে অধর্ম্মের যুগব্যাপী হতাশন ।
 ছিল ধৈর্যে স্নেহে সিন্ধু অর্জুনের বীৰ্য্যানল,
 হরিলে কোরব সেই অতিমহা স্নেহ-জল,
 উদ্গীর্ণ করিল গিরি যে গৈরিক প্রস্রবণ
 কাপাইয়া কুরুক্ষেত্র, আচ্ছন্ন করি গগন,
 হুদিনে হইল ভস্ম দ্রোণাচার্য্য পরাক্রম ;
 হুই দিনে কর্ণ আর,—কর্ণ করে নাহি রণ,
 শিশু-হত্যা-পাপে প্রাণ করিয়াছে বিসর্জন ।
 এক দিবসের যুদ্ধে হত শল্য, দুৰ্য্যোধন ।
 কালি হইয়াছে শেষ, হইয়াছে অবসান

অধর্মের দীর্ঘ দিবা, ভারত করি শ্মশান !

রূপ, তবশ্মী, আর দ্রোণ-পুত্র ছরাশয়,—

আছে মাত্র কোরবের এই মহারথী ত্রয় ।

উ । পাণ্ডব ও নারায়ণ ?

শৈ । আছেন যুদ্ধে সব ;

পরিণামে ধর্মের মা । নাহি হয় পরাভব ।

উ । মা সূভদ্রা ?

শৈ । দেবী ত্রিনি, তাঁর অমঙ্গল নয়

সম্ভব মা ।

উ । সুলোচনা ?

শৈলজা নীরবে রয় ।

উত্তর। আকুল শোকে কহিল উচ্ছ্বাসে—“হায় !

তুই ও মা ! গেলি চলি ফেলি তোর উত্তরায় ।

আছিল হৃদয় তোর ক্রীড়া গোলকের মত

অভিমত্যা সমীরণে প্রপূরিত অরিরত ।

হায় ! নিদারুণ কাল কেমনে লইল হরি

সেই স্নেহ-সমীরণ গোলক বিদীর্ণ করি !

যেই শিশু-বৃক্ষ মা গো ! হৃদয়ে করি রোপণ

পালিলি ষোড়শ বর্ষ, কুরুক্ষেত্র প্রভঞ্জন

উপাড়ি ফেলিল ভূমে কোমল হৃদয় তোর

ফেলিল উপাড়ি, তবু ছিড়িল না স্নেহ-

নীরবে রহিয়া বালা জিজ্ঞাসিল আব্বার—

“কুশলে ত আছে বল পিতা ভ্রাতা মা ! আমার ?”

নীরব রহিল শৈল । সে নীরব সমাচার

পশিল বালিকা-প্রাণে, তুলিল কি হাহাকার !

অশ্রবিন্দু নাহি দিল স্তিমিত নয়নে দেখা ।

না হইল রূপান্তর মুখের একটা রেখা ;
 করিতে সে শোকচিত্রে রেখাটী গভীরতর
 না পারিল পিতৃ-শোক ভ্রাতৃ-শোক চিত্রকর !
 হায় ! বিষধর যারে দংশিয়াছে একবার,
 শত বিষধরে দংশি কি আর করিবে তার ?
 হইয়াছে এক বজ্রে ভস্ম যেই উপবন,
 কি আর করিবে তার শত বজ্র প্রহরণ ?
 কেবল কহিল বালা—“হায় ! তবে উত্তরার
 পিতার গৃহও শূন্য, হইয়াছে অন্ধকার !
 সে বিরাট-রাজপুরী, বিরাট শ্রশানপ্রায়,
 করিতেছে হাহাকার, করাল কাল ছুয়ায় !
 হায় বাবা ! হায় দাদা ! বড় আদরের ছায়া
 ছিল যে উত্তরা, হায় ! কেমনে কাটিয়া মায়া
 এক সঙ্গে পিতা পুত্র গেলে চলি পতি সনে,
 ফেলি এই বালিকায় হেন অকরুণ মনে ?
 হায় মা ! আছিল অন্ধে উত্তর উত্তরা তোম ।
 উত্তর গিয়াছে চলি, উত্তরার স্বপ্ন ভোর !
 সকলে মা ! গেল চলি”—চাহি শৈলজার মুখ—
 “তথাপি বিদীর্ণ নাহি হইল আমার বুক !
 ছয় দিন বৃতপ্রায় ছিলাম হৃচ্ছিতা আমি,
 তবু নাহি মরিলাম,—আমি কি পাষণধানি !”
 জীবনের আশা বাছা ! ছিল কি তোমার আর
 যোগস্থ হইয়া হরি আগাইলা পুনরবার !
 কেন দয়াময় হরি অনাধিনী এ কল্যাণ
 বাঁচাইয়া, শুদ্ধলতা অর্পিলা অনলে হায় ?
 ভূমি কোরবের লক্ষী, আছে মা ! গর্ভে তোমার

৫২

উ

শৈ।

- একই অঙ্কুর মাজে ফোঁরবেব ভরসার
মানবেব আশা-তরু, ধর্ম্ম-রাজা-ভিত্তিভূমি,
হবে তব পুত্র, হবে ধর্ম্ম-রাজা-লক্ষ্মী তুমি
- উ। আছে ত কুশলে মাত ! দেবর পঞ্চ আমার ?
- শৈ। পাণ্ডব, সাত্যকি, কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি
নিশীথে পশিয়া, মেঘ-শালায় শার্দূল মত,
অস্থখ্যাতা পঞ্চ শিশু নিদ্রায় করেছে হত।
কালী নিশীথিনী অঙ্কে, হইয়াছে অভিনীত
অধর্ম্মের শেষ অঙ্ক, পাপপূর্ণ, শোকাবিত
পড়িয়াছে যবনিকা, জলিয়াছে কি অশান
কুরুক্ষেত্রে ।—নারায়ণ । কর পূর্ণ মনস্কাম ।
এ অধর্ম্ম বাক্ষসের কবল হইতে নর
উদ্ধারিতে, দিল প্রাণ দেবতুলা পুত্রবর ।
আমাদের শোকে মা গো জগত পাইবে সুখ ;
ভুলি পত্নীপ্রেম, কর মাতৃপ্রেমে পূর্ণ বুক ।”
বিস্মিতা, স্তম্ভিতা, ভীতা । উত্তরা নীরবে রথ
শোকাকুলা, চিস্তাবিত । বদন গাভীর্য্যময়,
হ’ল যেন মেঘময় শীতের বিশদাকাশ ।
বহুক্ষণ এইরূপে ভাবিল, না বহে শ্বাস ।
উঠি ধীরে ধীরে শেষে, কহিল—“মা ! চল যাই ।”
- শৈ। কোথায় ?
- উ। মা ! উক্তবার এক ভিন্ন স্থান, নাই——
পতির জলন্ত চিতা ।
কাঁপিয়া উঠিল বুক
শৈলজার হৃৎ হৃৎ ; কহে অশ্রুপূর্ণ মুখ—
“পতির চিতায় প্রাণ সমর্পণ হ’তে আর

নাহি কি রমণী-ব্রত উচ্চতম, মা আমার ?”

“আছে”—স্থিরকণ্ঠে বামা কহি া হাইল ধীরে—

“পালিব তা, মাথিয়া মা ! পাতপদ-ভঙ্গ শিরে ।”

নীরবে শিবির হ’তে বাহিরল হইজন

আর চলিল না পদ—ও কি দৃশ্য বিভীষণ !

তৃতীয় প্রহর নিশি ; জলিতেছে অগণিত

চিতাকুরুক্ষেত্র-বক্ষে,—জলিতেছে সংখ্যাতীত

চিতা বক্ষে ভারতের, জলিতেছে অনিবার

ক্ষত্রিয়ের গৃহে গৃহে, বক্ষে বক্ষে অনাথার।

নিবিড় স্থচিকাবিন্দু অমাবস্থা অন্ধকারে

জলিতেছে চিতাশ্রেণী ; কুরুক্ষেত্র চিতাহারে

কালের জীবন্ত মূর্তি করি যেন অভিনয়,

দেখাইছে কাল-গর্ভ বিরাট শ্মশানাগর।

যোজন যোজন ব্যাপী, স্থানে স্থানে নদীতীরে

জলে রথীদের চিতা, প্রতিবিম্বে নদীনীড়ে

জলিছে অনন্ত চিতা,—কি যে কি ভীষণ ছবি।

নদীগর্ভে অন্ত যেন হতেছে অনন্ত রবি !

হায় ! এক মহাচিতা ততোধিক বিভীষণ

যথায় হইল ভঙ্গ অনাথ সৈনিকগণ,—

অষ্টাদশ অক্ষোহিনী,—ক্ষুদ্র অগ্নি পারাবার,—

জলিতেছে দুবে, মনে আতঙ্ক করি সঞ্চার।

মহা নরমেধযজ্ঞ হইয়াছে সমাপন,

নিশিষেবে ধীরে ধীরে নিবিতেছে হতাশন

অনন্ত শ্মশান-ভূমে সমাচ্ছন্ন শীতাকাশ।

একট্র নক্ষত্র নাহি হইতেছে পরকাশ।

ঘোর কৃষ্ণ নৈশাকাশ ; শোকেতে নক্ষত্র যত

পড়ি ধরাভলে যেন শোভিতেছে চিতামত ।
 মুক্তকেশী শোকাকুলা সংখ্যাতীত বীরনারী,
 —সবিদ্রাৎ কাদম্বিনী,—বরবিয়া অশ্রুবারি
 কাঁদি সাবাদিন আশ্র-পল্লব লইয়া করে,
 অশ্রুবিয়া মৃত পতি পুত্র পিতা সহোদরে,
 সুড়িয়া সমব-ভূষি করিয়াছে হাহাকার,
 লয়ে ছিন্ন বক্ষে ছিন্ন বক্ষ প্রাণ-প্রতিমার
 শোকের বরিষা এবে হইয়াছে অবসান,
 এখনো কাঁদেছে কেহ ভগ্ন-ভগ্ন প্রাণ,
 আঁধার শিবিরে ধীরে । শকুনী শৃগালকল
 ঘন নৈশ নীরবতা বিদারিয়া কোলাহল
 করিতেছে স্থানে স্থানে, করিতেছে ছুটছুটি ;
 কত বিজীবিলা যেন আঁধারে উঠিছে ফুটি ।
 কাঁপিল বালিকা-বক্ষ, ধরি শৈলজার গলা'
 রাখি বুকে মুখ, কহে বালিকা শোকবিহ্বলা—
 “হায় মাত । ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ,
 আমাদের বক্ষ-চিতা এক্রপে কি নির্ক্ষাপণ
 হইবে মা ? হইবে মা ! এইরূপে অবসান
 আমাদের শোক-নিশি, হায় ! জুড়াইবে প্রাণ ?”
 “কয় চিতা আমাদের ?”—কহে শৈল সাক্ষচক্ষে,—
 “দেখ মা । অনন্ত চিতা ভারত-মাতার বক্ষে !
 পুড়ি এই চিতানলে অধর্ম তিমির রাশি,
 নব-ধর্ম উবা ওই আনন্দে উঠিছে ভাসি ।
 ওই কাকলির কলে উঠিছে মা । কৃষ্ণনাম
 জুড়াতে অগত-প্রাণ, তোমার আমার প্রাণ
 লয়ে উত্তরায় বক্ষে বনমালা ধীরে ধীরে

গেল পতি-চিতামূলে । দূর হিরণ্য-তী-তীরে,
 অশোক পাদপ-মূলে সে পবিত্র তীর্থধাম
 প্রণমিলা, কি উজ্জ্বল উজ্জ্বল ছটি প্রাণ !
 প্রিয় পুত্র লয়ে বক্ষে স্নুলোচনা পুণ্যবতী
 লভিয়াছে নিরবাণ একই চিতায় সতী ।
 ত্রিদিব বীণার বক্ষে যেন পুণ্যময় গীত
 হইয়াছে লয়, বীণা হইয়াছে অন্তর্হিত ।
 ব্যোম-বিহারিণী তরী হইয়া গগনোথিত,
 আলোক সহিত যেন হইয়াছে অলঙ্কিত ।
 নিকীর্ণিত প্রায় চিতা ! ক্ষীণলোকে নারায়ণ
 দাঁড়াইয়া অন্তরালে করিলেন দরশন
 উত্তরার শোক-ছবি, বিদীর্ণ হইল বুক,—
 কি আলোকে, ও কে বসি, হায় ! এ কাহার মুখ !
 গিয়াছে বহিয়া যেন কত যুগ উত্তরার,
 ঘটাইয়া কি বিপ্লব ক্ষুদ্র স্বপ্নেতে তার !
 নব যৌবনের সেই পুষ্পাকীর্ণ বঙ্গালয়ে
 করিতেছে প্রৌঢ়তায় কি দারুণ অভিনয় !
 বিগুপ্ত অক্ষুট ফুল, নিবিয়াছে অ'লোরাশি,
 ফুটন্ত আনন্দোজ্জ্বল শোক উঠিয়াছে ভাসি
 হাসি ভরা, ক্রীড়া ভরা, সে চঞ্চলা পৌরামিনী,
 হ'য়েছে গান্ধীৰ্য্যভরা কি নিবিড়া কাদম্বিনী !
 জ্যোৎস্না-প্লাবিতা সেই ফুটন্ত কুসুম লতা,
 এবে শুষ্কা, অন্ধনগ্ধা হায় ! বজ্রাঘাতে বধা ।
 অশোক পদাপ মূলে শোকে দাঁড়াইয়া হরি,
 অদৃষ্ট, আধারে স্থির, বক্ষে শিব বক্ষা করি,
 ঘোর ঝটিকায় পূর্ণ যেন মহা জলধর,

রুদ্ধ করি সে বিপ্লব রহিয়াছে স্থিরতর ।
 অনিমিষ-নেত্রে কৃষ্ণ চাহি উত্তরার পানে ;
 দেখে না উত্তরা, কহে উদ্দেশে আকুল প্রাণে,—
 “কোথায় রহিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি !
 এই শোক-পারাবারে দেও নাথ ! পদতরী !
 তোমার নয়ন সম ছিল যেই নেত্রদ্বয়,
 ছিল তব রূপ সন্মুখে রূপ মাধুর্য্যাময়,
 মাতা স্নহদ্রাব ছবি সেই মুখ মনোরম,
 তোমার দেহত্রে মাথা পার্থ-বীর্য্যো হতাশন,
 বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি, স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার,
 একপে কি হ’ল ভঙ্গ ? চিহ্ন রহিল না তার !
 অর্জুনের প্রাণ-পুল; প্রাণ-পুল স্নহদ্রাব,
 গোবিন্দের পুত্র, শিষ্য, না, না, নাহি মৃত্যু তার
 বলিয়া চন্দ্রলোক কি গৌরবে প্রাণেশ্বর !
 বিরাজিছ ! শিরে কিবা কিরণ-কিরীটবর !
 কি স্নহদ্রাব বীর বেশ ! কিবা স্বর্গ মনোহর !
 আনন্দে অপ্সরোগণ বসিতেছে নিরস্তর
 কি কুসুম সুবাসিত ! কি সঙ্গীত শ্রবণমল
 উৎখলিছে ! বরষিছে কি অমৃত স্নহীতল !
 সতৃষ্ণ নয়নে নাথ ! দেখিছ কি উত্তরায়
 চিনিতে কি পার তারে ? তার এই দশা হায়,
 কেমনে রয়েছ চাহি ? লগ্ন বৃকে এক বার,
 কহিয়া একটি কথা জুড়াও জীবন তার ।
 পৃথিবীতে ছয় মাস দিয়া তারে স্বর্গ স্নহ,
 কেমনে চলিয়া গেলে বিদীর্ণ করিয়া বুক !
 প্রেমের মুকুল তব সঞ্চাতিয়া এ লতায়,

কেমনে চলিয়া গেলে অকরণ প্রাণে হয় !
ক্ষমা কর ছয় মাস ; প্রেমবিয়া সেই ফুল,
রাখি তব প্রতিকূপ, বক্ষা করি কুককুল,
ছয় মাস পরে,—নাথ ! ছয় যুগ উত্তরার—
উত্তরা আসিবে অকে, স্বর্গে তার তপস্কার ।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু, অনাথার দীর্ঘ মৃত্যু এ জীবন ।
কর আশীর্বাদ, নাথ ! এ অনন্ত মৃত্যু-ব্রত !
হয় যেন উদ্ঘাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ !”

বসি আশ্র-দ্বারা শৈল চাহি আকাশের পানে
সেই চন্দ্রলোক, চন্দ্র, নিরখিতেছিল ধ্যানে ।
স্বপ্ন-উখিতার মত চিতা ভস্ম লয়ে কবে,
উভয় ললাটে মাখি কহিল উজ্জ্বল-ভাব—
“কর আশীর্বাদ, বৎস ! তব বনমাতা ব্রত
হয় যেন উদ্ঘাপিত, হয় পূর্ণ মনোরথ !”
বিরাট, উত্তর, চিতা পার্শ্বে প্রণমিয়া, ধীরে
নীচবে উভয় শোকে চলিল শূন্য শিবিরে ।
এখনো অশোক-মূলে দাঁড়াইয়া নাচায়ণ,
প্রস্তর মূর্তি যেন অনিঘিষ হনয়ন ।
আসিলেন ধনঞ্জয় সুভদ্রা জননী সঙ্গে,
বসিলেন চিতামূলে ;—উত্তাল শোক তরঙ্গে
অর্জুনের ভাসিতেছে শাস্তি ছায়া ; জননীর
অনন্ত অতলম্পর্শী শোক সিদ্ধ এবে স্থির ।
একটী লহরী মাত্র, হুলিল এক উজ্জ্বল,
পুলকের শশান-ছায়া ; বহিল একটী শ্বাস ।
কেবল একটী কথা কহিলেন ধনঞ্জয়—

“এইরূপে আমাদের হইল ভস্ম হৃদয় ।”

“না না, নাথ !”—ভদ্রাদেবী উত্তরিলে কণ্ঠস্থির

“পবিত্রিত, বিগলিত, তরলিত প্রেমনীড়

এইরূপে আমাদের হইল কঠিন প্রাণ,

জুড়াতে জগত-প্রাণ, বিলাইতে কৃষ্ণনাম ।

স্নলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমত্যা আত্ম-দান,—

নব ধর্ম-রাজ্য ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম ।

সাপ বীরব্রত, লও ধর্মব্রত শ্রেষ্ঠতর,

মুখি পুত্র-ভস্ম বুকে হও কর্ণে অগ্রসর ।

পুত্রের সুষোগ্যা মাতা, পুত্রের সুষোগ্য পিতা,

হইব আমরা, যবে হইবে ধরা প্রাবিতা

এই নব ধর্মায়ুতে ; হুঃখ রহিবে না আর

জগতেত, হবে ধরা স্বথ শাস্তি পাবাবার ।

গুনিতে গুনিতে যেন বিশ্ব-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম,

একই চিতায় লভি পতি পত্নী নরবাণ !”

পুত্রের চিতার ভস্ম উভয়ে মাখিয়া বুকে,

ষোগী যোগিনীর বেশে, চলিলা শিবিরমুখে ।

হইল ঝটিকা-পূর্ণ জলধর বিচলিত,—

হয়ে অগ্রসর কৃষ্ণ, হৃদয়েতে উদ্বেলিত

মাখিলেন সেই ভস্ম ; উষার আকাশ পানে

চাহিয়া কহিলা শোক-প্রীতি-উদ্বেলিত প্রাণে—

“মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,

মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ,

না হয় মোচন যদি ; মানবের মুক্তি-পথ

রক্ত-সিদ্ধ গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবান্নিবৎ ;

একই নির্ধাতে নাথ ! একই নিমিষে হায় !

কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায় ?
 একই শ্রমশান মাত্র করি নাথ ! প্রজ্বলিত,
 কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত ?
 এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রাহিত
 যে শোণিত-পারাবার, কৃষ্ণের তপ্তশোণিত
 প্রতি বিন্দু সে সিকুর ; হা নাথ ! প্রতি শ্রমশান
 করিয়াছে ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ ।
 প্রতি রমণীর কণ্ঠ, অনাথার হাহাকাব,
 গাকারীর শোকোচ্ছ্বাস, শোক-ছবি উত্তরার,
 অজ্ঞানের উন্নততা, সে বৈরাগ্য সুভদ্রার,
 করিয়াছে কৃষ্ণ-প্রাণে শেলাঘাত অনিবার ।
 রাজহৃদয়ে বিনির্মিত ধর্মরাজ্য বাতাহত
 পড়িল ভাঙ্গিয়া যবে বালির স্বজন মত,
 বুঝিলাম তব ইচ্ছা, বিনা এই রক্ত দান,
 এ অগ্নি পরীক্ষা বিনা, হইবে না নিরমাণ
 ধর্মরাজ্য ধরাতলে হইবে না কদাচিত
 যত এ ভারতে মহাভারতরাজ্য স্থাপিত ।
 দিলাম অনলে আপ, হৃদয় বিদীর্ণ করি
 ঢালিলাম রক্ত-ধারা অষ্টাদশ দিন ধরি,
 তথাপিও প্রাণাধিক কুমায়ের এ শ্রমশান
 জ্বলিবে কৃষ্ণের প্রাণে হায় নাথ ! অনির্বাক্য ।
 নিষ্পাপ মানব-পুত্র নাহি দিলে বলিদান
 আত্মপ্রাণ, হবে না কি মানবের পরিত্রাণ ?
 নাহি তব, তব প্রাণ মানবের মহাপ্রাণ,
 তুমি সহিতেছ যদি, কৃষ্ণের হৃদয়ে স্থান
 পাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনকাম ।—

কর এবে ধরাতলে ধর্মরাজ্য নিরমাণ ।
 ওকি দৃশ্য !”—নারায়ণ স্বপনে যেন নিদ্রিত
 দেখিলেন কুমারের চিতা পুনঃ প্রজ্বলিত
 হইল, ছুঁইল অগ্নি প্রভাত-নভঃমণ্ডল,
 ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্বলিত চতানল
 উঠিল সে অগ্নি হ’তে ত্রিভূবন আলো করি
 “মহাভারতের” মূর্তি,—মাতা “রাজরাজেশ্বরী ।
 নব ধর্ম-কৈদি-মূলে বদিয়া দেবতাগণ—
 . আর্য্য অনার্য্যের—ধ্যানে ; বেদি-বক্ষে নিরুপম
 নিকামের মহামূর্তি ; তহপরি বিবাজিতা
 জননী আনন্দময়ী, অতুলা প্রতিভাবিতা ।
 বিদগ্ধ অধর্ম মল, রক্তবর্ণ কলেবর ;
 অন্ধৈন্দু-কিরীট শিরে, পাশাঙ্কুশ ধতুঃশর
 —সমরাত্র, শাসনাত্র,—হইয়াছে শোভমান ;
 চারি ভুজের চারি দিকে ; ত্রিনেত্রে ত্রিকাল-জ্ঞান ।
 ধর্ম-সম্রাজ্ঞীর মুখ, অনন্ত মহিমা ছবি,
 ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শাস্ত বাল-রবি ।
 অনন্ত মানব ব্যাপী ভবিষ্যত, বর্তমান,
 নয়নে আনন্দ-অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম ।
 পূর্ণ জীবনের ব্রত ; মন প্রাণ উদ্বেলিত,
 “মা ! মা !”—বলি নারায়ণ আনন্দাশ্রু বিগলিত,
 পড়িলেন ধরাতলে মানব-প্রেমে মূর্ছিত
 কুমারের চিতাপার্শ্বে ;—পূর্বাকাশ বিভাসিত
 হইল প্রভাতালোকে, বাজিয়া উঠিল ধীরে
 অনন্ত মঙ্গল বাত, প্রাবিষ্টা আনন্দনীড়ে
 কুরুক্ষেত্র স্মরণল উঠিল আনন্দ গীত,

ধর্মরাজ,—ধর্মরাজ্য,—করি উচ্চে বিধোষিত ।

আসিলেন ভদ্রার্জুন, উঠিলেন নারায়ণ,

আসিলেন ধীরে ধীরে শৈল সহ দ্বৈপায়ন ।

অগ্রে কুমারের চিতা, পূর্বব গগন পানে

চাহি স্থির নারায়ণ রহিলেন ষোগধ্যানে

পার্শ্বে স্থির ধনঞ্জয়, ভদ্রাদেবী মধ্যস্থলে

উভয়ে, তিন মুখ ভাসে প্রেম অশ্রুজলে ।

তিনের গৈরিক বেশ, বুক চিক্কাভয়ে মাখা,

ভদ্রার শৈবিক আলুলায়িত কুন্তলে ঢাকা ।

চিতার অপর পার্শ্বে জাহ্নু পাতি ধরাতলে

বসিয়াছে শৈল, শোভে কপোল ধারা-যুগলে ।

পার্শ্বে স্থির দ্বৈপায়ন, কপোলে যুগল ধারা,

কহিলেন দেব-ঋষি প্রেমানন্দে আত্মহারা—

“কি ত্রিমূর্তি অপার্থিব ! ভারত—জগত—বাসি !

দেবগণ ! ঋষিগণ ! একবার দেখ আসি !

জ্ঞানদেব নারায়ণ ; বলদেব ধনঞ্জয় ;

মধ্যে ভক্তিদেবী ভদ্রা , সমুখে মহিমাধর

চিতা আত্ম-বিসর্জন ; জ্ঞান, বল, আত্মদান,

ভক্তির নিকাম স্ত্রে সম্মিলিত, সমপ্রদ ।

এই চতুর্ভুজ, এই মানবের মোক্ষদাম,—

রাপরের অবতার পূর্ণ তব মনস্কাম !

পূর্ণকাম দ্বৈপায়ন, এই মহাতীর্থ দাম

দেখিল নয়ন ভরি, দেখিল ভরিয়া প্রাণ ।

নারায়ণ ! অগ্নরাথ ! দেও শক্তি ধরি' ধ্যান,

আনন্দে গাইব তব এ মহাভারত গান ।

ওনিয়া সে গীত, করি কলনামামৃত পান,

“মানব লভিবে মুক্তি, ধরা হবে স্বর্গধাম ”
 গুরু দেব পদাঙ্ক শৈলজা লইয়া শিবে,
 আ কুল কাঁদিয়া বালা কহিতে লাগিল ধীরে,—
 “হে গুরো ! কৃপায় তব, হা পুত্র ! স্নেহেতে তোর,
 অনার্য্য মাতার তোর আজি নারী-জন্ম ভোর ।
 জগন্নাথ ! জগৎপতে ! আর্য্য অনার্য্যের হরি !
 হে নীলমাধব ! দেও পদাঙ্ক দয়া করি
 পতিত অনার্য্যগণে, পতিত্বেপাবন নাম
 দেও বনপুত্র-মুখে, ধর্ম্মরাজ্যে দেও স্থান !”
 নিগূর্ণ নবীন তুণে অঙ্কুরিয়া হুটী কুল,
 একটা পড়িল বরি অকালে পুষ্প-মুকুল
 তোমার পবিত্র অঙ্কে । নির্মল কোরক আর
 আছে তার প্রেম-বৃন্তে । এই কলি স্কুমার
 ফুটাইয়া প্রেম-করে, হৃদয়েতে দলে দলে
 লিখিও তোমার নাম পিতৃ-প্রেম-অশ্রুজলে ।
 দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল ! দিও শিক্ষা আশ্র-দান !
 দিও পদাঙ্ক-ছায়া ! ধর্ম্মরাজ্যে দিও স্থান !
 শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
 নবীনের হয় এই অপরাহ্ন অবসান

সমাপ্ত ।

রৈবতক উৎসর্গিত

পিতার চরণে,

কুরুক্ষেত্র উৎসর্গিত

চরণে মাতার,

প্রভাস পত্নী ও পুত্র

•• নিশ্চলের করে

অর্পিতাম, নারায়ণ !

নিশ্চল্য তোমার ।

রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা,

কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস কাব্য

অন্তিমলীলা লইয়া রচিত । রৈবতকে

কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে

বিকাশ, এবং প্রভাসে

শেষ ।



(কাব্য)

—:~:—

প্রথম সর্গ।

—:~:—

ছায়া।

নির্মল আনন্দরাশি, নির্মল আনন্দ হাসি,
 প্রভাসের মহাসিদ্ধি। আনন্দ নির্মল,—
 জলরাশি ; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
 অপবাহু—বসন্তের গুল্ম চতুর্দশী।
 আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাশ্বর,
 প্রকৃতি আনন্দময়ী ঘোড়শী রূপসী।
 আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
 আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাশ্বর।
 নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,

মিশাইয়া পরস্পরে,— মহা আলিসন !
 মহাদৃষ্ট !—অনন্তের অনন্ত মিলন !
 নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা ; বেলায় তরঙ্গ-খেলা ;
 দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
 গাইয়া আনন্দগীত, চুষ্টি অনিবার ।
 সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
 সাক্ষাৎ বকিরে হাঁসে বেলা সিন্ধুরাণী ।
 বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
 বিচিত্র কেতনশিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
 সিন্ধুমত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত ।
 অসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
 গজপুংগব, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
 কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধুমত ।
 কিছুদূরে মনোহর বঙ্কিম বেল'য়,
 নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
 রুমের শিবিরশ্রেণী তুলি উর্দ্ধে শির
 শোভিতেছে যেন দেব পবিত্র মন্দির ।
 শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিকুপম,
 নীল কেতনের বক্ষে, পীত স্তদর্শন
 কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে,
 করিছে মহিমাময় ! সিন্ধু অবিরাম
 অসংখ্য তরঙ্গ করে করিছে প্রণাম ।
 সূবর্ণ-পর্যাক্ত অঙ্কে আনন্দরূপিনী
 চারু উপধানে অঙ্কশায়িতা কুঞ্জিনী ।
 সত্যভামা পাশে বসি, নিরানন্দ যুগলী ;
 সত্যভামা পর্বে শোভা বিমল-সুতার,

দীপ্ত সন্ধ্যা পার্শ্বে যেন কুল জ্যোৎস্নার ।
 নির্নিমেষ নেত্র চারি, চাহিয়া অনন্ত বারি,
 অনন্ত বারির ক্রীড়া অনন্ত সুন্দর,—
 চিত্তাকুল সত্যভামা, কুঞ্চিত অধর ।
 বিমুক্ত কবরীবাশি, পড়েছে পর্য্যবে ভাসি,
 সুধাকর হ'তে যেন নীলামৃত ধারা ;
 সাক্ষ্য গগনের মত স্থির-নেত্র তারা ।
 সেই মুক্তকেশপটে সে রূপের খেলা,—
 সন্ধ্যা-পটে বসন্তের অপরাহ্ন বেলা ।
 উভয়ে নীরবে ধ্যানে, চাহিয়া সিদ্ধুর পানে ;
 কল্পিণীর দৃষ্টি,—দৃষ্টি শান্ত জ্যোৎস্নার ।
 সত্যভামা দৃষ্টি,—দৃষ্টি গাম্ভীর্য্য সন্ধ্যার ।
 চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধা বিদর্ভনন্দিনী—
 “কি অনন্ত শোভা ! দিদি ।”—কহিল কল্পিণী ।
 “অপরাহ্ন শেষে শান্ত সমুদ্র-হৃদয়
 হইয়াছে সমুজ্জল নীলমণিময় ।
 সিদ্ধু যেন পূণ্যবাশি, কিংগ আনন্দ হাসি
 সিদ্ধুবক্ষে বসন্তের সাক্ষ্য রবিকর,—
 পূণ্যবক্ষে আনন্দের আলোক সুন্দর ।
 আনন্দ-মণ্ডিত, পুণ্যে পূর্ণিত অর্গব,
 চেয়ে দেখ ।”—সত্যভামা নিম্পন্দ নীরব ।
 নিম্পন্দ নীরব চাহি চাহি কিছুক্ষণ
 কহিল কল্পিণী—“দিদি ! সৃষ্টির প্রথম
 অনন্ত সলিলবক্ষে ছিল নারায়ণ
 ভাসমান,—দেখ সেই দৃশ্য নিরূপম ।
 দেখ সেই পারাবার । ভাসিতেছে বক্ষে তার

জ্যোতিরূপী নারায়ণ—সায়াকৃ-কিরণ !

অনন্ত সলিল বক্ষে দেখ নারায়ণ !

হায় ! দিদি, আমাদের পতি নারায়ণ !

ওই পারাবার মত, হয় যদি পরিণত

আমাদের শিলাময় কঠিন হৃদয়

প্রেম-পারাবারে, হেন অনন্ত অক্ষয় !

এমনি নির্মল প্রেম, এমনি অতল,

• আনন্দ লহরীময়, এমনি শীতল ।

আমাদের হৃদয়েতে তবে নারায়ণ

ভাসিতেন যেন ওই রবির কিরণ !”

আনন্দে রাণী বিহ্বলা, ধরি সভ্যভামা-গলা

কহিল উচ্ছ্বসে ; হুই মুক্তা নিরমল

ভাসিল-রাণীর হুই নয়নে সজল ।

হুই মুক্তা সমুজ্জল, হুই বিন্দু অশ্রুজল,

ভাসিল নয়নে—প্রেম-সমুদ্র বিভব

রমণীর ; —সভ্যভামা নিম্পন্দ নীরব ।

সেই নেত্র ছল ছল, সে মুখ অকণোজ্জল

মেঘাচ্ছন্ন নিবন্ধিধা কহিলা কল্পিণী,—

“এ কি, দিদি, কেন তুই এত বিষাদিনী ?

উৎসব আনন্দে প্রাণ, সকলের ভাসমান,

উৎসবে যাদবগণ উন্নত অধীর ;

তোর মুখে কেন এই বিষাদ গভীর ?”

বিষাদ গভীর কণ্ঠে উত্তরিলা রাণী,—

“সত্য, দিদি, কি অজ্ঞাত বিষাদে না জানি

ভুবিয়া যেতেছে যেন হৃদয় আমার,

যত ভাসাইতে প্রাণ চাহিতেছি, তত জান

হইতেছে শিলাময় ; ভুবিছে হৃদয়

বিষাদ-সিকুর গর্ভে নিবানন্দময় ।

তুধু দিদি আজ নয়, প্রাণ নিবানন্দময়

বহু দিন, বহু দিন হৃদয়ে আমার

হইয়াছে কি যেন কি ছায়ায় সঞ্চার ।”

কুস্মিনী । কেন দিদি, কি ছায়া সে ? কেমনে সঞ্চার

হইল হৃদয়ে তোর ? কেন এ বিষাদ ঘোর ?

আমরা রাজার কন্যা, প্রেয়সী রাজার,

পতি নর-নারায়ণ-বিষ্ণু অবতার ।

পুত্রগণ ইন্দ্রসম, রূপে গুণে নিরূপম ;

রূপ গুণ প্রেম তোর জগতে হ্রলভ ।

তোর হৃদয়েতে ছায়া, এ কি অসম্ভব !

মত্য শুন নাই তুমি, দিদি, কত অমঙ্গল

ঝটিয়াছে যাদবের রাজ্যে অবিরল ।

বলি নাই, কে বলিবে ? তোর প্রাণে ব্যথা দিবে,

নাহি চাহে কারো প্রাণ । সবল তরল

তোর প্রাণ, শিশিরাক্ত কামিনী কোমল,

পড়ে বরে পরশনে ; তোবে অকরণ মনে

কে কহিবে অমঙ্গল হুঃখ-সমাচার ?

নিকেপিবে শিলা প্রাণে যুধিকামালার ?

ত্রিদিবের কোমলতা, ত্রিদিবের প্রেমলতা,

ত্রিদিবের পবিত্রতা, এ মর্ত্যে কঠিন

কেমনে আসিলি তুই, ভাবি চিরদিন ।

আহিস্ এ মর্ত্যে পড়ি, এই দেবীরূপ ধরি,

এ মাটির পৃথিবীর তুই কিছু নয়,

মাটির বাতাস তোর প্রাণে নাহি সয় ।

কষ্টিণী

বড় নিরাশ্রয় আমি, বড়ই দুর্বল,

সত্য দিদি কিছু আমি, সংসারের নাহি জানি

আমার আশ্রয় তোর, সুভদ্রার, গলা ।

তুই দিকে তুই জন, না থাকিলে অনুক্ষণ,

কবে এত দিনে, দিদি, এই লতা কীণা

যেতো শুকাইয়া অবলহন-বিহীনা ।

কি ঘটেছে অমঙ্গল, কিছুই না জানি, বল !

কুশলে ত আছে বঁল পুত্রকল্যাণ ?

আশ্রমে আছেন ভাল ভদ্রা নারায়ণ ?

সত্য ।

সকলে আছেন ভাল । কিন্তু অমঙ্গল

বহু দিন হ'তে, দিদি, ঘটিছে কেবল ।

বহু দিন অনাবৃষ্টি; মহানদীচর

হইয়াছে শুষ্কপ্রায়; মহাশব্দে বয়

ঝটিকা শরীরবর্ষী; নীহারে আবৃত

প্রদোষে প্রভাতে দিক; পড়ে অনিবার

উদ্ধারশি যত্নরাজ্যে বরষি অঙ্গার ।

নাহি দিবাকর আর তেমন উজ্জল;

ধূলি ধূসরিত যেন আদিত্যমণ্ডল

শ্রামল, অরুণ ভঙ্গ, বর্ণের বিকৃত

অবয়বে চক্রে সূর্য্য গগন আবৃত ।

ঘন ঘন ভূমিকম্প ।। ভূধর উদরে

কি ঘর্ষর শব্দ ! শুনি শরীর শিহরে ।

মূষিকের উপদ্রব স্থান নির্কিংশেষ;

ঘুমালে ষাটবগণ কাটে নথ কেশ ।

গৃহ, পথ, সরোবর, বন, উপবন,

মৃত মূষিকেতে নিত্য পূর্ণ অগণন ।

দিবা নিশি পশু পক্ষী, পালি গা সারিকা,
ডাকিছে বিকৃত কণ্ঠে, যেন বিভীষিকা
দেখিতেছে অশুষ্কণ; বহে অনিবার
তপ্ত রুদ্ধ বায়ু যেন করি হাহাকার।

কল্পিণী দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, অ মি এ সফল।
কিন্তু দিদি, প্রাণে মম, ভাসে নাই তোর সম
কোনো অমঙ্গল ছায়া; বিষাদে আধার
করে নাই কই, দিদি, হৃদয় আমার।
মঙ্গল ও অমঙ্গল, অনন্ত বিশ্বমণ্ডল,
বাহার সৃজন, তিনি মঙ্গল-নিদান।
তিনি দয়াময় প্রেমময় ভগবান।
আমরা এ ক্ষুদ্র জীব, কিবা শিব, কি অশিব,
কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, আলোচনা তার,—
পতঙ্গের প্রগল্ভতা বিশ্ব বুদ্ধিবার।
স্রষ্টার এমন সৃষ্টি, যে ভাবে করিবে দৃষ্টি,
দেখ মঙ্গলের ভাবে মঙ্গল সকল।
অমঙ্গল ভাবে দেখ সব অমঙ্গল।
কি মঙ্গল, অমঙ্গল, সুখ দুঃখ যাহা বল,
সকলি মানব মনে; জগত কেবল
সুখময়, শোভাময়, অনন্ত মঙ্গল।
দিদি, ভ্রান্তি কর দূর, হয়েছে যাদবপুর,
হইয়াছে বহুকরা অমঙ্গলময়
অনারুষ্টি হে হু; দিদি, আর কিছু নয়।
হইবে স্রষ্টি যবে, ধনে ধাত্রে পূর্ণ হবে
আবার যাদব-রাজ্য, হাসিবে আবার
বহুকরা, হুে বিশ্ব সুখ-পারাবার।

সত্য । ভারত যুদ্ধের কালে ঘোর অমঙ্গল
ঘটেছিল এইরূপ গুনিয়াছি আমি ।
কলিল তাহার হায ! কি ভীষণ ফল !
যত্নকুল ভাগ্যে, দিদি, কি আছে না জানি !
কল্পিণী । ভারত-যুদ্ধের ফল ভীষণ এমন,

কে বলিল সত্যভাষা ?

ভারত-যুদ্ধের ফল, কি আনন্দ নিরমল !
ভারত ব্যাপিয়া শাস্তি, ধর্মের উত্থান,
ভারত ব্যাপিয়া উঠিতেছে হরিণাম ।
জরাসন্ধ, শিশুপাল, অসংখ্য অবনীপাল,
অধর্মের মহীকূহ, নাহি তুর্য্যোধন,
আপনার পাপানলে ভস্ম পাপিগণ ।
কৃত্রণ কুব-সংগ কাটি যথা অগণন,
স্বত্বগে পূর্ণিত ক্ষেত্র করে আপনার,
হতেছে স্বত্বগে পূর্ণ ভারত আবাস !

সত্য । দেখেছি যা হনহনে, স্বপ্নে নহে, জাগরণে,
দেগিতে যতপি তুমি, হৃদয়ে তোমার
হইত নিশ্চয় দিদি ভীতির সঞ্চারণ ।

কত নিশি বোরতরা, সমাচ্ছন্ন বসুন্ধরা
নিবিড় তিমিরে, ঘোর কৃষ্ণ আবরণে,
দেখিয়াছি—স্বরিলেণ্ড ভয় হয় মনে !
দেখিয়াছি শয্যাকক্ষে, দেখিয়াছি এই চক্ষে,
মহামেঘ-প্রভা কৃষ্ণা নারী উন্মাদিনী,
মুক্তবেশী মহামেঘে কৃষ্ণা সৌদামিনী ।
হাসিতেছে বল বল, হনহনে কি অনল
জ্বলিতেছে, অঙ্গে অঙ্গে মহিমা-স্বপন,

করে ধনু, পৃষ্ঠে তুল, গর্জিত বদন।

কি গর্ব কুক্ষিতাধরে, পৌনোন্নত বক্ষোপরে !

কি গর্ব চরণক্ষেপে, সৌন্দর্যে ভীষণ !

আসিত যাইত বামা উদ্ধার মতন।

রুক্মিণী। সত্যভামা ! পরিহাস তোরে নিরন্তর

করিতে বাসেন বড় ভাল প্রাণেশ্বর।

নিশ্চয় এ তাঁর খেল ! 'তো'র কক্ষ ! অবহেলা

করিবে সে ত্রিদিবের, সাধ্য দেবতার

নাহি, দিদি, তুচ্ছ অপদেবতা কি ছার ?

সে পবিত্র স্বর্গধাম প্রবেশিতে কাঁপে প্রাণ

পুণ্যের ভকতিভাত ; করিবে প্রবেশ

পাপের কি সাধ্য বল সে পবিত্র দেশ !

সত্য। যে অশান্তি বোরতর হয়েছে সঞ্চার

যহকুলে, গৃহে গৃহে,—এও লীলা তাঁর ?

গৃহে গৃহে, কক্ষে কক্ষে, যাদবের বক্ষে বক্ষে,

বিধুনিত যে ভীষণ অশান্তি অনল,

পড়ে নাহি ছায়া তব হৃদয়ে সরল।

থাক উদাসিনী মত পতিধ্যানে অবিরত,

বাণিকার মত তব হৃদয় তরল,

ন হি জন চারিদিকে কি যে হলাহল

জলিতেছে নিরন্তর, জর্জরিত কলেবর

কি বিধেবে যাদবেরা, কি হিংসা অনল

কক্ষে কক্ষে, বক্ষে বক্ষে, জলে অবিরল।

এ অনলে সুরাপান করিছে আহতি দান

কি ভীষণ ! নিরন্তর, বিনা হশীকেশ,

নর নারী সুরাপানে মত্ত নির্কিংশেষ।

কেহ করে নাহি মানে, কেহ করে নাহি জানে,
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, কিছু নাহি জ্ঞান,
নাহি লজ্জা ভয়, পাপে বদন অন্নান ।

পরস্পরে কি বিদ্বেষ ! ব্যভিচার কি, অশেষ !

পিতাপুত্র পতিপত্নী পবিত্র বন্ধন

প্রবঞ্চনা ব্যভিচার করেছে ছেদন ।

সত্য, বুঝি মূর্তিমতী, সেই ভীমা রূপবতী,

ভ্রমিছে অশান্তি কঙ্ক কঙ্ক দ্বারকায়,

আচ্ছন্ন করিয়া পুরী বিশাল ছায়ায় ।

কুস্মিনী । কি ভীষণ চিত্র দিদি ! আঁকিলি নয়নে !

এও তাঁর লীলা, মম হইতেছে মনে ।

কিন্তু তোর, এ কি ভ্রান্তি ! ভারতের সে অশান্তি

লুকাইল স্বপ্ন মত লীলায় যাহার,

ভিনি যাদবের পতি তিনি কর্ণধার ।

দেখি' যাদবগণ করি স্মৃথে অতিক্রম

এ অশান্তি পারাগার, শাস্তির বেলায়,

প্রভাস উৎসব অস্তে, ঘাইবে হেলায় ।

ওই গুন কি তরঙ্গ, গুন কি তরঙ্গ-ভঙ্গ

হইতেছে আনন্দের শিবিরে শিবিরে,

সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ অমুকারি তীরে ।

কোথাও অশান্তি ছায়া, কালের সে কালী কায়,

দেখিস কি ? গুনিস কি শ্রবণে এখন

কোথাও সে অশান্তির অক্ষুটানিশ্বন ?

তাহার লীলার তীর কে পাইবে ? অশান্তির

দুই ভিন্ন লীলায় কি হবে পরাভব ?—

কুরুক্ষেত্র ধ্বংস লীলা, প্রভাসে উৎসব ?

বহুক্ষণ সত্যভামা রহিলা নীরবে
 চাহি সাক্ষ্য সিদ্ধপানে, নিমজ্জিতা যেন ধ্যানে
 ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আসি সিদ্ধ নীলিমায়
 মাথিছে নীলিমা আরো গভীর ছায়ায় ।
 “দিদি, যাহা कह তুমি ; আমার হৃদয়-ভূমি”
 कहিলেন সত্যভামা—“ছাইয়া সতত
 সিদ্ধ-বক্ষে ধীরে ওই সন্ধ্যা-ছায়া মত,
 হইতেছে গাঢ়তর সেই ছায়া নিরন্তর ;
 এই আনন্দের ধ্বনি শ্রবণে আমার
 ধ্বনিতোছে যেন অশাস্তির হাহাকার ।
 দেখ ওই সিদ্ধ নীর, কেমন প্রশান্ত স্থির !
 মুহূর্ত্তে, ঝটিকা তাহে হইলে সঞ্চার
 দোপনে হইবে বিধূনিত পারাবার ।
 এই শাস্তি যাদবের, এই ধ্বনি আনন্দের
 শুনিওছ, কোন দিকে দেয় দরশন
 যদি মেঘ, উঠিবে কি ঝটিকা ভীষণ !”
 নারায়ণ ধীরে ধীরে পশিলেন এ শিবিরে,
 প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি ! আয়ত নয়ন
 প্রশান্ত প্রসন্ন, যেন সায়াহু গগন ।
 প্রণমিলা হই রাণী পরশিয়া পা ছুখানি,—
 অগ্রে সত্যভামা, পরে বিদর্ভনন্দিনী,
 অগ্রে উষা, পরে দিবা সূচাকুহাসিনী,
 নমিলা উদয়াচল পদতল নীলোজ্জল,
 শরৎের স্প্রশতোতে ; বসিলা কেশব
 পর্যাঙ্কে, বসিলা ছই রমণী বিভব ।
 লইয়া পতির কর নিজ করে ক্ষুদ্রতর,

রক্তোৎপলে নীলোৎপল করিয়া স্থাপিত,
কহিলা রুক্মিণী—“নাথ ! হইয়াছে ভীত
সত্যভামা ! দয়াময় ! দূর কর ত'র ভয়,
অমঙ্গল অশাস্তির ছায়া কি ভীষণ
করেছে আচ্ছন্ন তার হৃদয়-গগন ।
উৎসবের এ উচ্ছ্বাসে, তাহার হৃদয়াকাশে,
একটিও আনন্দের নক্ষত্র উজ্জল
ফুটে নাই, মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কেবল ।”

স্মিতমুখ ইন্দীবর, কোতুক কুঞ্চিতাধর,
“মহিষি !—কহিলা কৃষ্ণ—“বিচিত্র কি আর
নিত্য এই ভাব সত্যভামার তোমার ।

বিধাতার এ মঙ্গল শাস্তিপূর্ণ দদাতল
শোভাময়, সুখময়, এই পুণ্যময়,
উৎসবের আনন্দের অনন্ত আলয় ।

সুখশাস্তি সুমঙ্গল, সত্যভামা, তুমি বল,
দেখেছে কি এ জীবনে কোথাও কখন ?
পেচক আলোক নাহি দেখে কদাচন ।

খুজি এই ভূমণ্ডল কোথা পাবে অমঙ্গল,
কোথায় অশাস্তি পাবে সত্যভামা চায় ;
যে চায় বেরূপ, রাণি ! সেইরূপ পায় ।

চন্দ্রে সে কলঙ্ক খোজে, কুসুমের কণ্টক,
জ্যোৎস্নায় মেঘছায়া, ত্রিদিগে নরক ।
নাহি সাধ্য বিধাতার নির্দোষ হবেন পাব
এ জগতে একমাত্র পূর্ণ-নির্ভিকার—

সত্যভামা,—সত্যভামা,—সত্যভামা আর ।”

রুক্মিণী। এ কোতুক তাক নাথ ! করো না প্রাণে আঘাত,

আজি নহে সত্যভামা মানিনী তোমার
 উঠিয়াছে প্রাণে তার বড় হাহাকার ।
 যাদবের অমঙ্গল, কি যে ঘন মেঘদল,
 ছাইয়াছে স্নেহপূর্ণ হৃদয় তাহার ;—
 তুমি যে যাদবপতি, অমঙ্গল তার ?
 মুকুন্দ ফিরায়ে মুখ, কিবা মৃত্তিমতী দুঃখ ।
 দেখিলেন সত্যভামা, চাহিয়া নীরবে
 আত্মহারা ঘোর ক্লক সায়াহ্ন-অর্ণবে !
 পতির কৌতুকবাণী, চিন্তা নিমজ্জিতা রংগী
 শুনে নাই । যেই জিহ্বা শ্লেষের আশুন
 তপ্ত অঙ্গারের মত বর্ষণে নিপুণ,
 অচল সে । বসবন্ধে, বন্ধের তবন্ধ-ভঙ্গে,
 যেই হৃদয়ের, ক্লক ধেতেন ভাসিয়া,
 সেই সিদ্ধ স্থির, মেঘে বেথেছে ছাইয়া ।
 দীপালোকে সত্যভামা বসি, বিষাদিনী বামা,
 শেষ সন্ধা মত, দেহ অবচল স্থির,—
 দেখি গোবিন্দের মুখ হইল গম্ভীর ।
 নতমুখ, অগ্র মন, শিবিরেতে কিছুকণ
 ভ্রমিয়া কছিল দেব,—“শান্তি অমঙ্গল
 সকলেই মানবের নিজ কর্মফল ।
 সেই কর্মফল রেখা,—উহাই অনৃষ্ট-লেখা—
 মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
 কার সাধ্য সেই লেখা কবিরে মোচন ?
 কুন্তিণি ! ফিরায়ে নেত্র, রাজহুয় যজ্ঞক্ষেত্র
 একবার শাস্তভাবে কর দরশন ।
 হায় ! ভারতের সেই অশান্তি ভীষণ

রাজস্বয় যজ্ঞস্থলে নিবারণিহু কি কোশলে !

বলি দিয়া অশান্তির হুই অবতার,

করিলাম শান্তির সে সাম্রাজ্য প্রচার !

কিন্তু কি হইল বল ? অধর্মী প্রচণ্ডানল

জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে, পতঙ্গের মত

হইল ভস্মিত, করি শ্মশান ভাবত ।

কত যত্ন করিলাম, জ্ঞান তুমি অগ্নিরাম

নিবারিতে কুরুক্ষেত্র, হইল নিফল,—

পূর্ণ অধর্মের, রাণি ! ধ্বংস কর্মকল ।

অধর্মের যে উত্থান জ্বালাইল সে শ্মশান,

সে অধর্ম যাদবের অস্থিমাংসগত,

বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত ।

এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল ;

কেমনে নিবারি,—কেন নিবারিব আমি ?

নহে যাদবের, আমি মানবের স্বামী !”

“আমি মানবের স্বামী”—শিহরিয়া হুই রাণী

দেখিলা যোগস্থ মূর্তি নীলমণিময়

দীপিতেছে দীপালোকে উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় !

দূর ঝটিকার মত ও কি শব্দ অবিরত

আসিতেছে ভাসাইয়া আনন্দ-উৎসব —

মানবের হাহাকার, পক্ষী-কলরব !

কাঁপিতেছে ঘন ঘন ধরা ক্ষুদ্র দোলা সম,

রুজ্জ্বিনী ও সত্যভামা পতিপদতলে

পড়িলেন শয্যালব্ধী প্রকম্পন-বলে ।

পতনে অর্জমুর্ছিতা, ধরিয়া বিস্মিতা ভীত

পতির চরণদ্বয়, উঠিলা কাঁদিয়া,

সমুদ্র-গর্জন তাহা নিল ভাসাইয়া ।
কাঁপে ধরা ঘন ঘন ; জীমূত গর্জন সম
গর্জিতেছে মহাসিন্ধু ভীম বেশ ধরি ;
কেবল যোগস্থ স্থির দাঁড়াইয়া হরি ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

—*—

অভিশাপ ।

অতীত প্রহর নিশি ; মহর্ষি তুর্কাসা
বৈবতক গিরি-বক্ষে বসি চিন্তাকুল ;
বসি চিন্তাকুল পার্শ্বে ঋষি কতিপয় ।
কক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশি অজ্ঞাতে
বসন্তের নৈশানিল কাঁপাইছে ধীরে
এক ক্ষীণা দীপশিখা । কম্পিত আলোক
কাঁপাইয়া প্রাচীরেতে নানা অবয়বে
বিকৃত, বীভৎস, কৃষ্ণ ছায়া ঋষিদের,
দেখাইতে কক্ষ ক্ষুদ্র প্রেতভূমি মত ।

আরভিলা ঋষি এক—“মহর্ষি ! ষথায়
ভেদিয়া জীমূত রাজ্য, আবর্ত ঋতুর,
তুলিয়া অনন্ত শির অনন্ত আকাশে
ভূধারমুকুটসহ,—মণ্ডিত বজতে
শশধর গুলকরে, তপ্ত স্বর্ণময়

উদয়াস্ত ভাস্করের কর পরশনে—
 বিরাজেন হিমাচল, তুলিয়া মস্তক
 প্রসারি অনন্ত ফণা নাগেন্দ্র যেমতি
 অনন্ত, অনন্তব্যাপি কীরোদ সাগরে ।
 তাঁহার ছায়ায় আমি উত্তর ভারতে,
 জার্কবী যমুনা শৈলসুতা অসংখ্য
 সরল কৈশোর লীলা করি দরশন,
 দেখি শৈল অঙ্কে অঙ্কে নাচিয়া ঘুরিয়া
 সেই ক্রীড়া, সেই লক্ষ প্রস্তরে প্রস্তরে,
 তুমি সেই সুমধুর কৈশোর সঙ্গীত,
 ভ্রমিয়াছি বহু বর্ষ ।”

“ভ্রমিয়াছি আমি”—

কহিল দ্বিতীয় শিষ্য—“মহর্ষি ! যথায়
 পঞ্চমুখ বিনিঃসৃত সুধাস্রোত মত
 সঙ্গীতের সুশীতল, নির্মল শীতল
 বহিতেছে পঞ্চনদ ; শোভিতেছে পঞ্চ
 নীলমণি হার বক্ষে পঞ্চনদ-ভূমি
 প্রসবি ঐশ্বর্য্য পৈর্য্য ; হিমাদ্রি মুকুট
 শোভে শিরে সুরঞ্জিত কান্দীর কুসুমে,
 সিদ্ধ বর্কে পাদপদ্ম সদা ভাসমান,
 দিকু পদাঙ্ক মত । ভ্রমিয়াছি আমি
 শৈলে বিচিত্রিত, শৈলপ্রাচীরে রক্ষিত,
 গাঙ্গারীর জগদভূমি পবিত্র গাঙ্গার ।”

কহিল তৃতীয় শিষ্য—“গুরুদেব ! আমি
 ভ্রমিয়াছি স্বর্ণপ্রস্থ পূর্ব ভারত
 মিথিলা, মগধ, বঙ্গ, কলিক, উৎকল ;

শতমুখী শতভুজা জাহ্নবী যথায়,
শতমুখে শত ধারা স্বধা সঞ্জীবনী,
শতভূজে বহুবাশি, করিয়া বর্ষা,
রেখেছেন সাজাইয়া নিকুঞ্জ নিখর
প্রকৃতির ফলে পুষ্পে, পাদপে লতায় ;
উভাল যৌবনগর্বে শৈলজা যথায়
শতমুখে উচ্ছসিত সিদ্ধ বিচূষিমা
ঢালিছেন প্রেমধারা স্বধা প্লাবিতা।”

কহিল চতুর্ধ শিষ্য—“ঋষিশ্রেষ্ঠ : আমি
ভ্রমিয়াছি মরুভূমি মধ্য ভারতের।
যেই বিধি সৃজিলেন কমলে কণ্টক,
শশাঙ্কে কলক, শমী হৃদয়ে অনল,
কামনা হৃৎপূরণীয় মানব হৃদয়ে,
সেই বিধি বুঝি হায় ! নিদারুণ মনে
হৃদয় করিল মরু ভারত মাতার !
রাখিল চাপিয়া বক্ষে বিদ্যা, আরাবলি,
ভীষণ কঠিন শৈল অচল যুগল !
কিংবা বুঝি ভ্রাস্তি মম ;—বিদ্যা, আরাবলি,
বুঝি মাতৃস্তনদ্বয় ; হায় ! অবিরল
বহি চান্নি স্তম্ভধারা অমৃত শীতল,
মহানদী, গোদাবরী, নর্মদা, তপতী
পালিয়া সস্তানগণে যুগ যুগান্তরে,
হইয়াছে জননীর বিত্তক হৃদয়,—
হায় ! নরধম মোরা !” হইল সজল
ঋষির নয়নদ্বয়। কহিল কাতরে—
“মাতৃভক্তি, মাতৃপ্রেম দিয়া প্রতিদানে

করি নাই সে হৃদয় সজল শ্রামল !
হইল কেমনে হায় । ভারত-সন্তান
সহৃদয়, অহৃদয় মেঘের অধম ?
নিদাঘে বসুধা-স্তম্ভ পান করি মেঘ,
বরিষায় সেই ঋণ করে পরিশোধ
অজস্র ধারায় ।”

ঋষি কহিল পঞ্চম—

“ঋষীন্দ্র । দক্ষিণাপথ ভ্রমিয়াছি আমি,
রাম সীতা লক্ষ্মণের পদাঙ্ক অমর
অনুসরি ; পত্নীপ্রেম, আত্মবিসর্জন ।
পতি প্রেমে, ভ্রাতৃ প্রেমে, কবি নিতীক্ষণ
চিত্রিত অমর বর্ণে, চিত্রপটে যেন,
অঙ্কে অঙ্কে পথে পথে দক্ষিণাপথের,
পবিত্রাদণ্ডকারণ্যে, পম্পা সরোবরে ;
শুনি অন্তরীক্ষে যেন সে করুণ গীত,
অমৃতবর্ষিনী সেই বীণা বাজীকির ।
দেখিছি মলয়, নীল, অচল যুগল—
জননীর সুপবিত্র যুগল চরণ,
সম্মিলিত কুমারীতে, ভাসিতে সাগরে
আকঙ্ক, তরঙ্গ তুলি লীলা মহিমার ;
সুপবিত্র স্বর্ণময় করি লঙ্কাপুরী
জননীর শ্রীচরণ রেণুর শৃঙ্খলে ।
জননীর কটিতটে নীলমণি মালা
দেখিয়াছি কৃষ্ণা, আমি শুনেছি চরণে
কল্লোলিনী কাবেরীর শিজিনী শিঞ্জন ।”

দুর্কাসা । উত্তম । নীরব ঋষি, নীরব সকল

হির নেত্রে চাহিয়া হুঁসীসা
কক্ষ প্রাচীরের পানে ; সেই মুখ পানে
চাহি শিষ্য পঞ্চ জন ;—নীরব সকল ।
হুঁসীসা । কি দেখিলে, কি শুনিলে ?

অবনত মুখ
করিলেন ঋষি পঞ্চ, রহিলা নীরব ।
হুঁসীসা । কি দেখিলে,—কি শুনিলে ?
প্রঃ শিষ্য । যোগীন্দ্র । সকলে

দোঁথাছি চক্ষু, কর্ণে শুনিয়াছি বাহা,
নাহি শক্তি, নাহি ভাষা, নিবেদিতে পদে ।
যে অশাস্তি, পূর্বে ছায়া ঘোর ঝটিকার,
ছিল কুরুক্ষেত্র পূর্বে ব্যাপিয়া ভারত
প্রলয়ের মেঘমত, ঝটিকা গর্জ্জন,
ভীষণ জীমূত মস্ত, সেই অশাস্তির,—
ঈর্ষা ক্রোধ বিক্ষুব্ধ বিহ্বল যি মত
রাজ্যে রাজ্যে পরম্পরে, নগরে নগরে,
গৃহে গৃহে, নরে নরে,—ঘন বজ্রপাত,
রাজ্যে রাজ্যে সংঘর্ষণ, আকুল ভারত
আসমুদ্র হিমাচল, করি প্রকাম্পিত,—
আসিঙ্গ অচল, দেব । দেব । আগজা গান্ধার,
সান্থদের হাহাকার, ঘোর হুঙ্কার
হৃৎতের, অধর্মের সে নৃত্য ভীষণ,—
নাহি আর । সে অশাস্তি গিয়াছে সরিয়া
তিমিরা-রাক্ষসী যেন দিবাকর করে ।
কুরুক্ষেত্র-ঝটিকায় গর্জিয়া, বধিয়া,
অসংখ্য অশনিপাতে করিয়া নিপাত

আপনার জন্মদাতা মহাপতিগণ,—

অধর্মের সে করাল মহামেঘমালা

হইয়াছে নিঃশেষিতা আত্ম-বিনাশিনী ।

ভীষণ ঝটিকা অন্তে প্রকৃতির মত

হাসিছেন মেঘমুক্তা ভারতজননী

কি মধুর শান্তি-হাসি ! ভারত জননী

অশান্তির দাব-দুহা, হইয়া শ্রামলা

আজি বিমণ্ডিতা কিবা শান্তি-কোয়াংসায়

নিরমল স্নগীতল ! নীলাবু সাগরে

ভাসমানা নিভা মাতা নীলাজ্ঞ রূপিণী, .

আজি ভাসিছেন কিবা শান্তির সাগরে

নিরমল স্নগীতল নীলামৃতময় !

প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য । ব্যাপিঘা ভারত

এক মহারাজ্য ছত্র । ছায়ায় তাহার

খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম

শান্তির কোমল অঙ্কে ; হতেছে চালিত

শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত ।

নাহি হিংসা, নাহি ঘেব । সৌরশক্তি মত

করিয়াছে নব ধর্ম প্রেমে শৃঙ্খলিত ;

করিয়াছে কি উন্নতি-পথে নক্ষালিত !

বাণিজ্যের রুদ্ধ স্রোত ছুটেছে আবার

প্রাবি ধনধাত্তে ধরা ; রুদ্ধ জ্ঞান-স্রোত

দর্শন বিজ্ঞান পক্ষে ছুটেছে আবার

লজ্জি গ্রহ উপগ্রহ, রাজ্যে অনন্তের,

তত্ত্ব রত্নে পূর্ণ করি জ্ঞানের ভাণ্ডার,

এক সিদ্ধ গর্ভে ; এক বর্ণ সর্বসঙ্গে,

বিবাজিত নব প্রেমে গলাগলি করি
 ধনমাতা জ্ঞানমাতা, — চির বিরোধিনী—
 আলিঙ্গিয়া নারায়ণে । শান্তি পারাবার
 সেই সিদ্ধ ; নব রাজ্য সেই শতদল ;
 সেই নারায়ণ কৃষ্ণ । শান্তি পারাবার
 গাইতেছে কৃষ্ণ নাম অনন্ত উচ্চাসে ।
 নব রাজ্য নীরজের অক্ষয় মৃণাল
 কৃষ্ণনাম ; নব ধর্ম মন্ত্র কৃষ্ণনাম ।
 আসমুদ্র হিমাচল ভারত কেবল
 গাইতেছে কৃষ্ণ নাম আনন্দে বিহ্বল ।

হাসিঘা বিকট হাসি কহিলা হর্কাসা—
 “হায় ! জড় মূর্খ নব ! বুঝিলনা কেহ
 কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা হর্কাসার ।
 কৃষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের,
 এই মহা নরমেধ করে উদ্ঘাপন !
 সাজি পাণ্ডবের দূত কতই কৌশলে
 পেতেছিল বড়মন্ত্র সন্ধির কারণ
 প্রাণপণে ! নারায়ণ দাঁতে তৃণ লয়ে
 মাগিলেন পঞ্চ গ্রাম । “হ্যচ্যগ্র মেদিনী
 নাহি দিব”—ভুলিলেন মন্ত্র হর্কাসার ।
 ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দান্তিক
 পোড়াইয়া, আধিপত্য বেদ ব্রাহ্মণের
 রক্ষিতে, করিয়া সেই যজ্ঞ নরমেধ
 স্থাপিলাম এই শান্তি আসিদ্ধ অচল—
 কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন !
 হা বিধাতঃ ! তথাপি কি হইল প্রচার

সেই গোপালক-নাম । ইন্দ্র, চন্দ্র ছাড়ি
গোপালক, গোবর্দ্ধন, পূজিবে ভারত !—

এই মনস্তাপ হায় । সহিব কেমনে !”

কিছুক্ষণ ঋষিবর রহিয়া নীরবে
জিজ্ঞাসিল—“কে করিল, করিল কেমনে,
এই পাপনাম, পাপ ধর্মের প্রচার ?”

কহিল প্রথম শিষ্য অবনত মুখে
সভয়—“মহর্ষি ব্যাস”—

আগ্নেয় ভূধর

গর্জিল হুর্দ্বাসা ক্রোধে, ভীত শিষ্যপানে
চাহি কোটরস্থ ক্ষুদ্র নেত্রে প্রহলিত—

“মহর্ষি !—মহর্ষি !—ব্যাস ! ওরে মূর্খ কহ
কে ব্যাস ? মহর্ষি নাম কে দিল তাহারে ?”

“পরশর পুত্র”—ভয়ে কহিল কাপিয়া
শিষ্য ।

“পরশর পুত্র”—গৈরিক এবার
ছুটিল আকাশ পথে, গর্জিল হুর্দ্বাসা—

“জিতেন্দ্রিয় পরশর, তার পুত্র কভু
সম্ভবে কি ওরে মূর্খ—উড়ুঘরে ফুল ?

মহাঋষি পরশর, তপস্যায় তাঁর
করিলি যে এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ !
লভিলি কি এই শিক্ষা হুর্দ্বাসার কাছে
হরাচার ?”

“বৈপায়ন”—কহিল তখন

ভীত প্রকম্পিত শিষ্য । কহিল হুর্দ্বাসা—
“বুঝিলাম এতক্ষণে কে মহর্ষি তোর,

কেঁ সে ব্যাস । বুঝিলাম গর্ভে ধীবরীর
জনমিল দ্বীপে যেই জারজ সন্তান,
সে তোর মহর্ষি ! মুখ । সেই তোর ব্যাস ।
সেই পরাশরপুত্র ! আৰ্য্য পরাশর
করিলেন বিসর্জন তপস্যা তাঁহার
ধীবরীর পদ্মগন্ধে দ্বীপ বালুকায় !
অপূৰ্ণ এ নব ধর্ম্ম ! মহর্ষি—ধীবর !
গোরক্ষক—নারায়ণ ! প্রণব তাহার—
গোপ নাম ! বেদ শাস্ত্র আছে কি তাহার ?

“ভগবদগীতা”—শিষ্য উত্তরিল ধীরে ।

করিয়া দোহন উপনিষদ সকল
দ্বৈপায়ন কি যে হৃদয়, জ্ঞানের অমৃত,
করিলেন সঙ্কলন এই গ্রন্থে তাঁর
বলিতে না পারি প্রভু ! সাজিয়া যোগিনী
বেড়াইয়া ভীর্ষে ভীর্ষে হুজরা আপনি
করিছেন বিতরণ এই ধর্ম্ম-সুধা,—
কি আনন্দে উচ্ছ্বসিতা, কি প্রেমে বিহ্বলা
পান করি সে অমৃত, গাই কৃষ্ণ নাম,
যাইতেছে গড়াগড়ি নরনারীগণ,
নয়নে কি প্রেম ধারা আনন্দ হৃদয়ে !—
না দেখিলে নেত্রে প্রভু না হবে প্রত্যয় ।

ত্রকীনা । আমার সে মহাপ্রভু !—নির্কোষ তোমরা
শিখেছ ত ; শিখিয়াছ বেদ ব্যাখ্যা মম
তোমরা কি এককাল ছিলে নিজাগত ?
প্রঃ শিষ্য । না প্রভু ; তুলিলে সেই মহাপ্রভু নাম,
সে অপূৰ্ণ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, হাসে নর নারী ।

আর বাহা বলে দেব ! কহিতে না পারি ।

হাসিয়া জীবৎ ধ্বি কহিলেন ধীরে—

“হায় মুখ শিবাগণ ! না জান তোমরা

বর্তমান কত ক্ষুদ্র ! কতই অসীম

ভবিষ্যৎ ! নাহি চাহি বর্তমান বশঃ,

ভবিষ্যৎ মহাকীর্তি গাইবে আমার !

খণ্ডোত্তর ক্ষুদ্রালোক নিকটে উজ্জল ।

কিন্তু ভাস্করের জ্যোতি দাঁড়াইয়া কাছে

কে পারে দেখিতে বল ? কে পারে দেখিতে

হিমাদ্রির সে মহিমা বসি পদতলে ?

কল্পখানি ক্ষুদ্র গ্রহ পুত্র ধীবরীর

করিয়াছে প্রশমন ? দর্শন, বিজ্ঞান,

শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ,

সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, অঙ্ক, ইতিহাস—

আমার অনন্ত গ্রহ, অনন্ত মৈনাক

মহাকাল-সিন্ধু-বক্ষে রহিবে অচল ;

ধীবরের তৃণ রাশি ঘাইবে ভাসিয়া ।

আমার অনন্ত গ্রহ সাধিবে উদ্ধার

অনন্ত কালের তরে অনন্ত জীবের ।”

কহিল স্বগত ধীরে শিষ্য একজন—

“অনন্ত জীবের সত্য,—অনন্ত কীটের

এই মহাগ্রন্থ স্তূপ সাধিবে উদ্ধার ।

একখানি মাত্র হায় ! পড়িতে তাহার

আমি এ জীবের দস্ত, ক্ষুদ্র বুদ্ধি খানি,

অনন্তকালের তরে লভেছে উদ্ধার ।”

রহি যোন কিছুক্ষণ মহর্ষি গম্ভীর

জিজ্ঞাসিল—“শিষ্যগণ ! কহ শুনি পুনঃ
তোমাদের ঘোরতর সেই অপমান
যাদব শিশুর হস্তে,—কৃষ্ণ ভুজঙ্গের
শিশু সর্প বিষধর ।”

আনত বদনে

কহিল প্রথম শিষ্য—“শ্রুত্ব আদেশে
গিয়াছিহু দ্বারকায়া আমরা সকলে
গুপ্তচর । • পুরদ্বারে যত শিশুগণ
খেলিতেছে অপরাহ্নে ; দূরে আমাদের
নিরখিয়া, শিশু এক সাজায়ে গভিনী
জিজ্ঞাসিল—“কহ ঋষি ! করিয়া গণনা
কি প্রসব করিবে এ গভিনী রমণী ?”
খল খল শিশুগণ লাগিল হাসিতে ।

হর্কাসা । উত্তম—তাহার পর ?

প্রঃ শিষ্য ।

এই উপহাসে

হইয়া অধীর ক্রোধে লোহিত লোচনে
কহিলাম—“হে তুষ্কৃত গর্ভিত বালক !
করিবে এ ছন্ন নারী প্রসব মুবল ।
গর্ভিত যাদব কুল হইবে নির্মূল ।”
বহু বর্ষ গত শ্রুত ! স্মরণে তথাপি
সে মিগ্রহ অপমান হয় প্রবাহিত
ধমনীতে অগ্নি-স্রোত, দগ্ধ হয় প্রাণ ।

হর্কাসা ! মাঠে মাঠে বৎস । এক দিন আর
ইও দগ্ধ ! শিষ্যগণ ! এক দিনে আর
ফলিবে এ অভিশাপ অকরে অকরে,
অদৃষ্টের লিপি সম বজ্রের নির্ঘাতে ।

মুখল যাদবগণ করেছে প্রসব ;
অচিরে যাদব কুল হইবে নিখুঁল ।
যাও চলি শিষ্যগণ নিশ্চিন্ত আশ্রমে !
কর গিয়া আপনার তপস্তা সাধন ।

তৃতীয় সর্গ ।

দুই ভাগিনী ।

ফুল জ্যোৎস্নায় স্নাত শৈলমালা,
শেখর উন্নত নত
শোভিতেছে শান্ত রজত সাগরে
স্থির তরঙ্গের মত ।
একটি শেখরে বসি একাকিনী
বাসুকীর ভগ্নী কারু ;—
সুমলয় বয় চুধি কুবলয়,
চুধি মুক্তকেশ চারু ।
ফুল শশধর, ফুল নীলাধর,
চন্দ্র-নীলাধর তলে
চন্দ্র নীলাধর-নির্মিত কুসুম,
নীলামৃত দলে দলে ।
চন্দ্র-নীলাধরে বিস্তৃত সুন্দর
চাহিয়া অনন্ত প'নে,

আকর্ণ বিস্তৃত অনিমিষ নেত্রে,

জয়ংকারু বসি ধ্যানে ।

ফুল শশধর, ফুল নীলাশ্বর,

চন্দ্র-নীলাশ্বর তলে

নীল শৈলমালা নিরুপ নীরব,

নীরবে মলয় চলে ।

নীরবে শেখরে বিয়ল পাদপ

দাঁড়াইয়া স্থানে স্থানে,

স্থানে স্থানে গুল্ম বসিয়া নীরবে

চাহি চন্দ্রাকাশ পানে ।

সম্মিতা প্রকৃতি অবগাহি অঙ্গ

জ্যোৎস্নায়, মুগ্ধপ্রাণে

রয়েছে চাহিয়া নিরুপ নীরব

চন্দ্র নীলাশ্বর পানে ।

ফুল শশধর, ফুল নীলাশ্বর,

নীলাকাশে ফুলতর

চন্দ্র ফুলতর উঠিল ভাসিয়া,—

কারুণ্য হৃদয়েষ্বর ।

সেই আকাশের সেই চন্দ্র কারু

দেখিছে বসিয়া ধ্যানে,

দেখিয়াছে কারু কৈশোরে যৌবনে

সেই চন্দ্র মুগ্ধপ্রাণে ।

নীল, নীলতর, নিরাশা আকাশে

ফুল, ফুলতর ধীরে,

হইয়াছে শশী ; আজি ফুলতর ;—

অতীত যৌবন তীরে

বসি অভাগিনী দেখিছে সে শোভা ।

প্রাণিয়া হৃদয় তার,

প্রাণিয়া ভারত, কি মহা পূর্ণিমা

করেছে বিশ্বে সঞ্চার !

সেই পূর্ণিমায় লভিছে ভারত,

লভিছে জগতবাসী,

কি শান্তি শীতল ! কেবল কারুর

হৃদয় কি অগ্নিরাশি ?

অভিমান-ক্ষীত হৃদয় পূর্ণিত

নিরাশা অনলে দহি

জলিয়া, গলিয়া, ছুটিয়া, গর্জিয়া,

গৈরিক ধারায় বহি

পড়িছে হৃদয়ে, অজস্র ধারায়,

কত ধারা অবিরত !

বিদৌর্ণ বিকৃত, বিসম্বদ হৃদয়

আগ্নেয় ভূধর মত ।

মানস আকাশে সেই পূর্ণ চন্দ্র,

সেই চন্দ্র করে চারু,

বিদৌর্ণ সে জিরি, গৈরিক প্রবাহ

নীরবে দেখিছে কারু ।

“দিদি” !— অকস্মাৎ নিবিড় নীরব

শেখরে উঠিল ভাসি,

নিবিড় নীরব জগতে জালিল,

কি যেন অক্ষুট রাশী !

হৃদয় বিকৃত কি যেন সঙ্গীত

উঠিল স্বতিতে আগি,

স্বপ্নের বিশ্বত কি স্বপ্ন-স্বপন
 প্রাণের, কাহার লাগি ।
 ধীরে ধীরে ধীরে, সে অক্ষুট বাঁশী
 বিশ্বত জ্যোৎস্না-গীত,
 বিশ্বত-স্বপন, স্বপ্নের স্নেহের
 শীতল সুখ-মগ্নিত,
 উঠিল ভাসিয়া ফুল জ্যোৎস্নায়
 কারুর নয়ন আগে,
 শান্ত আকাশের শান্তিবালা ঘেন,—
 কি শান্তি বদনে জাগে !
 “কে তুমি ? আকাশ হইতে কি তুমি
 নামিলে এ গিরি শিরে ?
 কে তুমি ? মানবী, কহ কিবা দেবী ?”—
 জিজ্ঞাসিল কারু ধীরে
 বিশ্বয়ে স্তম্ভিতা—“আকাশের দেবী ?
 কিংবা বনদেবী বল ?
 কিংবা শশাঙ্কের অন্ধ-বিহারিণী
 শান্তি সুখ নিরমল ?”
 “দিদি”—কি মধুর ডাকিল আবার
 শান্তির ত্রিদিব লভা !
 শান্তি সরোজিনী প্রভাত সমীরে
 কহিল কি প্রেম-কথা !
 আবার বিশ্বয়ে জিজ্ঞাসিল কারু—
 “কেন দেবি । এলে তুমি,
 অভাপিনী শৈল, ধরি তার রূপ
 ছলিতে এ মরুভূমি ।

সেও অভাগিনী, অভাগিনী আমি,—

নিষ্ঠুর বিধির খেলা !

জালিল যে মরু উভয়ের প্রাণে,

নাহি তার সীমা বেলা ।

রমণীর প্রাণে জলে যেই মরু

অনির্ব্বাণ অনিবার,

জগতের মরু, শয্যা কুসুমের

হায় তুলনায় তার !

প্রাস্তরের মরু, মা'রে এক দিনে,

প্রাণের সে মরু, হায় !

পলে পলে দহে, দহে তিল তিল,

পলে কত মুগ যায় !

সে মরু-দহনে দহিয়া দহিয়া

আমা'র সে শৈল-ফুল,

হয়েছে আকাশে ওই শান্তি তারা,

দেখ কি শোভা অতুল !

আমি সে দহনে দহিয়া দহিয়া

বসি নৈশাকাশ তলে,

ওই তারা পানে চাহিয়া চাহিয়া

ভাসি স্মৃতিস্রোতেরে ।”

“দিদি ! দিদি ! আমি সেই শৈল তব,

যরে নাই শৈল ভোর”—

শৈলজা পড়িল গলায় কারুর

স্নেহের উজ্জ্বল ভোর ।

“ভয়ী পূণ্যবতী, পূণ্যবান ভাই,

প্রেম পূণ্য পারাবার,

তোমাদের পুণ্যে শৈল পুণ্যবতী,

দিদি কি অভাগ্য তার ?

“তুই শৈল !—তুই আমাদের শৈল !

সেই ক্ষুদ্র স্নেহলত। !”

অটিয়া হৃদয়ে উন্মাদিনী কারু,

উচ্ছ্বাসে সরে না কথা ;—

“তুই শৈল ! সেই স্নেহের পুতুল, !”

—কাদে কারু শিশুশ্রায়—

“চাপি মুখখানি রাখ, দিদি ! রাখ !

হৃদয় বে ফেটে যায় ।

“তুই সেই শৈল, স্নেহ-মন্ডাকিনী,

আমার প্রাণের আধা ।

হই ক্ষুদ্র বীণা শৈল জরৎকারু,

এক স্বরে প্রাণে বাধা ।

নাগরাজ-প্রেম সেই এক স্বর,

আমাদের একপ্রাণ ;

পিতৃমাতৃহীনা আমরা ছজন—

সে প্রেমে হৃদয় জ্ঞান ।

নাগরাজ মাতা, নাগরাজ পিতা,

নাগরাজ ভগ্নী, ভ্রাতা,

করুণ কিশোর প্রেমময় ভ্রাতা

আমাদের প্রাণদাতা ।

বাঁচি সেই প্রেমে, নাচি সেই প্রেমে,

খেলি সেই এক খেলা,

সেই প্রেম বন্ধে হৃদিকে ছজন

ঘুমায়েছি হই বেলা ।

সেই বুক হায় ! শুক আধখানি

শৈল রে বিরহে তোর !

বিরহে রে তোর হইয়াছে শুক

আধখানি বুক মোর ।

অর্দ্ধশুক বুকে আয় দিদি ! আয় !

ডাক পুনঃ দিদি বলি,

দেখি এই মুখ, শুনি সেই কথা,

পাষণ ষাউক গলি ।

দেখি নাই মুখ, শুনি নাই কথা,

হায় ! দিদি ! কত দিন !

আয় দিদি ! আয় ! আয় মুখে মুখ,

বুক বুক করি লীন ।”

“দিদি !—দিদি !—দিদি !—দিদি প্রেমময়ি !

ভগিনী জননীসমা !

অহো ! হুটি প্রাণে দিয়েছি কি বাথা !

দিদি ! কি করিবি ক্রমা ?”

কারুর চরণ ধরি হুটি করে,

উদ্ধনেজে দর দর—

“দিদি ! দিদি !—ওমা !—” —ও কিছে শৈলজা ;

ও কি কথা !—ও কি বর ।

উন্মাদিনী তার লইল তুলিয়া

বুক সেই প্রেমলতা,

চুষিল বদন, চুষিল নয়ন,

কারু না সরে কথা ।

গলিল পাষণ, গলিল অগত,

গলিলেন সুধাকর,

কি সুখা ঝরিল, জগত ভরিল,—

কারুর হৃদয়-সর ।

মোহিত জগত, কারুর হৃদয়

হইল মোহিত ধীরে,

মুখ হ'তে মুখ পড়িল সরিয়া

শৈল বৃকে সিক্ত নীরে ।

তুলি মুখ—“দিদি ! দিদি ! মা আমার !”

ডাকে শৈল দর দর

তুলিয়া কারুর মুচ্ছিত বদন,

ভয়বস্ত ইন্দীবর ।

“গুরুদেব ! এ কি ! কি হইল হায় !

হায় ! কি করিলে হরি !”—

কাঁদিল শৈলজা, অবশ বদন

বাম অংসোপরে পড়ি ।

“নাহি জানি নাথ ! কোথায় তোমার

গোলোক আনন্দময়,

বুঝি এই প্রেম তা পদাশুজ,

সে গোলোক এ হৃদয় ।”

যোগস্থা শৈলজা বসি কিছুক্ষণ

চাহি নীলাকাশ পানে,

ধীরে বুলাইল কারু মুখে কর,

সকাঁরি তাকিত প্রাণে ।

ধীরে ধীরে কারু মেলিল নয়ন,

মুখ অঙ্কে শৈলজার ।

রহিল চাহিয়া শৈল মুখ পানে

নীলব চিত্তিতাকার ।

চাহিয়া চাহিয়া স্বতি, ধীরে ধীরে

উঠিল হৃদয়ে ভাসি,

উঠিল আকাশে আবার ভাস্বর

সরাইয়া মেঘরাশি ।

উঠিয়া হৃদয়ে লইয়া শৈলেন্দ্রে

কহে কারু কণ্ঠে হির—

শৈল রে ! আমরা কি ক্রীড়া-পুতুল

নিদারুণ নিয়তির !

আমাদের মত দুঃখী তিন জন

আছে কি জগতে আর ?

আমাদের মত দুঃখী তিন জন ?—

এত সুখ ছিল কার ।

শৈশবে হুজনে যুগশিত মত

কাননে করি বিহার,

ছুটিতাম বনে যুগশিত সনে,—

এত সুখ ছিল কার ?

নাচিলে শিখিনী পেখম খুলিয়া,

অঞ্চল করি প্রণাম

নাচিতাম বনে আমরা হুজনে,—

এত সুখ ছিল কার ?

কাননের শ্রামা গাইলে মধুরে,—

অনুকারি স্বর তার

গাইতাম স্নেহে শ্রামা বনমালা,—

এত সুখ ছিল কার ?

সহকার পত্রে লুকাইয়া কুহ

ডাকিলে কোকিল আর,

ডাকিতাম পত্রে লুকায়ে আমরা—

এত স্নেহ ছিল কার ?

সিন্ধুতীরে বসি মধ্যাহ্ন ছায়ায়,

ফুল জ্যোৎস্নায় আব,

প্রশ্রবণ পারে, প্রপাতের ধারে,

গাঁথিতাম পুষ্পহার,

গাইতাম গান, খেলিতাম খেলা,

কহিতাম কত কথা,

—কিশোর উচ্ছ্বাস—মুখে মুখে ছই

বন-কপোতিনী যথা ।

নবীন কিশোর ভ্রাতা নাগরাজ

গলায় গলায় তাঁর

বেড়াতেম বনে, শেখরে শেখরে,—

এত স্নেহ ছিল কার ?

তিন খণ্ড করি এক বনফল,

একই আহার আব,

ঝাইতাম স্নেহে অনাথ এ তিন—

এত স্নেহ ছিল কার ?

আকাশের পানে চাহি মুগ্ধ কার,

শান্ত হ'নমন স্থির ।

ধরি গলা শৈল আকাশের পানে,

চাহি হ'নমনে নীর ।

“একদিন বনে—পড়ে কি লো মনে ?”

পুনঃ কারু কহে কথা,

“দেখিলাম এক সলতা পাদপ,—

বিশুদ্ধ পাদপ, লতা ।

চারিদিকে চারু শোভে বনস্থলী

পল্লবে কুহমে ফলে,

এ পদপ লত্ন ফল পুষ্পহীন,

ঝরে পত্র পলে পলে

শুষ্ক বৃক্ষলতা দেখি করুণায়

ছুটি প্রাণ ছল ছল—

পড়ে কি লো মনে কতই করুণা,

ঢালিলাম কত জন ?

আজি নাগরাজ সেই শুষ্ক তরু

আমরা সে শুষ্ক লতা ।

ফলফুলহীন হায় ! তিন জন !

বিশুষ্ক পল্লব যথা,

পড়িছে ভাঙ্গিয়া, পড়িছে ঝরিয়া,

দেহ-শোভা পলে পলে,

শুষ্ক তিন জন একই উত্তাপে,

একই নিরাশানলে !

“নিরাশা । নিরাশা ! নিরাশা কি দিদি !”

—শান্ত কণ্ঠে শৈল কহে—

“মুখের সংসারে হায় ! এইরূপে

নরে মরীচিকা দহে !

হৃভঙ্গার প্রেম, দিদি ! কক্ষপ্রেম,

বাদ্যের প্রাণের আশা,

সুখার সাগরে ডুবেছে বাহারা,

কি নিরাশা ! কি নিপাসা !”

“অৰ্জুনের প্রেম”—ক্রীড়া বাঁকাইয়া

কহে মুগ্ধ স্বরে কারু—

“অর্জুনের প্রেম, নহে মরীচিকা ?

সে কি সরোবর চারু ।”

শৈল ।

আছে শৈশবের, আছে কৈশোরের,

আছে খেলা যৌবনের ।

অর্জুনের প্রেম যৌবনের খেলা

উন্মেষিত হৃদয়ের ।

কিন্তু, দিদি । খেলা নহে মরীচিকা,—

সুখের সোপান-স্তর ;

খেলিয়া খেলিয়া সোপানে সোপানে

উঠ উঠে নিরন্তর !

পুতুল লইয়া খেলিয়া পূজিয়া,

খেলিতে পূজিতে শিখি

মানুষ-পুতুল লইয়া যৌবনে ;

খেলিয়া পূজিয়া দেখি

মানুষ-পুতুল ছাড়িয়া হৃদয়

অবৈষ' পুতুল আর

সে পুতুল কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য

জীবনের এ খেলার ।

সে প্রেম-সাগরে হইবে নিবৃত্তি

আশার ও লিপাসার,

সে স্বধা-সাগরে না উঠে গরল,

মরীচিকা নিরাশার ।

“কৃষ্ণপ্রেম ।”—যেন দংশিল ভুজঙ্গ,

শৈলেরে শিলায় ফেলি

দাঁড়াইল কারু, কুণ্ডিত অধর,

আকর্ণ নয়ন মেলি ।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহি শৈলজায়

“কৃষ্ণপ্রেম !”—কারু কহে

“সুখার সাগর কৃষ্ণপ্রেম, শৈল ।

যে প্রেমে হৃদয় দহে !

কৃষ্ণপ্রেম-সুখা ! দন্তে ভুজঙ্গের

সুখা তবে রহে বল !

সুখা তবে রহে আশ্রয়-ভূধরে,

গৈরিক সুখা তরল !

যেই কৃষ্ণপ্রেমে জলিয়া পুড়িয়া

এরূপ হইলু ছাই !

যেই প্রেমশিখা এই ভস্ম মাঝে

জলিছে, বিরাম নাই ।

যেই প্রেমে জলি উন্মাদিনী মত

ছুটিয়াছি বনে বনে ।

ভাবিয়াছি জলে, পড়েছি অনলে,

পশিয়াছি ঘোর বনে ।”

শৈল । তুমিই কি সেই উন্মাদিনী নারী

যামব-পুরীতে ঘুরি,

ভীমা মুক্তকেশী বেড়া’তে নিশীথে

আতকে পুরিয়া পুরী ?

কারু । আমি ।

শৈল । তুমি ।

কারু । আমি । আমি মুক্তকেশী,

ভীমা উন্মাদিনী আমি ।

জলি সে জালায়—কি দারুণ জালা

জানেন অন্তঃস্বামী ।—

মস্তকের মণি খুঁজিত কণিনী
 বেড়াইয়া বক্ষে কক্ষে,
 দেখিতাম মণি কভু সত্যভামা,
 কভু কল্পিণীর বক্ষে।
 দেখিতাম—চক্ষু পড়িত খসিয়া
 কি উগ্র অনলে জলি !
 বহিত হৃদয় নয়নে ধারায়
 কি উগ্র অনলে গলি !
 সেই স্মৃতি, শৈল !—জলিছে নয়নে,
 পড়িছে হৃদয় গলি”—
 হৃকরে নয়ন চাপিয়া, শৈলের
 হৃদয়ে পড়িল ঢালি।
 উভয় নীরব—তবল অনলে
 ভাসিছে শৈলের বুক।
 বহে শাস্তিধারা শৈলের নয়নে,
 চাপি হৃদে সেই মুখ।
 “কিন্তু দিদি ! তুমি,—ঋষিপত্নী তুমি,
 তুমি পুত্রবতী নারী !
 জান তুমি দিদি ! রমণীর প্রেম
 পবিত্র জাহ্নবী-বারি।”—
 কহে শৈল ধীরে। হাসি উজ্জ হাসি
 কহে কারু হাসি যুগে—
 “শত রবি শশী, নক্ষত্র অশেষ
 ভাসে না জাহ্নবী বৃকে ?”
 শৈল। ভাসে প্রতিবিম্ব, জানে না জাহ্নবী,
 যায় এক সিঁদু পানে।

কাক । এক পাবাবারে গতিই আমার—

কি গতি এ দক্ষ প্রাণে !

পড়ে প্রাতিবিষ জাহ্নবীর বৃকে,

নাহি পড়ে এই প্রাণে ।

এক প্রতিবিষে পরিপূর্ণ বৃক

জাগ্রতে, নিদ্রায়, ধ্যানে ।

ঋষিপত্নী আমি !—পুত্রবতী আমি ।—

দিদি রে !—ছলনা সাহ,

অর্থ্য ঋষি কভু অনাধ্যা নারীরে

করে কি বিবাহ আর ?

“কৃপা করি তব হইলাম পতি”—

কহিলেন ঋষিবর,

এই ত বিবাহ ! হইলেন ভ্রাস্ত

শিশুসম নাগেশ্বর ।

ছল-পতি ঋষি, এই ছলনাঘ

সাধিতে স্বকাৰ্য্য তার ;

ছল-পত্নী আমি, দিদি অনাধ্যোর

করিতে রাজ্য উদ্ধার !

শৈল । দিদি ! পুত্র তব ?

কাক । বাধেয় দ্বিতীয় !

হরিয়া সতীত্ব কার

ঋষি ছর্যাচার আনিল কুমার,

অর্পিল করে আমার ।

নিরাশ্রয় শিশু, নিরখিয়া সুখ

দ্রবিল হৃদয় মম,

সবল হৃদয় এ শিশু হীরক

° পালিয়াছি খনি সম ।
 জানে শিশু আমি জননী তাহার ;
 নিরখি তাহার মুখ,
 এ দগ্ধ হৃদয়ে পাই কি সাস্থনা !
 কি আনন্দে ভরে বুক !
 যেই দিন দিদি ! নথ মাত্র মম
 ছুঁইবেন ঋবিবর,
 জানেন আপনি, হইবে চূর্ণিত
 সে দিন অস্থি পঞ্জর ।
 শৈশবে কৈশোরে সিদ্ধু নদ তীরে
 বসিয়া ছুজনে স্নেহে,
 দেখিতাম রবি সহস্র হইয়া
 ভাসিতে সিদ্ধুর বকে ।
 সেইরূপ দিদি ! সহস্র হইয়া
 ভাসে কৃষ্ণ এ হৃদয়ে,
 ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
 কৃষ্ণ শিষ্যশ্রোতে বহে ।
 হৃদয়েতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নয়নেতে,
 অধরেতে কৃষ্ণনাম,
 শ্রবণেতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরশনে,
 নাসিকায় কৃষ্ণস্রাণ ।
 এই দেখ দিদি !—নিকোষিয়া অসি
 করিয়া বকে প্রহার—
 “কৃষ্ণ বিনা, দিদি ! এ দেহে, হৃদয়ে,

কিছু মম নাহি আর ।”
 বিজলীর বেগে শৈল সেই অসি
 নিক্ষেপিল দূরে বলে,—
 বহে রক্তধারা,—আত্মহারা শৈল
 পড়ে কারু পদতলে,—
 “দিদি ! দিদি ! ওমা তুমি প্রেমময়ি ।
 প্রেমস্বরূপিণী তুমি !
 দেও কৃষ্ণপ্রেম ভগিনী কল্যায়
 উদ্ধার এ বনভূমি !
 দেখ পতি তব জগতের পতি,
 খুলি নেত্র-আবরণ !
 তিনি পতি তব, তিনি পতি মম,
 তিনি নর-নারায়ণ !”

চতুর্থ সর্গ ।

—::—

যোগানল ।

এখন (৩) হুঁসসা ঋষি বসি সেই শৈল-কক্ষে
 একাকী নীরব চিন্তাকুল ।
 দেবাইছে কীণ দীপ কাঁপি নৈশানিলে কক্ষে
 ঋষিরে শ্রেত সমতুল ।
 ধীরে ধীরে পশি কক্ষে, নগেজ বাসুকি, কাক
 অশমিল চরণে ঋষির ।

ওঁনিয়া চরণ শব্দ মুদিলেন নেত্র ঋষি,
 হইলেন ধ্যানমগ্ন স্থির ।
 ছল ধ্যানে ঋষিশ্রেষ্ঠ রহি স্থির কিছুক্ষণ
 মেলিলেন নেত্র ধীরে ধীরে,
 সন্মিত বিকট মুখে কোটরস্থ যুগ্ম নেত্র
 চাহিলেন কারু বাণকিরে ।

হুর্কাসা । তোমার বিলম্ব দেখি, এই সপ্ত দিবা নিশি
 রহিয়াছি যোদ্ধা নিমজ্জিত,
 যোগবলে আকর্ষিয়া আনিবু তোমাতে আজি
 করিবারে ব্রত উদ্ঘোষিত ।
 সসৈন্তে আগত ভূমি ?

বাসুকি । সসৈন্তে আগত আমি
 কোথায় পাইব সৈন্ত ঋষি !
 যুগ্ম হিমালয়-সান্ন নীলাকাশে নীলতর
 অলভেদী রহিয়াছে মিশি,
 যুগ্ম-নীলাবু বেলা সিদ্ধু সহ করে খেলা,
 সিদ্ধু, বেলা, আকাশে মিশিয়া,
 আসিছু আকাশ-তট ব্যাপিয়া ভারত-ভূমি
 বহুবর্ষ আসিছু ভ্রমিয়া ।
 বেড়াইব বনে বনে, হিমাচল, বিষ্ণুচল,
 আরাবলি, মহেন্দ্র, মলয় ;
 নীল অগ্নি আভরণ অঙ্গে অঙ্গে ভারতের
 বেড়াইব অনার্য্য আলয় ।

হুর্কাসা । কি দেখিলে ? কি শুনিলে ?

বাসুকি । শুনিলাম, দেখিলাম,
 শুনি নাই, দেখি নাই, যাহা !

সাধ্যাতীত ! চিন্তাতীত ! মানব কল্পনাতীত !

মানবের কার্য্য নহে তাহা।

হায়! কুরুক্ষেত্র-পূর্ব ভারতের সে অশান্তি !

এই শান্তি কুরুক্ষেত্র-পর !

সেই হিংসা, এই প্রেম ! সে অধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম !

সে নরক, এ স্বর্গ সুন্দর !

আসিহু অচল ব্যাপী পাণ্ডব সাত্রাজ্য-ছায়া

কি শীতল, কিবা পুণ্যময় !

নাহি সেই রক্ত স্রোত, প্রেম স্রোতে নর নারী

জুড়াইছে তাপিত হৃদয়।

সেই কুরুক্ষেত্র ঋষি ! দেখিয়াছ নেত্রে তব,

এই কুরুক্ষেত্র একবার

দেখ গিয়া নেত্র ভরি ! দেখিলে হইবে দ্রব

প্রেমহীন হৃদয় তোমার !

এ কুরুক্ষেত্রেও ঋষি ! রথী সেই নরদেব,

রথে বসি ভদ্রা ধনঞ্জয়,

বার্ষিতেছে নিরস্তর কৃষ্ণ-প্রেমামৃত শর,

প্রেমে মত্ত দুইটি হৃদয়।

এ গাণ্ডীব কৃষ্ণ নাম, দেবদত্ত কৃষ্ণ নাম,

তৃণ কৃষ্ণ-প্রেমামৃতে ভরা ;

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী তুচ্ছ, প্রেম-বন-বন্দে

দেখ গিয়া মাতিয়াছে ধরা।

হুঁসসা। ইন্দ্রজাল ! ইন্দ্রজাল ! যুদ্ধ ইন্দ্রজালে ঘোর।

আর্য্য জাতি ব্যাপিয়া ভারত।

জরৎকার যোগবলে ছিন্ন হবে ইন্দ্রজাল,

কুত্র উর্গনভ জাল মত।

প্রভাস ।

কিন্তু সেই পাপ নাম সরল অনাৰ্য্য ভূমে

কেমনে পশিল বল হায় ?

বান্ধুকি ! কুকনাম পাপ নাম ! পুণ্য নাম তবে আর

আছে ঋষি কোথায় ধরায় ?

প্রেমে প্লাবি বৃন্দাবন, ভাসাইল ব্রজভূমি

শৈশবে কৈশোরে যেই নাম,

যোবনে বিজয় মন্ত্র কুরুক্ষেত্রে যেই নাম,

যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র নিষ্কাম !

ভারতের শাস্তি-মন্ত্র, ভারতের রাজ্য-মন্ত্র

“মুক্তি-মন্ত্র প্রোঢ়ে ভারতের,

যেই স্থপবিত্র নাম, সেই নাম পাপ নাম !

পুণ্য নাম তুমি পাপিষ্ঠের !

কেমনে সে নাম ঋষি ! পশিল অনাৰ্য্য ভূমে ?—

‘কাক ! কাক ! শৈলজা আমার

প্রচারিয়া সেই নাম, পতিত অনাৰ্য্য ভূমি

পুণ্যবতী করিছে উদ্ধার ।

হুঁকার ! শৈলজা ! শৈলজা ! কে সে ? একটি রমণী ক্ষুদ্র

হইয়া কণ্টক তব পথে

রহিল জীবিত নাগ । প্রচারিতে সেই নাম

এ প্রত্যক্ষ করি কোন মতে ?

“নরাধম ! হুঁচকার ! নৃশংস মানব-পশু !”

—দাঁড়াইল গর্জি নাগরাজ—

“এ মুহূর্তে ভাঙ্গি গিবি পড়িল না শিরে তোব,

পড়িল না এ মুহূর্তে বাজ ।

পশুবৎ অত্যাচার করিতে রমণী প্রতি

আর্য্য ঋষিদের ধর্ম জানি ।

নারীহত্যা ধর্ম তোর ; সবল অনার্থ্যদের

মহাপাপ ওরে নয়-মানি !

অনার্যের দেবী নারী ; ধর্ম রমণীর পূজা ;

কেশ মাত্র যেই নরাধম

পরশিবে রমণীর, ছুঁইবে তাহার ছায়া,

অনার্যের বধ্য সেই জন ।

কে শৈলজা ? হায়, ঋষি ! শৈলজা ভগিনী মম,

প্রাণের পুতুল বাসুকির, —

ক্রোধে রক্ত হনমনে বহিল যুগল ধারা

বাড়ব কুণ্ডের যেন নীর ।

“হায় ! নিদাক্ষণ বিধি, করি পিতৃমাতৃহীন

অকালে আমরা তিন জন,

অর্পিল আমার অকে ছই ভগ্নী, শিশু বৃক্ষে

ছই শিশু লতার মতন ।

কার ভগ্নী সহোদরা, শৈলজা পিতৃব্য-কন্তা,

আমি প্রাণ, তারা হুটি কায়া ;

হায় ! ঋষি প্রাণ দিয়া পালিয়াছি ছই কায়া,

প্রাণের অভিন্ন ছই ছায়া ।

কিন্তু কি যে হ্রাশায় দিহু কাঁপ, হায় ! আমি !

সেই মহা হ্রাশা-অনলে

পোড়াইহু ভগ্নী হুটি ! সেই অতুতাপে ঋষি

কি যে অগ্নি এ হৃদয়ে জলে ।” —

হ্রাশাঃ

উজ্জ্বলে উঠিয়া কার, ধরি বাসুকির গলা,

কহে—“দাদা ! দাদা ! পিতৃ সম !

হইও না আত্মহারা ! তোমার ভগিনী হুটি—

ভাহাদের ভাগ্য নিকপম ।

তোমার এই মহাব্রতে নাহি দিত ঝাঁপ যদি

হইত কি ভগ্নী যোগ্যা তব ?

তাহাদের ততোধিক আছে কি জগতে সুখ ?—

প্রেমোচ্ছ্বাসে উভয় নীরব ।

হাস্তিকি । কারু ! কারু ! প্রাণাধিকে । তুই এই প্রেমময়ী !

পুণ্যময়ী, পবিত্রতাময়ী ।

কারু রে ! শৈলজা আর !—আমি তোরা দুজনের

ভ্রাতার কদাচ যোগ্য নহি ।

ভেবেছিলাম যে শৈলজা, আমি পাপিষ্ঠের ভয়ে,

বনলতা শুকায়েছে বনে ;

আজি সে শৈলজা দেবী, সে শৈলজা সন্ন্যাসিনী,

প্রেমধারা বহে হৃদয়নে !

সে ধারায় বনভূমি হইতেছে পুণ্যভূমি,

হইতেছে অনার্য্য-হৃদয় ;

পশুতুল্য সে হৃদয় যাইতেছে প্রেমে গলি,

প্রেমে গলিতেছে শিলাচয় ।

কহে শৈল কৃষ্ণ-কথা, গায় শৈল কৃষ্ণনাম,

কহে শৈল—‘কহ কৃষ্ণ ! হরি !’

‘হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ !’ কহিয়া অনার্য্যগণ

যাইছে ভূতলে গড়াগড়ি ।

গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,

কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,

গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মাঘের কোলে,

লুকুইয়া মুখ মা’র বুকে ।

বনের পাখীও যেন গাইতেছে কৃষ্ণনাম,

কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ, শিখী,

বহিছে বন-নিব্বার, মর্ম্মরিছে তরুগণ

কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি ।

বনপুত্র পুত্রীগণ সাজিয়া গৈরিক বাসে,

কৃষ্ণ অঙ্গে লিখি কৃষ্ণনাম,

নাচিতেছে বাহ তুলি বেড়ি মম শৈলজায়,

অশ্রুজলে ভাসি অবিরাম ।

তাজিয়া পতির শয়া, তাজিয়া কোলের শিশু;

ছুটি পত্নী, ভগিনী, জননী,

পড়িয়া শৈলের পায়, কহে—“দে মা ! কৃষ্ণনাম ।

একবার দেখা নীলমণি !”

সাজি বনশিশুগণ শিশু কৃষ্ণ, গোপ শিশু,

শিরে চূড়া, অঙ্গে পীত ধরা,

বাম করে ক্ষুদ্র বেণু, পাচনি দক্ষিণ করে,

ফুল-অঙ্গ বনফুলে ভরা ;

সাজি গোপী বনবালা—চাঁক বনফুল মালা—

বনফুল অঙ্গে চাক্ষুশীলা,

জলে, স্থলে, গিরি-শৃঙ্গে, গৃহে গৃহে, বনে বনে,

কি মধুর করে ব্রজলীলা !

কে বলে অনার্য্য হুঃখী, অনার্য্যের নাহি রাজ্য ?

হিংস্র পশু অনার্য্য বর্কর ?

আজি কি আনন্দ-ভূমি হইয়াছে বনভূমি ।

অনার্য্যের কি রাজ্য স্তম্বর !

অনার্য্যের প্রেম রাজ্য, আমার শৈলজা রাণী,

রাজকর প্রেম-অশ্রু জল ;

প্রেম-অশ্রুতলে রাণী শাসিতেছে বনভূমি,

নাহি হিংসা, নাহি অমঙ্গল ।

রাজনগে গুরুতর হয় নাই প্রশমিত
 যে অনাৰ্য্য নৃশংস হৃদয়,
 আজি সেই শিলা-বন্ধ, হইয়া দ্রবিত প্রেমে,
 শীতল নির্মল সুধাময় ।
 করিব সে দেবী হতা ।—সুদাইয়া অন্তরালে
 সেই দেবী দেখিয়া নয়নে,
 শুনিয়া সে কৃষ্ণ নাম, দেখিয়া সে ব্রজলীলা,
 মরিয়াছি আপনি মরমে ।
 এই দেবীকেই আমি কবেছিলাম নিয়োজিত
 কিবা ঘোরতর মহাপাপে ।
 করি কৃষ্ণ নিম্পীড়িত চেয়েছি তাজ্বিতে প্রাণ
 সেই ঘোরতর পরিতাপে—
 বাহুকি আপন কৃষ্ণ পীড়িতেছে ব্যাঘ্রবৎ
 আপনার লৌহময় করে,
 কারু বিজলীর বেগে সরাইল কর কঁাদি’
 “দাদা । দাদা” বলি উচ্চৈঃস্বরে ।

বাহুকি । চাহিয়াছি কতবার পড়ি গিয়া পদতলে
 আমার পালিতা শৈলজার,
 মাগি ভিক্ষা কমা তার, মাগি কৃষ্ণনাম আর,
 দ্রব করি পাষণ আমার ।
 হায় ! সেই পাপ স্মৃতি করিয়াছে শিলাময়
 এই দেহ পাপের আধার,
 জালিয়াছে কি অনল হায় । চারিদিকে মম,
 এ পদ সরেনি আমার ।

হুঁসীসা । কেবল সে পাপ নাম, কেবল সে নাম-গীত,
 কেবল সে পাপ কথা আর,
 বাহার তাহার মুখে, কত আর লব হায় ।
 জলি বুক হইল অজার ।

আন নাই সৈন্ত তবে ।

বাস্তবিক ।

কোথাও পাইব সৈন্ত

অনার্য্য ভাঙ্গিয়া নাগ-ভূমি

ছুটেছে প্রভাস মুখে, হরিনাম, কৃষ্ণনাম

বিনা আর কিছু নাহি শুনি ।

হর্ষাসা । নাহি হৃঃষ নাগপতি । আমি ঋষি জরৎকার,

যোগবলে ক্ষম হুনিবার

জালাইয়া গৃহ-বন্দ, দেখেছ কৃত্রিয় কুল

কুরুক্ষেত্রে করিতে সংহার ।

নাহি হৃঃষ, যত্নকুল যোগবলে সেই রূপে

গৃহ-বন্দে, করিব সংহার ;

ভাসে বন কৃষ্ণ-প্রেমে,—ভাসিতেছে কৃষ্ণ পুরী

স্বরা-প্রেমে মহাপারাবার ।

বাস্তবিক । স্বরা-প্রেম কৃষ্ণ-পূরে !

হর্ষাসা ।

কৃষ্ণ-পূরে, নাগরাজ ।

কৃষ্ণ-প্রেম,—ইন্দ্রিয় সংযম,—

কেবল পরের তবে ; নিজ পূরে স্বরা-প্রেম ;—

এই তব নর-নায়ায়ণ ।

আমার আদেশে কারু পাঠ ইয়া নাগবংশা

রূপসী বুঝতী দারকার,

বিলাইল কৃষ্ণ-প্রেম—ত্রিবিষ্ণু ! স্বরার প্রেম,—

দারাবতী মগ্নবতী প্রায় ।

গোপনে বাইয়া কারু করিয়াছে নিরীক্ষণ,

স্ববাসক্তি, রূপাসক্তি আর ;

অনাসক্ত ধর্ম-পুরী করিতেছে টল টল,

টল টল বৃন্দ অবতার ।

বাসুকি । নরাধম ! নরপশু ! অরক্ষিতা অবলায়
 কেমনে পাঠালি দ্বারকায়
 পুরাইতে পাপত্বা ? অনার্যের নারী দেবী ;
 পণ্য নাহি জানে অবলায় ।
 কারু ! কারু ! এই পাপে কেমনে হইলি রত
 নাগ-রক্ত করি কলুষিত—
 কাঁপিতেছে থর থর মহাক্রোধে নাগরাজ
 সাপটিয়া অসি কোষস্থিত ।
 দেখিলা ভয়ীর মুখ কি যে নিরাশার ছবি !
 কি যে স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া !
 নাগপুরে বাপীতীরে একদিন নিরাশায়
 ছিল কারু একপে বসিয়া ।
 সে স্মৃতি বিজলী বেগে আলোকিল দুরাতীত
 নাগরাজ বুঝিলা তখন
 কেন সেই যত্নপূরে গোপনে যাইতে কারু,
 এই পাপে হ'ল নিমগন ।
 স্বদীর্ঘ নিখাস ছাড়ি, জালবদ্ধ সিংহ মত
 দাড়াইলা কক্ষে অধোমুখে ;
 নিবিল এ ক্রোধানল ; নির্দোষিত প্রতিহিংসা।
 জলিয়া উঠিল পুনঃ বৃকে ।
 হর্যাসা । নাগরাজ ব্রাহ্ম ভূমি । জানি বিজ্ঞাচল সম
 অনার্য্যার চরিত্র অটল ।
 কার সাধ্য অনার্য্যার কলুষিবে সে চরিত্র,
 কলুষিবে জাহ্নবীর জল ।
 দেখি অগ্নি-শিখা জ্বল পতঙ্গ উড়িয়া পড়ি
 হয় আত্মঘাতী অগণন ।

অপবিত্র অগ্নি-শিখা হয় কি ? যাদবকুল

অজ্ঞাঘাতী হইবে তেমন।

অনার্য্যার তীব্র সুরা, অনার্য্যার তীব্র রূপ,—

কামানলে মত্ত যত্নকুল।

কামানলে ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেইরূপে,

যত্নকুল হইবে নির্মূল।

পারিলে না আনিতে কি তোমার আপন সৈন্ত ?

বাহুকি।

নাগ-সৈন্ত হইয়া সজ্জিত,

প্রভাস যাত্রীর মত আসি' কালি সন্ধ্যাকালে

মহাবনে হবে একত্রিত।

হর্ষাসা।

। তোমার করে ছিল যেই কার্য্য ভার ?

কাক।

হইয়াছে, হইবে সাধিত।

হর্ষাসা।

উত্তম ! পড়িবে পুনঃ উর্গনাভ নিজ জালে

হবে কালি সবংশে নিহত।

বাহুকি।

না, না, স্বাধ ! নাগ-সৈন্ত করিবে না অজ্ঞাঘাত

কৃষ্ণার্জুন প্রতি হুতজ্ঞার ;

নখাগ্রও তাহাদের ছুইবে না।

হর্ষাসা।

কেন নাগ !

বাহুকি।

এই তিন দেবতা আমার !

বিস্মিত নয়নে কাক, হর্ষাসা বিস্মিত নেত্রে,

চাহিলেন বাহুকির পানে।

উর্ধ্বনেত্রে শৈল কক্ষে, শৈল প্রতিমূর্তি মত,

নাগরাজ দাঁড়াইয়া ধ্যানে।

বাহুকি।

শুন ঋষি অরংকাক, শুন অভাগিনি কাক,

যেই স্বর্গ দেখেছি নয়নে

আসিতে আসিতে পথে, অদূরে সিঁদুর তীরে,

দ্বৈপায়ন মহর্ষি আশ্রমে ।

কি আশ্রম পুণ্যময়, শাস্তিময়, প্রীতিময়,

আনন্দ-আগম্য স্নানীতল ।

আমি হিংস্র বনপশু কেমনে কহিব তাহা,—

সে ত নহে এই ধরাতল ।

স্বনীল আকাশ-পটে, শ্রামল ধরার বক্ষে,

ধ্যান-মগ্ন শাস্ত্র শৃঙ্গচয়,

শোভিছে চিত্রিতমত, নীল মণিময় পটে,

শ্রাম অঙ্গ মরকতময় ।

কি শাস্ত কানন-শোভা ! কাননে কি মনোলোভা

পুণ্যানীরা সরসী, নিৰ্ঝর !

জলচর, স্থলচর, হিংসক, হিংসিত, পশু

বেড়াইছে যেন সহোদর ।

আশ্রমের পুণ্য লতা, আশ্রমের পুণ্য ফুল,—

ঋষিপুত্রকন্ডা—নিরন্তর

খেলে পশু পক্ষী সহ, আলিঙ্গি শার্দূল, সিংহ,

পশু পক্ষী যেন সহোদর ।

অসংখ্য কুটীর ঘায়ে, কাননছায়ায় বসি,

যেন শাস্ত পবিত্র নিৰ্ঝর

কহিতেছে শাস্ত্রকথা আৰ্য, ও অনার্য ঋষি,

যেন প্রেমময় সহোদর ।

যোগশূন্য-বক্ষে শোভে রজতের উত্তরীয়

সরস্বতী-স্রোত মনোহর,

দেখিলাম সেই শূন্য, সেই সরস্বতী-তীরে,

কি পবিত্র কুটীর স্থলয় !

যে পার্থের ভূজবলে, যে ভদ্রার পুণ্যবলে,
 যে কৃষ্ণের দেবত্বে স্থাপিত
 ক্ষত্রিয়ের ধর্মরাজ্য সেই তিন দেব মূর্তি
 এ ক্ষুদ্র কুটীরে বিরাজিত ।
 সেই রাজ্য-চন্দ্রালোক পশিল নিবিড় বনে,
 —আমরা পতিত আর নহি—
 কারু বে ! বাহার প্রেমে, সেই শৈল তাঁহাদের
 চরণ-সেবিকা প্রেমময়ী ।
 কুটীরের তিন কক্ষ,—সম্মুখের কক্ষে চিত্র,
 স্তম্ভদ্বার তুলিতে অঙ্কিত,
 শোভিতেছে কৃষ্ণলীলা ; পশ্চাতের কক্ষ এক
 শৈলজার চিত্রে সুশোভিত,—
 পাতালে অনাথা বালা, বৈবতকে ভৃত্য বেশ,
 বনে বনমাতা কুমারের,
 প্রেমময়ী সন্ন্যাসিনী, বনভূমি উদ্ধারিণী,
 অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাননের ।
 শোভে অত্র কক্ষে চিত্র অভিমুখ্য উত্তরার,—
 এই কক্ষ শোকপারাবার :
 পাষণ ঘাইবে গলি' দেখিলে এ চিত্রাবলী,
 মানবের কথা কি আবার ।
 সেই দুই শেষ চিত্র—সেই চক্রবৃ-হ-শায়ী
 মাতৃ-অঙ্কে বীরেন্দ্র কুমার ।
 আর সেই চিত্রা-দ্বিত ।—না, না, পারিব না আর,
 কারু ! কে কাটিছে অ মার ।
 সরল শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলা শোকে
 নাপ্রবাক করি হাহাকার ;

কাদিল উচ্ছ্বাসে কারু ; কেবল রহিল শুষ্ক
 কোটরস্থ নেত্র দু'ধার ।
 স্বাহািক সপত্নী অনার্য্য আর্য্য ঋষিগণ মিলি যবে,
 মিলি যবে ঋষি-শিশুগণ,
 গায় সবে কৃষ্ণ-নাম সহ শৈল ভদ্রার্জুন,
 প্রেমের উচ্ছ্বাসে হতমন ;
 হতমন প্রেমোচ্ছ্বাসে দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে
 সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি মহিমার ।
 কারু বে, সে প্রেমোচ্ছ্বাসে পাষণ ষায় বে গলি,
 মানবের কথা কি আবার !
 এক দিন সে সময় পশি তত্ত্বের মত
 সে নির্মল পবিত্র কুটীবে,
 প্রণত হইয়া ভূমে কক্ষে কক্ষে চিত্রাবলী
 নমিয়াছি ভাসি অশ্রুধীরে ।
 অলক্ষিতে চতুষ্টয়—কৃষ্ণার্জুন ভদ্রাশৈল—
 নমিয়াছি দিনে শত বার ;
 কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত ! বেথাটিও পারে নাই
 কাল তাহে করিতে সঞ্চার !
 কি রহস্ত !—এক দিন জিজ্ঞাসিলু ঋষি একে ;
 তপস্বী কহিল ধীরে হাসি—
 “যুদ্ধ ! জান না তুমি পুশ্পটও ত্রিদিবের
 কখন হয় না শুষ্ক বাসি ।
 কৃষ্ণ নর-নারায়ণ ; নর-দেব, নারী-দেবী,—
 তাঁহার বিভূতি তিন জন ।
 কালের ক্ষতীত তাঁরা, ষায় যুবা ! কাল বহি
 প্রণমিয়া তাঁদের চরণ ।”

যুবক ! যুবক ! আমি যুবক ! যুবতী তুই !

কাক ! এত মিথ্যা কথা নয় ।

নহে দেব, নহে দেবী, আমরা হুয়াশা-মোহে

দেব-দম্ভী মাত্র হুয়াশয় !

কিন্তু আর হইব না । আৰ্য্য অনাৰ্য্যের এই

সন্মিলিত মহারাজ্যে স্থান

মাগি' নিব ভ্রাতা ভগ্নী ; পতিতপাবন কৃষ্ণ !—

আনন্দে গাহিব কৃষ্ণনাম ।

ভক্তির নিঝর শান্ত নাগরাজ হনয়নে

বহিতেছে ধারা নিরন্তর ;

ভগিনীর নেত্র-সিক্ত ভকতির সে উজ্জ্বলে ;

শুধুনেত্র মাত্র ঋষিবর ।

হর্ষাসা । নাগেন্দ্র ! কি ভাস্তি তব ! বুঝিয়াও বুঝিলে ন

কত বার চক্র এ চক্রীর !

কুরুক্ষেত্রে নিক্ষেপ্ত হইয়াছে ভারত-ভূমি ;

অনার্য্য তুলিয়া যদি শিব

হয় তবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য,

কি করিবে একা যত্নকুল ?

শিমূল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি !

কজ্র জাতি হইবে নির্মূল ।

তাই এই ধর্মরাজ্য, তাই এই প্রেমরাজ্য,

আৰ্য্য অনাৰ্য্যের সন্মিলিত ;

গেছে ষট্‌জিংশ বর্ষ, যায় আর কিছুকাল,

কজ্র বংশ হইবে বর্জিত ।

তখন থাকিব শত জলিবে অনার্য্য-ভূমে,

হবে শত ইন্দ্রপ্রস্থ আর ;

তখন এ ধর্মরাজ্যে অনার্য ও ব্রাহ্মণের
 চিহ্ন মাত্র রহিরে না আর ।
 অকস্মাৎ কি গর্জন ! ভূমিকম্প কি ভীষণ !—
 নাগরাজ পড়িল শিলায় ।
 মস্তক হইল ক্ষত, ছুটিল শোণিতধারা,
 চাপি করে, থর থর কায়
 কাঁপিতেছে ভ্রাতা ভগ্নী, ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ ;
 প্রসারিয়া ক্ষুদ্র চনয়ন
 কহিল দুর্বাসা—“নাগ ! এ কক্ষে করিলে যেই
 মহাসন্ধি, করিতে লজ্বল
 এখন উদ্ভূত তুমি ! ক্রুদ্ধ তাহে ভূতনাথ,—
 সেই ক্রোধে এই প্রকম্পন ।
 দেগিবে প্রমাণ আরো ? আইস”—ইজিতে ঋষি
 ডাকিলে, ভয়েতে জ্ঞানহত
 চলিল ভগিনী ভ্রাতা ঋষির পশ্চাতে, দুই
 ক্রৌড়নক সূত্রে আকর্ষিত ।
 পর্বতশেখরে উঠি দেখিল বিশাল হ্রদ ;
 হ্রদে ওকি দৃশ্য বিভীষণ !
 গর্জিছে পর্বত গর্ভে কি ভীষণ অগ্নিসিদ্ধ
 ধূমরাশি করি উদ্গিরণ ।
 অগ্নিসিদ্ধ কি ভীষণ ! কি গর্জন ! কি ঘূর্ণন !
 অগ্নিশিখা শত সংখ্যাভীত,—
 ভীমা অগ্নি-ভূতদ্বিনী—ছুটিতেছে, গর্জিতেছে,
 অগ্নি-সিদ্ধ করিয়া মথিত ।
 শতধা বিদীণ করি যেন এই শৈল-গিরি
 রুদ্ধ ক্রুদ্ধ অগ্নি-পারাবার

চাহিছে ছুটিতে বেগে নাশিতে আকাশতল,

ধরাতল করিয়া সংহার ।

এই অগ্নি-হৃদতীরে' নিশীথ আকাশ-তলে,

হুঁসিয়া প্রসারি ক্ষুদ্র কর

কহে—“দেখ নাগরাজ ! জয়ংকার যোগানল !

ওই দেখ অনার্য্য-ঈশ্বর !”

হ্রদের অপর তীরে ছল্ল-ভূতনাথ ধীরে

মহাক্রোধে করিয়া গর্জ্জন

কহিলেন—“নাগাধম ! লজ্জিবি প্রতিজ্ঞা তোর ?

মম আজ্ঞা করিবি লঙ্ঘন ?

পাণ্ডব কোরব বংশ ভয়ীভূত কুরুক্ষেত্রে,

যহবংশ মাত্র আছে আর,

প্রভাস উৎসব ক্ষেত্রে কালি গুপ্ত অস্ত্রে তুই

যত্নকুল করিবি সংহার

জয়ংকার যোগবলে ! করিবি অনার্য্য রাজ্য

আসমুদ্র অচল স্থাপিত !”

অগ্নির গর্জ্জন সহ মিশিল সে ভীম বব,

ভীম মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্হিত ।

ঘন ঘন কাঁপে বরা ; শৈল শৃঙ্গ কাঁপে ঘন,

সিদ্ধ-গর্ভে ঘান-যষ্টি যত ;

বাহুকি বিহ্বল ভয়ে, ভয়েতে বিহ্বলা কার,

পড়িলা শিখরে মূর্ত্তাগত ।

পঞ্চম সর্গ ।

—:~:—

মহাপান ।

উদ্বেল আনন্দে, লীলায় উচ্ছল,
 প্রভাসের সিদ্ধ উঠিল ভাসি
 মধুর বাসন্তী-পূর্ণিমা উষায় ;—
 হৃদয়ে অনন্ত মাধুরী রাশি।
 উবার আলোকে উঠিল ভাসিয়া
 স্নদর্শন চূড়া, কৃষ্ণের শিবির ;
 “হরি বোল হরি ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হরি !”—
 গাইয়া আনন্দে অধীর
 কণ্ঠ লক্ষ লক্ষ ; লক্ষ লক্ষ যাত্রী
 পড়িল সৈকতে প্রণমি শিবির ;
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গায় প্রকম্পিত
 করি মহাসিদ্ধ প্রভাসের তীর ।
 গাইয়া, নাচিয়া, করতালি দিয়া,
 আর্থ্য ও অনার্থ্য শিশু, নারী, নর,
 ছুটে সিদ্ধ পানে, ছুটে যেই রূপে
 সৈকত-বালুকা বহে যবে ঝড় ।
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গাইয়া গাইয়া
 অংগাহে যাত্রী—শিশু, নারী, নর ;
 বিচিত্র বরণ, বিচিত্র বসন,
 প্রভাসের আজি কি শোভা হৃদয় !

“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—বলি দেয় ডুব,
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—ভাসিয়া কহে ।
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গায় পারাবার,
 হরে ! কৃষ্ণ !”—সিদ্ধু অনিলে বহে ।
 করি সিদ্ধু স্নান, অঙ্গে লিখি নাম,
 বেড়িল শিবির যাত্রী অগণন,
 আকুল হৃদয় করিতে দর্শন
 নরচক্ষে সেই নর-নারায়ণ ।
 ধীরে ধীরে হরি হইলা উদয়
 হইল উদয় দুই দিনকর ।
 এক সূর্য্যো দীপ্ত সিদ্ধু প্রভাসের
 অস্ত্র সূর্য্যো মহাকাশের সাগর ।
 চূড়াবন্ধ কেশ,—মোহন মুকুট !
 নীলমণি অংসে, উরসে আর,
 শোভে গৈরিকের উত্তরীয় চারু ;
 অঙ্গে অঙ্গে কিবা লীলা মহিমার ।
 করুণা মহিমা ললাটে নয়নে,
 করুণা মহিমা উরসে ভরা,
 সুধাকর-সুখা করুণা-মহিমা
 বহিতেছে ঘেন প্রাণিয়া ধরা ।
 কি সুদীর্ঘ দেহ, কণ্ঠ সুবক্রিয় !
 যাত্রী-সিদ্ধুবন্ধে উঠিল ভাসি ।
 ত্রীমুখমণ্ডল, যেন সিদ্ধু বন্ধে
 আকর্ষ ভাস্কর ভাসিল হাসি
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—যাত্রী লক্ষ লক্ষ
 গাই এক কণ্ঠে প্রাণিয়া গগন,

পড়িল ভূতলে ভক্তিতে অধীর
 সাষ্টাঙ্গে প্রণত প্রণমি চরণ ।
 অনন্ত তরঙ্গ ভূজে প্রণমিয়া
 হইল পয়োধি প্রণত স্থির ;
 এই মহাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একা
 আপাদ ভাস্কর বক্ষে জলধির ।
 অনিমিষ নীল নীলোজ্জ নয়ন,
 আকর্ণ বিশ্রাস্ত, প্রেমে ছল ছল,
 চাহি বসন্তের নীলকাশ পানে
 নীলমগি মূর্তি স্থির অবিচল ।
 তুলি লক্ষ শির প্রভাসের তীর,
 লক্ষ শির তুলি প্রভাস-সাগর,
 সেই দেব-মূর্তি চাহি অনিমিষ,
 চাহি অনিমিষ বিশ্ব চরাচর ।
 দেখে অনিমিষ ব্রজবাসিগণ—
 ব্রজের গোপাল যশোদা-হলাল,
 শিরে শিখি চূড়া, অঙ্গে পীত ধড়া,
 করেছে পাঁচনি, কর্ণে বনমালা ।
 ব্রজের কিশোরী দেখে অনিমিষ
 ব্রজের কিশোর জিভক্ৰ শ্রাম,—
 কি মধুর হাসি, কি মধুর বাণী,
 করিছে কি প্রেমে উদাস প্রাণ ।
 দেখে ক্ষত্রিয়েরা নেত্রে অনিমিষ
 অর্জুন-সারথি পাঞ্চজন্তমর,
 যথ-চক্র যত মহা বণ-চক্র
 করিছে চালন কি বিশ্বয়কর !

অনিমিষ নেত্রে দেখে ষোগিগণ
 মহাষোগি-মূর্তি ষোগে নিমগন ;
 দেখে অনার্যেরা নেত্রে অনিমিষ
 দয়াময় হরি, পতিতপাবন !
 দেখে যাদবেরা নেত্রে অনিমিষ,
 দেখে কামাসক্ত সুরাসক্তগণ,
 মহাশাল মূর্তি দাড়ায়ে সম্মুখে
 নব কুরুক্ষেত্রে ভীম দরশন ।
 স্তম্ভদ্রা শৈলজা সঙ্গে দুই জন,
 চলিলেন হরি প্রসন্ন বদন
 শত নর নারী দেয় গড়াগড়ি
 পড়ি পদপদ্মে, চলে না চরণ ।
 ভক্তি-অশ্রু-জলে প্রক্ষালি চরণ
 ভিজিছে সৈকত পবিত্র নীবে,
 গায় “কৃষ্ণ ! হরি !” নাচে ভক্তগণ,
 মাখি সেই ধূলা ললাটে শিবে ।
 যেতেছেন হরি পবিত্র করিয়া
 যেই ধূলারানি, তাহাতে পড়ি
 “হরি । কৃষ্ণ ! হরি !” বলি নর নারী,
 আৰ্য্য ও অনার্য্য, যায় গড়াগড়ি ।
 যেই খানে হরি, উঠিছে সেখানে—
 “হরি । কৃষ্ণ ! হরি ! পতিতপাবন ।”
 “জয় বনমাতা — স্তম্ভদ্রা জননী !”—
 উঠে পুণ্যযব বিদ্যাবি গগন ।
 তোলে অতিথিনি বোঝনে বোঝনে
 ব্যাণিজ্য প্রভাস মন্ত ব্যক্তিগণ—

“জয় বনমাতা !—সুভদ্রা জননী ।।

হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! পতিতপাবন ।”

কোথা বৃদ্ধা নারী কণ্ঠ জড়াইয়া

কহে “বুকে আয় ! আয় নীলমণি !”

মাতৃপ্রেমে বৃদ্ধা উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া,

কহে—“আমি তোঁর যশোদা জননী ।

বৈধেহিনু তোঁরে, মেরেছিনু তোঁরে,

তাই ওরে নিরদয় ননীচোর

আসিলি ছাঁড়িয়া ? আয় বুকে আয় ।”—

কহে যশোদার ভাবেতে বিভোর ।

কহে বৃদ্ধ কেহ নন্দ-প্রেমে ভোর

গলা জড়াইয়া—“গোপাল আমার !

কত কাল হায় ! অশ্রু-স্রোত যম

যমুনার স্রোতে বহে অনিবার ।”

শ্রীদাম সুনাম ভাবে ভোর কেহ

কহে ডাক—“ওরে ভাই বে কানাই !

বেলা হ’ল ভাই, চল গোষ্ঠে যাই !

তুই বিনা ভাই ! যায় না গাই !”

গোপী-ভাবে ভোর যুবতী সকল

ছাড়ি পতি পুত্র, অবশ প্রাণ,

নাহি লজ্জা ভয় দিয়া আলিঙ্গন,

নাচে হাসে বাসে, গায় প্রেম-গান ।

কহে—“পতি পুত্র নাহি পড়ে মনে,

তুমি প্রাণপতি তুমি প্রাণেশ্বর ।

কত কাল হায় ! অগ্নি বিবাহে,

জুড়াও এ প্রেম-পিপাসা-কাতর !

ওইত কালিন্দী, জিজ্ঞাস হে গ্রাম !

যমুনা-পুলিনে জিজ্ঞাস আর,

কত অশ্রুধারা বরিয়াছে হায় !

আমরা বিরহ-বিধুরা বালার :

দেও আলিঙ্গন জুড়াও এ প্রাণ !

দেও পাদপদ্ম হৃদয়োপরি !”

ধরে পাদপদ্ম অনাবৃত বক্ষে,

শোভে পুষ্পপাত্রে ফুল ইন্দীবর ।

কেহ বা বিবশা পড়িয়া চরণে,

অঙ্গে অঙ্গে কেহ, কেহ বক্ষোপর,

ভক্তির চরম প্রেমে আত্মহারা ;

আপনি কেশব প্রেমেতে বিভোর ।

বহে অশ্রুধারা রমণী-নয়নে,

বহে অশ্রুধারা নয়নে হরির,

“হবে ! কৃষ্ণ ! হবে !”—গায় নর নারী

নাচে আত্মহারা বহে নেজে নীর ।

দাঁড়াইলে কৃষ্ণ সলিল সমীপে,

ব্রজকিশোরীর ভাবে নারীগণ

দলে দলে দলে পড়ে সিঁদুজলে,

কোথায় ভূষণ, কোথায় বসন !

আকঙ্ক আবঙ্ক সলিলে ভুবিয়া,

কহে যোড়করে—“ত্রিভঙ্গ গ্রাম !

কদম্বের ডালে বাজাও বাঁশরা,

ব্রজকিশোরীর জুড়াও প্রাণ !

লও কুল মান, বাহা আছে আর,

লও প্রেম, লও চরণে প্রাণ !”

ভাসে অল্পাগে অধীরা অবলা,
 সাগর-তরঙ্গে কুহুম রাশি,
 “হবে ! কৃষ্ণ ! হবে !”—গায়ে তীরে নীরে
 নর নারী প্রেম-তরঙ্গে ভাসি ।
 চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
 কেহ কহে—“পিতা আমি পুত্র ভব ।”
 কেহ কহে—“প্রভু ! তব দাস আমি
 যাবত জীবন চরণে রব ।”
 কেহ পুষ্পমালা পরায় গলায়,
 চাঁচব চুড়ায় পরায় কেহ,
 করে পদে, অঙ্গে, দেয় পুষ্পমালা,
 চন্দনে চর্চিত করিয়া দেহ ।
 কেহ দেয় করে স্তমোহন বাঁশী,
 কেহ দেয় করে পাঁচনি বাড়ি,
 কেহ করে তুলি দেয় চারু শিঙ্গা,
 ব্রজলীলা-রঙ্গে মত্ত নর নারী ।
 কোথায় বাৎসল্য তরঙ্গে ভাসিয়া
 গায় নর নারী শৈশব লীলা,
 গায় গোষ্ঠলীলা কোথায় আবার
 সখ্য প্রেমোচ্ছ্বাসে দ্রবিয়া শিলা ।
 গায় বাসলীলা হইয়া তনয়
 কান্ত ও মধুর প্রেমে বিহ্বল ;
 কোথায় বা গায় কুরুক্ষেত্র লীলা
 শান্ত দান্ত প্রেমে নেত্র ছল ছল ।
 সকলেই দেখে আশন গলায়,
 অঙ্গে, বক্ষে, কৃষ্ণ করিছে বিহার ।

কারো পিতা, কারো পুত্র, কারো সখা,
 কারো প্রাণপতি, প্রাণমী কাহার ।
 একপে বাৎসল্য, শাস্ত, দাস্ত, সখ্য,
 কাস্ত ও মধুর প্রেমে ভাসমান
 পবিত্র প্রভাস—নব বৃন্দাবন,
 প্রেমে সিদ্ধু আজ বহিছে উজান ।
 লক্ষ লক্ষ যাত্রী ব্যাপিয়া প্রভাস
 প্রেমের সাগরে মত্ত ভাসমান,
 করিতেছে পান অজস্র ধারায়,—
 কিবা মহাসিদ্ধু !—কি মহাপান !
 মানব সিদ্ধুর প্রেমের তরঙ্গে
 ভাসিয়া ভাসিয়া করি দিবাভীত,
 আসিলেন কৃষ্ণ কিরিয়া শিবিরে,
 জুড়ায়ে তাপিত, উদ্ধারি পতিত ।
 প্রেমের আবেশে আপনি অধীর
 শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া হরি,
 দেখিলা অনন্ত সিদ্ধুর সৈকতে
 মানব-সিদ্ধুর অনন্ত লহরী ।
 অনন্ত যন্ত্রের অনন্ত সঙ্গীত
 ছুটিছে মধুরে লহরে লহরে ।
 লহরে লহরে বক্ষে সঙ্গীতের
 বহিছে ছুটিয়া—“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”
 নাহি তৃষ্ণা কুখা, নাহি অবসাদ,
 আৰ্য্য কি অনাৰ্য্য নাহি কিছু জ্ঞান,
 গাইছে নাচিছে গলাগলি করি,
 করিতেছে কৃষ্ণ-প্রেমাসুত পান ।

যোগী সংখ্যাতীত বসি স্থানে স্থানে
 ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে করে গীতা গান,
 কেহ বা যোগস্থ, সমাধিস্থ কেহ,
 করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ।
 কুরুক্ষেত্র পূর্বে অন্তর বিগ্রহে
 যে বাণিজ্যে ক্ষেত্র ছিল মরুময়,
 আজি সেই ক্ষেত্র মহাবত্নাকর,
 অনন্ত রত্নের অনন্ত আলয় ।
 আসিদ্ধ অচল বাপি মহাত্মোতে,
 ঢালিয়াছে রত্ন সেই রত্নাকর
 প্রভাসে অক্ষয়, বিপণমালায়
 দিগন্ত সজ্জিত, কি শোভা সুন্দর !
 বিহ্বল বিক্রেতা গায়ে কৃষ্ণনাম,
 কৃষ্ণনাম ক্রেতা পাইছে বিহ্বল,
 পণ্য কৃষ্ণনাম, মূল্য কৃষ্ণনাম,
 কৃষ্ণ-প্রেম যেন বাণিজ্য সম্বল ।
 দেখিলেন হরি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম,
 তিন মহাত্মোতে করিয়া প্লাবিত
 সমগ্র ভারত, আজি এ প্রভাসে
 কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে হয়েছে মিলিত ।
 প্রণমি স্রাষ্টাদে আকুল উচ্ছ্বাসে
 কহে শৈল দর দর ছনয়ন—
 “দেখ নরনাথ ! দেখ নারায়ণ !—
 আৰ্য্য অনার্য্যের প্রেম সন্মিলন !
 ত্রিযুগের হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ,
 তব প্রেম-স্রোতে গিয়াছে তাসি ।

দেখ ধর্মরাজ্য !— প্রেম রাজ্য তব !

কি প্রেম !—কি শাস্তি !—অমৃতরাশি !”

কহিলেন হরি প্রেমের উচ্ছ্বাসে

আকুল আনন্দে অধীর প্রাণ—

“এ যে প্রেম-রাজ্য ভদ্রা শৈলজার !

শৈল ! আজি মম পূর্ণ মনস্কাম ।”

আকুল উচ্ছ্বাসে পড়িয়া চরণে

কহিলা উদ্ধব—“পূর্ণ মনস্কাম

উদ্ধবের আজি ! দেখিল এ লীলা,

বিদায় তাহারে দেও ভগবান ।”

কহিলেন কৃষ্ণ—“উদ্ধব ! উদ্ধব !

এক মাত্র তুমি সখা স্বরূপায় ।

সাদাক্ষ জীবনে একই সাধনা,

যাইও না তুমি ছাড়িয়া আমার ।

ব্রজের উচ্ছ্বাসে উদ্ধব ! আমার

আজি উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রাণ ।

নাহি নন্দ পিতা, যশোদা জননী,

নাহি সখা মম শ্রীদাম সুদাম ।

গোষ্ঠের সঙ্গিনী, বন-বিহারিণী

প্রেমের প্রতিমা কিশোরীগণ,

ভক্তিবিলাসিনী, নাহি মম আর

নাহি সে যমুনা, নাহি বৃন্দাবন ।

ব্রজের সে খেলা সাক্ষ বহু দিন,

সে প্রেম-স্বপন হইয়াছে শেষ ।

সেই বনমালা গেছে ওকাইয়া,

বাজে না সে বাঁশী, নাহি সেই বেশ ।

ছাড়ি-প্রেমময় বন্ধ-বশোদার,
 জনক নন্দের অঙ্ক প্রেমময়,
 ছাড়ি প্রেমময় ব্রজের রাখাল,
 ছাড়ি প্রেমময়ী কিশোরী-হৃদয়,
 উদ্ধব ! উদ্ধব ! ছাড়িয়া আমার
 প্রেমের প্রবাহ গভী বৎসগণ.
 ছাড়ি প্রেমময়ী যমুনা আমার,
 প্রেম-পুষ্পময় ছাড়ি বৃন্দাবন,
 কি মহা মরুতে দিয়াছিহু ঝাপ !
 হুই ভুজ মম পার্থ দৈপায়ন ;
 হুই ভুজ বলে জাগাইহু হায় ।
 কত কুরুক্ষেত্র ঝাণ্ডব ভীষণ !
 সেই মরুভূমি, সেই বনভূমি,
 আসিহু হিমাঙ্গি হইলে উদ্ধার,
 অস্ত্র হুই ভুজ লতা ভদ্রা শৈল
 সৃজিয়াছে কিবা প্রেম পারাবার !
 আজি চতুর্ভূজ মুরতি আমার
 গদা পার্থ-বল' শঙ্খ গীতা আর,
 স্তম্ভদ্বার বন্ধ শাস্তি শতধল,
 প্রেম মধুচক্র বন্ধ শৈলজার ।
 পূর্ণ আজি মম জীবনের ব্রত,
 পূর্ণ ঝাপরের নিয়তি কঠোর,
 অধর্মের ক্লমপক্ষ ঘোরতর,
 হইল নীরবে কুরুক্ষেত্রে ভোর ।
 আজ্ঞ-বলিদান দিয়া অভিমত্যা
 যেই গুরুপক্ষ করিল সকার,

পবিত্র প্রভাসে হইল উদিত,
 সুশীতল পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমার ।
 কি চন্দ্র শীতল ! কি শান্তি জ্যোৎস্না !
 কি ঘোর ঝটিকা অমাবস্তা পরে !
 যেও না উদ্ধব ছাড়িয়া আমায়
 এ মহা উজ্জ্বল, নিষ্ঠুর অন্তরে ।
 দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
 প্রভাস সিদ্ধুর গর্ভে ভাসমান
 কিবা পূর্ণচন্দ্র, মহাকাল গর্ভে
 নব মহাধর্ম ঘেন মূর্তিমান ।
 দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস,
 আসিছে অচল শান্তি জ্যোৎস্নার
 ভাসিছে ভারত ; ধর্ম-শশধর
 বর্ষিতেছে সুশা অনন্ত ধারায় ।
 দেখিল উদ্ধব, দেখিল প্রভাস
 প্রভাস সাগর কত ক্ষুদ্রতর ।
 অভিন্ন আর্ধ্য ও অনার্য্য হৃদয়,
 অনন্ত প্রেমের কি মহাসাগর ।
 কহিল উদ্ধব বোড়করে পুনঃ—
 “কৃপাসিদ্ধ ! দাসে হইয়া নিদয়,
 রাজনীতি মরুভূমিতে তাহার
 একটি জীবন করিতেছ ক্ষয় !
 দেখাইয়া তারে মুরতি কঠোর,
 করেছ কঠোর হৃদয় তাহার
 মহামরুভূমি । আজি সে মরুতে
 একটি নবর হইয়েছে সঞ্চার ।

পান করি এই সুশীতল নীর
 কি শান্তি জীবনে হয়েছে সঞ্চার,
 পড়িয়াছে খসি নেত্র-আবরণ
 কি স্বর্গ খুলেছে নয়নে আমার ।
 যাইব গোপাল ! তব বৃন্দাবনে,
 যমুনার তীরে যাইব তোমার,
 ভ্রমি কুঞ্জে কুঞ্জে, যমুনা-পুলিনে,
 তুনিব তোমার বাঁশীর স্বাক্ষর ।
 পিতা নন্দ তব, জননী যশোদা,
 দেখিব তোমাব বিহর-বিধুর ।
 দেখিব শ্রীদাম দেখিব স্নদাম,
 সেই গোষ্ঠ-গীলা দেখিব মধুর ।
 যমুনা-পুলিনে বিবহ-বিধুরা
 ব্রজের কিশোরী হারাইয়া শ্রাম,
 দেখিয়া নয়নে, পড়িয়া চরণে,
 চাহিব কাতরে তব প্রেম দান ।
 বিদায় এ দাসে দেও দয়াময় ।
 দিয়া পাদপদ্ম পাষণ উদ্ধার ।
 কর এ দ্বাপরে !”—কাতরে কাঁদিয়া
 পড়িল উদ্ধব চরণে আবার ।
 ব্রজের স্মৃতিতে কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত
 কহিলেন কৃষ্ণ করুণ-হৃদয়,—
 “কে দেখিতে যায় বল না, উদ্ধব
 উৎসবের অন্তে উৎসব আলয় ?
 কে-দেখিতে যায় বল বলালয়,
 হইলে উদ্ধব । অভিনয় শেষ ?

ব্রজের উৎসব হইয়াছে শেষ;

নাহি সেই গীত, নাহি সেই বেশ !

বহু দিন গত যমিনীকা হায় !

পড়িয়াছে, আজ শূন্য রঙ্গালয় !

কি দেখিতে বল বাইবে উদ্ধব !

নাহি অভিনেতৃ, নাহি অভিনয় ।

যে ক্ষুদ্র নিকরে জন্মিলা জাহ্নবী,

রহিলা কি ক্রুদ্ধ সেই নিরঝরে ?

উড়াইয়া শৈল, জুড়াইয়া মরু,

পতিতপাবনী মিথিলা সাগরে ।

ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে—ক্ষুদ্র নিরঝরে—

গোপের গোপীর হৃদয়ে তরল

যে প্রেম-জাহ্নবী জন্মিলা উদ্ধব !

বড়মুখী, করি অশাস্তি অনল

নির্ঝাপিত, বোর অধর্মের শৈল

বলে কুরুক্ষেত্রে করি বিতাড়িত ;

জুড়াই তাপিত, উদ্ধারি পতিত,

হইল প্রভাসে সাগরে মিলিত ।

বিশ্ব চরাচর আজি বৃন্দাবন,

মহাকাল ধারা যমুনা তাহার,

নর নারী নন্দ, যশোদা জননী,

নর নারী গোপ-কুমারী কুমার ।

ব্রজ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস,—ত্রিভঙ্গ ;

নবধর্ম, মম কদম্ব লীতল ;

নর নারী প্রেম, চাক বনমালা ;

বাণী, বিশ্ব-কর্ত্ত বাজে অবিরল ।

দেখ কি মধুর এই বৃন্দাবন !
 কি মাধুরী এই যমুনা বয় ।
 দেখ কি ত্রিভঙ্গ ! কদম্ব সুন্দর !
 শুন কি বাশরী মাধুরীময় !”
 কহিল উদ্ধব—“পারিল না পার্থ
 বৃষিতে, সহিতে, নর-নারায়ণ !
 যেই বিশ্বরূপ, সে অনন্তরূপ
 কেমনে উদ্ধব করিবে ধারণ ?
 যেই সৌর রাজ্যে, অনন্ত অসীম,
 আদিত্য আপনি যান হারাইয়া,
 কি বৃষিবে তাহা পতঙ্গ খতোত,
 ক্ষীণ ক্ষণস্থায়ী আলোক লইয়া ;
 হায় ! বিনা শিক্ষা, বিনা সাধনায়,
 না পারি লভিতে ক্ষুদ্র শিল্পজ্ঞান ;
 বিনা শিক্ষা, আমি বিনা সাধনায়,
 অনন্ত অস্তিত্বা পূর্ণ ভগবান
 বৃষিব কেমনে ? লজ্জিয়া কেমনে
 অনন্ত জ্ঞানের মহাপারাবার,
 দেখিবে তোমার চিদানন্দ রূপ ?—
 এখনো উদ্ধব শিখেনি সঁতার ।
 ভাবায়, শিল্পের চিত্র, সঙ্গীতের,
 রয়েছে অক্ষর, রয়েছে বিধান ;
 অক্ষর বিধান আছে সেইরূপে
 লভিতে অনন্ত ওব তত্ত্বজ্ঞান ।
 আজি এ প্রভাসে পেয়েছি অক্ষর,
 এ প্রভাসে আজি পেয়েছি বিধান,

বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত,
 ভক্তির অতীত নহে ভগবান !
 তব ভক্তি-ক্ষেত্র, প্রেম ক্ষেত্র-তব,
 যাব বৃন্দাবনে, ভজিব তোমায় ।
 তুমি হবে প্রভু, আমি হব দাস,
 পরে পুত্র, তুমি পিতা করুণায় ।
 আমি পিতা মাতা কিছুদিন পরে,
 তুমি ননৌচোবা জ্বলাল আমার,
 পরে প্রেমময় সখা হই জন,
 গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রেমে করিব বিহার ।
 তখন হইবে তুমি প্রাণপতি,
 আমি প্রাণ-পত্নী হইব তোমার ;
 তুমি যে রমণ, রমণী যে আমি,
 এই জ্ঞান শেষে রবে না আর ।
 ভক্ত ভগবান, প্রেমিকা প্রেমিক,
 হইব চিন্ময়, আনন্দময়,
 বাস নিশি শেষে, চরণে বিদায়
 লইল উদ্ধব, করুণাময়, ।”
 চরণে পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া,
 পবিত্র ধূলায় ধূসরিত কায়,
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গর্জিল বাহু তুলি
 উদ্ধব নাচিয়া নাচিয়া যায় ।
 “হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গর্জিল প্রভাস,
 ছুটিল উন্মত্ত নরনারায়ণ
 উদ্ধবে বেড়িয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
 ফুল জ্যোৎস্নায়, অতুল রশ্মি ।

“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”—গায় দীন কবি,

প্রেমের উচ্ছ্বাসে আনন্দে বিহ্বল,

উদ্ধব ! তাহারে নেও বৃন্দাবনে,

দেখ বন্ধ ভাসি বহে অশ্রুজল !

আমিও উদ্ধব ! তোমার মতন

রাজনীতি মহা মরুতে পড়িয়া,

কাটাইলু এই একটা জীবন,

শত মনস্তাপে জলিয়া পুড়িয়া !

প্রেম-পিপাসায় এ তাপিত প্রাণ

বড়ই কাতর, পিপাসাতুর ;

উদ্ধব ! আমায় নেও বৃন্দাবনে,

সেই ব্রজলীলা দেখিব মধুর ।

চতুর্দশ বর্ষ বসি এক ধ্যানে

দেখিয়াছি সেই লীলা চিন্তাতীত ;

পাইয়াছি শাস্তি মরুদগ্ন প্রাণে,

হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্বাপিত ।

উদ্ধব ! আমারে নেও বৃন্দাবনে !

সেই ব্রজলীলা দেখিয়া মধুর

জুড়াইব প্রাণ,—মরুদগ্ন প্রাণ

বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর

ষষ্ঠ সর্গ ।

—*—

প্রতিজ্ঞা ।

“বনবালা ! বনবালা ! কত কাল আর
 এই পিপাসা অনল
 বহিব এ মরু-বুকে ?—বহিব শোণিতে
 এই অনল তরল ?”—
 অতীত প্রহর নিশি, ফুল নীলাশ্বরে মিশি
 হাসিতেছে বৈশাখের প্রফুল্ল চন্দ্রিম ! ;
 নীলাশ্বর নীলিমায়, উজ্জ্বলিত মহিমায়,
 ভাসিতেছে সেই হাসি পূর্ণ মধুরিমা ।
 বৈশাখের পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র স্বধাধার,
 সমুজ্জল সে স্বধায় প্লাবিত আকাশ ;
 প্লাবিয়া আকাশ অঙ্গ, শীতল স্বধাতরঙ্গ
 তুলিয়াছে সিদ্ধুতীরে কি স্বধা-উজ্জ্বল !
 নারী-মুখ স্বধাকর চাহি সেই শশধর,
 রূপের স্বধায় মুখ পূর্ণিত প্লাবিত ;
 প্লাবি মুখ নীলাশ্বর, ঝরিতেছে স্বধা-কর
 চন্দ্র-দীপ্ত সিদ্ধুতীর করি আলোকিত ।
 সিদ্ধুতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত ছনয়নে,
 বসি বামা. নারী-গর্বে প্রদীপ্ত নয়ন ;
 নারীগর্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
 শোভিতেছে বিজ্যংদীপ্ত মেঘখণ্ড সম ।
 অনার্যের সেনাপতি সাজিয়াছে রূপবতী,

কেশের উষ্ণীষ শোভে ললাট উপর ;
 উষ্ণীষে চূড়ার শোভা চন্দ্রকরে মনোলোভা,
 উরজ্ঞাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর ।
 পৃষ্ঠে তুণ, শরাসন, নিদ্রিত ভুজঙ্গ সম,
 কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতর ;
 খচিত কোষে বলসি নিতম্ব-বিলম্বী অসি,
 শোভিছে সফণা ফণী তীব্র বিষধর ।
 শোভে ভুজে সুকুমার—মনমথের কণ্ঠহার—
 রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি' !
 সুপ্রকোষ্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা,
 খেলে কর সঞ্চালনে কিবা লীলা করি !
 কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় খেলে কিবা লীলাময় !
 সুগোল কোমল কণ্ঠে কঙ্কী মনোহর ;
 কোমল কোষিক শোভা কি উরুতে মনোলোভা !
 সুগোল চরণে শোভে যজ্ঞীর মুখর ।
 রয়েছে জৈষদ হাসি অধর কোণায় ভাসি,
 চাহি চন্দ্র পানে বামা বসি অবিচল,
 চাহি সেই মুখ পানে, অধীর যদিয়া পানে,
 বসি শিলাতলে কহে সাত্যকি বিহ্বল ।—
 "বনবালা ! বনবালা ! কত কাল আর
 এই পিপাসা অনল
 বহিব এ মরুবুকে ?—বহিব শোণিতে
 এই অনল তরল ?
 কত কাল ।—এক দিন নিদ্রাঘ নিশীথে
 শয্যা-কক্ষে, স্বপনে যেমন,
 অপূর্ব-রমণী-মূর্তি নীলিমা মাধুরী

দেখিলাম, মেলিয়া নয়ন ।

নয়ন না পালটিতে চপলার মত

হইল অন্তর স্থলোচনা ।

ভাবিলাম স্বপ্নদেবী হইয়া কি মূর্ত্তিমতী

করিলেন আমায়ে ছলনা ।

বিস্মিত ত্যজিয়া শয্যা, স্বপ্নে যেমন,

কক্ষ হইতে হইয়া বাহির

দেখিলাম, অঞ্চপৃষ্ঠে অপূৰ্ণ কোশলে

বারবালা লজ্জিল প্রাচীর ।

বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত, দেহ রোমাঞ্চিত,

দাঁড়াইয়া অচেতন প্রায়,

ভাবিলাম,—এ কি স্বপ্ন! কিংবা কোন দেবী

এইরূপে ছলিল আমায় !

একি দৃশ্য ! কি রহস্য !—

চিন্তা সাঝানিশি,

দেখিলাম প্রভাতে উঠিয়া,

নহে স্বপ্ন, প্রাচীরের মূলে তুরঙ্গের

পদ-চিহ্ন রয়েছে পড়িয়া !

কে রমণী ? কেন কক্ষে পশিয়া গোপনে

এই রূপে হ'ল অন্তর্হিত ?

সেই অশ্ব-পদ-চিহ্ন হৃদয়ে আমার

হায় ! যেন হইল অঙ্কিত ।

বৃকের উপর দিয়া তুবল-বাহিনী

যেন বেগে গিয়াছে চলিয়া,

কি যেন যদিও স্থিতি, অজ্ঞাত উজ্জ্বল,

রূপ-স্বপ্ন, গিয়াছে রাখিয়া ।

কি যেন দারুণ ব্যথা মরমে মরমে
 অকস্মাত হইল সঞ্চার ;
 কি যেন আবেশে দেহ হইল অবশ,
 প্রাণে যেন কিবা হাহাকার !
 কত দিন, কত নিশি, এই রূপে হয় ।
 বাণ-বিক্র কপোতের মত,
 কাটিলাম যাতনায়, দিবা সুনাহারে,
 যাতনায় নিশি অনিদ্রিত !
 দেখিলাম কত বার, বিহ্বলবিক্ষেপী
 নবীন নীরদময়ী বালা
 নাড়াইয়া কক্ষে মম, বিহ্বলবিক্ষেপে
 অন্ধকার কক্ষ করি আলা ।
 ছুটিলাম উন্মত্তের মত কত বার
 ধরিতে সে দীপ্তা কাদম্বিনী ;
 ধরিলাম, —কিস্তি কই ? কক্ষ অন্ধকার
 ছলিয়াছে ভ্রাস্তি মায়াবিনী ।
 দিবা নিশি কত বার, হয় ! শত বার,
 আরোহিয়া অট্টালিকা-শির,
 দেখিতাম আত্মহারা নেত্রে অনিমিষ
 সেই অশ্রু লজ্জ্য কি প্রাচীর !
 একদা নিশিতে যেন দেখিছ রমণী
 সেই রূপে প্রাচীর লজ্জিয়া,
 বকুলে বাঁধিয়া অশ্রু, কক্ষের প্রাসাদে
 সশক্তি বাইছে চলিয়া ।
 ছুটিলাম হৃদয়ের আবেগের বশে
 শরাসন-ভ্রষ্ট শর মত,

গুনি পদ-শব্দ মম অশ্রাক্রাণ্ডা বামা
 উদ্ধাবৎ হৃৎ অস্তহিত ।
 ছিন্ন সুসজ্জিত অশ্ব নিকটে আমার,
 অশ্ব-পৃষ্ঠে লজ্জিয়া প্রাচীর
 ছুটিহু, ছুটিল বেগে তুরঙ্গ যুগল
 অন্ধকারে যেন দুই তীর
 বায়ুগামী তুরঙ্গের ঘোর হেবারব
 ঘন বন উঠিছে ভাসিয়া
 নৈশ নীরবতা বন্ধে, অশ্ব-পদাঘাতে
 অগ্নি-কণা পড়িছে ছুটিয়া ।
 কিবা অশ্ব-সঞ্চালন ! কত ক্ষুদ্র শ্রোত,
 কত বিহ্ব, করি উল্লভবন
 ছুটিয়াছে বীরজনা, বসি অশ্বে বামা
 চাক্র শৈল প্রতিমা যেমন ।
 এইরূপে বহু ক্রোশ তুরঙ্গ যুগল
 মহাবেগে করি অতিক্রম,
 প্রসারিত পদোপরে অবসর পড়ি,
 অকস্মাত ত্যজিল জীবন ।
 এক লক্ষে পড়ি ভূমে ফিরাইয়া মুখ,
 রাগি বন্ধে করোপরে কর,
 দাড়াইয়া বীরবালা, যেন বনকুরঙ্গিনী
 ব্যাধ অগ্রে সংগ্রাম-তৎপর ।
 অধার নির্মলা নিশি, জলিছে আকাশে
 দীপালোক অসংখ্য নীরব ;
 সেই আলো অন্ধকারে মরি ! কিবা রূপ !
 ভূতলের অতুল বিভব !

বিমুক্ত কুন্তল পটে শোভিতেছে কিবা

শ্বেদ-সিক্ত বদন সুন্দর ।

গ্রাম চিত্র-পটে শিল্পী রেখেছে আঁকিয়া

যেন পূর্ণ নীল শশধর ।

সমেখলা কটিবন্ধে, উচ্চ কটিতটে,

আঁধারে বলসে ভীমা অসি

অশ্ব-সঞ্চালন বেগে দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণী

পীণ বক্ষে পুড়িয়াছে খসি ।

অশ্ব-সঞ্চালন-শ্রমে উঠিছে, পড়িছে,

লীলা করি উন্নত উরস ;

তরঙ্গিত সরোবরে উঠিছে, পড়িছে,

ফুটোমুখ যুগ্ম তামরস !

বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি নির্ভীক মুরতি

দাড়াইয়া দলিতা কপিনী,

জিজ্ঞাসিমু,—‘কহ তুমি দেবী কি মানবী ?’

‘কহিব না’—কহিল গর্জিণী ।

‘কিবা জাতি ?’—কহিব না । ‘কি নাম তোমার ?’

‘কহিব না’—স্বদৃঢ় উত্তর ।

‘কেন এই নিশি-যান তব ?’—‘কহিব না ।’

বজ্রকণ্ঠে কাপিল অন্তর ।

‘তবে গুপ্ত-চর তুমি ধরিব তোমায় ;—

‘ধর শক্তি যদি থাকে তব ।’

‘জান কি সাত্যকি আমি বীরচূড়ামণি ?’

‘জানি’—বামা বহিল নীরব ।

‘সিংহের সহিত জীড়া ।’—আমিও সিংহিনী ।’

‘খোল তবে অসি ভীক ধার ।’— :

'খুলিব না, হান অসি ! পাতিয়াছি বুক !
 কাপুরুষ ঘোষিবে সংসার ।'
 কি ঘোর সংকট ! কিবা মৃতি গরবিনী,
 শিলা সম দাঁড়ায়ে নির্ভীক !
 কি রূপ বিছ্যাৎপ্রভা ! ধাঁধিল নয়ন ;
 যুরিতে লাগিল চারিদিক ।
 কি যেন মদিরা-স্রোত ছুটিল শোণিতে,
 দেহ মম অবশ অধীর,
 কহিলাম—'নারী-বন্ধ ! মানিলাম পরাজয় ;
 এইরূপ নহে অবনীর !
 হৃদয় বিজিত ক্ষত বক্তৃতা সম
 রূপ-পাত্রে লও উপহার ।'—
 'লইলাম ;— এইখানে এমন সময়ে
 পক্ষান্তরে মিলিব আবার !'
 সগর্বে কি বায়ে মুখ চলিল মহুরে,
 কি গর্কিত হৃদয় গমন !
 কি গর্কিত দেহভঙ্গি, রূপ-গরবে
 অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ কেমন !
 রূপের তরঙ্গ-লীলা, চাহিতে চাহিতে,
 মিশাইল নৈশ অন্ধকারে ;
 অন্ত গেল চন্দ্র মম হৃদয়-আকাশে,
 অন্ধকারে আবরি তাহারে ।
 আত্মহারা কিছুকণ ভ্রমি, শিলাথণ্ডে
 রাখি মম অবসন্ন শিখা,
 বসিলাম ধরাভূলে, অবসন্ন দেহে
 শোণিত-প্রবাহ যেন স্থির ।

চাহিলাম নীলাকাশ, দেখিলাম যেন
 নিবিয়াছে তারকা সকল,
 মূর্ত্তিমতী নিশাদেবী শোভিতেছে বামা,
 নীলাকাশ করিয়া উজ্জ্বল ।
 সেই স্মৃতি করিতেছে অবশ হৃদয়,—
 দেও সুরা-পাত্র, বনবালা !
 অধর-মদিরা মাখি ! জ্বলিল এ প্রাণে
 নিদারুণ সেই স্মৃতিজ্বালা ।”
 ঢালি সুরাপাত্রে সুরা, পান করি বামা,
 সাত্যকিরে করিল অর্পণ ;
 পান করি কহে—“ হ ! কিবা তীব্র সুরা !
 তরল বিদ্যুৎ অনুপম ।—
 মিলিলাম পক্ষান্তরে, মিলিলাম আর
 কত স্থানে, হায় ! কত বার !
 প্রহেলিকা স্বরূপিণী এখনো যে তুমি !—
 পুরিল না পিপাসা আমার ।
 মস্ত-মুগ্ধ কণী মত এই দীর্ঘ কাল
 চলিয়াছি ইন্দ্ৰিতে তোমার,
 তোমার ইন্দ্ৰিতে আমি করিয়াছি হায় ।
 কি নরক যাদব-সংসার ।
 তোমার ইন্দ্ৰিতে হায় ! স্থাপিহু গোপনে
 দ্বারকায় শৌণ্ডিক-আলয় ;
 রাখিলাম লুকাইয়া দ্বারকা নগরে
 সর্পী-সম শৌণ্ডিক নিচয় ।
 অনার্থ্য্যার সুরা-সুধা, রূপ-সুধা আর,
 গরলে গরল উগ্র মিশি,

উন্নত যাদবকুল হুই মহাবিষ
 হায় ! পান করি অহর্নিশি !
 অনার্য্যার প্রেমানল, অনার্য্যার হরানল,
 হিংসা-কুণ্ড করি প্রজলিত,
 পুড়িছে যাদবকুল ; ক্রোধের শাসনে
 হইল না অগ্নি নির্ঝাপত ।
 নাহি সে শোণ্ডিকালয়, তথাপি গোপনে
 করিতেছে হুই বিষ পান ;
 দ্বারকা অশান্তিপূর্ণ, না জানি ঘটবে
 যাদবের কিবা পবিণাম !
 কহিলে—‘অনার্য্য জাতি, যারা এক দিন
 ছিল এই ভারত-ঈশ্বর,
 হইয়াছে অন্নভাবে হা অদৃষ্ট ! তারা
 হীনজীরী শোণ্ডিক ইতর ।
 তুমি কুরুক্ষেত্র-জঘা, করুণ-হৃদয়,
 ত্রিক্ষের ভূজ অস্ত্রতর ;
 অনার্য্যোরে দেও ছায়া ! হও যজ্ঞপুবে
 অনার্য্য-আশ্রয় তরুণ !
 অনুচা অনার্য্য-বাণী—এই হেতু তার
 কক্ষে নৈশ অভিসার ।
 দেও ভিক্ষা ! যথাকালে দিবে পদে তব
 জীবন, সর্ব্বস্ব, অনুচার ।’—
 দেও সুরাপাত্র !—আহা ! কি তীব্র অনল !—
 কাল পূর্ণ হয়েছে কি বল ?
 তাই কি প্রেরিলে পত্র ? নাহি পারি আর
 সহিতে এ পিপাসা অনল ।”

আবার মদিরা পান, সুরা বিনিময়
 ছই জনে আবার আবার ;
 বিলোল কটাক্ষ সহ কি লীলা করিয়া
 দেয় বামা পাত্র মদিরার !
 কহিল রমণী,— কিবা কণ্ঠ প্রেমময় !
 বিলাস-বিস্বল মদিরায়,—
 “বীরেন্দ্র ! এ দীর্ঘ কালে বল কি তোমার
 এই ভ্রান্তি ঘুচিল না হায় !
 তুমি আৰ্য্য-কুল-রবি প্রথর উজ্জল,
 পতিতা অনাৰ্য্যা আমি আর,
 আৰ্য্যের উত্তান-ভঙ্গ,—তব বাহুনিয়
 আছে কিবা আমি অনাৰ্য্যার ?”
 সুরা-স্নেহ কণ্ঠে মত্ত কহে যুযুধান,—
 “নীলাজের লীলা নীলিমার
 দেখি নাই যত দিন, ভাবিতাম মনে
 তামরস ত্রিদিব শোভার ।
 শ্রামাক্ষিনী অনাৰ্য্যার রূপে যে মদিরা,
 আছে যেই লালসা প্রথরা,
 গোরাক্ষিনী আৰ্য্যবালা-রূপ জ্যোৎস্নায়
 নাহি সেই লাবণ্য সুধরা ।
 অনাৰ্য্যা কানন-বালা কানন-মদিরা,
 বিহ্যৎ-পূরিতা উগ্র সুরা,
 উত্তান দাড়িম্ব-স্থধা আৰ্য্যা বামাক্ষিনী,—
 পুষ্প-স্থধা কোমলা মধুরা ।
 প্রৌঢ় আমি, করিয়াছে তব রূপ প্রাণে
 কি বিহ্যৎ আবেগ সঞ্চার,

নব যুবকের মত আত্মহারা আমি,
 প্রাণ মম মরু পিপাসার !
 কে বলে যৌবন মাত্র প্রেমের সময় ?
 পারে নদ মধ্যম জীবনে
 দেখাতে কি সেই লীলা, তরঙ্গ উত্তাল,
 খেলে যাহা সাগর-সঙ্গমে ?
 প্রোড়ে মম যে তরঙ্গ, উত্তাল উচ্ছ্বাস,
 খেলিতেছে হৃদয়ে আমার,
 যৌবনের সে উচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র জলকীড়া
 বালকের তুলনায় তার ॥
 প্রভাসের সিন্ধু সম অনন্ত অতল
 আজি প্রেম-সাগর আমার ;
 তব পূর্ণচন্দ্র-মুখ তীব্র আকর্ষণে
 করিছে কি লহরী সঞ্চার !
 দেও সুরা পাত্র,—সুরা চূষি প্রেমাবেশে
 অহো ! কিবা সুরা তীব্রতর
 ঢালিয়াছে, প্রেমময়ি ! অধর তোমার !
 কি আনন্দে ভাসিতেছে ধরা !
 কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! ওই মুখখানি !
 মন্থনের কি লীলা-কমল
 শোভিতেছে চন্দ্র করে ! লগাট, কপোল.
 মাধুরীর স্বর্গ সমুজ্জল !
 মদিরাক্ত ছনয়নে কি অরুণ অ ভা
 কি আবেশে হয়েছে পুন্ডিত
 অরুণ আবেশময় কটাক্ষ বিলোল
 কি তাড়িত করিছে সিক্ত !

ছদ্মবেশে কিবা শোভা অঙ্গে মনোমোভা !

কি তরঙ্গ-রঙ্গ কালজয়ী !

এই দীর্ঘ কাল দেখি ক্রমে পূর্ণতর,

আজি পূর্ণতম প্রেমময়ী !

আজি সেই পূর্ণতায় অভুক্ত সুধার

প্রাণ মম হয়েছে বিকল ।

এস প্রিয়ে ! এস প্রিয়ে !—বাড়াইল কর

স্বরামন্ত সাত্যাকি বিহ্বল ।

বিজ্ঞানীর মত কারু পড়িল সরিয়া,

দাঁড়াইল নিকোষিয়া অসি ।

জানু পাতি ভূমিতলে বসিয়া সাত্যাকি

কহে—“ক্ষম প্রেয়সি ! প্রেয়সি !”

কহে কারু—“এত দিনে বুঝিলে না তুমি,

না বীজ—সত্য—অনার্য্যার

এমন সুলভ নহে, বন-ভূজঙ্গনী

না দেয় মন্তক মণি তার

থাকিতে জীবন দেহে । হও অগ্রসর,

এই অসি হৃদয়ে তোমার

পশিবে আমূল, অসি পশিবে আমূল

এ গর্জিত হৃদয়ে আমার !

স্থির হও ! শুন তবে ! এই প্রহেলিকা

যথাকালে খুলিব এখন,

ডাকিয়াছি সেই হেতু ; শুধু তব তরে

এত দিন রেখেছি গোপন ।

শুন তবে ! এক দিন নৈশ অভিসারে

কৃতবন্দী দেখিল আমার,

করি-অশ্ব-অনুসার ধরিল পাপিষ্ঠ,

পরাজিয়া যুদ্ধে অবলায় ।

কহিল—‘আমায় বর ! দিব ভিক্ষা প্রাণ ;

নহে প্রাণ সতীত্ব সহিত

হরিব,—খাইব মধু, করি নিস্পীড়িত

এই পুষ্প স্তবায় পূরিত ।’

রক্ষিতে সতীত্ব,—প্রাণ তুচ্ছ অনায়াস,—

কহিলাম—“প্রণয়ী আমার

যহকুল অবতংস বীরেন্দ্র শৌনেয় ;

আমি নারী অস্পৃশ্য তোমার ।”

কিবা উপহাস হাসি হাসি দ্বরাচার,

পশু সম করি ব্যবহার,

‘সাত্যকি বীরেন্দ্র যদি’—কহিল হাসিয়া—

‘কাপুরুষ জগতে কে আর ?

মাগিলাম নিকৃপায় সময় তখন,

মহা সত্য করিয়া কঠোর ;

সেইকাল হবে পূর্ণ, পূর্ণ শশধর

গেলে অন্ত ; হবে স্বপ্ন ভোর ।”

পদাহত কণীমত সাত্যকি উঠিয়া

গরজিল নিকোষিয়া অশি—

“নহে আমি যুযুধান, কৃতবর্মা-শির

এ নিশিতে নাহি পড়ে ধসি ।

করিলাম এ প্রতিজ্ঞা । আজি কাপুরুষ

শতবার ডাকিব তাহার ;

সাত্যকি কি কৃতবর্মা রজনী প্রভাতে

রহিবে না প্রেমসি ! ধরায় ।

“বিহ্বাৎ ।” ডাকিল বীর, হ্রেষিয়া তুরঙ্গ
 বন হ’তে আসিল ছুটিয়া ;
 সাত্যকি উঠিল লক্ষ্মে, লুকা’ল বিহ্বাৎ
 জ্যোৎস্নায় বিহ্বাৎ খেলিয়া ।
 বন হ’তে সেনাপতি তক্ষক আসিয়া
 কহিল কারুর পদে পড়ি,—
 “উৎসবের সন্নিকটে সৈন্ত হুসজ্জিত,
 নাগ-মাতা চল দ্বরা করি !”
 কাপিয়া উঠিল ধরা, নাচিল সাগর,
 পুনঃ প্রকম্পনে ঘোরতর,
 আসিছে তরঙ্গমালা ভাসাইয়া বেলা,
 অশ্বে কারু ছুটিল সত্বর ।

সপ্তম সর্গ ।

—:~:-

লীলা শেষ ।

হাসিছে প্রভাস ; নিশি দ্বিতীয় প্রহর
 মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বশস্তের
 করি সমুজ্জল উজ্জ্বল আকাশ মণ্ডল,—
 চারু চন্দ্রাতপ নীল অমৃতে রঞ্জিত,
 নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত ।
 শিবির অনতি দূরে ধবল বেলায়—

যুথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্দ্রকরে,
বসি নর-নারায়ণ বেদি নীলোৎপলে,
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জল,
করি সমুজ্জল মহাকাল পারাবার ।
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের অন্তরে
যেন শত পূর্ণচন্দ্র হইয়া উদিত,
করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃসৃত
সুশীতল, সমুজ্জল, পতিতপাবন,
আলোকিয়া চন্দ্র করে আলোকিত বেলা ।
উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ, রাখি উজ্জ্বল শির,
আকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণা নিখর,
চাহি অনন্তের পানে প্রশান্ত বদন ।
অঙ্গে অঙ্গে রাজ-বেশ, মস্তকে উজ্জ্বল,
জলিতেছে চন্দ্রালোকে, পূর্ণচন্দ্র করে
জলিতেছে ততোধিক ললাটে, বদন ।

শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা প্রীতির,—
প্রেমাক্রান্তে ছল ছল নেত্র ইন্দীবর ;
নীলামৃতে ছল ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত স্থললিত দেহ ; বেণী অমল্লগ
বেষ্টিয়া মস্তক চারু, চূড়ায় সুন্দর
শোভিছে অসাবধানে ললাট উপর ;
শোভিছে গলায় ভক্ত-দত্ত পুষ্পমালা,
বহুমাল্য কণ্ঠে যেন দেবী প্রতিমার ;—
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ পদাঙ্কজে । অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে

দেবপদ কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
 বসিল শৈলজা ; যেন সন্ধ্যা নিরমলা
 বসিল সুনীল শান্ত নীলান্বর পদে ।
 “প্রাণনাথ ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস,—”
 কাতরে কহিল শৈল—“এই শৈলজার
 প্রেম বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল,
 লও শান্তি-সিদ্ধ পদে, পূরাও বাসনা !
 মধ্য-উৎসবেতে বজ্র নিনাদের মত
 গুনিল স্তম্ভিত যাত্রী,—‘সমাপ্ত উৎসব ।
 কৃষ্ণের আদেশ,—যাত্রী যাবে রজনীতে
 পঞ্চকোশ, আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন !
 থামিল উৎসব সিদ্ধ কল্লোল নিমিষে ।
 গীতা-গীত অর্ক তানে, বাণ অর্ক তালে,
 থামিল, মৃদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া ।
 নৃত্যশীল উচ্ছ্বাসে ভক্তবৃন্দ তব
 বজ্রাহত দাঁড়াইল প্রতিমূর্তি মত ।
 মুহূর্ত, উৎসব ক্ষেত্র, নিরুপ নীরব,
 দেখিলাম চক্ৰালোকে মহাচিত্র মত !
 ব্যাপিয়া প্রভাস তীর উঠিল ভাসিয়া,
 সেই নীরবতা বক্ষে, সমুদ্র গর্জনে
 মুহূর্ত ; মুহূর্ত পরে যাত্রী হাহাকা র
 উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি-কল্লোল ।
 সৈকত ধূলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া
 কহিল কাঁদিয়া—‘হরি ! হুটি দিন আর
 ছিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাবন
 জুড়াইব প্রাণ, কেন হইলে নিদ্রা ?’

কহিল কাঁদিয়া —‘মা গো ! তোরা হুইজন
 এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
 ল’য়ে চল বৃন্দাবনে, দেখা গোপালের
 সে কিশোর লীলাভূমি পতিতপাবনী ।
 অবগাহি যমুনার স্নানীতল নীবে,
 আলিজিয়া স্নানীতল কদম্ব তমাল,
 কুম্ভ-পদে পবিত্রিত শ্রাম দর্শাদলে
 —ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত স্নানীতল—
 রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেম পিপাসা
 জুড়াইব, প্রাণ মা গো ! বড়ই আকুল ।’
 চলিল না পদ মম, স্রজ্জা আপনি
 চলিলেন, ভক্তগণ বেষ্টিয়া তাঁহার
 সরল শিশুর মত নাচিয়া নাচিয়া,
 গাইয়া গাইয়া নাম-গীত স্রমধুর,
 হুই নেত্রে প্রেম-ধারা, গিয়াছে চলিয়া
 বড়ই আকুল প্রাণ তব শৈলজার ।
 আসিল ছুটিয়া রাখি চরণ যুগল
 জুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা তার ।
 উৎসবাস্তে উৎসবের আলয়ের মত
 করিতেছি হাহাকাহ এই পুণ্যভূমি,
 এই নব কুরুক্ষেত্র, নব বৃন্দাবন ।
 প্রাণনাথ ! দীনবন্ধো ! তুমি দয়াময় !
 করুণার সিদ্ধ তুমি ! কেন এইরূপে
 ভাবিলে উৎসব নাথ । দিলে ব্যথা প্রাণে
 ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে ?’
 রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে,

নারায়ণ রেহ-কণ্ঠে কহিলা—“বুঝিবে ।”
 সেই সুপ্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত শীতল,
 আকর্ষণ বিস্তৃত নেত্র, চাহিয়া চাহিয়া
 কহিতে লাগিল শৈল—“পতিতপাবন !
 সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
 ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে !
 আৰ্য্য ও অনার্য্য, নাথ ! হুই মহাশ্রোত
 এ প্রেম-প্রবাহে আজি হুইয়া পতিত,
 সলিলে সলিল ঘেন হুইয়া বিলীন,,
 ছুটিল কি.সিদ্ধ-মুখে শাস্তি পারাবার !
 আজি এ ভারত নাথ ! বৈকুণ্ঠ তোমার,
 তুমি নর-নারায়ণ, পূর্ণ সনাতন ।
 আজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ !
 এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল
 রহিল পতিত নাথ ! তাহাদের প্রতি
 হুইলে নিদয় কেন ? কেন নিবারিলে
 ৩এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
 শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত বনে ?
 শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
 রহিল পতিত নাথ ! রহিল পতিত
 শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি ;
 জরৎকার, মাতা-কন্তা-ভগ্নী শৈলজার ।
 বনের সুস্বাদু ফল, বন নারিকেল,
 বনবাসী ভ্রতা মম ; মৃত আবরণ,—
 হৃদয় মধুর শস্ত্রে মধুও সলিল ।
 ভগ্নী নিদাঘের নদী অন্তরসলিলা ;

রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে
বহিতেছে প্রেম-ধারা নির্মল। নীতলা ।
আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল,
অলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে
মহা বাড়বাগ্নি সম !—দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয় ?

আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিলা হার
সন্নেহে—“বুঝিবে শৈল !”

চারু নেত্রে চারি
চাহি পরস্পরে স্থির পূর্ণচন্দ্রালোকে,—
প্রভাত শিশির সিক্ত চারি ইন্দীবর
চাহি পরস্পরে শান্ত, স্থির, অবিচল ।
দেখিল শৈলজা যেন কি প্রেম-উচ্ছ্বাস
উঠিল ভাসিয়া দেব-নেত্রে ছল ছল ।
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ—
“বাস্তুকি ও ভরৎকাক !”—শৈলজা প্রথম
শুনিল যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের
এত দিনে, এতদূরে ! কি কণ্ঠ মধুর !
কিবা প্রেম-বিগলিত ! কহিল প্রেমিক
চির প্রেমিকের, যেন চির প্রেমিকার,
চির মধুময় নাম, চির প্রেমময় ।
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল
প্রেমময়ী, শুনে নাট এমন মধুর !
মূহূর্ত্ত নীরব বহি কহিলেন পুনঃ—
“বাস্তুকি ও ভরৎকাক !—ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল ! এই ধরাতলে ।”

ভগবন্ ! তব মুখে বড়ই মধুর

ভক্ত নাম !—ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি !

“প্রাণনাথ ! লীলাময় ! এ কি লীলা তব !”—

কাদিয়া পড়িল শৈল লুটা’য়ে চরণ ।

“প্রাণনাথ ! লীলাময় ! এ কি লীলা তব !

বাসুকি ও জরৎকার ভক্ত তব যদি

কেন তাহাদের এই অশান্তি অনলে

পোড়াইলে হয় নাথ ! একটি জীবন ?

চল নাথ ! চল ঘাই পতিত পাতালে ।

নাগপুর হবে তব নব ব্রজপুর ;

বাসুকি শ্রীদাম সখা ; শৈল জরৎকার,

—হায় ! নাথ ! জরৎকার মহা মরুভূমি,

চির প্রেম-পিপাসিনী চির উন্মাদিনী !—

হইবে ব্রজের গোপী ; বহিবে যমুনা

সিক্কুনদে সিক্কুমুখে, গাইয়া গাইয়া

পতিতপাবন নাম ; সাগর-সঙ্গমে

হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত অসীম ।

হইল উদ্ধার নাথ ! অহল্যার মত

পতিতা অনার্যা-ভূমি ; হইল উদ্ধার

উষর অনার্যা-ভূমি ; হইল শোভিত

মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম সরোবরে,

তব কৃপা-জারুবীর প্রবাহে শীতল ;

কেবল কি নাগভূমি হবে মরুময় ?

কেবল কি নাগপতি, কারু কি কেবল,

সদয়ে বহিবে মরু ? নিবিবে না হায় !

কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা !”

“নিবিবে—নিবিবে—শৈল !”—ধীরে নারায়ণ
কহিলেন স্থিরকণ্ঠে গান্ধীৰ্য্য-পূৰিত—

“পূৰ্ণকাল ;—পূৰ্ণ ব্রত ;—পূৰ্ণ মনোরথ ।”

সে মুহূৰ্ত্তে অকস্মাৎ ঘাদব শিবিরে
উৎসব-নিনাদ বক্ষে উঠিল ভাসিমা
ঘোর হাহাকাৰ ধ্বনি ; উঠিল কাঁপিয়া
শৈলজ্বাৰ বক্ষ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ !
সে ভীষণ হাহাকাৰ হইতেছে ক্রমে
অধিক অধিকতর, ধীরে দূৰাঘাত
মহা ঝটিকাৰ মত । হইল অধীর
শৈলজ্বাৰ আগ ;—শান্ত স্থির নারায়ণ !

“ঘহনাথ !—অগম্যনাথ !—বিপদভঞ্জন !

কর দক্ষা যহকুল !”—উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে আসি

দাক্ষক চরণতলে হইয়া পতিত

কহিল কাতর কণ্ঠে,—“উন্নত সুরায়

সাত্যকি ও কৃতবৰ্ম্মা নিন্দি পরস্পরে,

সাত্যকির বজ্রাঘাতে হইয়াছে হত

কৃতবৰ্ম্মা ; অলিয়াছে হায় ! ঘোরতর

অস্তর বিগ্রহানল । উন্নত সুরায়

যহকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়া

আঘাতিয়া পরস্পরে,—বক্ষ যহকুল !”

অকস্মাৎ ভূমণ্ডল উঠিল কাঁপিয়া ;

হুলিল কণায় স্থিত ক্ষুদ্র মণিমত

ভূজদেব । মুহূৰ্ত্তেক উঠিল ভাসিমা

বিহব্ধের কলরব, ভীত, নিদ্রে খিত ;

দুৰ্ভস্থিত ঘাদবের মহা হাহাকাৰ

হইল ভীষণতর; মুহূর্ত্তেক পরে
 হ'ল নিমজ্জিত মহাজলধি গর্জনে ।
 করিয়া ভীষণতর সে ভীম নির্যোষ
 উঠিল ঘর্ষরথনি গর্ভে বসুধার !
 সংখ্যাতীত রথে যেন মত্ত দৈত্যগণ
 মহাহবে ;--হইতেছে ভীম বেগে যেন
 রথে রথে অস্ত্রে অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ !
 বিদীর্ণ করিয়া ধরা, রৈবতক গিরি,
 হুর্দ্বাস-আশ্রয়-শূন্য, শত বজ্রনানে
 হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্নিরাশি !
 কিবা দর্পে, কিবা বেগে ছাইল গগন !
 নভঃস্থল, ভূমণ্ডল, উঠিল জলিয়া
 নীল রক্ত গৈশ্বানরে ;--কি ক্রীড়া ভীষণ,
 আক্ষালন অনলের, বোর বিলোড়ন !
 ঘন ঘন ভূকম্পন, ঘর্ষর গর্জন !
 নিবিল সে বহ্নিরাশি । ধূম বিভীষণ
 নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন,
 আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত
 অমাবস্তা-অন্ধকারে বিশ্ব চরাচর ।
 ভস্ম বৃষ্টি, ধূ তু বৃষ্টি, বৃষ্টি নাগরের
 হইতেছে, মুহুমূহ মংস্ত্র নানাবিধ,—
 যেন মহা তিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক
 প্রসারি ভীষণ মুখ করিতেছে বেগে
 উৎক্ষেপিত বহ্নিরাশি । গিরি-অঙ্গ বাহি
 পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা মত
 মহাশ্মোতে স্থানে স্থানে ; পড়িতেছে বেগে

প্রজ্জলিত ধাতু পিণ্ড, উদ্ধারশি মত,
 অস্ত্র-ভেদ্য অক্কায়ে, ভস্ম-বরিষণে ।
 বাদব শিবির-শ্রেণী মহা অক্কায়ে
 উঠিল জলিয়া মহা দাবানল মত
 অক্কায়ে ;—ছুটিলেন বেগে নারায়ণ,
 দারুক শৈলজা সহ, ঘোর ভূকম্পনে
 সাবধান দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে,
 অর্ধ মূর্ছাগত, ভূজ-বন্ধনে হেলায়
 অতিক্রমি সে ভীষণ বৃষ্টি, অক্কায়ে ।
 দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল মত
 পতঙ্গ পালের মত মরিছে পুড়িয়া
 যতকুল, অবাতিয়া হায় ! পরম্পরে,
 দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আহত ।
 দেখিলেন যতকুল উন্নত সুরায়,
 নাহি জ্ঞান আত্ম-দ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব,
 গুপ্ত শত্রু-আক্রমণ ॥ কি দৃশ্য ভীষণ !—
 জলিছে শিবির শ্রেণী ব্যাপিয়া যে জন !
 বাদবের অস্ত্র-ক্রীড়া, অসি-বিঘূর্ন,
 রক্তত বিহ্যতনিভ—ঝগসি নয়ন !
 সেই ঘাত, প্রতিঘাত ! সেই রক্তপাত !
 ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র মত !
 ক্রিপ্ত ভূজদেব মত অস্ত্র বরিষণ
 গুপ্ত-শত্রু-করোৎসৃষ্ট । ঘোর অক্কায়ে !
 ঘন ঘন ভূকম্পন ! ঘোর গরজন,
 উল্ফন, জলধির ! ভীষণ নির্ঘোষ
 বহুধার মহাগর্ভে ! শূন্যে পর্বতের

ভীমারাবে ভস্ম, ধাতু, অগ্নি বরিষণ ।
 ষাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ঘোষে
 নিমজ্জিত ; ষাদবের ভীষণ সে রণ
 কাষ্ঠ পুতুলের ক্রীড়া-অভিনয় মত
 হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে ।
 আছিল উৎসবে, নাহি অস্ত্র সকলের,
 তীরজাত এরকায়, মুষলে মুষলে,
 প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত
 নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায় ।
 স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিল চাহিয়া
 সে ভীষণ মহাদৃশ্য ! ক্রমে ক্রমে হত
 হইল ষাদবকুল, স্নেহের আধার
 পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু । বধী মহাবধী
 ভারতের অদ্বিতীয় হইল নিহত
 তক্ষকের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার,—
 রৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙ্গিয়া
 একে একে যথা এই মহা ভূকম্পনে ।
 নিবে যথা প্রলয়ান্নি ভীম পরাক্রমে
 নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
 আত্মঘাতী যজ্ঞকুল । ধীরে ধীরে মহা
 অশান-অমল মত শিবির-অনল
 নিবিল ; নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ ।
 নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক প্রবাহ,
 ভস্ম বৃষ্টি, ধাতু বৃষ্টি, মহা ভূকম্পন,
 মহাকম্প জলধির । মাতা বহুব্রা
 নাচিয়া তাণ্ডব নৃত্যে, হাসিয়া ভীষণ

অনল গৈরিক স্রাবে মহা অট্ট হাসি,
গর্জিয়া ভীষণ মন্ড্রে, নৃমুণ্ডমালিনী
মহাকালী, যহকুল-শোণিতে ভূষিতা,
হইলেন শাস্ত ধীর । ধীরে ভয়ঙ্করী
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত ।
বীভৎস স্বপন অস্তে প্রকৃতি যেমতি
খুলিলেন ভীত আখি, প্রথম আলোকে
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাসিয়া
চিন্তাতীত প্রকৃতির চিত্র ভয়ঙ্কর !

চারদিকে ভঙ্গ ভরে রয়েছে পড়িয়া
কত জলজীব-শব, ধাতুপিণ্ড কত,
মহা শৈল ধও সহ নানা অবয়বে ।
ভীমাকৃতি শৈল-শৃঙ্গ অমিত বিক্রমে
উৎপাটিত, উৎক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত
গুহ পত্র রাশি মত ক্রোশ ক্রোশান্তরে,
স্থানে স্থানে জলে স্থগে রয়েছে প্রোথিত
ক্ষুদ্র ধও-গিরিমত্ গর্ভে বহুধার ।

সুদূরস্থ বৈবতক পর্বতমালায়
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অচিন্ত্য ক্রৌড়া
করিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে । মৃৎপিণ্ডে যথা
অর্থহীন লক্ষ্যহীন ক্রৌড়া বালকের ।
কোথায় গগনস্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা
হইয়াছে অন্তর্হিত মহামেঘ মত ;
কোথায় বা নব শৃঙ্গ উঠিয়া আকাশে
শোভিছে দিগন্তব্যাপী মহামেঘ মত
প্রসারিয়া শৈল বগ্ন ; গৈরিকের ধারা,

কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মত,
 শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কোথায় গহ্বর
 হইয়াছে গিরি ; গিরি হয়েছে গহ্বর ।
 সম্মুখে যে দৃশ্য—হায় ! মানব-নয়ন
 না পারে দেখিতে ; দৃশ্য না পারে সহিতে
 মানব-হৃদয় হায় ! ছিল যেই খানে
 ক্রোশব্যাপী যাদবের উৎসব শিবির,
 রহিয়াছে ক্রোশব্যাপী যাদব-শ্মশান ।
 বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
 প্রধূমিত স্থানে স্থানে,— রয়েছে পড়িয়া
 বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অজ্ঞাহত ।
 কেশবের পুত্র, পৌত্র, রক্ত, মাংস, প্রাণ,
 ধাতু শৈলখণ্ড সহ, কোথায় বা পড়ি
 ধাতু শৈলখণ্ডতলে, অনন্ত শয়নে ।
 প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে
 যাদবের, প্রভাসের মহা পারাবার
 এবে হায় ! যাদবের শোক-পারাবার !
 “এই কি করিলে হরি !”—কাঁদিয়া দারুক
 কহিল চরণে পড়ি । শাস্ত কণ্ঠে হরি
 উত্তরিল, শাস্ত নেত্রে চাহি অবিচল
 প্রভাত আকাশ, স্থির—“দারুক ! দারুক !—
 যাদবের কুরুক্ষেত্র ! হয়েছে সাধিত
 সাধুদের পরিভ্রাণ, হৃদয় বিনাশ ;
 ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত ।
 যুগ শেষ !—লীলা শেষ”—

উত্তিল কাঁপিয়া

ধরাতল। “লীলা শেব”—উঠিল গর্জিয়া
 মহাসিদ্ধ। “লীলা শেব”—হইল অঙ্কিত
 সুনীল আকাশপটে অরুণ আভাষ
 সুনীতল সমুজ্জল। লভিয়া উদ্ধার
 “লীলা শেব” মহাকণ্ঠে গাইল মানব।
 “লীলা শেব”—হৃৎকৃৎতের ভীষণ শ্মশান
 মহাকণ্ঠে কুরুক্ষেত্র গাইল প্রভাস।
 “লীলা শেব”—পাদপদ্মে হইয়া মুচ্ছিত
 পড়িল দারুক-শোকে। “লীলা শেব”—শৈল
 পড়িতে মুচ্ছিতা প্রদে লইলেন হরি
 আপন ত্রিদিব বক্ষে,—পূর্ণ গৈলজার
 তপস্যা, জীবনব্রত কোমল কঠোর।

অষ্টম সর্গ।

—*—

মহাপ্রস্থান।

ভারতের মহাদিবা, মহাদিবা জগতের
 হইল প্রভাত ধীরে; হইল প্রহর;
 দ্বিতীয় প্রহর ধীরে; নাহি দিবাকর।—
 ধূম্র ভঙ্গ্য আবরণে আবরিত নভঃস্থল,
 অদৃশ্য মধ্যাহ্ন-রবি, অদৃশ্য অম্বর।
 ধূম্র ভঙ্গ্য আবরণে আবরিত পারাবার
 গর্জিতেছে প্রভাসের ঘোরাল ধুম্রল;

আবরিত বেলা-ভূমি ধুম্র তম্র আবরণে,
 আবরিত চরাচর—নিস্তরু নিশ্চল ।
 শিলাখণ্ডে, ধাতুখণ্ডে,—ভৃগুভ্রজ, সমুদ্রজ,—
 নানা জীবে, দ্রব্যে নানা, সমাচ্ছন্ন তীর
 ভ্রমাবৃত, সমাচ্ছন্ন প্রান্ত জলধির ।
 রহিয়া রহিয়া ধরা কাঁপিতেছে মৃদু, গুরু,
 প্রকম্পন অবিরল, অথবা বিরল ;
 যেন ক্রীড়াশীল শিশু দোলাইছে ক্রীড়া-দোলা,
 কল্প ঘন, বহুক্ষণ কখন নিশ্চল ।
 মহাশক্তি ধ্রুবতী গরজি জলধি-মজ্রে,
 রহিয়া রহিয়া নৃত্য করিতেছে ভীমা,
 ধ্বংস করি দিবাকর, ধ্বংস করি চরাচর,
 ক্ষুদ্র বেলাখণ্ডে যেন করিয়াছে সীমা ।
 কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
 ঘটিবে যুগান্তকারী বক্ষে বসুধার ।
 মানবের ইতিহাসে, মানবের মহাকাব্যে,
 এক মহাসর্গে হবে সমাপ্তি প্রচার ।
 কি যেন ঘটনা ঘোর, কি যেন গভীর শোক,
 আসন্ন, চাপিয়া বক্ষে নারী ধ্রুবতী
 পড়ে আছে দীর্ঘাকার, একটি উপলখণ্ডে,
 পাষণে পড়িয়া যেন পাষণ-মূর্তি ।
 তার ক্ষুদ্র ইতিহাসে, জীবনের ক্ষুদ্র কাব্যে,
 আসন্ন, সমাপ্তি ; আজি হৃদয় তাহার
 ধূলিল ঘোরাল ওই মহাপারাবার ।
 কি তরঙ্গ, কি উচ্ছ্বাস ! হাহাকার, কি নিশ্বাস ।
 কি মহন, বিলোড়ন ! ফাটিতেছে বুক ।

শিলায় চাপিয়া বুক বামা অধোমুখ ।
 হুই ধারা নয়নের হইয়া শতেক ধারা
 পড়িছে পাষণ বাহি ভস্ম বালুকায়,
 নীরব রমণীপ্রাণ কঁদে উভয়ায় ।
 সে নীরব হাহাকারে, হৃদয়ের আর্দ্র তপে
 পড়িছে গলিয়া যেন কঠিন পাষণ,—
 কি শীতল শিলা, কিবা করুণানিদান ।
 আলিঙ্গিয়া শিখাখণ্ড রমণী চাপিছে বুক
 কোমল বপোল বামা, দাক্ষণ ব্যাথায়
 আবরিয়া শিলাখণ্ড শত গুচ্ছে “কেশরাশি
 পড়ি ভিজিতেছে, সেই ভস্ম বালুকায়
 নাগ-সেনাপতি বেশে এখনো সজ্জিতা বামা,
 পৃষ্ঠে তুণ, বটিবন্ধ, কটিবন্ধে অসি ;
 “কারু !—কে ডাকিল মূঢ়, ধীরে শিষ্ট-পার্শ্বে আসি,
 কারুর উত্তপ্ত প্রাণে অমৃত বরষি ?
 “দাদা ! দাদা !”—বলি কারু, উঠি উন্মাদিনী মত
 পড়িল গলায় স্নেহ-বন্ধে বাহুকির ।
 উচ্ছ্বসে ছুটিল বেগে চারি নেত্রে নীর ।
 “দাদা ! দাদা ! কহ দাদা ! বড়ই আকুল প্রাণ,
 পেয়েছ কি তুমি দাদা ! তাঁর দরশন ?
 খুজিয়াছি সারাদিন, খুজিয়াছি বেলা-ভূমি ;
 উন্মাদিনী নিশা অস্ত্রে দিবা উন্মাদিনী !—
 খুজিয়াছি জল স্থলে উন্মাদিনী আমি ।
 বাইতে ছুটিয়া বেগে পড়িয়াছি ভস্মস্তরে,
 পড়িয়াছি শিলাখণ্ডে হায় ! কত বার,
 কত দেহ, পাই নাই দরশন তাঁর ।

পেয়েছ কি তুমি দাদা ?”

“পেয়েছি ।”—নিখাস ছাড়ি

বাসুকি ভগিনী সহ বসিল শিলায় ।

“পেয়েছ ! কোথায় তিনি ? কেমন আছেন কহ ?

আছেন ত নিরাপদে ?”—

“বিপদ তাঁহায়

পারে কি ছুইতে ?—”ঘোর মহা সিন্ধু পানে,

হুজনে রহিল চাহি উচ্ছ্বসিত প্রাণে ।

বাসুকি । পেয়েছি দর্শন কারুণ্য—বহু অব্বেষণ পরে

রজতের মহামূর্তি দূর সিন্ধুতীরে

দেখিলু উপলাসনে, উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ,

কি মহিমা মহাবক্ষে, সমুন্নত শিরে !

অঙ্গ অবিচল, স্থির, নিম্নলিত জনমন,

কিবা স্তম্ভ সিংহ-শোভা, নির্দ্রিত গৌরব ।

শৌর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের মুরতি নীরব !

ধবল গিরির শৃঙ্গে মহামেষ-ছায়া মত

পড়িয়াছে শোব ছায়া বদনে গভীর,

কপোল গভীরাক্তিত শুষ্ক অশ্রুনার ।

শৈলখণ্ড-অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতেছি

এই দিবা-অন্ধকারে সে রূপ মহান,

হুইলেন নার যুগ ধীরে অধিষ্ঠান ।

হিমাক্রি় পাদমূলে বিলোড়িত ঝটিকায়,—

সানুদেশে চিরশাস্তি অবিচল স্থির ;

ভীষণ বিপ্লবে ঘোর নির্মূলিত যজ্ঞকুল,—

যজ্ঞনাথ শাস্ত, স্থির, মুরতি গভীর,

মহাশোক নৈবে নাহি বিন্দু অশ্রুনার ।

‘আর্য্য !—দেব !’—নারায়ণ ডাকিলেন স্থিরকণ্ঠে,
 কি যেন সঙ্গীত আঁহা ! শুনিলাম কাণে ;
 সেই নিশা ভয়ঙ্করী, এই ভয়ঙ্কর দিবা,—
 কি শান্তি-আলোক-স্থধা প্রবেশিল প্রাণে !

নব মেলি নেত্র, কহিলেন—‘হায় ! হরি !
 এই কি করিলে ভাই ! জগতে অতুল
 হরিকুল, হরিকুল, করিলে নির্মূল !’

স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ, উত্তরিল—‘হরিকুল
 হয়নি নির্মূল, নাহি হইবে কখন,
 যুগে যুগে হবে তার নিয়তি নূতন ।
 নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, যুগে যুগে আবির্ভূত
 হবে তুমি, হব আমি, হইবে এমন
 নব কুরুক্ষেত্র, নব প্রভাস ভীষণ !’

এরূপে দৃষ্ট ধ্বংস যুগে যুগে অন্ধ অন্ধ
 হবে বন্থধার ; হবে স্রুত উদ্ধার,
 নব যমুনার কূলে, নব ধর্ম্ম-বৃক্ষ-মূলে,
 নব বৃন্দাবনে, শুনি নব গীত আর ।’

কহিলা রোহিণী হৃদ—‘হরি ! এই লীলা তব
 না পারি বুঝিতে ; প্রাণ আকুল আমার ।

পূত্র-শোকে, পৌত্র-শোকে, ভ্রাতৃ-শোকে, বন্ধু-শোকে,
 বিদীর্ণ হৃদয় ময় ; করিলে সংহার
 যত্নকুল, এক জন নাহি বুঝি আর ।

কিবা দিবা,—কি উৎসব ! কিবা নিশি, কি বিপ্লব !

যাদবের, বন্থধার, হায় কি ভীষণ
 অন্তর-বিগ্রহ ! ঘোর আত্ম-বিনাশন !

কি আনন্দে নিরানন্দ ! কি সুখে কি মহাশোক !

কি মঙ্গলে অমঙ্গল, অমৃতে গরল !
 হইল কি রজ্জ্বালয় কি শ্মশানে পরিণত !
 জ্বলিল নিকুঞ্জবনে কিবা দাবানল !
 পুত্র গেল, পৌত্র গেল, ভ্রাতা গেল, বন্ধু গেল,
 গেল হরিকুল, হরি ! একি লীলা হয় !
 ফুল গেল, ফল গেল, পত্র গেল, শাখা গেল,
 ক্ষত দগ্ধ বৃক্ষ কেন রাখিলে আমায় ?
 'রাখিয়াছি'— উত্তরিলো স্থিরকণ্ঠে নারায়ণ—
 'রাখিয়াছি,—তব লীলা হয় নাই শেষ
 ভাবতে তোমার মাত্র লীলার উদ্দেশ্য ।
 এ বৈরাগ্য, এই বল, এ সারল্য, এ গরল,
 এ প্রেম-সাগর, এই বাড়ব আধার,
 হৃদ্যবনে, মধুরায়, কুরুক্ষেত্রে, দ্বারকায,
 করিয়াছে ক্ষুদ্র জীড়া ; মহাজীড়া তার
 নব ক্ষেত্রে, নব ভাবে, হইবে প্রচার ।
 ভারত জগত নহে । নহে এই পারাবার
 এই জগতের সীমা । অগ্র পারে তার
 আছে মহারাজ্য চয় অনন্ত বিস্তার ।
 আছে বহু পারাবার, আছে বহু হিমাচল,
 আছে বহু নদনদী কানন কান্ধার ;
 আছে বহু নর জাতি, নানা বর্ণ, নানা বেশ,
 সৃষ্টিমেয় এই নর তুলনায় তার !
 সৃষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
 মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী ।
 পৃথিবীর মহাদেহ, মহাদেহ মানবের,
 একপে বেধেছে ঢাকি ধূম্র ভস্মরাশি ।

জ্ঞানের আলোক নাই ; শিল্পের সৌন্দর্য্য নাই ;

নাহি বাণিজ্যের স্বথ ; ধর্ম্মের সাঙ্ঘনা :

পৃথিবীর দেহ বন, মানবের দেহ জড়,—

অহল্যা পাষণ নহে কবির কল্পনা ।

ভারত ভূতলে স্বর্গ, দেবতা ভারতবাসী

তুলনায়, পৃথিবীর ভারত-হৃদয়,

মানবের মহাশির, জ্ঞানের আলয় ।

যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম্ম এই শিরে,

হইল স্থাপিত, স্মৃথে করিয়া গ্রহণ

সে শক্তি-বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্ম্মালোক

যাও দেশ দেশান্তরে, পতিতপাবন !

সৌরাষ্ট্রের উপকূলে সজ্জিত অর্ণবযান

আছে বহু দাঁড়াইয়া তব প্রতীক্ষায় ;

যাদবের পুণ্যভাগ, আছে সসজ্জিত তীরে,

কর দেব । মহাযাত্রা, উদ্ধার ধরায় !

এ ভারতে আমাদের এই যুগ-কার্য্যো শেষ ;

সপ্ত দিবা নিশ পরে হবে অস্তহিত

দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে জল-বিশ্ব মত ।

কর দেব । মহাযাত্রা ! পাবানী অহল্যা মত,

তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার

পৃথিবী, মানব জাতি ; মরু হবে জনপদ ;

হবে বন মহারাজ্য সম অমরায় ।

পুত্র সম নর নারী হবে দেবী দেবোপম,

যাবে শোক, পাবে পুত্র কন্যা সংখ্যাতিত ;

জগতের ইতিহাসে, পুশ পাঞ্জে জগতের ;

হবে-হরিকুল, হরিকুলেশ পূজিত ।

যাও দেব ! সিন্ধুগর্ভে নৃত্যশীল তরীমালা

অনন্ত কেতন করে ডাকিছে তোমায় ;

করিতেছে আবাহন নৃত্যশীল পারাবার

পূরবে, পশ্চিমে, নর উদ্ধার আশায়

কর দেব ! মহাযাত্রা ! উদ্ধার ধরায় !'

নারায়ণ নয়নেতে বহিতেছে দুই ধারা,

প্রেম-বিগলিত ধারা বক্ষে করুণার,

আত্মহারা বলরাম পড়িলা গলায়, বক্ষে,

আলিঙ্গিলা নীলাম্বর আলোক দিবার ।

'দীনবন্ধো ! দয়াময় ! পতিতপাবন !'—

হলধর উচ্চ রবে কহিলা কাঁদিয়া—

"চলিলাম নারায়ণ । বরষিয়া তব প্রেম

মানব মরুতে, নাম গাইয়া গাইয়া

মানবের মহাবনে, অধর্মের অন্ধকারে,

পতিত মানব জাতি করিব উদ্ধার,

কৃষ্ণনাম । হরিনাম করিব প্রচার ।

ওই—'হরে কৃষ্ণ ! হরে !'—গাইতেছে পারাবার,

'হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ !'—গায় তীরে তীরে

অনন্ত অজ্ঞাত দেশ অনন্ত অজ্ঞাত নর,

অনন্ত অজ্ঞাত-কণ্ঠে ভাসি অশ্রুনিরে ।

গাইতেছে ভবিষ্যত—'হরে । কৃষ্ণ ! হরে । কৃষ্ণ !

গাইতেছে মহাকাল—'হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !'

গাইতেছে মহাবিশ্ব, মহাগ্রহ উপগ্রহ,

অনন্ত প্রাণিষা প্রেমে—'কৃষ্ণ । কৃষ্ণ ! হরে !'

"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হরে ! হরে !—গর্জিয়া নাচিয়া রাম

চলিলেন প্রেমানন্দে ছাড়ি বনমালা,

হুই বাহ উর্কে তুলি দিয়া করতালি !
 আমাদের অবেষণে, ভ্রমিতেছে নাগ-সৈন্ত
 “জয় নাগরাজ !”—বলি করি উত্তোলন
 শত অসি ; আক্রমিল শুনিয়া গর্জন ।
 “তিষ্ঠ !”—বলি নারায়ণ প্রসারি দক্ষিণ কর
 রহিলেন স্থিরনেত্রে চাহি সৈন্ত পানে,
 চিত্রাক্ষিত মহামূর্তি যেন মহাধ্যানে ।
 কারু । বনচিত্র যত দাঁড়াইল নাগ সৈন্ত,
 উত্তোলিত শত অসি হইল অচল ।
 কহিলেন নারায়ণ—“বাসুকির কার্য্য শেষ ।
 বৎসগণ ! তোমাদের নব কার্য্যস্থল
 সিদ্ধুর অপর পারে স্থলর শীতল ।
 শ্বেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,
 কেতন সহস্র ফণা সহ স্তদর্শন
 উড়াইয়া, সিদ্ধুমুখে কর তার অনুসার,
 গাই আর্থ্য অনার্থ্যের গীত সন্মিলন ”
 দেখিলাম নাগ সৈন্ত সজ্জিত প্রাচীর মত,
 নারায়ণ-পাদপদ্মে পড়িল ভাবিয়া ।
 উঠিয়া, জলধি মস্ত্রে গাই—“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”
 অনুসরি হলায়ুধ চলিল ছুটিয়া ।
 কি মূর্তি মহিমাময় চাহি আকাশের পানে
 কপোলে যুগল ধারা, করুণা শীতল !
 মূর্তি নর-নারায়ণ ! চাহিল পড়িতে পদে
 ছুটিয়া, চরণ হায় । হইল অচল ।
 হায় মহাপাপী আমি ! ঘুরিল মস্তক মম
 কি মাদকে দেহ মম হইল পূরিত,

পড়িলাম ধরাতলে হইয়া মূর্ছিত ।
 উচ্ছ্বসিত নাগপতি ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে
 অশ্রুমনে অধোমুখে মূরতি গম্ভীর ।
 চাহি সিদ্ধ পানে কারু হুই নেত্র স্থির ।
 বাহুকি । মূর্ছা অস্তে হায় ! আর সেই মূর্তি মহিমার
 নাহি দেখিলাম, হায় ! দেখিব কি আর ?
 দেখিবে কি পুণ্যালোক পাপ অন্ধকার ?
 দেখিব কি ?—দেখিতেছি । দেখিতেছি নিরন্তর
 এই ঘোর অন্ধকারে স্নিগ্ধ নীলোজ্জল
 সেই রূপ মনোহর, চন্দ্রদীপ্ত নীলাশ্বর,
 সেই প্রেমময় রূপ পবিত্র শীতল ।
 ভীত বীর ধনঞ্জয় গুনিয়াছি এই রূপে
 দেখেছিল মহাবিশ্ব ; করুণা-নিলয়
 আমি দেখিতেছি রূপ আজি বিশ্বময় !
 ওই দেখ সেই রূপ ! চল কারু ! চল যাই,
 পড়ি গিয়া হই জন চরণে তাঁহার !
 যাইছে বাহুকি ছুটি, কহিল ধরিয়া কারু
 স্থিরকণ্ঠে—“দাদা ! ভ্রাস্তি কর পরিহার !
 আমাদের আজীবন-আশা আজি পরিপূর্ণ !
 যেই আশা-বন্ধ-মূলে সেচিলাম জল
 আজীবন, ফলিয়াছে আজি তার ফল ।
 কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল, বহুকুল প্রভাসেতে,
 করিয়াছে আশ্রয়তা । হইল উদ্ধার
 এত দিনে নাগরাজ্য, সাম্রাজ্য তোমার ।
 পূর্ণ জীবনের ব্রত ! পরিপূর্ণ মনোরথ ।
 চল যাই নাগপুরে, বসাব তোমায়

সিংহাসনে, গরাইব মুকুট মাথায় ।

জীবনের আশা-স্বপ্ন করি চরিতার্থ স্থখে,

ভরিতে অনার্য্য রাজ্য করিব প্রচার ।

পাবে কারু এত দিনে সীমা আকাঙ্ক্ষার ।”

“কালি এ প্রভাস-ক্ষেত্রে অনার্য্যের ঘেই রাজ্য
হয়েছে স্থাপিত”—কহে বাহুকি বিহ্বল—

“তার কাছে তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধরাতল ।

আমরা বনের পশু, কোথা পাব হেন রাজ্য ?

কোথা পাব সেই জ্ঞান, সে প্রেম অতুল ?

কারু রে ! এখন তোরা গেল না কি ভুল ?

রাহুল চরণদ্বয়, যে রাজ্য মহিমাঘর,

চল যাই সেই রাজ্য করি অধিকার !

এমন সন্তাপ-হর রাজ্য এই ধরাতলে

আমরা পণ্ডিত নাহি পাইব রে আর !”

কাদিতেছে নাগরাজ ! অন্তর-রোদন কারু

নিবারি পাষাণী মত কহিল আবার—

“ভুলিলে কি দাদা ! কৃষ্ণ শত্রু যে তোমার ।”

বাহুকি । শত্রু কৃষ্ণ !—না না, কারু ! হায় ! এ জীবনে আমি

ভাবি নাহি শত্রু কৃষ্ণ,—ভাবিব কেমনে ?

পিতার রক্ষিত, শিশু, আমার কৈশোর বন্ধু,

ওগে, বনে, মিশিয়াছি জীবনে জীবনে !

দেখিয়াছি আকৈশোর তাহার সে দেব-রূপ—

পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ শিরে ।

শুনিয়াছি দেবকণ্ঠ, নর-করুণার গীত,

বনেও পাষণ আমি ভাসি অশ্রুনায়ে ।

করিয়াছি আলিঙ্গন দেব-দেহ লীলাময়,—

কি অমৃতে প্রাণ মম হইত শীতল ;
 বৃন্দাবনে, নাগপুরে, যমুনায, সিন্ধুবক্ষে,
 করিয়াছি কত ক্রীড়া আনন্দে বিহ্বল !
 রাখি মুখ অঙ্কে মম ঘুমাইত শিশু মত,
 আমি জননীর মত দেখিতাম মুখ,
 কভু গলা জড়াইয়া অংগে মম রাখি মুখ,
 সখ্য প্রেমে পরিপূর্ণ করিত এ বুক ।
 কখন নীলাঞ্জ-নেত্রে চাহিয়া অনন্ত পানে
 দেখিত, কাঁহত ধর্ম-সাম্রাজ্য-স্বপন ;
 যাহার ছায়ায় আর্ধ্য অনার্য্যের এই স্বর্গ,
 কালি করিলাম স্বর্গ প্রভাসে দর্শন ।
 বসিয়া চরণতলে, লয়ে বক্ষে পা ছুঁখানি,
 পাইতাম কি যে শান্তি, কি নিশ্চল সুখ !
 নর নারী প্রেম নহে মধুর শীতল তত,
 যেই প্রেমে কভু মম উছলিত বুক ।
 অনার্য্যের রাজ্য-আশা, সুভদ্রার দেবী-রূপ,
 কি কুক্ষণে এ হৃদয়ে হইল সঞ্চার !
 জালাইল অভিমান, সে অনলে স্মৃতিহীনি
 দিল পাপী আঁধা, স্বর্গ হরিল আমার ।
 অলি এই অভিমানে দেখি নাই সেই রূপ
 এত কাল, যাই নাই নিকটে তাহার ।
 জানিতাম, দেখি যদি সেই দেব অংশুমালা,
 অভিমান কুজাটিকা হবে না আমার ।
 দেখিলাম বৈপায়ন আশ্রমে সে দেবরূপ,
 দেখিলাম কালি আর্ধ্য অনার্য্য উৎসবে ;
 দেখিলাম আজি আর্ধ্য অনার্য্যের মহাযাত্রা,

দেব-নেত্রে প্রেম-অশ্রু বহিতে নীরবে ।
 চাহিলাম পা দুখানি আবার লইতে বুকে,
 পাপী আমি চলিল না চরণ আমার ।
 শত্রু মম হুঁচকার সেই জ্বরংকার ঋষি,
 করিয়াছে কলুষিত পাপ পারাবার
 আমাদের এ জীবন ।—কি ভীষণ গত নিশি !
 অন্ধকার, অগ্নি বৃষ্টি, ঘন ভূকম্পন ।
 কি ভীষণ আত্মহত্যা ! নর-হত্যা নিরমম
 গুপ্ত শরে ! মহাপাপ,—সে ত নহে রণ ।
 পাপিষ্ঠের কি কোশল । ভূগর্ভস্থ অগ্নি-শিখা,
 মুখ আমি, ভেবেছিলাম তার যোগানল ।
 বুঝি সেই রুদ্ধ বল, ছল নাম জ্বরংকার,
 সন্ধি, পরিণয়, হায় ! সকলই ছল ।
 কার । সকলই ছল দাদা ! হুঁসীসা তাহার নাম ।
 ছলনা সে রুদ্ধ মূর্তি । হইয়া শিক্ষিত
 গুনিয়াছি শিষ্য এক সাজি সেই রুদ্ধ বেশে,
 অন্তরালে হুঁচকার ছিল লুকায়িত !
 খুলি নাই এত দিন এই প্রবন্ধনা আমি,
 খুলিলে এ বড়বস্ত্র রহিত না আর,
 হইত না অনার্যের সাত্রাজ্য উদ্ধার ।
 “হুঁসীসা ! হুঁসীসা ঋষি !”—বাহুকি গর্জিল কোধে
 “অভিশাপ-ব্যবসায়ী সেই হুঁচকার ।
 ঋষিকুলে ধুমকেতু ! ছলিল বনের পশু
 এইরূপে ।—প্রতিশোধ লইব তাহার ।
 নারায়ণ !—প্রায়শ্চিত্ত চরণে তোমার !”
 স্কন্ধ শাস্ত্রের মত ছুটিল বাহুকি কোধে,

মুহূর্ত্তেকে লুকাইল দিবা-অন্ধকারে ।
রাখিয়া শিলায় বুক, রাখিয়া শিলায় মুখ,
ভাসিতে লাগিল কারু নয়ন-আসারে ।

নবম সর্গ ।

—:❖:—

বীণা পূর্ণতান ।

এইরূপে কিছুক্ষণ,—কে বলিবে কতক্ষণ ?
এক ক্ষণে কত শোক কারু হৃদয়ে !
এক ক্ষণে কত অশ্রু হৃদয়ে বয় !
রাখিয়া পাষাণে বুক, রাখিয়া পাষাণে মুখ,
কারু ও পাষাণে প্রাণ করেছে অর্পণ ।
গলিল না এ পাষাণ, কারু নয়ন-জলে,
গলিল না সে পাষাণ একটা জীবন ।
উঠি কিছুক্ষণ পবে, চাহি ধুমাবৃত ধরা,
কহিতে লাগিল কারু—“হায় ! যা তোমার
বিদীর্ণ হইয়া বুক গত নিশি যেই রূপে
ছুটিল গৈরিক ধূস্র ভস্ম অনিবার,
অনিবার সেই রূপে, নহে এক নিশি, মাত !
একটা রমণী জন্ম, বিদীর্ণ হৃদয়
প্রেমের গৈরিক ধারা, অভিমান ধূস্রাশি,
ঢালিয়াছে নিরাশার ভস্ম অগ্নিময় ।

এই বরিষণ পবে আজি মা ! তোমার মত
ধূম্র ভস্মে সমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার ;
কাঁপিছে তোমার মত হায় ! বারংবার !
কেন এ কল্পন ঘন, হা হত হৃদয় মম ?”

—চাপি ছই করে বামা বন্ধ আপনার—

“ওই সিক্কোঙ্কাস সম, কি উঙ্কাস হৃদয়েতে
অজ্ঞাত ? অজ্ঞাত হায় ! এ কি হাহাকার ?
কোশলে ক্ষত্রিয় জাতি হইয়াছে আত্মবাতী,
ভারতে অনার্য্য রাজ্য হ’য়েছে স্থাপিত,
এই আনন্দের দিনে, কেন নিরানন্দ মনে ?
কেন প্রাণ এইরূপে হতেছে কল্পিত ?

কি যেন বিবাদে ঘোর, এই দিবসের মত,
করেছে হৃদয় মম ঘোর অন্ধকার,
কি যেন ঘটিবে আজি মহাশোক ঘোরতর,
করি বজ্রাহত ক্ষুদ্র হৃদয় আমার ।

মরু তপ্ত হাহাকার কি যেন কহিছে কাণে—
‘দেখ্ ঘোরতর দিবা ! সিদ্ধ ঘোরতর !

দেখ্ কিবা ঘোবতর রমণী-অস্তর !

ঘোরতরে ঘোরতর মিলাইয়া, মিশাইয়া,—

জীবনের ঘোর গীত ঘোরতর তানে,

দে রে ঝাঁপ !—নাহি শক্তি রমণীর প্রাণে ?

আছে শক্তি,—দিব ঝাঁপ । কুশলে আছেন তিনি

তুনিলাম,—মনে আর নাহি মনস্তাপ ।

একবার নিরখিব আমার সর্বস্ব ধন,—

এত নহে নারী-জন্ম—ঘোর অভিশাপ !

তুনিয়াছি আজীবন তুনিলাম ভ্রাতৃমুখে,—

তুমি নারায়ণ, তুমি পতিতপাবন ।
 না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
 এই জানি—তুমি মম জীবন মরণ !
 তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার স্রুধা,
 তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল !
 তুমি মম চির স্রুধ, তুমি মম চির হ্রুধ,
 স্রুধ হ্রুধ মন্বনের অমৃত নীতল !
 ধরার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, ধরার আলোক শ্রেষ্ঠ,
 স্রুধা শ্রেষ্ঠ এ ধরার, পিপাসা যাহার,
 সে কেমনে ঘোর দিনে, এই ঘোর সিদ্ধ বক্ষে,
 বিসর্জ্জিবে এই ঘোর জীবন তাহার ?
 নিরখিয়া সে সৌন্দর্য্য, নিরখিয়া সে আলোক,
 নাথ ! সেই রূপ-স্রুধা নেত্রে করি পান,
 জীবন সৌন্দর্য্যাময়, জীবন আলোকময়,
 জীবন সে স্রুধাময়, করিবে প্রদান—
 স্রুধাময়ে স্রুধা—পূর্ণ কর মনস্কাম !”
 ছুটিল রমণী বেগে, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত বাল্য,
 দেখিল অদূরে,—নিষ নিবিড় ছায়ায়,
 আলোকিয়া অন্ধকার ওকি মূর্তি মহিমার !
 নিম্নলিখিত নেত্র, যোগ-আসনে শিলায় !
 অবলম্বি মহাবৃক্ষ, সমুন্নত মহাবপু,
 প্রসন্ন বদন, দেহ অচঞ্চল স্থির,
 স্থাপিত মুরতি যেন মহা সমাধির ।
 ষোগিবেশ বার্জার্ধির ; নিমজ্জিত মহাধ্যানের ;
 পশ্চাতে ধূল্য ব্যোম শোভে মহাপট ।
 পদতলে মহাদেবী শোভে সিদ্ধতট ।

নীরব, নিষ্পন্দ, ঘোর, শুষ্ক বিশ্ব চরাচর ;
 কেবল অনন্ত সিন্ধু মহাস্তুতি গীত
 গাইতেছে মহাকণ্ঠে গান্ধীৰ্য্য-পূৰ্বিত ।
 এক পল অপলক নেত্রে নিরখিল কারু
 মহাযোগী মহাদেব ! মুহূৰ্ত্তেক পর
 হইল সে মূৰ্ত্তি, দৃশ্য, কিবা রূপান্তর ।
 নিরখিল নাগপুর, নাগপুরে সরোবর,
 চারু সরোবর-তটে কিশোর স্তম্ভর !
 সজ্জিত মুগ্ধা বেশে,—সজ্জিতা যেমতি কারু—
 মদনযোহনরূপ প্রাণমুগ্ধকর ।
 কি সৌন্দর্য্য ! কি মদিষা ! কিবা বীৰ্য্য ! কি গদিষা !
 ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দেহ, নবীন নিধর ।
 নবীন নীরদ অঙ্গে প্রতিভা বিছাত বঙ্গে
 খেলিতেছে, কি তরঙ্গ-লীলা করুণার !
 কিশোরী কারুর প্রাণে কি নবীন সুখ-স্বপ্ন
 জাগিল, করিল কিবা অমৃত সঞ্চার !
 বাপীতটে উপবনে, নদীবক্ষে, গৃহকক্ষে,
 কাননের অঙ্কে অঙ্কে, হ'ল অভিনীত
 সেই-স্বপ্ন-নাটকের কত অঙ্ক মনোহর,
 অঙ্কে অঙ্কে কি গৰ্ভাক্ষ অমৃত পূৰ্বিত !
 শেষ অঙ্ক—প্রত্যাখ্যান ! সেই ঘোর অপমান
 সেই প্রতিজ্ঞা ! মরুময় একটা জীবন !
 মুহূৰ্ত্তেক দাঁড়াইয়া সমস্ত জীবন কারু
 দেখিল, যাপিল কারু হায় ! সেইক্ষণ ।
 প্রত্যাখ্যান !—সে প্রতিজ্ঞা !—গৰ্ভিয়া উঠিল জ্বলি
 নিকীর্ণিতপ্রায় সেই নারী অভিমান ।

ছুটিল কারুর শর,—হায় ! উন্মাদিনী কারু !—
 শোকেতে উন্মাদ কবি, করুণানিদান ।
 ক্ষমিও তাহারে, প্রেমময় ভগবান !
 যেই পদ কোকনদ, পূজে ভক্ত প্রেমময়
 সুকোমল ভক্তি-পুষ্পে, প্রেম-অশ্রু জলে,
 ভক্তদের মরমের সেই মর্শ্ব স্থলে,
 কেমনে পাষণ প্রাণে—না, না, পারিব না নাথ ।
 দেখ বুক ভাসিতেছে শোক-অশ্রু-নীরে ।—
 পড়িয়াছে সেই শব্দ তোমার ভক্তের বৃকে,
 পড়িবে ভক্তের বৃকে যুগযুগান্তর,
 নিবিবে না এই ব্যথা, যুগ যুগান্তরে ।
 যুগে যুগে প্রাণনাথ । কবির হৃদয় মত
 বিদীর্ণ হইয়া শবে ভক্তের হৃদয়,
 একুপে ধারায় শত, বহিবে হৃদয়-রক্ত,
 অরিবে ধারায় শত অশ্রু শোকময় ।
 একুপে আমার মত উচ্ছ্বাসে লইয়া বৃকে
 প্রেমময় শিশু পুত্র, পত্নী প্রেমময়ী,
 কাঁদিয়াছে কত কবি, কাঁদিবে কতই আর
 যুগে যুগে ।—এ গভীর শোক কালজয়ী !
 কাঁদিবেক যুগে যুগে কত নর কত নারী,
 কবির নয়নজলে অশ্রু মিশাইয়া,
 মম পত্নী পুত্র মত আকুল হইয়া ।
 নিতি নিতি প্রাণনাথ ! ভকতের অভিমান,
 যুগে যুগে মানবের নির্ভরতা আর,
 করিবে কি এইরূপে কত দেহ সুকোমল,
 জড় ব্যাধে কত যুগশিশু সুকুমার ?

যুগে যুগে এইরূপে না হইলে রক্তপাত,

হায় ! নাথ ! মানবের রক্ত কলুষিত

হবে না কি পবিত্রিত ? গলিবে না পাপ শিলা ?

হইবে না অধর্মের অগ্নি নির্ঝাপিত ?

হইবে না ধর্মের কি সাম্রাজ্য স্থাপিত ?

নারায়ণ মেলি নেত্র—“কারু !”—সুপ্রসন্নমুখে

ডাকিলেন, সেই স্বর করুণা, শীতল ।

পশিল কারুর প্রাণে, সে করুণা, সেই সুখা,

নিবিল সে অভিমান, সেই দাবানল ।

“পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি !

উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তিধাম !”

কহিলেন প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ভগবান ।

“প্রাণনাথ !”—উদ্গাদিনী পড়িল কাঁদিয়া বক্ষে,

জগতের হৃদীতল সেই শান্তিধাম !

পারিতৃপ্ত প্রেম, কারু পূর্ণ মনস্বাম ।

প্রেমে পরিপূর্ণ ধরা, গগন প্রেমেতে ভরা,

প্রেমামৃতে ভাসিতেছে বিশ্বচরাচর ;

অনন্ত আলোকরাশি, অনন্ত সঙ্গীতে ভাসি,

উঠিতেছে,—কি সৌন্দর্য ! কি স্বর্গ স্বন্দর !

সেই স্বর্গ মুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া চাহিয়া কারু,

করিতে করিতে সেই প্রেমামৃত পান,

মুদিল নয়ন ধীরে,—বীণা পূর্ণতান !

“কারু ! কারু ! কি করিলি !”—কাঁদি উঠে নাগরাজ

দূর হ’তে নিরখিয়া আসিলা ছুটিয়া ।

“কারু ! কারু ! কি করিলি ! হায় ! কি করিলে হরি !”

পড়িলা চরণ তলে মার্জিত হইয়া ।

মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত পরে, বাহুকি উন্মত্ত শোকে,
 মুহূর্ত্তেকে সেই শর করি উৎপাটন
 হানিল আপন বক্ষে, হানিতেছে পুনর্বার,
 কাড়িয়া লইয়া শর বেগে নারায়ণ,
 করিলেন মহাসিদ্ধ-গর্ভে বিসর্জন ।
 শিখা মহাপারাবার, সেই মহা রক্ত আর
 কে করিবে প্রক্ষালন, করিবে ধারণ ?
 রক্ত নারায়ণ !—মহা সিদ্ধ নারায়ণ !
 হরির চরণ-ক্ষত ভক্তের হৃদয়-ক্ষতে,
 বাহুকি সে পাদপদ্ম, করিল ধারণ,—
 কি মিলন পতিত ও পতিতপাবন ।
 কি মিলন অঙ্গে অঙ্গে, রক্তে রক্তে কি মিলন !
 প্রেমে প্রেমে কি মিলন—ভক্ত ভগবান ।
 কিবা মহাবিনিময় ! কিবা দান প্রতিদান !
 এই মহাদান, এই মহা প্রতিদান,
 যুগে যুগে মানবের মহা পরিজ্ঞান ।
 এইরূপে রক্তে রক্তে, মাংসে মাংসে এইরূপে,
 সিদ্ধ-জলে মিশি জল-বিন্দু কলুষিত,
 হয় বিন্দু পূর্ণকাম, হয় পবিত্রিত !
 অশ্রুধারা হনয়নে বহিতেছে দরদর
 সেই ক্ষত সন্মিলনে ; করি বিগলিত
 সে অশ্রুতে পাদপদ্ম, পতিতপাবনীর গঙ্গা
 হইতেছে বাহুকির বক্ষে প্রবাহিত ।
 বাহুকি অধীর শোকে, বাহুকি অধীর প্রেমে,
 প্রেম-শোক-সন্মিলনে অধীর হইয়া,
 “হায় ! কি করিলে হরি !—কম মুগ্ধ বালিকায় ।”—

কাতরে শিশুর মড কহিলা কাঁদিয়া ।
 কণ্ঠ জড়াইয়া কারু, অংসোপরে রাখি মুখ,
 কোমলভের মালা যেন বক্ষে স্তম্ভোভিত ;
 বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
 নাগরাজ শিরে, প্রেম-অশ্রু-বিগলিত
 প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে কহিলেন নারায়ণ—
 “নাগরাজ ! বৃথা শোক কর পরিহার !
 যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পাদ,
 স্ব ভাবে মানব করে মর্ম অনুসার ।
 ভ্রাতা ভগ্না হই জন, চাহিয়াছ শত্রুভাবে,
 পাইয়াছ শত্রুভাবে আজি হইজন ;
 আমাদের লীলা শেষ, পূর্ণ এই যুগ-ব্রত,—
 ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপন ।”
 “হায় ! হরি ! হইজন”—বাসুকি কহিলা খেদে—
 “কেন হইলাম শত্রু, চরণ কণ্টক ?
 করিলাম এ জীবন ভীষণ নরক ?
 মানব যে পাদপদ্ম পূজিয়াছে, পূজিতেছে,
 পূজিবে অনন্তকাল, পুষ্প স্নেহকোমল ;
 মানব যে হরিনাম, আনন্দে করিয়া গান,
 করিয়াছে, করিতেছে, প্রাণ স্তম্ভীতল ;
 আমরা সে পাদপদ্ম পূজি নাছি একদিন,
 গাই নাই একদিন সেই হরিনাম,
 আমরা সে পদাঙ্কে করিলাম হায় ! নাথ !—
 এই দেখ বাসুকির কাটিতেছে প্রাণ !
 আমরা তোমাকে শত্রু কেন ভাবিলাম ?”
 “ইহাও আমার লীলা ।”—কহিলা যোগেশ্বর হরি

বাহুকের সর্ব অঙ্গ উঠিল শিহরি ।
 কহিলা কাতরে—“হায় ! এ কি লীলা হরি !
 ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন করিলাম সমর্পণ
 যৌবন প্রভাতে এই দুইটি জীবন,
 নারায়ণ ! কেন নাহি করিলে গ্রহণ ?
 এই বনফুলে স্থান কেন করিলে না দান ?
 —হায় ! অকরণ হরি !—ক্ষুদ্র দুর্বাদল
 পায় স্থান তব পুদে,—পতিতপাবন তুমি !—
 পাইল না কেন কারু বাহুকি কেবল ?
 জগত পূজিছে পদ, জগত গাইছে নাম,
 কি স্বর্গ প্রভাসে হায় ! কালি দেখিলাম !
 কেবল বাহুকি কারু না পূজিল সেই পদ !
 না গাইল স্তমধুর সেই হারিনাম !
 না পাইল স্তমধুর সেই স্বর্গে স্থান !
 কারু বাহুকিরে হায় ! না করিলে শত্রু তব,
 বনের পতঙ্গ নাহি করিলে দাহিত
 দাবানলে, ধর্মবাক্য হ’ত না স্থাপিত ?”
 “নাগরাজ ! শত্রুমিত্র”—কহিলেন নারায়ণ
 যোগস্থ ঈশদ হাসি—“কে বল কাহার ?
 আমি জগতের, এই জগত আমার !
 ওই দেখ পায়াবর—কি মহাশক্তির ক্রীড়া !
 কি শক্তিতে মহাসিন্ধু দেখ বিধূনিত !
 ওই দেখ কি তরঙ্গ ! দেখ কি তরঙ্গ-ভঙ্গ !
 কি তরঙ্গে তটভূমি আহত কম্পিত !
 করি সংঘর্ষে ফেনগুঞ্জ উদ্গিরিত !
 জলরাশি মুহূর্তেক না গায়ে থাকিতে হির

শ্রোতোবলে,—শ্রোত তবে শত্রু কি তাহার ?

তরঙ্গে তরঙ্গাঘাত, তটভূমে প্রতিঘাত,

উন্মির কি শত্রু উন্মি, শত্রু কি বেলায় ?

এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া,

এই ঘাত প্রতিঘাতে হতেছে সৃজিত

পলে পলে বস্তুকবা, হইতেছে পলে পলে

প্রবাল মুকুতা রাশি সৃজিত বর্দ্ধিত ।

এই ঘাত প্রতিঘাত চেতন জগতে আছে,

মানব-জগতে আছে এ ক্রীড়া আমার ;

এই ঘাত প্রতিঘাত,—প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র !

এ নহে তোমার ক্রীড়া, নহে দুর্কীসার ।

মানব মঙ্গল তটে অধর্ম তরঙ্গায়িত—

পতিত ক্ষত্রিয় জাতি—হইয়া প্রহত,

প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে হইয়াছে হত ।

এই ঘাত প্রতিঘাতে মানবের কি মঙ্গল

দেখিতেছ নাগরাজ হয়েছে সাধিত,

ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত ।

দুর্কীসার বড়মুগ্ধ, অার্য্য অনার্য্যের সন্ধি,—

আমার নীতির ক্রীড়া নহে দুর্কীসার ;

ভূমিও দুর্কীসা মাত্র, নিমিত্ত তাহার ।

আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মম রূপ,

শক্তির নীতির মম মহা আবর্তন ।

এই আবর্তন—সৃষ্টি, স্থিতি বিনাশন ।”

এ কি কথা । এ কি মূর্ত্তি ।—বাহুকি বিশ্বয়ে উঠি,

দেখিতে লাগিলা মূর্ত্তি বিশ্বয়ে বিহ্বল ।

ওনিতে লাগিলা কাণে সে কথা কেবল ।

দেখিতে ধরিতে মূর্তি নাহি পারে নর-নেত্র,
 নাহি পারে সেই কথা করিতে ধারণ !
 সে মূর্তি অনন্ত, ভাষা অনন্ত-নিশ্বন !
 বাস্তবিক বিষয়ে কহে করষোড়ে—“জগন্নাথ !
 অনন্ত শক্তি তব ! তবে কেন হায় !
 ভ্রাতা ভগ্নী দুইজনে এ লীলা-শিখায়
 পোড়াইলে অকরণ ? দাস অন্নদাস করি
 রাখিলে না কেন নাথ ! চরণ-ছায়ায় ?”
 “নর-জন্ম, নরদেহ”—উত্তরিলা নারায়ণ—
 “যুগে যুগে এই রূপে করিয়া গ্রহণ,

কত কুরুক্ষেত্র, কতই প্রভাস সহি,
 সহি আমি কত নর-হুঃখ নিরমম !
 কে আমার স্থখী বল ?—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র ?
 স্থখী কি যশোদা, নন্দ, ব্রজাঙ্গনাগণ ?
 আমার বাস্তবিক, শত্রু, কেমনে হইবে স্থখী ?
 কে আছে এমন মম ভক্ত প্রিয়তম ?
 মানব অধর্ম ফলে জলে যেই হুঃখানলে,
 জলি সেই হুঃখানলে সহ নিজ গণ,
 না করিলে ধর্ম রাজ্য ভূতলে স্থাপন ;
 আদর্শ, দর্পণ মত, না ধরিলে নর-চক্ষে,
 দেখিতে বুঝিতে নাহি পারে নারায়ণ
 কুদ্র নর, নাহি হয় উদ্ধার সাধন !
 এইরূপে যুগে যুগে সহিত স্বগণ মম
 —কেহ শত্রু, কেহ মিত্র,—লভিয়া জনম
 সাধুদের পরিজ্ঞান, বিনাশ হৃদয়দের,
 সাধি আমি, করি ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন ॥

ত্রেতার বাবণ, আর দ্বাপরের হৃষ্যোধন,
 হর্ষাশা, বাহুকি,—অঙ্গ একই লীলার ;
 ত্রেতার সে শূর্ণগথা, দ্বাপরের জবৎকার, ।
 রূপে মুখা ভকতির প্রতিমা আমার !
 এস সখে ! এস বুকে ! বড়ই কাতর প্রাণ
 তব প্রেম-পিপাসায়, গাও হরিনাম ।
 এস বুকে ! আমাদের লীলা অবসান ।”
 নারায়ণ ছই নেত্রে বহিতেছে প্রেমধারা,
 ঝরিছে কারুর বক্ষে ধারা অবিরাম,
 দেখিলা বাহুকি,—প্রেমপূর্ণ ভগবান !
 “কারু ।”—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলা বাহুকি উচ্ছে,
 ডাকিল জলধি “কারু” কণ্ঠে উচ্চতর,
 ডাকিল গগন “কারু” কণ্ঠে ঘোরতর ।
 ডাকিল সে ঘোর দিবা, সে প্রকৃতি ঘোরতর
 ডাকিল, ডাকিল উচ্ছে বিশ্ব চরাচর,—
 শুনিলা না কারু, কারু দিল না উত্তর ।
 সেই প্রেমময় বক্ষে, সেই প্রেমময় মুখ
 চাহি প্রেমানন্দ কারু নেত্রে দরদর
 রহিয়াছে,—কারু কই দিল না উত্তর !
 নিরখিলা নাগরাজ,—হইয়াছে প্রেমানন্দে
 প্রেমসিদ্ধ বক্ষে প্রেম-বিশ্ব সম্মিলিত ।—
 পড়িলা চরণতলে হইয়া মূর্ছিত ।

দশম সর্গ ।

—:~:—

প্রায়শ্চিত্ত ।

“—ও কি হাহাকার !

সুভদ্রে । সুভদ্রে । শুন ও কি হাহাকার !”—

ছুটিয়াছে উকা মত নৈশ অন্ধকারে
 দারকা-হস্তিনাপথে তুরঙ্গ যুগল,
 মহাবনে ক্ষুরক্ষেপে তুলি প্রতিধ্বনি
 নৈশ নীরবতা বক্ষে । ছুটিয়াছে বেগে,—
 দিবা, রাত্রি, মহাবন, নগর প্রান্তর,
 নাহি জ্ঞান অশ্বের কি অশ্ব-আরোহণ ;
 নাহি শক্তি, নাহি নিদ্রা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
 কত দিবা, কত রাত্রি । অশ্ব-মুহমুহ
 পরিবর্তিয়া পান্থশালায় কেবল
 সাত্রাজ্যের স্থানে স্থানে চক্ষুর নিমিষে,
 ছুটিয়াছে অশ্বারোহী,—পলকে প্রত্যেক,
 অশ্বের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে হরিত,
 করিছে নির্ভর যেন জীবন মরণ ;
 কি যেন ঘটনা মহা করিছে নির্ভর
 অশ্বের গতিতে দ্রুত । ছুটিয়াছে অশ্ব
 চাপি দস্তে দস্তালিকা ফেনিল বদনে
 শ্বেদসিক্ত ; শ্বেদসিক্ত আরোহিযুগল ।
 ছুটিয়াছে উর্দ্ধধাসে অশ্বপাহকায়
 কান-কঙ্কর পথে করি বিকীর্ণিত

অগ্নিকণা ঘন ঘন, ঘন বজ্রাঘাতে ।
 অকস্মাৎ নিজ অশ্ব করিয়া সংযত
 কহিলেন ধনঞ্জয়—“ও কি হাহাকার !
 শ্রুভদ্রে ! শ্রুভদ্রে ! ওন ও কি হাহাকার !”
 নীরব নিশীথ ! বন নিস্তব্ধ নীরব !
 নীরব শ্রুভদ্রা দেবী ! নিশ্চল নীরব
 সংযত যুগল অশ্ব ! প্রকৃতি নীরব ।
 বুঝিলেন সবাসাচী ভ্রান্তি আপনার ।
 আবার ছুটিল অশ্ব, পরাভবি বেগে
 গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের শর ক্ষিপ্তগতি ।
 অতিক্রমি বহু পথ ফাল্গুনি আবার
 সংযত করিয়া অশ্ব কহিলা কাতরে—
 “সখে ! সখে !—ও কে ডাকে ? ওন ভদ্রা ! ওন !
 ও যে কণ্ঠ কেশবের !” নীরব কানন ;
 নীরব শ্রুভদ্রা স্থির অশ্বে আপনার ।
 কেবল অশ্বের ক্ষুর বিক্ষেপ-নির্ঘোষে
 ডাকিছে বিকল কণ্ঠে বনপক্ষী কোথা ।
 ওগ্নিনিদ্র ; ভগ্ননিদ্রা কুরঙ্গ-শশক
 ছুটিতেছে ; করিতেছে শার্দূল জুস্তপ ।
 আবার বুঝিলা ভ্রান্তি । ছুটিল আবার
 যুগল তরঙ্গ বেগে ঘোর ঝড়বেগে ।
 অতিক্রমি বহু দূর আবার পার্থের
 দাড়াইল অশ্ব, পার্শ্ব কহিলা আবার—
 “না, না, নহে ভ্রান্তি ভদ্রা । ‘সখে ! সখে !—বলি
 কি কক্কণ কণ্ঠে ওন ডাকিছেন হরি !—
 আসিতেছে দাস তব ।’—করি কথাস্বাত

ছুটিলেন ধনঞ্জয়, ছুটিলেন দেবী
 উজ্জ্বলসে বহু দূর,—ভ্রান্তি পুনর্বার !
 না পারে চলিতে আর তুরঙ্গ যুগল,
 বহিতেছে অঙ্গে স্বেদধারা দর দর,
 বহিতেছে দর দর অঙ্গে আরোহীর ।
 চলিতেছে ধীরে অশ্ব ফেলি ঘন শ্বাস,
 বঙ্কিম গ্রীবায বজ্রা করিয়া চর্কিত
 মুহুমূহ, মুহুমূহ করিয়া আহত
 বক্ষঃস্থল মুখে গর্কে, করিয়া সতেজ
 মুহুমূহ নাশাবন্ধ, বিস্তৃত কুঞ্চিত ।
 নিবিড় তমিস্রা নিশি ; নিবিড় কানন ।
 অশ্বপৃষ্ঠে পার্শ্ব ভদ্রা উভয় নীরব,
 অন্যমনা, বিবাদিত, চিন্তা-নিমজ্জিত ।
 ধীরে চলিতেছে অশ্ব । কহিলা ফাল্গুনি—
 “কি নিবিড় অন্ধকার । কি ঘোরা রজনী !
 কি ভীষণ মহাবন আবৃত তিমিরে !
 কি যেন কি মহাশোক এই জগতের
 হইয়াছে সংঘটিত ! করেছে জগত
 বিচূর্ণিত, পরিণত ঘোর অন্ধকারে ;
 করিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্দীপিত !
 কি যেন কি মহাশোকে হৃদয়-জগত
 বিচূর্ণিত ; পরিণত নিবিড় তিমিরে ;
 জীবনের চন্দ্র সূর্য্য তারা নির্দীপিত ।
 অন্ধকার ! অন্ধকার ! নিবিড় গভীর
 অন্ধকার এ জগত ! হৃদয় জগত
 অন্ধকার, অন্ধকার নিবিড় গভীর !

শূত্র ! শূত্র ! সব শূত্র ! শূত্র এ জগত !
 হৃদয়-জগত শূত্র ! শূত্র তুমি, আমি ।
 নাহি শক্তি দেহে মম, নাহি মম দেহ !
 নাহি হৃদয়ের শক্তি, হিড়ি হৃদয়ের ।
 শক্তিহীন, দেহহীন, হৃদয়বিহীন,
 কি যেন রয়েছি আমি ।—স্বপন ! স্বপন ! ছায়া !
 অন্ধকার ! অন্ধকার !”

শান্ত কণ্ঠে হ্রিষ
 কহিলেন ভদ্রাদেবী—“শোকে অভিভূত
 হইও না এই রূপে । হায় ! যাদবের
 অনাথ শিশুর, আর নারী অনাথার
 রয়েছে রক্ষণভার করেতে তোমার ।”
 “শোক ভদ্রা !”—শোকরুদ্ধ কণ্ঠে ধনঞ্জয়
 কহিলেন—“শোক ভদ্রা । শোক দুই বার
 পাইয়াছি এ জীবনে । দুই বজ্রাঘাতে
 বিদৌর্গ, বিচূর্ণ, শোকে হয়েছে হৃদয়
 দুই বার, দুই ক্ষেত্রে । কুরুক্ষেত্রে—কোলে
 জননীর মহাশয্যা সে মহাশিশুর ।
 আশ্রয়ে,—সে মহাশয্যা সাক্ষী বালিকার
 মাতৃকোলে, এ পাষণ পিতৃপদতলে !
 আমাদের পদতলে করি সমর্পণ
 প্রসূতি প্রসূত সন্ত শিশু নিরাশ্রয়,
 কহিল কাঁদিয়া—‘শেষ পূজা উত্তরার
 লগ বাবা । লগ মাতা । এ পবিত্র ফুলে,
 উত্তরার অশ্রুজলে । শোধিল উত্তরা
 আজি তোমাদের ঋণ অনন্ত মেহের ।

ওই ডাকিতেছে অভি বসিয়া বিমানে ।
 আনন্দে বিদায় দেও ! জন্মজন্মান্তরে
 শব্দর শাশুড়ী, যেন জনক জননী,
 পাই তোমাদের,—বর দেও উত্তরায় ।”
 ছুই করে, ছুটি ফুলে, আলিঙ্গি চরণ
 হৃজনেব, লুটাইয়া পড়িল চরণে ।
 কাদি উঠে তুলি বক্ষে অর্পিলাম যবে
 তব অঙ্কে, দেখিলাম কি হাসি অধরে !
 দেখিলাম অনাথার সে প্রথম হাসি !—
 কি আনন্দ ! কি মাধুরী চির-নিদ্রাগতা !”
 কাদিয়াছি চিরদিন সেই ছুই শোকে !
 কাদিয়াছি প্রতিদিন । সে শোক-স্মৃতিতে
 গোবিন্দের মহাবাক্য, গীতার সাস্থনা,
 বীরত্বের সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা কঠোর,
 গিয়াছে ভাসিয়া । প্লাবি ধৈর্য্যের বন্ধন,
 উড়াইয়া তৃণবৎ ধৈর্য্য ঐবাবত,
 বহিয়াছে শোকগঙ্গা পতিতপাবনী ।
 কিন্তু এই শোক, ভদ্রা ! নহে সেইরূপ !
 প্রভাস-উৎসব কথা শুনি জনরবে
 আসিতেছিলাম, পথে সংবাদ ভীষণ
 শুনি যেই দিন হায় ! দারুকের মুখে
 মিলিলাম আত্মহারা মথুরার পথে
 তব সনে,—সেই দিন !—কত দিন আজ
 নাহি জ্ঞান ; মহাকাল এ মহাশোকের
 —প্রলয়ের—নাহি সাধ্য করে পরিমাণ ।
 সে দিন হইতে এক অশ্রুবিন্দু মম

উঠেনি হৃদয়-উৎসে, বহেনি নয়নে
 হয়েছে হৃদয় শুষ্ক, শুষ্ক হৃদয়ন।
 হইয়াছে মরুভূমি হৃদয়, নয়ন,
 পরিপূর্ণ হাহাকারে, নিবিড় তিমিরে !
 সেই ঘোর অন্ধকারে, ঘোর কৃষ্ণপটে
 জীবনের,—হইয়াছে বিলুপ্ত তিমিরে
 দৃষ্টাবলী জীবনের,—ভাসিছে কেবল
 সেই ছই মহাশোক। তাহাতেও আজি
 উঠিছে না হৃদয়েতে একটি উজ্জ্বল,
 বহিছে না এক বিন্দু অশ্রু হৃদয়নে।
 সেই শোক-দৃষ্ট আজি নিশ্চিন্ত মনিন
 কি অজ্ঞাত মহাশোকে ! সুভদ্রে ! সুভদ্রে !
 হউক যাদব ধ্বংস, ধ্বংস চরাচর,
 নাহি হুঃখ। নারায়ণ—প্রাণসখা মম—
 আছেন কুশলে বল ? বল একবার
 পারিব সে পদাঙ্ক ধরিতে হৃদয়ে,
 জুড়াইতে হৃদয়ের এই হাহাকার ?
 “এ কি ভাস্তি প্রাণনাথ !”—উত্তরিলা দেবী
 শাস্তি স্থিরকণ্ঠে—“যিনি মঙ্গল-নিদান
 জগতের, যিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল,
 সত্তবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন ?
 মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ হুঃখ আর,
 জন্ম মৃত্যু, শোক শাস্তি, লীলা যাত্র তাঁর ;—
 অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।
 না থাকিলে অমঙ্গল, মঙ্গল কখন
 বুঝিত কি ক্ষুদ্র নর ? বুঝিত কি সুখ,

না থাকিত দুঃখ যদি ? মৃত্যু না থাকিলে,
 পারিত বহিতে কি এ জীবনের ভার ?
 আবির্ভাব তিরোভাব স্বয়ং তাঁহার
 না থাকিলে, ভক্তি শ্রোত বহিত উজান,
 ধর্মের উন্নতি-চক্র হইত অচল ?
 হইত অচল জীব-চক্র উন্নতির
 দুঃখ, মৃত্যু, অমঙ্গল না থাকিত যদি ।
 কর শোক পরিহার ! নিয়তি তাঁহার
 স্মরণ্য বিশ্ব্যাপী পালিবেন তিনি,
 সূদর্শন নীতি-চক্রে পালিবে জগত,
 পালিব আমরা ক্ষুদ্র চক্রে আপনার
 সেই মহাচক্র-গর্ভে । ততোধিক আর
 ক্ষুদ্র নব আমাদের নাহি অধিকার ।
 যত দিন ভক্তি প্রেম থাকিবে হৃদয়ে,
 তাঁহার চরণাঙ্কুর প্রেম সরোবরে
 ভাসিবে সতত । প্রেমে চির অধিষ্ঠান—
 প্রেম বন্দাবনে প্রেমময় ভগবান ।”

একটি শীতল ধারা হৃদয় মরুতে
 বহিল পার্থের ধীরে ; এক ক্ষীণালোক
 উঠিল জলিয়া দূরে ঘোর অন্ধকারে
 সেই মহামরুভূমে । সেই ক্ষীণালোকে
 দেখিলেন ধনঞ্জয় ভাবি আবর্জন
 নিয়তি চক্রের ক্ষুদ্র অক্ষুট রেখায় ।
 চলিল নীরবে ধীরে । উঠিল ভাসিয়া,
 নিশান্তে নীরবে ধীরে অক্ষুট আলোক
 স্নানোচ্ছন্ন শশাঙ্কের । উঠিল ভাসিয়া,

কানন নীরবে ধীরে বিভীষিকাময়,
পার্থ ভবিষ্যত মত । উঠিল ভাসিয়া,
কাননের পথ মত, কর্তব্যের পথ

অক্ষুট আলোকে ধীরে । ছুটিল আবার
তুরঙ্গ যুগল বেগে । করি অতিক্রম
কানন, প্রভাতে অশ্ব প্রভাস-প্রাপ্তরে
প্রবেশিল, উজ্জ্বলসে ছুটিল তখন ।

ভস্মাচ্ছন্ন দিবালোক ধীরে ধীরে ধীরে
উঠিল ভাসিয়া । ধীরে উঠিল ভাসিয়া
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন প্রভাস-প্রান্তর ।

“ও কি শব্দ !”—হুই অশ্ব ধামিল পলকে ।

নহে ভ্রান্ত এই বার,—বিকট চীৎকার
পৈশাচিক, শুনিলেন ভদ্রাও এবার ।

ছুটিল যুগল অশ্ব শব্দ লক্ষ্য করি
যেন এই ক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যে অশ্রুতম ।

দেখিলেন ঋষি এক পড়িয়া ভূতলে
করিছে বিকৃত মুখে বিকট চীৎকার,

বক্ষে শিলাখণ্ড এক । চক্ষুর নিমিষে
অবতরি হুইজন, নিমিষে চক্ষুর

শিলাখণ্ড সবাসাচী করিয়া অস্তর ।

“ওই আসে ! ওই আসে !—কোথা যাব আমি ?—

যায় প্রাণ পিপাসায় !” করিছে চীৎকার

চাহি শূন্ত পানে ঋষি বিকৃত বদনে ।

ছুটিলেন ভদ্রা দেবী ; দূর নিরন্তরে
প্রক্ষালিয়া ক্ষিপ্তকরে গৈরিক অঞ্চল,

আনিয়া শীতল বায়ি ঢালিয়া বদনে

স্ববির পিপাসাহূর । করি জল পান,
 দ্বিগুণ বিকৃত মুখ করি মহাক্রোধে,
 গর্জিল—“কে তোরা পাপী ? সুভদ্রা, অর্জুন !
 দূর হও পাপীয়সি, ওরে ছরাচার !
 চিনিম্ না হুর্কাসায়, অভিশাপে যাব
 কুরুকুল যত্নকল হইল ভস্মিত ?
 দূর হও ! দূর হও ! পিপাসা ! পিপাসা !”
 লইয়া মস্তক অঙ্কে, বারি সুগীতল
 আবার দিলেন ভদ্রা বিকৃত বদনে ।
 উঠিল চীৎকার পুনঃ—ওরে পাপীয়সি !
 দূর হও ! দূর হও ওরে ছরাচার !
 এখনি করিব ভস্ম অভিশাপানলে !”
 কহিলেন ভদ্রা দেবী কণ্ঠে কঙ্কণার—
 “কর ভস্ম আমাদের ইচ্ছা হয়, দেব ।
 কেমনে যাইব চলি, ফেলিয়া তোমায়
 এমন সময়ে হায় ! দেও অনুমতি
 সেবির চরণ প্রভু । হও শাস্ত স্থির,
 পাবে শাস্তি, সুমধুর গাও কঙ্কণায় !”
 অতঃপরে অগ্নি যেন হইল পতিত,
 গর্জিল হুর্কাসা ক্রোধে হইয়া অধীর—
 “সে পাপীর ভগ্নী, ভগ্নাপতি সে পাপীর,
 সেবিবে ।—পবিত্র-অঙ্গ ছুঁইবে আমার !
 দূর হও ! দূর হও ! মহাবি হুর্কাসা
 গাইবে সে পাপনাম !”—ঘোর অট্টহাসি
 হাসিলা দুগায় স্বধি প্রোতপূর মত—
 “যোগামল যাব করি বিদীর্ণ ভূধর,

হ'য়ে উদ্ভাবিত, কুল করিল ভস্মিত
 যে পাপীর, দাবানলে পদ্মপাল মত,
 গাইবে তাহার নাম মহর্ষি দুর্কাসা ?
 দূর হও দুঃচারিণি ! হব শাস্ত, স্থির,
 বল সেই যোগানলে হইয়াছে পাপী
 ভস্মীভূত, কিংবা হত অস্ত্রে অনার্যের,
 হুগিত পশুর মত । বল ফলিয়াছে
 দুর্কাসার অভিশাপ,— বেদ-ব্রাহ্মণের
 মহাশত্রু মহাপাপী মরেছে পুড়িয়া
 বেদ-যজ্ঞানলে মম, গিয়াছে নরকে ;
 তাহার সে ধর্মরাজ্য গেছে রসাতলে !
 শিলাখণ্ড পড়ি বুকে সে ঘোর নিশীথে
 করেছে অচল দেহ । বড় ছাপ মনে
 নাহি পারিলাম হায় ! করিতে প্রদান
 পূর্ণযজ্ঞে শেষাহতি, করি পদাঘাত
 পতিত শত্রুর শিরে শত শত বার ।
 ওই আসে ! ওই আসে !—বিকৃত চীৎকার
 আবার করিল ঋষি । —“জগন্ত ভীষণ
 নাওকীর সুদর্শন-চক্র নরকের !
 কোথা যাব ! কোথা যাব ! একে, একে, একে
 নৃপতি বৈদিকদেব-পূজকের কাছে
 গেলাম, আশ্রয় কেহ দিল না আমায়
 ধর্মভ্রষ্ট ছদ্মচার । সকলের করে
 অর্ঘ্য সে পাপীর তরে ! সকলের মুখে
 পাপনাম । পাপনামে পূর্ণ ধরাতল !
 ওই আসে ! ওই আসে !—দুর্কাসা আবার

করিল চীৎকার ঘোর,—“দিল না আশ্রয়
 বিধর্মী বৈদিক দেব-পূজক সকল ।
 অধর্ম্যে পূর্ণিত ধরা । যাইব বৈদিক
 দেবতাগণের কাছে, মাগিব আশ্রয় ।
 ঘাব ওই চন্দ্রলোকে । এ কি চন্দ্রালোক !
 কোথা শশধর ? কোথা বোহিণী ভাহার ?
 কোথায় জ্যোৎস্না ? এ কি ! অন্ধুত ! অন্ধুত !
 এ চন্দ্রলোকের চন্দ্র শোভিছে পৃথিবী
 কি সুন্দর ! কি নীতল উৎস জ্যোৎস্নার !
 শিলাময়—শিলাময়—কি মরু বন্ধুর
 এই চন্দ্রলোক ! তপ্ত জলন্ত আতপে
 শৈলের উপরে শৈল, শৈল তছপরে,—
 বিদীর্ণ, উদ্গীর্ণ, মৃত আশ্রয় ভূধর,
 অনন্ত, অসংখ্য । নাহি চিহ্ন উদ্ভিজ্জের !
 নাহি জীব ! নাহি জল ! কেবল প্রাণের
 মধ্যাহ্ন নৈদাঘ সূর্য্যে তপ্ত শৈল মরু !
 যায় প্রাণ ! কোথা যাব !—পিপাসা ! পিপাসা !”
 সিক্ত অঞ্চলের বারি স্তব্ধা আবাব
 ঢালিলেন । ধনঞ্জয় বিস্মিত, ত্তম্বিত,
 দাঁড়াইয়া পার্শ্বে করি গাঙাবে নির্ভর,
 বীরবেশে, আত্মহারা । বসিমা স্তব্ধা
 উদাসিনী, মুক্তকেশী, গৈরিক বসনা,
 অন্ধে দুর্ভাসার শির,—মূর্ত্তি কঙ্কণার ।
 “ওই আসে ! ওই আসে !”—ছাড়িল চীৎকার
 আবাব দুর্ভাসা ভয়ে । প্রলাপের মত
 কহিতে লাগিল পুনঃ—“যাব সূর্যালোকে ।

কোথায় আদিভা জবা-কুম্ভ-সঙ্কশ,
 ধ্বান্তারি সৰ্বপাপয়, দেব দিবাকর ?
 কোথায় তাহার বধ ? সপ্তাশ্ব কোথায় ?
 সারথি অরুণ কোথা ?—অনল ! অনল !
 ভয়ঙ্কর—ঘোরতর—অনল কেবল !
 অনন্ত, অতল, অগ্নি-মহাপারাবার !
 পৰ্বতপ্রতিম অগ্নি-তরঙ্গ ভীষণ
 ছুটিতেছে, গর্জিতেছে ! তরঙ্গে তরঙ্গে
 কি আঘাত, প্রতিঘাত, বিরাট-গর্জন,
 অনলের অনিবার ! শত বজ্রনাদ,
 বালকের করতালি তুলনায় তার ।
 কি শক্তিতে চিন্তাতীত অগ্নি পারাবার
 বিনোদিত, বিমণ্ডিত, ঘোর আবর্তিত !
 কি অসংখ্য অগ্নিস্তম্ভ, অনন্ত গোলক,
 অনল পৃথিবীরূপি শত সংখ্যাতীত,
 হইতেছে মহানুজ্ঞে অগ্নি-প্রশ্রবণে
 উৎক্ষেপিত অনিবার কি বেগে ভীষণ,
 কত উর্ধ্বে ! হইতেছে উদ্ভিন্ন, বিদীর্ণ,
 কি বিরাট মহাশব্দে ! ভীম বজ্র-মজ্জে
 সংখ্যাতীত পরিপূর্ণ কি মহাবোম
 অনিবার ! চিন্তাতীত, বরুনা-অতীত,
 ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
 যেমনে অলন্ত সেই অনলমণ্ডলে
 বাইব ! শিশুর জীড়া-গোলক কেবল
 তুলনায় ভূমণ্ডল ! মধ্যাহ্ন উত্তাপ
 নিদাঘের, তুলনায় ভূষার শীতল ।

কি উত্তাপ ! কি উত্তাপ ! যাইছে পুড়িয়া
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা !—কি জালা ! পিপাসা !”

যন্ত্রণায় দুর্কীসার বিকৃত-বদন
হইল বিকৃততর । যন্ত্রণায় ধ্বি
করিতেছে ছটফট ; তীব্র যন্ত্রণায়
রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, হতেছে মথিত
ঘন ঘন । সুভক্তার করুণ হৃদয়
গলিল, বহিল অশ্রু করুণ নয়নে,—
করুণার প্রেম-গঙ্গা সস্তাপ হারিণী ।
কহিলেন—“পাবে শান্তি, লও কৃষ্ণনাম ।”
“দূর হও ! দূর হও !”—দুর্কীসা আবার
যন্ত্রণা-জড়িত বশ্ঠে করিল চীৎকার ।—
“আবার, আবার, সেই নাম পাপিষ্ঠের
কলুষিত করি কর্ণ !—আবার, আবার,
শ্রবণ হইতে শ্রোণ করিয়া দাহিত
তরল অনল-স্রোতে ! ওরে পাপীয়সি !
বাভিচারী হ্রাচায হীন গোবন্ধক,
লইবে তাহার নাম মহষি দুর্কীসা ?
লইবে পবিত্র স্বর্গ নাম নরকের ?
পারিজাত পুতিগন্ধ মাখিবে সৌরভে ?
আমুক সে বিশ্বম্ভার চক্র বিভীষণ,
গণ্ড খণ্ড দুর্কীসার করুক এ দেহ,
করুক বিদগ্ধ, ভয় ; তথাপি—তথাপি—
তথাপি দুর্কীসা নাহি লইবে সে নাম !
ওই আসে ! ওই আসে ! কি চক্র ভীষণ !
কি ঘূর্ণন ! কি গর্জন । অগ্নি-উদগিরণ !

কোথা যাব ! কোথা যাব ! দেবতা বেদের
কোথা ইন্দ্র ! কোথা রুদ্র ! কোথায় বরুণ !
অশ্বিনীযুগল কোথা !—অদ্বুত ! অদ্বুত !

অনন্ত—অনন্ত—নীলগর্ভে অনন্তের
ভ্রমিছে অনন্ত সূর্য্য, অনল গোলক,
অস্ত্রহীন, তুর্নিরীক্ষ্য ! কি চক্রে মহান,
সূর্য্যে সূর্য্যে মহাশূন্তে করিয়া বেটন,
ভ্রমিতেছে কত গ্রহ ! বেষ্টি গ্রহগণ
কত উপগ্রহ, কত চন্দ্র ভূমণ্ডল,—
ভ্রমিতেছে অনিবার ! গতি আবর্তন
মানব-কলনাতীত ! সৌর রাজ্য কত,—
কত সৌর পরিবার,—শত, সংখ্যাতীত—
ভ্রমিতেছে নীলিমায় মহা অনন্তের,—
অশ্রাস্ত, অশ্রাস্ত ! কিবা অনন্ত ভ্রমণ
অস্ত্রবীক্ষে, কি অনন্ত চক্রে সংখ্যাতীত,
কি শক্তিতে, কি নীতিতে, অচিন্ত্য কোশলে !

অসংখ্য জগত ! সেই জগতে জগতে
কতই বিচিত্র সৃষ্টি ! জড় চেতনের
কি বিচিত্র বঙ্গভূমি ! জগতে জগতে
সৃষ্টি-কত রূপান্তর ! জগতে জগতে
রূপান্তর জীব জীব, উদ্ভিজ্জে উদ্ভিজ্জে,
কি বিচিত্র ! কি বিচিত্র, জগতে জগতে,
উন্নতি ও অবনতি জড় চেতনের !
ভূলোক হইতে ওই পুণ্য দেবলোক,
—শোভাময় ! শাস্তিময় ! চিদানন্দময় !—
মানব হইতে ওই পুণ্যাকা সকল,

—শোভাময় ! শান্তিময় ! চিদানন্দময় !—
 কি অদ্ভুত বিবর্তন জড় চেতনের
 কত স্তরে, অধে, উর্ধ্বে, কি নীতি-শৃঙ্খলে,
 দৃষ্টাভীত, জ্ঞানাভীত, । কই দেবলোকে
 কোথা ব্রহ্মা, কোথা বিষ্ণু, কোথায় বা শিব,
 বৈদিক দেবতাগণ ? কাহার আশ্রয়
 লইব ? আশ্রয় আজি কে দিবে আমায় ?
 “ওই অসে ! ওই আসে !”—আব'র চীৎকার
 করিল দুর্কীসা ভয়ে । চাহি অধোমুখে
 জননী করুণাময়ী, করিছেন ধীরে
 সঞ্চালিত হুই কর,—হুই কোকনদ—
 ঋষির বিকৃত ভীত বদন উপরে ।
 “কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত !”—বদন-বিকৃতি
 ঋষির হইল দূর । কহিল উচ্ছ্বাসে—
 “কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত নীলমাণময়
 কি বিরাট দেববপু ! বিরাট পুরুষ !
 দ্যুলোক, ভূলোক, ওই অনন্ত আকাশ
 ব্যাপিয়াছে সেই দেহ ! গ্রহ, উপগ্রহ,
 চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল
 ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে,
 আদিহীন, অন্তহীন ! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
 মহাপারাব্যয়ে ক্ষুদ্র জলবিষ মত,
 জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন !
 এই কি সে বিশ্বরূপ ? পরম নিধান
 এ বিশ্বের, নিত্য, সত্য, অব্যয়, অক্ষয় ?
 অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ? নিয়ন্তা নীতির ?

এ অনন্ত কোশলের অনন্ত-কোশলী ?

এক, অদ্বিতীয় ? ভিন্ন শক্তির নাম

বৈদিক দেবতাগণ ? অদ্ভুত ! অদ্ভুত !

সত্য কি এ নবধর্ম ? সত্য বিশ্বরূপ ?

সত্য না না, মানিবে না, ছর্কাসা কখন !”

আবার স্তম্ভদ্বা দেবী সঞ্চারিলা কর।।

“কি অদ্ভুত ! কি অদ্ভুত !”—বিস্ময়ে ছর্কাসা

কহিতে লাগিল—“সেই বিরাট পুরুষ

হইল কি রূপান্তর ! কিরীট-শোভিত,

শঙ্খচক্রধর, নীলকান্তি মনোহর,

রবিকর পীতাম্বর, মহাযোগীধর !

হে রাজর্ষি ! মহাদেব ! কে তুমি ? কে তুমি ?

দিবে না, দিবে না, না না, ছর্কাসা তোমায়

পশিতে ছদয়ে তার । পশিলে ছদয়ে ?

কে তুমি ? কে তুমি ? ক—ক ?”

স্বমধুর নাম

গাইলেন ভদ্রা পার্থ । স্বমধুর নাম

উচ্চারিতে ধীরে সেই বিকৃত বদন

হইল প্রশান্ত, স্থির । পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত ।

পাপমুক্ত ঋষি চলি গেলা শাস্তিধাম ।



একাদশ সর্গ ।

—*—

স্বর্গারোহণ ।

এখন ঘোবাল দিবা, নাহি যেন দিবা কর ।
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চবাচর ।
কি যেন শোকের গীত গাইতেছে পারাবার ।
কি যেন সমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার ।
শিলা-ভঙ্গ-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ অশানপ্রায়,
বিস্তীর্ণ প্রভাস-ক্ষেত্র যত দূর দেখা যায় ।
এখনো বিনীর্ণ সেই বৈবতক শূন্য-চয়
করিছে উদগীর্ণ ধূম সতত গৈরিকময়
রহিয়া রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত
করিতেছে দৈত্যবাহ ক্রোধ-বাস্প উদ্দারিত ।
এখনো উঠিছে কাঁপি রহিয়া রহিয়া ধরা,
ছন্দ রয়েছে যেন কি শোক আবেগে ভরা !
কি যেন শোকের দৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রভাস তীর,
ভাঙ্গাচ্ছন্ন ঘোর ক্লক ! ঘোর ক্লক সিদ্ধ-নীর ।
ঘোর ক্লক আবরণে হইয়াছে একাকার ।
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর ক্লক পারাবার ।
নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন জগত্তের !
যেন প্রলয়ের দিন,
জগত হইয়াছে লীন
মহাকাল-মহাবক্ষে, মহাবক্ষে প্রলয়ের ।

অগ্নিগিরি উদ্ভাসিত প্রস্তরে আহত, হত,
 অনার্থ্য পড়িয়া আছে স্থানে স্থানে শত শত ;
 নাহি হিংস্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বাঘসগণ ;
 কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোক-স্বন
 মাঝি ধূম্র ভস্ম অঙ্গে ! আহতের আৰ্ত্তনাদ
 বহিয়া বহিয়া ধীরে শোকে ত্রাসে সবিবাদ !
 কেবল স্বভজ্ঞা পার্থ, শোকে ত্রাসে অভিভূত,
 ভ্রমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাপ্লুত ।
 করি আহতের সেবা, হতে বর্ষি অশ্রুজল,
 করুণার নদ নদী ভ্রমিছেন অবিরল ।
 আর চলিল না পদ ; কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ ;
 দম্ভুখে উৎসব-ক্ষেত্র প্রভাসের,— কি শ্মশান !
 যথায় যোজন ব্যাপী ছিল শিবিরের সারি,
 আলোক-কুহুম-দামে নাট্যাশালা অহুকারি,
 দক্ষ শিবিরের দণ্ড স্থানে স্থানে চিহ্ন তার
 বহিয়াছে দাঁড়াইয়া, দক্ষ বজ্রধণ্ড আর ।
 ভস্মাবৃত, শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
 বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রগুঞ্জে আচ্ছাদিত !
 বিলাসের ভগ্ন, দক্ষ, উপকরণের রাশি
 আছে পড়ি শব সহ ; এখনো রয়েছে বাসি
 বিলাস-কুহুম-দাম বাদবের বাদবীর
 অঙ্গে অঙ্গে ভস্মাবৃত ; করে পান-পাত্র স্থির
 এখন রয়েছে কারো ; রয়েছে বিলাস বেশ-
 ভস্মাবৃত ; ভস্মাবৃত বেণীবন্ধ চাকু বেশ ।
 বহিয়াছে অঙ্গে অঙ্গে রক্তময় আভরণ
 বাদবের বাদবীর, শুক অলঙ্কার চন্দ্র ২।

পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্তকী অর্ধেক নাচে ;
 বক্ষে মৃতা প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে ।
 কেহ গদাহত, কেহ অস্ত্রাহত নিদাক্ষণ,
 কেহ বা প্রপ্তরে,—অস্ত্রে প্রকৃতির অকরণ ।
 ভ্রাতায় ভ্রাতার যুঝি, কোথা ভ্রাতৃপুত্র সহ
 আছে পড়ি দুই জন ; কোথা দৃশ্য শোকাবহ,—
 দুই দ্বন্দ্বী মধ্যে আসি পত্নী, পুত্রী, ভগ্নী বলে
 নিবারিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, পড়িয়াছে মধ্যস্থলে ।
 দুই দিকে দুই কর রহিয়াছে প্রসারিত ;
 কি করুণা, কাতরতা রয়েছে মুখে অঙ্কিত ।
 নিমিষে নিরখি দৃশ্য,—উর্দ্ধমুখে অশ্রুজলে,
 করঘোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতলে
 জানু পাতি। ভদ্রা দেবী,—হৃদয়ে শান্তির ধাম,—
 দাঁড়াইলা করঘোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম
 অক্ষুট জীবৎ ধীরে কাঁপিতেছে স্তম্ভধর,
 উর্দ্ধমুখ শাস্তিময়, স্থিরনেত্র ইন্দীবর ।
 রহিলেন দুই জন মূরছিত যোগস্থিত
 মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিকলিত ।
 মহাশোকে অর্জুনের করুণার পারাবার
 উদ্বেলিত, অশ্রুধারা বহিতেছে অনিবার ।
 হৃদয়োর মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে
 হইল বিলীন, নেত্র ছল ছল প্রেম-নীরে ।
 কিছুকণ পরে উঠি কহিলেন ধনঞ্জয়—
 “এ কি লীলা হরি । তুমি প্রেমময় দয়াময় ।
 দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার ;
 স্রুজ সরোবর, এব নহে যোগ্য তুলনার ।

কুরুক্ষেত্র বীর-ক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম ।
 প্রভাস উৎসব-ক্ষেত্র,— তার এই পরিণাম ।
 কুরুক্ষেত্রে এই রূপে বিকট মৃত্যু, বিলাস,
 করে নাই নিরময় পরস্পরে উপহাস ।
 একপে অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল ।
 একপে অমোদ-সুখা হয় নাই অশ্রুজল ।
 এই রূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার ।
 প্রমোদ নিকুঞ্জ বন হয় নাহি পুরাবাস ।
 পড়েছিল বীরগণ মহা মহীকহ যথা ;
 ছিল না একপে তাহে জড়িতা রমণী লতা ;
 বসন্ত বাহারে তথা উঠেনি দীপক বাগ ।
 ছিল না কুমুম বনে লুকাইয়া তীব্র নাপ ।
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র ; এ ক্ষেত্র আশ্রয়ভার ;
 কুরুক্ষেত্রে বীণা ক্রীড়া ; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া সুরার ।
 মানব, প্রকৃতি, মিলি কহিয়াছে কি ভীষণ
 দাবদহ, অসজ্জিত সুরমা প্রমোদ বন !
 কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্ম্ম রাজ্য লক্ষ্য তার ;
 হরি ! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার ?
 কেবল কহিলা দেবী—“কর্ম্মফল ! কর্ম্মফল !
 এত দিনে ধর্ম্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল !”
 কিন্তু কই, কক্ষ কই ? ছুটিলেন হইজন
 দেখিলেন সম্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম ।
 একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলায়,
 পড়েনি এখনি ভষ্ম,— বেলা-ভূমি পরিহার ।
 শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলকুলরাশি,
 শোকেয় গুণানে যেন শান্তির শীতল হাসি ।

বুঝিলেন হুই জনে দারুক, শৈল, কেশব,
এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এ বিপ্লব ।
সাত্তীক্ষে প্রণত ভূমে হইলেন হুই জন,
পাইলেন শোকে শাস্তি পাতি বন্ধ অনুক্ষণ ।

মহামরুদত্ত বৃকে কি ঘেন তুবার জল
প্রবেশিল, দক্ষ প্রাণ করি শাস্ত স্মৃতিতল ।
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার,
মাখিয়া ললাট বন্ধে পূজ্য পদবজ আর,
চলিলেন হুই জন উর্দ্ধ্বাসে বহুদূর,—
ও কে ! জননীর অঙ্কে যেন শিশু, তৃষাতুর !

একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ
করিতেছে ছটকট, ভূতলে রাখিয়া বুক ।
কখন উঠিয়া চাহি শূত্র পানে আশ্রহার্য
ছুটিছে উন্মাদ মত, ছনয়নে অশ্রুধারা ।

“শৈলজ্ঞে ! শৈলজ্ঞে !”—পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত
ছুটিলেন, লইলেন স্বদয়েতে উদ্বেলিত
শৈলজ্ঞায় ; কহিলেন নেত্রের প্রশ্ন হল হল—

“কোথায় আছেন কৃষ্ণ ? আছেন কুশলে বল ?”

দাঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূত্র পানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কাণে,
কহিলা আকুল কান্দি,—“আহা কি মধুর নাম ।

কে শুনা’ল জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ ?

গাও নাম আরবার । গাও নাম শতবার ।

সহস্র সহস্র বার । গাও নাম, গাও আর ।

গাও নাম পারাবার । গাও নাম সমীরণ ।

গাও নাম চক্রে সূর্য্য । গাও গ্রহ অগণন ।

এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
 এমন ত্রিতাপহর, শীতল শান্তির ধাম,
 নাহি মর্ত্যে, নাহি স্বর্গে । এমন মধুর নাম,
 গাও মুখ ! গাও চোক ! গাও অঙ্গ ! গাও প্রাণ !
 গাও মুখ মধুস্বরে ! গাও চোক অবিরাম
 বরষিয়া প্রেমধারা ! নামামৃত করি পান,
 গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষণ প্রাণ !
 নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে নেচে গাও নাম !

হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! হরে !
 হরে ! রাম ! হরে ! রাম ! রাম ! রাম ! হরে ! হরে !^{১০}

ছই বাহু উর্দ্ধে তুলি, দিয়া তালি অবিরাম,
 নাচিতেছে নাগরাজ গাইয়া গাইয়া নাম
 পাগল শিশুর মত, বহিয়া নয়নধারা
 ভিজিতেছে বক্ষ, বেলা,—নাগরাজ আত্মহারা ।
 প্রেমানন্দে চিত্ত যেন হইয়াছে প্রপূরিত ;
 বহিতেছে অনিবার নেত্র পথে উদ্বেলিত ।
 সেই নৃত্যে, সে আনন্দে, স্তম্ভিতা ও ধনঞ্জয়
 ভুলিলেন আত্মশোক, হইলেন তনুময় ।

সেই প্রেম ! সে আনন্দ ! সেই গীত ! সে নর্তন !
 হইতেছে বাহুকির শ্বেদ কম্প ঘন ঘন ।
 মহাভাবে যোযাফিত হইয়া দেহ অধীর
 পড়িতে, আপন অঙ্গে ভজা লইলেন শির ।
 মহাভাবে ভজা, পার্শ্ব, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন
 রহিলেন কিছু ক্ষণ, আত্মপ্রেমানন্দে লীন ।
 মহাশোক-স্রোতস্বতী ধনঞ্জয় স্তম্ভিতার
 হইল বিলীন, পশি প্রেমানন্দ পারাবার ।

ধীরে ধীরে বাহুকির উপজিলে বাহু জ্ঞান,
 কহিল শৈলজা—“দাদা ! পূর্ণ তব মনকাম
 যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
 চেয়ে দেখ তব শির অঙ্কে সেই স্তম্ভদার ।
 যেই পার্শ্ব শত্রু তব, দেখ পদতলে বসি
 সেবিচ্ছেন পদ তব ! কি প্রেমে কি অশ্রু খসি
 পড়িতেছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার !
 হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার !
 জলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায়
 কর পান সেই প্রেম অজস্র সুখ-ধারায় !
 পতিতপাবনী শায়া এই রাতা জাহ্নবীর,
 জুড়াইবে প্রাণ তব, জুড়ায়েছে পাপিনীর ।”
 “স্তম্ভদা ! স্তম্ভদা ! পার্থ ।”—নাগরাজ সবিষ্ময়
 উঠিয়া রহিল চাহি মূর্তিবৎ, প্রীতিময় ।
 “স্তম্ভদা ।—জীবন স্বপ্ন ! স্তম্ভদা ! পিপাসা মম !
 একটি চরণ-রেণু ভাবিতাম স্বর্গ সম ।
 আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্বস্ব ধন,—
 তাঁর অঙ্কে মম শির, আমি পাপী নরাদম ।
 হায় মা ! একটা জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
 পুজিয়াছি পত্নীতাবে, চেয়েছি হরিতে বলে ।
 করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত ;
 কোরব বাদব যজ্ঞে করিয়াছি কর্কশিত
 এই কর, এই আত্মা,—সকলি লীলা তাঁহার !
 আজি কোথা সে স্তম্ভদা ? সে বাহুকি কোথা আর ?
 স্বপন ! স্বপন সব ।—বিকট-স্বপন ঘোর !
 সেই ঘোর অযাযস্তা আজি হইয়াছে ভোর ।

আজি সেই পদ্বীভাব মনে নাহি পড়ে আর ;
 আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার !
 কত প্রেম সুখে তোর, কত প্রেম অন্ধে, বুকে !
 সে অন্ধে শিশুর মত বাহুকি ঘুমায়ে সুখে ।
 বাহুকি আবার অন্ধে রাখি শিশুমত শির
 কাঁদিতেছে ভিজিতেছে অন্ধ বরি অশ্রুনার ।
 “তুই মম কারু আজি ; তুই মম শৈল আর ;
 তুই মম মার্তা, পিতা, তুই মা ! কৃষ্ণ আমার !”
 উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হ’ল পুনঃ ভাবাবেশ,
 বাহুকি কহিল উঠি,—“মরি ! কি মধুর বেশ !”
 চাহি স্নহদ্বার পানে—“কি মোহন চূড়া শিরে
 কাঁপিতেছে শিশিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে ধীরে
 কেশে কুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীতধ্বজা ।
 কি ত্রিভঙ্গ মৌলিকান্তি, অতরল স্রধা ভরা ।
 কি মোহন পী-গাঘর ! গলে কিবা বনমালা !
 চন্দন-চাঁচিওত বুক কি প্রেমের নাট্যশালা !
 শ্রীঅঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাত রাশি
 করপদ্মে বিদ্বাধবে শোভে কি মোহন বাঁশী ।
 বাজিতেছে কি মধুরে ! ডাকিতেছে—‘আয় ! আয়
 এই বাই, এই বাই !’—ভাবাবেশে পুনঃ বায়
 পড়িলা ভদ্রার অন্ধে প্রেমানন্দে মূরছিত ।
 হইলেন চারি জন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত ।
 গাইলেন তিন জন,—প্রেমে পুলকিত প্রাণ,—
 আত্মহারা চাহি শূন্য, লীলাময় কৃষ্ণনাম ।
 বাহুকি মেলিলে নেত্র শুনিতে শুনিতে নাম,
 কহিলেন ধনঞ্জয়—“নাগেন্দ্র ! আকুল প্রাণ,

কোথা কৃষ্ণ ? কহ, তুমি পেয়েছ কি দেখা তাঁর ?

কোথায় আছেন তিনি ? পাইব কি হয় ! আর

হৃদয়ে সে পদাঙ্ক ? দেখিব নয়ন ভরি

নয়-নারায়ণ রূপ, কহ দাসে দয়া করি ।”

“কোথা কৃষ্ণ ?” নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহারা

পার্শ্বে আলিঙ্গিয়া কহে বিষ্কারি নয়নতারা—

“কোথা কৃষ্ণ ?” উচ্চ হাসি বাহ্যিকি উষ্ণ হাসি,

সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমজ্বালাশি !

“কোথা কৃষ্ণ ?—বেথিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয় ?

বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময় !

কৃষ্ণ চক্রে, কৃষ্ণ স্বর্গে, কৃষ্ণ গ্রাহে উপগ্রহে ।

অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে ।

যেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ;

কৃষ্ণ ভীম ভূম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায় ।

কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল জ্যোৎস্নায় ;

কৃষ্ণ, সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধারায় ।

কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,

কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে ।

বিলাস শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে ।

প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র বহিষণে ।

কৃষ্ণ শাদ্দুলের দণ্ডে, কৃষ্ণ নারীবিন্ধ্যধরে ।

শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সঙ্গীতস্বরে ।

কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে ।

কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ শ্রবণে ।

কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম এ অধরে ।

কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে ।

কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায় ।
 কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায় !”
 বক্ষের সে অজ্ঞকৃত উত্তেজিত বিস্ফারিত
 হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত ।
 রক্তজবা হ’তে যেন রক্ত চন্দনের ধারা
 ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে ; বাহুকের নেত্র-তারা
 আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রুতে স্নানিতল,
 বিষ্ণু-পদে উপজিল যেন জাহ্নবীর জল
 “কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় ?” করি অসি নিক্ষেপিত,
 কহিল নাগেন্দ্র পুনঃ—“কর বক্ষ বিদারিত !
 দেখিব আমার সেই ননীচোরা নীলমণি ;
 পুনি তাহে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীরননী ।
 কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তুহুখানি !
 আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি !
 শ্রীদাম স্বদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে !
 ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে !
 কুঞ্জে কুঞ্জে জ্যোৎস্নায় বাজে কি মধুর বাঁশী !
 কি প্রেম-যমুনা বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি
 ওই তন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—‘আয় ! আয় !’
 এই যাই, এই যাই ।”—প্রেমে রোমাঙ্কিত কান
 ছুটিলা বাহুকি বেগে নাচি করতালি দিমা,
 ধরিলেন ধনঞ্জয় ছই বাহু প্রসারিয়া ।
 “যাক মান, যাক কুল ! ছেড়ে দেও ! ছেড়ে দেও !
 জীবন যৌবন নাথ ! নেও তুমি, সব নেও !”
 কাদিতে কাদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত
 হইলা পার্থের বক্ষে,—ছই বক্ষ সম্মিলিত

কি শঙ্কর, কি কঠোর । কিবা প্রেমানলে গলি
মিলিল, মিশিল যেন রবির কিরণে অলি
মিলিল, মিশিল স্নিগ্ধ ছুখানি কোমল ননী ;
চন্দ্র-করে যেন ছুটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি ।
হুই দিক হ'তে আসি হুই নদ বিপরীত,
মিলিল মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত ।
অৰ্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাসুকির ।
বাসুকির অংসোপরে অৰ্জুনের মুগ্ধ শির ।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গনে
স্থির হুই বীরমূর্তি, ধারা বহে হৃ-নয়নে ।
নিৰ্ব্বাপিত অগ্নি-গিরি-শেখর হ'তে লীতল
যেন নিৰ্ব্বরিণী ধারা বহিতেছে অবিরল ।

"চেয়ে দেখ মা আমার !" — কহে শৈল মুগ্ধমন—
'আর্য্য অনার্য্যের আজি চির-প্রেম-সন্মিলন !
কি শোকের মরুভূমে,— কে লীলা বুঝিবে তাঁর ?—
উথলিল স্তম্ভীতল কি প্রেমের পারাবার !
পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম,—
ধরাতলে ধর্ম্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন !
আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা ! হৃদয়ে আয় ।
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায় ।"
মুচ্ছিতা হইয়া শৈল পড়িলা ভদ্রার বুকে,
মুচ্ছিতা স্তম্ভিতা, বলি বুকে বুকে মুখে মুখে !
আর্য্য অনার্য্যের বীৰ্য্য, আর্য্য অনার্য্যের শক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের প্রেম, আর্য্য অনার্য্যের ভক্তি,
আর্য্য অনার্য্যের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর্য্য অনার্য্যের,
এত দূরে—এইরূপে—মিশি মহাভারতের

সঞ্চারিল নবযুগ । নবযুগ-ইতিহাস
 এইরূপে, এত দূরে,—মানব-অদৃষ্টাকাশ
 করিয়া অলোক পূর্ণ,—খুলিল মহিমাবিত,
 ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ-স্থাপিত ।
 ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগানি, কত্রিয়-অধর্ম্ম আর,
 অনার্য্যের সংঘর্ষণ, কাঁপাবে না ভিত্তি তার ।
 আৰ্য্য অনার্য্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত,
 গঙ্গা যমুনার মত, কিছু দূর প্রবাহিত
 হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে পূর্ণ মিশ্রিত,
 করিবে ভারতভূমি শাস্তি-ধারি বিপ্লাবিত
 সহস্র সহস্র বর্ষ । সে শাস্তি-প্লাবিত তটে
 ফলিবে কতই বহু, নীল নৈশাকাশ পটে
 অনন্ত নক্ষত্র মত । কত কীর্ত্তি অতুলিত,
 অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাই প্রতিষ্ঠিত,
 অসংখ্য মৈনাক মত । মহাকাল-পারাবার
 গাইবে সে কীর্ত্তি গীত, প্রণমিবে অনিবার ।

ভাঙ্গিল-আনন্দ স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চারি,
 জিজ্ঞাসিল ধনজয় মুছিয়া নয়ন-বারি
 আপনার—“নাগরাজ ! কর আত্ম-সম্বরণ ।
 কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ ?
 দেখিতে সে পদাঙ্ক বড়ই আকুল প্রাণ ।
 কোথায় আছেন হরি ? দেখেছ কি ভগবান ?”
 “দেখেছি”—বারুকি ধীরে উত্তরিলা শান্ত, স্থির,
 বহিতে লাগিল পুনঃ চনয়নে প্রেম-নীর ।
 “দেখেছি, কিরীট । আমি দেখেছি নয়ন ভরি
 দীনবন্ধু রূপাসিদ্ধ, পতিতপাবন হরি ।

মধু মরু দেখে যথা নিদাঘের নবঘন,
 দেখিয়াছি আমি সেই নররূপী নারায়ণ ।
 এই শিলাসনে বসি এই নিম্ববৃক্ষতলা,
 অন্ধে বৃক্ষ কারু মম, প্রেমে জড়াইয়া গলা ।
 বড় পুণ্যবতী কারু । কি প্রেম-মুরতি খানি !
 সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোণে পাব পাপী আমি !
 মহাশত্রু !—নাগপতি কাদিতেছে শিশু সম—
 “যাদব শোণিতে সত্ত্ব কলুষিত কর মম !
 তথাপি কি ক্ষমা, দয়া ! কহিলেন—‘এস ভাই !
 এস বন্ধে !—লীলা শেষ,—শান্তিধামে চল যাই !’
 পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বন্ধে,
 কি প্রেম নয়নে চাহি, কি, ধারা বহিছে চক্ষে !
 কি ত্রিদিব সেই বন্ধ ! মরু বন্ধে কি অমৃত
 ফরিল অজস্র ! প্রাণ হইল কি পবিত্রিত,
 শীতলিত, কি জ্বাৰিত ! পাষণ হইয়া জল
 বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে স্থগীতল !
 হইলাম মূৰ্ছিত, দেখিলাম ধবাতল
 শত চক্ৰালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জল ।
 কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর,
 উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধ কর !
 কি সুন্দর পুষ্পরথ ! রথ-শিরে সুদর্শন
 কিবা চক্রে সমুজ্জল ! শুভ-শিরে সুকেতন,
 সুদর্শন চক্ৰাকিত, উড়িতেছে কি লীলায় !
 কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায় !
 যথেষ্ট বসি নারায়ণ, অন্ধে কারু বসি স্নেহে
 গলা জড়াইয়া প্রেমে, বৃকে বৃকে মুখে মুখে

পরশিয়া ভাবাবেশে ; ভাবাবেশে চরাচর
 গাইতেছে হরিনাম,—চরাচর কি সুন্দর !
 গাইতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর ।
 গাইতেছে অন্তরীক্ষ, গাইতেছে হরপুর ।
 ভাবাবেশে দেবদাসী নাচিয়া গাইয়া নাম,
 বসিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুগ্ধপ্রাণ ।
 তরঙ্গে তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গে নাম,
 প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে গ্রহে অবিরাম ।
 সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নাম তরঙ্গে আর,
 ভাসিয়া উঠিছে বধ ;—বিশ্ব শাস্তি-পারাবার ।
 আমি রহিলাম পড়ি, হায় ! মহাপাপী আমি !
 যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি ।
 না না নাথ ! জান তুমি, তুমি ত অন্তরবাসী,
 আমি বনপশু হীন, নহে আততায়ী আমি ।
 প্রকৃতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ,
 যাদব-শরিরে পশি করেছি সম্মুখ বণ ।
 একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তাঘাত,—
 আমি কবি নাই গুপ্ত এক বিন্দু রক্তপাত ।
 'এই দেশ অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্র-লেখা বাসুকির !
 বাসুকি তুর্কাসা নহে, বাসুকি অনার্য্য বীর ।
 তুমি বাসুকিরে নাথ ! করিয়াছ আলিঙ্গন
 কত দয়া ! কত প্রেম । নরহরি ! নারায়ণ !'
 আরবার বাসুকির হইতেছে ভাবাবেশ,
 কাপিতেছে দেহ, নেত্র হইতেছে নির্নিমেষ ।
 পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর,
 হইতেছে স্বেদোদগম, জনমনে দর দর ।

বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে
 হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে ।
 বাহুকি আবিষ্ট কণ্ঠে কহে—“দেখ কি সুন্দর !
 কি সুন্দর বৃন্দাবন ! কি কদম্ব মনোহর !
 কি জ্যোৎস্না ! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি !
 কি পুষ্প-সৌরভ ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশী ।
 কি প্রেমমুরতি শিশু, কি প্রেম-নয়নধারা !
 গলা জড়াইয়া কারু প্রেমময়ী আত্মহারা !
 ওই বাজিতেছে বাঁশী কি মধুরে—‘আয় ! আয় !’
 এই যাই, এই যাই ।”—বাহুকি ছুটিয়া যায়
 ছই বাহ প্রসারিয়া ; মহাভাবে প্রেমভরে
 পড়িতে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্ৰকরে ।
 রাখিলেন সুভদ্রার অঙ্কে শ্লথ মুগ্ধ শির ;
 বসিলেন শৈল, পার্থ, পদতলে বাহুকির
 লয়ে বক্ষে পদতীর্থ । ভাবাবিষ্ট তিন জন
 রহিলেন চাহি শূন্তে সেই প্রেম-বৃন্দাবন ।
 প্রেমাত্ম নয়নে, প্রেম আননে চিত্ত অচল,
 গুনিলেন সেই বাঁশী, সেই যমুনার জল ।
 সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে ওইয়া আনন্দ মনে
 মহাভাবে গেলা চলি বাহুকি সে বৃন্দাবনে ।
 কাঁপিল বৃক্ষা যেন মহাভাবে বিকম্পিত ;
 গরজিল সিদ্ধ যেন মহাভাবে উজ্জ্বলিত ।
 ঘোরাল প্রকৃতি মূর্তি ; দিনে নাহি দিবাকর ;
 হাভাবে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব দ্রাচর ।

দ্বাদশ সর্গ ।

—*—

কর্মফল ।

রৈবতক যোগশৃঙ্গে, বিটপি-ছায়ায়,
 বসিয়া মহর্ষি ব্যাস অজিন আসনে ।
 বসি চারিদিকে ধ্যান-মগ্ন ঋষি প্রায়
 কুরঙ্গ, শশক, মেঘ শর্দুলের সনে ।
 অপরাহ্ন শেষ । মহা আকাশ মণ্ডল
 উপরে হনীল শান্ত ;— শান্তি-নিকেতন
 যেন নারায়ণ বক্ষ যোগে অবিচল,
 আবরি হিরণ্যগর্ভে অনন্ত ভুবন ।
 নিরে প্রভাসের সিন্ধু হনীল উজ্জল,
 অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে খেত পুষ্পাবৃত ;—
 যেন নারায়ণ বক্ষ লীলায় চঞ্চল,
 প্রেমে উজ্জ্বলিত, খেত চন্দনে চর্চিত ।
 কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি হৃন্দব
 বিরাজিছে বহুধার বক্ষে হুশ্রামল !
 কি ঘোর বিপ্লব পরে কি শান্তি হৃন্দব
 বিরাজিছে মহাবির বক্ষে হুশীতল !—
 দেখিলেন ধনঞ্জয়, অজিন আসনে
 বসি মহর্ষির পার্শ্বে শোকে উদ্বেলিত ;
 কি যেন শৈবিক বৃষ্টি, ভীষ ভূকম্পনে,
 করেছে হৃদয় রাজ্য ঘোর বিপ্লাবিত ।

কহিলেন সব্যসাচী—“হায় ! দেব ! আমি
 দেখিয়াছি দ্বারবতী ;—সে অমরাবতী
 করেছিল অনাথার হাহাকার বাণী,
 অনাথার অশ্রুধারা, কি যে স্রোতস্বতী !
 উৎসবের নাট্যালয়ে মধ্য অভিনয়ে
 গিয়াছে চলিয়া যেন অভিনেতাগণ ;
 সজ্জিত আলোকে ফুলে সেই বঙ্গালয়ে
 অনাথা রমণী শিশু করিছে ক্রন্দন !
 দেখিলাম বজ্রসম কঠিন হৃদয়ে
 সে শোকের সতীত্বের স্বর্গপুণ্যময় !
 করি বজ্রাঘাত সেই পুরে নিরদয়
 কহিলাম—‘তিরোহিত হবি লীলাময় !’
 কহিলাম—‘সত্যভামা ! করেতে তোমার
 করেছেন সমর্পণ নর-নারায়ণ
 ধ্বংস-শেষ কুলভার, শিশু অনাথার ।
 লও এই ভার—শোক কর স্মরণ !
 সপ্ত দিবানিশি পবে এই লীলাভূমি
 দ্বারবতী সিন্ধুগর্ভে হবে নিমজ্জিত,—
 বলেছেন লীলাময় । পুণ্যবতী তুমি
 চল ইজ্ঞাপ্রস্থে, শোক কর তিরোহিত !’
 কি আলোকে কল্পিণীর উঠিল ভাসিয়া
 নিরুপম সেই রূপ ! কি হাসি অধরে
 ঈষৎ—ঈষৎ—শান্ত ! উঠিল হাসিয়া
 অরুণ গোলাপে সিন্ধু শিশির নীকরে ।
 কি আনন্দ হৃদয়েনে প্রেম ছিল ছিল !
 পতিপ্রাণা নববধূ প্রেম আবাহন

শুনেছে পতির যেন । অঙ্গ ঢল ঢল
 অহুবাগে, অহুবাগে প্রফুল্ল বদন ।
 আবেশে অবশ দেবী গলা জড়াইয়া
 পড়িলেন সপত্নীর বক্ষে স্বর্গোপম ।
 সেই হাসি, সে আনন্দ, রহিল ভাসিয়া
 চিত্রে যেন ; ধীরে দেবী মুদ্রিলা নয়ন ।
 পূর্ণিমা নিশান্তে চক্রে জ্যোৎস্না যেমন,
 মিশাইল পতিপদে সতীর জীবন ।
 সুপ্ত আনন্দের মূর্তি পর্ষ্যক্ষে রাখিয়া
 পাদপদ্ম নিজশিরে করিয়া গ্রহণ,
 সত্যভামা মহাশোকে কহিলা কাঁদিয়া,
 —আনন্দের পদতলে শোকেয় জন্মন,—
 ‘তুইও দিদি ! পাপিনীরে করি বিসর্জন
 এই শোক দাবানলে, গেলি চলি হায় !
 কর আশীর্বাদ । আজ্ঞা পালি নিরমম
 ছজনার পাদপদ্ম দাসী যেন পায় ।’
 পতি দেব, পত্নী দেবী,”—শোকে ফাস্তনির
 কুরুকণ্ঠ, হনয়নে বহিতেছে নীর ।
 প্রেমে শোকে ছল ছল নেত্র মহর্ষির ;
 চাহি জলধির পানে চারি নেত্র স্থির ।
 “মানব পাণ্ডবানল, ভীষণ শ্মশান,
 দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্রে ;”—কহিলা অর্জুন —
 “দেখিয়াছি হায় । দেব । প্রভাসে আবার
 পৃথিবী গগনব্যাপী সেই চিতাশুন !
 দেখিয়াছি আরবার ক্ষত্রিয়া রমণী,
 —মাথায় মঙ্গলঘট সবারি পল্লব,—

গাইয়া মঙ্গলগীত, বিদ্যাৎবরণী
 আরোহিতে সেই চিতা"—আবার নীরব
 হইলেন মহেশ্বাস ; কহিলা কাঁদিয়া,
 না পারি রাখিতে চাপি হৃদয়-উজ্জ্বাস—
 "কহ দেব । এইরূপে নিশ্চয় হইয়া
 কেন করিলেন হরি স্বকুল বিনাশ ?"
 ব্যাস : স্মরি সেই মহাগীতা, মহাগীতাকার,
 অর্জুন । সম্বর শোক । জান ভগবান
 এক, অদ্বিতীয়, সত্য ; বিশ্ববীজাধার ;
 অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ; অব্যক্ত মহান ।
 সচ্চিদানন্দের মহা আনন্দ উজ্জ্বাসে
 ছুটে মহাবিবর্তন প্রবাহ যখন,—
 অব্যক্তির মহাব্যক্তি, আলোক বিকাশ
 বিদ্যাভেদ,—হয় ব্যক্ত বিশ্বের কারণ ।
 ক্রমে স্থল বিশ্ব, ক্রমে বিশ্ব স্থূলতর—
 গ্রহ, উপগ্রহ, জীব,—হয় বিবর্তিত ।
 ক্রমে স্থূল স্থল, স্থল কারণে অমর,
 কারণ সচ্চিদানন্দে, হয় নিবর্তিত ।
 তিনি বিশ্বরূপ ;—তিনি কারণে ঈশ্বর ;
 স্থলোতে হিরণ্যগর্ভ ; বিরাট আবার
 স্থূল বিধে । সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিরন্তর
 হইতেছে বিবর্তনে দেখ চক্রাকার !
 দেখ ওই পঁচাবার । শাস্ত্রভাব তার
 অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাব ভগবান
 মহাত্মাত,—বিবর্তন ; এ বিশ্ব সংসার,—
 উর্নিমালা ; জীব,—জলবিষ কয় জান ।

সিদ্ধগর্ভে প্রোতোবলে তরঙ্গ ফেনিল
 জন্মি, জন্মি জলবিষ যথা অগণন,
 মিশাইছে সিদ্ধগর্ভে,—সলিলে সলিলে ;
 সিদ্ধুর সলিল, শক্তি, থাকিছে তেমন।
 তেমতি হিরণ্যগর্ভে—অব্যয়, অক্ষয়,—
 বিবর্তন কারণে প্রবাহে জন্মিয়া,
 অনন্ত জগত হুল,—তরঙ্গ নিচয়,—
 আবার হিরণ্যগর্ভে বাইছে মিশিয়া
 কলে কলে মহাচক্রে, জন্মে জন্মে আর
 জীবগণ বিবর্তন চক্রে, ক্ষুদ্রতম ;
 কালাবস্তে এককন্মী, এক কৰ্ম্ম অঁর,
 এক মহাকৰ্ম্ম নীতি,—নীতি-বিবর্তন।
 এই মহাকৰ্ম্মচক্রে, আছে নিয়োজিত
 জড় চেতনের কৰ্ম্ম-চক্র ক্ষুদ্রতর ;
 কৰ্ম্মফলে জীবগণ হইয়া চালিত
 হয় আবর্তিত চক্রে জন্মজন্মান্তর।
 কৰ্ম্মফলে জন্ম, পার্থ ! মৃত্যু কৰ্ম্মফল ;
 কৰ্ম্মফল সুখ দুঃখ। করিবে যোগণ
 যেইরূপ বীজ, পাবে অমুরূপ ফল ;
 কুব্ধে অফল নাহি কলিবে কখন।
 জন্মিয়া সচ্চিদানন্দে, স্বজি চরাচর,
 ছুটেছে সচ্চিদানন্দে চক্রে বিবর্তন।
 সেই সং চিত্তানন্দে গতি নিরন্তর,
 জড় চেতনের মহাকৰ্ম্ম সনাতন।
 কর কৰ্ম্ম, এই গতি করি অমুসার,—
 পাবে জন্ম, পাবে লোক, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতর।

কর কর্ম, এই গতি প্রতিকূলে আর,—
 পশুত্ব—জড়ত্ব—পাবে জন্মজন্মান্তর ।
 দেখে বিবর্তন গর্ভে করে আকর্ষণ
 জীব জীব, জলে জল । হইবে অঙ্কিত
 কর্মফলে যে প্রকৃতি আত্মায় যখন,
 সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মা হবে আকর্ষিত
 জন্মান্তরে । কর উর্দ্ধে ইষ্টক ক্ষেপণ,
 পৃথিবীর আকর্ষণ হইলে অতীত,
 পড়িবে না ; সেই গ্রহে করিবে গমন,
 সেই গ্রহ আকর্ষণে হইবে পতিত ।
 থাকে পশু আকর্ষণ, প্রকৃতি জড়ের,
 পশুত্বে জড়ত্বে তব হইবে জনম !
 থাকে দেব আকর্ষণ, প্রকৃতি দেবের,
 দেবলোকে, শ্রেষ্ঠলোকে, করিবে গমন ।
 এইরূপে লভি গতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর,
 হইলে জীবাত্মা সৎচিদানন্দময়,
 মশাইবে রবিকরে বর্ণহীন কর,
 হবে বিশ্ববারি মহাপারাবারে লয় ।
 একরূপে সচ্চিদানন্দে স্থষ্ট বিবর্তনে,
 একরূপে সচ্চিদানন্দে স্থিত চরাচর ;
 একরূপে সচ্চিদানন্দে লয় বিবর্তনে
 হইতেছে চরাচর কলকলান্তর ।
 কেন এই বিবর্তন ? কেন এ সংসার ?—
 তাঁর মায়া, তাঁর ছায়া, প্রকৃতি তাহার ।
 এই বিবর্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
 অনুকূলে প্রতিকূলে কর্ম অনুসারে

ধর্ম্যধর্ম্য পাপপুণ্য । এই কর্মকল
 জন্ম মৃত্যু মানবের, স্থখ হঃস্থ আর ।
 কেন প্রতিকূল কর্ম করি আমি নর ?—
 চেতন্ত্বের বিশ্ব আমি । আমি ইচ্ছাময় !
 চেতনের চেতনত্ব করিছে নির্ভর
 এ ইচ্ছার স্বাধীনত্বে জান ধনজয় !
 এই বিবর্তন গতি,—জগত মঙ্গল,—
 কত প্রতিরোধ, হও অধর্ম্মে পতিত,
 বিবর্তন মহাশক্তি দিয়া কর্মকল
 যাইবে বহিয়া করি তোমায় পেষিত ।
 অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখ কি ভীষণ
 সেই কুরুক্ষেত্রে, এই প্রভাসে আবার ।
 ক্ষত্রিয়ের কর্মকল হয় । নিয়মম
 কুরুক্ষেত্রে, এ প্রভাসে যাদবের আর ।
 ছুটিয়াছে বিবর্তন,—মানব মঙ্গল,—
 উড়াইয়া তৃণবৎ মত্ত ঐরাবত—
 অধর্ম্মী ক্ষত্রিয় জাতি ! কি শাস্তি শীতল
 ধর্ম্মরাজ্য ছায়াতলে লভিছে ভারত !

অর্জুন । কিহু কর্মকল-রেখা করিতে মোচন
 নাহি কি পাবেন হরি পতিতপাবন ?

ব্যাস । পাবেন—পতিত যদি আশ্রয় সমর্পণ
 করে পাপপন্থে তাঁর, পাণ্ডব যেমন ।
 পতিতের পাপকর্মে প্রবৃত্তি তখন
 থাকে না রূপায় তাঁর । পুণ্যকর্মকলে
 পাপকর্মকল-রেখা হয় বিমোচন,
 অজ্ঞানের রেখা যথা নিয়মল জলে ।

জন্মাক দেখে না চন্দ্র । কর্মাক তেমন
 দেখে না বিশ্বের কুপাময় সুধাকর !
 দেখিল না কত্ৰিধেরা ; আপন স্বজন
 দেখিল না যাদবেরা, কর্মাক পামর ।
 এইরূপ কর্মাকেরে না কর সংহার,
 আপনার কর্মপথ, কর্মপথ আর
 মানবের, করিবে সে কণ্টক-আধার ;—
 প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র কুপা পারাবার !
 রাজহয়ে ধর্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত
 ছিল কত দিন বল ? কত দিন বল
 — থাকিতে কত্ৰিধজাতি, যাদব পতিত—
 থাকিত এ অট্টালিকা বালতে চঞ্চল ?
 কুরুক্ষেত্রে ধর্মরাজ্য হইয়া স্থাপিত,
 হয়েছিল যাদবের পাপে সচঞ্চল
 ভিত্তিমূল । হইয়াছে প্রস্তরে প্রোথিত
 সেই ভিত্তি ;—গাও, পার্থ । মানব মঙ্গল !
 দেখিয়াছি, প্রভু, আরো দৃশ্য ঘোরতর ।
 আসিলাম কুরুক্ষেত্রে দারবতী ছাড়ি
 যবে নাগরিক সহ, কি যে ভয়ঙ্কর
 ভূমিকম্পে, জলকম্পে সমুদ্রের বারি
 প্রাবিল সে মহাপুরী তরঙ্গে ভীষণ,
 বালকের ক্রীড়াপুরী যেন ভীর্ণহিত ।
 সিদ্ধান্তে, ধরাগর্ভে, কি ঘোর গর্জন !
 হইল মুহূর্তে সেই পুরী অন্তর্হিত ।
 সেই মহা সাম্রাজ্যের চিহ্ন নাহি আর ।
 চিহ্ন মাত্র নাহি দেব । সে মহালীলার ।

অজুন ।

ব্যাস । তাঁহার সাম্রাজ্য পার্থ । লীলাস্থল নয়
 ক্ষুদ্র দ্বারবতী, নহে ক্ষুদ্র বৃন্দাবন ।
 তাঁর রাজ্য, লীলাস্থল, মানব-হৃদয় ।
 তাঁর রাজ্য বিশ্বরাজ্য ; তিনি নারায়ণ ।
 তাঁর রাজ্য, ধর্মরাজ্য ;—করিতে প্রাবিত
 নাহি সাধ্য সমুদ্রের । কাল-পারাবার
 চুম্বিয়া চরণ তট হবে প্রবাহিত,
 লইয়া চরণরেণু মন্তকে তাহার ।
 কোরবের রাজ্য, আর রাজ্য যদবের,
 বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্থ, দ্বারকা, হস্তিনা,
 কেবল নিমিত্ত মাত্র ধর্ম সাম্রাজ্যের
 অঙ্কিত নির্মাণপথে,—অপূর্ব মহিমা
 মানব হইত ভ্রাস্ত এ রাজ্য পার্থিব
 থাকিলে পৃথিবীবক্ষে ; পশ্চাতে তাহার
 দেখিত না অন্ধ নর সে রাজ্য ত্রিদিব ;
 দেখিত না লীলাময় যুগ-অবতার ।
 নাহি সেই বৃন্দাবন ; নাহি দ্বারবতী ;
 রহিবে না ইন্দ্রপ্রস্থ ; রবে না হস্তিনা ।
 রবে সেই রাজ্য, রবে সে অমরাবতী ।
 ব্যাপিবে অনন্তকাল সে রাজ্য-মহিমা ।
 জগত,—ভারত মত,—ছায়ায় তাহার
 পাইবে অনন্ত শক্তি, জুড়াইবে প্রাণ ;
 মানব অনন্তকাল লভিবে উদ্ধার,
 প্রেমানন্দে স্তম্ভুর গাই কৃষ্ণনাম ।
 বহিছে মহর্ষি-নেত্রে ধারা দর দর,
 বহিতেছে দর দর নেত্রে কান্তনীর ।

আশ্রয়হারা কিছুক্ষণ চাহি স্থিরতর
 অপরাহ্ন সিদ্ধপানে, মূৰতি পত্তীর ।
 অর্জুন । নিবেদিব হায় ! দেব চরণে কেমনে
 এ শোক-কাহিনী-শেষ ? যেই মনস্তাপ
 জ্বলিছে দাবাগ্নি মত মরমে মরমে
 কেমনে দেখাব আমি, চিত্তিবে সে পাপ ?
 লইয়া চতুর্দশীর শশি-রেখা শেষ,—
 হত-শেষ যত্নকুল,—অনাথা রমণী,
 অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ,—পঞ্চনদ দেশ
 করিহু প্রবেশ যবে, মহর্ষি । তখনি
 আক্রমিল দণ্ড্যগণ ; করিল হরণ
 বহুরাজি, অশ্ব রথ ; করিল হরণ
 যাদব-রমণীবৃত্ত ;—আমি নরাধম
 সে দৃশ্যও ভগবন ! করেছি দর্শন ।
 যে গাণ্ডীব ছিল মম কার্ণাট ক্রীড়ার,
 নাহি শক্তি সে গাণ্ডীবেরে করি জ্যারোপণ ।
 নাহি পড়ে অস্ত্র মনে ; নাহি বল আর
 কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভূজে ; হায় ! অদর্শন
 হইয়াছে সেই দেব-সারথি আমার,—
 শক্তিরূপী নারায়ণ । নাহি প্রবাহিত
 কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীৰ্য্য ধমনীতে আর ;—
 করি শিলাময় চক্র, রবি অন্ত মত ।
 হইয়াছে গাণ্ডীব যেন ষষ্টি স্রবিরের ।
 তাহাতে করিয়া ভর করিহু দর্শন
 সে লুপ্ত, সে হরণ । হায় প্রবীণের
 গুণিলাম হাহাকার, শিশুর যোদন ।

দেখিলাম অধর্মের যেই অভ্যুত্থান,
 করি নাই কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে দর্শন ;—
 সুরামত্তা বাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ,
 করিল তত্ত্ববর্ণনে আত্মসমর্পণ ।
 দেখিতেছি এই দৃষ্ট ; গাণ্ডীব বাহিয়া
 পড়িতেছে অশ্রুধারা,—পড়িছে তরল
 ফাল্গুনীর মনস্তাপ ; রহিয়া রহিয়া
 শেব গৈরিকের ধারা তরল অনল,
 পড়িছে বহিয়া ধীরে ধীরে নির্দোষিত
 আগ্নেয় ভূধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনীর ;
 দেখিতেছি এ নরক;—দেব ! আর্চস্থিত
 কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর !
 অশ্রুপৃষ্ঠে দুই নারী,—দেবী কি মানবী !—
 এ নরকে তারা-বেগে করিল প্রবেশ ।
 কি শান্তি প্রতিমা হুট, কি কল্পনা হবি !
 পবিত্র গৈরিক বাহি পড়িয়াছে কেশ ।
 দুই পবিত্রতা মূর্তি,—রয়েছে চাহিয়া
 দম্ভাঙ্গণ পাব'ণের মূর্তি যেমন ;
 পাব'ণ-প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া
 পাপিষ্ঠা বাদবীগণ ;—অপূর্ব দর্শন !
 ধামিয়াছে কোলাহল ; নীরব প্রান্তর ;
 অনিচ্ছাস নাসা ; প্রাণ বস্ত্র অবিচল ।
 কি যেন তাড়িত-শ্রোত করিল সত্ত্ব
 চিত্রে পড়িত দেব ! সে লুপ্তনাম ।
 স্ববির বোকুত্তমান রয়েছে চাহিয়া ;
 রয়েছে বোকুত্তম ন চাহি শিঙগণ ;

রয়েছে চাহিয়া দৃশ্য, ভুজ্জ আলিঙ্গিয়া
 কুতা নাগী-বন্ধ, করে লুষ্ঠনের ধন ।
 মধ্যস্থলে হুই অশ্ব স্থির, অবিচল ;
 স্তম্ভদা শৈলজা অশ্ব স্থিরা অবিচল ।
 স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে সে লুষ্ঠনস্থল ;
 মেঘপৃষ্ঠে শরতের হুই শশিকলা ।
 মুহূর্ত্তেক পরে দেব ! চলিল ছুটিয়া
 অনার্য্য তরুরগণ ৭ যত্নকুল জায়া
 ছুটিল পশ্চাতে,—এও আসিহু দেখিয়া !—
 প'পের পশ্চাতে যেন কর্মফল-ছায়া ।
 যাইতে ছুটিয়া এক বাদবী পাপিনী
 জীবাব হানিল বর্শা বক্ষে স্তম্ভজার ।
 ছুটিল শৈলের অশ্ব করুণাক্রপণী
 লইল পাতিয়া বর্শা বক্ষে আপনার ।
 তিরোহিত নারায়ণ ; ধবংস যত্নকুল ;
 নিমজ্জিত দ্বারবতী গর্ভে জলধির ;—
 ততোধিক প্রাণ দেব ! হয়েছে আকুল
 নিরখি পতন ঘোর যত্ন-রমণীর ।
 আসিল প্রভাসে ভদ্রা নিয়ে শৈলজায়
 অহতা করুণাময়ী । করি অতিক্রম
 দহাত্মি পঞ্চনদ, সাত্ত্বাজা-ছায়ায়
 প্রবেশিধা পাণ্ডবের, করিয়া প্রেরণ
 ধবংসশেষ, কৃতশেষ, বাদবী বাসব
 ইন্দ্রপ্রস্থে প্রদাসহ, আসিহু হেথায়
 জুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব
 মহাবির কর্তৃক চরণ-ছায়ায় ।

সহিত না প্রাণে মম আশ্র-বিনাশের
সেই মহা শোকদৃষ্টি ; ধৈর্য্য-বীৰ্য্য-চ্যুত
পারিত না ধনঞ্জয় সাহিতে উদ্ধার
বাদবেব ; তাই বুঝি ছিহ্ন অনাহৃত
প্রভাস উৎসবে ! দেব ! বাণকের বল
নাহি ভুজে, নাহি ভয় হৃদয়ে আঘার ।
বখী-হীন হেহ-রথ হয়েছে অচল,
অপার্থ হয়েছে পার্থ ; --কি কর্তব্য তার ?

বাস । গাওবীর পরাভব, বাদবী হরণ,—
সকলি তাঁহার লীলা । মহিমা পূরিত
হুই ভাবি ইতিহাস, পার্থ ! নিক্রপম
এই হুই ঘটনায় হয়েছে স্মৃতিত ।

বাদবী হরণে আশ্র হইয়া মিশ্রিত
রক্ত আৰ্য্য অনার্য্যের, ব্যাপিয়া ভারত
কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্ম্মরাজ্য-ছায়াতলে ! আলোকি জগত
দর্শনের বিজ্ঞানের নন্দ্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া ।
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া ।
আৰ্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান
করিবে স্মজন পার্থ ! যুগ যুগান্তর ।
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান !
তরঙ্গে তরঙ্গে কত বিপ্লব ভীষণ
এই নব শক্তি-মূলে হইয়া গ্রহিত

হবে ভগ্ন, ওই সিদ্ধ-তরঙ্গ যেমন ;
 হৃদে কুণ্ড, ভুঞ্জে পার্থ, নব ধর্মব্রত
 রবে ষত দিন পার্থ । এ মহাভারত
 রহিবে অচল দৃঢ় হিমাচল প্রায় ।
 এই কালে কত রাজ্য জল-বিস্ববৎ
 উঠিবে পড়িবে মহা কালের ক্রীড়ায় ।
 গাণ্ডীবীর গাণ্ডীবের নাহি কার্য আর
 এ ভারতে ; নাহি কার্য ভারতে আমার ।
 আমরা সলিল-বিশ্ব যে মহালীনার,
 সেই লীলা শেষ, বিশ্ব কি করিবে আর ?
 এ আশ্রম সিদ্ধ-গর্ভে হবে নিমজ্জিত ;
 হিমাচলে মহাধ্যানে হব নিমগন ।
 রাখি বজ্রে উজ্জপ্রস্থে, রাখি পরীক্ষিত
 হস্তিনায়, কর মহাপ্রস্থান এখন
 পঞ্চ ভ্রাতা, সহ ভোজ অন্ধক কুকুর—
 হত-শেষ বহুকুল । লজ্জি হিমাচল,
 ক্রমে ক্রমে বহু-দেশ, জনপদ, পুর,
 করিয়া লজ্জন, এই মহাযাত্রাদল,
 —অসংখ্য মানব জাতি, পশু নির্বিশেষ,
 পতিতপাবন নামে করিয়া উদ্ধার,
 করি পশু নর, মহামরু মহাদেশ,—
 হরিকুল,—বহুকুল,—শ্রোত ছনিবার
 'লোহিত সাগর' ভীরে হবে উপনীত
 সহস্র সহস্র বর্ষে, পশ্চিমে সূর্যব ।
 খুলিবে কি ইতিহাস ! করিবে পূরিত
 কি অমৃতে, অমরবে, কি মরু বহুব

হইয়া উত্তরবাহী করিবে স্থাপিত
 স্থপতিত্রয় যজ্ঞরাজ্য, পুণা যজ্ঞপুত্র,
 পূরব দক্ষিণ তীরে 'লবণ সিদ্ধুর'।
 গিয়াছেন হলধর সহ হরিকুল
 সিদ্ধুর উত্তর তীরে করিতে কর্ষণ
 মহা নবধর্ম্য হলে। জগতে অতুল
 কত অর্থ্য মহারাজ্য করিবে স্থাপন
 ত্রিকূলে ভূমধ্য সেই 'লবণ সিদ্ধুর,
 এই হই যাত্রীদল। কতই জগত
 নূতন নূতন তর। ব্যাপিয়া হৃদয়
 করিয়া আলোকময় নব ভবিষ্যত।"
 সেই মহাভবিষ্যত যেন উদ্ঘাটিত
 মহাবীর হনয়নে। কপোল বহিয়া
 কি আনন্দধারা বক্ষ করিছে প্রাবিত।
 কি মূর্ত্তি মহিমাময়। কি ধ্যানে বসিয়া।
 কি যেন অদৃশ্য হৃদয় তাক্তিত পরশে
 হইল পবিত্র দেব-দেহ রোমাঞ্চিত।
 "আসি মা!"—কহিয়া উঠি যেন ধ্যানবশে
 চলিলেন; চলিলেন কাক্তনি বিম্বিত।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

—*—

ভবিষ্যৎ ।

ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিণী ধীরে,
 সৃষ্টির অস্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
 মিশাইছে ধীরে ধীরে প্রভাস সিন্ধুর বক্ষে,—
 সিন্ধু যেন নারায়ণ শান্তির আশ্রয় ।
 সত্ত্ব গৈরিকাবৃত্তা শোভিতেছে বেলা-ভূমি,
 ধূসর-বাসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
 সান্ত্বন্যে প্রণতা,—যেন মহানির্ঝরণের গীত
 শুনিতেছে সিন্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী ।
 যেই শিলাসনে হরি হইলেন তিরোহিত
 সেই শিলাপাদমূলে, শিলা অন্তরে,
 বসিয়া সূক্তা দেবী উদাসিনী শান্তিময়ী,
 প্রথম শিলায় শির রাখি ভক্তিতরে ।
 শৈলজা শাশ্বতা অঙ্গে, উদাসিনী শান্তিময়ী,
 সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন মুখ বক্ষে সূক্তদার ;
 যোগস্থা যোগিনী শৈল নিম্নলিত জনমন,—
 অশ্রুত কুবকে মালা অপরাধিতার ।
 শিরদেশে বৈপারন, পদতলে ধনঞ্জয়,
 দাঁড়য়ে মুরতি মত হির তিন জন,
 শান্তিলীলামূর্তে ভরা করুণা-ত্রিদিব মুখ,
 করিছেন অনিমিষ নেত্রে দরশন ।

মেলিল নয়ন শৈল ; শাস্তির জয়দ হাসি
 ভাসিল অধর প্রান্তে, ভাসিল নয়নে,—
 ভাসিল জ্যোৎস্না যেন সুনীল দর্পণে ।
 চাহি দৈপায়ন প্রতি সজল নয়নে শৈল
 কহিল—“করুণাময় । করেছি স্বরণ
 অস্তিমে, হুহিতা শিরে দেও অীচরণ ।—
 দেও পাদপদ্ম পিত ।”—কহিল চাহিয়া পার্শ্বে—
 “দেশ দেশান্তরে তুমি যেই অনাথায়
 থুঁ জিলে অধীর শোকে, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে
 চাহিলে হুহিতা মত বসাইতে, হায় !
 দেখ সে হুহিতা তব, মাতা হুভদ্রার অঙ্কে,
 কি ছার খাণ্ডব রাজ্য তুলনায় তার ?
 তোমার কৃপায় আজি পতি মম নারায়ণ !
 যেই প্রেমগঙ্গা পদে জন্মিল তোমার,
 পাইয়াছে নারায়ণ প্রেম-পারাবার ।
 পেয়েছ হুহিতা তুমি, আমি পাইয়াছি পতি,
 হইয়াছে উভয়ের পূর্ণ মনস্কাম,
 লও হুহিতায় বৃকে, খাও কৃকনাম ।”

“মা !”—কাদি উচ্চস্বরে, অর্জুন অধীর শোকে
 পড়িলেন সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষে শৈলজার ।
 হুই ভূজে প্রেমভরে জড়াবে পার্শ্বের গলা,
 —শোভিল গলায় যেন নীলমণি-হার,—
 আছে শৈল চাহি যাকু-মুষ্টি করুণার ।
 কহিলেন ধনঞ্জয়—“মা ! তোমার এ ক্ষুদ্র বৃক
 অর্জুনের শাস্তিদাম, ত্রিদিব তাহার,
 অর্জুনের এই স্বর্গ, তুই মা করুণাময়ী

লইবি কি কাড়ি,—কবি মরু এ সংসার ?
 তিবোহিত নারায়ণ ; ধ্বংশেষ যতকুল ;
 স্বপ্নশেষ দ্বারবতী, চিহ্ন নাহি তার ;—
 বড়ই আকুল প্রাণ । মরুভূমি এ সংসার ।
 একই সাস্থনা তুই পার্থ স্রুজ্যার ।
 তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, ভুলিছ পুত্রের শোক,
 ভুলিছ সংসার মা গো ! দেখি তোর মুখ ।
 তোর স্নেহে, তোর প্রেমে, আশ্রম কুটীর খানি
 হয়েছিল কি স্বর্গ মা । কি স্বর্গ এ বুক ।
 আমাদের এই স্বর্গ, আমাদের এই শান্তি,
 হরিয়া কি বাবি তুই দিয়া নব শোক ?
 পাইয়াছি পুত্রশোক, দিয়া এই পুত্রীশোক,
 জীবন সন্ধ্যার শেষ হরিয়া আলোক ?
 বড় সাধ ছিল,—তোরে, অভিরে, লইয়া বৃকে,
 গুইয়া ভজ্যার অঙ্কে, শিরে হৃদীকেশ
 পাদপদ্ম, করিব এ জীৱ-লীলা শেষ ।
 কিন্তু পুরিল না সাধ ; অভিমত্য় গেল চলি ;
 অস্তহিত নারায়ণ ; তুই মা আমার
 গেলে চলি এইরূপে, হায় ! পার্থ স্রুজ্যার
 এ জগতে কে রহিল, কি রহিল আর ?
 অস্তমিত প্রভাকর, জগতের যুগ-স্বৰ্ঘা,
 অস্তহিত যতকুল কিরণ তাঁহার ।
 এ চটি কিরণ-বিন্দু তুই কাদম্বিনী-বক্ষে
 আছি আমি, তুই গেলে বর কোথা আর ?
 বাবি যদি, নিয়ে চল তোর করুণার বক্ষে
 যথা পুত্র, যথা কস্তা বাইবি আমার ।—

রুদ্ধকণ্ঠ বাপে, কথা সরিল না আর ।
 শৈলজা সজলনেত্রে চাহি অর্জুনের মুখ
 কহিল—“এ শোক পিত ! কর পরিহার !
 শৈলের কি শুভ দিন ! এমন কে আছে বল
 এ জগতে ভাগ্যবতী মত শৈলজার !
 শুয়েছে কি মহাতীর্থে, কি পবিত্র দেব-বৃক্ষে,
 আসিয়াছে কি সুন্দর লয়ে পুষ্পরথ
 তার পুত্র, পুত্রবধু,—উত্তরা ও অভিমুখ্য,—
 আসিয়াছে পিতা মাতা,—কি পুণ্য জগত !
 নীরব, নয়ন স্থির, চাহিয়া অনন্তাকাশে
 কিছুক্ষণ সে জগত, কহিল আবার—
 “কেবল একটি ভিক্ষা চরণে তোমার ।
 ওই দেখ নিম্ব বৃক্ষ, পবিত্র ছায়ায় বার
 হইলেন তিরোহিত নর-নারায়ণ,
 এই কাছে দাক্ষমুণ্ডি, অনার্য্য শিল্পীর করে
 নীল মাধবের পিত ! করিবে সৃজন ।
 এক পার্শ্বে জগন্নাথ, অগ্র পার্শ্বে ধনঞ্জয়,
 শান্তির প্রতিমা মধ্যে সুভদ্রা জননী,
 অনন্ত বরুণাময়ী পতিতপাবনী ।
 প্রভাস সিদ্ধুর তীরে এই তিরোধান কেন্দ্রে,
 মন্দির গগনস্পর্শী করি বিনির্মিত,
 এই তিরোধান-শৈলে নিষ্ঠাইয়া বহুবৈদি,
 নবদর্শ মহামুণ্ডি করিবে স্থাপিত ।
 সেই মন্দিরের ছায়া পড়িবে এ সিদ্ধ বৃক্ষে,
 পড়িবে কালের বক্ষে, যুগ যুগান্তর ;
 অনন্ত মানব যাত্রী দেখি চূড়া হৃদর্শন,

বাবে সিদ্ধযাত্রী মত, জন্ম জন্মান্তর
 অনন্ত শাস্তির তীরে ; কতই বিপ্লব বোর
 তরঙ্গে তরঙ্গে আসি মন্দির-ভিত্তির
 প্রহারিবে পাদমূলে ; হবে যুগে যুগে কত
 স্থানান্তর, রূপান্তর, মূর্তি, মন্দির !
 এ মন্দির, এ মূর্তি, নীল মাধবের, পিত !
 অনার্যের করে তুমি করিবে অর্পণ ;
 যুগে যুগে, বনে বনে, বিপ্লবের হতাশনে,
 রক্ষিবে পতিত, মূর্তি—পতিতপাবন ।
 আর্যদের আছে জ্ঞান, আছে শাস্ত্র আর্যদের,
 অনন্ত শাস্ত্র-শিক্ষক আছে ঋষিগণ ;
 পতিত অনার্যদের কিছু নাই, কেহ নাই,
 দিও তাহাদের মূর্তি পতিতপাবন !
 এই মন্দিরের ক্ষেত্র আর্যের ও অনার্যের
 হইবে ত্রীক্ষেত্র, মহাসম্মিলন ধাম ;
 অনার্য ব্রাহ্মণ-আর্য গাবে এক কৃষ্ণনাম,
 আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান,—
 প্রতিধ্বনি তুলি সিদ্ধ গাবে হরিনাম ।
 অর্জুন উচ্চ্বাসে মত্ত, कहিলেন—“মা ! আমার !
 অর্জুন, অর্জুন-পোত্র, প্রপোত্র তাহার,
 করি শূত্র কোষাগার ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনার,
 পালিবে মা ! তোয় আজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা আমার ।
 কেবল একটি ভিক্ষা,—বীরঘাতী ধনঞ্জয়,
 অর্জুন আকর্ষ বীর-রক্তে নিমজ্জিত ;
 এ মহাবেদির বক্ষে বসাইলে এ পাণ্ডীরে,
 এ পবিত্র বেদি মা গো ! হবে কলুষিত ।

অৰ্জুনের পাপ নাম, অৰ্জুনের পাপকীর্তি,
 এই ভস্মরাশি মত সিদ্ধুতীরস্থিত,
 অচিরে কালের সিদ্ধু, পবিত্রিয়া ধরা বন্ধ,
 একই উচ্চাসে যেন করে অপনীত ।
 মধ্য মূর্ত্তি জগন্নাথ, শৈলজা স্তম্ভদা পার্শ্বে,
 বিরাজিবে কাল-বক্ষে এ তিন মুরতি ।
 মধ্যে হরি হিমাচল, পার্শ্বে প্রেম-স্রোতস্বতী
 বহিবে অলকানন্দা, মাতা ভাগীরথী ।”
 হইল মলিন মুখ শৈলজার, শৈল যেন
 পাইল পরম ব্যথা, সজল নয়ন
 কহিল কাতরে শৈল—“ধনজয় মহাপাপী !
 কৃষ্ণ-নখা পাপী ! তবে পাপী নারায়ণ !
 তাঁর রাজ্যে কত হত্যা ! কি জীব-শোণিত-সিদ্ধু
 হইতেছে তাঁর রাজ্যে নিত্য প্রবাহিত ।
 সেই মহাহত্যা-ক্ষেত্র তুলনায় কুরুক্ষেত্র,
 অনন্ত সিদ্ধুর কাছে বিন্দু পরিমিত ।
 যার ভূজবলে এই বিরাজিছে মহারাজা,
 বিরাজিছে মহাশাস্তি ব্যাপিয়া ভারত,
 যাহার বীরত্ব গাথা, যার করুণার কথা,
 গাইছে, অনন্ত কাল গাইবে জগত ।
 অধাৰ্ম্মিক মহাপাপী আজন্ম শত্রুর প্রতি
 রণক্ষেত্রে করুণায় প্লব কর যার,
 আমি পতিতার প্রতি করুণার এ প্রণাহ,
 পাপী সেই বলদেব, দেবতা আমার !”
 কিরাসে মলিন মুখ, চাহি বৈদায়ন প্রতি,
 কাতরে কহিল শৈল—“কহ জগবান ।

হুহিতার এ কামনা, শিষ্যার অস্তিম্ব আশা,
 করিবে পূরণ তুমি, তুমি পূর্ণকাম ।
 কহিলা—“তথাস্তু ।” ।—শাস্ত কণ্ঠে ভগবান ।
 “আর এক ভিক্ষা প্রভু !”—কহিতে লাগিল শৈল
 “একটি আশঙ্কা-ছায়া তব হুহিতার
 পড়িয়াছে এ হৃদয়ে, কর অপসার !
 সম্বরিলে নাগরাজ আপনার পুণ্যলীলা,
 করি এই তীর্থে ক্রিয়া অস্ত্যোষ্টি তাহার,
 —ছিন্ন সংসারের শেষ বন্ধন আমার ।—
 চলিলাম নাগপুরে, অনার্যের অভ্যুত্থান
 নিবাসিতে,—কিন্তু লীলা কে বুঝিবে তাঁর ?
 শুনিলাম সেনাপতি তরুণ গিয়াছে চলি
 লুপ্তিতে যাদব-পত্নী, যাদব ভাণ্ডার,—
 কি পাপের অভিনয় দেখিলাম আর ।
 এ পাপের পরিণাম—জলিছে কি কুরুক্ষেত্র,
 আর্যের ও অনার্যের, ভারতে আবার ?
 আবার অনার্য জাতি হবে, হিংস্র পশু মত,
 উৎপীড়িত, বিতাড়িত, বিধ্বংসিত আর ?
 আবার কি নর-রক্তে যাবে ডাসি ধর্মরাজ্য ?
 এই প্রেম, এই শাস্তি, এই সম্মিলন
 আর্যের ও অনার্যের, হইবে স্বপন ?
 স্থিরনেত্রে বৈপায়ন শৈলজার নেত্র পানে
 চাহিলেন নির্নিমেষ । শৈলের নয়নে
 চাহি শূণ্ডে লক্ষ্যহীন হইল অচল, স্থির ;
 শৈলজা যোগস্থা, শৈল প্রতিমা যেমন ।
 কহিলেন মহাযোগী—“ভারতের, জগতের,

দেখ মহাভবিষ্যত !—কি দেখিছ বল ?
 উত্তরিল শৈল, স্থিরনেত্র ছল ছল,—
 “বড়ই নিষ্ঠুর দৃশ্য ওই দেখিতেছি কাছে !
 জলিয়াছে কি দারুণ সময় অনল !
 পুড়িতেছে নাগজাতি তরুকের মহাপাপে,
 পোড়ে যথা যজ্ঞানলে পতঙ্গের দল ।
 দগ্ধশেষ নাগগণ, কাকর পালিত পুত্র
 মহর্ষি আন্তীক-পদে লইল আশ্রয় ;
 ঋষি অগ্রে অপহতা বাদবীর পুত্রগণ
 করিল কি মহাসন্ধি, অমর অক্ষয় !
 নিবি নাগ-যজ্ঞানল, কৃষ্ণ-প্রেমের চারি যুগে
 হ’ল আৰ্ঘ্য অনার্যের পূর্ণ সন্মিলন !
 যে ধর্মের গুরু পক্ষ প্রবেশিল কুরুক্ষেত্রে,
 আজি পূর্ণমানী তার শাস্তি-নিকেতন !
 শিরে পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ ; ভারত পূর্ণিমালোকে
 সহস্র সহস্র বর্ষ বাইছে ভাসিয়া
 অনন্ত উন্নতি-পথে, হৃদয়ে অভয় শাস্তি,
 সন্মিলিত মহাবক্ত শিবার বহিয়া ।
 আবার সে চন্দ্রালোক ছাইল অধর্ম-মেঘে,
 কন্দ, —বাগ যজ্ঞ ; ধর্ম, —স্বার্থ নিরমম
 আরবার জীব-রক্তে রঞ্জিত হইল ধরা,
 যজ্ঞ-ধূম-সমাক্রম ভারত-গগন !
 স্বার্থক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অন্তর বিগ্রহানল
 জলিল আবার সেই ধূমে কি ভীষণ !
 ভারতের মহাধর্ম, ভারতের মহাশক্তি,
 ভারতের মহারাজ্য হইল স্বপন !

হিমাঙ্গির ছায়া-তলে, মানব হিমাঙ্গি মত,
মিশ্রিত ক্ষত্রিয় কুলে, পুনঃ ভগবান
আসিল রাজর্ষি রূপে, ঘোষিলা ভৈরব কণ্ঠে
কি মহান কর্মবাদ ! কি ধর্ম নির্মাণ !

নিবিল বিগ্রহানল, নিবিল সে যজ্ঞ-ধূম,
নিবিল সে জীবরক্ত-প্রগাহ নির্মম,
মহাকরুণার স্রোতে ; বহিল ভারত প্লাবি
সেই করুণার স্রোত পতিতপাবন,
উদ্ধারি পতিত জাতি কত দেশ দেশান্তর,
সৃজি কত মহারাজ্য, উপরাজ্য কত !

মানব লাভিল শান্তি সহস্র সহস্র বর্ষ ;
হইল জগত কিবা স্বর্গে পরিণত !

কালে, দূর পর্য্যটনে, স্থানান্তরে রূপান্তর,
হইল যুগল ধর্ম-স্রোত তিরোহিত ।

পৃথিবীর পশ্চিমার্দ্ধ নিমজ্জিত অন্ধকারে
রহিল, রহিল অর্দ্ধ মানব পতিত ।

স্বদূর সিন্ধুর তীরে আসিলেন আরবার,
নব যজ্ঞকূলে, নব যজ্ঞস্থানে, হরি

শান্তিরস-অবতার ; উদ্ধারিলা পশুভূমি ;

ঘোর আত্ম-বলিদানে শিলা দ্রব করি ।

সেই বলিদান-কাণ্ডে জ্বলিল কি মহালোক !

দেখাইল পশুগণে দেবত্ব মহান ;

এই করুণার স্রোতে তবু নব-মরুভূমি

ভিজিল না, দ্রবিল না পশুত্ব পাষণ ।

লোহিত সমুদ্র তীরে সেই মহামরুভূমে,

পাণ্ডব প্রস্থান স্থানে, আসিল আবার

সখ্যবস-অবতার, নব ধনঞ্জয় রূপে,
 মরুভূমে ভোগবতী করিয়া সঞ্চার ।
 মহা নব কুরুক্ষেত্র জলিল পৃথিবীব্যাপী,
 পশিল সে দাবানল ভারতে পতিত,—
 ধর্মহীন, বলহীন, ভারত জীবনহীন,
 অস্তুর বিগ্রহ-বিষে পুনঃ জর্জরিত ।
 তখন জাহ্নবী-তীরে, চাক নব বৃন্দাবনে,
 আসিলেন গৌরহরি প্রেম-অবতার ;
 কি মধুর প্রেমবসে ভাসিছে ভারত ভূমি !
 উথলিছে কি মধুর প্রেম-পারাবার !
 কালা হইয়াছে গোরা, জীর্ণবাস পীতধড়া,
 হয়েছে মোহন বাঁশী দণ্ড বৈরাগীর ।
 চন্দন হয়েছে ধূলা, প্রেমে-গোরা আত্মহারা,
 নয়নে যুগল ধারা প্রেম-জাহ্নবীর !
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—নাচে গোরা বাহু তুলি,
 ধূলায় সোণার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি ।
 কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়,
 প্রেমের তিথারী প্রেম অঙ্গুলি বিতরি ।
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—গাইতেছে নব নারী,
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—গায় ভাগীরথী ;
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—গাইতেছে পশু পক্ষী,
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—গায় জলপতি ।
 ‘হরিবোল ! হরিবোল !’—কি আনন্দে শৈলজার
 কবিল জদয় কুঙ্গর পূর্ণ উদ্বেলিত ।
 কি প্রেম নয়ন-ধারা পড়িছে ভদ্রাব অঙ্গে ।
 করিয়াছে কুঙ্গর দেহ মাধুরী পূরিত !

“হরিবোল ! হরিবোল !”—আবার গাইল শৈল,
 “হরিবোল”—গাইলেন কৃষ্ণ দৈপায়ন ;
 গাইলেন পার্থ ভদ্রা “হরিবোল হরিবোল !”
 ধীরে শান্তি-সন্ধ্যা শৈল মুদিল নয়ন ।
 “মা ! মা !”—কাঁদি ধনঞ্জয় মুচ্ছিত পড়িলা বৃকে ;
 পড়িতেছিলেন ধীরে ভদ্রা মূৰ্ছিত,
 কহিলেন দৈপায়ন—“স্বভজ্রে ! সম্বর শোক !
 তব করে ধর্মরাজ্য রয়েছে স্থাপিত ।”
 স্পৃগ-উদ্ভিতার মত স্বভদ্রা তুলিলা শির,
 রহিলা চাহিয়া স্থির শৈল মুখ পানে,—
 নিদ্রা যাইতেছে শান্তি আনন্দ-স্বপনে ঘেন ।
 দাঁড়াইয়া দৈপায়ন নিমজ্জিত ধ্যানে ।
 ধীরে বসন্তের সন্ধ্যা, প্রকৃতিরূপিনী ধীরে,
 সৃষ্টির আন্তিম অঙ্ক করি অভিনয়,
 ভুবিল সিদ্ধুর গর্ভে, সিদ্ধু স্থির অবিলস,
 ঘেন নারায়ণ-বক্ষ শান্তির আলয় !
 সন্ধ্যা গৈরিকাবৃত্তা শোভিতেছে সাক্ষা বেলা,
 ধূসরবসনা শান্তিময়ী উদাসিনী
 সাষ্টাঙ্গে প্রণতা,—ঘেন নির্ঝঞ্জেয় গীত
 শুনিতেছে সিদ্ধু-কণ্ঠে যোগস্থা যোগিনী ।
 সিদ্ধুবক্ষে জলোন্মুস ভক্তির উন্মুস মন,
 উদ্ভিল, আসিল বেদি মূলে ধীরে ধীরে
 তরঙ্গে তরঙ্গে মুহু ; তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ি
 শৈলজার দীর্ঘ কেশ ভাসিতেছে নীরে ।
 ভক্তির তরঙ্গ মুহু মুচ্ছিত পার্শ্বের পদ
 প্রক্ষালিছে, ধীরে পাদপদ্ম মহর্ষির ;

প্রফালিছে ভক্তিভরে শৈল বেদি-বিলম্বিত
 পবিত্র চরণাঙ্কুর স্মৃত্তা দেবীর ।
 বসন্তের শেষ সন্ধ্যা তমসারূপিণী ধীরে
 সৃষ্টির অন্তিম অঙ্ক করি অভিনীত,
 ঢাকিল প্রভাস-সিন্ধু প্রভাস সিন্ধুর তীর,
 তামস সাগরে বিশ্ব করি নিমজ্জিত ।
 ধ্যানস্থ আকাশ পানে চাহিয়া মহর্ষি স্থির ;
 মূর্ছিত অর্জুন বক্ষে পড়ি শৈলজ্ঞার ;
 প্রীতির প্রতিমা স্থির চাহি শাস্ত শৈল-মুখ,
 চাহিয়া, চাহিয়া, ভদ্রা দেখিলা না আর ।
 যাও মা মানবী-দেবি ! পূর্ণ ব্রত মা ! তোমার ।
 যাও মা করুণাময়ি ! পূর্ণ ব্রত মা ! আমার ।
 চতুর্দশ বর্ষ মা গো ! একপে বসিয়া ধ্যানে,
 দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা, একপে বিশ্বন্ধ প্রাণে ।
 পাইয়াছি শোকে শাস্তি ; পাইয়াছি হৃৎথে স্থখ ।
 প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র ; প্রেমে ভরিয়াছে বুক ।
 ফলিয়াছে বহু আশা ; ফলে নাই বহু আর ;
 বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার ।
 গীত শেষ-অপরাজে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে !
 বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাণ-তীরে ।
 সম্মুখে অজ্ঞাত সিদ্ধ, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী ।
 এই তাঁরে সন্ধ্যা ; উষা অন্ত তীরে মুগ্ধকরী !

পারিশিষ্ট ।

(১)

প্রভাস, অষ্টম সর্গ, ১৪৬ পৃঃ—

“শেতবর্ণ মহাবল ওই নব নাগপতি,—

কেতন সহস্র কণা সহ স্নদর্শন

উড়াইয়া, সিন্ধুক্ষে কর তার অনুসার,

গাই আর্ধ্য অনার্যের গীত সম্মিলন।”

মহাভারত—মৌবল পর্ব, চতুর্থ অধ্যায়,—

“এই কথা কহিয়া মহামতি মধুসূদন অবিলম্বে নির্জন বন
প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, বলদেব যোগাসনে আসীন রহিয়া-
ছেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে এক বৃহদাকার শেতবর্ণ সর্প
বিনির্গত হইতেছে। ঐ সর্পের মস্তক সহস্র সংখ্যক ও মুখ রক্তবর্ণ।
সর্প দেখিতে দেখিতে বলদেবের মুখ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রা-
ভিমুখে ধাবমান হইল। তখন সাগর, দিব্য নদী সমুদয়, জলপতি
বরুণ এবং কর্কোটক, বায়ুকী, তক্ষক, পৃথুশ্রবা, বক্রণ, কুঞ্জর, মিশ্রী,
শঙ্খ, কুমুদ, পুণ্ডরীক, ধূতরাষ্ট্র, হ্রাদ, ক্রোধ, শিতিকণ্ঠ, উগ্রতেজা,
চক্রমন্দি, অতিষণ্ড, হুম্বুখ ও অম্বরীষ প্রভৃতি নাগগণ সেই সর্পকে
প্রত্যাগমন পূর্বক স্বাগত প্রদান ও পান্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা
করিতে লাগিলেন।”

যদি ইহা রূপক না হয়, যদি ইহার অর্থ বলরামের কতিপয়
নাগসহ সমুদ্রযাত্রা না হয়, তবে কি ?

Tod's "Rajsthan" Chap. 11. Foot note.

“Arrian notices the Similarity of the Theban and
the Hindu Hercules and cites as authority the ambas-
sador of Seleucus, Megasthenes, who says ‘He uses the
same habit with the Theban ; and is particularly wor-

shipped by the Saraseni, who have two great cities belonging to them, namely Methoras (Mathura) and Clisoboras'.

"Diodorus has the same legend with some variety. He says 'Hercules was born among the Indians' * * (Hari-cul-es) -lord of the race (cula) of Hari, of which the Greeks might have made the Compound Hercules. Might not a colony after the great war have migrated westward? The period of the return of the Heraclidæ, the descendants of Atreus (Atri is progenitor of Hari-cula), would answer: it was about half Century after the great war."

গ্রীকদের বংশের পুরাণের নাম "হরিকুল"। তাঁহার কুলের নাম তবে হরিকুল। হরিকুলের নেতা বা ঈশ্বর—হরিকুলেশ; গ্রীক Hercules. প্রভাস লিখিবার সময় কবি মহাভারতের উপরোক্ত ইঙ্গিত ও গ্রীক ইতিহাস আলোচনা করিয়া যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন অতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ও চিরস্মরণীয় টড ও য়ে এরূপ বলিয়া গিয়াছেন তিনি জানিতেন না।

(২)

প্রভাস—ষাটশ সর্গ ২২৮ পৃষ্ঠা—

"লোহিত সাগর তীরে হবে উপনীত

সহস্র সহস্র বর্ষে পশ্চিম সূদ্র।

*

*

*

পূর্ব উত্তর তীরে লবণ সিঙ্গুর "

মহাভারত মহাপ্রস্থানিক পর্ব, প্রথম অধ্যায়,— "অনন্তর 'তাঁহারা (পাণ্ডবেরা) ক্রমে ক্রমে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগর সমুদয় সমুদ্রীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন।

* * * অনন্তর পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।"

Bible. Genesis, Chapter XI.

"And the whole earth was of one language, and of one speech.

2. And it came to pass, as they journeyed from the East that they found place in the land of Shinar."

পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান কল্যাণানুসারে খৃষ্ট পূর্ব ৩১০১ বৎসরে সজ্জাটত হয় এবং বাইবেল অনুসারে নোয়াহ, বা টড মহোদয়ের মতে বৈবস্বত মনুর, সন্তানগণের পশ্চিমাভিমুখে অভিযান প্রায় সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

Chap. XII.

"Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee.

2. And I will make thee a great nation and I will bless thee, and make thy name great and thou be a blessing.

4. So Abram departed * * and Abram was seventy and five years old when he departed out of Harae.

আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদগণের গণনানুসারে মহাপ্রস্থান খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরে সজ্জাটত হইয়াছিল। যদি তাহা হয়, তবে দেখা যাইতেছে বাইবেলানুসারে এব্রামের অভিযান খৃঃ পূঃ প্রায়ই সেই সময়ে অনুমিত হইয়াছে।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহাতে জ্যোতদ্বী ও চারি পাণ্ডবের ক্রমান্বয়ে মৃত্যু বর্ণনা আছে, যে উপাখ্যান, তাহা পড়িলেই বোধ হয় উহা বাদ দিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের দুইটি মহাঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগত-পূজ্য কবি মহাভারত শেষ করিয়াছিলেন।

(১) বলরামের আত্ম সপ্নরূপে প্রভাস সমুদ্রাভিমুখে শাবিত হইল

(২) পাণ্ডবগণ একটি কুকুর (যজ্ঞকুলের কুকুর শাখা) সহ “অসংখ্য দেশ” নদী সাগর সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া লোহিত সাগরের কুলে” ও “লবণ সমুদ্রের উত্তর তীরে” গমন করিলেন।

এরূপে যজ্ঞকুলের বা হরিকুলের দুই শাখা জল ও স্থলপথে পশ্চিমাভিমুখ গমন করিবার ইঙ্গিত পাইতেছি। অত্র দিকে গ্রীক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্ব দিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে এক দল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞিত দেশা-বেষণ করিতেছেন। “লোহিত সাগরের” পূর্ব তীরে মহম্মদের লীলা-ভূমি আরব্য দেশ, এবং “লবণ সমুদ্রের” বা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে খৃষ্টের লীলা-ভূমি যুদিয়া, উত্তর তীরে গ্রীস। সংস্কৃতে যজ্ঞ শব্দের উচ্চারণ ইহুদি শব্দের মত; ইহুদিদের দেশের নাম যুদিয়া। খৃষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। খৃষ্ট জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অধোরা সন্ন্যাসীর মত পূর্ব দিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে জন্মিষ্যেছেন, তাহাও পূর্ব দিক হইতে জানীরা গিয়া প্রচার করেন। আরও দেখিতেছি কি গ্রীসে, কি যুদিয়ায়, কি আরবে, ভারতীয় প্রতিমা পূজার মত প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। পুরাতত্ত্ববিদগণ চেষ্টা করিলে এরূপ অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এ সকল সাদৃশ্যের মধ্যে কোনও রূপ ঐতিহাসিক ওষু আছে কি? না থাকে কাব্যকাব্যের ক্ষতি নাই। তাহার পথ মুক্ত। প্রভাসের করিব পক্ষে মহাভারতের দুইটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এতদ্বিন্ন ত্রিভীষ্মপরাধদেবের পার্শ্বে বলদেবের ও সুভদ্রা দেবীর পূজা কেন, তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

প্রকাশক ।

অমিতাভ ।

—*—

বাহার অমিত আভায় সার্কি দুই সহস্র বৎসর কাল-বন্ধ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও উইরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত বাহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি । তাঁহারই অন্ততর নাম অমিতাভ ।

এ কাব্যখানির প্রণয়নসম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থকারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী । তবে তাঁহারা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অস্বাভাবিক অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি । এ অবতারণিকাকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহা-দিগকে অধিক আমাদের আপনাতর বলিয়া বোধ হয় । বুদ্ধদেবের ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক ; অতএব তাঁহাকে অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত করিবার প্রয়োজনও বিশেষ নাই ।

এই কাব্যের কয়েক অধ্যায় “জন্মভূমি” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য “জন্মভূমি” “বঙ্গবাসী” প্রমুখ হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ-পত্রিকা । শুনিয়াছি উক্ত কয়েক অধ্যায় “বঙ্গবাসী” অধ্যক্ষগণের ও সাধারণ হিন্দু পাঠকগণের প্রীতিপদ হইয়াছিল । যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমার পক্ষে ততোধিক স্নেহের ও সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই হইতে পারে না । কারণ এ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব হিন্দুদেগের কাছে ঘোরতর বিদ্বেষভাজন ছিলেন বিদ্বেষ এতদূর যে, পশ্চিমদেশীয় হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের নাম করিলেই তাঁহাদের সকল পুণ্য ক্ষয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন । ইংরাজী-

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও একরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং এতাদৃশ বিপরীত মতাবলম্বী যে, ব্রাহ্মণগণ যষ্টির আঘাতে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসের যেরূপ মূল কি তাহা আমি বড় বুঝিতে পারি নাই।

প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম কি—তৎসম্বন্ধে বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভেদে ঘোর-তর মতভেদ। শ্রীবুদ্ধদেব ক্ষীণবুদ্ধি মানবকে যেক্রূপ তাঁহার মহাধর্ম বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন, আমি সেক্রূপ এই কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে সকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গ-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমান শরচ্চন্দ্র দাসের মত কেহই বৌদ্ধদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা করেন নাই। তিনি এ অধ্যায়টিকে আদিষ্ট (inspired) বলিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তবে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ কোথায় ?

বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র দর্শনের উপর প্রোথিত। তাহার দু'খানি প্রধান ইষ্টক,—কর্মপ্রদ ও জন্মান্তরবাদ। ইহা কি হিন্দুরা বিশ্বাস করেন না, এবং ইহা কি হিন্দুধর্মের দুইটি মূল তত্ত্ব নহে ? তবে একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম আপাততঃ মতভেদ বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুধর্মের ভিত্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। বুদ্ধদেব এ সম্বন্ধে নীরব। হিন্দুধর্ম বলেন, কর্মফল নিবন্ধন জন্মান্তর ও তজ্জনিত দুঃখ হউক, কিন্তু শ্রীভগবানের রূপায় তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে।

“তেরাগিয়া সর্ব ধর্ম

লও তুমি একমাত্র

শরণ আমার ।

করিও না শোক পার্থ ? সর্ব পাপ হ’তে আমি

করিব উদ্ধার ।”

গীতা ১৭শ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক ।

বুদ্ধদেবের মতে কেবল স্বকর্মের দ্বারা কুকর্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্জন্মের এবং তজ্জনিত দুঃখের ‘নির্কারণ’ হয়।

সাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার বলেন, বুদ্ধদেব ভগবৎ কৃপার কথা কিছুই বলেন নাই। অথচ শ্রীভগবান্ নাই, তাঁহার কৃপায় কিছুই হইতে পারে না, এমন কথাও তিনি বলেন নাই। যদি এ উভয়ে তিনি বিশ্বাসহীন হইতেন, তবে তাঁহার মত স্পষ্টবাদীর তাহা না বালিবারও বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে নীরব থাকিবার কোনও কারণ ছিল কি ?

আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় দেখিতে পাই তাঁহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাস-মূলক কর্মপ্রধান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বজ্র-গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

“ত্রিগুণো বিষয়া বেদাঃ নিঃশ্রেণ্য ভবাজ্জুন।”

কিন্তু দুই সহস্র বৎসর সেই মহাবাক্য লুপ্তপ্রায় হইয়া কর্ম আবার বুদ্ধদেবের সময়ে নির্ণয় জীবঘাতী বৈদিক যজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। কেন ? মানুষ এত ক্ষুদ্র, মানব-হৃদয় এত দুর্বল যে, সে “অবাস্তবসংগোচর” ব্রহ্মকে ধারণ ও গ্রহণ করিতে পারে না। সে কেবল তাঁহাকে-মানুষের অবয়বে গঠিত করে তাহা নহে, তাঁহাতে মানব-প্রকৃতিও আরোপ করে। মানুষ যেরূপ পূজায় পরিতুষ্ট হয়, তাঁহাফেও সেরূপ পূজায় দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে চাহে। বুদ্ধদেব বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেই ধর্মের একরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে; মানুষ কষ্টসাধ্য প্রকৃত পুণ্যকর্ম ছাড়িয়া সহজসাধ্য যোগ যজ্ঞকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। বুদ্ধদেবের তিরোধানের সাক্ষী দুই সহস্র বৎসর পরে আজ আবার তাহাই হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেব, অদৃষ্ট, অজ্ঞেয় অচিন্ত্য কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতেন না। তাঁহার মতে,

ওরূপ বিষয়-মুখ্য-চিন্তার অতীত। ঈশ্বরও সেরূপ মানব-জ্ঞানের ও চিন্তার অতীত। অতএব ধর্ম ঈশ্বর-বিমুক্ত হওয়া উচিত। এবং বিধ কোনও কারণে কি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন? এই নীরবতাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পিপাসু ভক্তি-প্রাণ ভারতে তাঁহার মহাধর্মের অধঃপতনের ও অপলাপের কারণ।

কিন্তু ভগবৎরূপায় মুক্তিলাভ—এ কথাটা কি, একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মহাপাপীও একবার তাঁহার শরণ লইলে মুক্ত হইবে। খৃষ্টও তাহা বলেন। কিন্তু এ কথাটার অর্থ কি? মহাপাপী যদি কেবল একবার শ্রীভগবানের শরণ লইলেই মুক্ত হয়, তবে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার কোথায় রহিল? তবে এ শরণ লওয়ার কোন তাৎপর্য আছে কি? কিরূপে শ্রীভগবানের শরণ লইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে?

“মদন্ত, মদন্ত-চিন্ত, হও মম উপাসক,

কর নমস্কার।”

যুক্তায়া, মৎপরায়ণ—এরূপ হইলে পার্বে

একত্ব আমার।”

গীতা ৯ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

যে এরূপ ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে, তাঁহাকে ডাকিতে পারে, তাহার আর পাপে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে-ক্রমশঃ পুণ্যপথে অগ্রসর হইবে এবং তদনুরূপ তাহার পাপ ধর্ম-ফল ক্ষয় হইবে। এরূপে উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবে। অতএব কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রচলিত হিন্দু মত ও বৌদ্ধ মত প্রকৃত মুক্তি সম্বন্ধে যে বড়োবিভিন্ন তাহা বোধ হয় না। গীতার বহুস্থানে নির্বাণ ও মুক্তি অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবৎ হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান ভক্তিগ্রন্থ । তাঁহার দশম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায়ের “বঙ্গবাসী” কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত হইলঃ—

“জন্ম কৰ্ম্মাশেষেই জন্মগ্রহণ করে,-কৰ্ম্মাশেষেই লয় পায়, এবং কৰ্ম্ম-বশেই স্মৃৎ, হৃৎ, ভয় ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে । আর যদি অন্তের কৰ্ম্মের ফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনিও কৰ্ম্ম-কর্ত্তাকেই ভজনা করেন ; কারণ যে কৰ্ম্ম না করে, তিনি তাহাকে ফলদান করিতে পারেন না । অতএব জীবগণকে যখন কৰ্ম্মেরই অনুবর্তন করিতে হইতেছে তখন তাহাদের ইচ্ছা প্রয়োজন কি ? প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে মনুষ্যদিগের ভাগ্যে যাহা বিহিত হইয়াছে, তিনি তাহার কখনই অন্তথা করিতে পারেন না । মনুষ্য স্বভাবেরই অধীন, স্বভাবেরই অনুসরণ করিয়া থাকে । দেবতা, অসুর ও মনুষ্য সকলেই স্বভাবে অস্থিত রহিয়াছে । জীব কৰ্ম্মবশে উচ্চ, নীচ দেহ লাভ করিয়া কৰ্ম্মাশেষেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে । কৰ্ম্মবশেই শত্রু মিত্র বা উদাসীন হইতে দেখা যায় । সুতরাং কৰ্ম্মই ঈশ্বর । অতএব স্বভাবস্থ, স্বকৰ্ম্মকারী জীব কৰ্ম্মেরই পূজা করিবে ।”

ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । এবং ইহাই প্রকৃত বৌদ্ধধৰ্ম্ম নহে কি ? বুদ্ধদেব ইহার অধিক নিরীশ্বরবাদ কি কোথায়ও শিক্ষা দিয়াছিলেন ?

আমরা আরও দেখিতেছি বুদ্ধদেব আমাদের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার । তিনিই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে পূজিত হইতেছেন । বঙ্গের কৃতী পুত্র রাজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন শ্রীক্ষেত্রের অদ্বুত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সত্য নামক তিনটি মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিকল্প মাত্র । তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ মাত্র । বুদ্ধ আমাদের বিষ্ণু অবতার, কাজেই উহা বিষ্ণুপদ । বৌদ্ধ

ধর্মের “মা হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” মহাবাক্য, হিন্দুধর্মের একটি মূলমন্ত্র। অতএব কে বলিল বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে? বুদ্ধ-মত সার্বভৌম হিন্দুধর্মের একটি মত মাত্র। এখন যেকোন এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্ম, কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেরও এক পরিবারে কেহ ব্রাহ্মণ-মতাবলম্বী, কেহ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতে অল্পপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্ম অল্পপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্মের বহু-শাখার একটি শাখা বিশেষ। অতএব মানবজাতির তৃতীয়াংশেরও অধিক হিন্দুধর্মাবলম্বী।—ইহা একবার মনে হইলেও কোন্ মানব-হৃদয়, কোন্ হিন্দু-হৃদয়, হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব ও সার্বভৌমত্বে স্তম্ভিত না হয়! এ পতিত অবস্থায়ও ভারত জগতের ধর্মগুরু। এস হিন্দু-গণ! হিন্দুধর্মের সেই বিশ্বরূপ একবার দর্শন করি এবং কোটি কোটি ভক্তিগ্নুত কণ্ঠে গগন কম্পিত করিয়া সেই হিন্দুধর্মের স্তুতি গান করি—

“নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকল্পঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমোনমস্তে !

নমঃ পুণ্ড্রানুগ পৃষ্ঠভক্তে

নমোহস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব।”

স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্ত তিনটি মহৎ পথ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহার গীতায় দেখাইয়া দেন—জ্ঞান-পথ, কর্মপথ ও ভক্তি-পথ। তিনি তিনেরই সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়া যান। কিন্তু, হুর্দল মানব শ্রীভগবানের প্রতিভা কোথায় পাইবে? তাঁহার শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে? এ কারণে কালে সকল ধর্মশিক্ষকের ধর্ম-শিক্ষা মানবচরিত্রের বিকৃতি অহুসারে বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে

ভারতে সেই কৃষ্ণশিক্ষার অবনতি ঘটয়া ধর্ম কেবল আবার জী-
 যাতী যাগযজ্ঞে পরিণত হইল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া
 কৰ্ম্মপথ সম্প্রসারিত করিয়া যান। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা
 নিবন্ধন, কালে তাঁহার পরবর্তী বৌদ্ধ-যাজকগণ সে পথে ঘোরতর
 নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব উপস্থিত করিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া
 জ্ঞানপথের সম্প্রসারণ সাধন করেন, এবং বৌদ্ধধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া
 উহাকে তাঁহার সার্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কালে তাঁহার
 শিক্ষাও মার্মাবাদের কাঠবৎ কঠোরতায় পরিণত হইলে শ্রীচৈতন্য-
 দেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমে ধর্মের সেই
 কঠোরতা ভাসাইয়া দেন। গীতামূলক সম্প্রসারিত এই তিন মতের
 সম্মিলনেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম। কালে ইহাতে, এবং জগতের স্কল
 ধর্ম, জড়ত্ব প্রবেশ করিয়া ভারতের ও জগতে ঘোরতর অশান্তি
 উপস্থিত করিয়াছে। আবার ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান
 ঘটয়াছে। কাল পূর্ণ, এখন সেই মহা-প্রতিজ্ঞা আমাদিগের একমাত্র
 আশা—“সম্ভবামি যুগে যুগে।” এস! এই মহা আশা-স্রোতে জাতীয়
 তরণী ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার আবাহনের জন্ত আমর ভারত-
 সম্মানগণ অগ্রসর হই!

কলিকাতা

২২ শে আষাঢ়

১৩০২ সন।

}

নবীন।

TO

The Hon'ble H. T. S. Cotton, E. S. I.,

Chief Secretary to the Government of Bengal
A member of the Bengal Legislative Council

AND

Formerly District Officer of

CHITTAGONG.

THE PLACE OF MY BIRTH.

I

RESPECTFULLY DEDICATE THIS VOLUME.

As

A TRIBUTE OF GRATITUDE AND LOVE.

FROM

ITS PEOPLE

FOR HIS KIND AND SYMPATHETIC RULE

AND

Never-failing Interest in their Welfare.

অমিতাভ ।

(২৩০০—২৪০০ কল্যাণে আবির্ভাব ও তিরোধান)

অবতার ।

মাঝি সপ্ত স্বর্গ, শাস্তির ত্রিদিব,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-পতির শ্রবণে
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-হাহাকার
পশিল নরের করুণ স্বনে ।
কাঁদিল তাঁহার করুণ হৃদয়,
বাধিত হইল কোমল প্রাণ,
কহিল — “লভিব একজন আর,
জগতের দুঃখ করিব নির্বাণ ।”
গাইল আনন্দে দেবতা সকল,
স্বর্গে, স্বর্গে, স্বর্গে ছুটিল গান,—
“লভিবেন হরি এক জন আর
জগতের দুঃখ করিতে নির্বাণ ।”

শুভজন্ম।

হিমাচল পাদমূলে, শৈলজা "রোহিণী"-কূলে
 ছিল যথা কপিল-আশ্রম,
 নগর কপিলবস্তু, নরপতি শুক্লোদন,
 শাক্য-রাজ্য শোভে নিরুপম ।

শাক্য,-সূর্য্যবংশ-শাখা, প্রথর কিরণমাধা
 সূর্য্য-রশ্মি লভি নির্বাসন,
 স্থাপিয়া শাকোট বনে পার্বত্য নব রাজ্য
 • শাক্য নাম করেছে ধারণ ।

হিমাবৃত হিমাচল উত্তরে মহিমাময়,
 নীলাকাশে তরঙ্গে বিস্তৃত,
 পশ্চিমে কোশল রাজ্য শাক্যদের পিতৃভূমি,
 রাম-পদ-রঞ্জে পবিত্রিত ।

মগধের পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পূর্বে গর্বে,—
 প্রথর পূর্ব্বাহ্ন পরাক্রম;
 দক্ষিণে কাশী-কোশল, ভারতের মহাতীর্থ
 কাশী হৃদে করিয়া ধারণ ।

তিন দিকে রাজ্য ত্রয়; উত্তরে হিমাদ্রিস্থত
 প্রকৃতির বীর পুত্রগণ;—

তথাপিও শাক্যরাজ্য গর্বে মৈনাকের মত
 আশ্র-স্থান করিছে রক্ষণ ।

বৃদ্ধ রাজা শুক্লোদন; মহামায়া, প্রজাবতী,—
 মহিষী-যুগল পতিব্রতা,

শঙ্করের অঙ্কে যেন পার্শ্বতী ও ভাগীরথী
 পুণ্য-অঙ্কে প্রীতি, পবিত্রতা ।
 শাকা-রাজ্য স্থখে ভরা, ধন ধাত্রে প্রেম পুণ্যে
 পরিপূর্ণ দেশ মনোহর ;
 ধন ধাত্রে, প্রেম পুণ্যে পরিপূর্ণ রাজপুত্রী ;
 পরিপূর্ণ রাজ্যের অন্তর ।
 প্রেম পুণ্যোবিভাসিত শাস্তির স্ননীলাকাশে
 তবু যেন হ'য়েছে সঞ্চার
 কোথা ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, স্থখ শাস্তি জ্যোৎসনার
 পড়িয়াছে ছায়ার আঁধার ।
 পুত্রহীন শুক্লোদন ; মায়াময়ী মহামায়া,
 পূণ্যবতী প্রজাবতী তথা,—
 উভয়ের শূন্য অঙ্ক, পুষ্পহীন পুষ্প-পাত্র
 অধাহীন অধাকর যথা ।
 আসিল বসন্তোৎসব, ভাসিল কণিলবন্ত
 ছয় দিন উৎসবে মগন,
 দেখিলা সপ্তম দিনে, পূর্ণিমা-প্রভাতে স্থখে,
 মায়াদেবী অপূর্ণ স্বপন ।—
 চারি স্বর্গদূত আসি দেবীর পর্যাঙ্ক খানি
 হিমালয়ে করিয়া বহন,
 অবিশাল শালবনে নামাইল সসম্মে,—
 দিব্যালোকে উজ্জল কানন ।
 স্ববরাগীগণ নান অধাপূর্ণ সরোরবে
 করাইল দেবীরে তখন ;
 পার্শ্ববত্যাগেল ভাসি, হইল পবিত্র দেহ,
 কিরণ-মাবিত পুষ্পবন ।

রজত শেখর-শিরে, সুবর্ণ-প্রাসাদে শোভে
 পুষ্পাশ্রয়া চাকু-পুষ্পাবৃত্তা ;
 নক্ষত্রখচিত-বাসে, স্বর্গীয় সৌরভে পুষ্পা
 মায়াদেবী হইয়া সজ্জিতা
 গুইলেন ; দেখিলেন,— মাতঙ্গ ভূষার-শ্বেত,
 শুভে শ্বেতপদ্ম মনোহর,
 প্রশমিয়া তিনবার, বিদারি দক্ষিণ পার্শ্ব
 প্রবেশিল গর্ভে করিবর ।
 নিরমল চক্রে যেন পুষ্পবন-অন্তরালে,
 ধীরে ধীরে হইল সঞ্চার ;
 কি আনন্দে, কি আলোকে, ভাসিল দেবীর প্রাণ !
 ভাসাইল পতিত সংসার ।
 জাগিলেন মহামায়া । ডাকিলেন শুদ্ধোদন
 স্বপ্ন-বেত্তা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ;
 কহে তারা—“মহারাজ । হইলেন পুণ্যবতী
 মহারানী,— কি শুভস্বপন !
 থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজ-চক্রবর্তী,
 একছত্র করিবে ভুবন,
 যায় যদি ধর্ম্মাশ্রমে, হৃৎকপূর্ণ জগতের
 পাপভার করিবে মোচন ।”
 উৎসব আনন্দ রঙ্গে ছুটিল তরঙ্গ-স্রোতে,—
 মেঘ-ছায়া কোথা গেল ভাসি ।
 বসন্তের পৌর্ণমাসী, পূর্ণচন্দ্র হাসি হাসি,
 উজ্জ্বলি চািলি সুধারাসি ।
 পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে হইলেন মায়াদেবী—
 পুত্রবতী অপূর্ণ স্বপনে,

কি প্রীতি, কি পরিভ্রতা, কি গাঙ্গৌর্য্য, সরলতা,
কি আনন্দ জননীর মনে !

জগতের দুঃখে সদা কাঁদিত মায়ের প্রাণ,
মাঘার মূরতি মহামায়া,

কহিতেন—“নারায়ণ লভি এক জন্ম আর
দুঃখী জীব দেহ পদছায়া !”

এইরূপে কালপূর্ণ ! পৌষ-পূর্ণিমা আসি
হ’লো পুষ্যানক্ষত্র মিলিত ;

পুলকে পূরিল প্রাণ, আনন্দে “লুপ্তিনী বনে”
চলিলেন সঙ্গিনী সহিত ।

আসিছেন ঋতুপতি মধুরে মধুরে পুনঃ
মৃহ মৃহ ঢালি মধুরিমা !

প্রকৃতি মেলিছে আঁখি, ভাসিছে নিখলাকাশে
বসন্তের প্রথম নীলিমা ।

প্রথম মলয়ানিলে ফুটেছে প্রথম ফুল,
ফুটেছে প্রথম কিসলয় ।

প্রথম পাখীর গান, পুষ্পের প্রথম ভ্রাণ,
কানন করিছে সুধাময় ।

প্রথম বসন্তোন্মেষে দেবীর হৃদয়ে যেন
কিবা স্বর্গ ঝুলিল প্রথম,
অস্তরে বাহিরে দেবী দেখিলেন প্রেমালোক,
নারায়ণ প্রেম-প্রস্রবণ ।

সে প্রেমে ভাসিল বুক, সে প্রেমে হাসিল মুখ,
সেই প্রেমে ভিজিল নয়ন ;

স্বর্গীয় সঙ্গীতে ভাসি স্বর্গীয় সৌরভ রাশি,
দশদিক ছুটিল তখন ।

আনন্দে মুচ্ছিতা দেবী পড়িতে, ধরিলা করে

এক শাল-শাখা স্বশোভন,

প্রসূত হইল পুত্র, ত্রিদিব-লতায় যেন

ফুটিল প্রসূন মনোরম ।

যেই আনন্দের ধ্বনি উঠিল সে শাক্য-রাজ্যে,

প্রতিধ্বনি তুলি হিমালয়ে,

সহস্র সহস্র বর্ষ প্লাবি আজি বাজিতেছে

অর্দ্ধাধিক নবের হৃদয়ে ।

চন্দ্র অস্তরালে মেঘ, হাসি অস্তরালে অশ্রু,

নিয়ন্তার কি স্বপ্ন নিয়ম !

এই আনন্দের মাঝে, সপ্তম দিবসে হায় !

মায়াদেবী মুদিলা নয়ন ।

যাও মা করুণাময়ি ! জগতের দুঃখভার

যুগে যুগে করিতে মোচন

প্রসবিয়া দেবপুত্র, অবতীর্ণা হও তুমি ;

পূর্ণ তব নিয়তি এখন ।

যাও মা করুণাময়ি ! জরা-মৃত্যু দুঃখ-ভরা

এ জগত নহে তব স্থান ;

আছে মানবের আশা, আবার আসিবে তুমি,

নরদুঃখে কাদিলে পরাণ ।



ভবিষ্যৎ ।

হিমাদ্রির চারু অঙ্কে পবিত্র আশ্রমে
 যোগস্থ অসিত ঋষি ; সিত জটারাশি
 শোভিছে মস্তকে অতি বুদ্ধ মহর্ষির,—
 হিমানী-কিরীট ক্ষুদ্র শৃঙ্গে হিমাদ্রির !
 দেখিলেন ধ্যানে ঋষি অপূর্ব কুমার
 হইয়াছে অবতীর্ণ কপিলনগরে,
 অপূর্ব আনন্দ প্লাবি আকাশমণ্ডল
 প্লকিত পবিত্রিত করিছে ভূতল ।
 শূন্তে যোগবলে ঋষি রাজহংস মত
 আসিয়া কপিলপুরে মনোরথ-গতি
 কহিলেন—“নরপতি ! আসিয়াছি আমি
 তব নব জাত শিশু করিতে দর্শন ;
 পূরাও বাসনা মম ।” সঙ্কমে নৃপতি
 আনি পুষ্পনিভ শিশু চরণে ঋষির
 রাখিলেন স্বর্ণাসনে, শোভিল তখন
 স্বর্ণ পুষ্পপাত্রে স্বর্ণ পুষ্প নিকরম ।
 “অদ্ভুত—অদ্ভুত শিশু !”—কহি ঋষিবর
 ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া শিশুরে
 রহিলা—নীরবে ধ্যান-মগ্ন অবিচল,
 বহিতে লাগিল অশ্রুধারা অবিরল ।
 ভীত রাজা শুদ্ধোদন, বিস্মিত-অস্তর
 অমঙ্গল ছায়াচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন যেন
 হইল প্রফুল্ল শশী, জিজ্ঞাসিলা ত্রাসে—

“একি ভাব ঋষিশ্রেষ্ঠ ! কেন এ।রোদন ?
এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন ? এ অশ্রু নিশ্বাস
করিছে হৃদয়ে মম ঋটিকা সঞ্চার
ঘোরতর । কহ দেব । দেখিলে কি তুমি
অমঙ্গল এ শিশুর ? কহ দয়া করি,
কাতর পিতার প্রাণ ।”

মুছি, অশ্রুধারা

উত্তরিলা মহাযোগী,—“একি ভ্রান্তি তব !
অমঙ্গল !—মহারাজ ! মঙ্গল-নিদান
শিশু তব, অমঙ্গল সম্ভবে কি তার ?
নাই কাঁদিতেছি আমি শিশুর কারণ ;
আমার কারণ হায় । কাঁদিতেছি আমি ।
করিবেন প্রবর্তিত এই শিশু তব
ধর্মচক্র এ জগতে,—এই শিশু তব
সর্ব লোক হিত, সর্ব লোক সুখ আর,
সাধিবেন মহাধর্ম করিয়া প্রচার ।
তাহার কল্যাণ মূলে, মধ্যেও কল্যাণ,
শেষেও কল্যাণ তার ; শুদ্ধ, নিরমল
সেই ধর্ম সনাতন ;—শুদ্ধ, নিরমল
যথা নব বসন্তের আকাশমণ্ডল ।
মানব পাইবে মুক্তি ; হবে ব্যাধি-ধরা-
পাপ-তাপ-মুক্ত জীব, জুড়াইবে যথা ।
রাগ-দ্বेष-মোহ-দম্ব মানব হৃদয়ে
সুশীতল ধর্মামৃত হইবে বর্ষিত,
হবে ধরাতল সুখ শান্তিতে পূর্ণিত ।
উড়ন্ত পুষ্প যথা ফুটে কদাচিত,

কত কল্লাস্তরে নৃপ ! সেইরূপে হায় !
 এ বুদ্ধ পুরুষোত্তম পুত্ররূপে তব
 হইলেন অবতীর্ণ । হইবে উদ্ধার
 সংসার-সমুদ্র-গর্ভে জীব নিমজ্জিত
 লভিয়া নির্বাণ-তরী, জীব সস্তাপিত ।
 বুদ্ধ আমি ; জীবনের এই ক্ষীণ দীপ
 হইবে নির্বাণ আশু, কাদিতেছি আমি,
 সেই বুদ্ধরূপ নাহি দেখিব নয়নে ।
 কাদিতেছি আমি সেই বুদ্ধ আরাধনা
 ফলিল না ভাগ্যে মম । না শুনিব আমি
 সেই সাম্য গীত, সেই শান্তির সঙ্গীত,
 হবে যাহা প্রচারিত দেশ দেশান্তরে,
 যুগ যুগান্তরে যাহা করিবে ঘোষিত
 শৈল-বক্ষে শৈলমালা কবিয়া অঙ্কিত ।
 কাদিতেছি আমি ;—যেই উৎস করুণার
 প্রাণিয়া ভারতবর্ষ প্রাবিবে জগত,
 আমি এক বিন্দু নাহি পাইব তাহার ।
 মন্ত্রশাস্ত্র বেদশাস্ত্র কহিছে আমায়
 হইবেন বুদ্ধ এই কুমার তোমার ।
 সন্ন্যাস গ্রহণ করি জীবের উদ্ধার
 সাধিবেন, করিবেন নির্বাণ প্রচার ।
 হে রাজন্ ! দ্বাদ্বিংশৎ লক্ষণ মহান
 মহাপুরুষের, অনুবাক্যনা অশীতি,
 দেখ কুমারের দেবদেহে বিদ্যমান ।
 নহে নৃপতির এই লক্ষণ সকল ।
 তুচ্ছ রাজছত্র ; যেই ছত্র সুবিস্তার

স্থাপিবেন কাল-বক্ষে, অমর অক্ষয়,
 ব্যাপী অর্দ্ধ ধরাতল, দায়ায় তাহার
 মানব লভিবে শান্তি—একি পুণ্য তোমার !
 সিদ্ধ তব মনোরথ ; সিদ্ধ মনোরথ
 মানবের এতদিনে ; ভক্তিপূর্ণ মন
 রাখিও সিদ্ধার্থ নাম পিতা শুদ্ধোদন ।
 বিমাতা গৌতমী, দেবী মহা প্রজাবতী,
 পালিবেন শিশু,—নাম হইবে গোঁতম ।
 শাক্যকুলে জন্ম—নাম হবে শাকা-পুনি ।
 মানবের দুঃখভার হবিত্তে আগত
 যথাকালে শিশু—নাম হবে তৎসাগত ।
 মহা তপস্ভাষ, ধ্যান, লভি মহাজ্ঞান,
 ধর্মিণের পুত্রনাম—জাম্ববতীর চরম,
 অমর অক্ষয়, অমিল নবম ।
 ভগবতে নামের এই পূর্ণা নামভয়
 অদ্বিত কাল-বক্ষে, অমর অক্ষয় ।”

নামের এই পূর্ণ নামকরণ উৎসবে
 আসিল দৈবজ্ঞ অষ্ট । অপূর্ব লক্ষণ
 নিরখি শিশুর দেহে, কহে সপ্তজন—
 “থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধরার ;
 হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ অবতার ।”
 কনিষ্ঠ কোণ্ডিন্ত কহে,—“কহিতেছি আমি ;
 জরাজীর্ণ, কণ্ঠ, মৃত, ভিক্ষু বেই দিন
 নিরখিবে শিশু, গৃহ ছাড়িয়া সে দিন
 নিশ্চয় হইবে বুদ্ধ ; করিবে মোচন
 পৃথিবীর পাপ-তাপ, মোহ-আবরণ ।”

নৃপতি-নয়নে অশ্রু উঠিল ভাসিয়া ;
 ছায়ায় উপরে ছায়া ভাসিল অস্তরে,—
 গম্ভীর—গম্ভীরতর । রাখিলা প্রহরী,
 এই চারি দৃশ্য পুত্র নাহি দেখে যেন ।
 হায় ! মুগ্ধ নরপতি ! ডাকেন যাহারে
 অন্তর্যামী ভগবান, কে রাখিতে পারে
 রুদ্ধ করি গৃহ-দ্বার সেই পুণ্যস্মারে ?
 কবে জলধিরে যদি চল্ল আকর্ষণ,
 পাত কি রাখিতে আহা ! বালির বন্ধন !

(৩)

কৈশোর ।

বিমাতা দেবীর স্নেহে বাড়িতে লাগিল শিশু,
 বৈশাখের শুক্লপক্ষে যেন শশধর ;
 কোন দেবমূর্তি যেন দক্ষ দেব শিল্পকর
 করিতে লাগিল ক্রমে পূর্ণ কলেবর ।
 মহোৎসবে বিদ্যারম্ভ করিলেন শুভক্ষণে
 গুরু বিশ্বামিত্র সৰ্ব্বশাস্ত্রে হুনিপুণ ।
 কি আর শিখিবে শিশু, শিক্ষা দিতে জন্ম যার ?
 শিখে কি সৌরভ-লাভ মল্লার-কুসুম ?
 সৰ্ব্বশাস্ত্রে হুনিপুণ হইল কুমার আশু ;
 ছিল যেন, সৰ্ব্বশাস্ত্রে প্রজ্ঞার অন্তরে,

পুষ্পবৃক্ষে পুষ্প যথা বসন্তের পরশনে
 উঠিল ফুটিয়া যেন তারকা অশ্বরে ।
 কত শিশু বিদ্যালয়ে ! কপিল নগরে কত !
 কিন্তু এই শিশু—এ ত নহে পৃথিবীর !—
 শান্ত, স্থির, অচঞ্চল, কি মহিমা সমুজ্জল
 আলোকিছে স্বর্ণকান্তি, কি মূর্তি!প্রীতির !
 ক্রীড়া-যুদ্ধে, মৃগয়ায়, নাহি সমকক্ষ কেহ,
 নাহি সমকক্ষ অশ্ব, অস্ত্র, সঞ্চালনে ;
 কিন্তু ঘোর মৃগয়ায়, ঘোর যুদ্ধক্রীড়ায়,
 চকিতে থামিত শিশু, কি ভাবিত মনে ।
 মৃগের পশ্চাতে ছুটি আকর্ণ টানিয়া শর,
 সে মুহূর্ত্তে প্রতিহার করিত কখন ;
 যাইতেছে অশ্ব ছুটি শুনি অশ্ব কষ্টবাস
 থামিত, হইত কভু স্বপ্নে নিমগন ।
 জগতের হুঃখ কিছু কুমার ত নাহি জানে,
 দেখে নাই, শুনে নাই, ভাবে নাহি মনে,
 তথাপি হৃদয়ে ধীরে ত্রিদিব করুণা-উৎস
 হইতেছে সঞ্চারিত অজ্ঞাতে কেমনে ।
 একদিন নিরজনে মনোহর পুরোহিতানে
 সিন্ধু ভাবিতেছিল বসি অস্ত্র মন ;
 গুরু-মেঘ-বস্ত্র মত রাজহংস শত শত
 আনন্দলহরী পূর্ণ করিয়া গগন
 যাইছে ভাসিয়া স্বখে, হঠাৎ আহত বৃকে
 একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন ।
 উদ্ধার করিতে শর লাগিল কোমল করে,
 কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম,

অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
 বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ ।
 করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
 হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল ;
 কুমার লইয়া বৃকে, মুগ্ধা জননীর মত
 চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছু কাল ।
 কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও
 বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
 উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
 করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ !
 আসি দেবদত্ত কহে— “কুমার, এ হংস মম,
 মম শরে হ’য়ে হত পড়েছে ভূতলে ।”
 কুমার কহিলা ধীরে— “হতজীব হত্যাকারী
 পায় যদি ভাই ! কোনো ধর্মশাস্ত্র বলে,
 যে দেয় জীবন তারে, সে কি তাবে পাইবে না ?
 হত নহে এই হংস, আহত কেবল,
 আঘাতের ব্যথা ভাই । আজি বুঝিয়াছি আমি,
 হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল ।
 তোমারো ত আছে প্রাণ ; পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
 বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
 লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা ;
 এ হংস আমার , আমি দিব না কখন ।”
 শাক্য-পুত্র দেবদত্ত, স্তম্ভিত বিস্মিত চিত্ত,
 দেখিল, কুমার নহে,— মূর্তি করুণার ।
 কিবা করুণার গীতি তাহারো হৃদয়ে আজি
 প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাহার ।

কিরিল নীরবে গৃহে ; উড়িল মরাল স্বখে,
কলকণ্ঠে এ বরুণা করিয়া প্রচার ।

সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি নীরবে আকাশ পানে,
হৃদয়ে প্রথম চিন্তা হইল সঞ্চার ।

নীরবে বসন্তাকাশে নিদাঘের ক্ষুদ্র মেঘ
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে উঠিল ভাসিয়া ;

সিদ্ধার্থ ভাবিলা বসি—কি ভাবনা নাহি জ্ঞান—
নীল সাক্ষ্য নভঃপানে চাহিয়া চাহিয়া ।

ভাবিলেন—“এ শরের ঈষদ পরশে হয় !
প্রাণে যদি এই ব্যথা লাগিল আমার,

জনকের অজ্ঞাগারে কি ভীষণ অঙ্গ রাশি !
না জানি কি ব্যথা হয় ! আঘাতে তাহার !

তনিয়াছি ওই অস্ত্রে হইয়াছে কত যুদ্ধ,
হইতেছে কত যুদ্ধ নিত্য সংঘটিত !

কত লক্ষা, কুরুক্ষেত্র, হইয়াছে—হইতেছে—
এই পৃথিবীর বক্ষে নিত্য অভিনীত !

উহ ! রোদন ধ্বনি, কি ভীষণ হাহাকাৰ
উঠিতেছে মানবের জগত প্রাণিয়া !

হায় ! কি মানব অক্ষ ? করে ভোগ রাজ্য সুখ
মানবের বক্ষে এই অনল জ্বলিয়া ?”

বয়সের শ্রোত সহ চিন্তা-শ্রোত হুনিবার,
হইল বিস্তৃত ক্রমে, হইল গভীর ।

ব্রাহ্মপুরী কোলাহল ছাড়িয়া ঘোবনাগমে
চাহে বেড়াইতে যুবা কাননে নিবিড় ।

একাকী কি চিন্তা মগ্ন রহিতেন কদাচিত্,
ডাকিলেও সহচর, যুবা নিরুত্তর ।

অন্তরে কি যেন ক্ষুধা ! কি যেন পিপাসা প্রাণে !

বিলাসে বিতৃষ্ণা, রাজ্যে অতৃপ্ত অন্তর ।

আজি শুভ হলোৎসব ; সজ্জিত সহস্র হল

করিতেছে রাজপুর-ক্ষেত্র বিকশিত ।

সজ্জিত কৃষকগণ ; হলোৎসবে রাজপুরী,

হৃন্দর কপিলবস্ত্র, আনন্দে পূরিত ।

স্বমধুর মধু মাসে মধুরে প্রকৃতি হাসে

মাধুর্য্য মাখিয়া শ্রাম অঙ্গে নিকুপম ।

আকাশে আনন্দ হাসে, অনিলে আনন্দ ভাসে,

আনন্দ পল্লব পুষ্প, বিহঙ্গ-কুজন ।

প্রভাতে পূরবাশে আনন্দ অরুণ রাগে

উষার কোমল মুখ করেছে রঞ্জিত ।

হলোৎসবে চারিদিকে উঠিতেছে নরকণ্ঠে

প্রভাত কাকলী সহ আনন্দ-সঙ্গীত ।

সিদ্ধার্থও সুখী আজি ; আনন্দের এ তরঙ্গ

পশিয়াছে প্রাণে, মুখে উঠিয়াছে ভাসি ।

চাহিয়া চাহিয়া ওই কর্ষণ একাগ্র মনে,

ও কি ভাবনার মেঘ দেখা দিল আসি ?

যুবক দেখিলা কষ্টে সুসজ্জিত পশুগণ

বহিছে সজ্জিত হল বিদারি ভূতল ;

সজ্জিত কৃষকগণ, কিন্তু কষ্টে তাহাদের

হইয়াছে শ্বেদোদগমে ললাট সজল ।

কর্ষণে কর্ষণে কত মরিতেছে ক্ষুদ্র জীব,

সহিতেছে কি বেদনা হইয়া বিকৃত,

উড়ি উড়ি পক্ষিগণ খাইতেছে নিরমম

মৃত কি জীবিত হয় । ক্ষুদ্র জীব কত ।

এইরূপে জীব জীব হিংসিতেছে নিরন্তর,
 চারিদিকে কি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম !
 আনন্দের আবরণে আরবি প্রকৃতি-দেবী
 রেখেছেন কি অনন্ত ভীষণ শ্মশান !
 অনন্ত জীবের হঃখে কঁদিল কোমল প্রাণ,
 অলক্ষিতে অশ্রুমনা ছাড়ি সজ্জিগণ,
 ছাড়ি পূর-ক্ষেত্রসীমা সিদ্ধার্থ প্রান্তরে পশি
 ভ্রমিতে লাগিলা একা স্বপনে যেমন ।
 নগর-উৎসব-ধ্বনি, পল্লীর আনন্দ-ধ্বনি,
 প্লাবী, বিশ্বব্যাপী যেন কিবা হাহাকার,
 জীবের কি হঃখ গীতি, উঠিতেছে চারিদিকে !
 গজ্জিতেছে চারিদিকে যেন পাবাবার !
 দেখিলেন জম্বু বৃক্ষ অদূরে বিস্তারি ছায়া,
 আশ্রহারী তরুমূলে বসিলা কুমার,
 জন্মান্তর সংস্কার অজ্ঞাতে নিদ্রার মত
 করিল সমাধিমগ্ন আনন্দ-আধার ।
 বাইতেছে পঞ্চজন মহর্ষি আকাশ-পথে,
 অকস্মাৎ যোগাসন হইল অচল ।
 জম্বুবৃক্ষমূলে বসি দেখিলেন জ্যোতির্ষ্ময়
 নব যুবা, নিমীলিত নয়নযুগল ।
 শরীরে সূর্য্যের প্রভা, কনক কেশর আভা
 বিমণ্ডিত বরবপু মহিমা-আলয়,
 যোগাসনে যোগময় নিকম্প ভিত্তি মত,—
 অধিগণ মনে মনে মানিলা বিস্ময় ।
 “কে যুবা ? বাহার ধ্যানে আমাদের ধ্যান-প্রভা
 করিল নিস্তেজ, যোগ-আসন অচল ?”—

ভাবি মনে ঋষিগণ দেখিলেন মহা ধ্যানে
 বিষ্ণু-অবতার যুবা, শুদ্ধ নিরমল !
 অজ্ঞান আধারে পূর্ণ হইয়াছে এ সংসার,
 আবির্ভূত এ প্রদীপ নাশিতে আধার ;
 যেই মহা ধর্ম্ববলে জগত পাইবে মুক্তি,
 করিবেন নবযোগী সে ধর্ম্ম প্রচার !
 ভক্তিবরে ঋষিগণ করি তবে প্রদক্ষিণ,
 গ্রহে উপগ্রহ যথা, ধ্যানস্থ যুবায়ে,
 গেলা চলি প্রীতি মনে ; রাজপুরে এই দিকে
 উঠিয়াছে কোলাহল—“কুমার কোথায় ?”
 অবেশে সজ্জিগণ, রাজ-অনুচরগণ,
 আসি জম্বুবৃক্ষতলে হইল বিস্মিত ;
 সবিস্ময় শুদ্ধোদন, আসিলেন সেইখানে,
 ভাঙ্গিয়া আসিল পুরী, নগর সহিত ।
 অতীত মধ্যাহ্ন কাল ; তথাপিও স্থিরতর,
 রহিয়াছে বৃক্ষছায়া, করি ছায়াবিত
 ধ্যানস্থ কুমার-দেহ— রবিকরে চন্দ্র যথা,
 হইয়াছে রবিকর যোগে পরাজিত ।
 দেখিলেন শুদ্ধোদন সোণার মূরতি পুত্র
 স্থাপিত পাদপমূলে শবিত্ত হৃন্দর ।
 দেখিলেন শুদ্ধোদন ধ্যানস্থ নবীন যোগী,
 ভাবিলেন এই পুত্র । কতু নহে নর ।
 কি প্রীতি কি শান্তি মুখে । কি প্রীতির স্বপ্নে সুখে
 বেন নিমজ্জিত পুত্র, কি জ্যোতি নির্মল ।
 কি প্রীতি কি পবিত্রতা, চন্দ্র চন্দ্রিকায় যথা,
 করিতেছে দর্শকের পরাগ শীতল ।

ভক্তিভরে শুদ্ধোদন, অশ্রুপূর্ণ হনয়ন,
 দেখিছেন, দেখিতেছে নর সংখ্যাতীত
 নীরবে বেষ্টিয়া বৃক্ষ ; নীরবে নিদাঘানিল
 বহিতেছে, অশ্রুবৃক্ষ স্থির অকম্পিত ।
 আগ্রভাত অপরাহ্ন, একপে বসিয়া ধ্যানে
 করিলা কুমার ধীরে নেত্র উন্মীলিত ।
 উঠি ধীরে আশ্র-হার্য, প্রণমিয়া পিতৃপদ,
 কহিলা কাতর-কণ্ঠে করুণা-ব্যথিত,—
 “পিত ! হিংসাময় ক্রমি কর হুমি পরিহার,
 হয় পদে পদে জীব-হিংসা সংঘটিত ।
 পিত ! জীবের কর দয়া । কর সর্ব জীব সুখী
 কর জগতের সুখে প্রাণ সমর্পিত ।”

(৪)

অশোকোৎসব ।

চিন্তাধিত শুদ্ধোদন ; চিন্তাধিত প্রজাবতী
 কহিলা কাতরে—
 “একি ধ্যান সিদ্ধার্থের ? আমার সিদ্ধার্থ, নাথ ।
 যবে না কি ঘরে ?
 বড়ই ব্যাকুল আজি হইয়াছে প্রাণ ।
 কে শিখাল, কেমনে বা শিখিল এ ধ্যান ?”
 ঈষৎ হাসিয়া রাজা কহিল তখন—
 “কে শিখাল তোমাকে এ অশ্রু বরিষণ ?”

দেবী কহে—“দেও তুমি বিবাহ তাহার
 হইবে সংসারী তবে সিদ্ধার্থ আমার ।”
 চিন্তাশ্রিত শুক্লোদন আসিল। সভায়,
 সভাগৃহ সমাচ্ছন্ন চিন্তার ছায়ায় ।
 সমাচ্ছন্ন রাজপুরী, কপিল নগর ।
 সর্বমুখে “রাজপুত্র করিবে না ঘর ।”
 চিন্তিত অমাত্যগণ কহিলা—“নৃপতি !
 বাড়িতেছে উদাসীন্ম ক্রমে দ্রুতগতি
 কুমারের হৃদয়েতে করিয়াছি স্থির
 আমরা অমাত্যগণ, না হ’তে গভীর
 এই শ্রোতস্বতী, বাধি বিবাহ-বন্ধন
 করিব কোশলে তার গতি নিবারণ ।
 সিদ্ধার্থের সপ্তদশ বৎসর অতীত ।
 যৌবন-উষায় এবে প্রেম উন্মেষিত ।
 নিষ্ঠার প্রমোদপুরী, প্রমোদ কানন ;
 রচিব স্বপ্নের স্বর্গ, প্রেমের স্বপন ।
 বিলাসে প্রণয়াবেশে, এ মৃগ মিশুন
 বাধিব হিমুন্ধ ; যবে প্রহরী নিপুণ ।
 জরা, বাধি, মৃত্যু, দুঃখ, উদাসীন আর,
 দিব না আসিতে পূর-পরিথার পার ।”
 ভাসিল ঈষদ্ হাসি নৃপতি-বদনে,
 রবিকর-রেখা যেন মেঘাল গগনে ।
 কহিলেন—“হায় ! এই বালির বন্ধন
 করিবে কি তটিনীর গতি নিবারণ ?
 জন্ম যার হিমাচলে, হায় । গিত তার
 কে পারে রোধিতে বল বিনা পারাবার ?

তথাপি বিবাহ যদি তোমাদের মত,
কর আয়োজন, কর পূর্ণ মনোরথ ।
কিন্তু কুমারের মত জান একবার,—
কিরূপ, কাহার কত্না বাসনা তাহার ।
জিজ্ঞাসিলে রাজপুত্রে রাজ-অমুচর,
কহিল—“উত্তর দিব সস্তাহ অন্তর ।”
গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হইলা কুমার ।
ভাবিলেন দিবানিশি—“সংসারে আমার
নাহি তৃপ্তি ; যে ক্ষুধায় পিপাসায় প্রাণ
আকুল, বিলাসে নাহি হতেছে নির্বাণ ।
কেবল বাসনা, বসি বিজন গহনে
থাকি সেই নিরমল স্বপ্নের স্বপনে !
ভাবি—কোথা হ’তে আসি যেতেছে কোথায়
এই বিশ্ব চবাচর জলবিশ্ব প্রায় ?
ভাবি—এ ভীষণ হিংসা কেন পরস্পরে
জলে স্থলে, মহাশূন্তে জীবের অন্তরে ?
ভুবি হিংসা-বহিমাঝে, পরিয়া গলায়
পরিণাম পুষ্পহার কি হইবে হায় !
অশ্রুও ভীষণ হিংসা । এই বলিদান, —
নিরমম এ হিংসা কি স্বর্গের সোপান ?
এই নির্দয়তা ধর্ম ?—মনে নাহি লয় ।
না—না—এই নির্দয়তা ধর্ম কতু নয় ।
আছে কোনো ধর্ম, কোনো নীতি সনাতন,
করিবারে এই হিংসা-বহি নির্বাণ ।
যে চাহে কাঙ্ক্ষা এই সংসার-বন্ধন
করিবারে সেই মহা ধর্ম অন্বেষণ,—

কথিয়া বিবাহ, ভোগ বিলাস সম্বল,
 পরিবে সে শৃঙ্খলের উপরে শৃঙ্খল ?
 না করিলে মনপ্রাণ সর্বস্ব অর্পণ,
 জীবের এ হুঃখ নাহি ঘুচিবে কখন ।
 এক প্রাণ দিব কারে—হুঃখ পারাবার
 অনন্ত প্রাণীকে, কিংবা পত্নীকে আমার ?
 যেমন আমার প্রাণ হিংসায় কাতর,
 না হবে তেমন কেন পরের অন্তর ?
 সঞ্চারিছে যেই শান্তি দয়ার নিষ্কর
 মম প্রাণে, নর প্রাণে কেন নিরন্তর
 বহিবে না, করিবে না শাস্ত স্ত্রীতল
 হায় ! হিংসানলে দগ্ধ এই ধরাতল ?
 নরের এ দয়া বুঝি ধর্ম সনাতন !
 এই ধর্ম হবে বুঝি হিংসা নির্দাপণ !
 যাব বনে—করিব না বিবাহ কখন—
 মহাধ্যানে করিব এ তত্ত্ব অবেষণ ।
 থাকিলে সংসারে, ভোগ বিলাসে জড়িত
 হইয়া এ আত্মা হবে পাপে কলুষিত ।
 কাটি জনকের স্নেহ, স্নেহ জননীর,
 জীবহুঃখে দিব প্রাণ—করিলাম স্থির ।”
 সুসজ্জিত কক্ষে যুবা ভ্রমি কিছুক্ষণ
 চিত্তামগ্ন পথহারা পথিক যেমন
 আধার-প্রান্তরে দীপ করিল দর্শন ।
 প্রফুল্ল বদনে যুবা করিল তখন—
 “না—না—হইতেছে ভুল, যদি এ সংসার
 ছাড়ে সবে, গৃহাশ্রম রহিবে না আর !

থাকি গৃহে এই ধর্ম করিব সাধিত
শিখাব সাধিতে নবের হয়ে পবিত্রিত ।
বিকার-সমুদ্রে ডুবি রব নির্বিকার,
পঙ্কজ পঙ্কেই বাড়ে, জলে শোভে আর !
পূর্ষ মহাজনগণ ছিলেন সংসারে

অনাশক্ত, অগ্নিদেব যেমতি অঙ্গারে ।
থাকিব সংসারে ; যেই দয়ার নিঝরে
সুশীতল মম প্রাণ, নবের অন্তরে
এই সুশীতল উৎস করিয়া সঞ্চার
নিবাব হিংসার বহি, জুড়াব সংসার ।”
সিকার্ব সপ্তম দিনে, প্রফুল্ল অন্তর,
“করিব বিবাহ আমি”—করিলা উত্তর ।

“রূপ কুল জন্ম গোত্র বিশুদ্ধ বাহার,
রূপসী বিদুষী নব্রা জেগী, নাহি যার ।
মুখে প্রফুল্লতা বৃকে কঙ্কণা আলয়,
হস্তে পর-সেবা, বাক্য মধুরতাময় ।
স্নেহে মাতা ভগ্নী সমা, পতিপরায়ণা,
নাহি মনে প্রগল্ভতা, তর্কে অপ্রবণা ।

তানে ধর্মে অনালস্ত, জানে আত্মসম
সর্ব-জীব, সেই নারী হবে পত্নী মম ।”

চিন্তাবিত নরপতি—হেন নিরুপমা
কোথায় মিলিবে কস্তা ? দিলেন ঘোষণা ,
“শাকা-কুমারীকে, যগি-কাঞ্চনে পূরিত,
করিবে “অশোক ভাণ্ড” স্বখে বিতরিত
কুমার সপ্তম দিনে ।” উৎসব-বাসরে
হাসিল সজ্জিত পুরী প্রফুল্ল অন্তরে

সজ্জিত অশোক কক্ষ বিচিত্র বাসনে,
 বিচিত্র কুসুমদামে, বিচিত্র ভূষণে ।
 বিচিত্র পুষ্পের বেদি ; পুষ্পেত কুমার
 নবীন যৌবন-পুষ্পে ; দীর্ঘ পুষ্পহার
 চাঁক নব যৌবনের শাক্য কুমারীর
 বহিতে লাগিল ধীরে, যেন জাহ্নবীর
 সলিলে কুসুমদাম চলেছে ভাসিয়া
 পূজি কোনো দেব-পদ তরঙ্গে নাচিয়া ।
 কুমার সজ্জিত পুষ্পে, সজ্জিতা কুমারী,
 সজ্জিত অশোক ভাণ্ড পুষ্পে সারি সারি !
 কুমারের করে ভাণ্ড করিয়া গ্রহণ,
 বিনিময় করি করে আত্ম সমর্পণ,
 একে একে ভাণ্ড শিরে গেল বালাগণ,
 গেল চন্দ্র-কির্দীটিনী যামিনী যেমন ।
 কুমার অটল, স্থির, অবিচল মন,
 স্বর্ণ দেবমূর্তি যেন ;—এ কি দরশন !
 কোমুদী যামিনী-শেষে উঠিল কি ভাসি
 উষার আলোকরাশি স্প্রভাতে হাসি ।
 দণ্ডপাণি-সুতা গোপা অতি ধীরে ধীরে
 প্রবেশিল দিবা যেন অশোক-মন্দিরে ।
 হাসিল সে রূপালোকে কক্ষ সুষোভন,
 বসন্ত-প্রভাতে যেন কুসুম-কানন ।
 কুমার চাহিলা—চক্ষু ফিরিল না আর,
 নিম্পন্দ বহিল চাহি বদন গোপার ।
 ভাসিয়া উঠিল জন্মান্তর-স্মৃতি মনে,
 অকুরিল স্পৃষ্ট বীজ বর্ষা সমাগমে ।

কুমার দেখিলা স্বপ্ন,—যমুনার তীর,
 কি সুন্দর বন, কিবা শোভা প্রকৃতির ।
 কিশোর গোপাল তিনি, কিশোরী গোপিনী
 এই গোপা, কিশোরের প্রেমে উন্মাদিনী ।
 কি মধুর প্রেমলীলা ভক্তির চরম ।
 কি মধুর যুগলের আত্মবিস্মরণ ।
 গোপাও আপনা-হারা রয়েছে চাহিয়া,
 নবোঢ়া যুথিকা যেন চন্দ্র নিরখিয়া ।
 কি অজ্ঞাত স্থখে পূর্ণ হৃদয়
 হইল প্রথম,—স্বপ্ন পৃথিবীর নয় ।
 ভগ্ন স্বপ্ন কুমারের, ভগ্ন কুমারীর,
 হইল, রহিল চাহি পানে পৃথিবীর ।
 সলজ্জা কহিলা গোপা হাসি আধ আধ—
 “যুবরাজ ! করিয়াছি কোন অপরাধ ?
 করিলে বঞ্চিত, নাহি দিলে উপহার,
 কেন হইলাম আমি যুগার আধার ?”
 “নহে যুগা”—লজ্জাপূর্ণ কহিলা কুমার
 “নিঃশেষ অশোক ভাও ; কিবা উপহার
 দিব ভাবিতেছি যনে ।” করিয়া মোচন
 অঙ্গুরী গোপার করে কহিলা অর্পণ ।
 বীড়ার অরুণ রাগ বপোলে গোপার
 ভাসিল, অঙ্গুরী গোপা খুলি আপনার
 কহিলেন—“এ অঙ্গুরী করুন গ্রহণ
 রত্ন বিনিময়ে এই তৃণ অকিঞ্চন ।
 আমি উপাসিকা, নহে বাসনা আমার
 আভরণহীন কর দেখি আপনার ।”

গেলা চলি গোপা বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনী ;
ঐঠিল কপিলপুরে আনন্দের ধ্বনি ।

(৫)

বিবাহ ।

সিদ্ধার্থ সপ্তম দিনে শাক্যকুল-ধর্ম্মমতে,
রঙ্গভূমে সজ্জিত বিস্তৃত
শিল্পে শৌর্য্যে যুবাবুন্দে হেলায় করিলে জয়,
শাক্যগণ হইল বিস্মিত ।
অজন্ম বৈরাগ্য ভয়ে বিলাসে পালিত যুবা,
পিঞ্জরের বিহঙ্গ যেমন ;
কোথায় পাইল যুবা এ অপূর্ব্ব শৌর্য্য বীৰ্য্য,
এই শিল্প শিক্ষা নিরুপম
হায় ! মুখ শাক্যগণ ! কিবা অসম্ভব তার,
নারায়ণ অংশে জন্ম যার ?
শিখে কি কেশরী শৌর্য্য ? শিল্পবিদ্যা ইন্দ্রধনু ?
সজ্জিত কোকিলে শিখে আর ?
“জয়, রাজপুত্র জয় !”— গাইল অনন্ত কণ্ঠ,
বামাগণ দিল হলুধ্বনি,
বাজিল মঙ্গল-বাদ্য, গোপা দিলা বরমালা,
পুষ্পবৃষ্টি করিল রমণী ।
বিবাহ-উৎসবে মত্ত হইল কপিলবন্ত
সপ্ত দিবা নিশি অবিরাম,

দানশ্রোতে দরিদ্রতা গেল ভাসি, শাক্যরাজ্যে
 হইল হুঃখের অবসান ।
 উনবিংশ বর্ষ যবে হইলেন রাজপুত্র
 উদ্ধাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত,
 উড়িবে অনন্তাকাশে যে বিহঙ্গ মনসাধে
 হইল পিঞ্জরে নিপতিত ।
 তথাপি রাজার মনে নাহি শাস্তি, এ শৃঙ্খল
 কাটে পাছে পাখী উদাসীন,
 নির্মলা বোহিণী তীরে নির্মলা প্রমোদ-পুরী
 শিল্পী-স্বপ্ন নন্দন-প্রতিম ।
 বেষ্টিত নিবিড় বনে চাক্র শৃঙ্গে মনোহর
 গ্রীবা-বর্ষা-হেমন্ত-নিবাস
 হইল নির্মিত চাক্র, মর্ম্মরের স্বপ্ন যেন
 বিচিত্র তরঙ্গে পরকাশ ।
 উত্তরে অদূরে স্থির ধ্যানমগ্ন হিমাচল,
 তুষার রজতে বিমণ্ডিত,
 মিশেছে মহান্ শির মহান্ অনন্ত সনে,
 যেন যোগ-আত্মা সমাহিত ।
 স্তরে স্তরে মহাবন, দিগব্যাপী শৈলবপু,—
 স্থানে স্থানে মেঘে আচ্ছাদিত,
 তুষার নির্ঝর ধারা শোভে শৈল বক্ষ বাহি,
 যেন বজ্রতের উপবীত ।
 হিমাচল পদতলে শোভিতেছে পুরী, যেন
 পুষ্পপাক্ষ দেব-পদতলে,
 তিন দিকে বোহিণীর, শশধরে বেষ্টি যেন,
 মরকত মেখলা উছলে ।

মধুর সঙ্গীত ধ্বনি বহে নিৰ্জ্জনতা বক্ষে
 স্ৰবাসিত শৈল সমীরণ,
 নাচিছে নর্তকীগণ, পুষ্পোত্থানে পুষ্পগণ,
 বক্ষে শিখী তুলিয়া পেশম ।
 গোপার মধুর প্রেমে করিল প্রমোদ-পূরী
 প্রেমের মাধুর্য্যে প্রপূরিত,
 গোপায় প্রেমের স্রোতে বৈরাগ্য চলিল ভাসি,
 সিদ্ধার্থ হইল নিমজ্জিত ।
 গোপা রূপবতী, গোপা গুণবতী, ধর্ম্মে মতি,
 পতি-প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা,
 সিদ্ধগর্ভে নদী যেন, সিদ্ধা সাধিকার মত
 পতি-পদে গোপা আত্মহারা ।
 • নাহি অঙ্গে আভরণ, না আছে অবগুষ্ঠন,
 দেখিয়া বিবশা লজ্জাহীনা,
 একদা হাসিল সখী ; হাসিয়া কহিলা গোপা
 উজ্জ্বলে আলাপি কণ্ঠবীণা,—
 “নারী-আভরণ ধর্ম্ম, নারীর সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম,
 ধর্ম্ম অবগুষ্ঠন তাহার ।
 স্নানলিলা দীর্ঘিকার আছে কি অবগুষ্ঠন ?
 কি অবগুষ্ঠন চন্দ্রিকার ?
 ইন্দ্রিয় সংযত যার, বাক্য যার নিয়মিত,
 চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ যাহার,
 মন যার নিরমল স্বচ্ছ সরসীর জল,
 আবরণে কি কাজ তাহার ?
 আর যার লজ্জা নাই, সজ্জন নীলতা নাই,
 চিত্ত যার নহে বশীভূত,

ইন্দ্রিয় হৃদমনীয়, শত অবগুণ্ঠনেও
 সেই নারী সদা অনাবৃত !
 আত্মবশ চিত্ত মম, পতিতে আমার প্রাণ,
 চরিত্র হুর্ভেদ্য আবরণ,
 স্বয়ং অজ্ঞেয় হৃগ, তাহার রক্ষক ধর্ম,
 লজ্জা অবগুণ্ঠন বসন !”
 গোপা আর সিদ্ধার্থের বিবাহ পবিত্র যোগ
 গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলন,
 সিদ্ধার্থ আপনি কাষা, গোপা পুণ্যবতী ছায়া,
 পতি-প্রাণে পশিল কেমন !
 দুইটি শিশির বিন্দু যথা কুল পুষ্পদলে
 সমীরণে হয় সংমিলিত,
 দুইটি হৃদয় প্রেমে হইল মিশ্রিত তথা,
 হইল বিন্মিত বিমোহিত ।
 রাজপুত্র এতদিন ছিলেন জীবন-পথে
 পথিক একাকী অসহায়,
 সঙ্গিনী সহধর্মিণী মিলিল, পাইল তরু
 শক্তি, সম-প্রাণতা, লতায় ।
 বুঝিলেন রাজপুত্র নৃশংস হিংসার মাত্র
 রক্তভূমি নহে এ সংসার,
 আছে তাহে প্রেমধারা নিবমল সুশীতল,
 বনপথে আলো জ্যোৎস্নার ।
 ভাবিলেন বুঝি আছে দুঃখের ছায়ায় সুখ,
 হাহাকার সঙ্গে আছে হাসি,
 বহুভূমে আছে সর,— পতিপ্রাণা রমণীব
 পতি-প্রেম বর্গ-সুধায়াশি ।

নবীন বৈরাগ্য মেঘ, গোপার প্রণয়ালোকে
হইল অদৃশ্য, আলোকিত ;
আশ্রিত হইল রাজা, হতভাগ্য শুক্লোদন
বিহ্বলে হইল প্রতারণিত ।

(৬)

গাথা ।

মহাঝটিকার পূর্বে প্রশান্ত প্রকৃতি মত,
শান্তির স্বপ্নে জোড়ে রাজপুরী নিজাগত ।
নাহি উদ্বেগের ছায়া, নাহি নিরানন্দাভাস,
রাজার হৃদয়ে,—যেন খচিত শারদাকান্ত
আশা-তারকায় ভরা ; মাতা গৌতমীর প্রাণ,
কুম্বিত সর্বোবর,—পূর্ণ তাঁর মনস্কাম ।
গোপার সৌন্দর্য্যে প্রেমে সিদ্ধার্থ মুগ্ধ, মোহিত,
বুকিলেন বনহস্তী হইয়াছে শৃঙ্খলিত ।
নাহি বৈরাগ্যের ছায়া সিদ্ধার্থের মুখে, প্রাণে,
সে রূপ সিদ্ধার্থ আর না থাকে বসিয়া ধ্যানে ।
রূপের তরঙ্গ তুলি' রূপসী নর্ত্তকীগণ
নাচিতেছে, করিতেছে কণ্ঠ-সুধা-বরিষণ ।
সুধার তরঙ্গ তুলি' নানা যন্ত্র একতানে
বাজে বলকণ্ঠ সব অমৃত ঢালিয়া প্রাণে ।
নৃত্য গীতে নবপুরী মুখরিত মনোহর,
আলোকিত রূপে, পুষ্পে সুসাসিত নিরন্তর ।
এই বিলাসের স্বপ্নে, গোপার বদন বৃকে,

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

চাহি মুখ প্রেমমুগ্ধ একদা সিদ্ধার্থ সুখে
 শুনিছেন একমনে বাঁশরী-স্বর-মহরী,—
 বাজিতেছে বেণু কণ্ঠে এ কি গীত মুগ্ধকরী !
 নীরব নিশীথ স্থির, নীরব নিদ্রিত পুত্র,
 কক্ষান্তরে বাতায়নে সখী একা কি মধুর
 আলাপিছে বেণু ! সখী কি বাজায় নাহি জানে,
 কি যেন অভূতপূর্ব বসিয়া অজ্ঞাত ধ্যানে
 নিজে আত্মহারা বালা !—একি দেবমায়া হায় ।
 সেই নৈশ বাঁশরীর মুচ্ছনায় মুচ্ছনায়
 কি যেন বৈরাগ্য-সুধা করিতেছে সঞ্চায়িত
 নিদ্রিত জগৎ-প্রাণে, কুমার প্রাণে মোহিত ।
 নিদ্রিত গোপার মুখ বন্ধে, যুবা আত্মহারা,
 না দেখে নয়নে আর । ধীরে নয়নের তারা
 হ'লো নিমীলিত, বন্ধে ছলিয়া পড়িল মাথা,
 শুনিতে লাগিল যেন বাঁশরীতে এই গাথা ।—
 “জরা ব্যাধি হুখে ভরা হায় ! এইজিকুবন,
 মরণ-অগ্নিতে দীপ্ত, অনাশ্রয়, অকিঞ্চন ।
 কুন্তলভ্রমরের মত হায় ! জীব আর,
 মরণের হস্ত হ'তে নাহি কি উদ্ধার তার ?
 শারদীয় অলসম অনিত্য এ বলালয়,
 জন্ম মৃত্যু নিরন্তর করিতেছে অভিনয় ।
 বেগবতী নদী মত, চঞ্চল বিছাৎপ্রায়,
 মানব-জীবন ক্রম কোথায় চলিয়া যায় ।
 অজান আঁধারে বোর তৃষ্ণায় পীড়িত নর,
 কুন্তলভ্রমর মত ঘুরিতেছে নিরন্তর ।
 ইজিরের সুখে মুগ্ধ হায় যে মানব মত,

জড়িত ব্যাধির জালে প্রলুব্ধ যুগের মত ।
 বাসনা জলন্ত বহি ; তাহার ইন্ধন ভোগ ;
 ভোগ সুখ স্বপ্ন সম, জলে চন্দ্র-ছায়া ভোগ ।
 যৌবনে স্নান দেহ হ'লে জরা-ব্যাধি-গত
 করে নর পরিহার, যুগে শুষ্ক হৃদ মত ।
 ফলিত পুষ্পিত চারু বৃক্ষ সর্ম দেহ, হয় ।
 জরা আক্রমিলে হয় তড়িৎ-আহত-প্রায় ।
 কহ যুনে ! মানবের কি আছে উপায় বল ?
 জরা দহে দেহ, যথা গুপ্ত বিষ বনস্থল ।
 হরে পরাক্রম বেগ, স্তরূপ বিরূপ করে,
 হরে সুখ, হরে শান্তি, ব্যাধি-দগ্ধ করে নরে ।
 কহ যুনে ! মানবের কি আছে উপায় বল ?
 নির্বাপন হইবে কিসে জরা-ব্যাধি-জুঃখানল ?
 শিশিরে তুষারপাতে প্রফুল্ল কমল প্রায়
 হয় ! দেহ, বল, রূপ—সকলি শুকায়ে যায় ।
 নিপতিত নদীবক্ষে বিগুপ্ত পত্রের মত,
 এ সংসারে প্রিয়জন ভাসিয়া যায় সতত ।
 যে যায় সে যায় হয় ! কেহ ত ফিরে না আর,
 মিলন তাহার সহ নাহি হয় আরবার ।
 সকলি মৃত্যুর বশে, মৃত্যু বল বশে কার ?
 জন্ম-জরা-মরণের বিষে পূর্ণ এ সংসার ।
 ক'রেছিলে প্রাণিধান সিদ্ধার্থ ! কি মনে হয়—
 উদ্ধারিতে এ সংসার ? উপস্থিত সে সময় ।”
 চন্দ্রমা পশ্চিমাকাশে ডুবিতেছে ধীরে ধীরে,
 ধীরে ধীরে ভাসিতেছে উষা পূর্বাকাশ-শিরে ।
 বাণী-কণ্ঠে এ সময়ে শুনি এ অপূর্ব গান,

নিদ্রিত কি আগরিত সিদ্ধার্থের নাহি জ্ঞান ।
 বারেক ভাবিলা মনে—পৃথিবীতে এ সঙ্গীত
 সম্ভবে না, শুনিতেছি স্বপ্নে ত্রিদিবের গীত ।
 শুনিলেন বিহঙ্গের অক্ষুট কাকলী গান ।
 বুঝিলেন নহে স্বপ্ন,—আকুল হইল প্রাণ ।
 হৃদয় করিল মুগ্ধ সঙ্গীত-সুধা-তরল,
 জাগিল নিদ্রিত প্রাণে প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানল ।
 আবার উঠিল বাজি বাঁশীতে মধুর গান,
 শুনিতে লাগিল পুনঃ সিদ্ধার্থ উদাস প্রাণ ।

গাথা ।

১

এ বাঁশীর স্বর, মানব-জীবন ।
 সুধাময় অনিল-নিষন ।
 আনল-লহরী মত, জীবন বহে সন্তত,
 ঝটিকা নিশ্বাস—কুস্বপন ।

২

কোথায় হইতে আসি, কোথায় বা যায় ভাসি,
 আদি অন্ত কোথায় কেমন ?
 শুধু দেখি অনিবার আসে যায় বার বার,
 তাহে শক্তি পায় না কখন ।

৩

এই ভোগ, এই সুখ, এই পরিজন-মুখ,
 বাঁশীর তরল যেমন,
 উঠ, উঠ, মায়াহত । কাঁদিছে হৃদয়ে অগত,—
 কি কাতর কল্পণ বোদন !

এই দেহ স্বকুমার, এই প্রেম পুষ্প-হার,
তুকাইবে, রবে, না কখন ।

অনিত্য এ স্বথ ছাড়, নিত্য স্বথ আবিষ্কার
কর তুমি, কর নিজ্জয় ।

বসিলেন যুবরাজ উঠিয়া পর্য্যকোপরে,
অভিভূত, আত্মহারা সেই সঙ্গীতের সুরে ।
জীবনের পূর্ব-কথা ভাসিয়া উঠিল মনে ।
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য দেখিলেন হৃদয়নে ।

বুঝিলেন এ সংসার আনন্দ্য, কিছুই নয়,
এজীবন-দীপালোক জলি নির্দীপিত হয় ।

সত্য বেগু-রব-মত মানব-জীবন হায় !

আইসে কোথায় হ'তে কোথায় ভাসিয়া যায় ।

কিন্তু এ অনিত্য মাঝে অবশ্য আছে নিশ্চয়

কোনো নিত্য সত্যস্বথ, মানব-শাস্তি-আলয় ।

যদি আমি পাই তাহা, পারি প্রদানিতে নরে,—

গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন ধ্যানভরে ।

পুত্রের বিলাসে মুগ্ধ, শাস্ত চিত্ত, ভ্রান্ত মন;

নিশাশেষে ও কি স্বপ্ন দেখিছেন শুক্লোদন ?

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব শুক্ল জগৎ ;

জীবগণ নিদ্রা ক্রোড়ে অবিচল মৃতবৎ ।

এমন সময়ে পুত্র ত্যজি রাজ আভরণ

পরিত্রাজকের বেশে করিতেছে নিজ্জয় ।

পশ্চাতে মঙ্গলগীত গাইতেছে দেবগণ,

বাজিছে মঙ্গলবাত্ত আকাশে মধুর স্বন ।

হৃদয় হইল শুক্ল, কাগিয়া উঠিল বুক,

কহিলেন, স্বপ্নে ডাকি উঠেঃ স্বপ্নে শুক্লমুখ—
 “কঙ্কুকি । কঙ্কুকি । ওবে ফাটে বুক দেখে আয় ।
 কাঁদাইয়া পুরবাসী সিকার্য কোথায় যায় !”

(৭)

বৈরাগ্য ।

দেখিলেন রাজপুত্র,— দিন দিন মায়াজালে
 করিতেছে জড়িত সংসার ;
 যে বিলাস বিষবৎ ভাবিবেন পূর্বে মনে,
 এবে মুখ কুহকে তাহার ।
 বিলাসের বিষবৃক্ষ বাড়াতেছে দিন দিন,
 হৃদয় করিছে আচ্ছাদিত ।
 আর না, এখন তাবে সমূলে হুতুট-করে
 করিবেন বলে উৎপাটিত ।
 হইলেন রাজপুত্র পুনঃ ধ্যান-নিমজ্জিত
 ভয়ে প্রাণ কাঁপিল গোপার ।
 পুত্র-প্রাণ শুকোদন দেখিলেন, আশাকাশে
 পুনঃ মেঘ হইল সঞ্চার ।
 গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্তের বিচিত্র প্রাসাদত্রয়
 করিলেন নির্মিত, সজ্জিত,—
 রমণীর রূপালোকে, সঙ্গীতের সুধা-স্রোতে,
 বিলাস বিলাসে অপূরিত ।
 ইন্দ্রন ইন্দ্ৰিয়-স্থখে চালে রাজা কত মতে !
 কিন্তু-পুত্র বিতৃষ্ণ সতত ;
 থাকে ধ্যানে অন্তর্যমানে আনন্দপূর্ণ ভবনে,
 পদপদ্মে নীরবিন্দু মত

একদিন সন্ধ্যাকালে, কুমার যাইতেছিল।

ঐমোদ-কাননে যনোহর ;—

পাখি মধ্যে ও কি দৃশ্য ! যাইতেছে বৃদ্ধ এক

জরা-জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ।

“সারথি ।”—জিজ্ঞাসে যুবা—“কে এই দুর্বল নর,

মাংসহীন শরীরে ভাসিয়া

উঠিয়াছে শিরা যত বৃক্ষের শাখার মত,

দন্তহীন, দৃষ্টিহীন, যাইছে চালিয়া ?

যষ্টিতে ক’রেছে ভঁর, তবু কাঁপে কলেবর,

গুরু বেশ স্থলিত চরণ ।

কি কষ্টে যাইছে আহা ! কি বিকৃত কলেবর !

লোল চর্ম্ম বিকৃত কেমন !”

সারথি কহিল ধীরে,— “কুমার ! হয়েছে বৃদ্ধ

হায় । এই নর জীর্ণদেহ ।

নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গণ, নাহি বলবীৰ্য্য আর,

কে আর করিবে তারে মেহ ?

জীর্ণ বনকান্ত মত, হইয়াছে কাৰ্য্যাক্ষম ;

তাই পুত্র পত্নী, পরিবার,

নাহি করে যত্ন আর, দুখী অনাথের মত

যায় এইরূপে দিন তার ।”

সারথি ।”—জিজ্ঞাসে পুনঃ কাঁদিল কোমল প্রাণ,

—“কুলধর্ম্ম ইহা কি তাহার ?

কিংবা জগতের ধর্ম্ম ? শীঘ্র বস, সত্য বল,

চিন্তিব ইহার প্রতিকার ।”

“কুমার ।”—সারথি কহে,—“নহে ইহা কুলধর্ম্ম,

জগতের ধর্ম্ম এইরূপ ।”

কুমার জিজ্ঞাসে,—“তবে আমার গোপার দেহ,
হইবে কি এমনি বিকৃপ ?”

“হায় ! রাজপুত্র !”—কহে সারথি—“এ জগতের
সকলেই জরার অধীন ।

কিবা রাজা, কিবা রাজ্যী, রাজপুত্র, রাজবধু,
জরাজীর্ণ হবে এক দিন ।”

স্বদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, কুমার কহিলা ধীরে,—
“আমরা কি অবোধ অজ্ঞান ।

মাতিয়া যৌবন-মদে হায় ! নাহি তারি কভু
এই শরীরের পরিণাম ।

সারথি ! কিরাও রথ,—চল গৃহে ! যাইব না
প্রমোদ কাননে। আজি আর ।

জরা আক্রমিবে যাবে এইরূপে একদিন
ক্রীড়ামোদে কি কাজ তাহার ?”

আর এক দিন যুগা যাইতে প্রমোদবনে
দেখি’ পীড়াগ্রস্ত একজন,

জিজ্ঞাসিলা,—“এ কে নর ? এ ত নহে জরাগ্রস্ত,
তবে কেন বিবর্ণ শরীর,

ভুল দেহ, ক্লিষ্ট মুখ, কষ্টে বাহতেছে শ্বাস,
যাতনায় বহে নেত্রনীর ?”

“হে দেব !”—সারথি কহে,—“জরা নহে, পীড়া এই,
জরার অধিক ক্লেশকর ।

নিবিবে জীবন-দীপ, হরণ ক’রেছে তৈল
হায় ! পীড়া নিহূর-অস্তর !”

কুমার কহিলা ধৈর্যে,—“বাহ্য্য তবে বশকীড়া,
ব্যাধি-দশা এ কি ভয়কর !

কে পারে দেখিয়া ইহা আমোদে হইতে রত ?

সারথি ? ফিরাও রথবর !”

আর এক দিন যুবা যাইতে উজ্জান পথে

দেখি দৃশ্য চিত্তবিদারক,

জিজ্ঞাসিয়া—“একি দেখি, খাটের উপর দেহ,

বস্ত্রাবৃত আপাদমস্তক !

কেন বা বহিয়া উহা নিতেছে ইহারা বল,

কেন বেড়ি’ নয়-নারী হায় !

করিতেছে আর্তনাদ, করি’ বন্ধে করাঘাত,

গড়াগড়ি দিতেছে ধূলায় ?

সারথি ! স্বরায় ! কহ ! এ কি করে মম প্রাণ !

এ কি, বর্ষে আমার নয়ন !”

সারথি বিষাদে কহে,— “খাটের উপরে দেব !

হতভাগ্য মৃত একজন ।

জীবখেলা শেষ তার, পত্নী, পুত্র, পরিবার,

পৃথিবীতে দেখিবে না আর ।

কুরায়েছে মৃতভোগ, গৃহ তার অন্ধকার,

পরিজন করে হাহাকার !”

কুমার গম্ভীর মুখে কহিলা,—হায় রে ধিক্ !

অরাজকরিত এ ঘোবন !

ব্যাধি ভোগ্য দেহে ধিক্ ! অনিত্য জীবনে ধিক্ !

ধিক্ ভোগরত জ্ঞানিগণ ।

নাহি থাকে অরাব্য্যাধি নাহি থাকে মৃত্যু যদি,

তবু ভ্রংশপূর্ণ এ সংসার ।

সারথি । ফিরাও রথ, যাব না উন্মাদ-পথে,

মুক্তি চিন্তা করিব ইহার ।”

দেখি আর এক দিন । পথে অপরূপ মূর্তি

সারথিকে জিজ্ঞাসে কুমার,—

“বিনীত প্রশান্ত মূর্তি কে ওই পুরুষবর

জীবন্ত মুরতি নম্রতার ?

কষয়-বসন অঙ্গে হস্তে মাত্র ভিক্ষাপাত্র,

গতি কিবা প্রশান্ত সুধীর !

বহনে কি শান্তি, প্রীতি ! অঙ্গে কি পবিত্র জ্যোতিঃ !

কি কল্পণা-পূর্ণিত শরীর ।”

সারথি ভকতি-ভরে কহিল,—সন্ন্যাসী ইনি,

সংসার করিয়া পরিহার,

হইয়া সন্ন্যাস ব্রত. ইচ্ছিয় করি, সংযত,

হয়েছেন বিনয়-আধার ।

রাগ নাই, ঘেঘ নাই সংসার-কামনা নাই,

একমাত্র ভিক্ষানে জীবন

করেন ষাপন ইনি ; করেন প্রীতির নেত্রে

সর্ব জীব সমান দর্শন ।”

সাধু ! সাধু ! হে সারথি !”—কুমার প্রকুলমুখে

কহিলেন আনন্দিত মন,

“আমার জীবনপথ দেখিলাম এত দিনে ;—

সন্ন্যাস প্রশংসে জ্ঞানিগণ ।

আত্মহিত, পরহিত, জীবনের নিত্যসুখ,

স্বমধুর ফল সুধাময়,

আছে এই পুণ্যপথে ;—সারথি ! কিরাও বধ !—

এই পথ করিব আশ্রয় ।’

দিন যায়, রাত্রি যায়, সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে

বহিতেছে ঝটিকা অবল ।

দিন যায়, রাত্রি যায়, প্রলয়-বাটিকা-বেগ
দিনে দিনে বাড়িছে কেবল ।

প্রভাত-অক্ষুটালোকে পুরোত্তান-তরুমূলে
নিরঞ্জে বসি' মূর্তিপ্রায়,

প্রভাতের বাল-স্বৰ্ঘ্য জালিয়া মধ্যাহ্নভাতি
সায়াক্ষের অঁধারে লুকাই ।

সারাদিন ধ্যানে যুবা ভাবেন অনন্তমনে,
সীমা কিছু নাহি ভাবনার ।

প্রাণের পিপাসা তাঁর মিটিবে না এ সংসারে,—
‘ছাড়িবেন তবে কি সংসার ?’

হায় ! স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মা গৌতমী,—
করিবেন কেমনে প্রহার

এমন দারুণ বজ্র, তাঁদের কোমল প্রাণে ;
প্রাণে হৃদ-মুখিকা গোপার ?

হায় ! পতিপ্রাণা গোপা অমৃত-বল্লরী মত
বেড়িয়াছে পতি-সহকার,

মিশায়েছে দেহে দেহ, মিশায়েছে প্রাণে প্রাণ,—
এই কি সলাট-লিপি তার ?

গোপার দেবতা পতি গোপার তপস্তা শ্রেয়
পতিপূজা জীবনের ব্রত,

প্রেমরূপা প্রাণধারা ঢালিয়াছে অবিরল
সুশীতল নিষ্করিণী মত ।

একটি কঠোর কথা কহে নাহি কোন দিন,—
সিদ্ধার্থের ঞ্জিল নয়ন ।

হায় ! কি এ বজ্রানলে সেই প্রেমময়ী সত্য
করিবেন সিদ্ধার্থ ঘাহনু ?

না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিন জন—
 বৃদ্ধ পিতা, মাতা, ওই আর
 তাঁহার আশ্রয়ের গোপা, তাঁহার প্রেমের গোপা,—
 কিবা তিন মূর্ত্তি করুণার।
 হায়। ইহাদেবে ঠেলি, ভূমে বজ্রাহত ফেলি,
 যাইবেন সিদ্ধার্থ কেমনে ?
 দুই ধারা দয় দয় বহিতে লাগিল ধীরে,
 সিদ্ধার্থের যুগল নয়নে।
 তাদের পশ্চাতে হায় ! কিন্তু ওকি দেখা যায়—
 নরনারী অনন্ত অপার !
 জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার,
 মাগিতেছে করুণা তাঁহার।
 দুঃখপূর্ণ এ সংসারে থাকিবেন কোন আশ্রয়ে,
 সহিবেন দুঃখ নিদারুণ,
 নর-নারী-হাহাকার শুনিবেন অনিবার
 নিশ্চয় হৃদয়ে সতরুণ।
 ধর্ম—জীবহিংসা-বজ্র ! তাতেও অনন্ত জীব
 নির্বাক করিছে হাহাকার।
 দীন-জীবে দুঃখ দিলে হায়। মূর্থ নর কেন
 হরে দুঃখ নিরূপণ তোমার ?
 “না—না, হিংসা নহে ধর্ম, নহে ধর্ম নির্দয়তা,
 নির্বাকের এই পথ নয়,
 আছে অত্র পূণ্য পথ, করি’ আত্মবিসর্জন
 সেই পথ খুঁজিব নিশ্চয়।”
 একদা একপে বসি’ ভাবিছেন দয়াময়,
 আনন্দের মহা কোলাহল।

উঠি, রাজ-অন্তঃপুরে ছাইল সমস্ত পুরী,

ছাইল নগর অবিরল।

‘আসি’ এক অহুচর, কহে আনন্দের মূর্তি—

“যুবরাজ ! দেও উপহার।

আজি বড় শুভ দিন, চরিতার্থ নরশতি,

জন্মিয়াছে কুমার তোমার।”

চিজিতেব মত চাহি রহিলেন রাজপুত্র

ভার মুখ পানে অবিষ্টল,

বিস্মিত সে গেলে চলি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি’

কহিলেন নয়ন সজ্জা ;—

“হায় ! যেই সংসারের বন্ধন করিতে হিন্ন

করিলাম সংকল্প এখন,

অদৃঢ় বন্ধন আর হৃদয়ের হৃদয়েতে

সে সংসার করিল স্থাপন।

আর কিছু দিন হায় ! থাকি যদি এ সংসারে,

বন্ধনের উপরে বন্ধন

ছড়াইবে এ সংসারের ; আর না, সময় এই—

মায়াজাল করিব ছেদন।

(৮)

মহানিশি ।

অন্তে গেল ধীরে দিবা, আইল গোধূলি ।
 গোধূলি হইল অন্ত । বিভাবরী আসি
 ঢাকিল কপিলবস্ত্র স্বচ্ছ অন্ধক'বে ।
 সমুদ্র-কল্লোল মত সুদূর মধুর
 নগর-আনন্দ-ধ্বনি পশিয়া শ্রবণে
 ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান । ছাড়িয়া উদ্যান
 দেখিলেন যুবরাজ পশিয়া নগরে,—
 আলোকে প্রাবিত পূব ; বাগে নিনাদিত ।
 রাজপথে ছই পার্শ্বে তরঙ্গ খেলিয়া
 ছুটিছে আলোক-মালা, দেখাইয়া চারু
 বিচিত্র পতাকাবলী, বিচিত্র তোরণ—
 নির্মিত পল্লবে পুষ্পে, আলোকে ঝঁচিত ।
 কদমী মঙ্গলঘট চিত্র ত সুন্দর
 শোভিতেছে স'রি স'রি সজ্জিত আলোকে
 পল্লবে কুসুম-দামে ; শোভে দ্বারে দ্বারে
 গর্গক্ষে, অলিন্দে, ছানে, আলোক-রূপিনী
 কুসুম-তববময়ী আনন্দ প্রতিমা,
 লীলাময়ী, হাস্তময়ী । বাজাইয়া বহু.
 বহু-বঠে ছলধ্বনি তুলিয়া পঞ্চমে,
 অধঃকৃত রাজপুত্রে করিছে বর্ষণ
 পুষ্পকরে পুষ্পরাশি অজস্র ধারায় ।

চ'লেছে তুরঙ্গ—রঙ্গে গ্রীবা ভঙ্গি করি
নাচিয়া নাচিয়া ; ধীরে নাচিয়া নাচিয়া
মস্তকে মঙ্গল-খালা মঙ্গল-রূপিণী
আনন্দে রূপসী-বৃন্দ করতালি দিয়া,
গাইয়া মঙ্গল-গীত যাইছে চলিয়া ।
বাজিছে মঙ্গল-বাত্ত সম্মুখে পশ্চাতে
কুমারের, উঠিতেছে মঙ্গলের ধ্বনি
সংখ্যাতীত নরনারী-কণ্ঠে অবিরল ।
শোভিতেছে রাজপুরী, পুরী কুমারের,
যেন মহা নাট্যশালা আলোক-স্বজন,
মণ্ডিত কুহুম-দামে পল্লবে, কেতনে,—
আনন্দ-সাগরে যেন উৎস আনন্দে র !

সখাগণ, সখীগণ, মতা প্রজাবতী
দেখাইলা পুত্রমুখ কুমারে তখন,—
আনন্দে অধীরা পুরী, অধীরা জননী ।
ঢলাঢলি করি, রঙ্গে, করি গলাগলি
কবিতোছে হলুধনি পুরাঙ্গনাগণ,—
হাসির তরঙ্গ-ভঙ্গে কটাক্ষ ঢালিয়া ।
দেখি সত্য শিশুমুখ উঠিল কাঁপিয়া
কুমারের স্থির বক্ষ ; উঠিল কাঁপিয়া
দেখি কুমারের মুখ গোপার হৃদয় ।
সুবর্ণ সংসার-পাত্রে জীরন্ত অমৃত
নিদ্রার্থ দেখিলা যেন, হৃদয় তাঁহার
করি আকর্ষিত, করি প্রাণিত, কল্পিত ।
সে হৃদয়-প্রকল্পন,—সিদ্ধ প্রকল্পন
পূর্ব-চক্রেদয়ে যেন ; সে মুখ গভীর,

ঝটিকা আসন্ন সেই গাভীরা সিদ্ধুর—
দেখিল, বুঝিল গোপা ; অমঙ্গল-ছায়া
ভাসিল আনন্দাকাশে ; কাঁপিল হৃদয় ।

বসিলেন রাজপুত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে
খচিত বিবিধ রত্নে, কুশুম-মালায়,
সঙ্গীত-সুধায় পূর্ণ কক্ষে আলোকিত,
সজ্জিত গল্পবে পুষ্পে, চিত্রে, প্রতিমায়,—
পুষ্প-কিসলয়-ময়ী নর্তকী-মালায় ।

প্রেমভরা ঐশ্বর্য, কতই উজ্জ্বল
উঠিল রমণীকণ্ঠে, কণ্ঠে সারস্বতের ।

সেই সুধাধারা নাহি প্রাণে কুমারের
প্রবেশিল, পরশিল হৃদয় তাঁহার,

প্রসারিত পদ্মপত্র যথা বারিধারা ;—
কুমার উদাস প্রাণে রহিলা বসিয়া ।

না তুনি সঙ্গীত যুবা, শুনিছে কেবল
জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত-জীব-হাহাকার ।

না দেখি নর্তকী-মুখ, দেখিছে কেবল
জরাজীর্ণ, রোগে লীর্ণ, মৃত, নিরন্তর ;—

দেখিতেছে আর শাস্তমূর্তি যোগিবর ।

“অনুসর । অনুসর !”—কহিছে কেবল
জলদগম্ভীর স্বনে যোগী নিরন্তর ।

যুবক শুনিছে—‘অনুসর ! অনুসর !’

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ; উৎসব-কল্লোল
নিবিয়াছে, নিবিতেছে ধীরে পুরালোক ।

আনন্দের অবসানে অবসন্ন পুরী

নিদ্রা ঘাইতেছে সুখে, গোপা নি জাবতী ;

কেবল এ রাজপুরে যুবা অনির্জিত ।
 গোপার সূতিকা-কঙ্কে সিদ্ধার্থ কখন
 দেখিছে পত্নীর মুখ অতৃপ্ত-নয়নে ;
 সন্তোজাত শিশুমুখ দেখিছে কখন
 ত্রিদিব কুহুম ক্ষুদ্র ; উচ্চ্বাসে অধীর
 কখন শয্যায় বসি, কখন উঠিয়া
 ভ্রমিতেছে চিন্তাকুল ধীরে কক্ষতলে ।
 গোপা দেখিছেন স্বপ্ন—কীপিতেছে ধরা,
 বহিছে প্রলয় ঝড় করি বৃক্ষরাজি
 উৎক্ষেপিত, ভূপতিত ; আকাশে নিম্প্রভ
 চন্দ্র সূর্য্য গ্রহরাজি ; পড়িছে ধসিয়া
 বরিষার ফোঁটা সম নক্ষত্র সকল ।
 গোপার মুকুট ভগ্ন, ছিন্ন কেশজাল,
 ছিন্ন মুকুতহার ; গোপা ভগ্ন শয্যাতেলে ।
 কান্ধালিনী আত্মহারা পড়িয়া ধরায় ।
 রাজার চামর ছত্র দণ্ড ভূপতিত
 ছিন্ন ভিন্ন আভরণ সহ সিদ্ধার্থের ।
 নগরের দ্বার দিয়া হইল নির্গত
 প্রহরিত জ্যোতিঃপিণ্ড শান্ত হৃশীতল,
 নিবিড় তিমিরে পুরী করি নিমজ্জিত ;
 উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু, স্তম্ভের কল্পিত ।
 আতঙ্কে ভাঙ্গিল নিজা, কাদি উঠেঃস্বরে
 কহে গোপা—“কহ নাথ ! এ কি স্বপ্ন হায় !
 শোকে, হুঃখে, ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল আমার,
 কি হবে আমার হায় ! কহ দয়া করি ।”
 আশ্বাসি আকুলা গোপা, স্বপ্ন-বিবরণ

ওনিয়া ঈষৎ হাসি কহিলা কুমার—

“এ নহে কুস্বপ্ন গোপা । পুণ্যবতী তুমি

দেখিয়াছ পুণ্যময় পবিত্র স্বপন ।

জন্ম করা মরণের হুঃখভাবে ধরা

দেখিয়াছ প্রকল্পিত, হবে হুঃখরাশি

উন্মূলিত, উৎপাটিত, বৃক্ষরাজি মত,

নবধর্ম মহাবড়ে । যেই মহালোক

হইল নির্গত এই রাজপুরী হতে,

আলোকিবে মানবের মোহ-অন্ধকার ।

ছিন্ন করি মোহ-জাল আভরণ মত

স্বর্গীয় ভূষণে প্রিয়ে । হইব ভূষিত

আমরা, ত্যজিয়া ক্ষুদ্র ছত্রদণ্ড এই

হইব ত্রিলোক মধ্যে একছত্র পতি ।

হইও না ভীতা গোপা ! হও আক্লাদিতা ।

করিও না শোক, কর স্মৃৎ আহরণ ।

এ নহে কুস্বপ্ন, মহা প্রীতি স্মৃথে স্মৃথী

হইব আমরা ; স্মৃথী হইবে জগৎ ।’

ছাড়িয়া নিখাস, সদ্যঃপ্রসূত প্রসূন

লইয়া হৃদয়ে গোপা হইলা নিজতা ।

সেই ত্রিদিবের বক্ষে ত্রিদিব-কুসুম

করি বলে আকর্ষিত নেত্র কুমারের,

তুলিল কি নবোজ্জ্বল হৃদয়ে তাঁহার,—

সিদ্ধার্থ রহিলা চাহি চিত্তিতের মত ।

বৈরাগ্যের শিলা বেগে চলিল ভাসিয়া

সেই উজ্জ্বলের স্রোতে ; উষ্ণীয়া কুমার

পর্য্যঙ্ক হইতে ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা

অধোমুখে, অন্ধালোকে কক্ষে নিরঞ্জে,
 শ্রোতে নিপতিত মহা মহীরুহ মত ।
 বিসর্জি জলস্তানলে গোপা স্বর্ণলতা,
 সদ্যোমুকুলিত এই কুহুম-কোরক
 ত্যজিবেন গৃহ !—হায় ! পশুর অধিক
 এই ঘোর নৃশংসতা । উচ্চাস-সহরী
 ছুটিল বর্ধিত বেগে, হইল শরীর
 রোমাঙ্কিত, স্বেদসিক্ত, কাঁপিল হৃদয় ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে অধীর যুবক
 আসিলেন কক্ষান্তরে—এ কি দৃশ্য হায় ! ।
 গভীরা রজনী ; চারু কক্ষ আস্তরণে
 স্তম্ভা নর্ত্ত গীষণ ; স্তিমিত আলোক ।
 কেহ বা বিবজ্জা, কেহ বিচ্ছিন্না কবরী,
 কেশজালে সমাচ্ছন্ন বিকৃত বদন ।
 কাহারো বিকট ভঙ্গী, ঘূর্ণিত নয়ন
 ভীতিপূর্ণ, কেহ হাসি হাসিছে বিকট,
 বকিছে প্রলাপ কেহ, কেহ কড় মড়
 ঘষিতেছে দস্তে দস্তে পড়িতেছে লালা
 বদন ইহতে কারো, শব্দ নাসিকার
 কাহারো বকিছে প্রাণে ভীতির সঞ্চার ।
 দেখি এ বীভৎস দৃশ্য সিদ্ধার্থের মনে
 উপজিল মহা ঘৃণা । কহিলা কাতরে—
 “হায় ; কি ভীষণ দৃশ্য ! যেই নারীরূপে
 এইমাত্র ছিল এই কক্ষ আলোকিত,
 মুহূর্ত্তে ঘটিল তার এই পরিণাম ;
 আনন্দের রজভূমি, উৎস উৎসবের

এইমাত্র ছিল, সেই কক্ষ মনোহর
 মুহূর্তে হইল এই ভীষণ শ্মশান ?
 লোকে ইহাদের রূপ রতিতে মোহিত
 রহিয়াছে চিরদিন ? ইহাই সংসার ?
 হা দিক্ ! মুখেরা হায় ! হয় অমরক
 কন্দম-পূরিত এই চাকু চিত্রঘটে ;
 হায় ! বরাহের মত হয় নিমজ্জিত
 এ অশুচি-পক্ষে ; মরে পতঙ্গের মত
 আবর্জনা প্রজলিত এ অনলে পুড়ি ।
 কি স্থণা এ নরদেহ ।” আবার তাহার
 পড়িল নয়ন স্রুতা রমণীমণ্ডলে,
 এবার হইল মহা করুণা সঞ্চার
 কুমারের হৃদয়েতে । কহিলা কাতরে—
 “হায় ! ব্যাধজাল-বদ্ধ-কুরঙ্গিনীমত
 ইন্দ্রিয়ের পাশে বদ্ধ অভাগিনীগণ ;
 নিমজ্জিত মহামোহে, পক্ষে নিমজ্জিত
 বন-করিনীর মত । বাসনা-অনলে
 হইতেছে ভস্মীভূত পতঙ্গিনী মত ।
 মহাসিদ্ধ-গর্ভে ভগ্ন তরুণীর মত
 হইয়াছে মরণপ্রায় ; নাহি জানে হায় !
 কক্ষপক্ষ-শনি-সম জীবন যৌবন
 হইতেছে ক্ষয় ; ভোগ-হলাহলে
 আপনি মরিছে, পুড়ি, পুড়িছে জগৎ ।
 অসার শরীর সুখে হায় ! নিমজ্জিত
 হইতেছে কি না পাপে ইহারা সকল ।
 কি ভীষণ পরিণাম হায় ! ইহাদের ।

অঙ্গুলি নির্দেশ করি শূরজ্ঞানিগণ
 দেখাইতেছেন আশ্র-বলিদান-পথ ;
 করিছেন — 'শাক্যসিংহ ! যাও সেই পথে,
 কর মানবের এই হুঃখ বিমোচন ।'
 যাইব সে পথে আমি । কিন্তু বৃদ্ধ পিতা, —
 অজ্ঞাতে ত্যজিলে পুরী হবে শেলাঘাত
 তাঁহার করুণ-প্রাণে ; পড়িয়া চরণে
 যাইতে এ পথে আমি লইব বিদায় ।"

— * —

(২)

বিদায় ।

অলঙ্কিতে যুবরাজ কক্ষে জনকের
 প্রবেশি নমিলা পদে । চকিত-নয়নে
 দেখিলেন শুদ্ধোদন পুত্র গুণধর
 দাঁড়াইয়া পদতলে পূর্ণচন্দ্র মত,
 আলোকিম্ব! কক্ষ দেবরূপের প্রভায় ।
 "মহারাজ ! — কহে পুত্র ধরিয়া চরণে —
 "নাহি করিবেন খেদ, না দিবেন বাধা
 দাসের কর্তব্য-পথে । হে দেব ! আপনি
 ক্ষমিবেন পুরজন সঙ্কিত এ দাসে ।
 নিজ্জন্মকাল মম সমাগত এবে,
 করুন এ আশীর্বাদ যেন মনোরথ
 হয় সিদ্ধ, হয় পূর্ণতপস্বী আমার,
 সিদ্ধার্থ — 'সিদ্ধার্থ' নাম লভে ধরাডলে ।"

পুত্রের প্রার্থনা পুত্রপ্রাণ নৃপতির
 পশিল হৃদয়ে হায় । বজ্রের মতন ।
 পড়িতে নৃপতি অর্ধ-মূর্ছিত মায়ায় *
 ধরিল। কুমার ; বৃদ্ধ সংবরি আঘাত
 কহিলেন—“কহ বৎস । কোন্ প্রয়োজনে
 ত্যজিবে সংসার ? কহ কি অভাব তব ?
 রূপবতী, গুণবতী, লাদণ্য-প্রতিমা
 গোপা বধুমাতা মম ; নবজাত শিশু
 নবোদিত শশধর ; এই শাক্য-রাজ্য
 বিস্তীর্ণ স্ববর্ণ-প্রস্থ, চার লীলাভূমি
 প্রকৃতির, বীরভূমি বীরের জননী ।
 অমুপন রূপ তব, নবীন ঘোবন,
 শিরীষ-কুম্ব-সম দেহ সুকুমার ।
 পুষ্পাঘাতে যেই দেহ হয় প্রপীড়িত,
 কঠোর সম্মাস-ক্লেশ সহিবে কেমনে ?
 হা পুত্র জীবনাদিক ! পাইয়া তোমায়
 ভুলিয়াছি আমি তব জননীর শোক ;
 বুছিয়াছি বক্তব্যের কত বজ্রাহত
 সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের, স্মৃতি জীবনের ।
 আশার আকাশে হায় ! এ বৃদ্ধ বয়সে,
 তুমি মাত্র ধ্রুবতার। এই জীর্ণ-তরী
 তোমাকে চাহিয়া মাত্র রয়েছে জাসিয়া ।
 ভুবা'ও না তাবে তুমি । এই জীর্ণ-গৃহ
 করিও না ধরাশায়ী, একমাত্র বল,
 এবেই আশ্রয়, তার করিয়া হরণ ।”
 হলো কঠোরোপ শোকে ; বহিতে লাগিল

দর দর অশ্রুধারা যুগল-নয়নে
 বৃদ্ধ নৃপতির, নেত্রে সন্তপ্ত যুবার ।
 প্রথম শোকের বেগ করি সংবরণ
 কহিলেন নরপতি—“কহ বৎস ! কহ
 কি হুঃখ তোমার, কেন ছাড়িবে সংসার ?
 সিদ্ধার্থ ! কি চাহ তুমি ? যাহা চাহ তুমি
 দিব আমি । হায় ! এই রাজকুল প্রতি,
 এই বৃদ্ধ পিতা প্রতি, প্রজাবতী প্রতি
 কর দয়া, ত্যজিও না অকালে সংসার,
 ভাসা’ও না শাব্যরাজ্য অকুল সাগরে ।”

কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া নীরবে
 কহিলেন রাজপুত্র—“চারি বর তবে
 দেও দাসে দয়া করি ; দিলে চারি বর
 থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর ।
 জরায় যৌবন-ফুল যেন না শুকায় ; (১)
 ব্যাধি যেন বভু নাহি পরশে আমার ; (২)
 মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার ; (৩)
 পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার ।” (৪)

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি নৃপতি বিম্বাদে
 কহিলেন—“পুত্র ! যাহা হইবার নহে,
 পাইবার নহে যাহা চাহিতেছ তুমি ।
 কর কল্লান্তর করি তপস্তা কঠোর
 না পায় যোগীরা যাহা, পাইব কোথায় ?”
 কহিল সিদ্ধার্থ—“তবে দেও মহারাজ !
 অস্ত্র এক বর,— আমি ত্যজিলে সংসার
 হবে না কাতর তুমি ; সংসারে আবার

নাহি হয় যেন পিতঃ । প্রবৃতি আমার ।”

এত দিনে নৃপতির পড়িল খসিয়া
নয়নের আবরণ ! দিবা চক্ষে আজি
দেখিলেন পুত্ররূপী নর-নারায়ণ ।
বুঝিলেন যেই শশী জুড়াতে ধরায়
হতেছে উদিত আজি সাধ্য কিবা তাঁর
রোধিতে তাহার গতি ! ক্ষুদ্র শুক্লোদন,
ক্ষুদ্র শাকারাজ্য হায় । তুলনায় তার,
সিদ্ধার্থ চাহিছে যেই রাজ্য পুণাময় ।
মানবের মুক্তিপথে কেন শুক্লোদন
হইবেন এ কণ্টক এ বুদ্ধ বয়সে ?
কাতর নৃপতি তবে বিদীর্ণ-হৃদয়ে,
ছিন্ন করি মায়াপাশ, বাস্পরুদ্ধ-স্বরে
কহিলেন—“হিতকর । মোক্ষ জগতের
ইচ্ছা তব ; হও তুমি পূর্ণমনোরথ !”
প্রণমিলা পিতৃপদে পুত্র ভক্তিভাবে ।
স্বপবিত্র পদভীর্থে পুত্রের মন্তক

প্রণত ; পাদপদ্মে করপদ্মদ্বয়
কুমারের ; করপদ্ম পুত্রের মন্তকে
জনকের ; কুমারের চক্ষু ছল ছল,
জনকের অশ্রুধারা বহিছে ধারায়
বাতায়ন-পথে চাহি আকাশের পানে
বিভাসিত চক্রকরে শাস্ত-স্বশীতল ।
কি চিত্র মহিমাময় । ভূতলে ত্রিদিব ।
কি মুহূর্ত্ত !—কিবা যোগ—কি প্রেম মহান ।
কি মুহূর্ত্ত ! কি বিয়োগ ! আশ্রয়-বলিদান ।

এ মুহূর্ত, এই যোগ, এ বিয়োগ আর,—
মানবের কি অনন্ত আশা-পারাবার ।
চলিলা সিদ্ধার্থ-পুত্র, পড়িলা শয্যায়
সিদ্ধার্থ-জনক বৃদ্ধ বজ্রাহত প্রায় ।

(১০)।

মহানিস্ক্রমণ ।

অতাত নিশাঙ্ক ; মহা উৎসবের শেষে
নিজা যাইতেছে পুরী ; নিষিতেছে ধীরে
চারিদিকে দীপমালা ; যাইছে ভাসিয়া
বসন্তের নীলাকাশে ফুল তারাদল
বসন্তের, বহিতেছে বসন্ত-অনিল ।
কি গভীর শান্তিময় মূর্তি প্রকৃতির
ভাসিতেছে চারিদিকে নিষ্পন্দ নীরব ।
পিতার চরণে পুত্র হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেগা নিয়তির ;
সেই নীলাকাশ মত হৃদয়-আকাশ
শান্ত, নিরমল, স্থির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ।
দাঁড়ায়ে অগ্নিন্দে স্থির, দেব-অবয়ব
রাখি বাতায়ন-বন্ধে, রহিলা চাহিয়া
সেই নীলাকাশ বন্ধে শান্তি অনন্তের
কিছুক্ষণ । দেখিলেন, বসি দেবগণ

নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহার
প্রীতিপুষ্পে, মেলি শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিজমণি ।

পুষ্পা নক্ষত্রের সহ মিশি হৃদাকর
কহিয়াছে মহাযোগ পুণ্যপ্রীতিময়
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এককণ্ঠে— “এই ত সময় :”
স্বপুণ্ড ছন্দক ভৃত্যে করি জাগরিত,
কহিলা— “ছন্দক । যাও, আন দ্বারা করি
সজ্জিত করিয়া অম্ব ‘কণ্টক’ আমার ।

আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ ।”
স্বপ্নে ঘেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,

বিশ্বয়ে ছন্দক কহে— “কহ, বুঝবাজ :
কোথায় বাইবে এই নিশীথ সময়ে ।”

“ছন্দক !” — সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—

“আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার,

জুড়াইতে মানবের, জুড়াতে আমার
জরা-মরণের দ্বন্দ্ব, কহিতে সাধন

জগন্ময় শিব শাস্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি তাজিব ভবন ।”

এই বার স্বপ্নে নহে, পড়িল জাগ্রতে,
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—

“যেন নিদাক্ষণ কথা আনিও না যুখে
বুঝবাজ । এই মোহ মৃগাল-কোষল,

এই স্বপ্নকান্তি রূপ যখনমোহন,

এ কি যোগ্য তপস্তা ? শিরীষকুস্থম
 সহিবে কি দারানল ? কর পরিত্যাগ
 এই হ্রাকাজ্ঞা হায়, আশ্রিত আমরা,
 কর রক্ষা আমাদের দয়াবান তুমি !”
 “হৃন্দক !”—সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
 “কে সাথে এমন পত্নী প্রেম-নিব্বরিণী,
 সন্তোজাত প্রাণপুত্র, পিতা মেহ-য়,
 মাতা প্রজাবতী, মাতৃশ্রেয় ভাগীরথী,
 পারে ভাজিবারে ? সাথে, পারে ত্যজিবারে
 ত্রিদিবশ্রুতিম দাজ্ঞা, প্রজা পুত্রোপম ?
 কিস্ত পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
 অনন্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
 তবে জরা-মরণের হুঃখ ঘোরতর
 কেমনে সহিবে বল ? নাহি অর্ধেষয়া
 নরের উদ্ধার-পথ, পুড়িব স্বজন,
 জালি বিলাসের বহি—এ ত নহে প্রেম ?
 প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ ।
 না,—হৃন্দক ! ত্যজি গৃহ, ঘাব তপস্তায় ।”
 হৃন্দক কহিল—“প্রভু ! এক নিবেদন,—
 মানব তপস্তা করে জন্ম জন্মান্তরে
 যে সুখ সম্পত্তি তবে, পেয়েছ সকল
 বিনা তপস্তায় তুমি । এ রাজ্য হৃন্দর
 লোকপূর্ণ, বস্তুপূর্ণ ; পুর মনোহর ;
 ফলে পুষ্পে হৃশোজিত, বিহগ-কুজিত,
 জলজ-কুস্থম-পূর্ণ-সবসী ভূমিত
 প্রমোদ-উজান তব ; কৈলাস প্রতিম

অট্টালিকা মনোহর ; চারু অন্তঃপুর
 রতন-কিঙ্কণী জালে ভরসে শোভিত,
 সঙ্গীতে হৃন্দরীবুন্দে,—বিলাসে পূরিত ।
 রাজপুত্র—রাজা তুমি, প্রথম যৌবন,
 তরুণ কোমল দেহ, শশাঙ্ক বদনে
 শোভিছে ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল ।
 এখনও অপূর্ণ ভোগ-কামনা তোমার ।
 অমর-পতির মত এ অমর্যাবতী
 কর ভোগ, কর ভোগ-কামনা পূরণ ।
 মধ্য অঙ্কে অভিনয় করিও না শেব
 এইরূপে, রঙ্গভূমি করিয়া শ্রবণ ।
 যৌবনাঙ্কে, সন্তোগাঙ্কে করিও সন্ন্যাস
 নিষ্কণ্টকে, কেহ নাহি করিবে বারণ ।
 হও কাস্ত এইক্ষণ, বক্ষ পৌরজন । ”
 “ছন্দক, ছন্দক !”—যুঝা কহিলা উজ্জ্বল—
 “অসার সন্তোগ-স্থখ অনিত্য অক্রম ;
 ষ্ণোল ষ্ণোলা মত, বিস্তম্ভিতি সম
 অসার, অস্থায়ী জল-বুদবুদের মত,
 হুভোগ্য স্বপনসম, হৃদ্পৃষ্ঠ সঞ্চল
 সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিবে ।
 কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগে
 —কামিনী, কাম্যনে, বাছো—ভৃষ্টি কাম্যনাক
 পাইয়াছে এ অগতে ? হায় ! এ সন্তোগ,
 সুগ ভৃষ্টিকার মত বাক্য পিপাসা,
 অতৃপ্ত-কামনানলে দহে নিরবধি ।
 কোন কাম্যবস্তু নাহি করিয়াছি ভোগ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য । কোন্ ভোগ-পুষ্পে

শ্রমস্ত মধুপ মত করিনি চষন

ইন্দ্রিয়ের সুখমধু । কই তৃপ্তি কোথা ?

মত্ত ভিম্বিরের মত সন্তোষ-সাগরে

কি ক্রীড়া না করিলাম হয় । এত দিন ?

কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ-পুষ্পে পুষ্পে

মত্ত মধুকরমত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া

অসিহু কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে

নাহি শান্তি ? নাহি সুখ ? মানব-জীবন

কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?

না, হৃদয় !—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,

ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার,

জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার

হইতে উত্তীর্ণ হয় । আছে মুক্তি-পথ

ধুজিব সে মুক্তি-পথ, ধুজিব নির্বাণ

এই দাবায়ির ; ধরা করিব শীতল ।

আন অশ্ব ! হও তুমি সহায় আমার !

উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে,

সোণার পিঞ্জরে তোর, সোণার শৃঙ্খলে

মিটুবে কি সাধ ? দ্বার কর অনর্গল,

অনন্ত আকাশে আমি বাইব উড়িয়া।”

হৃদয় কঁদিয়া কহে—“হায় ! দেব ! তবে

নিশ্চয় কি, এ সংসার শোকে ডুবাইয়া

যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?” নিশ্চয় হৃদয় !—

উত্তরিল দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—“নিশ্চয় ।

স্নেহের মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার ।
 মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে
 প্রজ্জ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপাতত,
 তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন ।
 শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
 দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে
 করে অবরুদ্ধ পথ ছন্দক ! প্রাবিত
 করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকাৰে,
 তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয় ।
 আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক ।
 পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
 দেখিতে গোপার, নব প্রহরের, মুখ ।
 স্মৃতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
 দেখিলা জলিছে মূহ মন্দ দীপাবলী
 মূহ আলোকিয়া কক্ষ ! কুহুম-শয্যা
 আলুলায়িত কুস্তগা, স্থলিত-বসনা,
 নিদ্রা ঘাইতেছে গোপা, বক্ষে সন্ত শিশু,
 —সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুহুম—
 লইয়া আদরে ঘেন ;—জিনি দীপদায়
 করিয়াছে আলোকিত গৃহ ছই জন ।
 এ বার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
 কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু ছনয়নে
 আসিল, ডানিল, বাঁবে,—মায়ায় যবনে
 সিদ্ধার্থের স্তম্ভীতল শেষ উপহার ।
 দাঁড়াইয়া দ্বারে, শির রাখিয়া প্রাচীরে
 অবসর, বেহ ছির, অবরুদ্ধ খাস ;

চাহিয়া চাহিয়া পত্নী পুত্র-মুখ পানে
 হইলেন ধ্যান মগ্ন । গুনিলেন কর্ণে
 জরা-ব্যাধি-ব্যথিতের ঘোর হাহাকাৰ !
 ঘোর চঃখপূর্ণ ধরা,— কত নর নারী,
 কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যত
 পুড়িতেছে দুঃখানলে, দেখিলা নয়নে ।
 হ'ল মায়া অন্তর্হিত, অশ্রু নয়নের
 শুকাইল ছনয়নে ! যুবা আত্মহারা
 আসিলেন গৃহ-দ্বারে যথায় ছন্দক
 সজ্জিত 'কণ্টক' সহ, চিত্রিত উভয়
 ছিল দাঁড়াইয়া শোকে নীরব নিশ্চল ।
 "কণ্টক ! কণ্টক !" — অশ্রু ডাকিয়া আদরে,
 উঠিলেন এক লক্ষ্মে সিদ্ধার্থ আকুল,—
 শ্বেত মেঘ-পৃষ্ঠে ঘেন শোভিল শশাঙ্ক
 শরতের নিরমল ! গ্রীবা ধাঁকাইয়া
 হৃদয়-হৃৎকল অশ্রু বেগে বায়ুগামী
 প্রভুর আদরে গর্কে নাচিয়া নাচিয়া
 চলিল কোমল পদে ইঙ্গিতে নীরবে ।

(১১)

নবীন সন্ন্যাসী ।

গভীর নিশীথ এবে মহা প্রস্থাপনে
 নির্মজ্জতা মহাপুরী ! মহা উৎসবের

অবসাদে নিদ্রাগত পুরবাসিগণ
 নিদ্রাগত দৌবারিক হুয়াবে হুয়াবে ।
 ভাবে নাই স্বপনেও উৎসব নিশীথে
 নির্মম হৃদয়ে সত্যঃপ্রসূত প্রসূতি
 হায় রে ! যাইবে ছাড়ি একপে কুমার ।
 এই মহাপুরে বৃদ্ধ নৃপতি কেবল
 জাগ্রিতেছে শোকে অর্দ্ধ-জাগ্রত-মুচ্ছিত,
 ভাসিতেছে অনিবার নয়নের জলে ।
 কোমল চরণক্ষেপে নীরবে গম্ভীরে
 চলিয়াছে ধীরে অশ্ব, চলিয়াছে ধীরে
 ছন্দক পশ্চাতে শোকে গম্ভীর নীরব,
 বহিতেছে অশ্রুধারা বক্ষে দর দর ।
 পূর্ণচন্দ্র-প্রভ অশ্ব, পূর্ণচন্দ্র শত
 জিনি' রূপে অখারোহী বসিয়া নীরবে—
 নাহি খেদ, নাহি দৈন্ত, নাহি শঙ্কা ভয়,
 নাহি মায়া মমতার রেখা মাত্র মুখে ।
 প্রকুল প্রসন্ন মুখ, হৃদয়-গগন
 নৈশ গগনের মত শান্ত সমুজ্জল ।
 দোখল ছন্দক যেন অগ্রে কুমারের
 চলিয়াছে দেবগণ পুষ্প বরবিধা,
 বাজাইয়া দেববাণ, আনন্দ সঙ্গীতে
 পরিপূর্ণ করি নৈশ ভূতল গগন ।
 তুলিল ছন্দক যেন পশ্চাতে কাতরে
 মৃত্তিমতী শাকালক্ষী বিমুক্ত-কবরী
 কাঁদিছে বিবশা শোকে, কাঁদিতেছে পুরী ।
 অতিক্রমি পুরী রাজপুত্র মুহূর্তেক

দেখিলেন রাজপুৰী । নীরবে গগনে
উঠিতেছে শশধর, রজত-সলিলে
প্লাবিত করিয়া ধরা, শাক্য-রাজপুৰী ।
“যুবরাজ ! যুবরাজ !” বাপ্পকঙ্ক স্বরে
কাদিয়া ছন্দক উঠে কহিল কাতরে—
“শৈশবের মাতৃকোল, খেলার প্রাঙ্গণ
কৈশোরের, যৌবনের চারু রঙ্গভূমি,
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধ মাতা, প্রেমের প্রতিমা
গোপা শাক্যকুলশোভা, সন্তোজাত শিশু,
ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, শোকেব সাগরে
কোথায় চলিলে হায় ! দেখ রাজপুৰী
নিরমল জ্যোৎস্নার খেত শুভ্র বাসে
কাদিতেছে হায় ! নব বিধবার মত ।”
কুমার প্রফুল্লমুখে কহিল—“ছন্দক
এ কি ভ্রম তব ! দেখ দেবদেবীগণ
বরষি ত্রিদিব-পুষ্প অমল ধবল,
পুষ্পাবৃত, পবিত্রিত, করিয়াছে পুরী ।
মানব মঙ্গল গীত গাইছেন সবে
আনন্দে আকাশে বসি ; পূজিছেন সবে
বসাইয়া পদ্মাসনে বৃদ্ধ পিতা মাতা,
প্রজাবতী, গোপা, নব-প্রসূত নন্দন ।”

আবার আনন্দে অঞ্চ চলিল নাচিয়া
নবোদিত চন্দ্রালোকে । চলিতে চলিতে
অতিক্রমি রাজ্যসীমা, অতিক্রমি ক্রমে
ক্রোড়দেশ, মল্লদেশ, রজনী প্রভাতে
প্রবেশিল বেণুবনে অনামার তীরে ।

(১২)

যৌবনে যোগিনী ।

ধীরে মহানিশি হতেছে প্রভাত

কপিল নগরে ধীরে,

প্রস্থাপন ছায়া যাইছে সরিয়া,—

ভাসি গোপা অশ্রুনাথ

কি করুণ কণ্ঠে উঠিল কাঁদিয়া—

“কোথা যাও প্রাণনাথ !”

সহচরীগণ উঠিল জাগিয়া,—

একি কণ্ঠ অকস্মাৎ ।

আবার আবার কাঁদিতেছে গোপা—

“কোথা যাও প্রাণনাথ !”

সখীদের প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া,—

কক্ষে যেন বজ্রাঘাত ।

ছুটিল গোপার শয়নের কক্ষে—

শাক্য-বধূ নিদ্রাগতা,

হৃদয়েতে শিশু, শোভিতেছে যেন

পুষ্পিতা সুবর্ণলতা ।

নয়নের জলে ভাসে মুখ বুক,

বুকের শিশুটি অব,

বরিষার জলে ভাসিছে যুথিকা

সকোরক স্নকুমার ।

যত ডাকে সখী, তত কাঁদে গোপা—

“কোথা যাও প্রাণনাথ !”

ততই চাপিয়া শিশুটি হৃদয়ে,
করে গোপা অশ্রুপাত ।

কি শোক-স্বপন ! জাগাইল সখী
মুখে বকে দিয়া হাত ।

নয়ন মেলিয়া কহে গোপা কাঁদি—
“প্রাণনাথ ! প্রাণনাথ !”

“কোথায় কুমার ?”—জিজ্ঞাসে সখীরা,
গোপা কহে—“প্রাণনাথ !”

“কোথায় কুমার ?”—মহাকোলাহল,
হ’ল শিরে ঝঞ্জাবাত ।

“কোথায় কুমার ?”—মহাকোলাহল
উঠিল শয়ন ঘরে,

“কোথায় কুমার ?”—মহাকোলাহল
উঠিল কপিলপুরে ।

“কোথায় কুমার ?”—উবার কাকলী
তুলিল নিবাদধ্বনি ;

“কোথায় কুমার ?”—প্রভাত-সমীর
জিজ্ঞাসিছে স্বনি’ স্বনি’ ।

“কোথায় কুমার ?”—জননী গৌতমী
ভূতলে মুচ্ছিতা পড়ি ;

“কোথায় কুমার ?”—ছুটে পদাতিক,
অখারোহী অশ্বে চড়ি ।

খোঁজে ঘরে ঘরে, নগরে নগরে;
খোঁজে বন উপবন,

শেখরে, গহ্বরে, প্রাচীরে প্রান্তরে,—
নিশান্তে এ কি স্বপন !

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

“কোথায় কুমার ?”—চিহ্ন নাহি তার,

গেল দিবারাত্রি চলি ;

বিবাদের দিবা, রাত্রি বিবাদের,

কিছু ত গেল না বলি।

“কোথায় কুমার ?”—আসিল ছন্দক,

উঠিল কি হাহাকার।

“কুমার সন্ন্যাসী”—অশ্রু-স্রোতে বহি

ছুটিল এ সমাচার।

সপ্ত দিবানিশি শাক্য-রাজ্যে কেহ

ছুইল না অন্ন জল,

সপ্ত দিবানিশি প্লাবি শাক্যরাজ্য

হাহাকার অশ্রু-জল।

সপ্ত দিবানিশি মাতা প্রজাবতী

মৃচ্ছিতা ধরাশায়িতা ;

সপ্ত দিবানিশি গোপা অভাগিনী

মৃচ্ছিতা ধূলি-লুপ্তিতা।

সপ্ত দিবানিশি বৃদ্ধ নবপতি

নীরব নিশ্চল স্থির ;

নিজিত আগ্রত কেহ নাহি জানে,

নেত্রে নাহি বিন্দু নীর।

উন্মাদিনী মত বিবশা মহিষী

আসি কহে —“হায়, নাথ !

“সিকার্ত্ত একপে আমাদের বৃকে

করিল কি বজ্রাঘাত !

“দিদি মায়াদেবী বড় ভাগ্যবতী,

“গিয়াছেন আগে চলে ;

আমি পাপীয়সী রহিলাম হায় ।

“পুড়িতে এ বজ্রানলে ।

“বৃদ্ধ হই জনে ফেলি এইরূপে

“পুত্র যদি গেল চণ্ডি,

“বাইব আমরা পশ্চাতে তাহার

“সংসার চরণে দলি ।

“যে পথে সে গেছে যাব সেই পথে,

“রব সে যেখানে রবে ;

“ছায়ার মতন রব সঙ্গে তার,

“পর্যণ শীতল হবে ।”

বাঙ্গাকুল-কণ্ঠে বিষাদ গঞ্জীর

কহে নরপতি থেদে—

“হায় । রাণি, নর-নির্বন্ধের স্রোত

“কে পারে রাখিতে বেঁধে ?

“বাধিতে সে স্রোত কি দৃঢ় বন্ধন

“না বাঁধিছ হই জন ।—

“এই শাক্য রাজ্য, প্রমোদ প্রাসাদ,

“গোপা নারীরছোভম ।

“সংসার বন্ধনে দৃঢ়তম বাহা—

“অপত্য মেহের হার,

“তাতে ও ত শেষে বাঁধিছ মাহিষি !

“বাকি কি আছিল আর ?

“এ বন্ধনরাশি, সমষ্টি তৃণের,

“নিল উড়াইয়া বলে

নির্বন্ধের স্রোত ; গিয়াছে ভাসিয়া

“সিদ্ধার্থ সে স্রোতোজলে ।

“যে দিন শুনিছ মায়াদেবী মুখে

“অপূর্ব গর্ভ-স্বপন,

“জানিছ সে দিন সিদ্ধার্থ আমার

“নহে পুত্র কদাচন ।

“যে দিন দেখিছ দেহে কুমারের

“অপূর্ব দেব লক্ষণ,

জানিছ সে দিন সিদ্ধার্থ আমার

“নহে পুত্র কদাচন ।

“যে দিন শুনিছ বুদ্ধ ঋষি মুখে

“পুত্রের ভাবী জীবন,

“বুঝিছ সে দিন সিদ্ধার্থ আমার

“নহে পুত্র কদাচন ।

“যে দিন দেখিছ শিশু বুদ্ধমূলে

“মহাধ্যানে অচেতন,

“বুঝিছ সে দিন সিদ্ধার্থ আমার

“নহে পুত্র কদাচন ।

“যে দিন শুনিছ সিদ্ধার্থ কিরিল

“দেখি জরা, ব্যাধি, শব,

“সে দিন বুঝিছ সিদ্ধার্থ নিশ্চয়

“মম পুত্র অসম্ভব ।

“বুঝি নারায়ণ পতিতপাবন

“আমি পতিতের ঘরে

“জনমিলা পুনঃ এই নররূপে ;

“নরের উদ্ধার তরে ।

“মায়াদেবী বুঝি দৈবকী জাহার,

“বশোদা জননী তুমি,

“কপিলনগর হইবে এবার

“নব বৃন্দাবন-ভূমি।

“জীব-দুঃখে, দেবি ! লইল মস্তকে

“যে পুত্র এ দুঃখ ভার,

“বৃদ্ধ পিতা মাতা ভাসাইতে দুঃখে

“কাঁদিল না প্রাণ তার ?

“কাদে যার প্রাণ দেখিলে কীটের (ও)

“বিন্দু মাত্র রক্তপাত ;

“পিতা, মাতা, পত্নী, সন্ত-শিশু শিরে

“সে কি করে বজ্রাঘাত ?

“না না, কুমারের অচিন্তা নিয়তি

“নিয়াছে অচিন্তা পথে

“নিষ্ফল এ শোক, গিয়াছে কুমার

“নবের উদ্ধার-ব্রতে ।

“কি সাধ্য আমরা হীন ক্ষুদ্র জীব

“যাব দেবপথে তার

“কি সাধ্য পতঙ্গ করিবে লভন

“হেন মহা পারাবার ?

“কেবল ধর্ম্মেতে পতিত তাহাকে

“করিব, হইব আর ।

“সন্ন্যাসীর প্রিয়ে ! জান না কি নাহি

“পিতা মাতা পরিবার ।”

“চল তবে নাথ !”—কহে কাঁদি যাঁতা —

“চল যাই কোন বনে ।

“এ গৃহ-অশানে থাকিব না আর

“গুড়ি এই হত্যাশনে ।

“নয়নের মণি হারিয়েছি আমি,

“নয়নে না দেখি আর ।

“শ্রবণের শক্তি গিয়াছে আমার

“তুনি শুধু হাহাকার !

“হাহাকার প্রাণে মরীচিকা মত

“উঠিতেছে অনিবার ।

“প্রাণে নাহি প্রাণ হৃদয়ে হৃদয়

“আমাতে এ আমি আর ।

“কেমনে বহিব জীবন বিহীন

“হায় ! এই দেহভার ?

“গৃহের আলোক, প্রাণের আলোক,

“নিবেছে হায় ! আমার ।”

কহে নরপতি ধীরে শোকাহুর—

“আছে বল কোন বন,

“গেলে যেই বনে এ দারুণ জ্বালা

“হবে রাণি ! নির্দাপণ ।

“আপন নিয়তি পালিতে কুমার

“গিয়াছে, আসিবে কিরে ।

“আমরাও চল পালি আমাদের

“নিয়তি আনতশিরে ।

“পায় যদি পুত্র নবের উদ্ধার

“সাধন করিতে পথ,

“আসিবে অবগু করিতে উদ্ধার

“আমাদেরে, পালি ব্রত ।

“সেই আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া

“যাকি চল হই জন ।

“সিদ্ধার্থ আমার হইবে সিদ্ধার্থ,—

“পুত্র নর-নারায়ণ ।

“যেই সিংহাসনে বসিবে কুমার.

“তুচ্ছ শাণ্ড্য-সিংহাসন,

“তার তুলনায়, তুচ্ছ ধরা-রাজ্য ;

“পুত্র নর-নারায়ণ !

“হায় ! কি দেখিবে সেই পুণ্যাসন

“এই বৃদ্ধ হই জন ?

“সেই পণ্য রাজ্যো পিতা মাতা তোর

“পাবে স্থান ক্ষুদ্রতম ?

“জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ হইতে

“সিদ্ধার্থ ! যদি নিকৃতি

“লভে নর-নারী ; তোর পিতা মাতা

“পাবে না কি তোর স্রীতি ?

নৃপতির দর-দর বিগলিত

বহিল নয়ন-বারি ;

রহিল নীরবে চাহি শূন্তপানে ।

করে অশ্রু অপসারি

কহিল—“গৌতম ! যাও ত্বর করি

যথায় ধূল্য পড়ি

“সোণার প্রতিমা পুত্রবধূ গোপা

“যাইতেছে গড়াগড়ি !”

সপ্ত দিবানিশি, দিনে কত দিন ।

নিশিতে কতই নিশি !—

শোকে অচেতনা দীনা দীনা গোপা

ধরায় অধীরা যিশি ।

কেবল হৃদয়ে হৃদয়-প্রসন্ন,
 রেখেছে চাপিয়া বলে,
 পতির সে প্রিয় বসন ভূষণ
 প্রক্ষালি নয়নজলে ।
 শোকের ঝটিকা বহিয়া বহিয়া
 ডুবায়ে ভাসায়ে তরী,
 কর্ণধার-হীনা—বিস্মৃতি-সাগরে,
 এবে শাস্ত বেগ ধরি
 বহিতেছে ; গোপা উঠি ধীরে ধীরে
 ব্রহ্মময় বেদি' পরে
 পতির প্রেরিত বসন মুকুট
 স্থাপিলা ভকতি-ভরে ।
 খুলি আপনার বসন ভূষণ,
 কাটিয়া অলক-দাম,
 যৌবনে যোগিনী সাক্ষিয়া করিলা
 বেদি-পদমূলে দান ।
 কাটিতে কবরী কাঁড়ি উঠেঃস্বরে
 গৌতমী ধরিয়া কয়ে
 কহিলেন—“মা গো ! দেখি এই রূপ
 কেমনে রহিব ঘরে ?
 “পুত্র গেছে চলি, আছে পুত্রবধু—
 “তুইও যোগিনী হবি ?
 “বৃদ্ধ ছাটি প্রাণ রাখিবে কেমনে
 “দেখি এ বিষাদ-ছবি ?
 “তুই পুত্র এবে, পুত্রবধু তুই,
 “একই সাক্ষ্য-চায়া।

“থাক তুই বুকে, মা গো ! বাঁচাইয়া

“প্রাণশূন্য হই কায়া ।”

শাস্ত বিধাদেব মূর্তি গম্ভীর

কহে গোপা ভগ্নস্বরে—

“ধাকিবে মা ! গোপা, রবে চিরদিন

“তোমাদের স্নেহগারে ।

“সহকার-ভ্রষ্ট, বল্লরীর মত

“রবে এই বেদি-মূলে,

“তোমাদের পদ পূণ্যছায়া তলে,

স্নেহ-গঙ্গা-উপকূলে ।

“জীব হুঃখে মা গো ! একপে কাতর

“কাদে যার পতিপ্রাণ ;

“এই রাজ্য-স্বথ ত্যজে যে করিতে

“জীব-হুঃখ-নিবারণ ;—

“সে কি মা । মানব ? মানবীর স্বামী ?

সে যে মানবের গতি !

পিতা দেব-পিতা, তুমি দেব-মাতা,

গোপার মা দেব-পতি ।

হেন দেব-পতি সন্ন্যাসী-ভিখারী,

সহধর্ম্মিণীর তাঁর

সেই ধর্ম্ম বিনা, সেই বেশ বিনা,

কি আছে বল মা আর ?

বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস

সাধিবেন যম স্বামী !

বিলাস-ভবনে এই বেদি-মূলে

সাধিব সন্ন্যাস আমি ।

তিনি নারায়ণ, তাঁহার সন্ন্যাস
 উদ্ধার করিতে নরে ;
 আমি কুজ নারী, আমার সন্ন্যাস
 তাঁহার চরণ তরে ।
 পূজি এই বেদি, পূজি তোমাদের
 চরণ ত্রিদিব মম,
 সাধিব সন্ন্যাস ; আশীর্বাদ কর
 হয় ব্রত উদযাপন ।

(১৩)

প্রব্রজ্যা ।

সিদ্ধার্থ একক,—উর্দ্ধে নীরব আকাশ
 বসন্তের নিরোপম সুনীল বিস্তৃত ;
 নিম্নে হিমালয়সুতা নিশ্চল-সলিলা
 'অনোমা, সুনীলা ধারা নীরবে বাহিতা ।
 নীরব আশ্রকাননে অনোমার কূলে
 সিদ্ধার্থ একক ;—দাসদাসী অম্লচর
 ছিল শত সংখ্যাতীত বেষ্টিয়া বাহারে,—
 নক্ষত্রে বেষ্টিয়া শলী ; ছিল অট্টালিকা
 সুখ-সন্তোষে পূরিত ;—আজি সে একক ।
 রাজপুত্র, বুবা, দেহ শিরীষ-কুহুম
 স্কন্ধময় স্কন্ধোমল, অভাষ-উজাপ

আজি সে একক এই বিপুল সংসারে,
 অনন্ত আকাশতলে, আশ্রয়বিহীন ।
 স্মৃতিকুরে সুবাসিত সজ্জিত মস্তক
 এবে কেশহীন ; বস্ত্র কারুকার্যাময়
 বসন ভূষণ চারু শোভিত যে দেহে,
 এবে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কর্কশ মলিন ।
 হায় ! রাজপুত্র এই ভিখারীর বেশে
 কোথা যাবে, কোন্ পথে, যাইবে কেমনে ?
 মানবের অন্নবাতা মাগিবে কেমনে
 অন্ন-জল ; অন্নজল কে দিবে তাহারে ?
 কিছুক্ষণ বসি যুবা আশ্রয়স্থলে
 অনোমার উপকূলে উবার আলোকে,
 চাহিয়া প্রশান্ত মুখে নব বসন্তের
 নব দিবসের চারু নয়ন-উন্মেষ,
 ভাবিলেন ; —দেখিলেন অতীতের পটে
 স্মৃতির কৈশোর, ক্রীড়া নব যৌবনের, —
 পূর্ব গগনে ক্রীড়া নব দিবসের ;
 উষাসরূপিনী গোপা ; অন্ধেতে তাহার
 শিশুর সে সন্ত মুখ, উবার কুসুম
 সত্ত্ব সিন্ধু নিরমল ; প্রভাত আকাশ
 জনকের জননীর পবিত্র হৃদয়
 স্নেহ-নীলামৃত্তে ভরা অনন্ত অদীম ।
 নয়ন হইল সিন্ধু, হইল হৃদয়
 সিন্ধু উজ্জ্বলের শান্তি করুণ প্রবাহে ।
 ধীরে ধীরে অতীতের পট মনোহর
 হইল অন্তর ; ধীরে হইল অন্তর

উষার মাধুরী শোভা, দেখিল যুবক
 নবরবিকর-দীপ্ত আকাশের মত
 অনিশ্চিত ভবিষ্যত অনন্ত বিস্তৃত,
 পথহীন, ছায়াহীন, মরুভূমি মত ;—
 এই মহা মরুভূমে সিদ্ধার্থ একক !
 দেখিল। মরুর প্রান্তে সিদ্ধার্থ কেবল
 চারু উপবন এক ; শীতল ছায়ায়
 শান্ত সরোবর তীরে জরাব্যাদিহীন
 অনন্ত মানব শান্তি লভিছে নির্মল ।
 “ও কি যমীতিকা ? হায় ! অতিক্রমি মরু
 কোন্ পথে, কত দিনে, যাইবে কেমনে
 সিদ্ধার্থ সে উপবনে ? ছুটিগ যুবক
 চাহি উপবন পানে প্রকুল বদনে
 বেগে কারামুক্ত বন-বিহঙ্গের মত ।
 পূরবদক্ষিণ-মুখে নবীন সন্ন্যাসী
 চলিলেন, নাহি জ্ঞান গোণায়, কেমনে ।
 পদে পদে পদতল রক্ত-শতদল
 “হইতেছে রক্ত তৃণে, মুক্তি দায় দৃঢ়,”
 নাহি জ্ঞান ; বহিতেছে শ্বেদ দরদর ।
 পথে শাকী পদ্মা, ঋষি বৈবত-অশ্রমে
 লইয়া অশ্রয় ক্রমে “বৈশালী” নগরে
 হইলেন উপনীত নবীন সন্ন্যাসী ।
 আরাড়কালায় ঋষি শিষ্যগণে ডাকি
 কহিলেন—“দেখ ! দেখ ! অপরূপ রূপ ।
 কি আকৃতি যনোহর যনোমুগ্ধকর !”
 তিন শত শিষ্য স্নেহে বেষ্টি ঋষিবরে

করিতেছে অধ্যয়ন । অগমি চরণে
 সিদ্ধার্থ শিষ্যত্ব তাঁর করিলা গ্রহণ ।
 স্নমগ্র দর্শন-শাস্ত্র করি সমাপন
 দেখিলা সিদ্ধার্থ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
 নির্বাপনের পথ নাহি সাধ্য দর্শনের
 করে প্রদর্শন । ছাড়ি বৈশালী হৃন্দরী
 অতিক্রমি ভাগীরথী নিরাশ-হৃদয়ে
 পশিলেন “রাজ-গৃহে”, পুরী মগধের ।
 সৌন্দর্য্যো, ঐশ্বর্য্যো শৌর্য্যো ভারতে অতুল
 রাজগৃহ, সুসজ্জিত রাজগৃহ সম
 মনোহর শোভাময় ! দক্ষিণ সীমায়
 নীলাকাশে তুলি নীল বপু শিলাময়
 শোভে পঞ্চ শৈল, পঞ্চ-প্রহরী ভীষণ
 বেষ্টি চক্রাকারে সেই গিরিব্রজপুর
 জরাসন্ধ নৃপতির খ্যাত রাজধানী,—
 দ্বাপরে ভারত-বন্ধ কুরুছায়া বার
 করেছিল সমাচ্ছন্ন সবজ্ঞ-জলদ ।
 শৈলমুতা-সরস্বতী চারু নিখরিনী,
 বহি বহু নিখরের সুধা সুশীতল,
 বহিতেছে, তর তর শৈল, পাদ-মূলে
 ভক্তি যথা দেবপাদমূলে প্রবাহিতা ।
 দেখিলেন শাক্যসিংহ রহিয়াছে পড়ি
 ভগ্নশেষ রাজপুর, যথা ভগ্নরাশি
 অশানে কঙ্কালসহ ; রহিয়াছে পড়ি
 সেই মহারাজভূমি ; যুক্তিকা মন্থণ
 সে মহাক্ষেত্রের ; আর রহিয়াছে পড়ি

শৃঙ্গবাহী সে প্রাচীর, কারাগারে যার
 অশান্তি নৃপতি ছিল রুদ্ধ পরাক্রমে ।
 আবোহি পাণ্ডব শৈল দেখিলা কুমার
 খুলিয়া প্রকৃতি দেবী কি শোভা-ভাণ্ডার
 রেখেছেন চারিদিকে ললিত ভৈরব !
 ভীষণ গগনস্পর্শী শৈল-ছায়া-তলে
 এক দিকে রাজগৃহ পুষ্পোদ্ভান সম
 শোভিতেছে নিরুপম ;—কুদ্র পুষ্প বৃক্ষ,
 বিশাল বিটপিচয়, বসন্তে পুষ্পিত,
 সংখ্যাতীত রাজবন্য বন্ধিম সরল
 সুপ্রশস্ত ছায়াবিত, চারু কুদ্র পথ
 উদ্ভানের সুরঞ্জিত চারু হর্ম্যাবলি
 নানাবর্ণ অয়বে শোভিতেছে যেন
 বিচিত্র কুহুমচয়, শোভিছে দৌর্ধিকা
 উদ্ভানের অঙ্কে অঙ্কে, শ্রাম মনোহর,
 মরকত বিমণ্ডিত আবশীর মত ।
 চারি দিকে যত দূর যাইতেছে দেখা
 শ্রাম সমতল ক্ষেত্র, চারু আচ্ছাদিত
 বসন্তের নীলাকাশে মহা চক্রাকারে ।
 স্থানে স্থানে আশ্রয় শোভিছে স্তম্বর,
 শোভিছে স্তম্বর স্থানে স্থানে গ্রাম্যাবলি,—
 শ্রামল সাগরে যেত শ্রাম দীপপুঞ্জ
 কুদ্র মনোহর । কেণপুঞ্জ শ্রামার্ণবে
 স্থানে স্থানে পালে পালে শোভিছে গোপাল ।
 বসন্তের নীলাকাশে ছায়াপথ যত
 শোভিতেছে পুণ্যস্রোত নদ “পকানন”

অমিতাভ ।

দক্ষিণে শ্রামল ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
 লুকাইয়া, প্রকাশিয়া ; উত্তরে দক্ষিণে
 শোভিতেছে শৈলদ্বয়, উভয় একক
 প্রাচীন কৃষ্ণাত উচ্চ দেবালয় মত !
 অন্তর্মিত দিনমণি ; দেখিলা কুমার
 নীরব, নির্জন, স্থির, শান্ত প্রকৃতির
 শ্রাম বক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
 শাস্তিময়ী সুগভীরা সুকোমল করে ।
 নীরব, নির্জন, স্থির বিশ্বচরাচরে,
 নীরব, নির্জন, স্থির শৈলের শেখরে,
 সিদ্ধার্থ একক সন্ধ্যা গগনের তলে !
 প্রকৃতির শাস্তমূর্তি করিল সন্ধ্যার
 সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে শাস্তি স্থলীতল,
 হইলা সিদ্ধার্থ ধীরে ধ্যানে নিমজ্জিত ।

কুমার প্রভাতে ধীরে ভিক্ষাপাত্র করে
 নতশির, ছিন্নবাস, পশিলা নগরে ।
 কুজাটিকা-ঢাকা স্বর্ণগিরিশৃঙ্গ মত
 সুদীর্ঘ, উন্নত, দেব-মহিমা-মণ্ডিত
 নবীন সন্ধ্যাসী মূর্তি, বিস্তৃত নয়ন
 কমল-কোরক নিভ, বিস্তৃত ললাট
 প্রভাত-গগনসম শান্ত সমুজ্জল,
 বিস্তৃত উরস অংস, নাগরিকগণ
 দেখিয়া হইল মুগ্ধ গৃহকার্য্য গৃহী,
 পণিক গন্তব্য স্থান, বণিক বিক্রয়,
 মাতা স্তম্ভপায়ী শিশু, শিশুগণ ক্রীড়া,
 ছাড়িয়া রহিল চাহি চিত্তাঙ্গিত মত

উঠিল নগরে ক্রমে মহাকালাহল ;
 মহাসমারোহে পথ হইল পূর্ণিত ;
 ঘোষীরা চলিতে সাধা নাহি এক পদ !
 উচ্চৈঃস্বরে নারীগণ আকুল কঁদিয়া ;
 কেহ কহে—“নাহি জানি জনক জননী
 কেমন পাষণ্ড এর, এমন স্তম্ভর
 সোণার পুতুল হায় ! করিল সন্ন্যাসী ।
 কেহ কহে—“পিতা মাতা থাকিলে কি আর
 এমন সন্তান পারে হইতে সন্ন্যাসী ?”
 কেহ কহে—“না থাকুক জননী ইহার,
 হইব জননী আমি, প্রাণান্তে আমার
 সন্ন্যাস করিতে আর দিব না কখন ।”
 “বাছা ! বাছা !” বলি কঁাদে কেহ গলা ধরি,
 কেহ কঁাদি পদতলে যায় গড়াগড়ি ।
 নরপতি বিহিসার প্রাসাদ-শেখরে
 উঠি দেখিলেন,—নেত্র ফিরিল না আর ।
 ভাবিলেন,—একি চন্দ্র ? ইন্দ্র দেবরাজ ?
 কিংবা বিদ্যাচন্দ্রের এ অধিষ্ঠাত্রী দেব ?
 কিংবা দেব বৈশ্বানর ? মানবৈশ্বস্তুব
 নহে কদাচিত এই রূপ অপরূপ !
 ভিক্রান্তে পাণ্ডব শৈলে ফিরিলা সন্ন্যাসী
 তনি নরপতি, সেই অপরাহ্নে তথা
 আসিলেন পারিষদ রাধিয়া পশ্চাতে ।
 দেখিলেন বিহিসার নবীন সন্ন্যাসী
 বসিয়া স্বত্বিকাসনে গিহিঙহাঘারে
 ধ্যানমগ্ন দেখিলেন শৈল-বেদিকায়

স্বর্ণ-দেবমূর্তি যেন রয়েছে স্থাপিত ।
 কিছুক্ষণ পরে যোগী মেলিল নয়ন
 প্রণমিলা শৈলস্থিত রাতুল চরণে—
 রক্ত শতদল মূলে নীল সজ্জাবরে
 শরতের পূর্ণচন্দ্র পড়ি সমুজ্জল ।
 কহিলেন বিধিসার—“যোগিবর ! তব
 নিরখি এ দেবরূপ, দুর্লভ ঘোবন,
 মুগ্ধ এ মগধ, মুগ্ধ মগধ-ঈশ্বর ।
 সোণার ঘোবনে তব দেখিয়া সন্ন্যাস,
 প্রথম বসন্তে ঘোর শিশির সঞ্চার।
 নিদারুণ, হাহাকারে পূর্ণ মম পুরী,
 আকুল হৃদয় মম ! আইস যুবক
 ত্যজিয়া নিষ্ঠুর এই অকাল সন্ন্যাস
 কর রাজস্ব ভোগ এই রাজ্যে মম ।”
 উত্তরিল শাক্যসিংহ ধীরে—“মহারাজ !
 হউন চিরায়ু, সুখে করুন পালন
 এই রাজ্য চিরদিন অমরপ্রতিম ।
 নাহি চাহি রাজ্য, স্বখ; নাহি শাস্তি আমি;
 হয়েছে সন্ন্যাসী আমি শাস্তি কামনায় ।”
 সবিস্ময়ে বিধিসার কহিলা আবার—
 “এ কি কথা ! স্কুমার, অতি স্বকোমল
 পুষ্প নিভ এই দেহ সহিবে কেমনে
 দারুণ সন্ন্যাস-দাহ ! না, না, ত্যজি এই
 কঠিন প্রস্তরাসন, জনশূন্য বন,
 চল রাজপুবে মম । অশাস্তি গৃহের
 করে থাকে যদি শাস্তি-প্রদানী তোমায়,

দিব শান্তি, বসি অর্ক সিংহাসনে, মম
 কর কামভোগ, তব পূরাও বাসনা ।
 সিদ্ধার্থ, জৈবং হাসি কহিলা—“নৃপতি !
 হউ কুশল তব ! কামের প্রয়াসী
 নহি আমি ; কামভোগ যা ছিল আমার
 আছে কার ধরাতলে ? রাজ্য সুখভরা,
 সুখভরা রাজপুরী, পিতা পুণ্যবান,
 পুণ্যবতী মাতা, প্রেম-পূর্ণ স্রোতস্বতী
 নিকুপমা পত্নী, নবপ্রসূত কুমার,
 কত সুখৈশ্বর্য আর নাহি পড়ে মনে ।
 কামভোগে সুখশান্তি থাকিলে নিশ্চয়
 পাইতাম আমি, হয় । দিতাম কি ঝাঁপ
 অকালে অকূল এই সম্মান-সাগরে ।
 নরনাথ ! সুখ যদি ফলে গৃহশাথে,
 কে যায় খুঁজিতে তাহা বন বনান্তরে ?
 নাহি কামে সুখ ভূণ । বৃক্ষফল মত
 হয় কাম বৃক্ষচাত, অস্পৃশ্য, গলিত ।
 উড়াইয়া মানবের পবন মঙ্গল
 ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া
 করি দেহ অরাজীর্ণ, মৃত্যু-কলিত ।
 হয় যদি বেগবান, ঝটিকার মত
 কার সাধ্য করে জয় ? অনন্ত অসংখ্য
 কাম, কে পারে কখন লভিতে সকল ?
 রহিল অলঙ্ঘ্য যদি একটিও হয় ।
 লঙ্ঘ করে মনঃপ্রাণ ; হয় লঙ্ঘ্য যদি
 কোথা তৃপ্তি ? লবণাক্ত লগিলের মত

বাড়ায় পিপাসা কাম, করে প্রভাবিত
 মহামরুভূমে কাম মরীচিকামত ।
 প্রাচীন মগধপুরী দেখ ধ্বংসশেষ
 পড়ি তব পদতলে,— অতৃপ্ত কামের
 কি আদর্শ বিভীষণ গিরিব্রজপুর
 জরাসন্ধ নৃপতির ! এই স্বর্ণপ্রস্থ
 বিস্তৃত মগধ রাজ্যে রাজ্যের কামনা
 পূরিল না ; অষ্টোত্তরশত নরপতি
 দিয়া বলিদান যজ্ঞে করিবে প্রচার
 সাম্রাজ্য, ছুটিল বেগে অতৃপ্ত কামনা
 মহাস্রোতস্বতী মত প্রাসিতে ভারত ।
 পরিণাম তার ওই ক্ষুদ্র মল্লভূমি,
 এই ধ্বংস রাজপুরী ! কামী মানবের
 করাল কালের স্রোতে সাক্ষী ও শিক্ষক ।
 কি ভীষণ ! বসি শূণ্ণে গুন নরনাথ !
 কামভোগী নরনারী কিবা হাহাকার
 করিতেছে জন্ম-জরা-ব্যাধির পীড়নে ।
 আছে কোন ধর্মপথ হুংখী জীবগণ
 এই হুংখার্ব হ'তে করিতে উদ্ধার,
 লভিতে উদ্ধার মম ; থু জিব সে পথ ।
 ছাড়িয়াছি শাকা-রাজ্য, শাক্যরাজপুরী
 অথ সন্তোগের থনি, লভিতে সে বোধ ;
 সেই জ্ঞান মহাধর্ম করিতে প্রচার ।”
 বিদ্বিসার নৃপতির চক্ষু-আবরণ
 পড়িল থসিয়া, জ্ঞান হইল উদয় ।
 করযোড়ে নরপতি কহিলা কাতরে—

"চাচ্ছে ছই ভিক্ষা দাস, লভিলে সে বোধ,
বুদ্ধদেব দেখা দিয়ে এই দাসে তব
করিবে উদ্ধার, আর রহি কিছু দিন
এই শৈলে চরিতার্থ করিবে এ দাসে।"

রহিলেন শাক্যসিংহ। কিছু দিন পরে -
মহামারী উপজব বৈশালী নগরে
উষ্ণ জলিয়া, বনে দাবানল মত ;
হাহাকাহে পরিপূর্ণ হইল নগর।
কালের সে ভীমক্রীড়া করিতে বারণ
কত মুনি, কত ঋষি, যাগ যজ্ঞ কত
করিলেন কত মতে, বারিবিন্দু নাহি
হইল পতিত সেই ভীমদাবানলে।
তখন বৈশালীবাসী করিল শ্রবণ
নবীন সন্ন্যাসী সেই অপূর্ণ দর্শন,
লইল শরণ পদপঙ্কজে তাঁহার
করুণহৃদয় যোগী সুসজ্জিত পথে
পলবে কুহুমে, ঘটে, মঙ্গল-সঙ্গীতে,
অতিক্রমি ভাগীরথী পশিলে নগরে
হইল অচীরে শান্ত সেই মহাব্যাধি,
সলিল-প্রবাহে যেন ক্রীড়া অনলেক—
হামবের শক্তি-সিদ্ধ অনন্ত এতল !
কিরিয়া পাণ্ডব শৈলে, শিষ্য সন্তুশতে
প্রতিষ্ঠিত রামগুণ রুদ্রকের কাছে
লভিলেন শাক্যমুনি সমাধি যুগল।*

কিন্তু দেখিলেন নহে নির্কাণের পথ
এ সমাধি, চলিলেন পঞ্চ শিষ্য সহ
পূণ্যতীর্থ গয়াধামে স্থ জিতে সে পথ !

(১৪)

সাধনা ।

মনোহর গয়াধার পূণ্যতীর্থ ভারতের ।
বক্ষে পূণ্যগয়শৈল করিয়া ধারণ
শোভিতেছে চারু গয়া, অচলা অহল্যামত
ধরি বক্ষে শ্রীরামের পবিত্র চরণ ।
শোভে গয়া কলুতীরে, অস্তর-সলিল নদ
প্রথম শরতে বক্ষ প্রাবিত পূর্ণিত ;
অহল্যার ভক্তিশ্রোত উছলি নগ্ননপথে
বহিছে পাষণ-বক্ষ করিয়া দ্রবিত ।
সুপবিত্র গয়শৈলে অধিষ্ঠিত শাক্যমুনি
উদয়-অচল-শিরে অংগুমাঙ্গী মত,
নিরখিয়া শরতের শান্তিময়ী ফল্ল-শোভা
চিন্তিতে লাগিলা ধ্যানে নির্কাণের পথ ।
একদা ভাবিলা মনে—“ভুলেছি ইন্দ্ৰিয়-স্বপ্ন,
হঠাৎ অতীত আমি কাম্য কামনার ;
কিন্তু সে ইন্দ্ৰিয়গণ রহিয়াছে ভোগক্ষম,
ভোগক্ষম এ শরীর ইন্দ্ৰিয়-আধার ।
কেমনে পাইব জ্ঞান ? কেমনে পাইব অগ্নি
শুষ্ক কাঠে শুষ্ক কঠ না করি ঘর্ষণ ।

শুকদেহে শুক মন করি যদি সংঘর্ষণ,
 তবে বুঝি জ্ঞান-অগ্নি পাব স্রবশন।
 কঠোর তপস্তানলে পোড়াইব দেহ মন,
 অনলে কাঞ্চন করে নির্মল তরল,
 তপঃ-ক্লেশে ক্লিষ্ট মন পাবে শক্তি অলৌকিক,
 সংঘর্ষণে হয় যদি পবিত্র উজ্জল।”
 একদিন চিন্তাকুল ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে
 নীল নৈরঞ্জনা-ভীরে শারদ উষার
 আসিলেন রয়া-বনে, নিবিড় পাদপ শ্রেণী
 আচ্ছাদিয়া বনভূমি ধ্যানমগ্ন প্রায়ঃ।
 শরতে শ্রামল পত্রে শ্রামল লতিকাপুঞ্জে
 সাজাইয়া স্থানে স্থানে কুঞ্জ মনোহর,
 শরতেব চারু পুষ্পে, পুষ্পের সৌরভে চারু,
 শীতল শারদানীলে, কি বা প্রীতিকর !
 উচ্চ শাখে নানা পাখী গাইছে প্রভাতি গান
 করি স্বর-লহরীতে দিগন্ত-প্রাবিত,
 কোথা পত্র আবরণে ঢাকি ক্ষুদ্র অবয়ব
 গাইতেছে ক্ষুদ্র পাখী কি শাস্তি-সঙ্গীত।
 শরতের নব ভূণে সুশ্রামল তরুতল ;
 স্থানে-স্থানে সুশ্রামল শোভে ফুলবন,
 নীরব নিশ্চল স্থির, বসি যেন যোগাসনে
 গভীর সমাধি-মগ্ন বনযোগিগণ।
 বত দূর যায় চক্ষু, শতক্ষেত্র নবশ্রাম,—
 শ্রাম মরকতে ধরা যেন বিমণ্ডিত !
 প্রান্তবের প্রান্তভাগে শোভিতেছে নানা গ্রাম,
 শোভে গ্রাম উরুবিধ নন্দিক সজ্জিত।

শোভিতেছে বনভূমি স্বচ্ছ নৈরঞ্জন-তীরে ।
 তীরক্রম লতাকুঞ্জ প্রতিবিম্ব নীরে
 নীলাঞ্জন নৈরঞ্জন বহিতেছে তর তর,
 শাস্তির সঙ্গীত যুহু গাহি ধীরে ধীরে ।
 প্রসন্ন-সোপানশ্রেণী নামিয়াছে স্তরে স্তরে,
 ঘনীভূত প্রীতিধারা যেন কাননের,
 প্রীতি প্রবাহিণী বক্ষে ; শোভে তীরে শোভে নীরে
 স্নানীতল যোগাসন নীল উপলের ।
 তটিনীর অন্ত তীরে নীল আকাশের পটে
 নীলতর শৈলশ্রেণী তরঙ্গ খেলিয়া ;
 বক্ষে বক্ষে যোগ কক্ষ, সানুতে সানুতে শূণ্ডে
 যেন মহাযোগাসন রেখেছে পাতিয়া ।
 কিবা বন শাস্তিময় ! প্রত্যেক বৃক্ষটি যেন,
 পবিত্র উপাসন, সোপান স্নানর,
 শৈলবক্ষ, শৈলসানু, সিদ্ধার্থে কহিছে ডাকি—
 এই খানে ধ্যানমগ্ন হও যোগিবর ।
 এই শাস্তিময় বনে, শাস্তিময়ী নদীতীরে,
 শাস্তি-ছায়া-তরুতলে পাতি তৃণাসন,
 হইলেন ধ্যানমগ্ন ছয় বৎসরের তরে,
 কঠোর তপস্তা ব্রত করিতে সাধন ।
 কখন বদরি এক, কখন একটি তিল,
 কখন তণ্ডুল এক করিয়া আহার,
 ক্রমে যোব তপস্যায় হইলেন অনশন,
 প্রাণের আশ্রয় কিছু রহিল না আর ।
 প্রবল ইচ্ছার বলে করিলেন সিংহীত
 শরীর, ইন্দ্ৰিয়গ্রাম, যেন পুশাবন

কুম্মমিত প্রাসিত, লাগিল দলিতে বলে
 অমিত বিক্রমে গর্বে অমত বারণ ।
 শরীর ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইলে নিরুদ্ধ ক্রমে,
 হেমন্ত তুষারস্রাবী নিশীথেও তাঁর
 বক্ষ ও ললাট বাহি বহিতে লাগিল শ্বেদ,
 ঘেন তপ্ত গৈরিকের ধারা অনিবার ।
 সাধিয়া নিগ্রহ-যোগ, আশ্ফালন ধ্যান-মগ্ন
 হইলেন শাক্যসিংহ ; মনোবৃত্তি বল
 কুম্মকে করিয়া লয় রহিলেন অচেতন্ত,
 স্রবণ মুরতি মত নিস্পন্দ নিশ্চল ।
 পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস, কুদ্ধ মুখ কণ পথ,
 কুম্মবৎ বায়ুপূর্ণ হইয়া শরীর,
 কুম্মিত বাতাস বেগে আঘাতি কপাল শির
 করিল চৈতন্ত লয়, প্রাণযন্ত্র স্থির ।
 এ সময় এক দিন দেখিলেন শাক্যসিংহ
 দিবাক্রপা নারী এক বর্ষি অশ্রুজল
 কহিছে—“হা পুত্র তব কলিল না আশা-লতা,
 “অসিত শ্ববির বাক্য হইল নিষ্ফল ।
 “না তুমি হইলে বুদ্ধ, না করিলে রাজ্যভোগ,
 “করিলে জীবন ক্ষয় অকরণমনে ;
 “শোকে বিদরিছে বুক, বনের কুম্ম মত
 “বনে জন্মি পুত্র ! তুমি শুকাইলে বনে ।”
 জিজ্ঞাসিল শাক্যসিংহ—“রমণী ! কে তুমি কহ
 “কাতরা বিবশা শোকে, সিক্ত হনন,
 “কবরী আলুণায়িত, দেহ ধূলা-বিলুপ্তিত,
 “পুত্র পুত্র বলি মাতঃ ! করিছ রোদন ।”

কাতরা রমণী কহে—“তোমার জননী আমি,
 “আমি মায়া দেবী, আমি ত্রিদিব ছাড়িয়া
 “আসিহু আকুলা শোকে, তোমার নিষ্ফল ব্রত,
 “তোমার জীবন শূণ্য মূরতি দেখিয়া ।”
 আশ্বাসি মায়েরে যোগী—কহিলা দয়ার্দ্ৰ স্বরে—
 “ভয় নাহি, তব গর্ভে জনম আমার
 “হবে না নিষ্ফল, নাহি হইবে নিষ্ফল বাক্য
 “অসিত স্বপ্ন—শোক কর পরিহার ।
 “হব আমি বুদ্ধ মাতঃ । হয় যদি ধরাতল
 “বিদীর্ণ শতধা, হয় স্রমেয় প্রারিত,
 “চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা হয় যদি ভূপতিত
 “মরিব ন’, নাহি ব্রত করি উদ্‌ঘাপিত ।”
 জননী গেলেন চলি স্বপনের ছায়ামত,
 হইলেন শাক্যসিংহ যোগে দৃঢ়তর
 নিমজ্জিত দিবানিশি একাসনে একধ্যানে,
 লজ্জিতে তপস্তা-বলে সমুদ্র হস্তর ।
 ক্রমে ক্রমে বাহু জ্ঞান, হৃদ পূর্ণ তিরোধান,
 সিদ্ধার্থ অন্তর জ্ঞানে শুদ্ধ অবস্থিত,
 নিশ্চল নিপন্দ দেহ, পূর্ণ অবরুদ্ধ শ্বাস,
 বনে ঘন বনদেব-মূরতি স্থাপিত ।
 দিন যায়, রাত্রি যায় ; ঋতু যায়, বর্ষ যায় ;
 এইরূপে ছয় বর্ষ হইল অতীত ।
 কত বর্ষা, কত শীত, কত গ্রীষ্ম ধরতর,
 কত ঝড়, কত বজ্র, নাহিক সঞ্চিত ।
 মাংসহীন কলেবর হইল দুর্বল কল ।
 নাসি মার পথে ভ্রম করালে প্রবেশ

হইত বাহির কর্ণে ; নয়ন-কোটর ময় ;
 সে কাকন-কান্তি এবে অস্থিয়ার শেষ ।
 পিশাচ ভাবিয়া মনে গোপাল রাখালগণ
 করিত বিকৃত অঙ্গে ধূলি বরিষণ ;
 কেহ মৃত ভাবি মনে, স্থণায় যাইত দূরে ;
 পলাইল নিরাশায় শিষ্য পঞ্চ জন ।
 যত কাষ্ঠ হয় শুষ্ক ততই প্রথরতর
 হয় যথা অগ্নি ; হয় ততই উজ্জ্বল
 গৃহের প্রদীপ যথা, যতই অদৃশ্য, লীন,
 নিবিড় তিমিরে হয় শূন্য ধরাতল ।
 যতই শরীর শুষ্ক, যতই ভি মরাচ্ছন্ন
 হলো বিশ্ব চরাচর, নিষ্ক্রিয় শরীর,
 ততই অন্তর জ্ঞান যোগীর উঠিল জ্বলি ;
 আকাশ ব্যাপিল শিখা সে জ্ঞান-বহ্নির ।
 সেই ব্যাপ্ত জ্ঞানালোকে যোগী দেখিলেন বিশ্ব,
 বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য অসীম ।
 কিন্তু নির্বাণের পথ,—কই, কোথা ? নাহি চিহ্ন !
 হইল যোগীর আশা নিরাশায় লীন ।
 এই আশা, মহা-আশা, সিদ্ধার্থের, মানবের,
 ফলিল না ছয় বর্ষে, ফলিবে কি আর ?
 কি সাধনা আছে আর, কিরূপে সাধিলে তাহা
 সেই মহাজ্ঞান তত্ত্ব হইবে সকার ।
 নিরাশার সহচর সন্দেহ অজ্ঞাত পদে
 যোগীর মানস-প্রান্তে হয়ে সঞ্চারিত,
 ক্রমশ মেঘের মত হয়ে ঘন বিস্তারিত,
 কবিল সে জ্ঞান-সুখ ক্রমে আবিরিত ।

নিষ্কল দর্শন, যোগ,— সিদ্ধার্থ ভাবিলা মনে,—

বৃথা এ শরীর মাজ করিলেন ক্ষয় ;

সংসার ছাড়িয়া বৃথা অকূলে দিলেন ঝাপ,

না মিলিল কুল তার, মিলিবার নয়।

সংসার মোহন বেশে তখন উঠিল ভাসি

ঝুলিয়া অনন্ত শোভা নয়নে তাঁহার।

সে ঐশ্বর্যা, সে সৌন্দর্যা, গৃহের অপার স্বথ,

সে সুখে অপার শাস্তি প্রেমেতে গোপার।

একে একে পূর্বস্বত্তি সাক্ষ্য তারকার মত

হৃদয় আকাশে ধীরে ফুটিল তাঁহার ;

ফুটিয়া উঠিল আর পিতার সে শোকছবি,

শোকছবি গৌতমীর, হঃখিনা গোপার।

থাকিতেও পতি গোপা অনাথার সমধিক ;

থাকিতেও পিতা হয়। অনাথ বাহুল,

আছে কি বাঁচিয়া তারা ? আছে কি একটি আলো

রাজপুরে ? রাজ্যস্থানে একটিও কুল ?

সিদ্ধার্থ করুণপ্রাণ, উছলিল পে করুণা,

সিদ্ধার্থ কি হয় ! তবে কিরিবেন ঘরে ?

পিতার সে স্নেহ-স্বর্গে, মাতার সে স্নেহ-বক্ষে,

ভার্য্যার সে উদ্বেলিত প্রেমের সাগরে।

আবার ভাবিলা মনে— জনক জীবনে মৃত,

স্নেহময়ী জননী বিদীর্ণ হৃদয়,

অনাথা হঃখিনী গোপা, অনাথ অন্ধের শিশু,

করিলাম, করিলাম এ শরীর ক্ষয়,

শেষে কি কিরিতে ঘরে, কিরিতে সে রাজপুরে,

সেই নাট্যশালা হয় ! করিয়া শ্রবণ ?

জন্ম-জরা-মৃত্যু-পূর্ণ ফিরিতে সংসারে পুনঃ ?—

মানব-হঃখের হায় ! নাহি কি নির্বাণ ?

তাহাতে বা কি সাধনা, কিবা শাস্তি, কিবা স্থপ ?

কি সাধনা জরা-ব্যাধি-মরণের করে ?

বিস্তৃত তপস্যায় হায় ! কোথায় উদ্ধার পথ ?—

ঝুলিতেছে সেই কর মস্তক উপরে !

এই তপস্যার ক্রেশ ! এই ক্রেশে এই মৃত্যু !

বনে বন্যপশুদের হইয়া আহার,

কি ফল ফলিবে হায় !—আন্দোলিত সিদ্ধার্থের

হৃদয়ে কামনা পুনঃ হইল সঞ্চার ।

ধীরে ধীরে সেই কাম বাড়িল, হইল ধীরে

মূর্তিমান সেই মূর্তি কত মনোহর ।

পার্শ্বে কত মনোহরা রূপে নারী নিক্রপমা,

ফুলধনু, ফুলতুণে পঞ্চ ফুলশর ।

মধুর ঈষদ হাসি বাসন্তী জ্যোৎস্নারামি

পরকাশি বনে, কহে—কি বর্ধ বীণার !—

“সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য, ধনঃ গৌরব, বিলাস, আর,

যাহা চাহ দিব, যোগ কর পরিহার ।

কিবা স্থখ তপস্যায়, গেল ছয় বর্ষ হায় !

শরীর ককাল-শেব, ওষ্ঠাগত প্রাণ ।

দেখ মম পঞ্চ শর, দেখ মম পঞ্চ শক্তি,

কত স্থখ পাবে তারা করিতে প্রদান !”

ধরি ফুলধনু হাসি, তাম্র পাতি ফুল গুণ

দিয়া নিক্ষেপিল চাকু পঞ্চ ফুলশর,

শরত জ্যোৎস্নায় মিশি সজ্জিল পঞ্চ ঘোড়শী,

রূপে ছায়ায়ময়ী করি জ্যোৎস্না হৃন্দর ।

প্রথমা হাসিয়া কহে—“দেখ চেয়ে ষোণিবর
 কুসুম-তরঙ্গে অঙ্গ নির্মিত, সজ্জিত ;
 বাসন্তী স্রোতস্বরূপ ; কণ্ঠ কোকিলের স্বর ;
 নিখাস মলয়, অম্বরভি পূরিত ।
 আকাশনিবিড় কেশ তারকায় বিভূষিত,
 তারকা বলয়, কণ্ঠে তারকার হার,
 পূর্ণচন্দ্র কিরীটিনী, আমায় বরণ কর
 জগতের এ সৌন্দর্য্য হইবে তোমার ।”
 দ্বিতীয়া বলকে হাসি, কহে—“দেখ শাক্যসিংহ !

রতনে নির্মিত অঙ্গ, রতনে বচিত,
 কষিত কাঞ্চন-কাস্তি, তুলিয়াছে কি তরঙ্গ,
 রতন-আভায় দেখ দিক উজ্জলিত ।
 হৃদয় হীরকখনি, প্রবালে মুকুতা দন্ত,
 পদ্মরাগে নীলমণি যুগল নয়ন ;
 রতন-কিরীট শিরে ; বরণ আমায় কর,
 ঐশ্বর্য্য এ জগতের করিব অর্পণ ।”
 মধুরে তৃতীয়া কহে অমৃত বরষি—“দেখ
 অকলঙ্ক রূপ মম অমল ধবল ।

কত কণ্ঠ একতানে বাজে এই কণ্ঠে মম,
 বরষে অমৃতধারা অমল তরল
 এই কণ্ঠ কালজয়ী, সর্বব্যাপী, অব্যবহিত,
 কেমন সৌরভ দেখ নিখাসে আমার ।
 কণ্ঠ-সুধাময়ী আমি, আমায় বরিলে ষোণি !
 জগতের যশোরশি হইবে তোমার ।”
 চতুর্থী সগর্বে কহে—“এই দেখ রূপ মম
 নৈদাঘ ভাস্কর-তেজে দীপ্ত সমুজ্জল ।

কেমন উন্নত গ্রীবা, কেমন উন্নত বক্ষ,
 ঝলসে কিরীট শিরে রবির মণ্ডল ।
 ঝলসে কিরীট করে অপার্থিব রত্নময়,
 কত ক্ষেত্রে কত মতে কত নারীনর
 মাগে এ কিরীট মম মূহ্যমুখে, এস যোগি ।
 পরাব মুকুট শিরে হ্রস্ত স্তম্বর !”
 পঞ্চমা আবেশময়ী কুন্তল-আলুলায়িতা
 কুহুম-শয্যায় অর্কশায়িতা স্তম্বরী,
 অর্ক-অনারুত বক্ষ, অর্ক-নিমীলিত আধি-

কি মধুর হাসি সিক্ত বিষাদের মন্দির ।
 কুহুমে খচিতা বামা, এক করে চাক্ষু বীণা—
 তুলি’ছে মূর্ছনা মূহ কি আবেশময় !
 সুরা-পাত্র অস্ত্র করে, আবেশ কটাক্ষে কহে—
 “আইস বিলাস-মুখে পূরিব হৃদয় ।”
 দাঁড়াইয়া কামদেব, দাঁড়াইয়া রতিদেবী,
 রতির কুহুমকায় কুহুমের পাশ ;
 কহে কাম—“শাক্যসিংহ, চেয়ে দেখ এতাদিক
 আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ ?
 কি চাহ ? সকলি চাহ, দিবে প্রাণপন্নী মম
 বাঁধিয়া কুহুমদামে করেতে তোমার ।
 এই নির্ঝাণের পথ, দেখিছ কি হুঃখরেখা ?
 যাও ঘরে কিরে, যোগ কর পরিহার !”
 যোগিশ্রেষ্ঠ অবিচল হিমাদ্রি-সান্ন্যাস মত,
 কহিলেন দেখি কামক্ৰীড়া স্তম্বপুং—
 “ওরে ! প্রবঞ্চক মার । আমি চিনিয়াছি তোরে,
 শ্রোতন ধনু তোরে ; অমুবাগ শুণ ।

চিনি পঞ্চশর তোর,—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বশঃ,
চিনি আমি ; চিনি আর পৌরব, বিলাস ;
চিনি তাহাদের শক্তি, চিনি তোর পত্নী রতি,
আপনি মোহিনী, তার করে মোহ-পাশ ।

করি এই কাম্য পক্ষে প্রথমেই প্রলোভিত,
পরে ক্রমে অনুরাগ করিয়া সঞ্চার,

তত্ত্বের মত কাম প্রবেশে মানব-মনে ;
করে কাম্য-স্থখে রত, মোহ পরে তার ।

মোহের বন্ধনে পড়ি না দেখে দুর্বল নব
রতির; পশ্চাতে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু আর,
কি ভীষণ ছায়াত্রয় ! কি গভীর দুঃখময় !
কি গভীর তুঃখে নব করে হাহাকার !

আমি এই মোহপাশ কাটিয়াছি বহুদিন ;
আসিলি কি তুই পুনঃ ছলিতে আমায় ?
বিফল করিতে মম এ দীর্ঘ তপস্তা-ফল,
ওরে ছুরাচার ! নাহি চিনি নি আমায় !”

জলিল সংযমানল, ছুটিল নয়ন পথে
সে বহি, হইল ভস্ম মুহূর্ত্তেকে কাম,
শোকাকুল্য রতিনহ মোহিনী ষোড়শী পঞ্চ
সে অগ্নিতে ছায়া যেন হলো তিরোধান ।
সম্মিলে সেই বহি দেখিলেন শাক্যসিংহ
দাঁড়ায়ে অদূরে এক মূর্ত্তি বিভীষণ,
শরীর কঙ্কাল-সার, লেলিহান মহাবিহ্বা,
আসিছে আসিতে যেন বিজারি বদন ।

“দূর হও । দূর হও !”—যোগী কহিলেন ডাকি—

“চিনিয়াছি তোরে মৃত্যু বীভৎস-আকার ।

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

জানি কাম, মৃত্যু আর, বিষ তপস্তার পথে,
 জিনিয়াছি কাম, তোরে জিনিব এবার ।”
 কহে মৃত্যু ঘোর কণ্ঠে - “পারিবে না শাক্যসিংহ !
 ছুই দিন পরে আমি আসিব আবার ।”
 হলো মৃত্যু অন্তর্হিত । “আসিব ছ’দিন পরে”—
 ধ্বনিতে লাগিল ধ্বনি কর্ণে অনিবার।
 আসিলে ছ’দিন পরে শাক্যসিংহ কোন মতে
 করিবেন পুনঃ তার গতি নিবারণ ?
 ৫ দিন পরে আর থাকিবে না এ শরীর,
 শরীর বিহনে প্রাণ রবে না কখন।
 আবার নিরাশা আসি ছাইল মানসাকাশ,
 হইলেন চিন্তাবিত সিদ্ধার্থ এবার,
 করিবেন কি উপায় ? ভাবিলেন হায় ! বুঝি
 মানবের নহে সাধ্য মানব-উদ্ধার।
 এমন সময়ে যেন আলোকি আকাশশূভ
 আসিলেন ধীরে উল্ল নামিয়া ধরায়,
 সুন্দর ত্রিতন্ত্রী করে শোভিতেছে রত্নময় ;
 বিষয়ে সিদ্ধার্থ চাহি চিত্তার্পিতপ্রায়।
 ত্রিতন্ত্রীর একতার ছিল প্রথ, বাজিল না ;
 এক তার গেল ছিঁড়ি টানিলে বিষম ;
 সুন্দর হইলো বাঁধা বাজল তৃতীয় তার,
 করিয়া যোগীর কর্ণে স্রধা বরিষণ।
 চলি গেলা দেবরাজ ; বুঝিলেন শাক্য যোগী
 শরীর বিলাসে প্রথ, কিংবা নিস্পীড়িত,
 করিলে তপস্তা সিদ্ধি হইবে না কদাচিত,
 করিতে হইবে এই দেহ সঙ্গীবিত।

(১৫)

সিদ্ধি ।

ধীরে পোহাইল নিশি । উষা ধীরে ধীরে
 বরষি কোমল করে সুখা সঞ্জীবনী
 বাঁচাইল চরাচর । ইচ্ছা ধীরে ধীরে
 সঞ্জীবনী সুখা-ধারা করিয়া সঞ্চর
 বাঁচাইল সিদ্ধার্থের দেহ অচেতন
 অস্থিশেষ ; শাক্যদিংহ মেলিলা নয়ন ।
 দেখিলেন ছয় দীর্ঘ বৎসরের পরে
 কত মনোহরা উষা ! কত মনোহরা
 আকাশ-নীলিমা, চারু বহুধরা শ্রামা !
 দেখিলেন বনশোভা কত রূপান্তর
 হইয়াছে ছয় বর্ষে ! ক্ষুদ্র তরুগণ
 হইয়াছে মহীকর ; অঙ্কুরিতা লতা
 হইয়াছে বসন্তের পুষ্পে সুশোভিতা ।
 বৃক্ষরাজি, গুল্ম, লতা, বিস্তৃত বর্দ্ধিত
 হইয়াছে চারিদিকে ; কিন্তু সিদ্ধার্থের
 রূপ যৌবনের হায় ! চারু রত্নভূমি
 সেই দেহ,—হইয়াছে কি দশা তাহার ।
 নাহি শক্তি সিদ্ধার্থের অঙ্গ অপনার
 চিনিতে, করিতে কর পদ প্রসারিত,
 সর্ব্ব কলেবর যেন লৌহ-বিনির্ম্মিত ।
 ছিল পঞ্চ শিষ্য, তারা গিয়াছে চলিয়া
 দেখিয়া নিফল যোগ,—সিদ্ধার্থ একক

নিরাশ্রয়, অসহায়, সত্ত শিশু মত ।
 বহুদিনে বহুকষ্টে অঙ্গে ভর করি
 নৈরঞ্জন-তীরে ধীরে করিয়া গমন
 করিলেন জ্ঞান ছয় বৎসরের পরে,—
 অনলে অমৃত যেন হইল বর্ষণ ।
 ছয় বৎসরের জীর্ণ গৈরিক বসন
 তেয় গিয়া পরিলেন শবের বসন
 তীরস্থিত শ্মশানের, বসিলেন এক
 পাদপের ছায়াতলে নৈরঞ্জন-তীরে
 নান্দিকপতির কস্তা সিদ্ধমনোরথ
 আসিলা ‘স্বজাতা’ ধীরে পায়সার শিরে
 স্বর্ণপাঞ্জে, বনদেবে দিতে উপহার ।
 ও কি মূর্তি তরুতলে ? ও কি বনদেব
 কঠোর তপস্বি-বেশে সম্মুখে তাহার ?
 ভক্তিতে ভরিল বুক ; নমিয়া ভূতলে
 পায়সার পদাঙ্ক দিয়া উপহার
 কহে করযোড়ে বামা—“করিল মানস
 পায়সারে বনদেব পূজিবে এ দাসী ।
 সিদ্ধ তার মনোরথ । দাসীর এ পূজা
 কৃপা করি বনদেব । করুন গ্রহণ ।”
 সিদ্ধার্থ কহিল—“সাক্ষি । সামান্ত তপস্বী
 নহি বনদেব আমি । অনাহারে আমি
 করিয়াছি এই বনে তপস্তা কঠোর
 কত বর্ষ নাহি জানি । কুমায় আকুল
 আজি প্রাণ ; করিলাম সাদরে গ্রহণ
 তব পায়সার ভঞ্জে ! করি আশীর্বাদ,

সৰ্ব মনোরথ তব হউক পূরণ ।”
কিছুদিন এইরূপে অগ্নে স্নাত্যাতার
হইলে সবল যোগী, কিছু দিন আর
নিকট ‘গোচর’ গ্রামে ভিক্ষা আহরণ
করিলেন, হইলেন ক্রমে যোগক্ষম ।

জগতের মহাদিন হইল প্রভাত,—
মহাদিন সিদ্ধার্থের । করি প্রদক্ষিণ
সাত বার, সাত বার করিয়া শ্রণাম
সে অশ্বখ মহাবৃক্ষে, পূৰ্ব যোগাসনে
পাতি তৃণ স্ত্রামল, অগ্র অন্তমূৰ্ধ
বহিমূৰ্ধ মূল,—ভিক্ষালব্ধ তৃণবাশি—
হইলেন শাক্যসিংহ যোগস্থ আবাস ।
পূৰ্বমূৰ্ধ ঋজুকায়, নত অংসযুগ,
বীয়াসন, শোভে অন্ধে করোপরে কর,—
স্বর্ণপুষ্পপাত্রে চারি পদ্য মনোহর !
জটার কিরাটি শিরে নেত্র নিমীলিত,
অনিশ্বাস নাশা, বর্ণ শ্রবণরহিত,
দেহ অবিচল—ঋবনকন্ডের মত !
বাহুজ্ঞান তিরোহিত, প্রণিধান-বলে
আহবিত, স্মৃতিবল হইল উন্নীত ।
স্থির মনাকাশে স্থির জ্যোতিষ্কের মত
মহান সংসার স্থির হলো প্রকটিত—
“শরীর হউক শুদ্ধ, অস্থি মাংস লয়,
যাবৎ নিরূপ জ্ঞান না হয় উদয়,
এ শরীর এ আসনে রাখিবে নিশ্চয় ।”
পাদপ নিরূপ স্থির, নিস্তব্ধ কানন,

নীরব কাকলী-গীত, নিশ্চল পবন,
 স্থির নৈরঞ্জন-শ্রোতঃ স্থির প্রভাকর
 পূর্বাচল শিরে; স্থির বিশ্বচরাচর ।
 হইল জগত শাস্ত গান্ধীর্থ্যো মণ্ডিত,
 অজ্ঞাত আশায় যেন হৃদয় পূরিত ।
 মার পরাজিত ; চিত্ত স্থির অবিচল
 যেন মিল্ক নিরমল দর্পণ উজ্জল ।
 উদ্ভাসিত চিত্ত জ্ঞান প্রদীপ্ত শিখায়,
 রবিকরে দীপ্ত স্বচ্ছ দর্পণের প্রায় ।
 নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম ; চিত্তবৃত্তিচয়
 নিরুদ্ধ নিশ্চল, দেহ রুদ্ধদেহালয় ।
 সবিতর্ক সবিচার, ধ্যানেন্তে প্রথম
 হইল। নিবিষ্ট যোগী,—নাগিলা ভাবিতে
 কিবা সত্য, কি অসত্য, নিত্য ও অনিত্য
 নিত্যের সহিত কিবা সম্বন্ধ আত্মার ।
 দেখিলা উভয় নিত্য জড় ও চেতন ;
 উভয় সম্বন্ধহীন । উপজিস মনে
 নিবিকার নিবিতর্ক সমাধি দ্বিতীয় ।
 দেখিলেন জড় পরিবর্তনের শ্রোতে
 হইতেছে রূপান্তর নিত্য অবিরাম,—
 হইলেন জড়ে শ্রীতিবিরাগবিহীন ;
 উপজিস নিশ্চলিক সমাধি তৃতীয় ।
 ক্রমে স্বপ্ন-দুঃখ-বোজ হইল নির্মূল,
 নিবীজ, চতুর্থ ধ্যানে । উত্তম ভাসিয়া
 মেঘমুক্ত চন্দ্রমত আত্মার স্বরূপ
 চিত্তের দর্পণে জ্ঞান-আলোকে তখন ।

সমস্ত দিবস ধ্যানে হইল অতীত ।
 আসিল পূর্ণিমানিষি । বহিতে লাগিল
 অজস্র ধ্যানের স্রোতঃ । প্রথম প্রহরে
 অপূৰ্ণ আলোক চিত্তে হইল সঞ্চার
 অজ্ঞান আধার নাশি । দেখিলেন যোগী
 এই প্রজ্জালোকে, যেন খনিগর্ভে মণি,
 অতীত তিমিরে পূৰ্ণ জন্ম আপনার ;
 স্মৃতি হুর্গতি হেঁতু বুঝিলেন আর ।
 বহিল ধ্যানের স্রোতঃ । মধ্যম প্রহরে
 দেখিলেন যোগী তাঁর নাহি জন্মভূমি,
 নাহি নাম, নাহি গোত্র, নাহি বর্ণ, জাতি,
 পূৰ্ণ জ্ঞানীদের বংশে জনম তাঁহার ।
 প্রাণীদের পূৰ্ব্বে জন্ম অসংখ্য প্রকার
 দেখিলেন নিব্যজ্ঞানে । শরীরের শেষে
 ভাবিলেন জগতের এত দুঃখ কেন ?

কি মূল তাহার ?

পুনঃ বসিলেন ধ্যানে

জগতের সর্ব দুঃখ বিনাশের তত্ত্ব ।
 দেখিলেন বহিতেছে বেগে অবিরত
 সংসারে দুঃখের স্রোতঃ, জীব অবিরত
 জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে পুনঃ ;
 পুনর্জন্ম ; পুনশ্চ ত্যা ; জন্ম মরণের
 আবর্তনে করিতেছে জীব হাহাকার
 না পাই উদ্ধারপথ । ভাবিলেন যোগী
 কেন জন্ম-মরণের এই আবর্তন ?
 বহিল ধ্যানের স্রোতঃ । বুঝিলেন যোগী

হৃৎকথের কারণ (১) জন্ম ; জন্মের কারণ
 (২) কৰ্মফল ; কৰ্মফল উপজ্ঞে চেষ্টায় (৩)
 শারীরিক মানসিক ; চেষ্টার কারণ
 (৪) সুখ-তৃষ্ণা ; বুঝিলেন সুখ-দুঃখ-বোধ (৫)
 তৃষ্ণার কারণ ; সুখ-দুঃখ-অনুভব
 জন্মায় ইন্দ্রিয় (৬) গণ ; তাহার কারণ
 জগতের সহ মন ইন্দ্রিয় (৭) সংযোগ ।
 জগতের রূপ রস গন্ধ মনোহর (৮)
 এই সংযোগের-হেতু ! গন্ধ রূপ রস ;—
 সমস্ত জগত,—স্বরূপরমাণু জাত,
 করে প্রকটিত নানারূপে এক (৯) জ্ঞান ।
 বুঝিলেন সংস্কার এ জ্ঞানের মূল ;
 সংস্কার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যা-সমুত ।
 নহে সত্য রূপ রস,—একে দেখে ঘাহা
 স্বরূপ স্বন্দর, অস্ত্রে দেখে তা বিকৃপ ।
 এ অসত্য রূপ রস ভাবে সত্য নর
 আবিষ্কার মোহে ঘোর, আমিও আমার—
 এই অহঙ্কার-জ্ঞানে হ'য়ে প্রতারিত ।
 বুঝিলেন মহাবোধী, হইলে নিরোধ
 অহঙ্কার, ভ্রমজ্ঞান হ'লে তিরোহিত,
 জানিলে অসত্য রূপ রস জগতের,
 হইবে না মুগ্ধ তাহে ইন্দ্রিয় ও মন,
 করিবে না পাপকৰ্ম্মরত মুগ্ধ নর ।

(১) জাতি । (২) ভব । (৩) উপাদান । (৪) তৃষ্ণা । (৫) বোধনা ।

(৬) গণ । (৭) যজ্ঞায়তন । (৮) নামরূপ । (৯) বিজ্ঞান ।

পাপকৰ্ম-ফলে জন্ম হইবে না আর ;
জয়া-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্বাণ ।

দীরে ধীরে মহানিশি হইল প্রভাত ।

অরুণ-উদয় সহ উঠিল ভাসিয়া
অরুণের মত এই নির্বাণের জ্ঞান
যোগীর হৃদয়াকাশে । এত কাল পরে,
ছয় দীর্ঘ বৎসরের তপস্তার পরে,
পূর্ণ আজি মনোরথ । যেই জ্ঞান তরে
হইলেন রাজপুত্র সন্ন্যাসী ভিখারী,
করিলেন ছয় বর্ষ তপস্তা কঠোর
অলৌকিক চিন্তাতীত, করিলেন ক্রম
মনোহর কলেবর,—তরু কুসুমিত ;
সহিলেন অনাহারে, অঙ্গে অনাবৃত,
ছয় শীত, ছয় গ্রীষ্ম, ছয় বরিষার
যৌবতর বরিষণ ; সে ছলিত জ্ঞান
হইয়াছে প্রকটিত হৃদয়ে তাঁহার ।
হৃদয়ে তাঁহার আর নাহি চঞ্চলতা,
নাহি আশা, নাহি তৃষ্ণা, নাহি অহুবাগ,
নাহি অবিজ্ঞার ছায়া ; হৃদয় তাঁহার
নির্কাত নিরুপ মহাশান্তিপারাবার ।
নাহি কর্মকল-রেখা পুনর্জন্ম বীজ,
তাহার জীবন-পথে, হৃৎপথের দাহন ।
জন্মের নির্বাণ, অ'র নির্বাণ মৃত্যুর,
হইয়াছে সর্বরূপ হৃৎপথের নির্বাণ ।
নির্বাণের জ্ঞানালোকে হৃদয় তাঁহার
শুশীতল সমুজ্জল ! কত জন্মান্তরে,

কত কল্পমৃত্যুচক্রে করিয়া ভ্রমণ,
 সহিয়া অশেষ দুঃখ অশেষ যোনিতে,
 কত সাধনায় হায় ! কত তপস্তায়
 নির্মাণের পূর্ণবুদ্ধি আয়ত্ত তাঁহার,—
 সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ আজি, বুদ্ধ অবতার,
 সে অশ্বখ বোধিদ্রুম ! মহাকাল-স্রোতঃ
 ছুটিল পবিত্র নাম গাইয়া গাইয়া
 মহাভবিষ্যত-গর্ভে অনন্ত অসীম,
 অসংখ্য মানব-প্রাণে,—স্থপ্ত, অনাগত,—
 বরষি নির্মাণ-স্থধা অজস্রধারায়
 বহিল পবিত্র নাম পুণ্য সমীরণ ;
 ভাসিল সে নাম প্লাবি বিশ্বচরাচর ।
 শুনিলেন বুদ্ধদেব নক্ষত্রে নক্ষত্রে
 হইতেছে নাম গীত, স্বর্গে দেবগণ
 গাইতেছে নামগাথা, করিছে বর্ষণ
 অজস্র কুন্তলরাশি, স্থধা নিরুপম ।
 পলকে ভরিল প্রাণ, পলকে পূরিত
 হইল শরীর শীর্ণ, পলকে পলকে
 হইতে লাগিল সেই দেহ সঞ্জীবিত ।
 বহুক্ষণ এ পলকে থাকি নিমজ্জিত,
 অমৃত শশাঙ্ক-গর্ভে,—স্থির অবিচল,
 ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব মেলিল। নয়ন,
 মেলিল অরুণ-অঁখি দিবস যেমন ।
 প্রভাত শরীরী ; ধীরে অরুণে বঞ্জিত
 হইতেছে পূর্বাকাশ,—নবধর্মালোকে
 মানব-অদৃষ্টাকাশ হতেছে উজ্জল ।

বুদ্ধে বুদ্ধে বসি স্থখে প্রভাত-কাকলী
 গাইছে বিহঙ্গচয়, আনন্দে মানব
 বসি যেন নবধর্মবুদ্ধের ছায়ায়
 গাইছে নির্বাণপাথা ; নবধর্ম-মত
 বহিতেছে প্রভাতের নব সমীরণ
 ধীর, শান্ত, স্থলীতল ; নির্বাণের স্থখে
 পূর্ণ যেন জীবগণ, বিশ্বচরাচর ।

(১৬)

প্রচার ।

সপ্ত দিবা সপ্ত নিশি বোধিতকুম্ভে
 রহিলেন বুদ্ধদেব পূর্ণনিমাজ্জত
 নির্বাণের মহানন্দে অনন্ত অসীম,—
 অনন্ত আলোক-সিন্ধু শান্ত স্থলীতল ।
 নির্বাণ-আনন্দালোক গর্তে চরাচর
 দেখিলেন বুদ্ধদেব যেন ভাসমান,
 জরা-মরণের হঃখ হয়েছে বিলীন ।
 নির্বাণ-আনন্দগীত জড় অচেতন
 গাইতেছে গ্রাহে গ্রাহে ; আসি দেবগণ
 ধরাতলে, নির্বাণের আনন্দে অধীর,
 করিতেছে অতিথিক্রমে আনন্দ-নীরে
 তাঁহার চরণাঙ্কুরে, বোধিতকুম্ভে,
 শত শত স্বর্ণকুণ্ডে ; হতেছে প্রণত

বার বার পুণ্যক্রম করি প্রদক্ষিণ ।
 সপ্তাহ দ্বিতীয় দেব-নেত্রে নির্নিমেঘ
 চাহিয়া আতলশীর্ষ সেই পুণ্যক্রম
 হইল অতীত স্মরে । সপ্তাহ তৃতীয়
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই পুণ্যতরুতলে
 নির্ঝাঁপ-আনন্দে মগ্ন হইল অতীত,
 চাহিয়া চাহিয়া স্নেহসঞ্জননয়নে
 তরুবরে । সুপবিত্র ছায়ায় যাহার
 তাঁহার সকল আশা হইল সঞ্চল,
 লভিলেন বুদ্ধ-জ্ঞান, সুখ নির্ঝাঁপের,
 নাহি চাহে প্রাণ যেতে ছাড়িয়া তাহারে
 চতুর্থ সপ্তাহে বনে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
 সপ্তাহ পঞ্চম ষষ্ঠ নানা তরুমূলে,
 সপ্তাহ সপ্তম নীল নৈরঞ্জনা-তীরে
 তারায়ণ তরুতলে তারায়ণ বনে.
 নির্ঝাঁপের উপভোগে হইল অতীত ।
 নাহি ক্ষুধা, নাহি তৃষ্ণা, পূর্ণ সিদ্ধমত
 নির্ঝাঁপ-সুধায় পূর্ণ হৃদয় তাঁহার
 শান্ত, স্থির, অবিচল । হইল অতীত
 একপে সপ্তাহ সপ্ত, উরুবিষপথে
 যাইতে উৎকলবাসী বণিকযুগল,
 'এপুর' 'ভল্লিক' ভ্রাতা, চক্র শকটের
 হইল প্রোথিত ভূমে ; ধু ক্রিতে সহায়
 নিরখিল সৌম্যমূর্তি তারায়ণমূলে ।
 ভক্তিভরে উপহার দিল খাদ্য নানা
 মধু ইক্ষুখণ্ড সহ ; ইক্ষুখণ্ড মধু

করিলেন বুদ্ধদেব আনন্দে গ্রহণ ;

লভিলেন তৃপ্তি করি ক্ষুধা নিবারণ ।

দিন যায়, রাত্রি যায় । বসিয়া একাকী

ভারায়ণ তরু-তলে ভাবিলেন মনে—

“এরূপ নির্জ্ঞনবাস যোগ্য কি আমার ?

পাইয়াছি যেই ধর্ম্ম হুর্কোষ গস্তীর,

কে বুঝিবে এই ধর্ম্ম, করিবে গ্রহণ ?

আমার নির্কোণধর্ম্ম,—তৃষ্ণার বিরোধ,

শ্রুতি-স্মৃতি-বিপরীত,—এই আর্থাভূমে

শ্রুতিতে প্লাবিত, কাম্যকর্মে প্রণোদিত,

কে শুনিবে, কে বুঝিবে, করিবে গ্রহণ ?

না বুঝে, অবজ্ঞা ঘোর করিবে নিশ্চয় !

শ্রুতিজাত কামনার শ্রোতে খরতর

ভাসিছে ভারতভূমি ; করিয়া কামনা

স্বর্গভোগ, সুখভোগ, রাজ্য, ধন, বশঃ,

করে যাগ যজ্ঞ নর ; তারা কি কখন

করিবে কঠোর যজ্ঞ কামনা-নিরোধ ?

বুঝিবে কি কামনার নির্কোণই স্মৃতি ?

অসম্ভব, অসম্ভব । নিশ্চয় আমার

উচিত নির্জ্ঞনবাস । নির্কোণের স্মৃতি

করিব নির্জ্ঞনে এই দেহের নির্কোণ ।”

দেখিলেন বুদ্ধদেব বহিতেছে বেগে

করাল কালের শ্রোতঃ অনন্ত অসীম ।

অনন্ত অসংখ্য জীব ডুবিয়া ভাসিয়া,

ভাসিয়া ডুবিয়া পুনঃ, শত শত বার,

সহিয়া অশেষ দুঃখ জরা-ব্যাধি-করে,

জলিয়া ইঞ্জিয়-স্বধ-কামনা-অনলে,
 করিতেছে হাহাকার । সংসারের ভয়ে
 ভীত এক দিকে, অতৃদিকে সংসারের
 তৃষ্ণায় ব্যাকুল । ঘোর লবণসলিল
 বত করিতেছে পান, তৃষ্ণায় আকুল
 হইতেছে প্রাণ । এই আবর্তনে
 পড়িয়া মানবজাতি, না পাইয়া পথ,
 করিতেছে হাহাকার । চাহিয়া চাহিয়া
 কৃতাজলি তাঁর পানে করুণ নয়নে
 মাগিছে করুণা ভিক্ষা ; কহিছে কাঁদিয়া,
 আগত ও অনাগত জীব সংখ্যাভীত—
 “হায় কিবা খেদ ! অনন্ত মানব সদা
 সহিতেছি এই দুঃই জরা-মৃত্যু-করে ।
 ভগবান্ বোধিজ্ঞান লভিয়া সম্যক্,
 লভিয়া নির্ঝালত্ব, হায় ! মনোনীত
 করিলা নির্জন্মবাস । হৃদয় তাঁহার
 দ্রবিল না ; হইল না দয়ার সঞ্চায়
 জীবদুঃখে ঘোরতর ; জীবের উদ্ধার
 হইল না,—জীবে দয়া কে করিবে আর ?
 ভগবন্ ! দয়াময় ! কর দয়া জীবে !
 মায়ামুক্ত । কর দয়া মায়ী স্তূতগণে !
 দুঃখের-নির্ঝাল-বুদ্ধি লভিয়া অগতে
 তুমি বুদ্ধদেব ; জীব করিতে উদ্ধার
 আসিয়াছ যথাকালে, তুমি তথাগত ;
 জীবের উদ্ধারপথে গতি তব শুভ,
 অগত তোমার নাম । কর দয়া জীবে !

তোমার নির্বাণ—ধর্ম করিয়া প্রচার,
 করিয়া উদ্ধার জীব, কর সিদ্ধ তুমি
 জীবের সর্বার্থ, দেব ! হউক সকল
 তোমার সিদ্ধার্থ নাম । যাউক ভাসিয়া
 কালগর্ভে তব নাম করি বিতরণ
 নির্বাণ-অমৃত জীব যুগ যুগান্তর ।”
 এই হাহা কার, এই ভিক্ষা করুণার
 দ্রবিল হনয় ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বন্ধন
 করিল শিথিল ; বুদ্ধ করিলেন স্থির
 করিবেন নবধর্ম জগতে প্রচার ।
 কিন্তু হায় ! উপদেশ কাহাকে প্রথম,
 করিবেন ? শ্রদ্ধাবান বিনয়ী তেমন,
 হৃদয় অপকৃপাতী, মোক্ষ-অভিলাষী,
 কে আছে শুনিবে ধর্ম, শুনিয়া বুঝিবে,
 বুঝিয়া করিবে তাহা গ্রহণ, ধারণ ?
 কোথায় এমন পাত্র ? হইল স্মরণ
 রামপুত্র রুদ্রকেতরে । কোথায় এখন
 রামপুত্র ? বুদ্ধদেব বসিলেন ধ্যানে ;
 দেখিলেন সপ্তদিন হইল অতীত
 রামপুত্র কালগত । আরাড়কালায়
 তখন পড়িল মনে । কোথায় সে এবে ?
 আবার বসিয়া ধ্যানে দেখিল। স্বগত
 তাহার জীবনলীলা হইয়াছে শেষ
 তিন দিন । বুদ্ধদেব ছাড়িয়া নিশ্বাস
 করিলেন—“তবে ধর্ম কহিব কাহারে ?”
 তখন পড়িল মনে শিষ্য পঞ্চজনে ।

কোথায় তাহারা ? ধানে দেখিলেন কেব
 আছে তারা যুগদায়ে * বারাগসীধামে ।
 যাইবেন বারাগসী করিলেন স্থির
 শিষ্য পক্ষে ববধর্ষে করিতে দীক্ষিত ।
 চলিলেন বারাগসী, ছয় বর্ষ পরে
 ত্যজি নৈরঞ্জন-তীর, ত্যজি বোধিক্রম,
 ত্যজি মহাতীর্থ সেই পবিত্র কানন
 মানবের ; মানবের আশা মুখতারা
 চলিল করিতে হুঃখ-রজনী প্রভাত ।
 পথশ্রান্ত রবিতাপে আছেন বসিয়া
 শীতল ছায়ায় বৃদ্ধ ; বৃদ্ধ আজ্ঞীক
 দেখিল সে সৌম্যরূপ বাহতে চলিয়া ।
 অশূর মুখশ্রী, সেই কান্তি শরীরের,
 দেব-আভা হনয়নে, দেখি আজীবক
 হইল বিস্মিত, মুগ্ধ ; বসিল তথায় ।
 সম্ভাষণ অন্তে বৃদ্ধ কহে—“আয়ুয়ন্ ।
 তোমার ইন্দ্ৰিয়গ্রাম, কাস্তি বদনেও,
 গাজবর্ণ দেখিতেছি পবিত্র নির্মল
 গৌতম । কাহার শিষ্য কহ তুমি তনি ?
 এ আশ্চর্য্য ব্রহ্মচর্য্য শিখিলে কোথায় ?”
 জলদপ্রতিমকণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তরিল—
 “হয়েছি সধু আমি একক, ব্রাহ্মণ !
 করিয়াছি পাপক্ষয়, হয়েছি নির্মল ।”
 জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ—“তবে আচার্য্য কি তুমি ?”

“অহমেব”—বুদ্ধদেব করিলা উত্তর ।

“জিন তুমি ?”—ক্রোধে বিপ্র করিল জিজ্ঞাসা ।

“জিন আমি, সর্বপাপ করিয়াছি জয় ।”—

হইল উত্তর ডেজে । বুদ্ধ আজীবক

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গর্ব্বী ; গর্ব্বের, অভিমানে,

পড়িল আঘাত দৃঢ় ; সমধিক ক্রোধে

জিজ্ঞাসে—“এখন তুমি যাইবে কোথায় ?”

উত্তর—“যাইব কাশী । অন্ধে দিব চোক ;

অমৃত-হৃদুতি আর শুনাব বধিরে ।

হয় নাই ইহলোকে যে ধর্ম্ম প্রচার,

করিব সেখানে সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত

হৃৎখের নির্বাণ-দ্বার করি উদ্ঘাটিত !”

কাশীবাসী অন্ধ ! কাশী-নিবাসী বধির !

মহাতীর্থ কাশীধামে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন !—

জলন্ত অনলে ঘুত হইলে পতিত ।

ব্রাহ্মণ উন্নত ক্রোধে, গুহ্র জঘুগল

করিয়া কুক্ষিত মুখ করিয়া বিকৃত,

হাসিয়া বিকট হাসি চলিল কহিয়া—

“এ পথ তোমার, আর এ পথ আমার ।”

যাহতে উত্তরে বিপ্র, যাইবেন বুদ্ধ

সেই পথে, ক্রোধে বিপ্র চলিল দক্ষিণে ।

চলিলেন বুদ্ধ । ক্রমে ভাগীরথী-তীরে

হইলেন উপনীত । কহিলা নাবিক—

“দয়া করি কর পার ।” কহিল নাবিক—

“দেও পণ্য, করি পার ।” কাতরে স্নগত

কহিলেন—“পণ্য আমি পাইব কোথায় ?

দীন হীন ভিক্ষু আমি ; দিতে মূল্য আমি
 অক্ষম একটি ভগ্ন পাত্র মৃত্তিকার ।”
 কহিল নাবিক পুনঃ--“পণ্যজীবী আমি ;
 স্ত্রী পুত্র আমার আছে ; করিব না পার
 নাহি দেও পণ্য যদি ।” আকাশে তখন
 ঘাইছে বলাকাশ্রেরী, অঙ্গুলি নির্দেশ
 করিয়া কহিল বৃদ্ধ--“বলাকার মালা
 ওই দেধ ঘাইতেছে নদী অতিক্রমি !
 দিরাছে কি পণ্য তারা ? যোগবলে বৎস !
 আকাশের পথে আমি হই যদি পার
 কোথা পাবে পণ্য তব ?” হাসিলা ঈষদ ।
 সেই হাসি, সেই মূর্তি,—চক্ষু নাবিকের
 ঝুলিল, প্রগত পদে হইয়া নাবিক,
 যিনি করিবেন পার সংখ্যাতীত জীব
 এই ভব-ভাগীরথী, আনন্দে তখন
 তাঁহাকে করিল পার ডক্তিতে অধীর ।

বহুদেশ জনপদ করি অতিক্রম
 হইলেন উপনীত বারাগসীধামে,
 ভারতের মহাতীর্থ । অর্দ্ধচন্দ্রাকাশে
 শোভিতেছে কাশী নীলা ভাগীরথীতীরে
 নীলাকাশে অর্দ্ধ শলী । হর্ষ্য শত শত,
 সোপান-চরণ জলে করি নিমজ্জিত,
 পাড়াইয়া সমাবিষ্ট মহাবোগী যত
 ভগ্ন আচ্ছাদিত দেহ । শান্তি প্রতিবিম্ব
 পড়ি শান্ত সলিলেতে, হইট ত্রিদিব
 বিকাশিছে কিবা শান্তি পবিত্রতাময় ।

দেবালয়, বিদ্যালয়, শতসংখ্যাতীত
 শোভিতেছে স্থানে স্থানে । যোগী শত শত,
 পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, বিপ্র, আছে নিমজ্জিত
 অধ্যয়নে, কিংবা নানা শাস্ত্র আলাপনে ।
 ঢাক, ঢোল, কাংশ, ঘণ্টা, করতাল ববে
 পরিপূর্ণ কাশীধাম, লোক-কোলাহলে ।
 সোপান, সৈকত, জল, স্তল, রাজপথ
 আচ্ছন্ন মানবে, নানা, বাসে বিচ্ছিন্নিত ।
 সোপানে, সৈকতে, জলে বন্ধ নিমজ্জিত,
 কত কণ্ঠে, কত স্তোত্র হইতেছে গীত
 কত নবনারী-কণ্ঠে ; মস্তুরে বহিয়া
 যাইছেন ংগীরথী বহি পুষ্পভার,
 অঙ্কুরচন্দন পুষ্পগন্ধে সুবাসিত ।
 ধর্মকোলাহলে পূর্ণ বাগাণসৌধামে
 বৃদ্ধ করিলেন স্থির করিতে প্রচার
 নবধর্ম ভেরী-রবে, হৃন্দুভি-নির্ঘোষে ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেব আসি মৃগদায়ে
 দেখিলেন পলাতক শিষ্য পঞ্চজন ।
 দেখি দূরে কহে তারা—“ব্রত ভঙ্গ করি
 আসে শাকা, হইয়াছে তপস্তা নিষ্ফল ।”
 আসিলে নিকটে বৃদ্ধ, মহিমা-মণ্ডিত
 দেখি সেই শাস্ত্র মূর্তি, করুণ নয়ন
 জ্ঞানদীপ্ত, নিরখিয়া কহি এক স্বরে—
 “গুরুদেব ! গুরুদেব !” হইল প্রশ্নত ।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী ধূলরা যোগিনী,
 ধূলরা কুন্তলা বালা, ধীরে নিশীথিনী

উপাসিকা কুলনারী, নীলশশিময়
 পুষ্পপাটের মনোহর খেতপুষ্পনিভ
 লইয়া নক্ষত্রবিশি, অনন্তরূপিনী
 আসিলেন মহাতীর্থে । ধীরে আরাতির
 কোলাহল নীরবিল, হইল নীরব
 চরাচর, কালীধাম স্রবশ্রু নীরব ।
 দ্বিতীয় প্রহর নিশি ; নক্ষত্র-খচিত
 অনন্ত গগনতলে বসি যোগাসনে
 চাহিয়া অনন্ত নৈশ গগনের পানে
 কহিলেন বুদ্ধদেব—“আয়ুস্মনগণ !
 কবিও না তর্কজালে বিক্ষিপ্ত আশ্রয় ।
 কি চাহ তোমরা ? চাহ হিত ? চাহ সুখ ?
 দুঃখের নির্ক্ষাণ ? কাল কবিও না ক্ষয় ।
 হইয়াছি বুদ্ধ আমি ; পাইয়াছি আমি
 নির্ক্ষাণের মহাবুদ্ধি ; পেয়েছি নির্ক্ষাণ ।
 আইস তোমরা বৎস ! কবিব প্রদান
 সে অমৃত, সেই ধর্ম্যে কবিব দীক্ষিত ।
 তোমরা হইবে বুদ্ধ ; জরা জন্ম আর
 হইবে না ; ব্রহ্মচর্যা পূর্ণ তোমাদের ।”
 করষোড়ে পঞ্চশিষ্য বসি পদতলে
 শুনিল সে ধর্ম্য-চক্র ; হইল দীক্ষিত
 নবধর্ম্যচক্রে ; নিশি হইল প্রভাত ।

সে দিন হইতে শত শত নরনারী
 পবিত্র নির্ক্ষাণ-ধর্ম্যে হইল দীক্ষিত,—
 পণ্ডিত, নিধন, ধনী, মুখ, গৃহী, যোগী,
 শুনি মনোমুগ্ধকর উপদেশ-গাথা ।

দিন দিন যশোরায় হইল বিস্তৃত
 চারিদিকে, বাবাণসী করি বিপ্লাবিত।
 বর্ষা অস্ত্রে বহু শিষ্যে হইয়া বেষ্টিত
 চলিলা মগধে পুনঃ। * আছেন বসিয়া
 একদিন 'গন্ধহস্তি' পর্বতে গয়ায়
 সহ শিষ্য, দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপ
 অগ্নিহোত্র স্থবিখ্যাত বসিয়া নিকটে।
 অদূরে উঠিল অগ্নি ধোর দাবানল।
 গৌতম চাহিয়া সেই ভীম অগ্নি পানে
 কহিলা—“কাশ্যপ। দেখ বেগে দাবানল
 জলিতেছে কি ভীষণ। হায়! নরনারী
 যত দিন থাকে মোহে অবিজ্ঞা-অধীন,
 দহে চিত্ত তাহাদের কামনা-অনলে
 এইরূপে, জগতের গন্ধ রূপ রস
 যত করে অলুভব, সুখের কামনা
 বাড়ে তত, তত দুঃখ হয় ঘনীভূত;
 তত জন্ম-মৃত্যু-চক্রে হয় আবর্তিত।
 আমার নিষ্কাণ-ধর্ম-মন্দিরের দ্বার
 ইন্দ্রিয়সংযম; শাস্তিপূর্ণ অভ্যস্তর।
 এই দ্বারে প্রবেশিলে বহি বাসনার
 নাহি পাবে উত্তেজিত করিতে হৃদয়।
 ইন্ধনবিহনে অগ্নি হয় নির্কাপিত।
 ইন্দ্রিয়ে না যোগাইলে বিষয়-ইন্ধন
 কামনার দাবানল হয় নির্কাপিত,
 কাশ্যপ! মানব শাস্তি লভে অবিলম্বে,
 কামনা নির্কাণে হয় দুঃখের নির্কাণ।”

কাশ্যপ হইল দীক্ষা। তলিলেন বৃদ্ধ
 রাজগৃহে মগধের মহারাজধানী !
 যষ্টিবনে শিষ্যসহ আছেন বসিয়া
 লোকারণ্যে, বিষ্ণিসার মগধ সম্রাট
 বসি সমস্তমে পার্শ্বে। কহিলা কাশ্যপে—
 “কাশ্যপ। বৈদিক ধর্ম তেয়াগিলে, কেন,
 কহ শুনি।” করষোড়ে কহিলা কাশ্যপ—
 “স্বর্গ অপবর্গ আর ইন্দ্রিয় স্রবের
 কামনা যে ধর্ম প্রভু করে উদ্দীপিত,
 সে ধর্ম কেমনে হবে কামনা-নির্বাণ ?
 কামনার দাস শাস্তি পাইবে কেমনে ?
 তুচ্ছ নর, গুরুদেব ! আপনি জলধি ?
 হইলেন অশাস্ত, বক্ষে বহিলে ঝটিকা।”
 নবধর্ম বিষ্ণিসার হইলা দীক্ষিত,
 হইলা দীক্ষিত হই ব্রাহ্মণ-কুমার
 খ্যাত ‘সরিপুত্র’ ‘মোদগল্যায়ন’ আর ।
 এই দীক্ষা চতুষ্টয়, দীক্ষা সম্রাটের,
 করিল মগধরাজ্য পূর্ণ বিপ্লবিত ।
 মগধ সাম্রাজ্য গর্ভে হইল স্থাপিত
 বৌদ্ধধর্ম-মহাধ্বজা, উড়িল আকাশে
 বৌদ্ধধর্ম-বৈজয়ন্তী বলসি গগন ।

সংসার শ্মশান

মগধের বেণুবনে উপবিষ্ট বৃদ্ধদেব
 শিষ্যসহ, গুল্মমধ্যে যেন তরুবর ।
 শৈশবের সহচর আসি পিতৃ-দূত কহে
 প্রণমি চরণে, করি কৃতাজলি কর,—
 “হায় দেব ! কত দূত পাঠাইলা পিতা তব,
 কেহ না ফিরিল রাজ্যে, গেল প্রব্রজ্যায় ।
 আসিয়াছে এই দাস তোমার শৈশব সখা,
 পাবাণে বাঁধিয়া বুক লইতে তোমায় ।
 “বাজিতেছে ধর্মভেরী—দেশ দেশান্তরে তব,
 বাজিবে না শুধুই কি কপিলনগরে ?
 ধর্মের আলোক তব ছুটিয়াছে রাজ্যে রাজ্যে,
 শাক্যরাজ্য রহিবে কি নিবিড় তিমিরে ?
 ধর্মের অমৃত তব সংখ্যাতীত নর নারী
 করিয়াছে, করিতেছে, পান অনিবার ;
 কেবল কি শাক্য জাতি পাইবে না সেই স্নহা,
 জনক, জননী, পত্নী পাইবে না আর ?
 আকুল সে শাক্যরাজ্য, আকুল কপিলবন্তু,
 আকুল জননী তব, জনক আকুল ;
 আকুল গোপার প্রাণ পাইতে সে ধর্মস্নহা,
 সোণার পুতুল শিশু আকুল রাহুল ।
 রাজার জীবন-দীপ হায় ! নির্দাপিত প্রায় ;
 নৃপতি নির্দাণ পূর্বে দেখিতে কাতর

তোমার পবিত্র মুখ ; স্নাতক তাজিতে দেহ
 তব ধর্ম্মায়ত পান করি, ঘোগিবর ।
 তুমি করুণার সিদ্ধ, মাগিছে করুণা তব
 তোমার জনক বৃদ্ধ জীবন-সন্ধ্যায় ।
 মাগিতেছে শাক্যপুত্রী, মাগিতেছে শাক্যরাজ্য,
 তোমার করুণা ভিক্ষা আকুল তৃষ্ণায় ।”
 মধুর বসন্তকাল, মলয় অনিল পীরে
 বহিছে মধুরে মধু ঢালিয়া ধরায়
 সে মধুর প্রশনে ছুটিয়াছে ফুলরাশি,
 ছুটিয়াছে সুধাস্রোত বিহঙ্গগলায় ।
 আকাশের নীলিমায় ভাসিতেছে কি মাধুরী,
 ভাসিতেছে কি মাধুরী বসুধা শ্রামায় !
 কি মাধুরী চন্দ্রকরে, কি মাধুরী সরোবরে,
 বহিতেছে কি মাধুরী তটনৌধারায় !
 বসন্ত-পরশে বিধে ভাসিতেছে কি পুলক,
 সাধকের দেহে যেন দেব-প্রশনে !
 বিশ্বের হৃদয়ে যেন হইয়াছে সঞ্চারিত
 নির্ঝাঁপের মহাস্বপ্ন বসন্তের সনে ।
 পথে নির্ঝাঁপের স্রোতে ভাসাইয়া বহু রাজ্য
 আসিলেন বৃদ্ধদেব কপিলনগরে,
 নগর-বাহিরে বনে রহিলেন শিষ্যসহ,
 ছুটিল নগরবাসী আকুল অন্তরে ।
 নীরব আনত মুখে, ভিক্ষাপাত্র হেম করে,
 গৈরিকে আবৃত হেম-বপু জ্যোতির্ময়,
 জটার কিরীট শিরে, কাকন শেখরে যেন
 হইয়াছে শরভের মেঘের উদয় ।

খচিত স্বর্ণ যানে, বতন মুকুট শিরে,
 মণ্ডিত বতনজালে যে নগরে হায় ।
 বেড়াইত রাজপুত্র, আজি এই দীন বেশে
 ভিক্ষা করি ঘরে ঘরে ভ্রমিছে তথায় ।
 নগরের নরনারী কাঁদিয়া আকুল শোকে
 বেষ্টিয়া ভিক্ষুকে, ভিক্ষা কে দিবে তাঁহারে ?
 নরনারী-অশ্রুজলে ভিজিতেছে ভিক্ষা-পাত্র,
 হইল কপিলবস্ত্র পূর্ণ হাহাকারে ।
 অতি বুদ্ধ নরপতি দাঁড়াইয়া রাজদ্বারে
 দেখিছেন এ পবিত্র শোক-অভিনয়,
 অচল হৃদয়-বস্ত্র, অচল নিশ্চিন্ত নেত্র,
 বহিতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুগারাদ্বয় ।
 সুগম্ভীর পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে অতি ধীরে
 প্রীতির পবিত্র মূর্তি আসিলে হুয়াবে,
 চাপিয়া রাখিতে আর না পারিয়া শোকোচ্ছ্বাস,
 রোদন করিয়া বুদ্ধ কহিলা কুমারে—
 “সিদ্ধার্থ !—সন্ন্যাসি !—প্রভু ! কেন ভিক্ষা পথে পথে ?
 এই ক’টি সন্ন্যাসীর যোগাতে আহা
 অক্ষয় কি শুদ্ধোদন ?” গোতম বিনীতকণ্ঠে
 কহিলেন—“মহারাজ ! বংশের আমার
 এই ভিকারবৃত্তি ধর্ম্য ।” চাপি শোক শুদ্ধোদন
 কহিলেন—“আমাদের গৌরব জনম
 রাজবংশে,—স্বর্ধ্যবংশে ; কেহ ত কখন আর
 করে নাহি এই বংশে ভিক্ষা আচরণ ।”
 আবার বিনীতকণ্ঠে কহিলেন বুদ্ধদেব—
 “মহারাজ ! রাজবংশে জন্ম আপনার ।

দীন ভিক্ষাব্যবসায়ী পূৰ্ণ বুদ্ধদের বংশে
 বোগবলে জন্ম আমি লভেছি আবার ।
 হ্রস্বত পৈতৃক ধন পাইয়াছি আমি ষাণ্ঠা,
 আনিয়াছি প্রীতিভরে দিতে উপহার ।
 প্রসারিত ভিক্ষাপাত্র নৃপতি লইয়া করে,
 চলিলেন অন্তঃপুরে লইয়া কুমার ।
 নবীন সন্ন্যাসী ধীরে আসিছেন অন্তঃপুরে,—
 কহিলেন প্রজাবতী শোকে উক্কুসিত,—
 “হায় ! নৃপতির করে এইরূপে ভিক্ষাপাত্র
 দিলেন বিধাতা ।”—রাণী হইলা মূৰ্ছিত ।
 বসি বুদ্ধ ধরাতলে, অঙ্কেতে মূৰ্ছিতা মাতা,
 ডাকিলেন “মা ! মা !” বলি কঠে করুণার ।
 মায়ের ডাকিল মূৰ্ছা, ধীরে মেলিলেন আঁখি,
 কহিলেন স্বপ্নে বেন—“হৃদয়ে আমার
 কে ঢালিল এই সুখা, কে ডাকিল মা মা বলি
 আমার সিদ্ধার্থ মত, এ ছল কাহার ?
 সাত বর্ষ, সাত যুগ, যেই ভীম দাবানল
 জ্বলিছে আমার এই বৃকে অনির্বাক্য,
 তাহাতে অমৃত-বারি কে ঢালিল মা মা বলি,
 আসিল কি পুত্র মোর জুড়াইতে প্রাণ ?
 এ যে সিদ্ধার্থের কণ্ঠ, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
 সিদ্ধার্থের স্নেহভরা যুগল নয়ন,
 যশোদা ব্রজবিনী আমি, কে চিনিতে পারে আর
 সেই চোক সেই মুখ আমার মতন ?
 কে তুমি কহ না, দেব ! আমার পুত্রের রূপ
 ধরিয়া আসিলে তুমি ছলিতে আমার ?

আমার অনাথা বধু, যৌবনে যোগিনী গোপা,
 কে তুমি আসিলে বল ছলিতে তাহায় ?
 পুত্র মোর বনে বনে কি কঠোর-তপস্শায়
 অনাহারে অনিদ্রায় কাটিছে জীবন,
 পুত্রবধু গৃহে বসি কি কঠোর তপস্শায়
 কাটিছে জীবন পতি-ধ্যানে নিমগন ।
 মহারাজ ! মহারাজ ! ধ্বংস কর রাজপুরী,
 ধ্বংস কর বিলাসের প্রাসাদ উত্তান !
 কুমারের বন গৃহ ! বধুর প্রাসাদ বন !—
 কত দিন সবে আর মায়ের পরাণ !
 না—না—এ ছলনা নহে, এ যে সিদ্ধার্থের মুখ,
 সিদ্ধার্থের এই চোক, সোণার বরণ ।
 মহারাজ ! মহারাজ !” বসিয়া বিবশা রাণী—
 “আমার সিদ্ধার্থ এ যে, এ ত দেব নয় ।
 ফেলে দাও ভিক্ষাপাত্র, আন রাজ-আভরণ,
 তাহার এ বেশে মম বিদরে হৃদয় ।”
 সিদ্ধার্থ নীরব স্থির ; শুক্লোদন কহে শোকে—
 “হায় ! রাণি ! বুঝা শোক কর পরিহার ।
 তোমার সিদ্ধার্থ দেখ লভিয়াছে দেবজন্ম,
 দেখ নর-নারায়ণ কুমার তোমার ।
 তুচ্ছ রাজ-আভরণ ওই গৈরিকের কাছে,
 জটোর কিরীট কাছে মুকুট রাজ্যের ;
 ওই ভিক্ষাপাত্র কাছে কোন রাজকোষ আছে
 করিবেক বিনিময় স্থান আপনার ।
 পাইয়াছে যেই রাজ্য পুত্র তব অনন্তর,
 স্থানে কালে সীমা নাহি হইবে তাহার ।

পাইয়াছে ঘেই ধন সর্ব্বদ্বন্দ্বনিবারণ,—
 চাহ সেই রাজ্যে স্থান, সেই ধন আর ।
 লইরাছি ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপাত্র লও তুমি,
 সিদ্ধার্থ ! তোমার বৃদ্ধ বৃদ্ধা পিতা মাতা
 মাগে এই ভিক্ষাপাত্র, কাটিয়া মাগার পাশ
 দেও ভিক্ষাপাত্র !—পুত্র ! হও পরিজ্ঞাতা !”
 “দিলাম ।”—গম্ভীরে ধীরে কহিলেন বৃদ্ধদেব—
 “কিন্তু পিতঃ ! সহিবে না সন্ন্যাস-দাহন
 ওই জরাজীর্ণ-দেহে ; পালিবে আদেশ যম,—
 রাজসিংহাসনে হবে তোমরা শ্রামণ ।”
 দাঁড়াইয়া শিষ্যগণ, শাক্যরাজ-পরিবার,
 চারিদিকে পুরবাসী অমূচরগণ ।
 কিন্তু গোপা ?—কোথা গোপা ? ভূতলে পাতিয়া বৃক্ষ
 নিজ কক্ষে পুণ্যবতী ধ্যানে নিমগন ।
 সখী কহে—“উঠ সখি ! কত বৎসরের পরে
 কুমার আসিলা ঘরে, করি দরশন
 অপকূপ দেবকূপ,—কি মহিমা-বিমণ্ডিত !—
 চল সখি ! একবার জুড়াও জীবন ।”
 “না সখি !”—কহিলা গোপা অধরে আনন্দ-হাসি,—
 “ক্ষণ যদিও দীর্ঘ তপস্তা আমার,
 আমার হৃদয়নাথ ! আসিবেন এই ধানে,
 এই ধানে পদাঙ্ক পূজিব তাঁহার ।”
 সিদ্ধার্থ, শিষ্য দুই, আসিলেন ধীরে ধীরে,
 দেব অংগুমালী যথা কক্ষেতে উষার ।
 সঙ্কল্পি উঠিয়া গোপা দেখিল সে দেবকূপ ;
 হইল অগত পদে পড়ি দীর্ঘাকার ।

দেখিলেন বুদ্ধদেব গোপার ষোগিনী-বেশ,
 শিরে জটাভার, অঙ্গে গৈরিক বসন ।
 সিংহাসনে পুষ্পাবৃত বসন ভূষণ তাঁর ; •
 পবিত্র সন্ন্যাসক্ষেত্র বিলাস-ভবন ।
 নীরব নিষ্পন্দ স্থির বুদ্ধদেব, শিষ্যদ্বয় ;
 নীরব নিষ্পন্দ গোপা ধরি পদমূল,—
 দিবার প্রতিমা যেন দিবাকর-পদতলে ;
 অষ্টম বর্ষীয় শিশু নীরব 'রাহুল' ।
 গোপা দেখিলেন যেন নবীন সন্ন্যাসী ধীরে
 পশিলেন অন্ধকার হৃদয়ে তাঁহার,
 নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন যেন ভগ্ন দেবাগয়ে
 ধীরে ধীরে চন্দ্রকর হইল সঞ্চার ।
 যেই রাজপুত্র-মূর্তি ছিল হৃদে অধিষ্ঠিত,
 হইল মোহন মূর্তি ধীরে অন্তর্হিত ;
 সন্ন্যাসীতে রূপান্তর হইয়া সে মূর্তি ধীরে,
 হৃদয়ের পদ্মাসনে হইল স্থাপিত ।
 কিন্তু ওই শাস্ত স্থির অমিতাভ দেবরূপ,
 ওই নর-নারায়ণ, পতি কি গোপার !
 জগতের পতি তিনি, ছুঁইতে তাঁহার পদ,
 মানবী গোপার কিবা আছে অধিকার !
 বুঝি তাঁর পরশনে হইতেছে কলুষিত
 সে পবিত্র পদাঙ্ক,—উঠিলা শিহরি ।
 মনে করিলেন স্থির লইবেন অধিকার,
 লভিবেন সবার্ণবে সেই পদতরী ।
 সোণার পুতুল শিশু নীরব নিষ্পন্দ স্থির ;
 বিশ্বয়ের ক্ষুদ্র মূর্তি রয়েছে চাহিয়া,

ছুটিয়া ললাট গোপা, চম্পককলির পত্র,
 লইলেন ধীরে রাজবসন খুলিয়া ।
 চিরিয়া গৈরিকাকুল পরাইলা উত্তরীয়,
 বেশে চারু ক্ষুদ্র চূড়া বাঁধিলা সুন্দর,
 সুন্দর সন্ন্যাসী শিশু সাজাইয়া রাহলেবে
 আনন্দে কহিলা গোপা অশ্রু দরদর—
 “রাহল ! পিতার কাছে মাগ গিয়া পিতৃধন !”
 বিশ্বয়ে জিজ্ঞাসে শিশু কঁাদ কঁাদ স্বর—
 “কে আমার পিতা মা গো ! আছে কি পিতা আমার ?
 কই ত পিতায় মা গো ! দেখিনি কখন ?”
 অশ্রু দর দর গোপা কহিলা—“সন্ন্যাসীদেব
 তোমার জনক, ওই কর দরশন !
 অনন্ত অমৃত ধন আছে বৎস ! তাঁর কাছে,
 দিতেছেন অকাতরে নবের দয়াধার ;
 তোমাকে আমাকে তাহা অবশ্য দিবেন তিনি,
 মাগ গিয়া পিতৃধন চরণে পিতার ।”
 রাহলে লইয়া বুকে বসিলেন জানু পাতি
 পতি-পদতলে গোপা, মূর্ত্তি করণার ।
 রাহল কঁাদিয়া কহে—“দেও পিতঃ ! ‘পিতৃধন !’
 নীরব নিষ্পন্দ বুদ্ধ শিষ্যদ্বয় আর ।
 ছুটিয়া আসিল কক্ষে রাজপরিবারগণ,
 বৃদ্ধ রাজা রাণী সহ, করি হাহকার,
 আবার আবার শিশু—দেও পিতঃ ! পিতৃধন !”
 কহিছে কঁাদিয়া, অশ্রু বহিছে গোপার ।
 দিব পিতৃধন বৎস ! পালিব পিতার ধর্ম
 দিব সপ্ত রত্ন”—বুদ্ধ কহিলা গভীরে,

“সারিপুত্র ! ভিক্ষাপাত্র,—আজ্ঞা যাত্র দিল শিষ্য
পত্নী পুত্র করে পাত্র ভাসি অশ্রুশীরে ।

প্রজাবতী-পুত্র নন্দ বর-বেশে সুসজ্জিত
ছিল দাঁড়াইয়া, কালি বিবাহ তাহার ।

হিঁড়িয়া সুচারু বেশ, লইয়া উন্নতমত
শিষ্যের গৈরিক এক, ভিক্ষাপাত্র আর,
বসিয়া গোপার পার্শ্বে, কহে—“নন্দ ভ্রাতা তব,
তাহাকে ভ্রাতার ধনে দেও অধিকার ।”

নীরব নিম্পন্দ বৃদ্ধ কহিলেন ধীরে ধীরে—

“পূর্ণ অধিকার নন্দ দিলাম তোমায় !

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা কর, বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা

• যত দিন নবলোকে রবেন জীবিত,

বহিবে নিকটে তুমি, পালিবে পুত্রের ধর্ম,

পবিত্র নির্ঝাণ-ধর্মে হইয়া দীক্ষিত ।”

কাঁদিয়া কহিল নন্দ—এমন নির্ভুর কথা,

আনিও না মুখে, তুমি দয়া-পারাবার ।

জীবে দয়া ধর্ম তব, নন্দ বড় ক্ষুদ্র জীব,

নারায়ণ ! তারে দয়া হবে না তোমার ?

আজি হাতে নন্দের যে তুমি পিতা, তুমি মাতা,

তুমি রাজ্য, তুমি ধন, সর্বস্ব তাহার ।

আছে বহু পরিজন সেবিবারে পিতা মাতা,

• রবে নন্দ সঙ্গে, পদ সেবিবে তোমার ।”

চাহিয়া গোপার প্রতি কহিলেন তথাগত—

“বৃদ্ধ পিতা মাতা নাহি লভেন নির্ঝাণ

যত দিন, হবে তুমি সেবিতে চরণ গোপা !

হবে গৃহ তব পুণ্য তপস্যার স্থান ।”

গোপা অবনতমুখে শুনিলেন এ আদেশ,
 একটিও রেখা নাহি হ'লো রূপান্তর,
 তাঁহার প্রশান্ত মুখে; কেবল লইয়া বুকে
 কহিলা রাহুলে, চুপ্তি লগাট সুন্দর—
 “যাও বৎস প্রাণাধিক । যাও জনকের সনে,
 পুণ্যের পশ্চাতে যেন স্মৃতি নিরমল,
 পতি যার নারায়ণ, পুত্র মা গো ! দেবশিশু,
 সিন্ধু তার নারীজন্ম, তপস্তার ফল ।”
 চলিলেন বুদ্ধদেব পশ্চাতে রাহুল, নন্দ,
 দাঁড়াইয়া কক্ষে সব নীরব স্তম্ভিত,
 উদ্বেল উচ্ছ্বাসে শাকা যুবা বৃদ্ধ শত শত
 বৃদ্ধের চরণ-প্রান্তে হইল পতিত ।
 যুবা বৃদ্ধ শত শত লইল নির্ঝাণ ধর্ম,
 চলিল পশ্চাতে বস্ত্রা-তরঙ্গের মত !
 গোপার বিলাস-কক্ষ হইল কি মহাতীর্থ !
 হইল কি বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে পরিণত !
 বস্ত্রার কল্লোলমত ব্যাপিয়া বিশাল পুরী
 ব্যাপিয়া কপিলবস্ত্র উঠিল রোদন ;
 শত শত নরনারী করিতেছে হাহাকার,
 কেবল গোপার স্থির প্রশান্ত বদন ।
 কিছুদিন মহাযোগী থাকিয়া কপিলবনে
 করিলেন প্রতিদিন পিতৃ দর্শন ;
 কহিলেন নব ধর্ম ; পাইলা নির্ঝাণামৃত
 সংখ্যাভীত নর নারী, পিতা শুদ্ধোদন ।

* * * *

কিছু দিন পরে বৃদ্ধ শুনিলেন কোশাঘীতে

অস্তিম শয্যায় বুদ্ধ নৃপতি শায়িত ।
 আসিয়া কপিলপুরে শাক্যকুল-শেখরবি
 দেখিলেন হইতেছে ধীরে অন্তর্মিত ।
 পুত্ররূপী নারায়ণ নিরখিয়া নরপতি
 অস্তিমে হইল চিত্ত শান্তিতে পূরিত,
 আনন্দাশ্রু ছনয়নে, হইলেন নরপতি
 অনন্ত নির্বাণ-স্থখে ধীরে নিমজ্জিত ।
 পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিলেন লোকনাথ,
 ধীরে সেই চিতাবহি হইলে নির্বাণ,
 আসি শাকা-নারীগণ কহে কাঁদি শোকাকুলা—
 “দাসীদেবের পদপ্রান্তে দেও প্রভু ! স্থান ।”
 একে একে শাক্যগণ লইয়া সন্ন্যাসব্রত
 লইয়াছে সবে নব ধর্মের আশ্রয়,
 অনাথারমণী-পূর্ণ হইয়াছে শাক্যপুরী,
 হয়েছে কপিলবস্ত অনাথা-আলয় ।
 নাহি রাজা, কে করিবে ইহাদের ধর্ম রক্ষা ?
 বুদ্ধদেব শুনিলেন ভিক্ষা করুণার ।
 হুজিলেন হৃদয়বিজ্ঞ শুদ্ধ সন্ন্যাসিনীসম্মত,
 হইলেন গোপাদেবী অধিষ্ঠাত্রী তার ।
 মহাবন বিহারেতে রাখি শিষ্যশিষ্যাগণ,
 নির্জন কৌশারী-শৃঙ্গে, শান্তিময় স্থান,
 হইলা সমাধিময় ; হইল কপিলবস্ত,
 ত্রিদিবপ্রতিম শাকা-সংসার প্রশান ।

লোক-শিক্ষা ।

কৌশাঘীর মহোহর মুকুল পৰ্বতে,
 নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা সন্তোষাতা,
 সমেষ-বিছাৎ-বারি মণ্ডিতা ভূষিতা,
 কাটাইয়া বর্ষা ধ্যানে নির্ব্বাণের স্মৃথে
 নিরঞ্জে, চলিলেন করিতে প্রচার
 নব ধর্ম নব বলে পুনঃ তথাগত
 নব শরতের সহ । “একনালা” গ্রামে
 যাইতেছে ভরষাজ ভূস্বামী ব্রাহ্মণ
 বহু হল সহ ক্ষেত্রে, ভিক্ষাপাত্র করে
 দাঁড়াইলা বুদ্ধদেব হুয়ারে তাহার
 নতমুখে । ক্রোধে বিপ্র হইয়া অধীর
 কহিল—“শ্রমণ । দেখ করিয়া কর্ষণ
 বহু শ্রমে ভূমি, বীজ করিয়া বপন
 উৎপন্ন করিয়া শস্ত, করি আহরণ,
 করি আমি আপনার জীবনধারণ ।
 বিনা শ্রমে এ সংসারে আহার কাহারো
 নাহি মিলে । তব স্তম্ভ বলিষ্ঠ শরীর
 বলী বলীবর্দ্ধ মত, কেন অকারণে
 তবে তুমি অপরের হঁও গলগ্রহ ?
 কর্ষণ করিয়া ভূমি করগে বপন,
 বীজ তাহে, মিলিবেক যথেষ্ট আহার ।”
 বুদ্ধ অবনতমুখে উত্তরিল। ধীরে—

“ব্রাহ্মণ । আমিও ভূমি করিয়া কৰ্ষণ
বহুশ্রমে, তাহে বীজ করিয়া বপন,
উৎপন্ন করিয়া শস্ত করি তা আহার ।”
বিস্মিত ব্রাহ্মণ কহে,—“কৃষিজীবী তুমি !
দেখিতে পাই না কই চিহ্নও তাহার ।
কোথায় বলদ তব, কোথা বীজ, হল ?”
“বিশ্বাস আমার বীজ,”—বুদ্ধ উত্তরিল—
“আমার শস্তের ক্ষেত্র মানব হৃদয় ।
পশু মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্বীণ আমার শস্ত অমর অক্ষয় ।”
খুলিল নয়ন; পদপ্রান্তে ভরষাজ
পড়িয়া মাগিল দীক্ষা, লইলা সন্মাস ।

একদা ‘অলাবী’ বনে দম্ভ্যর কুটীরে
আছেন সমাধিমগ্ন । আসি ছরাচার
কহিল—“কে তুমি এই কুটীরে আমার ?
দূর হও, নহে প্রাণ বধিব এখন ।”
মেলিয়া নয়ন বুদ্ধ চাহি দম্ভ্যপানে
চলিলেন । “ও কি জ্যোতি নয়নে ইহার ।”—
ভাবিতে লাগিল দম্ভ্য—“নহে মানবের
এই মূর্তি । দম্ভ্য আমি হৃদয় আমার
কঠিন প্রস্তর সম, হইয়া দ্রবিত
সে পাষাণে যেন মূর্তি হতেছে অঙ্কিত ।”
কহিলা প্রকাশে দম্ভ্য—“সাধু তুমি যদি,
কহ মামুষের কিবা ধন শ্রেষ্ঠতম ?
তাহার কি কার্যো মুখ ? কি জীবন শ্রেষ্ঠ ?
স্বাচ্ছ কিবা শ্রেষ্ঠতম ? প্রশ্নের আমার

না নেও উত্তর যদি ধরি পা হু'খানি
গঙ্গার অপর পারে দিব ফেলাইয়া
ওই মাংসপিণ্ড তব ।" করুণার হাসি
হাসিয়া কহিলা বুদ্ধ—“করিয়াছ তুমি
বহু জীবহত্যা ভাই ! পেয়েছ কি সুখ ?
পাইবে কি তাহা তবে বধিয়া আমায় ?
কুটীর হইতে হায় ! দুর্বল নখর
তব বলবান দেহ । ধ্বংস হবে দেহ
খন আসিবে মৃত্যু । কে রবে কুটীরে ?

পাপকর্ম-ফল মাত্র লইয়া তোমার
যাবে তুমি এত চলি, রহিবে কুটীর ।
তোমার প্রশ্নের ভাই ! দিতে ছে উত্তর—
ধর্ম-মানবের ভাই ! সর্বশ্রেষ্ঠ ধন ।
ধর্মপালনেই সুখ, সত্য শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য,
জ্ঞানীর জীবন শ্রেষ্ঠ ।” জিজ্ঞাসিল ব্যাধ—
“কিরূপে করিব জন্ম-ক্লেশ অতিক্রম ?
কিরূপে হইব পার জীবন-সাগর ?
কিরূপে হইব শুদ্ধ, দুঃখের অতীত ?”
উত্তরিল বুদ্ধদেব—“কর্মফলে জন্ম ;
কর্মফলনাশে জন্ম-ক্লেশ হবে দূর ।
জীবন-সমুদ্রে পার হবে ধর্মবলে ।
চেষ্টায় হইবে তব দুঃখ তিরোহিত ।
জ্ঞানলাভে হবে প্রাণ পবিত্র শীতল ।”
আবার জিজ্ঞাসে ব্যাধ—লভিব কিরূপে
জ্ঞান, ধন, ধর্ম ; বন্ধু ? কি করিলে আর

উত্তরিল। পুনঃ বুদ্ধ—“করিলে বিশ্বাস
 ধর্ম্মে ভক্তিসহকারে পাবে জ্ঞানালোক,
 কর্তব্যসাধনে পাবে ধন, সত্যে যশঃ
 সুপবিত্র নিরবল, পাবে বন্ধু প্রেমে ।
 ক্ষমা, সত্য, বদান্ততা, দৃঢ়তা, সংযম,
 যে লভিবে, পরকালে হুঃখের দাহন
 হবে তার নির্দোষিত ; করিবে সে জন
 জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-চক্র অতিক্রম ।”
 ব্যাধের হৃদয়ে ধীরে উঠিল জলিয়া
 জ্ঞানালোক,—দীপালোক নিবিড় অঁধারে
 গৃহান্তরে ; ভিক্ষুবেশ করিয়া গ্রহণ
 ছুটিল সে নব ধর্ম্ম করিতে প্রচার ।

একদিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিনগরে

- আছেন শিষ্য বসি পবিত্র বিহারে ।
 মৃত শিশু বৃকে কুকাগৌতমী জননী
 আসি শোকাতুরা কহে—“নর-নারায়ণ !
 অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অক্ষয় !
 বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত !
 দেও বাঁচাইয়া মম বৃকের সন্তান,
 একমাত্র শিশু মম । একমাত্র ধন
 চাহি তব পদে ভিক্ষা । দয়াময় তুমি
 কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা তোমার ।
 পুত্রহীনা মার হুঃখ কে ঘুচাবে আর ?
 দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ ! দেও ছই প্রাণ !
 নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর ।”
 দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে

কি পতীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে—
 “হায় ! মায়াবদ্ধ জীব কি হুঃখ দারুণ
 সহে এইরূপে ! সহে ক্লম-জন্মান্তরে !”
 কহিলেন—“মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার ।
 অচিরে করিব তব শোক নিবারণ ।”
 আনন্দে মায়েৰ প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
 শুদ্ধহৃদে প্রবাহেয় হইল সঞ্চার ।
 আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিতা
 পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দে বিবশ ।
 কহিলেন, বৃদ্ধদেব—“উঠ মাতঃ ! যাও,
 আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল !”
 সামান্ত সরিষা ! হায় ! দ্বিগুণ অধীর
 হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণাগোতমীর ।
 চলিল সে রুদ্ধ স্বাসে ; আছে স্তুপাকার
 সরিষা তাহার গৃহে । কহিলেন দেব,—
 “সর্বপ সে গৃহ হ’তে আনিও কেবল,
 যেই গৃহে কেহ মাতঃ । মরেনি কখন ।”
 মৃত পুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিল সরিষা
 গৃহে গৃহে, কিন্তু হায় ! মিলিল না গৃহ
 যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
 জালায়েছে শোকানল । হইল অতীত
 নিষ্কল ভিক্ষার দিবা । ধীরে সন্ধ্যাদেবী
 আসিলেন ; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী ।
 অবসরা শোকাভূষা নির্জন প্রান্তরে
 বসিল উদাস প্রাণে । খুলিল তাহার
 জানের নয়ন ধীরে । দেখিল অগত

নিশীথিনী-ছায়া মত কৃষ্ণ ভয়ঙ্করী ।

মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন । কত শত পুত্র

• মরিয়াছে, মরিতেছে । কত পুত্র চিতা

জলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,

ওই মহানগরের দীপালোক মত ।

ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর ;

নিবিল সে দীপালোক । মৃত পুত্র ক্রোড়ে

উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা ।

দৈববাণী মত কণ্ঠ কাহিল গভীরে—

“দেখ মাতঃ ! হায় ! ওই দীপালোক মত

মানব-জীবনালোক জলি কিছুক্ষণ,

• যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে

আপনার কর্মফলে । কর্মফলে তব

গিয়াছে চলিয়া পুত্র । যাইবে আপনি,

আপনার কর্ম-চক্র কর অনুসার ।”

সৌম্য দেবমূর্তি কৃষ্ণ দেখিল নয়নে

আলোকিয়া অন্ধকার । দিয়া বিসর্জন

মৃত পুত্র, সন্ন্যাসিনী হইল তখন ।

স্থূলবুদ্ধি নব শিষ্য স্বর্ণকারে এক

কহিলেন সারিপুত্র—“চিন্তা অপবিত্র

জগতের যাবতীয় বিষয় সকল

স্থপিত হৃদয়ে তুমি, হইবে উজ্জল ।

সে ঘৃণা হইতে ধর্ম-অনুরাগ তব

ধূমান্ডে অনল যথা ।” গেল চারি মাস

শিষ্যে সে স্থূল জ্ঞান রহিল তেমন ।

বুদ্ধদেব দিয়া তারে সূচাক বহন,

স্কন্ধি আহাৰ আৰ, রাখিলেন কাছে।
 এক দিন অপরাহ্নে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
 আসিলেন রম্য এক সরোবর-তীরে।
 শত শত শতদল সুনীল সলিলে,
 ফুটিয়াছে, ফুটিয়াছে পবিত্র হৃদয়ে
 যেন শত পূণ্য-আশা। একটি তাহার
 করিয়াছে সরোবর সৌন্দর্য্যে উজ্জল।
 বুদ্ধ কহিলেন - “বৎস! থাক নিরখিয়া
 ওই ফুল ফুলপানে।” নেত্রে অবচল
 রহিল চাহিয়া শিষ্য, দেখিতে দেখিতে
 শুকাইল শতদল সন্ধ্যা-সমাগমে,
 ঝরিতে লাগিল দল ঝরিল সকল।
 কহিলেন বৃদ্ধদেব - “দেখ। ভিক্ষু দেখ!
 সৌন্দর্য্যের পরিণাম! পরিণাম আর
 এ বৃন্দর শরীরের, এই জগতের,—
 অনন্ত সৌন্দর্য্যধার! সকলি অসার!
 তেয়াগিয়া অনুৰাগ এই অসারের
 কর সার অনুষ্ঠান, পাইবে নিৰ্ব্বাণ।”
 নয়ন লভিল ভিক্ষু। এতদিন পরে
 হুল জ্ঞানে ধৰ্ম্মভাব উঠিল জাগিয়া।
 দুই শিষ্য ছোট বড় পঞ্চিক হুঁভাই।
 ছোটটি নিরোধ বড়। শিক্ষা ছয় মাসে
 হলো না একটি শ্লোক। দুঃখে বড় ভাই
 কহিল—“তোমার কিছু হইবে না আর!
 কর ত্যাগ মঠ তুমি!” কিন্তু ছোট ভাই
 বৌদ্ধধৰ্ম্ম প্রাপ্ত তার, ছাড়িল না মঠ।

নিমন্ত্রণে বড় ভাই আর এক দিন
 নিমন্ত্রিত শিষ্যগণ ছাড়িয়া তাহারে ।
 মনোহুঃখে ছোট ভাই কহিতে লাগিল—
 “হায় ! আমি ভ্রাতৃস্নেহ হ’তেও বঞ্চিত
 হইলু, কি কাজ তবে থাকিয়া এ মঠে ।
 হ’ব রত দান ধ্যানে হয়ে গৃহবাসী ।”
 একদা প্রত্যুষে মঠ যাইতে ছাড়িয়া
 দেখিল সে বুদ্ধদেব দাঁড়াইয়া পথে ।
 কহিল চরণে পড়ি—“ভ্রাতার আদেশে
 ছাড়ি মঠ যাইতেছি হইতে সংসারী ।”
 কহিলেন দেব—“ছোট পথিক গ্রহণ
 করিয়াছ পথ্য তুমি নিকটে আমার ।
 ভ্রাতার কথায় কেন ছাড়িবে এ মঠ ?
 এস তুমি, কর বাস নিকটে আমার ।”
 নিয়া বাসগৃহে তাকে করুণানিধান,
 শুভ্র বস্ত্রখণ্ড এক করিয়া প্রদান,
 কহিলেন—“বস্ত্রখণ্ড কর সজ্জ্বৰ্ণ
 ছুই করে, কহ আর—মলিনতা মম
 চিত্তের হউক দূর ।” বস্ত্রখণ্ড যত
 করিল ঘর্ষণ তত হইল মলিন ।
 ভাবিতে লাগিল ভিক্ষু—“শুভ্র বসনের
 ঘটিল হায় রে পরিবর্তন কেমন ।
 বস্ত্র-শুভ্রতার মত হায় ! পৃথিবীর
 সকলি অনিত্য, হায় ! সকলি অসার ।”
 বৈরাগ্য উঠিল ভাসি হৃদয়ে তাহার ।
 বুদ্ধদেব এই শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া

কহিলেন—“হইয়াছে কলঙ্কিত বৎস !

শুভ্র বাস, নহে তব বিষয় চিন্তার ।

কাম-চিন্তা মহাপাপ কলঙ্ক বিষয়

রহিয়াছে চিন্তে তব কব বিদূষিত !

ধূলি ত কলঙ্ক নহে কলঙ্ক এ কাম !

সাধু যারা এ কলঙ্ক করিয়াছে দূর ।

— — — কলঙ্ক নহে কলঙ্ক এ ক্রোধ

সাধু যারা, এ কলঙ্ক করেছে মোচন ।

ধূলি ত কলঙ্ক নহে, কলঙ্ক এ মোহ ।

সাধু যারা এ কলঙ্ক হইয়াছে পার ।”

এত দিন জড়-জ্ঞানে ছোট পথিকের

পশিল জ্ঞানের জ্যোতি, হইল উজ্জল ।

রাজগৃহ শৈল মূলে “কুণ্ড সপ্তধারা” ।

মগধের রাজলক্ষ্মী বিহিসার রাণী

আসিলেন ক্ষেমাদেবী স্বান অভিশাষে ।

“সপ্ত ধারা” ঢালিতেছে সুধা সপ্তধারা

নিরমল সুশীতল পুণাধারা মত ।

উপরে বিহাবে বসি ধর্ম্য সুধারামি

ঢালিছেন বুদ্ধদেব অনন্ত-ধারায়

নিরমল সুশীতল নরনারী প্রাণে

সংখ্যাভীত ; নরনারী শত সংখ্যাভীত

লইতেছে অভিনব ধর্ম্মের আশ্রয় ।

ভক্তির সে শ্রোতে ভাসি রাণী আশ্রয়বা,

পরিচরি বহুমূল্য বসন ভূষণ

পরিয়া গৈরিক বাস হইলা দীক্ষিতা ।

রাজরাণী হইলেন দীনা ভিখারিনী !

সমুদ্র-বল্লোল মত ঘোর কোলাহল
 উঠিল মগধরাজ্যে, ছাইল ভারত,
 হইল প্রচার-শ্রোতে প্লাবন সঞ্চার ।
 মগধ, অযোধ্যা প্লাবি, প্লাবি পঞ্চনদ,
 ভাসাইয়া দাক্ষিণাত্য, মিশিল সাগরে
 প্লাবন-প্রবাহ বেগে, নিল ভাসাইয়া
 ক্ষতিজাত-জীবজাতী বহু নিরমম ।
 ভূমিমা প্লাবন-মুখে দেশদেশান্তরে,
 উড়াইয়া তর্ক-শ্রোতে তৃণরাশি মত
 প্রতিযোগী-প্রচলিত নানাদর্শ যত,
 চতুশ্চত্বারিংশৎ বর্ষ করিয়া প্রচার
 নবদর্শ ; নবদর্শ করিলা স্থাপিত
 আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষে ভারতের ।
 অ্যাসিলেন মনোহর মুকুল পর্বতে
 কোশাঘর, ভগ্নদেহ শ্রমে অবসাদে,
 বরিষার চতুর্দাস করিতে ঘাপন ।
 একদিন তথাগত ডাকি শিষ্যগণে
 কহিলেন—“ভিক্ষুগণ ! ধর্ম চক্র মম
 মতনে করিয়া শিক্ষা, করিয়া সাধন,
 লভ নিরবাণ সবে ; করিবা প্রচার
 কর এই জগতের দুঃখের নির্বাণ ?
 ইহলোক পরলোক নির্বাণ-স্থান
 শাস্তিময় সুখময় কর মানবের ।
 ভিক্ষুগণ ! তথাগত থাকিবে না আর
 দীর্ঘকাল এ জগতে ; মাসত্রে আর
 হবে নির্বাণিত জন্ম, লভিবে নির্বাণ ।

দেহ জীর্ণ, আয়ু পূর্ণ, পূর্ণ মনস্কাম,
 জীবনের ব্রত,—দেও বিদায় এখন ।
 বিস্মিত ব্যথিত শিষ্যমণ্ডলী অধীর,
 অকস্মাৎ বজ্রাহত রহিল চাহিয়া
 মৃতবৎ মুখপানে । শিষ্য প্রিয়তম,
 আনন্দবিষাদে কহে—“একি কথা প্রভু !
 কেমনে এ সজ্ব তব যাইবে ছাড়িয়া
 অকালে, অনাথ করি এই ভিক্ষুগণ,
 করিয়া অনাথ এই তাপিত মানব ?
 এখনো মানবজাতি হয়নি উদ্ধার ।
 সংখ্যাতীত নর নারী হৃষিত অন্তরে
 চেয়ে আছে দয়াময় তব মুখপানে ।
 সজ্জের কি সাধ্য স্মৃতি করিয়া বধণ
 জুড়াবে তাদের প্রাণ ? কি সাধ্য ত্বদের
 সাধিবে হিমাদ্রি-ব্রত ? ক্ষুদ্র জলবিন্দু
 মহাপারাবার ব্রত করিবে সাধন ?
 সজ্জের কুটীর, অলম্বন বিহীন,
 আপনি পড়িবে ভাঙ্গি ভারে আপনার ।
 কহ দেব ! এ সজ্জের কি হবে উপায় ?
 “অনন্দ !”—কহিলা ক্ষুদ্র কণ্ঠে করুণার—
 “এই জীর্ণ ভয় দেহ কি করিবে আর
 সজ্জের ? আমার যাহা ছিল করিবার
 করিয়াছি, আমার যাহা ছিল কহিবার
 কহিয়াছি, দিয়াছি যা আছিল দিবার ।
 বড় ভ্রান্ত যে অনাথ ভাবে সজ্জ-নেত্রা !
 আমার অধীন সজ্জ, বন্ধিতে তাহার

পারি আমি,—আমি তাহা ভাবিনি কখন ।
 আমার অশীতি বর্ষ বয়সের ভারে
 ভাসিয়া পড়িছে দেহ । বৎস ! রাখ যদি
 সাবধানে ভগ্ন যান থাকে কিছু কাল ;
 থাকিবে এ দেহ যদি রাখি সাবধানে ।
 কিন্তু আমি সমাধিস্থ থাকি যতক্ষণ
 থাকি সুস্থ, অসমাবি বড় ক্লেশকর ।
 আপনি আপন পথ, বৎস ! অতএব
 আপনি দেখিয়া লও, করিও না আর
 নির্ভর এ ভগ্ন তুণে । সত্যের আলোকে
 তোমরা জীবন-পথে হও অগ্রসর ।
 সত্যকে আশ্রয় কর । আশ্রয় দ্বিতীয়
 করিও না এ সজ্জের । মরিবে শরীর ;
 মরিবে না শিক্ষা মম । সেই শিক্ষাশ্রয়
 কর যদি এ সজ্জের, হইবে অমর
 এই সজ্জ ; হবে সজ্জ নির্ঝগ্ন-নিঝবৎ
 “চলিলেন সত সত্য প্রভু কি ছাড়িয়া
 ভিক্ষুগণে—এই দাসে”—উঠিল কাঁদিয়া
 আনন্দ আকুল শোকের । কণ্ঠে সক্ররূপ
 কহিলেন বুদ্ধদেব—“কহিয়াছি আমি
 জন্মিলেই মৃতা বৎস ! ফুটে যদি ফুল
 শুকাইবে, জলবিশ্ব উঠিলে মিশিবে ।
 কাহারো মৃত্যুর করে নাহি পরিভ্রাণ
 এই বিশ্বে, বুঝা শোক কর পরিহার ।
 শোকীর নির্ঝগ্নে বৎস ! নাহি অবিকার ।”
 নিভৃতে কাশ্মপে ডাকি কহিল—“কাশ্মপ !

করিব তোমার সঙ্গে বস্ত্র বিনিময় ।
 তোমাতে রহিব আমি, রহিবে আমাতে
 তুমি বৎস ! প্রতিনিধি হইয়া আমার,
 চালাইবে সজ্জ তুমি । পড়িয়া কাশ্মীর
 দীনভাবে পদতলে করিল স্বীকার ।
 অনিন্দে চলিলা কুশীনগরে তখন
 বর্ষা অন্তে তথাগত লভিতে নির্ক্ষণ ।
 পথে চণ্ড চণ্ডালের হইলে অতিথি
 দিল সে মাংসান্ন ভিক্ষা,—ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান
 নহে ধর্ম্ম শ্রমণের,—করিয়া গ্রহণ
 হইয়া পীড়িত, কুশীনগরে আসিয়া
 শুইলেন শালবনে অস্তিম শয়নে ।
 মদগলী ও সারীপুত্র লভেছে নির্ক্ষণ ।
 লভেছে নির্ক্ষণ গোপা, গৌতমী, রাহুল ।
 দেখিলেন বৃহদেব জীবলীলা শেষ—
 শেষ জন্ম ; ইচ্ছিলেন নিরবাণ ধীরে
 আসিল পবিত্র নিশি মহানির্ব্বাণের :

(১২)

মহানির্বাণ ।

বসন্তের পৌর্ণমাসী । নির্যমল আকাশে
 বসন্তের পূর্ণচন্দ্র । ভাসিতেছে ধরা
 নিরমল সুশীতল চন্দ্রিকা সাগরে ।
 অবলম্বি সুবিশাল শাল তরুণব

বসি যোগাসনে স্থিঃ, বনদেব মত,
জটায়ু কিরীট শিরে, মুদিত নয়ন ।
বন-অবসরে খণ্ড জ্যোৎস্না নিশ্চল
পড়িয়াছে দেব-অঙ্গে, প্রশান্ত নয়নে,
সুবর্ণ দর্পণে যেন,—বর্ণে সুবর্ণের
উজ্জ্বল কাস্তিতে বন করি সমুজ্জ্বল ।
নীরবে আনন্দ বসি তৃষিত নয়নে
দেখিছে সে দেবরূপ ভক্তিতে বিহ্বল !
উন্মেষি আকর্ণ-শ্রান্ত প্রশান্ত নয়ন
চাহি ফুল চন্দ্রপানে কণ্ঠে পদপদ
কহিলা—“আনন্দ ! দেখ, যদি কেহ
চণ্ডের মাংসান্নে মৃত্যু ঘটিল আমার,
পাইবে সে বড় ব্যথা । কহিও চণ্ডেরে—
সুজাতার অঙ্গে বুকু হইলাম আমি,
লভিলাম নিরবাণ অগ্নিতে তাহার
বড় পুণ্যবান চণ্ড । এই দুই জন
সিদ্ধার্থের হিতকারী সুহৃদ পরম ।
যাও বৎস ! শিষ্যগণে কর সমবেত,
জীবনের শেষ কথা কহিব আমার ।”

ধীরে ধীরে শিষ্যগণ হইল মিলিত,
ভক্তি বিন্যাসের ঘেই ছায়া সুগভীর
পড়িয়াছে হৃদয়েতে ভাসিছে বদনে,
হইল গভীরতর ফুল চন্দ্রালোকে ।
প্রণমি চরণে সবে বসিল নীরবে
চারিদিকে শান্ত স্থির, চাহিয়া নীরবে
সেই দেব মুখপানে নেত্র অবিচল ।

এখনো চাহিয়া দেব ফুল চন্দ্রপানে ।
 সচেতন দুই চন্দ্র, পূর্ণ জ্ঞানালোকে,
 চাহি স্থির অচেতন এক চন্দ্র পানে ।
 অচেতন চন্দ্রালোকে দীপ্ত ধরাতল,
 সচেতন চন্দ্রালোকে, অনন্ত অতল ।
 কহিলেন শান্ত স্থির কর্ত্তে—“ভিক্ষুগণ !
 পূর্ণ মম জীব-চক্র, কর্ম্ম-চক্র আর
 এত জন্মে এত যুগে : আবর্ত্তিত আর
 জন্ম-জরা-মৃত্যু-চক্রে হইব না ঘোর
 দুঃখপূর্ণ, উপস্থিত নির্কারণ আমার ।
 শিখাইলু ঘেই ধর্ম্ম, করিলু প্রচার,
 অনুষ্টিয়া ভক্তিভাবে, শিখাইয়া নবে,
 নতিও নির্কারণ-সুখা : নির্কারণ-সলিলে
 ভাসাইও পরিতপ্ত এই ধরাতল ।
 সে মহানির্কারণ-ধর্ম্ম সংক্ষেপে এখন
 কহিব—জীবন শেব, শক্তি মম শেব,—
 জীবনের শেষ শিক্ষা, শেব কথা মম
 মিশ্রিল হৃদয়-পটে কর মুদ্রাকৃত,
 মর্ম্মর-ফলকে খেত, অমর অক্ষরে ।
 শ্রুত এই মহাগ্রন্থ, হৃদয়ে অঙ্কিত,
 হবে তোমাদের শ্রুতি ; তোমাদের স্মৃতি,
 স্মৃতিশাস্ত্র এ ধর্ম্মের ; এ ক্ষুদ্র নির্ঝর
 হবে কালে পরিণত মহাপারাবাহে
 প্রাণি এই ধরাতল নির্কারণ-সুখায় ।”

নীরব নিষ্পন্দ বন, নিষ্পন্দ নীরব
 ধরাতল, চরাচর ; নিষ্পন্দ নীরব

বহিতেছে বসন্তের শাস্ত সমীরণ ।

নীরব গগনে শশী, নক্ষত্র নীরব ।

নীরব প্রকৃতি নৈশ, হৃদয় নিশ্চল,

• শুনিতে নির্বাণ-ধর্ম নির্বাণসময়ে

নির্বাণ-দাতার মুখে,—নির্বাণ নির্ঝর ।

কভু চন্দ্রপানে চাহি, কভু শিষ্যপানে,

মহিমা-মণ্ডিত মুখে, শাস্ত হনয়নে,—

জ্ঞান-দীপ্ত স্বধাকর,—নাগিলা কহিতে

নারায়ণ দেব-কণ্ঠে, করিয়া প্রাবিত

নৈশ নীরবতা শাস্ত পবিত্র সঙ্গীতে,

জ্ঞানালোকে চন্দ্রালোক করি সমুজ্জল ।

১

“কে স্বজিলা এই বিশ্ব ? স্বজিলা কেমনে ?—

ভিক্ষুগণ ! জ্ঞানাতীত জগত্কারণ ।

তর্জনী ক্ষেপণ করি, মহাপারাবার

চাহিও না পরিমাণ করিতে কখন ?

২

“কেন এই বিশ্ব ? বিশ্ব আদি কি অনাদি ?

ভিক্ষুগণ ! চাহিও না জানিতে কখন ।

কেন আমি নব ? আমি আদি কি অনাদি ?—

নাহি জানি, কি জানিব বিশ্বের কারণ ।

৩

“যে করে এ প্রশ্ন, আর যে দেয় উত্তর,—

জানিও উভয় ভ্রান্ত । যুগ যুগান্তর,—

পারে নাহি নব-জ্ঞান করিতে উত্তর ।

পারিবে না নব-জ্ঞান যুগযুগান্তর ।

৪

“প্রচ্ছন্ন সে মহাতত্ত্ব মানব-নয়ন
দেখিবে না । আবরণ পর আবরণ
মানবের জ্ঞানবলে হ'বে উন্মোচিত ;
রবে তবু আবরণ পর আবরণ ।

৫

“এই দেখি—আছি আমি, আছে চরাচর,
সংখ্যাতীত চক্র সূর্য্য, গ্রহ, সংখ্যাতীত ।
সংখ্যাতীত সম্মিলিত জড় ও চেতন
হইতেছে নিত্য কৰ্ম্ম-চক্রে আবর্তিত !

৬

“এই দেখি—চক্রাকারে ভ্রমে ঋতুগণ ;
ভ্রমে দিবা নিশি পক্ষ ; গ্রহ সংখ্যাতীত
চক্রে চক্রে মহাশূন্তে করিছে ভ্রমণ,
করিয়া, অনন্ত মন্ড্রে অনন্ত প্রাবৃত ।

৭

“এই দেখি—জন্মে চক্রে বীজেতে অঙ্কুর,
অঙ্কুরেতে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফুল, ফুলে ফল,
ফুলে পুনঃ বীজ ; জলে জন্মে বাষ্পরাশি,
বাষ্পে জন্মে মেঘ, পুনঃ মেঘ হয় জল ।

৮

“হইতেছে মহাচক্রে নিত্য আবর্তিত
জড়-চেতনের সিন্ধু অনন্ত অতল ;
এই মহাসিন্ধু-গর্ভে বিশ্ব চরাচর
জলবিষয় মত উঠি হইতেছে জল ।

৯

“এই দেখি—চক্রে জীব জন্ম নিরন্তর
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে আবর্তনময়,
করি জরা-ব্যাধি-ভোগ হুঃখ নির্যাতন,
সেই মহাসিন্ধু-গর্ভে হইতেছে লয় ।

১০

“এই চক্র ধর্ম-চক্র । এই আবর্তন
জগতের মহাধর্ম । সৃষ্টি স্থিতি লয়
হইতেছে সংঘটিত এই আবর্তনে
নিরন্তর, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিময় ।

১১

“এই ঘোর আবর্তনে পড়ি জীবগণ
সহিছে অশেষ হুঃখ, জন্ম-ব্যাধি-জরা-
মরণের লৌহ-করে জন্মজন্মান্তর,
করিতেছে হাহাকার ব্যাপী এই ধরা ।

১২

“অতএব ভিক্ষুগণ ! হৃদয়ে অঙ্কিত
কর চারি আখ্যা-সত্য অমর দেখায়—
আছে হুঃখ,—আছে এই হুঃখ কারণ,—
হুঃখের নিরোধ আছে, নিরোধ উপায় ।

১৩

“আছে হুঃখ—হায় ! এই মানব-জীবন
হুঃখের প্রবাহ ক্ষুদ্র । হুঃখ জনমেব,
হুঃখ শৈশবেব, ঘোর হুঃখ যৌবনের
হুঃখ জরা-বার্দ্ধক্যেব, হুঃখ মরণের ।

১৪

“মানব-জীবন নহে-ঝটকা আশার,
নিরাশার মেঘমালা, মন্দ বেদনার,
বিয়োগের অশ্রু, বজ্রকীড়া বিপদের,
অশান্তির অতৃপ্তির ঘোর হাহাকার ।

১৫

“সৌন্দর্য্যো, ঐশ্বর্য্যো বীৰ্য্যো, গৌরবে ও শ্রেয়
কোথা তৃপ্তি ? হায় মৃগতৃক্ষিকা কেবল !
যত পাই তত চাই ; প্রাণে অনিবার
আকাজ্জক অতৃপ্তির ঘোর দাবানল ।

১৬

“কেন এই দুঃখ ? কিবা কারণ তাহার ?
কেন জীব সহে এত দুঃখ ঘোরতর ?
দুঃখের কারণ জন্ম । না হলে জনম
সহিত না জীব এত দুঃখ নিরন্তর ।

১৭

“কেন জন্ম ? কি কারণে জন্মে জীবগণ
সংখ্যাতীত রূপে, সংখ্যাতীত অবস্থায় ?
ভিক্ষুগণ । কৰ্ম্মফল জন্মের কারণ,
কৰ্ম্মফলে অবস্থার রূপান্তর হায় !

১৮

“স্বয়ংস্বর, নয় এই বিখ্যাতর
সকলেই কৰ্ম্মরত, জড় ও চেতন ।
কৰ্ম্মফলে কেহ স্বর, কেহ বা অস্বর,
কেহ নয়, কেহ কীট স্থগিত অধম ।

১৯

“কৰ্মফলে কেহ এই ধরার ঈশ্বর,
কেহ দীন হীন পথে পড়ি অনশন ;
কেহ জ্ঞানী, কেহ মুখ ; কেহ বদাকার,
কেহ মনোমুগ্ধকর রূপে অনুপম ।

২০

“পূবে পশুজন্ম, কর কৰ্ম পশুমত ;
পাবে দেবজন্ম কর কৰ্ম দেবোপম ;
স্বরলোকে কর কৰ্ম অশ্বরের মত,
অশ্বর, তিৰ্যাক, জন্ম করিবে গ্রহণ ।

২১

“ভিক্ষুগণ ! সতে সত, অসতে অসত,
এই বিধে জলে করে আকর্ষণ জল ।
পুণ্যকৰ্ম পুণ্য-জন্ম, পাপ-জন্ম পাপ,
সমযোনি আকর্ষণ করে কৰ্মফল ।

২২

“জগতের এই নীতি,— বরিবে যোপণ
যেইরূপ বীজ, ফল ফলিবে তেমন ।
শস্ত্রে শস্ত্র ; আত্রে আত্ম ; মাকালে মাকাল ;
কুবীজে সুফল নাহি ফলিবে বধন ।

২৩

“অতীতের কৰ্মফলে লভিয়া জন্ম,
বর্তমান কৰ্মফলে করে রূপান্তর
অতীতের কৰ্মফল ; রূপান্তর ফলে
লভে ভাবি-জন্ম, উচ্চ কিংবা নীচ, নর ।

২৪

এইরূপে কৰ্ম্মফলে জন্মজন্মান্তরে
অনন্ত অসংখ্য যোনি করিয়া ভ্রমণ
সহে জীব দুঃখ ঘোর ; নাহি সাধ্য কারো
এই কৰ্ম্মফল-ভোগ করিবে বারণ ।

২৫

“গ্রহ-উপগ্রহ-গতি অলজ্বা যেমন,
অলজ্বা জলেব যথা ভাটা ও জোয়ার,
অলজ্বা যেমন দিবা-নিশি-বিবর্তন,
এই কৰ্ম্মফল-গতি অলজ্বা অপার ।

২৬

“বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ ! জন্ম কৰ্ম্মফলে,
কিস্তি কেন কৰ্ম্ম ? কৰ্ম্ম করি কি কারণ ?
কৰ্ম্মের কারণ,—সুখভুগা দুর্নিবার ।
সুখ-আকাজ্জক্য করে কৰ্ম্মে নিমগন ।

২৭

“নির্ম্মম নিদাঘ-তাপে প্রতপ্ত কৃষক,
শীতল মৰ্ম্মর-হর্ষো ধরার ঈধর,
বর্ণিক সমুদ্র-গর্ভে, বণ-গর্ভে বীর,
সুখের ভুগায় কৰ্ম্মে রত নিরন্তর

২৮

“পশু, পক্ষী, কীট, হুলচর, জলচর,
আহারের আশ্রয়ের করি নিরন্তর
অন্বেষণ ভ্রমিতেছে সুখ আকাজ্জক্য;
সুখ আকাজ্জক্য হিংসা করে পরস্পর ।

২৯

“কেন এই স্মৃতি-তৃষ্ণা ? জীবের হৃদয়ে
এই স্মৃতি-তৃষ্ণা কিসে হয় সঞ্চারিত ?

- স্মৃতি-দুঃখ-অনুভব তৃষ্ণার কারণ ।
স্মৃতি তৃপ্ত হয় মন, দুঃখেতে ব্যথিত ।

৩০

“জগতের সহ মন-ইন্দ্রিয়-সংযোগ
এই অনুভব-হেতু । না জানে উন্মাদ
স্মৃতি দুঃখ ; নাহি শুনে বধির সঙ্গীত
স্বপ্নধুর ; জিহ্বা-হীন নাহি জানে স্বাদ ।

৩১

- “কেন জগতের সহ হয় এ সংযোগ
মন ইন্দ্রিয়ের নিত্য ?—আছে, ভিক্ষুগণ !
জগতের রূপ, রস, গন্ধ মনোহর ;
মন ও ইন্দ্রিয় তাহে করে আকর্ষণ ।

৩২

কেন চাহি ওই নারী—বড় রূপবতী,
করিচ্ছে রূপে মন ইন্দ্রিয় মোহিত ।
কেন চাহি ওই ফল ?—রসে সুধাময় ।
কেন চাহি ওই ফুল ?—সুগন্ধ-পূরিত ।

৩৩

“সত্যি কি রূপ তবে আছে রমণীর ?
ফলে রস, ফুলে গন্ধ ?—নাহি জানি আমি ।
উন্মাদের নাহি রূপ-রস-গন্ধ-জ্ঞান,
আমার হ’তেছে জ্ঞান, এই মাত্র জানি ।

৩৪

“কেম হয় হেন জ্ঞান ?—আছে সংস্কার
জন্মগত, জাতিগত । যে মাংস আমার
ঘটাইল এই মুহূর্ত্ত ; পরম হুল্লভ
চণ্ডাল চণ্ডের তাহা, স্বস্বাহ আহার ।

৩৫

“জাতিভেদে, জীবভেদে কত রূপান্তর
রূপ-রস-সুগন্ধের এই সংস্কার ।
অতএব নহে সত্য রূপ, গন্ধ, রস ;
প্রাপ্তিবশে ভাবি সত্য, মোহে অবিচার ।

৩৬

“বুঝিলে কি ভিক্ষুগণ ! হৃৎপথের কারণ
এই প্রাপ্তি ; এইপ্রাপ্ত রূপ-রস-জ্ঞান
উপজি সুখের তৃষ্ণা, করে কৰ্ম্মে রত
কৰ্ম্মফলে জন্ম ; জন্ম হৃৎপথের নিদান ।

৩৭

“এই প্রাপ্তি হ’লে দূর হবে তোমাদের
হৃৎপথের নিরোধ, জন্ম হটবে না আর ।
কিসে দূর হবে প্রাপ্তি ?—আছে কোন পথ
এ প্রাপ্তি হইতে নর লভিতে উদ্ধার ?

৩৮

আছে অষ্ট পথ—শুদ্ধ দৃষ্টি নিরমল,
সত্য বাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার,
পুণ্য কৰ্ম্ম, সাধু উপজীবিকা সুন্দর,
শুদ্ধ স্মৃতি, অবিচল সত্য ধ্যান আর ।

৩৯

“হিংসা চৌর্য্য, পিশুনতা, যথেষ্টা আঁচার,
মিথ্যাচার পরুষতা, বিরুদ্ধভাষিতা,
মিথ্যা মনোযোগ, মিথ্যা দৃষ্টি, প্রাণি-বধ,—
ঐইদশ লীলা জন্মহঃখপ্রসবিতা ।

৪০

“ভিক্ষুগণ ! এক দিকে ইন্দ্ৰিয়ের সুখ,
অন্যদিকে ব্রহ্মচর্য্য দেহ-নিষ্পীড়ন
পরিহরি, মধ্যপথ করি অনুসার,
কার অষ্টপথে চিত্ত-নৈশ্চল্য সাধন,

৪১

“হও ধ্যানে অগ্রসর । ভাতিবে “বিবেক,”
উঠিবে ধ্যানের যবে প্রথম সোপানে,
হইবে অবিজ্ঞা দূর, দেখিবে তখন
কি অনিত্য, কিবা নিত্য অলৌকিক জ্ঞানে ।

৪২

“উঠিবে ধ্যানের যবে দ্বিতীয় সোপানে,
হইবে “একোতিভাব ।” অনন্ত সঙ্গার
দেখিবে প্রবাহ-লীলা ! প্রবাহে প্রবাহে
হইতেছে উন্নিমত জন্ম বারংবার ।

৪৩

“বহুজন্ম হবে জ্ঞান বহু পুষ্প মত,
একই সঙ্গার সূত্রে গাথা পুষ্পহার,
জন্মান্তর কর্ষফলে ; ফল রূপান্তরে
বিভিন্ন যোনিতে জন্ম বিভিন্ন প্রকার ।

৪৪

“আরোহিলে সমাধির সোপানে তৃতীয়
জন্মিবে উপেক্ষা জড়ে ; হবে বিদূষিত
সুখ-দুঃখ জ্ঞান ; আত্মা অস্পন্দ অক্রিয়,—
“উপেক্ষক,” হবে পূর্ণ আসক্তি-অতীত ।

৪৫

“আরোহিলে সমাধির সোপানে চরম,
হইবে নির্বাণ তব অহঙ্কার-জ্ঞান ;
হইবে নির্বাণ জন্ম-মৃত্যু-আবর্তন ;
হবে বুদ্ধ ভিক্ষুগণ ! লভিবে নির্বাণ ।

৪৬

“কর্ম নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আর !
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত ; আত্মা শাস্তাকাল মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শাস্তি-পারাবার !

৪৭

“নির্বাণের পথে সত্ত্ব দিকপ্রদর্শক ।
ভিত্তি ধর্ম-চক্র ; চারি অক্ষর প্রাচীর
চারি আখ্যা সত্য ; অষ্ট স্তম্ভ অষ্ট পথ ;
সাধনার দুইকক্ষ—ভিক্ষু ভিক্ষুণীর ।

৪৮

“উর্দ্ধে উচ্চ চারি তল,—চারি সমাধির ।
শিরে পূর্ণচন্দ্রনিভ চূড়া সুদর্শন,—
নির্বাণ সুধার সিদ্ধ,—দেবলোকাতীত
শাস্তির ভূষিতস্বর্গ বুদ্ধ-নিকেতন ।

“বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ব—এই ত্রিরত্নে শরণ
লও ভিক্ষুগণ ! লভ নিরবাণ আর ।
পশিয়া গহন বনে ভূধরে সাগরে
বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ব, কর নির্বাণ প্রচার ।”

নীরব পূর্ণিমা-নিশি ; নিম্পন্দ নীরব
উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে স্থপ্ত ধরাতল ।
কুরাইল শেষ কথা ; ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব, ধীরে মুদিতা নয়ন ।
ভিক্ষুগণ এককণ্ঠে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন কণ্ঠিয়া ধ্বনিত—

“বুদ্ধং মে শরণম্ ।

ধর্মং মে শরণম্ ।

সজ্বং মে শরণম্ ।”

মহাকথা, মহাকণ্ঠ, শান্ত স্থগভীর
নৈশ নীরবতাসহ মিশাইল ধীরে ।
মিশাইল ধীরে পূণ্য-জ্যোৎস্নার সহ
নির্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক ;—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্বাণ ।
মহাতরু-তলে মহামূর্তি নির্বাণের
সমাধিস্থ, উদ্ভাসিত মহামহিমায়
পূর্ণিমার নিশীথের ফুল চন্দ্রকরে,
হইল স্থাপিত যেন মহা ঘোষাসনে ।
বসন্তের সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র-বর
হইল উজ্জ্বলতর, শান্তির অমৃত

ভাসিল সে চন্দ্রকরে, চলিল বহিষা
 বসন্তের নৈশানিলে, উঠিল ভাসিয়া
 চন্দ্রদীপ্ত গগনের নৈশ নীলিমায়,
 বসন্তের চন্দ্রদীপ্ত শ্রামল ধরায় ।
 শিষ্যগণ এককণ্ঠে ধ্বনিল—“নির্বাণ !”
 ধ্বনিল “নির্বাণ” স্থির শুদ্ধ শালবন ।
 “নির্বাণ” ধ্বনিলা শব্দী, নৈশ নীরবতা ।
 ধ্বনিল অনন্ত বিশ্ব—“নির্বাণ !” নির্বাণ !”
 মহাশোক পবিত্র হইল হৃদয়
 শিষ্যদের—সেই শোক শান্ত, সুগভীর,—
 অব্যত বিজ্ঞান সিদ্ধি একে, একে, একে
 শিষ্যগণ ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে
 করিল প্রণাম শেষ, করিল গ্রহণ
 শেষ পদধূলি, আর সে দেব-মুরতি
 নিরখিল শেষ এই জনমের মত ।
 ধূনিত কার্পাসে নব করিয়া আবৃত,
 অসিক্ত অরুচি তৈলে, করিল স্থাপিত
 দেব-দেহ সুচন্দন কাষ্ঠের চিতায় ।
 অস্ত গেল পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নখর ;
 অস্ত গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
 পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম জগতের ।
 শিষ্যগণ, ভারতের নৃপতিমণ্ডল,
 পুষ্পাবৃত ভাস্করাশি করিলা স্থাপিত
 দেশদেশান্তরে ; দস্ত করিলা স্থাপিত
 সিদ্ধুর অপর পারে সিংহলের পতি,
 মন্দির গগনস্পর্শী করিয়া নির্মাণ ।

অনন্ত মর্শ্বর-কাব্যে সেই দেবলীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হ'ল প্রতিষ্ঠিত,
মানবের মহাতীর্থ, জগত-বিস্ময় ।

যাও দেব ! লীলা শেষ । এসেছিলে তুমি
একবার ষমুনায় তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর !
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী ! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান ।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নিব্বার
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব । আসিয়া আবার
পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে ।
ভাসি প্রেম-অশ্রু-জলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঞ্চাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময় ! এই আশা করিও পূরণ ।

সমাপ্ত ।

সূচনা ।

—*—

সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি অবতারবাদ । ঈশ্বরের পুত্রই বল,
ঈশ্বরের বাল্যই বল, সকলই ঈশ্বর হইতে অংশী —
ঈশ্বরের অবতার । ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপঃ—
যখন যখন ঘটে, ভারত । ধর্মের শ্রানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃষ্টি আমি ।
সাধুদের পরিভ্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ ।

গীতা ৪—৭।৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণোক্ত অবতার-তত্ত্ব এইরূপঃ—

“জাতিতে জাতিতে”—যিগু কবিতা উক্তর—
রাজ্যে রাজ্যে, ঘটিবেক রণ ঘোরতর ।
ভূমিকম্প, মারিভয় দুর্ভিক্ষ অনল
ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনী মণ্ডল ।
তোমরা হইবে হত, স’বে অত্যাচার,
হইবে আমার তবে স্রণার আধার ।
তবে নর পরস্পরে হবে হিংসারিভ,
করিবে বিশ্বাস ডঙ্ক, হইবে স্রণিত ।
হবে লোক মিথ্যাদর্শ-শিক্ষকে বঞ্চিত,
অধর্মের প্রাহুর্ভাব, প্রেম নির্বাপিত ।

ধ্বংসের স্বগিত মূর্তি যবে দেবালয়
বিরাজিবে আসিবেন মানব-তনয় ।

মেথু, ২৪ অ ৭—২৭ ।

অতএব কৃষ্ণোক্ত ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই ।
কই, ইহাতে এমন ত কিছু নাই যে কৃষ্ণোক্ত অবতার কেবল
ভারতবর্ষে এবং খৃষ্টোক্ত মানব-তনয় কেবল ইহুদি দেশে জন্ম
গ্রহণ করিবেন । এতৎ সম্বন্ধে মহম্মদের মত কি জানিনা ! বোধ
হয় তিনিও এমন কিছু বলেন নাই যে ঈশ্বরের দূত কেবল আরব
দেশেই আবির্ভূত হইবেন । কৃষ্ণ এবং খৃষ্ট উভয়েরই মতে
যখন যেখানে ধর্মের অধঃপতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিবে,
তখন সেখানে ঈশ্বরের অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়া সাধুদিগের
পরিভ্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন
করিবেন । ঠিক একরূপ অংশুতেই বর্তমান জগতের ঈশ্বর
সকল—কৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ভারতে, খৃষ্ট ইহুদি দেশে, মহম্মদ আরবে
এবং চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । অতএব
সকল ধর্মাবলম্বীরা যে কেন এই মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বরের অব-
তার বলিয়া মানিবেন না, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা
উচিত । অন্ধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের এই এক ভ্রান্তিতেই জগত
আজি পর্য্যন্ত ধর্মবিদ্বেষে পরিপূর্ণ । এই এক ভ্রান্তি নিবন্ধনই
পৃথিবী কতবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে, এবং ধর্ম কি
ঘোরতর অধর্মের পরিণত হইতেছে । হায় ! ধর্মের প্রকৃত অর্থ
কি, মানুষ কি তাহা কখনই বুঝিবে না ?

যদি কিস্কিন্দ্রাত্তিও কেহ বুঝিয়া থাকে তবে ভারতীয় আধ্য-
ধর্মাবলম্বীরা । ইহাদের ধর্মের একটা আদি মন্ত্র—

“যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভাজি আমি।

পার্থ! সর্বরূপে নব যম পথ অনুগামী।”

গীতা ৩—১১।

তঁাহারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্মমত অনুসরণ করেন না।
অতএব, তঁাহাদের ধর্মের নাম নাই। তাহার একমাত্র প্রকৃত
নাম মানব-ধর্ম। সত্যই ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য।
মনস্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব অবস্থার মানবই ইহার
অধিকারী! শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই মনুষ্যত্বপথে অগ্রসর
হইবার জন্য অবস্থানুযায়ী সোপানশ্রেণী নিয়োজিত রহিয়াছে।
কুষোক্ত অহতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য
সকলই আর্ষ্যধর্মাবলম্বীদের কাছে অবতার স্বরূপ পূজনীয়।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আমি মেথু-প্রণীত খৃষ্ট-মাহাত্ম্য
হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তিপ্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত,
ও কবিতায় অনুবাদিত, করিয়া প্রকাশ করিলাম। অবশিষ্ট
ধর্মগুরু চতুষ্টয়ের এক্রপ জীবনী প্রকাশ করিবার আশা রহিল।
তাহা পূর্ণ হইবে কি না তঁাহারাই জানেন।

১ম অধ্যায় ।

জাগিলা জোসেফ, পালিলা দূতাজ্ঞা,
নিলা ভার্য্যা পুণ্যবান ।

গেলা বেংলেহেম নগরে সভার্য্যা
করিতে রাজস্ব দান ।

দীন হুজুর,— মিলিলনা স্থান
পাশ্চশালে তথাকার ।

অশ্বশালে তবে রহিলা হুজন,
জন্মিল তথা কুমার ।

হুতিকা-বসনে করিয়া জড়িত,
জননী সদ্য কুমার

রাখিলা অশ্বের আহার পাত্রেতে,
মিলিলনা স্থান আর ।

ছিল সে নিশিতে মেঘের গ্রহরী
যথায় রাখাঙ্গণ,

আসি স্বর্গ দূত বলসি গগন,
খোষিলা খুঁটে জনম ।

ঈশ্বরের গুণ গাইল আনন্দে,

বহু স্বর্গ দূত মিলিয়া সকল,—

"স্বর্গে ঈশ্বরের অত্যাচ্চ গৌরব,

ধরাতলে শান্তি, মানবে মঙ্গল,"

মেঘপাঙ্গণ জনক জননী

করিল শিশু দর্শন

সেই অশ্বশালে ; কহিল সকলে

করেছে যাহা শ্রবণ ।

ঈশ্বরের গুণ গৌরব গাইয়া

গেল চলি নিজ স্থান,

অষ্টম দিবসে, জোসেফ শিশুর
রাখিলেন যিশু নাম ।

২য় অধ্যায় ।

ইহুদী প্রদেশে হিরডের রাজ্যে
করিলে জন্ম গ্রহণ
এইরূপে যিশু ; পূর্বদিক হ'তে
দেখ ! আসি জ্ঞানিগণ
কহিল—“কোথায় ইহুদীর রাজ্য
জন্মিলেন যেই জন ?
অসিনু পূজিতে, পূর্বদিকে তাঁর
নক্ষত্র করি দর্শন ।”
শুনিয়া হিরড হইলেন ভীত,
ভীত নাগরিকগণ,
ডাকি পুরোহিত জিজ্ঞাসিল—“কোথা
লভিলে খুষ্ট জনম ?”
“বেৎলেহেম্ গ্রামে”— কহিল তাহারা—
“রয়েছে শাস্ত্রে লিখিত ।”
জিজ্ঞাসিল রাজা জ্ঞানীদেবে,— “কবে
হইল তারা লক্ষিত ?”
সেই নগরেতে প্রেরিয়া তাহাদেবে
কহিল নৃপতি সবে—

“অবেষিয়া শিশু পাইলে, আসিও,
আমিও পুজিব তবে।”

চলিল তাহারা ; চলিল সে তারা
করি পথ প্রদর্শিত,
রহে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যণা
ছিল শিশু বিরাজিত ।

দেখি তারা স্থির, আনন্দে অধীর
হইল সে জ্ঞানিগণ ।

প্রবেশিয়া গৃহে মাতার সহিত
করিল শিশু দর্শন ।

হইয়া প্রণত পুজিল তাঁহাকে,
খুলিয়া বহু ভাণ্ডার
করিল অর্পণ স্বর্ণ, সুসৌরভ,
নানাবিধ উপহার ।

ঈশ্বর-আদিষ্ট হইয়া স্বপনে
না ঘাইয়া পুনর্বার
হিরন্দের কাছে, গেল অত্র পথে
দেশে চলি আপনার ।

কহিল কোসেফে “ স্বপনে তখন
ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ—

“উঠ, লও শিশু, পালীও মিশরের,
তাহার জননী সহ ।

ধাকিবে ওথায়, যাবত আদেশ
না আনি দ্বিতীয় আর ।

খুজিবে শিশুকে নৃপতি হিরড
করিতে বিনাশ তার ।”

উঠিরা জোসেফ পলাল নিশীথে
 প্রস্থতি শিশু সহিত ।
 রহিল তথায়, যত দিন রাজ্য
 হিরড ছিল জীবিত ।
 হিরড যখন দেখিল জ্ঞানীরা
 করিয়াছে উপহাস ।
 করিল রাগাক্র, দুই বছরের
 অনধিক শিশু নাশ ।
 মরিলে হিরড, স্বপ্নে স্বর্গদূত
 আদেশিলে পুনর্বার,
 আসিল জোসেফ লয়ে পত্নী পু
 দেশে ফিরি আপনার ।
 গুনিল যখন হিরডের পুত্র
 হইয়াছে অধিপতি,
 গেলিলি প্রদেশে, “নেজারত” গ্রামে
 করিল ভয়ে বসতি ।

৩ অধ্যায় ।

জুডিয়ার বনে দীক্ষা গুরু ‘জন’
 হয়ে তবে উপনীত ।
 করিলা প্রচার— “কর অনুতাপ,
 স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত” ।
 উষ্ট্র লোমে তাঁর নিশ্চিত বসন ;
 চন্দ্র কটিবন্ধ আর

নহি যোগ্য আমি করিতে বহন
 চরণ পাত্ৰকা তাঁর,—
 কারবেন তিন অনলে দীক্ষিত,
 পবিত্র আত্মায় আর ।
 হস্তে কুলা, ভূমি করি পরিষ্কার,
 তুলি শত শত্যাগারে,
 পোড়াবেন তুষ, অনির্বাণ অগ্নি
 জ্বালাইয়া এ সংসারে ।
 'গেলিলি হইতে আসিলেন যিশু
 দীক্ষাতরে, কহে 'জন'—
 "তুমি কি আসিলে আমার নিকট ?
 আমি তব শিষ্যোপম ।"
 উত্তরিল। যিশু— "এরূপে উভয়
 করিব ধর্ম সাধন ।"
 হইয়া দীক্ষিত সলিল হইতে
 উঠিলেন যেই ক্ষণ,
 খুলিল জ্বিদিব, কপোতের মত
 পরমাত্মা এল নামি ;
 হ'লো দৈববাণী— "প্রিয় পুত্র এই,
 যাহে অতি প্রীত আমি ।"

৪ অধ্যায় ।

ঐরিলেন পরমাত্মা যিশুরে তখন
 মহারণ্যে, পাপহস্তে পরীক্ষা কারণ ।

চল্লিশ দিবস নিশি করি অনাহার
 হইলে ক্ষুধিত, কহে পাপ-অবতার—
 “ঈশ্বরের পুত্র যদি তুমি, আজ্ঞা কর
 হউক উপল বাশি কটি মনোহর ।”
 উত্তরিল। যিশু “নহে কটিতে কেবল,
 ঈশ্বরের বাক্যে নর বাঁচিবে সকল ।”
 তখন পাপিষ্ঠ তাঁকে করিয়া উত্তিত,
 করি এক মন্দিরের চূড়ায় স্থাপিত,
 হাসি ছবাচার তবে কহে কুতূহলে—
 “ঈশ্বরের পুত্র যদি, পড় ভূমিতলে ।”
 উত্তরিল। যিশু স্থির—“ঐতু তিহি তব,
 নাহি লবে ঈশ্বরের পরীক্ষা মানব ।”
 অতি উচ্চ শৈল শৃঙ্গে হুলি পুনর্বার,
 দেখাইয়া ধরারাজ্য, গৌরব তাহার,
 কহে—“এ সকল রাজ্য অর্পিব তোমায়ে
 কর যদি পূজা মম পঙ্কিষা ধরায় ।”
 যিশু উত্তরিল।—“দূর হও, ছবাচার ।
 ঈশ্বর—ঈশ্বর মাত্র উপাস্ত আমার ।”
 চলি গেল সম্মতান, স্বর্গ দূতগণ
 আসিয়া করিল তাঁর মহিমা কীর্তন ।
 যখন শুনিলা যিশু কারারুদ্ধ ‘জন’
 চলি গেলা গেলিলিতে বিষাদিত মন ।
 ছাড়ি ‘নেজারত’ গেলা সমুদ্রের তীর ।
 অন্ধকারে ছিল ঘরা, ভেদিয়া ভিমির
 দেখিল আলোক বাশি ; হইল সন্কার
 আলোক মৃত্যুর বাক্যে, ছায়াতে তাহার ।

করিলেন একত্রিংশ বর্ষে প্রচারিত —
 “কর অনুতাপ ; স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত ।”
 বেড়াইতে সিদ্ধুতীরে ‘এণ্ড’ ও ‘পিটার’
 দেখিলা হুতাই জাল করিছে বিস্তার
 কহিলা—“পশ্চাতে মম এস ভ্রাতৃদ্বয় ;
 নর-মন্ত্ৰধারী আমি করিব নিশ্চয় ।
 চলিল পশ্চাতে তারা, ‘জেম্‌স্’ আর ‘জন’
 আরো দুই জাল-জীবী মিলিল তেমন ।
 ভ্রমিতে লাগিলা তবে গেলিলি নগরে
 ধন্য উপদেশ দিয়া প্রতি ধর্ম-ঘরে,
 ধরাভলে স্বর্গ রাজ্য করিয়া প্রচার,
 আরোগ্য করিয়া রোগ বিবিধপ্রকার ।
 দেশ দেশান্তর হতে আসিতে লাগিল
 কত রোগী, কত লোক পশ্চাতে ছুটিল ।

৫ অধ্যায় ।

দেখি লোকানুগ্য যিত্ত, করিয়া গমন
 করিলেন এক উচ্চ গিরি আরোহণ ।
 তথায় থলিয়া মুখ, বসিয়া নির্জনে.
 এই রূপে দিলা শিক্ষা নিজ শিষ্যগণে—
 “ধন্য দীনাত্মার, স্বর্গ রাজ্য পাবে দীন,
 ধন্য শোকার্তেরা তারা পাইবে সাহসনা ;
 ধন্য বিনয়ীরা, ধরা হইবে অধীন,
 ধন্য পুণ্য-পিপাসীরা, পূরিবে বাসনা ।

ধন্ত দয়াদান, দয়া পাইবে তাহারা,
 ধন্ত নিরুলাভা, তারা দেখিবে ঈশ্বর,
 ধন্ত এই ধরাতে শান্ত-প্রদাতারা,
 ঈশ্বর-সন্তান নাম পাবে শ্রেষ্ঠতর ।
 ধন্ত যারা পবিত্রতা তরে উৎপীড়িত,
 স্বর্গ-রাজ্য তাহারাই পাইবে নিশ্চিত ।
 তোমরাও ধন্ত স'বে আমার কারণ
 কত মিথ্যা অপবাদ, কত উৎপীড়ন ।
 কর জয় জয়কার, হও আনন্দিত,
 স্বর্গে প্রতিদান তার পাবে আশাতীত ।
 তোমাদের পূর্ব-গামী যত জ্ঞানিগণ
 সহিয়াছে এইরূপে ঘোর উৎপীড়ন ।
 লবণ এ পৃথিবীর তোমরা সকল ।
 লবণের লবণহ হলে অপনীত,
 কিসে হবে লংগিত ? তখন দেবল
 ফেলে দেয় লোকে, করে চরণে দলিত ।
 আলোক এ পৃথিবীর তোমরা ধরায় ।
 গিরি শৃঙ্গে যে নগর লুপ্ত না যায় ।
 জ্বলি দীপ লোক নাহি রাখে লুপ্তায়িত ;
 রাখে দীপাধারে, গৃহ হয় আলোকিত ।
 তেমনি আলোক তব হউক উজ্জল
 মানব নয়নে, তব স্বকার্য্য সকল
 দেখিয়া তাহারা যেন গ'র পুলকিত
 স্বর্গস্থিত ঈশ্বরের গৌরব-সঙ্গীত ।
 আসি নাই আমি ধর্ম্ম করিতে সংহার ।
 সাধনা, সংহার নহে, উদ্দেশ্য আমার ।

আমি কহিতেছি সত্য, পৃথিবী আকাশ
যত দিন না হইবে লুপ্ত অপ্রকাশ,
যত দিন না হইবে সন্মার্থ-সাধন,
ধর্মের কণাও লুপ্ত হবে না কখন ।
এক ক্ষুদ্র ধর্মনীতি লজ্জিবে যেজন,
লজ্জিতে শিখাবে, স্বর্গ পাবে না কখন ।
সাধিবে আপনি, পরে শিখাবে যে জন,
স্বর্গ-রাজ্য হইবে সে প্রতিষ্ঠাভাজন ।
আমি কহিতেছি সত্য, ধার্মিকতা তব
শ্রেষ্ঠতায় যদি নাহি করে পরাভব
ধর্মব্যবসায়িগণ, 'কেরেশি' অধম,
স্বর্গ-রাজ্য তোমরাও পাবে না কখন ।
শুনেছ প্রাচীন মুখে,— 'করোনা হনন ;
যে করিবে হত্যা, দণ্ড পাইবে সেজন ।'
আমি কহিতেছি, ক্রোধ করিবে যেজন
অকারণে, হইবে সে দণ্ডের ভাজন ।
অপরে নিকোঁধ মাত্র যদি কেহ বলে,
নিশ্চয় সে হবে দণ্ড নরক অনলে ।
অতএব বেদিমূলে আনি উপহার,
হয় কোনো মনোবাদ স্বরণ তোমার,
কেলি উপহার গিয়া মনের মিলন
করিয়া ভ্রাতার সহ, পূজিও তখন ।
পছর করিবে তব বিবাদ ভঞ্জন,
পাছে শত্রু কারাগারে করে নিপতন ।
আমি কহিতেছি সত্য, হবেনা উদ্ধার,
যতদিন সর্বস্ব স্ত হবেনা তোমার !

তোমরা প্রাচীন কাছে করেছ শ্রবণ—
 ‘করিওনা পরদার তোমরা কখন।’
 আমি কহিতেছি, কাম নেত্রে যেই জন,
 অস্ত্র রমণীর প্রতি করে নিরীক্ষণ
 ব্যভিচার বাসনায, পূর্ণ পরদার
 করেছে সে কলুষিত হৃদয়ে তাহার।
 করে যদি পাপ তব দক্ষিণ নয়ন,
 করিও নিক্ষেপ তাহা করি উৎপাটন।
 মঙ্গল একটা অঙ্গ হয় বিনাশিত,
 না হইয়া সর্ব দেহ নরকে পতিত।
 গুনিয়াছ—‘যে করিবে পত্নীর বর্জন,
 বিবর্জন-পত্র তাহে করিবে অর্পণ।’
 আমি কহিতেছি—বর্জে যে নিজ কামিনী
 বিনা ব্যভিচার দোষে, তাহাকে শৈবিলী
 করে সেইজন ; সেই বর্জিতা বামায়
 যে করে বিবাহ, তার ঘটে পরদার।
 কহিয়াছে প্রাচীনেরা—‘করিয়া গ্রহণ
 শপথ ঈশ্বর নামে, করোনা লজ্জন।’
 তোমরা স্বর্গের নামে শপথ গ্রহণ
 করিও না, স্বর্গ ঈশ্বরের সিংহাসন ;
 কিংবা পৃথিবীর নামে,—ভায় পদাসন।
 কিংবা পুণ্যতীর্থ নামে,—নগর তাহার।
 কিংবা উপলক্ষ করি মন্তক তোমার।
 একটা মন্তক-কেশ করিতে তোমার
 যেত কিংবা কৃষ্ণ, বল আছে সাধ্য কার ?
 কেবল কহিবে কথা “হঁ, না” মাত্র সার।

ইহার অধিক যাহা পাপের আধার ।
 শুনিয়াছ—‘নেত্র বিনিময়েতে নয়ন,
 দস্ত বিনিময়ে দস্ত করিবে গ্রহণ ।’
 আমি তোমাদের কহি—পাপে কদাচিত
 হইও না প্রতিলব্ধী ; কেহ অনুচিত
 তোমার দক্ষিণ গণ্ডে গ্রহণিবে যবে,
 বাম গণ্ডে ফিরাইয়া দিও তারে তবে ।
 এক খানি বস্ত্রতরে যে চাহে বিচার,
 দিওতারে অল্প বস্ত্রখানিও তোমার ।
 বল ক্রমে এক ক্রোশ নিবে যেই জন,
 তার সঙ্গে দুই ক্রোশ করিবে গমন ।
 যেজন চাহিবে ভিক্ষা, করিবে প্রদান ;
 করিওনা ঋণপ্রার্থী জনে প্রত্যাখ্যান ।
 শুনেছ—‘বাসিবে ভাল প্রতিবেশিগণ,
 আপন শত্রুরে ঘৃণা করিবে তেমন ’
 আমি কহিতেছি—সবে বন্ধুর সমান
 শত্রুকে বাসিও ভাল । করিও প্রদান
 অভিশাপ বিনিময়ে আশীর্বাদ আর,
 ঘৃণা বিনিময়ে সবে দিও উপকার ।
 ঈর্ষা করে যেই জন, করে অভ্যাচার,
 মাগিও ঈশ্বর কাছে মঙ্গল তাহার ।
 স্বর্গে যেই পিতা তব করেন বিহার,
 হ’তে পার যেন সবে সম্মান তাঁহার ।
 পাপী, পুণ্যবানে দেয় তাঁর রবি কর ।
 সাধু অসাধুকে বর্ষে তাঁহার অম্বর !
 যে আমারে বাসে ভাল, ভালবাসি তারে,

কি মহত্ত্ব ? তা'ত করে যত ছরাচারে ।
 ক্ষণে ক্ষণে ভ্রাতারে করি প্রীতি সম্ভাষণ
 কি মহত্ত্ব ? করে নাকি নরকুলাধম ?
 অতএব হও পূর্ণ, পূর্ণ সনাতন
 তোমাদের স্বর্গস্থিত পিতার মতন ।

৬ অধ্যায় ।

“লোকের সমক্ষে, লোকে দেখাবার তরে,
 সাবধান ! করিও না কোনরূপ দান ;
 তাহা হ'লে পাইবেনা কোনো পুরস্কার,
 তোমাদের স্বর্গস্থিত জনকের স্থান ।
 করেনা হৃদুভি-ধ্বনি কর যবে দান,
 করে যথা পাইবারে লোকেতে স্নানাম
 ধর্মগৃহে, রাজপথে, ভণ্ড ছরাচার ;—
 পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার ।
 যখন করিবে দান, যেন সাবধান,
 দক্ষিণ কবের কার্য নাহি জানে বাম ।
 গোপনে করিলে দান, জনক তোমা'র
 দিবেন প্রকাশে তিনি পুরস্কার তার ।
 কর যবে উপাসনা, ভণ্ডের মতন
 করিও না ধর্মগৃহে, রাজপথে আর,
 দাঁড়াইয়া, আকর্ষিতে লোকের নয়ন,—
 পাবে তারা তাহাদের যোগ্য পুরস্কার ।
 প্রবেশি আপন কক্ষে, রুদ্ধ করি দ্বার,

কর উপাসনা তব অদৃশ্য পিতাব ।

গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার

প্রকাশে দিবেন তিনি পুরস্কার তার ।

কর যবে উপাসন মূর্খদের মত

করিও না পুনরুক্তি, ভাবে তারা মনে,

এক কথা তারা যদি কহে বারংবার

অবশ্য পশিবে তাহা ঈশ্বরশ্রবণে ।

তোমাদের কি অভাব ক্ষুদ্র মূর্খ নর,

চাহিবার আগে তাহা জানেন ঈশ্বর ।

বাক্য-আডম্বর নাহি করিয়া অসার

এই রূপে উপাসনা করিও তাঁহার—

‘আমাদের পিতা: ! স্বর্গে বিরাজিত,

পবিত্র তোমার নাম ।

তোমার এ রাজ্য ; স্বর্গে যথা, মর্ত্যে

হও তুমি পূর্ণকাম ।

দেও আমাদের দৈনিক আহার,

ক্ষম আমাদের ঋণ,

আমরা যেক্রূপে ক্ষমি আমাদের

• ঋণগ্রস্ত দীনহীন ।

করিও না লোভে পতিত কখন,

পাপ হ’তে কর ত্রাণ,

তোমারই রাজ্য, গৌরব বিভব,

চিরদিন ভগবন্ ।”

মানুষের দোষ যদি কর পরিহার,

ক্ষমিবেন তব দোষ জনক তোমার ।

মানুষের দোষ নাহি কর পরিহার,

ক্রমিবেনা তব দোষ জনক তোমার ।
 করিও না উপবাস ভণ্ডদের মত
 হুয়ে বিবাদিত, ক'রে মুখ কদাচার,
 জানাইতে লোকে তারা উপবাস-রত—
 পাবে তারা তাহাদের ষোণ্য পুরস্কার ।
 কর যবে উপবাস তোমরা এদন
 করিও হুতৈলসিক্ত, মুখ প্রক্ষালন ।
 তব উপহাস যেন লোকে নাহি জানে,
 করিবে গোপনে তব জনকের নামে ।
 গোপনে দেখিয়া তাহা জনক তোমার,
 প্রকাশ্যে দিবেন তিনি পুরস্কার তার ।
 করিওনা পৃথিবীতে অর্থের সঞ্চয়
 কাটে কীটে, করে যথা তঙ্করে হরণ ।
 স্বর্গেতে সঞ্চিত অর্থ, নাহি কাটে কীটে,
 না পারে তঙ্করে তাহা হরিতে কখন ।
 যেখানে করিবে তুমি অর্থের সঞ্চয়,
 সেখানে তোমার মন রহিবে নিশ্চয় ।
 দেহের আলোক নেত্র, এক-দৃষ্টি যদি
 হয় নেত্র, হবে তব দেহ দীপ্তিময় ।
 হয় সেই দৃষ্টি যদি পাপ নিরবধি,
 হবে অন্ধকারপূর্ণ দেহ সমুদয় ।
 অন্তর-আলোক যদি হয় অন্ধকার,
 সেই অন্ধকার কিবা ভীষণ আবার !
 করিতে দাসত্ব ছই প্রভুর কখন
 নাহি পারে কোন জন, নিশ্চয় সে জন
 একেবের বাসিবে ভাল, গিবে অপরে ;—

পারিবে না সেবিবারে ধন ও ঈশ্বরে ।
 জীবনের চিন্তা নাহি করিও কখন,—
 কি পাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান ।
 অসন হইতে শ্রেষ্ঠ নহে কি জীবন ?
 বসন ও দেহ তব নহেত সমান ?
 ওই দেখ আকাশের বিহঙ্গ নিচয়,
 না বুনেন, না কাটে শস্ত্র, না করে সঞ্চয় ;
 যোগান স্বর্গীয় পিতা তাদের আহাৰ,—
 তোমরা মানবগণ কত শ্রেষ্ঠ তার ।
 চিন্তা করি কে বাড়াতে পারে কলেবর
 এক হস্ত ? বস্ত্র তবে কেন চিন্তাপর ?—
 দেখ প্রান্তরের ফুল, জনমে কেমন !
 নাহি করে শ্রম তারা, না বুনেন বসন ;
 আমি কহিতেছি, তবু রাজা 'সলোমান'
 ছিল না সজ্জিত গর্বে একটি সমান ।
 আজ আছে, কালি হয় উননে পতিত
 যেই তুণ, তাকে যদি করেন ঈশ্বর
 একপে ভূষিত, তবে তোমায় ভূষিত
 'করিবেন ততোধিক, অবিস্বাসী নব ।
 অতএব চিন্তা নাহি করিও কখন
 কি পাইবে, কি পরিবে, কি করিবে পান ।
 —সংসারীও চাহ তাহা;—জানেন ঈশ্বর
 এ সব অভাব তব ; করিবেন দান ।
 সর্বাগ্রে ঈশ্বর-রাজ্য, পবিত্রতা তাঁর,
 অনুসর ; পাবে অন্ত অভাব তোমার ।
 অতএব কল্যাতবে তোমরা কখন

ভাবিওনা ; কলাতরে চিন্তা কর দূর ।
কল্য আপনার চিন্তা করিবে আপনি ।
অজিকার মত পাপ রয়েছে প্রচুর ।

৭ অধ্যায় ।

‘করোনা বিচার, পাছে হও বিচারিত ।
বিচার করিবে যথা, পাবে তথোচিত ।
যেই পরিমাণে তুমি করিবে প্রদান,
সেই পরিমাণে তুমি পাবে প্রতিদান ।
ভ্রাতার চক্ষের ভিল কর দরশন !
আপন চক্ষের তাল দেখনা কখন !
কেমনে করিবে তুমি ভ্রাতায় তোমার—
‘দেও নেত্র-ভিল আমি করি উৎপাটন
তোমার নয়ন হতে ।’ দেখ পরিষ্কার
তোমার নয়নে তাল রয়েছে তখন !
আগে তব নেত্র হতে, ভণ্ড হরাচার ।
আপন নয়ন-ভাল কর বিমোচন ;
ভ্রাতার নয়ন-ভিল তবে পরিষ্কার
দেখিয়া, পারিবে তাহা করিতে মোচন ।
কুকুরে পবিত্র যাহা দিওনা কখন ;
শূকরে যুকুতা নাহি করিও অর্পণ,
পাছে তাহা পদভলে করিয়া দলিত,
কিরিয়া তোমার দেহ করে বিদারিত ।
চাহ,— তবে তোমাতে তা’ হবে প্রদানিত,

খোঁজ,—তবে তোমরা তা' পাইবে নিশ্চিত,
 কপাটে আঘাত কর,—হবে উদ্ঘাটিত ।
 যে চাহে, সে পায় ; নহে যে খোঁজে, নিষ্ফল ;
 যে করে আঘাত, পায়, দ্বার অনর্গল ।
 তোমাদের মধ্যে আছে কে এমন নর,
 পুত্র যদি চাহে অন্ন, অর্পিলে পাথর ?—
 কিংবা চাহে মংগু যদি, দিবে বিষধর ?
 তোমরা মানব পাপী আপন সন্তানে
 দেও যদি এইরূপ দ্রব্য প্রীতিকর,
 দিবেন ত্রিদিবস্থিত পিতা তোমাদের,
 প্রার্থনাকারীকে দান কত শ্রেষ্ঠতর ।
 তুমি অপরের কাছে চাহ যেই মত,
 কর অপরের প্রতি,—ইহা নীতিগত ।
 প্রবেশ সঙ্কীর্ণ দ্বারে ; জানিও নিশ্চিত
 বিস্তীর্ণ কপাট, পথ অতীব বিস্তৃত
 বিনাশের ; সেই দ্বারে, সেই পথে, নর
 ধ্বংসপুণে সংখ্যাভীত পশে নিরন্তর ।
 সংকীর্ণ অপরিসর জীবনের দ্বার ;
 অতি অল্প লোক পায় সন্ধান তাহার ।
 কপট শিক্ষক দেখি করিও না ভুল ;
 মেষ চর্মাবৃত তারা ক্ষুধিত শাদ্দুল ।
 ফল দেখি তাহাদের পাবে পরিচয়,
 কণ্টকে না ফলে দ্রাক্ষা ফল সুধাময় ।
 একপে সুবৃক্ষে জন্মে সর্বত্রো অফল ।
 তেমতি কুবৃক্ষে জন্মে কুফল সকল ।
 সুবৃক্ষে কুফল নাহি ফলে কদাচিত ;

বরষিল বর্ষা, প্লাবিল প্লাবন,
 বহিল তুমুল ঝড়,
 আঘাতিল গৃহ, পড়িল ভূতলে,—
 কি পতন ঘোবতর
 একপে করিলে বিগু শিক্ষা সমাপন
 হইল সমস্ত শ্রোতা বিশ্বয়মগন।

৮ অধ্যায়।

পর্বত হইতে নামি প্রকুলিতমন,
 আদেশে আরোগ্য রোগী করি বহুজন,
 উঠিলা অর্ণবয়ানে শিবোর সহিত,
 হইল প্রচণ্ড ঝড়ে সিদ্ধ বিধূনিত।
 তরঙ্গে তরঙ্গে তরী নিমজ্জিতশ্রায়,
 নিরুদ্ভিন্ন তরীবক্ষে যিগু নিদ্রা যায়।
 শিবোরা ভাঙ্গিলে নিদ্রা, করি তিরস্কার।
 করিলা ঝটিকা শাস্ত, স্থির পায়বাব।
 ভূতগ্রস্ত বহু নর করিয়া উদ্ধার
 অস্ত্রতীরে, আসিলেন ফিরিয়া আবার।
 পাপী নরাধম সহ করিতে ভোজন
 বসিলা স্বশিষ্য সহ ; দেখি শত্রুগণ
 হাসিতে লাগিল ; যিগু কহিলা তখন—
 “নীরোগীর চিকিৎসা নাহি প্রয়োজন।
 “চাহি আমি দয়া, নাহি চাহি বলিদান,
 “আমি আসিযাছি পাপী করিবারে জ্ঞান।”

জিজ্ঞাসে ‘জনের শিষ্য—“আমরা সকল
করি উপবাস, কেন তব শিষ্যদল
নাহি করে প্রভু !” যিশু উত্তরিলে হাসি—

“বরষাত্রী কখন কি থাকে উপবাসী ?

“যেই দিন সেই বর হবে অন্তর্হিত,

“কন্নিবেশ উপবাস তারা সমুচিত ।

“পুরাণ বস্ত্রে ছিছে নূতন কাপড়

“তালি দিলে, হয় ছিছ আরো বৃহত্তর ।

“রাখিলে পুরাণ পাত্রে মদিরা নূতন,

“ভাদ্রি পাত্র হয় হারা ভুলে পতন ।

“নব সুরা নব পাত্রে করিলে সঞ্চয়,

“হইবেনা ভয়, হবে রক্ষিত উভয় ।”

ঘাটাইয়া মৃতে, অন্ধে করি চক্ষুদান,

মৃতে দিয়া বাক্য, পাপী করি পরিত্রা ,

ভ্রমিতে লাগিল যিশু নগরে নগরে,

প্রচারিয়া ধর্মরাজ্য প্রকুল অন্তরে ।

বহুলোক সমাগম করি দর্শন,

দয়ায় হইল তাঁর সাক্ষর মন,

বিহীন বক্ষুহীন মেঘপাল মত,

ভ্রমিতেছে পৃথ্বীরা ভ্রাস্ত্র নর বত ।

“কি প্রচুর শত্রু ।”—শিষ্যে কহিল কাতরে—

“কুবক কয়টী মাত্র, কে সঞ্চয় করে ?

“শত্রে জয় কাছে মাগ, বৎসগণ !

“কঙ্ক এ শত্রে তাঁর কুবক প্রেরণ ।”

ডাকিয়া ঘাদন শিষ্যে করিলা আদেশ,—

“পৃথ্বীরা মেঘপালে করিয়া প্রবেশ

“করগে প্রচার—স্বর্গরাজ্য উপাস্থত,
 “উদ্ধারি পীড়িত, মৃত করিয়া জীবিত ।
 “লইওনা সোণারূপা দ্বিতীয় বসন,
 “যে যেমন ভোগী, হয় কর্মীও ডেমন ।
 “যথা দেখ শ্রদ্ধাবান তিষ্ঠিও তথায়,
 “অশ্রদ্ধাবানের স্থান ত্যজিবে তথায় ।
 “যেতেছ তোমরা ব্যাঘ্রনখ্যে মেঘ মত,
 “ভুজঙ্গ হইবে জ্ঞানে, কর্মে পারাবত ।
 “খোরতর নির্ঘাতন সহিবে যখন,
 “কি করিবে, কি কহিবে, ভেবোনা কখন ।
 “আছেন পিতার আত্মা অন্তরে সবার,
 কহিবেন তিনি, যন্ত তোমরা তাঁহার ।
 “হবে তোমাদের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন,
 “সহিও, পাইবে তবে মুক্তি শিবাগণ ।
 “প্রচ্ছন্ন যা’ আছে, তাহা হবে প্রকাশিত,
 “অজ্ঞাত যা’ আছে জ্ঞানে হইবে বিদিত ।
 “কহিতেছি অন্ধকারে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত,
 “আলোকে করিও তাহা জগতে ঘোষিত ।
 “কহিতেছি যাহা কর্ণে, মুখে সবাচার
 “গৃহচূড় হ’তে তাহা করিও প্রচার ।
 “বাহারা শরীর তব করিবে সংহার
 “তাদেরে তোমরা ভয় করোনা কখন ;
 “সামিবে বিনাশ যাহা দেহ ও আত্মার
 “নরকেতে, তাহারাই ভয়ের কারণ ।
 “দেখেছ চড়ই পাখী কত ক্ষুদ্র প্রাণী,
 “পরসায় হ’টা মিলে ; কহিতেছি আমি

“ঈশ্বরের অনিচ্ছায় বৎস ! কদাচিত্ত
 “তাহারাও ধরাতলে না হয় পতিত ।
 “তোমাদের মন্তকেতে আছে যত চুল,
 “তাহাও জানেন তিনি নাহি তাহে ভুল ।
 “করিওনা ভয় তবে, মানব সন্তান
 “চড়ই পাখীর চেয়ে কত মূল্যবান ।”
 কহে একজন—“তব মাতা ভ্রাতাগণ
 দেখে দাঁড়াইয়া এই চাহে দরশন ।”
 তার মুখ নাহি দ্বিগু করিলা উত্তর—
 কে আমার মাতা ? কারা মম সহোদর ?”
 শিষ্যদের প্রতি কব করিয়া বিস্তার
 কহিলেন—“মাতা ভ্রাতা ইহারা আমার ।
 যাহারা পালিবে ইচ্ছা স্বর্গীয় পিতার,
 তাহারাই মাতা ভ্রাতা ভগিনী আমার ।”

৯ অধ্যায় ।

তীরস্থ অর্ণবখানে করি আরোহণ
 সমাগত লোকগণে করি সম্বোধন
 কহিলা একদা যিও—“গুন বৎসগণ ।
 জনৈক কৃষক শস্য করিল বপন ।
 পশুপার্শ্বে যত শস্ত্র হইল পতন,
 পাখীগণ আসি তাহা করিল ভক্ষণ ।
 কতক বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে প্রকুরিত
 মূলহীন, বহিকরে হইল দাহিত ।

কণ্টকিত ক্ষেত্রে কিছু হইয়া পতিত,
 মরিয়া হইয়া সব কণ্টকে আবৃত ।
 কতক ক্ষেত্রে পড়ি কুরিল প্রদান
 সুফল সহস্রগুণ, বহুমূল্যবান ।
 শুনি স্বর্গরাজ্য-কথা না বুঝে যে জন,
 তার চিন্তা পন্থ-পার্শ্ব-ক্ষেত্রের মতন ।
 শস্যরূপ শিক্ষা নাহি হাতে অঙ্কুরিত,
 পাপ বিহঙ্করণ তাহা করে বিনাশিত ।
 আনন্দে ধর্মের কথা করিয়া গ্রহণ,
 উৎপৌড়ন-ভয়ে যারা না করে পালন,
 বন্ধুর ক্ষেত্রের মত তাদের হৃদয়,
 ধর্মের শস্যে ব স্থায়ী মূল নাহি হয় ।
 অর্থের কুহকে আর সংসার চিন্তায়,
 সাহাব হনয়ে ধর্ম স্থ ন নাহি পায়,
 জঙ্গলে কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রের মতন,
 ধর্মের সুফল তাহে জন্মে না কখন ।
 শুনিয়া ধর্মের কথা বুঝে গেই জন,
 দৃঢ়তা সহিত চিন্তে যে করে গ্রহণ,
 উৎসব-ক্ষেত্রের মত তাহার হৃদয়
 সুফল সহস্রগুণ প্রসবে নিশ্চয় ।
 আবার কহিলা যিশু—“কৃষী এক জন
 শস্য ক্ষেত্রে তার কয়িল রোপণ ।
 ভূতাগণ যবে তার হইল নিদ্রিত,
 কুশস্ত শত্রুরা আসি করিল রোপিত ।
 যখন জগিল তৃণ দেখি সবিস্ময়,
 শস্য কুশস্ত ক্ষেত্রে জন্মেছে উত্তর, ”

ভৃত্যোবা প্রভুর কাছে সমাচার দিয়া
জিজ্ঞাসিল, কুশস্ত্র কি ফেলিবে তুলিয়া ।
নিবারণি কহিলা প্রভু—‘কুশস্ত্র এখন ।
তুলিতে, কুশস্ত্র পাছে কর উৎপাটন ।
থাকুক এখন, যবে কর্তনসময়
আসিবে, তুলিয়া আগে কুশস্ত্র নিচয়,
বাধিয়া অনলে তবে পুড়ি সমুদয়,
কুশস্ত্র গোলায় মম করিও সঞ্চয় ।’
কুবক ঈশ্বর-পুত্র, ক্ষেত্র ধরাধাম,
কুশস্ত্রের বীজ ধর্ম-রাজ্যের সন্তান ;
সম্মতান সেই শত্রু, কুশস্ত্র-নিচয়
তাহার সন্তানগণ পাপী হরাশয় ।
প্রলয় কর্তন-কাল, স্বর্গদূতগণ
প্রেরিয়া ঈশ্বর-পুত্র, করি আহবান
পাপিগণ অনলেতে করিবে অর্পণ,
উত্তিবে বোদনধ্বনি দন্তের ধ্বংস ।
শোভিবে পুণ্য-ত্রা স্বর্গে সূর্য্যের মতন,—
আছে যার কর্ণ, ইহা করুক শ্রবণ ।”

১০ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মজায়া সহ ‘হিরদেব’ ব্যভিচার
নিম্নিলে মহর্ষি ‘জন’, হিরদ তাঁহার
কাদাগারে কাটি শির, করিলা প্রেরণ
অশ্বপুষ্ঠে, উপপত্নী ‘হিরদা’ সদন ।

শুনিয়া নৃশংস বার্তা তরী-আরোহণে
 চলি গেলা শিষ্য সহ যিহু এক বনে ।
 পাঁচটা রুটীতে মাত্র,—অদ্বুত এমন,—
 করাইলা নর পঞ্চসহস্র ভোজন ।
 ইহাটি সিদ্ধবক্ষে তরী করি আরোহণ,
 নানাদেশ দেশান্তর করিলা ভ্রমণ,
 সর্বত্র নূতন ধর্ম কয়িয়া প্রচার,
 অলৌকিক বহু কার্য সাধি বারংবার ।
 কহিলা একদা লোকে—“মুখে যাহা যায়,
 তাহাতে মানুষ নাহি করে কলুষিত ;
 মুখ হ’তে আসে যাহা, মানুষ তাহায়
 করে কলুষিত মাত্র, জানিও নিশ্চিত ।
 মুখে যাহা যায়, তাহা প্রবেশি উদরে
 হয় ধ্বংস ; আসে যাহা মুখ হ’তে আর,
 হৃদয় হইতে তাহা জানিও নিঃসরে ;—
 মানব হৃদয় সর্ব পাপের আধার ।
 দেবন্দীয়া, চুরি, মিথ্যা, হত্যা, পরদার,—
 হৃদয় হইতে হয় উত্থান সবার ।
 যেই বৃক্ষ নহে মম পিতার বোপিত,
 নিশ্চয় জানিও তাহা হবে উৎপাটিত ।
 অন্ধের পরিচালক সেই অন্ধগণ,
 ভোমরা তাদের কাছে যাবেনা কখন !
 অন্ধলোক করে যদি অন্ধেরে চালিত,
 নিশ্চয় উভয় কুপে হইবে পতিত ।”
 কহিলে বিপক্ষগণ—“ঈশ্বরকুমার
 যদি তুমি, চিহ্ন তবে দেখাও তাহার”,

কহিলেন যিশু—“ওরে ভণ্ড নিরাধম !
 আকাশের চিহ্ন সব করিয়া দর্শন ।
 স্বদিন কুদিন পার করিতে বিচার,
 পড়িতে কালের চিহ্ন পার নাকি আর ?
 পাণীরাই করে শুধু চিহ্ন অবেষণ,
 তাহারা দেখিতে চিহ্ন পারে না কখন ।”
 জিজ্ঞাসিলা শিষ্যে—“কহ কে আমি ? পিটার !”
 উত্তরিল—“তুমি খৃষ্ট, ঈশ্বর-কুমার ।”
 “নহে তব কথা ইহা, স্বর্গীয় পিতার ।
 করিওনা ইহা জনসমাজে প্রচার ।”—
 উত্তর করিলা যিশু । সে দিন হইতে
 কহিতে লাগিলা শিষ্যে, হইবে সহিতে
 ধর্মযাজকের করে ঘোর অত্যাচার,
 ঘটিবে তাদের করে নিধন তাঁহার ।
 কহিলেন শিষ্যাগণে—“পশ্চাতে আমার
 যে বাবে, আশ্রয় করি আশ্রয়-পরিহার ।
 যে রক্ষিবে প্রাণ, তাহা হারাইবে, শ্রায় ।
 যে হারাবে মম তরে, পাইবে তাহার ।
 লভিয়া সকল বিশ্ব, হারালে আশ্রয়
 পাপের অতল গর্ভে, কি লাভ তাহার ?
 পিতার গোরবে পুল হইবে উপনীত,
 স্বর্গদূতগণ সহ হইয়া বেষ্টিত,
 এইরূপে স্বর্গরাজ্যে করি অধিষ্ঠান,
 কর্ম-অনুসারে ফল করিবেন দান ।”
 একদা করিয়া যিশু গিরি আরোহণ,
 মহান মূর্তি এক করিলা ধারণ ।

প্রদীপ্ত ভাস্কর মত ভাঙিল বদন,
 অমল আদ্যেক মত শোভিল বসন ।
 পূর্ব-ধন্বশিঙ্গকেরা করিয়া বেষ্টন,
 করিতেছে তাঁর সহ স্মৃতে আলাপন ।
 আসিয়া একটি মেঘ অমল উজ্জল,
 দেখিতে, দেখিতে, দেখ ঢাকিল সবল ।
 মেঘ হতে দৈববাণী হইল ভবন—
 “এই মম প্রিয়পুল, প্রীতির ভাজন ।”
 শুনি ভয়ে শিষ্যগণ পড়িল ধরাষ ।
 যিশুর সম্পর্শে উঠি বিশ্বয়ে তথায়
 দেখিল একক যিশু, কিছু নাহি আর ।
 নিষেধিলা ইহা নাহি করিতে প্রচার ।
 একদা জিজ্ঞাসে শিষ্য—“তঁাহার মহন
 না পারে আরোগ্য কেন করিতে সাধন,
 তাদের আদেশে পীড়া না হয় অন্তর ।”
 “অবিশ্বাস হেতু ;”—যিশু করিলা উত্তর—
 “আমি কহিতেছি, তব বিশ্বাস অন্তরে
 থাকে যদি এক ক্ষুদ্র শতপরিমাণ,
 যদ্যপি আদেশ কর ওই গিরিবতে—
 ‘হুও স্থানান্তর !’ উহা তেয়্যাগিবে স্থান ।”

১১ অধ্যায় ।

জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ এক দিন আ,
 “স্বর্গবাজ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন কাহার ?”

একটি শিশুকে ডাকি অন্ধে বঁসাইয়া
 কহিলেন শিষ্যগণ শিশুকে চাহিয়া,—
 “না হ’লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
 স্বর্গরাজ্যে পারিবেনা পশিতে কখন।
 যে হবে বিনীত এই শিশুর মতন,
 সেই জন স্বর্গরাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম।
 এক্রপ একটি শিশু যে করে গ্রহণ
 মম নামে, আমাকেও পাবে সেই জন।
 যে হিংসে একটা শিশু, হয় সেই জন
 গলায় বাঁধিয়া শিলা সমুদ্রে পতন।
 স্বর্ণিওনা শিশুদেবে, স্বর্গে শিশুঘত
 স্বর্গস্থ পিতার মুখ নিরখে সতত।
 মনে কর, কারো যদি থাকে শত মেঘ,
 তাহার একটি করে অপথে গমন,
 ফেলি উনশত, করি অরণ্যে প্রবেশ,
 বক্ষক কি নাহি করে তার অবেষণ ?
 সেইরূপ ইচ্ছা নহে স্বর্গীয় পিতার,
 এক্রপ একটা শিশু হউক সংহার।
 তোমার ভ্রাতায় যদি করে অপরাধ,
 উভয়ে মিলিয়া মিটাইও মনোবাদ।”
 জিজ্ঞাসিল শিষ্য—“দোষ আপন ভ্রাতার
 ক্ষমিব কি সাতবার, কিংবা কত বার ?”
 শিশু কহিলেন—“এই আদেশ আমার,—
 সাতবার। ক্ষমিবে তাঁ’ সাত শতবার।
 এই হেতু স্বর্গরাজ্য সে রাজার মত
 লইত যে ভৃত্যদের হিলাব সতত।

ভূত একত্বেহলো দশসহস্র মুদ্রায়
 দায়ী নৃপতির কাছে ; শোধের উপায়
 নাহি কিছু । আদেশিলা নৃপতি তখন
 পত্নীপুত্র সহ তার বিক্রীর কারণ ।
 পদতলে পড়ি ভূত, অশ্রু ছলছল,
 কহে—‘ধৈর্য্য ধর প্রভো ! শোধিব সকল ।’
 নৃপতির অন্তে হ’ল দয়াব সঞ্চার,
 তখন সমস্ত ঋণ ক্ষমিলা তাহার ।
 কিন্তু সে ভূতের কাছে ভূত অগ্নজ্ঞান
 ধারিত পয়সা শত, তাহার কারণ
 ধরিয়া খলায় তার, করিয়া প্রহার,
 কহিল—‘এখন দিবি ধারিস্ যে ধার ।’
 পায় পড়ি অশ্রুপূর্ণনেত্র ছলছল
 সে কহিল—‘ধৈর্য্য ধর, শোধিব সকল ।
 মানিল না হুঁচাচার, সেই অভাগারে
 করিল ঋণের তরে বন্দী কারাগারে ।
 তনিয়া নৃপতি ক্রোধে আরক্ত নয়ন
 কহিলেন—‘ওরে ছুষ্ট পাপী নরাধম !
 কহিহু যেকপ দয়া আমি তোর প্রতি,
 না করিলি তুই অন্য প্রতি রে তেমতি ।’
 ক্রোধে আজ্ঞা দিল রাজ্য করিতে পীড়ন
 ষত দিন ঋণ তার না করে মোচন ।
 নিজ ভ্রাতৃদোষ নাহি ক্ষমিবে যেজন
 স্বর্গস্থ পিতার কাছে পাইবে তেমন ।’
 একদা জিজ্ঞাসে আসি যুবা একজন—
 ‘কিসে, প্রেষ্ঠ প্রভো পাব অনন্ত জীবন ?’

উভয়িলা—“আমি শ্রেষ্ঠ, কহিলে কি মতে ?”

এক ভিন্ন শ্রেষ্ঠ নাহি দ্বিতীয় জগতে ।

তিনিই ঈশ্বর, চাহ অনন্ত জীবন,

দশ-আজ্ঞা সমুদয় করগে পালন ।”

যুবা কহে—“পালিয়াছি সেই সমুদয়

যৌবন হইতে আমি, বাকি কিবা আর ?”

কহিলেন—“যাহা আছে করিয়া বিক্রয়,

দিয়া দরিদ্রকে, এস পশ্চাতে আমার ।”

তুনি যুবা গেল চলি খেদান্বিতমন,

কারণ আছিল তার বহুতর ধন ।

তখন কহিলা যিও চাহি শিষ্যগণ—

“ধনীলোক স্বর্গরাজ্য পাবে না তখন

বায় যদি উড়ে, ক্ষুদ্র হুচীরকপথে,

ধনী স্বর্গে পারিবে না যেতে কোন মতে ।

মমতরে সর্বস্ব যে করিবে বর্জন,

পাইবে সহস্রগুণ, অনন্ত জীবন ।”

কহিলেন পুনঃ—“তুন । গৃহী একজন

একদা করিল বহু লোক নিষোজন ।

কেহ প্রাতে, কেহ বেলা দ্বিতীয় প্রহরে,

চতুর্থ প্রহরে কেহ নিষোজিত করে ।

সন্ধ্যাকালে সকলেই সম্মান বেতন

পয়সা, পয়সা, গৃহী করিল অর্পণ ।

প্রভাত হইতে যারা করিয়াছে শ্রম

তাঁহারা কহিল—‘তব বিচার কেমন !

সমস্ত দিনের বোঝা, যোজ্ঞ খরচর,

সহেছি আশা শ্রম করি নিরন্তর ।

চতুর্থ ঐহরে যারা হলো নিষোদ্ধিত,
তাদের সমান ভাবে পাওয়া কি উচিত ?
উত্তারল গৃহী—ভাই ! কি বল অথবা ?
তোমাদের সঙ্গে মম এই ছিল কথা,—
পয়সা বেতনে কর্ম করিবে আমার ।
পাইয়াছি, গৃহে যাও, কি ক্ষতি তোমার ?
করিবারে ত্যজ, যথা বাসনা আমার,
* আমার অর্থ, কি মম নাহি অধিকার ?
আমি ভাল,—এই হেতু, ইহার কারণ,
পাপে পূর্ণ তোমাদের হয় কি নয়ন ?”

১২ অধ্যায় ।

ফিরিলেন রাজধানী ;* অলিত পর্বতে পথে
বিশ্রাম করিয়া কিছুক্ষণ ;
প্রবেশিলা নগরেতে, সবৎসা গর্দভী এক
করিয়া আনন্দে আরোহণ ।
আসি বহুতরলোক দিল পথে বিছাইয়া
অঙ্গের বসন আপনার ;
কেহ বৃক্ষশাখা কাটি, পল্লবে ছাইল পথ,
করে সবে জয় জয়কার ।
প্রবেশিলা দেবালয়ে, বাহারা বিক্রম জয়
করিতেছে, দিলা তড়াইয়া ;

ভাঙ্গিয়া বিপণি সার, করি সব চুরমার
 দ্রব্য সব দিগা ছড়াইয়া ।
 কহিলেন—“গৃহ মম মন্দির উপাসনার,
 নহে ইহা তত্ত্ব-বিবর ।”
 অন্ধ চক্ষু, পঙ্গু পদ, লভিল পরশে তাঁর;
 যাজকেরা বিস্মিত অন্তর ।
 কহি বহু প্রহেলিকা, কহি না যাজকপণে—
 “স্বর্গরাজ্যে সেই রাজা মত,
 যে পুত্রের বিবাহের, করি বহু আয়োজন,
 ডাকিবারে নিমন্ত্রিত যত,
 পাঠাইয়া ভৃত্যগণ, কিন্তু কেহ আসিল না;
 তুচ্ছকরি নিমন্ত্রণ তাঁর,
 কেহ গেল কুবিক্ষেত্রে, কেহ গেল বিপণিতে
 কেহ ভৃত্য করিল সংহার ।
 রাগান্বিত হইয়া রাজা, প্রেরি সৈন্যগণ তবে!
 তাহারে করিয়া সংহার,
 ভাঙ্গিয়া নগর সব, কহিলেন ভৃত্যপণে—
 “নিমন্ত্রিত অযোগ্য আমরা ।
 যাও সবে রাজপথে, পথিক ডাকিয়া আন ।”
 ভাল মন্দ আসিল তখন ।
 দেখিলেন একজন, বিবাহের উপযোগী
 পরিধান করেনি বসন ।
 জিজ্ঞাসিলা নরপতি— “বিবাহের বস্ত্র বিনা
 কেমনে করিলে আগমন ?”
 আজ্ঞা দিলা—“বাধি তাকে কেলে দেও অন্ধকারে
 দস্তে দস্তে করুক ঘর্ষণ ।”

এইরূপে স্বর্গরাজ্যে হইবে আহুত বহু,
 কিন্তু অন্ন হবে মনোনীত ।
 চিন্তিল যাজকগণ, যিশুকে করিবে কিসে
 আপনার কথায় জড়িত ।
 কহে তবে একজন— “জানি প্রভো ! সত্য তুমি,
 ঈশ্বরের সত্য পথ আর
 শিখাইছ আমাদের, মাফে কর না গ্রাহ
 ভয় তুমি করনা কাহার ।
 কহ তবে আমাদের— নৃপতিকে রাজ-কর
 আমাদের দেওয়া কি উচিত ?”
 উত্তরিল— “ওরে ভণ্ড ! আম'য় করিতে কেন
 চাহ, বল, বিপদে পতিত ?
 দেখি কিসে দেও কর ?” দেখাইলে মুদ্রা এক,
 জিজ্ঞাসিল যিশু পুনর্বার—
 “অঙ্কিত এ মূর্তি কার ?” “নরপতি কৈসরের ।”
 —দিল সবে উত্তর তাহার ।
 উত্তর করিল যিশু— “কৈসরের বাহা, সবে
 কর তাহা কৈসরে অর্পিত ।
 ঈশ্বরের বাহা আর, ঈশ্বরে কর অর্পণ ।”
 যাজকেরা হইল বিস্মত ।
 নীতিব্যবসায়ী * এক ছল করি জিজ্ঞাসিল—
 “আমাদের স্বর্গশাস্ত্রে, বল
 কোন নীতি সর্বশ্রেষ্ঠ ?” উত্তর করিল যিশু
 নৈরদ্বয় প্রীতি-ছলছল—

“আত্মা, মন, হৃদয়ের আহিত করিবে প্রেম
 ঈশ্বরের, বিধাতা তোমার ;—
 এই নীতি আদি নীতি, এই নীতি সর্বশ্রেষ্ঠ !
 সমতুল্য দ্বিতীয় তাহার—
 আপনার মত ভাল বাসিবে প্রতিবাসীকে ।
 এই দুই নীতির উপর,
 সমুদয় ধর্মশাস্ত্র, সমস্ত ধর্মশিক্ষক,
 করিতেছে সকলি নির্ভর ।
 উপস্থিত শিষ্যগণে, সম্মাগত সমারোহে
 কহিলেন যিও অনন্তর—
 “মুসার * আসনে, দেখ, বসিয়াছে যাজকেরা,
 তাহাদের-অঙ্ক অনুচর *
 শিক্ষা তারা দিবে যাহা পালন করিও তাহা ;
 কিন্তু করিও না কদাচন
 তাহারা করিবে যাহা ; কারণ, জানিও, তারা
 কহে যাহা, করেনা কখন ।
 গুরুতর ভাব তারা, মানুষের স্বকোপরে
 ক্লেশকর করিবে স্থাপিত ।
 নিজে তারা করিবেনা, চালাইতে সেই ভার,
 একটা অঙ্গুলী সঞ্চালিত ।
 দেখাইতে মানুষেরে করে তারা কর্ম, আর
 করিবারে উদর পূরণ ।
 ভোজনে, কি দেবালয়ে, সর্বত্র দেখিবে তারা
 করে উচ্চ আসন গ্রহণ ।

হাতে মাঠে চাথে তারা সর্বত্র সকলে মিলি
 “প্রভো ! প্রভো !” ডাকুক কেবল ।
 তোমাদের এক মাত্র খুষ্ট প্রভু অদ্বিতীয় ;
 ভ্রাতা মাত্র তোমরা সকল ।
 পৃথিবীর কোনো নরে, পিতা বলি তোমাদের
 ডাকিও না তোমরা কখন,
 তোমাদের এক মাত্র পিতা তিনি অদ্বিতীয়,
 স্বর্গে তাঁর পবিত্র আসন ।
 তোমাদের মধ্যে বড় যেই জন, হইবে সে
 তোমাদের ভূতা অনুগত,
 যে ভাবে—“উন্নত আমি” নিশ্চয় সে হবে নত,
 নত যে. সে হইবে উন্নত ।
 রে ধর্মরাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
 তোদের ঘটিবে পরিতাপ !
 মানুষের স্বর্গদ্বার তোরাষ্ট করিস্ রুদ্ধ,
 করিস্ রে স্বর্গ অপলাপ !
 আপনি বাবিনা তোরা, তাদেরও নাহি দিবি
 স্বর্গ রাজ্যে করিতে প্রবেশ ;
 রে ধর্মরাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !
 তোদের ঘটিবে ঘোর ক্লেশ !
 অনাথা বিধবাদের করিস্ সর্বস্ব গ্রাস,
 ধর্মের করিয়া মিছা নাম ।
 এহেতু তোদের, ওরে ! ঘটিবে অধিকতর
 নরকেতে বাস অবিরাম ।
 একটি শিষ্যের তরে খুজিস্ সসিদ্ধ ধরা,
 যদি বা মিলিল একজন,

তাহাকে তোদের চেয়ে করিস্ দ্বিগুণতর

নরক-সন্তান, নরাধম ।

রে ভণ্ড ষাজকগণ ! পাইবিরে পরিতাপ ।

দিস্ যত তুচ্ছ উপহার ;

দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, নীতি, করিস্ না কদাচিত্

ঈশ্বরের নামে অনুসার ।

দিস্ উপহার তাহে নাহি ক্ষতি, কিন্তু বল

এ সবে কি নাহি প্রয়োজন ?

অন্ধ শিক্ষকগণ ! মশাটি গিগিতে কষ্ট,

কিন্তু উষ্ট্র করিস্ ভক্ষণ ।

রে ধর্ম্মষাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !

তোদের ঘটিবে পরিতাপ ।

তোদের ভোজনপাত্র বাহিরেতে পরিক্ষার,

অন্তরেতে পরিপূর্ণ পাপ ।

রে ধর্ম্মষাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম !

পরিতাপ পাবি ঘোরতর ।

শ্বেত সমাধির মত, বাহিরে গন্ধর তোরা,

কদর্য্যোতে পূর্ণিত অন্তর ।

তেমতি বাহিরে তোরা ধান্দিক, পূর্ণিত কিন্তু

পাপ প্রবন্ধনায় হৃদয় ।

রে ধর্ম্মষাজকগণ ! ওরে ভণ্ড নরাধম ।

পরিতাপ পাইবি নিশ্চয় ।

ধর্ম্ম প্রচারকদের সমাধি নির্মাণ করি,

কত মতে করিস্ সাজ্জত ;

কহিস্—এদের হত্যা পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত

করিস্ না তোরা কদাচিত্ ।

থাক সাক্ষী, ইহাদিগে যাহারা কহিল হত্যা,

তোরাই ত তাদের সন্তান,

ভূজঙ্গ ! বৃশ্চিক-বংশ ! নরক হ'তে তোরা

কেমনে পাইবি পরিত্রাণ ?

আমি যেই জ্ঞানিগণ, শিক্ষক, যাজকগণ,

শ্রেণিব তোদের শিক্ষাতরে,

বধিবি তাদের তোরা কিংবা করি বেত্রাঘাত

তাড়াইবি নগরে নগরে ।

মন্দিরে, বেদির আগে, পূণ্যাগাগণের তোরা

যত রক্ত করেছিস্ পাত,—

পূর্ব পুরুষের পাপ পূর্ণ কর ! এ পুরুষে

ধটিবেক সে অভিসম্পাত ।

হায় ! হত রাজধানি ! শিক্ষকগণেই তুমি

কর হত্যা, প্রহার প্রস্তর ।

কুকুট-জননী যথা করে নিজ পক্ষতলে

একত্রিত শাবকনিকর,

হায় ! আমি কতবার চাহিয়াছি করিবারে

একত্রিত তোমার সন্তান ।

কিন্তু কেহ আসিল না ! ওই দেখ গৃহ তব

শূন্য আজি, যেন মরুস্থান ।

যতদিন না কহিবে— ‘যত্ন সে, ঐতুর নামে

আগমন করে যেই জন !’

আমি কহিতেছি গুন, ততদিন আর তুমি

পাইবে না মম দরশন ।”

—

১৩ অধ্যায় ।

মন্দির হইতে পুনঃ

অলিভ পর্বতে

করিলে গমন,

জিজ্ঞাসিল শিষ্যগণ— “কহ, তুমি পুনঃ

আসিবে কখন ?

জগতের অন্ত যবে হইবে সাধিত

কি লক্ষণ সেই কালে হবে প্রদর্শিত ?”

“জাতিতে জাতিতে”—যি শু করিলা উত্তর—

“রাজ্যে রাজ্যে ঘটিবেক ২৭ ঘোরতর ।

ভূমিকম্প, মারিভয়, হর্ভিক্ষ, অনল,

ছাইবেক স্থানে স্থানে অবনীমণ্ডল ।

তোমরা হইবে হত, স’বে অত্যাচার ।

হইবে আমার তরে স্বর্গার আধার ।

তবে সবে পরম্পরে হবে হিংসারিত,

করিবে বিশ্বাস ভঙ্গ, হইবে ঘৃণিত ।

হবে লোক মিথ্যাধর্মশিক্ষকে বঞ্চিত,

অধর্মের প্রাহুর্ভাব, শ্রেম নির্দোষিত ;

ধ্বংসের ঘৃণিত মূর্তি বহে দেবালয়

বিরাজিবে, আসিবেন মানব-তনয়,—

পূর্ব আকাশে যথা হইয়া উদিত,

বিজ্ঞাৎ পশ্চিমাকাশ করে আলোকিত ;

সে দাক্ষণ বিপ্লবের অন্তে প্রভাকর

হইবে তিমিরাবৃত, নাহি দিবে কর

নিশানাথ, তারাগণ পড়িবে খসিয়া,

স্বর্গের শক্তি সব উঠিবে কাঁপিয়া ।
 তখন আকাশে চিহ্ন হবে প্রদর্শিত
 মানবের তনয়ের, হবে বিবাদিত •
 সমস্ত মানব জাতি । দেখিবে তখন—
 মানব-তনয় গর্বে করি আরোহণ
 স্বর্গীয় মেঘের পৃষ্ঠে আসিছে আবার,
 অতুল গৌরবান্বিত, শক্তি-আধার !
 সেই দিন, সেই দণ্ড নাহি জানে নর ;
 নাহি জানে স্বর্গবাসী—জানেন ঈশ্বর ।
 সতত প্রস্তুত থাক, এমন সময়,
 জানিবে না, আসিবেন মানব-তনয় ।
 প্রভু আসি দেখিবেন যেই ভৃত্য তাঁর
 কার্য্যরত, তাহাকে দিবেন পুরস্কার ।
 দেখিবেন যেই ভৃত্য স্বকার্য্য ভুলিয়া,
 ছুস্কারো, আমোদে রত, তাহাকে কাড়িয়া
 প্রেরিবেন ছুরাচার পাপীর সদন,
 উঠিবে রোদনধ্বনি দন্তের ঘর্ষণ ।
 স্বর্গরাজ্য জানিও সে কতাদেব প্রায়
 দীপ হস্তে ছিল যারা বর-প্রতীক্ষায় ।
 বুদ্ধিমতী পাঁচজন দীপের সহিত
 তৈলাধারে নিল তৈল করিয়া সঞ্চিত ।
 বুদ্ধিহীন পাঁচজন, প্রদীপ কেবল
 নিল সঙ্গ, না লইল তৈলের সঞ্চল ।
 বরের বিলম্ব দেখি শুইল সকল
 নিশীথে আসিল বর, হলো কোলাহল ।
 বাদের ছিলনা তৈল গিয়াছে নিবিয়া

দীপাবলী, তৈল তবে চলিল ছুটিয়া ।

অন্ত পঞ্চ কত্কা তবে বরের সঙ্কিত

চলিল বিবাহে, দ্বার হইল রোধিত ।

কহে অস্ত পঞ্চ কত্কা অসিয়া আবার—

‘প্রভু ! প্রভু ! আমাদের খুলে দেও দ্বার

উত্তরিল ফিরিইয়া বর মুখখানি—

‘সত্য কহি তোমাদের নাহি চিনি আমি ।’

থাক প্রতীক্ষায় তাই, মানব-তনয়,

নাহি জ্ঞান, আসিবেন কেমন সময় ।

স্বর্গরাজ্য জানিও সে প্রভুর মতন

যে গেল সুদূর দেশে করিতে ভ্রমণ ।

এক ভৃত্যে পঞ্চমুদ্রা, দিলা অস্ত্রে আর

হুই মুদ্রা, অন্যে এক, যথা শক্তি যার ।

প্রথম, দ্বিতীয় করি বাণিজ্য মুদ্রায়

করিল দ্বিগুণ বৃদ্ধি ; তৃতীয় প্রায়

রাখিল পুতিয়া সেই মুদ্রা আপনার ।

স্বগৃহে ফিরিলে প্রভু, যাহা ছিল যার

দেখাইল ভৃত্যপণ। প্রথম হুজনে

কহিলেন প্রভু প্রীতিপ্রফুল্লিত মনে—

‘উত্তম বিখ্যস্ত ভূতা ! করিয়াছ বেশ’

‘প্রভুর আনন্দরাজ্যে করহ প্রবেশ ।’

তৃতীয়ে কহিলা— হুষ্ট ! অলস ! আমার

না করিলি ব্যবহার উচিত মুদ্রার ’

‘কেড়ে লও মুদ্রা । আছে দশ মুদ্রা যার

কর সমর্পণ উহা করেতে তাহার !

যার আছে, সে পাইবে আরো, সমীচীন ;

যার নাই, সে হইবে আরো দীনহীন ।
 অধারে অকৃতি ভূত্যে কর বিসর্জন !
 উঠিবে রোদনধ্বনি, দন্তের ঘর্ষণ !
 আসিলে মানব-পুত্র দেবের সহিত,
 গোরবের সিংহাসনে হবে অধিষ্ঠিত ।
 সমস্ত মানব জাতি হবে একজিত ।
 অজ্ঞ হুম্ব করি বাম দক্ষিণে স্থাপিত
 রাখালের মত, প্রভু কহিবেন তবে
 দক্ষিণ পার্শ্বেতে স্থিত মেঘপাল সবে—
 ‘অসৃষ্টি হয়েছে যেই রাজ্যে নিয়োজিত
 তোমাদের তরে, তাহে হও অধিষ্ঠিত ।
 ক্ষুধাতুর যবে আমি, যোগালে আহার ।
 তৃষ্ণাতুর যবে, দিলে নীর স্রবাসার ।
 অজানিত ছিহু আমি, করিলে গ্রহণ ।
 বস্ত্রহীন ছিহু যবে, যোগালে বসন ।
 ছিলাম পীড়িত যবে, সেবিলে আমার ।
 ছিহু কারাগারে, দেখা করিলে তথায় ।
 কহিল পুণ্যস্মাগণ—‘এক কথা হায় !
 আমরা একপে কবে সেবিহু তোমায় ?
 কহিলেন প্রভু—‘এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার
 করিয়াছ সেবা যবে, করেছ আমার ।’
 কহিবেন বাম পার্শ্ব স্থিত অজদলে—
 ‘দূর হও নরকের অনন্ত অনলে !
 ক্ষুধার্ত ছিলাম আমি, দিলিলা আহার ।
 তৃষ্ণাতুর ছিহু আমি দিলিলা আসার ।
 অজানিত ছিহু, নাহি করিলি গ্রহণ ।

বজ্রহীন ছিহ্ন, নাহি ষোগালি বসন !
 ছিহ্ন ক্লেশ, বন্দী, নাহি করিলি দর্শন ।
 কহিবে তাহারা—‘প্রভু ! একি কথা হায় !
 কখন একুপে নাহি সৈবিন্ত তোমায় ?’
 কহিবেন প্রভু—‘এক নিকৃষ্ট ভ্রাতার,
 কর নাই সেবা যবে, করনি আমার ।’
 লভিবে অনন্ত দণ্ড ইহারা তখন ।
 লভিবেক পুণ্যাত্মারা অমর জীবন ।”

১৪ অধ্যায় ।

প্রধান ষাচকগণ, অধ্যাপকগণ আর,
 সর্কোচ্চ ষাচক গৃহে হইয়া মিলিত,
 ভাবিতে লাগিল সবে, করিবে কি ষড়যন্ত্রে
 যিশুর বিনাশ, নবধর্ম বিলোপিত ।
 যিশুর দ্বাদশ শিষ্য, তাহাদের একজন *
 ষাচকগণের কাছে আসিয়া তখন
 কহিল—‘কি দিবে বল, আমি তোমাদের করে,
 করি যদি কোনমতে যিশুকে অর্পণ ?’
 তখন হইল স্থির ত্রিংশৎ মুদ্রা মাত্র
 পাবে সেই অবিশ্বাসী তার পুরস্কার ।
 খুঁজিতে লাগিল পাপী শ্রবণ সে দিন হ’তে,
 শত্রু হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহার ।

জুড়িয়ার পক্ষ এক হলো এবে উপস্থিত,
 কহিলেন শিষ্যগণে—প্রবেশি নগরে,—
 “কহ কোনা গৃহস্থেরে, উত্তীর্ণ আমার কাল,
 কাটাব উৎসব শিষ্য সহ তার ঘরে।”
 সেরূপ হইল স্থির, আসিল উৎসব-সন্ধ্যা,
 বসিলেন শিষ্যসহ করিতে আহার।
 উৎসর্গ করিধা কুটী, ভানি শিষ্যগণে দিয়া
 কহিলেন—“খাও ! ইহা শরীর আমার।”
 লইলেন প নপাত্ত, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
 করি বহু. কহিলেন—“কর সবে পান।
 নবধর্মের মম বক্ত ! ইহা হইতেছে পাত,
 পায় যেন বহু নর পাপে পরিচ্ছাদ।
 আমি কহিতেছি শুন, আমার পিতার রাজ্যে
 যতদিন ইহা আমি নাহি করি পান
 তোমাদের সনে, বৎস ! এই দ্রাক্ষ্যা-বস আর
 করিবনা পান আমি, গাও বিভূ-গান।”
 সকলে গাইল গীত, উৎসব হইল শেষ,
 অনিভ পক্ষতে পুনঃ করিয়া গমন
 কহিল—“আমার প্রতি আজি এই নিশাকালে
 হইবে বিরক্ত সবে।” ‘পিটার’ তখন
 কহিল—“সমস্ত লোক হয় যদি, আমি নাহি
 হবো কদাচিত্।” যিও কহিল তাহায়—
 “এ রাজি, কুকুট নাহি। ডাকিতে, নিশ্চয় তুমি
 তিনবার অস্বীকার করিবে আমায়।”
 পিটার কহিল—“আমি যদি তব সনে,
 তথাপিও করিবনা আমি অস্বীকার।”

কহিল সকল শিষ্য সেইরূপ ; গিয়া তবে

স্থানান্তরে কহিলেন শিষ্যে পুনর্বার—

তোমরা এখানে থাক, আমি গিয়া ওইখানে

নিরঞ্জে উপাসনা করি একবার ।”

পিটার সহিত তিন শিষ্য মাত্র নিলা সঙ্গে,—

চিত্ত চিন্তাভারাক্রান্ত, বিষাদ-আধার ।

কহিলেন তাহাদেবে— “মূহুর্ত ছাড়ার মত

ঘোরতর বিষাদের ছায়া অন্ধকার,

আমার হৃদয় আজি ছাইয়াছে, বৎসগণ ।

তোমরা এখানে থাক প্রহরী আমার ।”

গিয়া কিছু দূর তবে প্রণত হইয়া ভূমে

কহিলেন—“পিতঃ মম । যদি সম্ভাবিত,

এ বিষাদ-পাত্র মম,— মম ইচ্ছামতে নহে,—

তব ইচ্ছা হয় যদি, কর অপনীত ।”

শিষ্যত্রয় নিদ্রাগত ; কহিলেন—“পারিলেনা

পিটার । একটি ঘণ্টা জাগিতে কেবল ?

জাগ, কর উপাসনা, লোভে যেন নাহি পড় ;

আত্মার ত ইচ্ছা, কিন্তু শরীর দুর্বল ।”

কিছু দূরে গিয়া পুনঃ করিলেন উপাসনা—

“পিতঃ মম । আমি ইহা না করিলে পান,

যদি এই পাত্র কভু নাহি হয় অপনীত,—

হে পিতঃ ! হউক পূর্ণ তব মনস্কাম ।”

কিরি দেখিলেন পুনঃ নিদ্রাগত শিষ্যগণ,

আবিভূত ঘোর নিদ্রা তাদের নয়নে ।

ছাড়িয়া তাহাদের গিয়া করিলেন উপাসনা

সেইরূপে তৃতীয়বার বসি নিরঞ্জে ।

ফির আসি অনন্তর কহিলেন শিষ্যগণে—
 “নিজা যাও, কর দূর শ্রান্তি যথোচিত !
 উদ্ধার হয়েছ কল, মানব-তনয় দেখ,
 হইয়াছে পাপীদের করে সমর্পিত ।
 উঠ, কর পলায়ন । ওই দেখ উপস্থিত,
 আমাকে যে শত্রু করে করিল অর্পণ ।”
 কহিতে-হহিতে কথা, আসিল সে শিষ্য তথা,
 যষ্টি তরবারি করে বহু লোকগণ ।
 তখন নিকটে আসি বিশ্বাসঘাতক শিষ্য,
 কহি—“জয় ! জয় প্রভু !” চুখিল চরণ ।
 যিগু কহিলেন—“ভাই ! কেন আসিয়াছ বল ?”
 লোকেবা ধরিয়া তাঁকে চলিল তখন ।
 যিগুর পক্ষীয় কেহ নিষ্কাশিত করি অসি,
 যাজকের ভৃত্য একে করিয়া প্রহার,
 কাটিয়া ফেলিল কাণ যিগু কহিলেন তাকে—
 “কোষে রাখ তুমি ভাই, অসি আপনার !
 যাহারা ধরিবে অসি, মরিবে অসির সহ ;
 মনে কি কর না তুমি আমি এইক্ষণ
 চাহিলে পিতার কাছে, দ্বাদশ স্বর্গীয় সৈন্ত
 করিবেন তিনি এই মুহূর্ত্তে প্রেরণ ?”
 কহিলেন লোকগণে— “যষ্টি তরবারি সহ
 ধরিবারে ত্বর কি আসিলে হেথায় ?
 বসি সঙ্গে মন্দিরেতে নিত্য দিহু শিক্ষা আমি,
 কেহ ত তখন নাহি ধরিলে আমায় ?”
 প্রধান যাজক গৃহে, অধ্যাপকগণ সহ
 সমবেত প্রাচীনেয়া, নিল সেই স্থান

যিগুকে ধরিয়া বলে ; চলিল পিটার পিছে,

বসি ভূতালের মাঝে দেখে পরিণাম ।

ছিল বহু মিথ্যা সাক্ষী, কেহ নহে অগ্রসর,

অবশেষে অবেষণে মিলিল হৃদয় ।

কহে তারা—“এই ব্যক্তি মন্দির করিয়া ধ্বংস

বলেছিল তিন দিনে করিবে সৃজন ।”

প্রধান যাজক উঠি কহে—“কেন নিকৃন্তর ?

কি কহে ইহারা ?” যিগু মোন ভাবে রয় ।

আবার যাজক কহে— “ঈশ্বরের নামে আমি

জিজ্ঞাসি—তুমি কি খুঁট, ঈশ্বর-তনয় ?”

উত্তর করিলা তবে যিগু—“কহিয়াছ তুমি ।

আমি কহি, অনন্তর করিবে দর্শন

মানব-তনয় বসি শক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে

আসিতে স্বর্গীয় মেঘে করি আরোহণ ।”

কহিল যাজক ক্রোধে, অঙ্গের বসন ছিঁড়ি—

“করিয়াছে দেবনিন্দা করিলে শ্রবণ ।

সাক্ষীর কি প্রয়োজন ? কি দণ্ড করিবে বল ?”

“প্রাণদণ্ড”—উত্তরিল তাহারা তখন ।

তখন সকলে মিলি, খুখুদিল বুখে তাঁর,

পাপীগণ নানামতে করিয়া প্রহার,

কহিল বিদ্রূপ করি— “কহ খুঁট ! ভবিষ্যত ;

কহ কে যারিল চড় পৃষ্ঠেতে তোমার ?”

পিটার বাহিরে বসি ; তথা এক নারী আসি

কহিল— “যিগুর সঙ্গে দেখেছি ইহায় ।”

পিটার তাদের কাছে অস্বীকার করি কহে—

“নাহি জানি এইরূপ কেন কহ হায় ।”

গেলে বহির্দ্বারে পুনঃ আসিয়া রমণী অত্র
 কহিল—“বিশ্বের সঙ্গে দেখেছি ইহায় ।”
 শপথ করিয়া তবে অস্বীকার করি পুনঃ
 কহিল পিটার—“আমি চিনি না তাঁহায় ।”
 গেলে চলি কিছু দূর, কহিল পথিকগণ,—
 “কথায় পড়েছে ধরা, এও একজন ।”
 কহে পুনঃ দিব্য করি—“না চিনি তাহাকে আমি ।”
 ভাসিল রজনীশেষে কুকুট-কূজন ।

১৫ অধ্যায় ।

ঐভাতে যাজকগণ, করিয়া বন্ধন,
 শাসনকর্তার * হস্তে করিল অর্পণ ।
 বিশ্বাসঘাতক শিষ্য দেখি পরিণাম,
 অনুতাপে ত্রিংশ যুজ্ঞা করি প্রতিদান,
 কহিল—“বিশ্বাস-ঘাতী আমি পাপাধম;
 করিয়াছি নির্দোষীকে বিপদে অর্পণ ।”
 যাজকেরা কহে—“তাহে আমাদের কতি
 আছে কিবা ? দেখ তুমি তোমার সঙ্গতি ।”
 ফেলাইয়া দিয়া যুজ্ঞা, গিয়া হরাচার ।
 উদ্ধকনে আত্মপ্রাণ করিল সংহার ।
 কহে যাজকেরা—“কথা কোষেতে সঞ্চয়
 এই যুজ্ঞা,—রক্তমূলা—নীতিসিদ্ধ নয় ।”

পরামর্শ অন্তে, তাহে হয়ে ভূমি ক্রীত,
 বিদেশীর সমাধিতে হলো নিয়োজিত,—
 রক্তভূমি নামে তাহা এখনো বিদিত।
 শাসনবর্তার আগে পাড়াইয়া স্থির—
 জিজ্ঞাসিলা দণ্ডদাতা—“ইছদি জাতির
 তুমি কি নৃপতি ?” যি শু করিলা উত্তর—
 “কহিয়াছ তুমি।” জিজ্ঞাসিলা অতঃপর—
 “কি কহিছে যাচকেরা ?” যি শু নিরুত্তর।
 হইলা শাসনবর্তা বিস্মিত অন্তর।
 বিচার আসনে তবে বসিলা যখন,
 করিলা তাঁহার ভাষা সংবাদ প্রেরণ।—
 “দেখেছি কুস্থপ আমি, কবোনা কখন
 সেই ধার্মিকের এক বেশ পরশন।”
 এ উৎসবে প্রজাদের ইচ্ছায় ভূপালে
 একজন বন্দী মুক্ত করিত সে কালে।
 আনিয়া তত্তর এক জিজ্ঞাসে তখন—
 “যি শুকে, কি তত্তরকে, করিবে মোচন ?”
 হুঁসিয়া যাচকদের কথায় তখন
 কহিল সকলে—“কর যি শুকে নিধন।”
 বিচারক তত্তরকে করিয়া মোচন,
 করিলা যি শুকে ‘কুস্থ’ শূলে সমর্পণ।
 কক্ষান্তরে নিয়া কাড়ি অস্ত্রের বসন,
 পরাইল রক্তবাস মিলি সৈন্তগণ।
 কাঁটার মুকুট গড়ি দিয়া শিরোপর,
 করে দিয়া তৃণঘটি, বভেক পামর
 জাহ্নু পাতি ভূমে কহে উপহাস করি—

“দেখ ইছদির রাজা । কি শোভা আ মরি ।”

অঙ্গ দিল থুখু সবে, কেড়ে নিয়া তাঁর

করের সে যষ্টি, শিরে করিল গ্রহাণ ।

এইরূপে উপহাস করি কিছুক্ষণ

কাড়িয়া লইল পুনঃ আরক্ত বসন ।

পর্যায় পুনর্বার আপন বসন

নিল ধরি, ত্রুশ শূলে করিল অর্পণ ।

বধ্যভূমে পিপাসায় হইলে কাতর,

দিল তিক্তমিশ্র ‘সিকা’ নির্ভর বর্ষর ।

পাপীরা তাঁহাকে শূলে করিয়া অর্পণ,

লইল বণ্টন করি অঙ্গের বসন ।

লিখে দিল অপবাদ মস্তক উপরে—

“যিশু, ইছদির রাজা” উপহাস ক’রে ।

দক্ষিণে ও বামে তাঁর তত্ত্বর যুগল

দিল শূলে সেই সঙ্গে । নেত্র ছলছল

“কমা কর,”—কহে যিশু চাহি উর্দ্ধ পানে—

“কি করে ইহারা, পিতা : । কিছুই না জানে ।”

পথিক ঘাইতে করি গালি বরিষণ,

উপহাস করি করে জিজ্ঞাসা—“কেমন

মন্দির করিয়া ধ্বংস নির্মাতে আবার

পার তিন দিনে, কর রক্ষা আপনার ।

ঈশ্বরের পুত্র যদি, আইস নামিয়া ।”

প্রধান যাজকগণ করিল হাসিয়া—

“করিলেন জ্ঞান পর, কিন্তু আপনার

করিবারে পরিজ্ঞান, নাহি সাধ্য তাঁর ।

ইছদির রাজা যদি, নামিয়া এখন

আহুন, বিশ্বাস সবে করিব তখন ।
 ঈশ্বরে বিশ্বাসবান, ঈশ্বর-তনয় !
 ঈশ্বর করুন রক্ষা।দেখি এ সময় ।”
 দুই পার্শ্বস্থিত সেই যুগল তরুর,
 তাহারাও দিল গালি মুখের উপর ।
 অতঃপর ষষ্ঠ ঘণ্টা হইতে নবম
 অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল ভুবন ।
 কহিলা নবমে যিগু কাঁদি উভরায়
 “হা নাথ ! হা নাথ ! কেন ত্যজিলে আমায় !”
 কহিল দর্শকগণ গুনি হাহাকার,—
 “দেখি আসে কি না, নাম করিছে যাহার !”
 তিত্ত বাবি সিক্তবস্ত্র করিয়া স্থাপন
 যষ্টি অগ্রে, নিল মুখে কোন নবায়ম ।
 বাত্রিংশ বৎসে পুনঃ কাঁদি উভরায়
 সেইরূপ, প্রাণত্যাগ করিলেন হায় ।
 মন্দিরের যবনিকা হলো বিদারিত,
 গিরি চূর্ণ, বস্তুকরা হইল কম্পিত ।
 কহিল দর্শকগণ ভয়ে প্রকম্পিত—
 “ঈশ্বরের পুত্র এই বুঝি নিশ্চিত ।”
 ধনী এক শিষ্য আসি মাগি কলেবর
 নির্মূল বসনে তাহা করি আচ্ছাদিত,
 এক শৈল কক্ষে তাহা করিয়া বন্ধিত,
 স্থাপিল প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড প্রস্তর ।
 কেবল রমণী দুটি রহিল বসিয়া
 তিত্তিল প্রস্তর নারী-শোকাঙ্গুরিয়ারি !
 রবিবার নিশি শেষে দেখিল রমণী

ঘোরতর ভূমিকম্পে কাঁপিছে মেদিনী ।
 স্বৰ্গ হ'তে দেবদূত নামি একজন
 সরায়ে উপলব্ধ, করিল আসন ।
 বিহ্বতপ্রতিম জ্যোতিঃ অঙ্গে বলবল,
 পরিধেয় বস্ত্র শোভে তুষার ধবল ।
 কহিলেন—“চেয়ে দেখ রমণীযুগল,
 যিশু গিয়াছেন স্বর্গে, শূন্য কক্ষতল ।”
 একাদশ শিষ্যগণ আকুলহৃদয়
 নির্দিষ্ট পৰ্ব্বতে এক লইল আশ্রয় ।
 কহিল। তথায় যিশু দিয়া দরশন—
 “পাইয়াছি সৰ্ব্বশক্তি আমি, শিষ্যগণ !
 পিতা, পুত্র পবমাত্মা নামেতে দীক্ষিত
 করিয়া মানবজাতি, কর প্রচারিত
 মন শিক্ষা, ষতদিন রবে চরাচর,
 তোমাদের সঙ্গে আমি রব নিরন্তর ।”

PREFACE.

"I asked for several men I had known well here. Many of them were drowned and the tales of the survivors were pitiful. Wealthy Talukdars were wandering about aimlessly. One man who had 12,000 "aris" of paddy (about 2850 maunds) in his godown had been drowned with all his family, a large one. Nothing was standing of his houses, even the mud plinth had been washed away, and the clods lay strewn over the neighbouring fields. The only remnant of the once comfortable homestead was the timber posts, on which the godown had stood. In this village as in Raja-khali, Ujantia, and Pekua, there are very few men surviving, and practically no women or children. There is therefore, but little present need of relief."

DIARY OF MR. C. G. H. ALLEN,

Settlement Officer, Chittagong,

Agent the Chittagong Cyclone

of the 2nd October, 1897.

ভানুমতী ।

প্রথম অধ্যায় ।

—*—

কমলে কামিনী ।

শরৎ কাল । প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রান্তঃ-
স্বর্ষোর মূহুর্তিরূপে হাসিতেছিল । পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলা-
রাশি ; পূর্বে বৃক্ষপল্লব সমাচ্ছন্ন শ্রামল পর্বতমালা । উভয়ের মধ্যে
নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎশতক্ষেত্রখচিত তটভূমি । তাহার স্থানে
স্থানে নিবিড় ওরুফাননশোভিত ছহুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া,
পেকুয়া, গঙামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্রামকান্তি ।
উত্তরে বর্ষার পর্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা
মুহুরী নদীর বিশাল রক্তধারা । বালস্বর্ষোর তরলস্রবণকরে মণ্ডিত
হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির
কল্পনাভীত, এবং চিত্রকরের চিস্তাভীত । কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্র-
গর্ভে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল

মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত “বাতিঘর” একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেশখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্বত মরকতস্তম্ভের মত, একঃ তাহার শেখবস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা স্বর্ণদ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীরসংলগ্ন বজরারছাদে বসিয়া, গাভীর্ষ্যপূর্ণরূপে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন,—

সম্মুখে অনন্ত সিদ্ধ ; সুনীল সলিলরাশি,
রবির স্বর্ণ-করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া স্থখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, ভীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিদ্ধর সেই অনন্ত অক্ষুট গীত
কি যেন অনন্ত স্তুতি করিতেছে আগরিত—
অতীত ও অনাগত, স্থখ-দঃখ-বিজড়িত,
সিদ্ধ-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিদ্ধ সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি স্থলর !
খেলিছে তরঙ্গমালা — শিরে ফেনপুষ্পরাশি,—
সমুদ্রমহনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরঙ্গহৃদয়-সিদ্ধ, তরঙ্গ-অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রোঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে, ভক্তিপূর্ণরিতহৃদয়ে, এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা যে উভয় অনন্ত, সর্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিদ্ধগর্ভে বসিয়া, সিদ্ধ ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়,

এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের “জাগরণ” বা চণ্ডীকাব্য সর্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরণপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গ-ভঙ্গে যে ফেনরাশি উদলীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমলকানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলবনে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেইরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীল। একটি অপূর্ণ কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল। তিনি তখন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সিন্ধুতীরে মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার স্বকণ্ঠে সিন্ধুনিদাদ প্রাণিত করিয়া স্থানীয় কবি ৬গ্রামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন —

2

অপরূপ অতি

ଶୁଭ ନବମୀ.

কালীদেবের জন্মে দেখেছি নয়নে.

পদ্মেতে পদ্মিনী.

জিনি সোদায়িনী.

হেব্রিলায় কামিনী কয়ল-বনে ।

3

वक्षिष्-नघनी

জিনিয়া হরিণী

କେଶବେଶୀ ଝୁଣୀ, ବିଦ୍ୟା-ବରଣୀ,

ধরি' করিবরে

ধনৌ গ্রাস কবে,

ক্ষণেকে উদ্ধার করিছে বদনে ।

6

স্বপ্নে দেখি জন্মে,

অনেকে কখনো,

চক্ষণা লুকাই অণেকে অঞ্চলে,

চপলা চমকে

কণে কুতূহলে,

ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম। এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত বরনামাত্র ? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্তি তরঙ্গপুষ্পে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট—স্পষ্টতর হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ? তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ঘরিয়া যেন গোদী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অত্র প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নাহী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন,—

কিশোরী বালিকা সোণার পুতুল,

হুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,

হেলিছে হুগিছে উঠিছে পড়িছে

তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি।

নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,

এই উঠিতেছে, পড়িতেছে এই,

মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী

এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।

এহ তরী-আগা উঠিল আকাশে,

হেলিয়া সমুখে হা'লে ভর করি'

চুষিল কিশোরী শিশুর বদন
 বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি ।
 এই তরী-পাছা উঠিল এবার,
 তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
 পড়িল সরিয়া । কিশোরী কোশলে
 তরী-বর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি ।
 আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
 মুক্ত কেশরাশি কেতন মত
 উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র-অনিলে
 সৌন্দর্যের লীলা করিয়া কত ।
 গোর বরণে, আরক্ত বসনে,
 সন্তোষাত লীলাময়ী অলকায়,
 শব্দে রবির প্রভাত কিরণ
 বলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায় ।
 তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
 ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
 বক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কোশলে,
 হুই ভুঞ্জে শিশু করিয়া উত্তিত,
 কভু শূণ্ডে তুলি দেখে তার মুখ,
 কভু বক্ষে রাখি চুষে আদরিণী ;
 বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
 সত্য কালীদেহে “কমলে কামিনী” ।

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি
 যেন অনাথনাথের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইল । ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট
 হইতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের
 জীমূতগর্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাণী বাজিতেছে ; কণ্ঠ

এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী । মরুসদৃশ সেই নির্জ্বল সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই জীড়াময়ী কিশোরীমূর্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত । গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরঙ্গী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে, এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে । সাগরানিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে । থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে । দূর হইতে ইহার ফেন-রাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রাস্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল । অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসরস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত অনিতে লাগিলেন ।

“কৈদ না কৈদ না বাছা কাতর অন্তরে ;

আমি এই চলিয়ায় অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে ।

আমি আছি সনা,

ভক্তের প্রেমে বাঁধা,

(তা কি তুমি জান না হে ?)

আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে ।”

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভারতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল । তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ণ শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল । তাঁহার আবার ভ্রাস্তি হইল ; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী “কমলে কামিনী” ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—*—

মুকুতেশী ।

নোকা তাঁহার বজ্রার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে হুর্গাপ্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নোকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু । হুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্তি । কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল । দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক । যে ছ' জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শব্দের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল ।

স্বামী । না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে । নোকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও ।

স্ত্রী । তোর যেমন বুকি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও ।

স্বামী । দক্ষিণের বাতাস । দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নোকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজ্রায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন ।

স্ত্রী । এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস ? অরু কি সাধে । বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না ? আর কোথাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নোকা লাগাইব ? লাগা নোকা দক্ষিণদিকে ।

বালিকার মুখ স্নান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জন করিয়া নৌকা উত্তর দিকে লাগাইতে বলল ।

স্ত্রী । ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে । ওদের হুকুম মত নৌকা লাগাইতে হবে ।

“কি ! থাক্ মাগি !”—বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাকার পড়িতেছিল । অনাথনাথ তাহাদিগকে নিবেশ করিলেন ।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—“আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছিস্ । অন্ধ আর কাহাকে বলে ?”

স্বামী । আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিবেশ করিয়াছিলাম ।

স্ত্রী । তুই নিবেশ করিয়াছিলি না আমি নিবেশ করিয়াছিলাম ? আমি বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না ? আমারই দোষ, সৰ্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার ‘পালা’ পুতিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—“এখনও ধর্ম আছে; এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হয় । আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল । তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার । হা ঈশ্বর ! তুমি ইহার বিচার করিবে । আমি মন্দ, আমার জিহ্বা বিষ, আর সকলের জিহ্বায় অমৃত ।”

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ গ্রহণ করিল,—“লক্ষীছাড়ি । আমার খাস, আমার কথা শুনিস না । আমি

বলিগাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, হুই দক্ষিণ দিকে লাগাইল কেন ? বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল । রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি হুঁসিয়াবহার করিয়াছে,—‘ছহির’ মধ্যে গিয়া শয্যা লইল । বজ্রার মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল ।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল — উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাধিব মা ? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে ; জমিদাদের বজ্রার কাছে খেলা করিলে ত’ পয়সা পাইতে পারিব ।”

স্ত্রী । আমি ষাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই । এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি ; দিন রাত্রি শষ্ট-প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্তও অবসর পাই না । আমার সোণার শরীর মাটি হইল । তাহার উপর এই গাল ।

স্বামী নৌকার ‘পাহাঘ’ বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার টিপ্তনী করিয়া বলিতেছেন, “খটুনির মধ্যে ঘাহা হইতেছে এই । মেয়েটি সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর ঝাখে, তাই বাপ বেটা ছটো খাইতে পায় ।”

পতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না ; মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল ।

দাম্পত্যপ্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজ্রা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমরা কি বাজিকর ?” বৃদ্ধা উত্তর করিল,—“হাঁ । হজুর কি অহুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন ?” ভৃত্য বলিল,—“দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস ।”

বেদেনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার

ভিতর হইতে পূর্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দিবে কি ?” তাহার স্বামী বলিল,—“বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় ?” বেদেনী তখন আবার জীমূতমস্ত্রে গজ্জন করিয়া করিলেন,—“তুই আগার আমার সঙ্গে লাগতে আসিলি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, তুই টাকা দেয় ত খেলব।

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে তুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন দিবেন না ? তখন সে মধুর কণ্ঠে “এই আমরা আসিতেছি” বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজ্রবার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক বালিকা ছুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূৰ্ণ শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ উজ্জ্বলবেশে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণা হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বালিকার নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরবাদন, এবং বালক-বালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাহার অপূৰ্ণ কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম দেখিয়া দর্শকগণ

বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীত-
ময়; তাহাতে' স্ফুট নাই। সেই নবনীতক্ষে অদ্ভুত শক্তি ও
কৌশল। এক একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের
হৃদয়ে তাহার জীবনের জ্ঞান আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল।
তাঁহার চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন চরণে মহিষের
বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু উর্দ্ধে ছই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর
দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে, কখন
বা দড়ির উপর হ্রিষভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সাইয়া
নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া
লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। অন্যঃ এতক্ষণে বুঝিতে পারি-
লেন যে কিরূপে তরুণে বোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে
“কমলে কামিনী”র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে
বেদুয়ার নাভিহ্র একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া। কখন এক পা,
কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালস
নিরাশ্রয়ভাবে দীনদয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়াছে। কখন সে চিৎ
হইয়া ক্ষুদ্র দেহলতাটিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া এবং বৃক্ষের
উপর শিশুটিকে বণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র ছয়ানি
গোলাপসন্নিভ অধরৌষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত,
কুণ্ঠমকোমল মুখখানি দেখিয়া, অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উছ-
লিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতেছিল,
এবং এক একবার তাঁহার দিকে সন্মোহ করুণ কাতরদৃষ্টিতে দেখিতে
ছিল। তাহার পর বালিকা এক আশ্রয়ের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ
পরে সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আশ্র
ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আশ্রয়ের ডাল ও তাহাতে আশ্রয়ের
ফল। সর্বশেষে রাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার
ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে রাজিকর

বাহির হইয়া আসিয়া সমুখের আবরণ উন্মোচন করিল । দর্শকগণ
সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্তির
মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া
আছে ।

কিশোরী তখন অবলম্বন বিহীনা,
মুদ্রিত নীলাঞ্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা ।
বিমুক্ত কবরী আনুগায়িত কুক্ষিত,
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত ।
কেশ-অস্ত্রবালে চাকু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘবেরখাঙ্কিত ।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে ।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃত,
সন্ধ্যার রক্তিমায় যেন মেঘবেরখাঙ্কিত ।
অবশ যুগল কর পড়ি অশ্বতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চিত চন্দনে ।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হ'তেছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস ।
কুক্ষিত অগক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে ।
মেঘাচ্ছন্ন সিঁদুরবেলা পরিত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ সমুদ্রগর্জন,
পাত্তীয়াপূর্ণিত বাজিকবের সঙ্গীত,
দোণার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মুচ্ছিত
নিগম্রা, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মাধুরিমা,

ভাসিছে নিশ্চল মুখে দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে !
শিশুটি সে মুখপানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল ।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং
অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল,—“ভানুমতি !”

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব,
নিশ্চল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

—*—

অনাথ ।

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল । শরৎকালে
এমন গ্রীষ্ম কেহ কখনও অনুভব করে নাই । সে উত্তাপও
কেমন এক রকমের । প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্বাত-
নিকম্প ভাব । বহুকরা যেন কি এক প্রকার স্থল প্রতপ্ত
বাস্পাকীর্ণ । সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না ।
পূৰ্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন
স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন । প্রাতঃকাল হইতে মেঘ
হইতেছিল । বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোর-
তর ক্লকবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল, এবং কেমন লিক
লিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল । তিনি সেই ঋতুচিহ্নিত গ্রীষ্ম
অনুভব করিয়াই একটি হুযোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন । এখন
এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বহুমূল হইল । অতএব এই

মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাইলেন। বেদেনী নোকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূৰ্ণ মুখভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া, ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা কি যে করণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পতিয়া রহিয়াছিল, সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই। কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই অপরাধে নোকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—“পোড়ামুখি! দেখিলি না বাবুটি বোকা। ৥ গভীর জায়গায় ২০ টাকা দিল, তাহার উপর আবার ২০ টাকা বকসিস্। চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা না হইলে কি বাজি দেখিয়া চখের জল ফেলে।” এই বলিয়া তিনি আবার শয্যা লইলেন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া খাদ্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুকিল, বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন সাদরে বালিকাকে বলিল—“মা! তোরা যা! আমি বাজার করিতে যাইতেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২০ টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।”

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারাই হই জনে বাবুর বড় ভরু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে রেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহার দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহার শ্রবণে নাই। তাহার

আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজ্রবার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধা লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গয়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, “ইনি কি মানুষ?” তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জ্যোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহা-দিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুষন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাহাদের একটি পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালের প্রভাতকিরণমণ্ডিত কুণ্ডলবাণী? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ, এবং সর্বশেষ তাহার সেই মধুর কথা। সে তাহার পিতার এটি ক্ষুদ্র প্রতি-চিহ্নের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রণয়না করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডাও খুলিয়া গেল। ছুই শিশু চিরপরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খুঁটে বলিয়াছেন,—

“দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম।

স্বর্গ রাহ্য তাহাদের, বারা শিশুদের সম।”

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে ছাটিকে খাওয়াইলেন। তাহাদের হৃজনের দয়া তাহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাহারা প্রজাদিগকে

সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের স্নেহে স্নেহী, তাহাদের
 হুঃখে হুঃখী হইতেন, এবং হুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন
 করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত।
 এই দরিদ্র দেশে প্রজাত্বাধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল।
 এখন জটিল আইন ও আইন-বাবসাদীদের কল্যাণে তাহার
 ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও, এখনও হুই এক স্থানে, বিশেষতঃ
 বুনিয়াদি জমিদারে, দৃষ্ট হয়।

বালকবালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—“তোমার নাম কি?”

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অত কোন নাম নাই?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেঙ্গে কি তোমার পিতা?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষন্ন ভাবে উত্তর
 দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাৎসরিককণ্ঠে তাঁহার শেষ
 প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার

শ্রমস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে । তাঁহার মুখ গভীর হইল । তাঁহার ভ্রূর নয়ন সজল হইল । অনাথনাথ আর তাহার পশ্চিম লইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন ।

বালিকা । কি গাইব বাবা ?

অনাথ । তুমি কি কীৰ্ত্তন জান মা ?

উত্তর । জানি

বালিকার ‘বাবা’ সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার ‘মা’ সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল । দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রিত হইয়া গেল । বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কাব জিপুরাচরণ রাগের একটি গীত গাইতে লাগিল,—

১
বাছারে জীবন-ছুড়ানে । এস বস কাছে !

বেঁধে দি ধড়া চুড়া,

ও বাপ ! মোচের বেলা ব’য়ে গেছে !

২

বেগু স্বরে ডাকছে বলাই,—

আয় আয় আয় রে কানাই,

তুই বিনে যে যায় না রে গাই ।

তোর পানে চেয়ে আছে ।

৩

বাছা রে । তোর মার মাথা খা,

গহিন বনে যাসুনে একা ।

তুই বিনে শ্রাণ যায় না রাখা,

তোর মুখ চেয়ে বাঁচে ।

৩৮

মাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রু-জলে
ছল ছল করিতে লাগিল । অনাথনাথ বলিলেন,—“তুমি মা পদা-
বলী জান ?”

উত্তর । জানি ।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকর সুর বাজিয়া
উঠিল । বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল আরও করুণ
করিয়া, গাইতে লাগিল,—

স্বপ্নের লাগিয়া

এ ঘর বাঁধিছ

আঙুলে পুড়িয়া গেল ।

অমিয়া-সাগরে

দিনান করিতে

সকলি গরল ভেল ।

ইত্যাদি ।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল । গীত
শেষ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া বজ্রার গবাক্ষপথে অনন্ত
সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন । এ গীত যে প্রেমের উজ্জ্বল,
সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাঁড়া
করিতেছিল । কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ
প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না । তাঁহার মাতৃপ্রাণে
মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতিপ্রদান করিত । তিনি বলিলেন,
“মা ! তুই শ্রামা বিষয়ের গান জানিস ?” বালিকা এক একবার
তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের
দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

“মা ! আমি তোমার কি করেছি ?

ওধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা ! ডেকেছি ।

চিরজীবন পাষাণীয়ে ।

ভাসালি আঁখি-নীয়ে,

চিরজীবন হুথানলে দলেছি ।

আঁধার দেখে তরাসেতে

চাহিলাম তোর কোলে যেতে,

আমারে ত কোলে তুলে নিলি না ;—

মা-হারা শিশুটির মত,

কৈদে বেড়াই অবিরত,

নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—

সস্তানেয়ে ব্যথা দিয়ে,

যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,

ভাল ভাল তাই তবে হোক,

অনেক হুঃখ সয়েছি ।”

বালিকা তাহার করুণকণ্ঠে ভৈরবীরাগিনীর চিত্তদ্রবকরী মুচ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া “মা” বলিয়া গাইতেছিল। অনাথনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল-কোকনদসন্নিভ কপোল বহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাদিয়া বলিলেন,— “মা ! আমি তোর মা ! আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, তুই আমাকে ছাড়িয়া বাইতে পারিবি না ।” বালিকাও কাদিতে লাগিল।

অনাথনাথেরও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশুটিও সজল চক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিল,— “মা ! তুমি দিদিকে লইয়া যাও । দিদির বড় হুঃখ । দিদিকে মা বড় মারে ।”

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশু-টিকে বক্ষে লইয়া সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,— “হারে গোপাল ! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি ?”

উত্তর । পারিব । তুমি ত আর মার খাইবে না । এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে ।”

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও স্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

“গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে । আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব । কেমন দিদি ! যাইবে ? বল, যাইবে ”

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহবার চেষ্টা করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল ।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন,—“সত্যি মা ! তুই যাবি ?”

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, “মা”—সেই মা সন্মোদনে সে কি মধুরতা, কি প্রাণের আবেগই ঢালিল ! বলিল,—মা ! এমন করুণাসাগর দেবদেবীহুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণসেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে ? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে ? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব ?”

অনাথনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—“কি ! বাজিকর অন্ধ !”

বালিকা বলিল, “অন্ধ । অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন হুচাকরূপে করেন ।”

চতুর্থ অধ্যায় ।

—*—

রণরঙ্গিণী ।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা । আকাশমণ্ডল
ঘনকুণ্ড মেঘাচ্ছন্ন । কুণ্ড ঘোরতর,
উঠিতেছে সিদ্ধগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে ।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে ।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত !
অন্ন অন্ন বৃষ্টিধারা ; থাকিয়া থাকিয়া
নবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধারা ;
ছুটাইয়া বেগে সিদ্ধগর্ভে ঘোরতর
কুণ্ডমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
ওরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে ।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিদ্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জনে ।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের
কাছে বসিয়া বিস্মৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন ।
অনাথনাথও বিস্মৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজ্রার বক্ষে

ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি 'প্রকৃত পরামর্শ করিতে-
ছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির যেই ভীষণ ভাব অবলোকন
কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজ্রাঘাতে তলিতেছিল, সেই তলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন,
কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন
বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছু বুঝিতেছে
না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে
বলিতেছিল, "হাঁ মা ! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।"
অশ্রুমনস্ক জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার
কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "হাঁ বাবা !
তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড়' হুঃখ। কিন্তু
কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ? অজ্ঞাতকুলশীলা" একটি
বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন ? সে কি উপস্থিত জীবন
ছাড়িয়া অত্র জীবন গ্রহণ করিবে ? তাঁহারা কি তাহাকে স্থায়ী
করিতে পারিবেন ? বালিকাটিই বা কে ? তাঁহারাও এই বিষয়েরই
পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও
কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ
উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত
হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া
সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভাষাতে ডাকাইলেন ! তখন
দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই।

বেদে প্রোঢ় দেখিতে যেন ভালমানুষ, আর বেদেনী তাহার
ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরের বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ,
নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা
বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে,

বজরার মধ্যে অমিষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল ।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভানুমতী কি তোমার মেয়ে ?” সে উত্তর করিল,—“না” ।

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল । সে মনে করিয়াছিল, তাহার ছেলে মেয়ের উপর বোকা বাবুটির একটা ভালবাসা হইয়াছে । তাহার সূচ্যগ্রবঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি । অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন । সে যদি তাহার কষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না । অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চট্টিয়া গেল । তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল । সে সেই অপূৰ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—“আহাম্মকের কথা শুন ? তোমার মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে ?” তার পর অনাথনাথের পালা । সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল,—“আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে ? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে ।” তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—“কাণা না হ’লে কি এমন কথা বলে ?” তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে—বাবু বিশ্বাস করিবেন না । ‘আহাম্মক’ স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে । তখন সে বলিল,—“বাবু ! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না । ওর বুদ্ধিওদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা ! এই যে

চোখ দেখছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তানাত্তে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব স্বামীর! তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত, স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—“ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জলিয়া কাল হইয়া গেল।” ক্রমে সাক্ষ্যনাসিক স্বর বর্ধিত হইয়া কৃত্রিম, বোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—“কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।”

একে বারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—“কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ারমুণী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাটার চোটে পরিচয় লইব।”

রমণীরহ উঠিয়া বাইতেছিলেন, অনাথনাথ বাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন,—“বাইও না, ব'স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে হ'বার মারিয়াছ।”

সেই কর্ত্তা শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবপন্ন মুখ দেখিয়া সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল,—“মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্তে আমার যেখানে

ধানে গজনা !’ বেদেনী সান্নাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল,
ঃ চক্ষু মুহুিতে লাগিল ।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনী শেষ পোড়া-
গালী, তাহার আর সন্দেহ নাই । এমন দেবীতুল্য মেয়ে না
লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীরকণ্ঠে
লেন,—“তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক ;
মেয়েটিকে দেখিয়া অবশি তাহার প্রতি ! আমার বড় স্নেহ
ইয়াছে । মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে । তোমরা
কাঁচাও দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব ।
ভাড়া ঘর করিয়া দিব,— তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া
এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার ।”

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল । সে মেয়েটিকে বড়
ভালবাসিত ! অনাথনাথ জমিদার । তিনি মেয়েটিকে যখন একরূপ
করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত স্নেহেই রাখিবেন ! তাহার
নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন । অন্ধের প্রতি
ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি হইতে পারে ? সে আনন্দে অধীর
হইল, এবং কৃতজ্ঞতাস্বচক গদগদকণ্ঠে বলিল,—“অন্ধ ভিখারীর
প্রতি বাবুর এই দয়া ! বাবুকে ঈশ্বর আরও কড়মানুষ করুন !
বাবুর সোণার কলম রূপার দোয়াত হউক !” তাহার আর বাক্য
সরিল না ।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল । সে বাবুটিকে আরও বোকা
সাব্যস্ত করিল । সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ পূর্ণিমার,
চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে । সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—“ভাল
দয়া ! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে
দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন ।

কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব। আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না। এই বলিয়া সে গাত্রেখান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্র! নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলিলেন,—“বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াই-তেছি। তোর মত পাপিষ্ঠার একরূপ কত্তা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।”

বেদেনী এতক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কত্তা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্তন করিয়া বড় প্রশম্মমুখে বলিল,—“বাবু আপনি বড় লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা,—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্তে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?”

অ। কত টাকা?

বে। চের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পর্যাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন; কারণ, মেয়েটির বয়স

১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—“অচ্ছা, তাহাঁও আমি দিব।”

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব।

অনাথনাথ তাহার জন্তেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা এক বার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপরে অল্পকে দয়া করিয়া তুমি যেক্রপ বাড়ী ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

একক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাটিলেন। তাহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে এই পিশাচীর হস্ত হইতে যেক্রপে হউক উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকুক্ষ মেঘখণ্ডের পর ঘনকুক্ষ মেঘখণ্ড ভীষণবেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকুক্ষ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা শীঘ্র ঘূর্ণবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২৩ দিবস ধাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা আগত প্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি

দিবেন বলিয়া, বেবোনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—ঝড় বেশী
হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।”
তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজ্রার বন্ধনাদি দৃঢ়তর
করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাঁহার
নোকায় বসিয়া আকাশ ও সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—
আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত গীত গাহিতেছে।

১

কি ভীষণ রণে, দেশ ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিনী।
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী ;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্রাবে শ্রাম অঙ্গ,—শ্রাম-অবনী !

৩

হুই কর লয়, হুই বরাভয়;
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, উর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ।—মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,

চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,

ওঁ মা । ধবংসরূপে সুৰ্বব্যাপিনী ।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃত্য বিহ্বলী,

নাচে রণ-রঙ্গে ধবংস-সহচরী,

অট্ট হাস কি উল্লাস,

ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী ।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবৰ্জনে,

রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,

কদাকার, তরাচার

নাশি', সৃজিলে মানব, জননি ।

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা । আসি

নাচ, রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি',

চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড—দেব,

নাশি', কর সুর-রাজ্য অধনী ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

—*—

ভূগা ।

অপর্যাহু ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবায়ু (cyclone) বহিতে
আরম্ভ হইল । বড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, একপ বেগে
বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তাঁয়ে একপ

আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার নিকটবর্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? একরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক উড়াইয়া লইতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলান্বিত বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড়বেগ তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেঁসিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিদ্ধগর্জনে ও ঝটিকাগর্জনে কণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্রাবৃত করিতে সিদ্ধ ঘোর গর্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই—এই ৩টা ৩০ টার সময়ই,—প্রায় চারি দিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণলোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও আশ্রিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি একরূপ বেগে পড়িতেছিল

যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বসিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। [কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে, কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে, একরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্কমৃত অবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল,—“বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে! আমাদের কি উপায় হইবে?” কেহ বলিতেছিল,—“ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান থাকিলে হয়।” কেহ—“আমার ছেলে কোথায় গেল,” কেহ বা—“মেয়ে কোথায় গেল”—কেহ বা “আমার বুড়া মা-বাপ কোথায় গেল”—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উদ্গতের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে একরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্রসহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া কাছারিস্থ ভূতাদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই ছরবছর

দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপর ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা, ভাষ্করমতীর জন্তে। তিনি স্বজ্ঞা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা ছটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০ টাকা পুরস্কার দিব।” কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল,—“কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন কালে সে ছোট নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।” তিনি ক্রমে পুরস্কারের স্বল্প বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনি। তিনি তখন নিজে ষাটতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—“কর্ত্তা! কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্তে আপনার প্রাণটা দিবেন?” তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গণেই ঝড়ের গোপে একরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্তন করাইল। তিনি বসিয়া, তাহাদের কি হইল, কাছারি হইতে দূরবর্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কান্দিতে লাগিলেন। কিন্তু টোব সময় ঝড় ও ঝুটিল বেগ একরূপ বর্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার

ঘোরা নিশীথিনী

যেন অপরাহ্ন হইল আমার :

অশ্রু কালের অশ্রু গতিতে
 যেন ঘোর ত্রাস্তি হইল সঞ্চার ।
 ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
 ভৈরববিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত ;
 বহিয়া বহিয়া, আসিছে যাইছে,
 আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত ।
 ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
 হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন ;
 ঘোর ছহকার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
 ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ ।
 ঝড়ের গর্জন, সিঁদু-আস্কালন,
 কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি !
 যেন ঘোরারাবী, মহারোদ্রী কালী,
 নাচিছে তাত্তব ঘোর অট্টহাসি ।
 ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
 ঝলসি বিহ্বাতে জলদ-নীলিমা,
 ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
 দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্তি ভীমা ।
 সমুদ্রের গর্ভে উঠিছে জলিয়া
 বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি ;
 রুদ্ধ ক্রোধামল, বক্ষ বিদারিয়া,
 বসুধার যেন উঠিছে ভাসি ।
 সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির
 কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ,
 পর্কত-প্রতিম কি তরঙ্গমালা
 করিছে কেনিল সিঁদু বিলোড়ন !

ঝটিকার সনে যেন মহাসিদ্ধ
 মাতিয়াছে মহা প্রলয়-আলবে ;
 অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
 গর্জিতেছে যেন অবিরাম রবে ।
 উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীধর,
 পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণঘটি মত ;
 পড়িছে অসংখ্য রথ রথী যেন,
 ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত ।
 কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
 অনলে হঠাৎ উঠিছে জলিয়া ;
 করিছে ঝটিকা, কি কোতুকজীড়া,
 অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া ।
 ঘন ঘন ঘোর ঝটিকা-গর্জন,
 গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ ;
 ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে
 ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্কুরণ
 মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
 অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত ;
 গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
 ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত ।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী । কালি কালীপূজা । অনাথনাথের
 কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি ভীমকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে
 লাগিল ;—

“কি ভীষণ রণে, দেখ জিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিনী ।”

ভীহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টিসংহারিনী
 ধ্বংসকুণ্ডলিনী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করি-

ভেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ। সেই ঝটিকা
 তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া হইয়া সেই ভীষণাঘাত,
 তাঁহারই অসি প্রহার। তাঁহারই পদদলনে সিঁধু বিলোড়িত
 হইয়া, অগ্নি উদ্গিরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা
 যাইতেছে, তাহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বাদ্ধিধারা তাঁহারই
 মৌলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথনাথ বুকিতে পারিলেন
 যে, বৃণবাতায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত
 হইয়া, তাঁহারে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমাগিনী সাজাইতেছে।
 সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক
 আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির
 করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ ঘেরূপ দারুণ
 গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ ঘেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব
 করিয়াছিলেন। এখনও ঝটিকা ঘেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতে-
 ছিল, তাহাতে তাঁহার বোম হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে
 নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,
 প্রজ্জ্বলিত গৃহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে।
 স্থানে স্থানে যেন বিজ্ঞদালোকে মেঘস্তর বহুৰূপ পর্য্যন্ত আলোকিত
 করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া
 তুলিতেছে। এটার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল।
 এটার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্তার নিশীথেব মত অন্ধকার হইল;
 এবং দক্ষিণ দিক হইতে একরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল
 যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারী-
 ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্শ্বত-
 বৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক
 আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের
 পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আনিয়া যেন বল-সঞ্চয় করিতে একটু

বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহ জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্তে তিনি বিশেষ চিন্তাবিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে, তবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে, দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে— অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন। এমন সময়ে অগ্নি গৃহস্থিত লোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অগ্নি ছুই এক খানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্তনাদ করিয়া উঠিল,— “ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!” এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন; আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের গুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও’ সিঁদ্ধুর মিশ্রিত ভৈরব-নির্নায়ে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও “হা দৈব! হা আত্মা!” রবে আর্তনাদ করিতেছে। কিন্তু কার আর্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্ম-

রক্ষার জন্তে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল । এ দিকে মূলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; বৃষ্টিধারাও একরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই ; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে ! তাহাতে রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে । লোকে পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চাচের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল । অনাথনাথও সপরিবারে এক খানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন । তখন একরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাউতেছিল না । কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন । কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরমাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্ৰীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল । পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া, কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন ।

রাত্রি অল্পমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল । তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্রাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল । ঝড় তখন পশ্চিম সমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠ ভালু শুকাইয়া গেল । এ আশঙ্কা মনে উদ্ভিত হইবামাত্রই চাবি দিকে লোকেয়া “গর্কি ! গর্কি” বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং “চালে উঠ !, গাছে উঠ !” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের

উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেহ, এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্টাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সস্তরঙ্গপটু ছিলেন। জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটি গা অপেক্ষাও বিরাটশব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবাব যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্মান্বিত আর্তনাদ শুড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বাম হস্তে পুত্রকে ধরিয়া সস্তরঙ্গ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে একরূপ বাধা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমুচ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—“কেহ যদি আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর; আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।” এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রতিষ্ট হইল,—“বাবা! ভয় নাই, তুমি মাঝে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।” অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—“মা! তুই কে? তুই কি সত্যি ‘কমলে কামিনী হুগা’?” এমন সময়ে কদম্বময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল।

নাৎকে মুখে কৰ্দমাঙ্ক জল প্ৰবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ
কৰিয়া ফেলিল । অনাথনাথ মুচ্ছিত হইলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

রণক্ষেত্ৰ ।

চৈতন্ত লাভ কৰিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড
জড়াইয়া ধৰিয়া তিনি তাহার উপৰ মৃতবৎ পড়িয়া আছে ।
তিনি সম্পূৰ্ণ বস্ত্ৰহীন । ধীৰে ধীৰে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপৰ
বসিলেন । কৰ-পদ সঞ্চালন কৰিয়া দেখিলেন, কৰ্দমাবৃত দৃঢ়-
ভূমি । একি সমুদ্ৰ বেলা, না সমুদ্ৰগৰ্ভস্থ কোনও চূড়াভূমি ?
তখন আকাশ নিৰ্মল । সেই ঘটনার চিহ্নমাত্র নাই । কদাচিত
কোথাও হুই এক খণ্ড মেঘ নীল-সমুদ্ৰের চক্ৰাৰ মত দেখা যাই-
তেছে । সেই ঘোর ঘূৰ্ণঝটিকাও নাই । কেবল থাকিয়া থাকিয়া
শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া
যাইতেছে, এবং তাঁহার আৰ্দ্ৰ দেহে দারুণ শীতসঞ্চাৰ কৰিতেছে ।
কৃষ্ণা-চতুৰ্দশীৰ আকাশে অনন্ত নক্ষত্ৰরাজি ছুটিয়া আছে ।
নক্ষত্ৰের অবস্থান অবলোকন কৰিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয়
প্ৰহৰ অতীত হইয়াছে । চাৰি দিক শান্ত, স্থিৰ, নীরব—নিশ্চল ।
অনাথনাথের আবার ভানুমতীৰ সেই গীত মনে পড়িল ;—

“কি ভীষণ রণে, দেখ” ত্ৰিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিনী !”

সেই তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি । অনাথনাথ সেই ভীষণ
ঝড় ও সেই ভীষণ দৃশ্য সকল তবে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন ?

না;—তিনি উলঙ্গ; পত্নীপুলহারা; অজ্ঞাত স্থানে নিপতিত ও
 শীতে কম্পিত; স্বপ্নই বা হইবে কেন? তিনি কাঁদিতে লাগি-
 লেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—“হায় মা! তোর
 এ কি বিচিত্র পটপরিবর্তন। সেই ঘূর্ণবাত্যার পর এই শাস্তি!
 সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মূহ হাসি। সেই ঘোর উল্লসনের
 পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্তির পর এই
 মোহিনী রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতিপ্রাণা পত্নী
 এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রটিকে গ্রাণ করিয়া তোর মোহিনী
 শোভা দেখিবার জন্ত কি হতভাগ্য আমাকে জীবিত রাখিলি!”
 তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।
 বহুকণ একরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুকণ একরূপ ভাবিলেন। সেই
 রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও একরূপ অবস্থায় পতিত হয় নাট,
 সে কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেককণ তাঁহার হৃদয়েও যেন
 ঘূর্ণবাত্যা বহিল। অনেককণ রোদনের পর সেই বাত্যা বর্ষণ শেষ
 হইয়া হৃদয় কিছু শাস্ত্যাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি
 যেক্রপ রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্র সহ সেই দুর্গতি-
 হারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতীও ত রক্ষা পাইতে পারে। এই ক্ষণ
 আশার সঞ্চারে হৃদয়ে ও দেহে ক্ষীণ শক্তিরও সঞ্চায় হইল। তিনি
 চারি দিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। এ সকল
 কিসের আলোক? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক?
 সিদ্ধ-সৈকতে তরঙ্গাভিঘাতে লবণাশুকণারাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে
 আলোক উৎপন্ন করে, একি সেইরূপ কোনও আলোক এই
 ঘূর্ণবাতিকার পর সমুদ্র-গর্ভে কিংবা সৈকতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াই-
 তেছে? কিছুকণ মনোনিবেশ পূর্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথ-
 নাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া
 দেখা যাইতেছে। আরও কিছুকণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ

হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে । ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অক্ষুট আৰ্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল । তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে ? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না ? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল । তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন । কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল । তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃত মানবদেহ । এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো, মহিষ, ছাগ, পালিত পশু-পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল । একটি দেহে পা পড়িবামাত্র ক্ষীণকণ্ঠে রোদনব্যঞ্জক চাৎকার উঠিল, কণ্ঠ স্ত্রীলোকের । অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কে ?” উত্তরে একটি ঘবনী নাম শুনিলেন । সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—“আমি কোথায় ?” অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—“বাগতে পারি না ।” তখন “হা আল্লা !” বলিয়া রমণী একটি বেদনাব্যঞ্জক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল । অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন । সে আর উত্তর দিল না ।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ । তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে । যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আৰ্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন । অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল । তিনি একটি আলোকের

দিকে ছুটিলেন। সে অলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্তনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের “বোঁধা” * জালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২৩টা লোক একটা কাঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটা বাটি ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃতদেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্রাচীরে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তত্ত্বের নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কোন স্থান?” সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—“দেখছ না, তোমার শব্দ-বাড়ী। এই যে এক শাওড়ী পড়ে আছে।” এই বলিয়া সে একটা কর্দমাক্ত দ্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোণার বালা খুলিবার জন্ত সবলে টানিলে দ্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা টানিতে লাগল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের “বোঁধা” ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েক জন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হতভাগিনীকে মা। মা।

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বোঁধা, এ অঙ্গুলে বোঁধা বলে।

বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বৌধার আলোকে খুজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতে-ছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,—“আমি কোথায়”, কেহ “আমার পুত্র কোথায়”, কেহ “আমার পতি কোথায়?” তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, এসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অল্প দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা অপহৃত বস্ত্র লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বৌধাও জলিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় ঘাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাঠের উপর অবসন্ন অবস্থায় বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বাসিকার গীত যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল;—

“ক ভীষণ রণে, দেখ-না নয়নে, নাচে কালী রণরঙ্গিনী!”

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিনীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। সঁত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভয় গৃহখণ্ড

ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পাগড়, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিনী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর লরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, সমস্ত স্থানে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল নর, পশু, পক্ষীতে এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত জগ্যা-দিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটকাবিশ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাবাজি। এ কোন্ স্থান?” বৈরাগী বলিল,—“বাবা! এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আশ্রয় আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে অশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!”

অনাথনাথ বিশ্বয়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—“চম্বল।” বাবাজি স্থিরকণ্ঠে করিলেন—“চম্বল।”

সপ্তম অধ্যায় ।

—.—

প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র ।

স্ববর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে । তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল কেনিল
দিগন্তপ্রসারিত মহা-পারাবার । তাহার পূর্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ
মহেশ-খালি ও কুহুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী । তাহার পূর্বে প্রায় দুই
ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্বতীরে চঞ্চল-গ্রাম ।
ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্বে চঞ্চল-গিরিমালা । অনাথনাথ তবে
কি সেই স্বল্পকর্ণের মধ্যে সমুদ্রতরঙ্গে এতদূর ভাসিয়া আসিয়াছেন ?
এত গ্রাম, প্রাস্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন
করিয়া ভাসিয়া আসিলেন ? তাই তিনি চঞ্চল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত
ও বিস্মিত হইয়াছিলেন । প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকা-
তাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া এক্ষণে গিরি-পাদমূলে
পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিশ্বাসের কথা নহে । একি
স্বপ্ন ? একি কোনও অপদেবতার খেলা ? একি আশ্চর্য-উপ-
শ্রাস ? এক্ষণ অল্প ৫ ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে
বিশ্বাস করিবে ? তাঁহার কি যন্ত্রিক বিকৃত হইয়াছে ? এক্ষণ
অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না ? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ,
তাহার মুখে গ্রামের পরিচয় কি বিকৃত যন্ত্রিকের করুণামাত্র ?
তাহা কেমন করিয়া হইবে ? ঝটিকাধিকস্ত হতভাগ্য নবনারী,
বৈরাগীকে যে এখনও দেখা যাইতেছে । সে তাঁহাকেও তাহার
আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চঞ্চল শুনিয়া
তিনি বিশ্বাসে এমন অভিভূত ও অস্বমনস্ক হইয়াছিলেন যে,
তাহার কথার উত্তর পর্যন্ত দেন নাই । তিনি আরও দেখিলেন,

বহুবিন্দীর্ণ শব্দেস্ত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয়স্বজনের অবেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেশখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অস্ত্রান্ত গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অভূত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমমণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিতনয়নে চাহিয়া বলিলেন,—“রূপাণিকো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেক্রমে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার স্বকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ ‘রক্ষা’ কর নাই?” দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অবেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, উবালোকে যাহা আরও স্ফটিকতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—

আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে

ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে

শ্রামশস্ত্রসমাক্ষর, ছিল সুশোভিত

পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—

রজনী-প্রভাতে এবে—বিন্দীর্ণ শ্মশান।

নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের ;

যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—

শবাকীর্ণ শ্বেতভূমি, মহারণভূমি।

শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে।

সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব ।

শবতের শব্দক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—

সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি ।

পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,

কীট পতঙ্গের শব ; শব সংখ্যাতীত

শব্দক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে ।

ভয়গৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,

ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—

কঁট শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে !

নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,

বিজড়িত ডালে ডালে বিচিত্র বসন

পাদপের, শোচনীয় কালের কেতন ।

ভাসিতেছে সরোবরে, প্রাবনে পূর্ণিত—

শবরাশি অগণিত শব অজানিত ।

শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—

নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে !

যেই দীর্ঘ রাক্ষপথ উত্তরে দক্ষিণে

গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,

করি অবরোধ সেই সমুদ্র-প্রাবন

হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,

জালে যেন মৎস্যগণ । রয়েছে পড়িয়া

মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—

নাহি তিল মাত্র স্থান নিক্ষেপিতে পদ ।

স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময় !

কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,

মাতৃস্তন শিশুগুণে ; কোথাও পড়িয়া

শিশু ভ্রাতা ভগ্নী দুটি গলায় গলায় ।
 গলায় গলায়, বৃকে বৃক, মুখে মুখ,
 পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী ;
 কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী !
 কটিসহ দৃঢ়াবল পত্নী সহ পড়ি
 কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল ।
 হায় ! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
 প্রেমসীম, এইরূপে আপনার প্রাণ
 করিয়াছে বিসর্জন ! অনিন্দ্যসুন্দর
 যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
 এগনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ ।
 প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
 যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে জনয়,
 মুখে মুখ, বোষ্ট্রী গ্রীবা হই ভূজলতা !
 রমণীর কর্দ্ধমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
 আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
 করিতেছে হায় ! যেন লজ্জানিবারণ ।
 কোথাও মুমূর্ষু ভীষ মৃত্যুযন্ত্রণায়,
 লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
 করিতেছে ছটফট ! মৃত্যুমুখে কেহ
 পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার ।
 কোথাও বা নবনারী প্রেমমূর্তি মত
 নগ্ন, কর্দ্ধমাক্ত, শির জাহ্নু-মধ্যে রাখি
 রয়েছে বসিয়া শুদ্ধ, যেন বজ্রাহত ।
 কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন নিমেষে
 হইয়াছে সংঘটিত, নর চিন্তাতীত !

মানবের কুরুক্ষেত্র ভুলনায় তার

বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর !

অনাথনাথ এই শৌচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া গিলিলেন। কোথায়, কি জন্তে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্ন্তের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া গৃহের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। শব-স্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা দ্রীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মূর্খকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহাৰ্য্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্রাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। একুণ অবস্থা হইয়াছে যে, কেহ দোঁধলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহাশ্মশানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমুদ্রিশালী গ্রামে সাজ্জত ছিল। কোথাও একটা বৃক্ষ পথ্যস্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অস্ত্র স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই,—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে একুণ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল

গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমুদ্রিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধাত্তে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা ছ একটা ভগ্ন খুঁটির শেষভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীট মাত্র অবশিষ্ট আছে! পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গড়ে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২৪১০ জন তাঁহার মৃত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত, পত্নী, পুত্র, মাতা পিতাকে সইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—“হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?” রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত জীবিত আছে, তাহাদের কেহ বা জাহুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্তব্যবিমূঢ় আত্মহারা জড়পিণ্ডের স্থায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহুজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অল্প জীবিত জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা তুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে স্রবতটয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত

লোকের মত যথাসাধ্য আর্থের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শব্দক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পুত্রী, পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উদ্ভবের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অল্প সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শব-মালায় ঘেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শব-মালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রৌড়া করিতেছে! শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

“কি ভীষণ রণে দেখ না নয়নে নাচে কাগী রণরঙ্গিনী?”

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভানুমতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাবপূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহাটরাদ্রী প্রলয়কাবিনীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোরা ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই ক্ষুণ্ণ-রূপে সেই শাস্ত সায়াহ্নে সমুদ্র-নিব'দে মিশ্রিত সমুদ্রানিলে বাহিত

সেই মধুর গান্ধীধাময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন । সম্মুখে বেদের
কুঙ্গ পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন । বুঝিলেন,
বাটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ কুঙ্গ আশ্রয় নির্মাণ করিয়াছে । তাঁহার
ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উথিত হইতেছে ।
তিনি উৰ্দ্ধ্বশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

—•—

ভগবতী ।

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা-মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার
হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে । নিকটবর্তী হইলে,
কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাইতেছে, তাহার আর সন্দেহ
রহিল না । অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাঙ্গা কাপড় ও যষ্টি
কুড়াইয়া 'বালিকা' একটি কুঙ্গ আশ্রয় নির্মাণ করিয়া তাহার
অভ্যন্তরে বসিয়া শাস্ত, বিষম, গম্ভীর, উদাস-কণ্ঠে দিগ্ভাঙল কি এক
গম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাইতেছে—

ভূই কর লয়, 'ভূই বরাভয়,

লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,

সদা শিব উৰ্দ্ধগৌর,

দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আগনি ।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যায়
হল । গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল ।
গীত ক্রমে বন্ধ হইল । ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া

গেল। কিছু ক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

“হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালী পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?”

বালিকা তাহার মুখচুশন করিয়া বলিল, “হাঁ ভাই! এ তাঁহারই গীত।”

“কাল যে এ'ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?”

“হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তুমি আর একটি গীত গাও! তোমার গান আমার কড় ভাল লাগে।”

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুশন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশাইল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধু-নিদাদমাত্র শুনা যাইতেছিল আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু কণ্ঠ তাঁহারই পুত্র অমিয়ের। তবে অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জাহ্নু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ-নয়নে ঝিলিলেন,— “তোর কি অপূর্ণ লীলা! তোর যেই ধ্বংস ক্রীড়ায় মহামহীকহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাতিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস! দয়াময়ী মা!” অনাথনাথ কিছুক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার জন্মের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।— শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্বল হইয়া

পড়িয়াছে । অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিলে, দুর্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত ? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

“দিদি ! সত্যসত্যই আমি কালীমার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম । কিন্তু মা বলিলেন, তিনিও মা । হাঁ দিদি ! তিনি কি সত্যই মা ?”

বা । হাঁ অমিয় ! তিনি মা ।

শি । তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মাহুষ মারিলেন ?

বা । তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, তোমাকে কখনও মারেন নাই ? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্ত্যাব ধারণ করিয়াছেন ! তিনি যেমন এত মাহুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন ।

শি । আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি । তুমি কি তবে সেই মা ? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত ! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনি আদর ! তুই আমাকে কত আদর করিস্ ।

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, “না ভাই ! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না । দেখ নাই, কত ভয়ানক বৃকে কত ভাই মরিয়া রহিয়াছে ?

শি । না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্ ।

বালিকা গলদস্ত্র-নয়নে শিশুকে বৃকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্মিত দুই কুন্ড ভুলে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনির্মিত কুন্ড মুখখানি তাহার স্বর্গসম বৃকে লুকাইল । বালিকা গদ গদ কণ্ঠে বলিল, “তুই ভাই ! দেব-শিশু ! এই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন ।”

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালকবালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মনাকিনীদারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্-রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, “দিদি! সমুদ্র সর্বদা বি বলিতেছে?”

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পাব'বার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে,—‘আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুবে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে মিশিতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মিতেছে চলিতেছে, মরিতেছে।’ এ সমুদ্রের কত শক্তি। কাল দেখিয়াছ, কেমন ভরকর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—‘দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র; তোমার শক্তি তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়, লীলাময় হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।’

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় বাঁহার পূজা হয়?

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাক্ষায় যিনি প্রহ্লাদকে বক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর। কেমন সুন্দর চূড়া। কেমন সুন্দর বাণী। তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ

সাজাইয়াছিলে। আমাকে কি তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে ? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি ? আমার বড় সাধ, তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—“তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেব শিশু ছিল না। সে যে গরীব ছুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী দু'জনে সুন্দর সংকীৰ্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন ? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি।” এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুয়ন করিল।

শিশুর মুখ গভীর হইল। সে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি ! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন ? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না ?” শিশু কাদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণকল্প অশ্রু-ধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, “হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ নাগিয়া বুধা না ডাকিয়া থাকি, তবে অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাজি-তীহাকে, ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। আমিও। আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।”

“মা !”—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে প্রিয়া উজ্জসিতকণ্ঠে

বলিলেন,—“মা ভগবতি। তুই আমাব অমিয়কে রক্ষা করি-
য়াছিস্ এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা
করিয়াছেন।”

• বালক বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বাজিয়া ডাঠল,—
“বাবা!” যে এরূপ মহাপলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায়
নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে
বক্ষে লইয়া সাক্ষনয়নে তাহার মুখচুষন করিলেন। বালিকা
সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার
কুদ্র হৃদয়ের স্মৃতিতল কৃতজ্ঞতাবারি তাহার চরণকমলে ঢালিয়া
দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত
হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ কুদ্র
মুখখানি রাখিয়া কঁাদিতেছিল। কিছু ক্ষণ উভয়ে নীরব।
• শিশু যেন কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যেন কি এক অজ্ঞাত
আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃ-
দর্শনজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার
গাঢ়তর মেঘ তাহার কুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে
বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণকণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, “বাবা মা—কোথায়?” প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত হইবা-
মাত্র তাহার কুদ্র-হৃদয়ের গৈর্য্যের বন্ধন ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত
দিবসের রুদ্ধ শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিগ। বালক মুখ ফুটিয়
আকুলহৃদয়ে কঁাদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ
করিয়া বলিলেন,—“বাবা! যিনি আমাদের তিন জনকে রক্ষা
করিয়াছেন, তিনি তোমাব পূণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা
করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত
হইবেন।” বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল
“ওঃ! বুকে কত বাথা! বাবা আমি দ্বিদিব কোলে বাইব।”

হাঁ বাবা তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।”

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, “বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।”

শিশুর মুখে তাহার সেই শৈশবের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটু আনন্দ দেখা দিল। সেই প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল-নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সাক্ষ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সে অবর্ণনীয় অনমুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?”

অ। না বাবা! সমুদ্রের অস্ত পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশ আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি! বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া হাসিতেছেন। আমাকে “অমিয়! অমিয়!” বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই বাড়ীর প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর

ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া
মার চারিদিকে গায়িতেছে, নাচিতেছে ! আরে মার মাথার উপর
বাবা ! আমাদের বাড়ীর রাসের সেই কুম্ভ বসিয়া কি সুন্দর
বাঁশী সজাইতেছেন ! মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া
ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন ! মা ! মা !

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মূদ্রিত করিয়া অর্কযুক্তিত
অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড়
গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন,
খুব জ্বর। ডাকিলেন,—“বাবা ! বাবা !” শিশু “বাবা !”
বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—“ঔঃ !
বুকে বড় ব্যথা।” অনাথনাথ বুঝিলেন যে ঝটিকা-প্লাবন সময়ে
শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস
ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,—“দিদি ! আমার মা
আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে
গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্ ? তুই একবার
সেই গানটি গায়িবি ? আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া
নাচিতে পারিব না। আমিও তোরা সঙ্গে গাইব।” বালিকা
তাঁহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সাক্ষ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া
সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয় ও তাঁহার অমিয়পূরিত
কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল ;—

“তোরা নাম রেখেছি হরিবোলা।

মনের সাথে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।”

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা-পুত্রের
এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর,
এমন পবিত্র, এমন প্রাণজবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয়
নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন।

গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু
 ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে
 গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, যুথ শান্ত,—প্রক্ষুটিত
 কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ
 হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত প্লথ হইয়া পড়িল। শিশু
 নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদ-
 তলে, চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—“দাদা! দাদা!” উত্তর
 পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—“বাবা! বাবা!” উত্তর
 পাইলেন না। শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের
 পদতলে, চলিয়া গেল। অনাথনাথ ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া
 পড়িলেন। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র
 দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

নবম অধ্যায়।

মহাশক্তি।

অমাবস্তার ঘোরা কৃষ্ণ মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী
 প্রকৃত নৃসিংমালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ
 করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহারকারিণীর বৃষ্টি আর
 কখনও হয় নাই। অশানবাসিনীর পূজার রাজিতে এমন প্রকৃত
 মহাশ্রান বৃষ্টি আর কখন সজ্জিত হয় নাই। সমস্ত বঙ্গদেশ
 সারারাজি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্রান! আনন্দ-
 আলোকের পার্শ্বে একপে নিবানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা। ভূই

উভয়ের কি মহত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে
নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম
না;—মানব-জীবন বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত।
আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনাসম্মিলনে তোর সংসার
প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি
বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারী-
রিক ও মানসিক অবসাদে অচেতন্ত ছিলেন। অকস্মাৎ
তঁাহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিন শ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবে
মত “বাবা!” সন্বোধন প্রবেশ করিল। সন্বোধনে যেন তঁাহার
মৃতবৎ দেহে সজীবনীয় সুখা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্ত্যলাভ
করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—“বাবা!” এবং অনুভব করি-
লেন, তঁাহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বসিত হইয়াছে।
নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তঁাহার চরণ-
দ্বয় ধরিয়া তঁাহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি
পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র আয়ত নয়ন।
সেই মুখে সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ, কি শোক।
অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন।
তঁাহার মনে হইল,—এ বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা
আবার “বাবা” বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন,—“কি মা!”
বালিকা বলিল—“বাবা! আমি চলিলাম। আমি ২১ দিন পরে
আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্তে একখানি নৌকা লইয়া
আসিব। তুমি চঞ্চল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।”

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ বাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাদিয়া বলিলেন,—“হায়! মা! অমিয় কি আর বাঁচিবে?”

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

ভা। উঠে। লক্ষ্মীন্দ্র আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা! সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিলাম, আমি এ সমুদ্রে সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদি নাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যাব্যবেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাহার চরণধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্বে, সমুদ্রে ঝাপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদেরমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাধিয়া পথ চলে, তাহুমতী সেইরূপে মৃতশব্দকে তাহার পৃষ্ঠে বাধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, হু' হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে।* এ শক্তি ত মানবীর নহে!

* “Mohabat Ali of Tafalier Char in Kútubdia (I can not refrain from putting his name in record) was wash-

এ কি তবে সত্যই সত্যই সেই “কমলে কামিনী” মহাশক্তি ! তিনি আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

ছই ক্রোশবাপী সমুদ্রশাখা সম্ভরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্নে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চশেখরসানুস্থিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামধ্যাত ৮শঙ্করপুরীর শিষ্য ছিলেন । তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাজাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন । গৌরদাস দেহ-ত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন । সে কথাটাতে কি এক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল । সে দিন গণিতেছিল । সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে । সে বেদে-বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল । বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসিভক্ত ছিল । আর বেদেনী—সেও ৮পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার বেক্ষণ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মত রূপ-গুণ-বুদ্ধি-কোশলসম্পন্ন রমণীররূপে দেখিলেই ঘড়া-বড়া টাকা দিবেন । অতএব উভয়ে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া বাজি করিতে ‘সোণাদিয়া’ হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল ।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বন্ধ মৃত শিশু সহ অশ্রীলাক্রমে পর্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে

ed from his home across the Kutubdia Channel to Chhanua. He spent the whole of the next day in swimming back to the Island, with the help of plank.”

উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটি বিশাল পার্বত্য-পাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মুক্তি।

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
 তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
 জটায় মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
 আদিনাথ-অঙ্গিণিরে শোভিতেছে যেন
 উচ্চচূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
 মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
 যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
 চাহি অর্ক-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
 স্থির, শান্ত, অগলক। ক্রদ্রাক্ষের মালা
 অঙ্গে দক্ষিণ করে। শোভিতেছে বরদ
 বাম কর বাম অঙ্গে, যেন মহাযোগী
 করিছেন বরদান জীব, চরাচরে।
 শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
 কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
 কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরী-বাস
 বাম-অঙ্গ-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
 অপরাহ্ন-প্রবিকরে ভাসে চারি দিকে
 কি দৃশ্য বল্লনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
 চার দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল;
 পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বর।

- উত্তরে ধূসর সিদ্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের ;
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মৃত,
গিরিশ্রেণী তরঙ্গিত শোভে চিত্রাঙ্কিত ।
- পূর্বে শাখা সিদ্ধু ; স্বেতভূজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আগিপি আদিনাথের পবিত্র চরণ ।
শোভিতেছে পূর্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
ইন্দ্রধার বক্ষে শ্রাম মরকত-মালা ।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ভে জলধির
কি সুন্দর !—সিদ্ধুগর্ভে যেন নারায়ণ ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্ব নাভায়ণ ।
চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ন-ঐবিকরে
কি গাভীর্বাণীপূর্ণ শাস্তমূর্তিতে বিরাজ করিতেছে ! স্থান, কাল,
তাহার হৃদয়ের অবস্থা, সম্মুখস্থ মহাবোগী,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়
ভক্তিতে পরিপূরিত হইল । সমাধিশেষে যোগিবর নয়ন উন্মীলন
করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে
রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল । সন্ন্যাসী কোমল স্নেহকণ্ঠে
জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা । তুমি কে ?”

ভা । আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা ।

স । তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?

ভা । পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের
কাছে প্রতিক্রমিত ছিলেন ।

স । শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর ।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা। কি তাহা বিশ্বাস কর ?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী জীবৎ হাসিলেন।

স। কেন কর ?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মূহুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষু দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেক্রপ ছিল, সেই রূপই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্ত দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন ?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু স্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শ্রেণী দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও ?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা। মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে ?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম ? পুরী বাবাজির হুঁচুচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলময় জীবকে পুনর্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় শব্দর পুরী তোমাকে পুনর্জীবিত করিতে পাড়িয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন ?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ, এই শিশু যোগদ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কণ্ঠফল ভোগ করিবার ছিল

সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে।
 এই সমুদ্রের স্রোতে একুথানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে
 দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ
 ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের
 আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জন্ম হয়। এই
 স্রোতের অতীত হইলে আর হয়না। তোমার এ জগতে কর্ম আছে।
 তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে
 পুরী গোস্বামী পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জীবিত
 হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কণ্ঠেও বিষ
 হইবে।

ভা! আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার
 দ্বারা বাবা। কি মহৎ কর্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতনধর্মরক্ষা। যিনি ধর্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম,
 কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাহারই
 ক্ষুদ্রাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর
 ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও
 এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থ সকলের কি
 হ্রস্বত্বই হইয়াছে। যে আসনে পূজ্যপাদ ৬ গোমতীবন ও রত্ন-
 বনের মত মহাযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মোহন্তরাই
 বসিয়াছে। ইহারা ত মোহন্ত নহে মোহাক! ৬ গোমতীবন ও
 রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০০ টাকা। তীর্থের
 প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত হইত।
 তাহারা স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির-সমীপবর্তী 'আন্তানে' কোপীনমাত্র-
 পরিহিত হইয়া ভাস্মাচ্ছাদিতকলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশ
 অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেব-
 সেবার্থ যথা ইচ্ছা 'প্রণামী' প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া

চরিতার্থ হইত। কিন্তু বর্তমান মোহন্তগণের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যাত্রিগণ ও মোহন্তগণকে প্রণাম করিয়া ‘প্রণামী’ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংশ্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধর্ম ‘বেলঙয়ে’ পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সম্মুখে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এত কাল ‘কর’ বা ‘টেক্স’ আদায় করিতোঁছিল। মহামান্য হাইকোর্ট সেই ঘোরতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরানি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্মসেবায় নিঃশেষিত হইতেছে। দেব এবং অতিথি সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলি পর্য্যন্ত সংস্কারভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া বাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে এ দেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিষা নহে মা। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমচল, আগন্ধার চট্টগ্রাম, একরূপ প্রগাঢ় শান্তি, বুদ্ধিতিরের সেই ধর্ম্ম-রাজ্যের পর, ভারত আর স্বধন ও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের স্থল জটিলতা, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে ‘পৌত্তলিকতা’ বপেন। বাক্য মনের অগোচর পরমব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন ‘প্রতিমা’ যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা

‘পৌত্তলিকতা’ বলিয়া তাহার প্রশংসা দেওয়া অকর্তব্য মনে করেন।
অল্প দিকে প্রজার ধর্মে ইস্তফেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের
একটি মূলনীতি। বহু ধর্ম সম্প্রদায়ে বিস্তৃত ভারতবর্ষে ইহা যে
উত্তম নীতি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না
করিলে ধর্ম কে রক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা
করিলে দেখিতে পাই, রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম রক্ষিত হয় না;
এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্মস্থাপন করেন।
যত দিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, তত দিন তাহা
রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজশক্তি অপসারিত হইলে অধর্মের
অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কুণ্ডোক্ত ধর্মের পশ্চাতে
বুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্মের পশ্চাতে
অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির
অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্মের এই হৃদিশা হইয়াছে। ইংরাজ
রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সঙ্ক্লেপ রাজনীতি
আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন
তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম জীবনহীন; হিন্দু
সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসীদের সাহস আছে, উৎসাহ
আছে, উদ্যম আছে। মহাবাড়োও অর্ণবধানের পালদণ্ডের
শীর্ষদেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী
মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্মে ও সমাজে জীবন
সঞ্চার করিতে একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন,
তবে নৈসর্গিকশোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা
করিতে পারিবে। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির ঘেরুপ
শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই।

এই কাৰণে তিনি মুক্তহস্তে শস্ত ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুই বিচার না করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। মনে করিয়া- ছিলেন, যে বীজ উর্বর ক্ষেত্রে পড়িলে; তাহা হইতে সফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায় ! প্রায় সকল বীজই উর্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব, এবং তাত্ত্বিক ধর্মের তাৎপর্য্য, উদ্ভাবিতা, সমপ্রাপ্ততা, ইহারা কিছুই বুঝে না। শুনিলাম কোনও এক জন অবস্থাপন্ন শিষ্য অগ্নানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থযাত্রাতে যোগদান করিতে পারেন না, কারণ কোন মোহন ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামী ! তুমি কি এই ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলে ? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ, তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে ? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বৃদ্ধি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের এই অশেগতি দেখিয়া বৃদ্ধি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বৃদ্ধি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল !

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গলদক্ষনয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবা ! ইংরাজ রাজা দৌর্দ্ভিওপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতেছেন। দস্যু তৎকরের দণ্ড দিতেছেন। ষাহারা দেববান চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে ? তাহাদেরও অস্ত্র চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে ? ”

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহারা ভয় করেন যে,—“রাজা হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ

করিলেন—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে।
 তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের
 কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল
 মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী।
 কেবল কয়েক জন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে
 তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিন্ত যাহা এখন মোহন্তরা
 ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে
 যাইবে। ইংরাজ ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল
 বিষয়েই অল্লাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া
 তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে ছুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে
 অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দারদ্র দেশে যাহারা ধনী,
 তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম—
 উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্ত
 দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থবল। ইহাদের
 সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্বস্বান্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত
 পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ
 বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত
 দেববিন্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া বাইতে পারে। তাহা হইলে
 এই বিবাদে তীর্থের কোন উপকার হইবে না। কেবল অভিযোগ-
 কারীর সন্ধান। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া
 কেহ সর্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন
 দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্বে সমাজের
 নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর
 তাহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব
 হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি
 প্রধান স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের

আবির্ভাব হইয়াছে, এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্তে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই; না করিতে পারে, এমন পাপ নাই; না জানে, এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচা-শয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্মের হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না ?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধবী ধর্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম আছে, তীর্থ আছে। কোনও পুণ্যবতী সোপানশ্রেণীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও বাজিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে !

ভা। হায় বাবা ! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎ কার্য্য হইবে ?

স। মা ! তোমাকে পুনর্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার জন্মে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—“আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।”

দশম অধ্যায় ।

—*—

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্রাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনববের কীণকণ্ঠে, পত্ন এ অঞ্চলস্থ কর্মচারীদের পক্ষে ঘোরারাবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকারধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্সবাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্বে দক্ষিণ লুসাই পর্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে, বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে । অনুমান দশ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে । শত্রুসৈন্তের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অত্রস্ত বজ্রবর্ষণে নগর বেক্রপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে । নগরে পূর্ণগৃহমাত্র নাই ; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মহামহীকর সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে । কর্ণকুলিহ অর্ণবধান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে । জম্বোট মাজিষ্ট্রেট কিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়া-ছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্তে যেরূপ পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না ।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাত্তব্রবাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অহুশস্থানে জলপথে ছুটিল । তাঁহার জমিদারী স্বর্ণবীপ-রূপ মহাশয় স্থানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েক দিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন । তাঁহার পত্নীর ও বেনেদের বহু অহুশস্থান

করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্রসর্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তি ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্মেন্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে; কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্বা-পক্ষা হ্রস্ব কার্য্য শবের সংকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি শবে দ্বাপাবলী ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শগাল, কুকুর, গৃধ্রী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল একপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি দীরে দীরে পচিতেছে এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ভ করিয়া এই শবরাশি পুতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চির-স্মরণীয় একজন ইরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য সহস্বে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা একপ হতসাহস, কর্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুন্যবতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হ্রস্বল প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপ-খনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নী পুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্সন সাহেব (Cixou) পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি সও হৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাহাকে অত্যন্ত

স্নেহ করেন, এবং বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীয়স্থ আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না ।

অপরাক্ত । শিবিরছায়ায়* সিদ্ধসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসরদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি।। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপূরাহ্ন-রবি-করে তরঙ্গিত তরঙ্গ সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পধান ও অর্ণবধান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে ।

অ। মা। এত দিনে আমি বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। বাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজ্যকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গমগ্ন হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কলিয়ান সাহেব (F. R. S. Collier) একখানি “ষ্টিমলক” লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি,—এমন নির্দোষ, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ণজ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেবপ্রতিম ডিক্‌সন সাহেব একটি কর্ণাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কন্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহা নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে ককণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সাহসিকতা। মৃতদেহের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কত বার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্ত পরিশ্রম

করিতেছেন। ইহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, মুখা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চিরপ্রসন্নতা। ঐ দেখ, পাছকা-শূন্তপদে বর্দ্ধমে টাড়াইয়া, আন্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমানকাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। ইহার এক অংশে "সফ্যা, অত্র অংশে প্রভাৎ ; এক অংশে নিশীথসময়, অত্রাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত। তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সন্তদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্তি কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও মুখে রুদ্ধভাব শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের নিকট প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্ত ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষের দান-

ভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন । সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্ত এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্ত ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাসমহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা বেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, গুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব । ইহার পর আমাদের প্রিয়ভাষী কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন ।

এমন সময়ে আর এক জন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথ-নাথের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বসিলেন,—“একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্ট্যাবিস্তৃত লোকদিগকে বিলাই-তেছে । সে বলিল, সে ব্রাহ্ম ।”

অ। সম্ভব । ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে । পূজ্যপাদ ৮রামমোহন বায়ের অভ্যুত্থান না হইলে, এতদিন অন্ধকৈ হিন্দু খুঁটান কি মুসলমান হইত । এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন ।

সাহেব । আচ্ছা বাবু ! ব্রাহ্ম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের বিভেদ কি ?

অ। কিছুই না । হিন্দু ধর্মের উচ্চতম শাখাই ব্রাহ্মধর্ম । তবে ব্রাহ্মরা এক লাঞ্চে সে শাখায় উঠিতে চাহেন । অষ্টমবর্ষীয় শিশুও একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং বলিলেই ব্রাহ্ম হইল । হিন্দুরা বলে, গোড়া বাহিয়া বৃক্ষের আগায় উঠিতে হইবে ।

সাহেব ! হিন্দুরা কি পৌত্তলিক নহে ?

অ। না । পৌত্তলিক শব্দ হিন্দুদের অভিধানে কি ভাষায়

পর্যন্ত নাই। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। পরম ব্রহ্ম মানব-
ইন্দ্রিয়ের, বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে কেবল তাঁহার শক্তির
দ্বারা ধারণা করিতে পারি। হিন্দুরা এক একটি শক্তির প্রতিমা
নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া সেই সেই শক্তির পূজা করে।
অদ্ভুত জ্ঞান ও কবিত্বপূর্ণ প্রতিমাতত্ত্ব বুঝাইবার এ স্থান নহে।
আপনিও সহজে বুঝিবেন না। তবে এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন,
খৃষ্টানদের ক্রুশ যেমন খৃষ্টের আত্মবলিদানের নিদর্শন, এ সকল
প্রতিমাও এক একটি শক্তির ও সত্যের নিদর্শন মাত্র।

স। কিন্তু এই প্রতিমার প্রয়োজন কি ?

অ। ক্রমশঃ প্রয়োজন কি ? যে কোনও বিজ্ঞা লিপিতে
হইলেই তাহার অক্ষর চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই।
সকল বিজ্ঞা অপেক্ষা যে ছদ্মের তত্ত্ববিজ্ঞা, তাহা শিক্ষা করিতে কি
কিছুই চাই না ? হিন্দুদের প্রতিমাগুলি সেই পরম বিজ্ঞা শিক্ষার
অক্ষর, শাস্ত্র তাহার গ্রন্থ, সম্প্রদায় সকল শ্রেণী, এবং পূজা বা সাধনা-
পদ্ধতি তাহার প্রণালী। এখানে অস্ত্রান্ত ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের
পার্থক্য ও বিশেষত্ব। অস্ত্র ধর্ম শিষ্ট, বুদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী অভেদে এক।
হিন্দুধর্ম অধিকারিতভেদে স্বতন্ত্র সোপান আছে। বাহ্যর বেক্রপ শিক্ষা,
ও জ্ঞানলাভ হইয়াছে, বেক্রপ মানসিক শক্তি আছে, সে সেইরূপ
সোপান অবলম্বন করে।

স। কিন্তু অধিকাংশ লোক নিম্নতম সোপানে থাকিয়া যায়।
উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহারা এ সকল পুতুলকেই ঈশ্বর
বলিয়া বিশ্বাস করে।

অ। তাহা নহে। আপনি সামান্য এক জন মূর্খ কৃষককেও
জিজ্ঞাসা করুন, সেও বলিবে, এতগুলি ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর এক।
প্রতিমার বিভিন্ন দেবতার বা ঐশিকশক্তির প্রতিমামাত্র। স্মৃতি
ধনদার, সরস্বতী জ্ঞানদার, হর্গা হর্গতিহারিণীর, কালী ধ্বংস-

কারিণীর প্রতিমা । তাহারা মারীভয় হইলে কালী পূজা করে, জন্মী কি সরস্বতী পূজা করে না । আর অধিকাংশ লোক ত নিম্নতম সোপানে থাকিবার কথা । অত্ৰ বিজ্ঞান—দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পেও ত তাহারা নিম্নতম সোপানে । হিন্দু ধর্মের সোপানগুলিও এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহার সকল সোপানে, এমন কি, নিম্নতম সোপানে থাকিয়াও মানুষ সচ্চরিত্র হইতে পারে, গুনিপ্পাণ হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে । ধর্মের ইহাই ত উদ্দেশ্য । আপনাদের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু নিম্নশ্রেণী কত শাস্ত, শিষ্ট ও সাধু, মনুষ্যত্বে কত উৎকৃষ্ট । তাহার কারণ, অন্যান্য ধর্মে হিন্দু ধর্মের মত অক্ষর নাই, অধিকারিভেদে শাস্ত্র নাই, শ্রেণী নাই, শিক্ষাপ্রণালী নাই ।

স। যদি হিন্দুদের উচ্চতম ধর্মশৃঙ্গই ব্রাহ্ম ধর্ম হয়, তবে হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মতভেদ কি লইয়া ?

অ। কতকগুলি ছাই ভস্ম লইয়া, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, যুবতীবিবাহ ।

স। এগুলি কি মন্দ ?

অ। মন্দ ! জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী । প্রত্যেক পুরুষ বিবাহ করিলেও বহুসংখ্যক নারী অবিবাহিতা থাকিবার কথা । তাই ভারতে বহুবিবাহপদ্ধতি আছে । ইহার উপর যদি বিধবারা আবার দুই বার ; বহুবার বিবাহ করে, তবে অবিবাহিতা রমণীর সংখ্যা আরও বেশী হইবে । দ্বিতীয়তঃ, বিধবারা একবার স্বামী পাইয়াছিল । তাহাদের স্বামী না দেওয়া, কিংবা অত্ৰ রমণীগণকে একেবারে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখিতে না দেওয়া, অধিকতর নির্ভরতা । তৃতীয়তঃ, এই ভারতে এখনই অন্নজলের জন্তে হাহাকার । আপনারা বলেন, জনসংখ্যা

বর্দ্ধিত হইয়া একরূপ হইয়াছে । তবে ভারতের লক্ষ লক্ষ বিধবাব্যে-
বিবাহ করিতে দিলে কি জনসংখ্যা আরও বাড়িবে না ? আপনাদের
দেশে জনসংখ্যা নিবারণের জন্তে কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বিত
হয় । আর ভারতের শাস্ত্রকার বলেন, হিন্দুবিবাহ শরীরে শরীরে
সন্তোগার্থ নহে । উহা আত্মায় আত্মায়, ধর্মসাধনার্থ । আত্মার
মৃত্যু নাই । দেহের মৃত্যুতে উহা ছিন্ন হয়, না । অতএব
বিধবারা মৃত পতির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্যা বা বৈরাগ্য
অবলম্বন করিয়া, জীবন পুণ্যময় করিয়া যাপন করিলে পরলোকে
আবার পতির সঙ্গে অনন্তকালের জন্তে সম্মিলিত হইবে ।
সাহেব । ছুইটার মধ্যে কোনটি মহৎ উপায় ?

সা । কিন্তু অসবর্ণবিবাহে দোষ কি ? নূতন রক্তের সংমিশ্রণে
তাহাতে জাতির উন্নতি সাধিত হয় ।

অ । হয় । নূতন সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয়, কিন্তু
ভিন্নজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয় কি ? ঘোড়ার ও গাধার রক্তের
সংমিশ্রণে ঘে পক্ষর হয়, উহা না হয় গাধা, না হয় ঘোড়া । গাধায়
ঘোড়ায় বেক্রপ পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে, ব্রাহ্মণে কলিত্রে,
কলিত্রে বৈশ্যে, এবং বৈশ্যে শূদ্রে ততোধিক প্রকৃতিগত পার্থক্য
আছে । যাহারা জ্ঞানপ্রয়াসী, তাহারা ব্রাহ্মণ যাহারা যুদ্ধ-
প্রয়াসী, তাহারা কলিত্র, যাহারা বাণিজ্যপ্রয়াসী, তাহারা বৈশ্য,
এবং যাহাদের এ তিন কার্যের কোনটিরই প্রকৃতি ও শক্তি
নাই, তাহারা শূদ্র । ভারতে প্রথমে এইরূপ চারি বর্ণের উৎপত্তি
হয় । পুরুষানুক্রমে বিশেষ গুণ ও কর্মের অনুশীলনের দ্বারা
প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও সংস্কার এত বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছে
যে, তাহাদের এক মানবজাতি বলা যাইতে পারে না । এক জন
ব্রাহ্মণ আর এই ভোমকে দেখুন । ইহারা কি এক জাতি ?
জন জ্ঞানপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ যদি এই ভোমের কস্তা বিবাহ করে,

তাহার সম্বন্ধে কি সূচর্য্যের জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে ? ভারতীয় বিবাহের দুইটি উচ্চ অভিসন্ধি । প্রথমতঃ সৰ্মজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ সমজাতীয় দুইটি আত্মার সংমিশ্রণ । এই উভয় সংমিশ্রণের দ্বারাই জাতীয় গুণ ও কৰ্ম্মের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে । কেবল সর্বণে বিবাহ হইবে হইবে না । জ্যোতিষের সাহায্যে যথাসম্ভব দুইটি সমধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মার সম্মিলন চাই । আৰ্য্যবিবাহের সমস্ত প্রক্রিয়াই দুইটি আত্মার বৈজ্যতিক (Mesmeric) সংমিশ্রণ । উহা বুঝাইবার এ স্থান কি সময় নহে । আৰ্য্যদের দশকৰ্ম্মের ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে উহাদের বৈজ্ঞানিকতায়, দার্শনিকতায়, এবং আধ্যাত্মিকতায় অভিভূত হইতে হয় । যাক সে কথা । আপনাদের দেশেও অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত আছে । কিন্তু এক জন রাজপুত্র কি আপনি, একজন মুচি মুদ্রাকরাসের কন্তা বিবাহ করিবেন কি ? ব্রাহ্মসমাজেরও ত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণবিবাহ মূলনীতি । কিন্তু কয়টি এইরূপ বিবাহ হইয়াছে । সে দিন ব্রাহ্মসমাজের এক জন ভক্তিবাজন নেতা বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মবিধবা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মের কন্তা চাহে, বৈজ্ঞ ব্রাহ্ম বৈজ্ঞ ব্রাহ্মের কন্তা চাহে । মোট কথা, মানুষ্যের আকৃতি এক নহে, প্রকৃতি এক নহে । যেখানে ভগবান এইরূপ বৈষম্য ঘটাইয়াছেন, মানুষ্য কেমন করিয়া সাম্য আনিবে জলে জল মিশিবে, অনলে অনল মিশিবে । জগতে সর্বত্র সম প্রকৃতিই মিশে । অতএব সমপ্রকৃতিই জাতীয়তার ঈশ্বরভিগ্নোত্ত ভিত্তি । তাহা মানুষ্য কেমন করিয়া উড়াইবে ? এ জন্ত সকল দেশেই একরূপ না একরূপ জাতিবিভাগ আছে । আপনাদের দেশে উহা ধন ও পদমৰ্গাদাগত । আৰ্য্যদের উহা প্রকৃতিগত । বলুন দেখি, কোনটি অধিক স্বাভাবিক ? আর আপনি যে নতন

রক্তের কথা বলিয়াছেন, সেই কথা হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ভুলেন নাই । তাঁহারা বর-কস্তার কয়েক পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া, সমাজাতীয় রক্তের নতনত্বের বিধান করিয়াছেন ।

স। আচ্ছা যুবতীবিবাহ অপেক্ষা কি বাল্যবিবাহ ভাল ?

অ। ভাল । তিনটি কারণে ভাল । প্রথমতঃ কি যুবক, কি যুবতী, অবিবাহিত থাকিলে উভয়ের পদস্থগিত হইবার কথা । চরিত্রের বাঁধ, সংঘমের বাঁধ,, এক বার ভাঙ্গিলে উহা রক্ষা করা বড় কঠিন । দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ না হইলে কস্তা কিরূপ অবস্থাপন্ন পাত্রের হাতে পড়িবে, তাহা জানা অসাধ্য । ধনীর গৃহের উপযোগী করিয়া ছহিতাকে শিক্ষা দিলে, সে যদি দরিদ্রের ঘরে পড়ে, তাহার হৃৎকের সীমা থাকে না । সেক্ষেপ দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা দিলে সে যদি ধনীর ঘরে পড়ে, অক্লান্তের কীট আক্কেতে গেলে বেক্ষেপ অবস্থা হয়, তাহারও সেক্ষেপ হয় । বিবাহ হইয়া গেলে বেক্ষেপ ঘরে পড়িল, তাহার উপযোগী করিয়া পিতা মাতা, স্বপুত্র শাশুড়ী তাহার চরিত্র গঠিত করিতে পারেন । যুবতী-বিবাহে এ সুবিধা থাকে না । বিবাহের পূর্বে বর কস্তা উভয়ের চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে । গঠিত চরিত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতন করা, প্রস্তরমূর্তি ভাঙ্গিয়া নতন করার মত অসাধ্য । যুবক যুবতী পরস্পরকে গুণ দেখাইয়া আকর্ষিত করে । পরস্পরের দোষ কখনও প্রকাশ করে না । যৌবনের মোহে নির্বাসনশক্তিও আচ্ছন্ন করে । এই জন্তেই এই দেশে বর-কস্তা নির্বাসনের ভার পিতা মাতার উপর । কোনও কার্যের ভার অদূরদশার অপেক্ষা দূরদর্শীর উপর অর্পণ করা কি সম্ভব নহে ? যৌবনের মোহ অন্তর্হিত হইলে পরস্পরের প্রকৃতি অনাবৃত হইয়া পড়ে । তখন উভয়ের প্রকৃতি যদি বিভিন্ন হয়, বিপরীত হয়, উহা পরিবর্তন করিবার আর সময় থাকে

না । কাজে কাজেই বিবাহবন্ধনের ছেদন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । অত্যা, উভয়ের জীবন ঘোরতর অশুখের হইয়া উঠে । তৃতীয়তঃ, একস্থানে একটি বৃক্ষ ও লতার চারা রোপণ করিলে উহারা পরস্পরের উপযোগী হইয়া, কেমন সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয় । কিন্তু একটি বর্দ্ধিত লতা রোপণ করিলে সেকরূপ হয় কি ? বিবাহের পর হিন্দুদের বরকল্যা বুঝে, তাহারা এ জীবনের অন্তে সম্মিলিত হইয়াছে ; আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না । তখন চেষ্টা করিয়া হইলেও, একে অন্যের ভালবাসার পাত্র হইতে চাহে, এবং পরস্পরের সন্নিহিত্য এই চেষ্টার অনুরূপ হয় । এক্ষেপে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সৃষ্টি হয় । বিশেষতঃ, উভয়ের ভালবাসা অত্যা কাহারও প্রতি সঞ্চাৰিত হইবার অবসর থাকে না । এইটি একটি গুরুতর কথা । যৌবনসঞ্চারেই ইন্দ্রিয় সতেজ হইতে আরম্ভ হয় । যদি এ সময়ে কাহারো উপর চক্ষু পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে বিবাহ না হয়, এই প্রেমের ছায়া পতি-পত্নীর মধ্যে একটি আবরণের মত থাকিয়া ঘোরতর অশুখের কারণ হয় । এ সকল কারণেই হিন্দুর বিবাহ এত সুশাস্তিস্থিত, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ অপেক্ষাকৃত এত অল্প ।

স। বালকবালিকার বিবাহের ফলে কি সম্ভাবনীয় নষ্ট ও ক্ষীণজীবী হয় না ?

অ। হইতে পারে । কই ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই । আবহমানকাল হইতে বাল্যবিবাহ ভারতে চলিতেছে । তথাপি এতকাল রাজস্থান, পঞ্জাব, এবং উত্তরপশ্চিম ভারত, এমন কি, এ বঙ্গদেশ কি অপূৰ্ণ বীরভূমি ছিল ! তন্নিম্ন বিবাহ হইলেও যৌবন-সঞ্চার পর্য্যন্ত দম্পতীকে স্বতন্ত্র রাখাই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা এখনও প্রচলিত । বঙ্গদেশে শাস্ত্রাজ্ঞা যে সকল সময়ে প্রতিপালিত হয় না, সেই দোষ শাস্ত্রের নহে ।

স। কিন্তু জীলোকের অবরোধপ্রথা কি ভাল ?

অ। পরাধীন দেশে ভাল বৈ কি? আপনারা স্বাধীন, পরাধীনের হুখ বুঝেন না। পরাধীন পুরুষ শত লাঞ্ছনা নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু পত্নীর লাঞ্ছনা পণ্ড পক্ষাণ্ড সহিতে পারে না। ভারত যে দিন হইতে পরাধীন হইয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুদের মধ্যে এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপ্রদেশ তাহার সাক্ষী।

স। কিন্তু ইহারই কারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না।

অ। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে এই অবরোধ-প্রথা আছে। আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিন্দু মুসলমান মেশামিশি করিতেছে না? বিশেষতঃ, এই দেশের লোক দরিদ্র। তাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগকে ইংরাজি শিখাইবে, গাউন পরাইবে, উল্লা তাহাদের সাধ্যাতীত। আপনারা কি আপনাদের মহিলারা কখনও বাঙ্গালা কি দেশীয় ভাষা শিখিবেন না। সামান্য শাড়ী-পরা স্ত্রীলোক দেখিলে, নাক সিটুকাইবেন। একরূপ অবস্থায় অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিলে উভয় জাতির সম্মিলনের কি সাহায্য হইবে? ভারতীয় সম্প্রদায়বিশেষ ত উহা উঠাইয়া দিয়াছেন; সম্যক্রূপে আপনাদের সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কই, তাহাদের সঙ্গে আপনাদের কি খুব মেশামিশি আছে? বরং আপনারা কি তাহাদের জাতিভ্রষ্ট (out caste) বলিয়া অবজ্ঞা করেন না।

* * * * *

স। আর শিক্ষাপ্রণালী?

অ। এই অবাধবাণিজ্য ও মোকদ্দমার দাবানলে ইন্ধন বোগাইতেছে ও বাতাস দিতেছে। আগে লেখাপড়া, শিল্প ও বাণিজ্যের মত, জাতিগত ছিল। রাজ-শাসনে জাতিগত থাকিত। এখন তাঁতির ছেলে, কুমারের ছেলে, কামারের ছেলে, জেলের ছেলে, এমন কি, মেথরের ছেলে পর্যন্ত লেখাপড়া শিখিতেছে। উদ্দেশ্য চাকরি। ইহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য আরও ধ্বংস হইতেছে; যাহাদের লেখা-পড়া পুরুষানুক্রমিক একমাত্র উপজীবিকা ছিল তাহাদের অন্ন মাথা যাইতেছে, এবং আপনারা উমেদারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছেন। আর শিক্ষা-প্রণালীই বা কি। স্বয়ং নৃমুণ্ডমালিনী কালী! করে এক দিকে ভীষণ পরীক্ষা-খড়া ও শিশুর সত্বশিষ্ট শির। অন্য দিকে "সেনেটের" সদস্যদের ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষদের জল্প অভয়, ও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের জল্প বদন কর। শবরূপী বঙ্গদেশের বক্ষে শিক্ষাপ্রণালী তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। যে দেশে পরীক্ষার নাম গন্ধ ছাড়া ম হংপণ্ডিতসকলের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সে দেশে প্রায় ভূমিষ্ঠ হইতেই শিশুর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বৎসর বৎসর পরীক্ষা ত আছেই, তাহার উপর ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক, আবার "টেস্ট" (Test)। পরীক্ষাও আবার এক প্রকার অগ্নি-পরীক্ষা। আবার এক। সঙ্গে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, শিশুর সাধ্য নাই যে, একত্র বহিয়া লইয়া যায়। তাহাতে নাই, এমন বিষয়ই নাই। ১০। ১২। বৎসরের শিশুকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, নানি শিখিতে হয়, এমন তত্ত্ব নাই! কেবল নাই অনাবশ্যক ধর্মতত্ত্ব। তাহাদের খেলা নাই, পুস্তকের চাপে খেলার কথা দূরে থাকুক, অবসর পর্যন্ত নাই। আমোদ নাই, উৎসব নাই। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বের বহি পড়িয়া। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ের নৃত্য

পুস্তক কিনিতে হইবে। তাহা না হইলে শিক্ষাবিভাগের নিজের ও আত্মীয়ের অপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক সকল বিক্রয় হইবে কিরূপে ইহাই এখন শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব সকল আবার গলাধঃকরণ করিতে হইবে বিদেশীয় একটি ভাষায়। একখণ্ড মাটির চারিদিকে জল থাকিলেই দ্বীপ বলে,—এ কথা শিশুকে বলিলেই সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। তাহাকে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া মুখস্থ করিতে হইবে—Island is a piece of land Surrounded by water. ইহার একটি অক্ষরও সে বুঝে না। দ্বীপ কি, তাহা বুঝা দূরের কথা। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অনেক দিন হইল স্কুল ও কলেজ হইতে বিনায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ছিলেন তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। সেখানে শিশু। নানাপ্রকার স্তব কণ্ঠস্থ করিত, নানারূপ ধর্মোপাখ্যান শিখিত। অক্ষর লিখিতে শিখিলেই দেব-দেবীর নাম লিখিতে শিখিত, এবং গৃহে গৃহে সেই দেব-দেবীর পূজা দেখিত। এইরূপে দেবভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হইত। দেব-দেবীর নামের পর আপনার পিতা-মাতার, আত্মীয়স্বজনের নাম লিখিতে শিখিত। তাহাদের পিতা-মাতার কাছে পরমপূজনীয় ও সেবক-সেবকাধম পাঠে পত্র লিখিতে শিখিত। পূর্বপুরুষের নাম লিখিত, তাহাদের কাহিনী শুনিত। এইরূপে গুরুজনের প্রতি ভক্তি, অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত। এখন পাঠশালাতেও ধর্মশিক্ষা নিবন্ধ, এবং পিতার কাছে ইংরাজি স্কুলের ছেলে বাজলায় পত্র লিখিতে হইলেও লেখে, “মাই ডিয়ার ফাদার।” আর সুশিক্ষার বাকি কি? ইহাতে না আছে ধর্মশিক্ষা, না আছে কর্মশিক্ষা। ছ’পাত ছাই ভস্ম পড়িয়া আপনার ব্যবসার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কাম্যার, কুমার, তাঁতি, সকলেই চাহে—চাকরী, ডাক্তারী, উকিলি, মোক্তারি অধিকাংশ টম্বিগিরি। এক একটি

পাণিষ্ঠ অর্থপিপাসু উকিল, মোক্তার, টন্নি যেখানে আছে, মোক-
দ্দমার চোটে তাহার আশে পাশে দুর্কা গাছটি পর্য্যন্ত গজায়
না। কালে কালে এই শিক্কাব ফলেও দেশ উৎসন্ন বাইতেছে।
অন্নজলের হাহাকার উঠিতেছে। দেহ ধ্বংস হইতেছে, আপনারা এই
বীরভূমিতে সামান্য সৈন্তের যোগ্য লোক পাইতেছেন না। আত্মা
জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে,—দেশে প্রকৃত পণ্ডিত জন্মিতেছে না।

সাহেব নীরব, স্তম্ভিতভাবে স্থিরনয়নে সমুদ্রের সাক্ষ্যশোভায়
চাহিয়া রহিয়াছেন। ভানুমতী চরণতল হইতে বলিল, “বাবা।
ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?”

অ। এই ত্রিদোষের প্রতিকার আছে। রাজা সহজে
প্রতিকার করিতে পারেন। অবাধবাণিজ্য উঠাইয়া দিয়া কিংবা
স্থানে স্থানে রাজভাণ্ডার হইতে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া
শিল্পীর অন্ন যোগাইতে পারেন। পূর্ববৎ, গ্রামবাসীর দ্বারা
পঞ্চায়েত নির্বাচন করাইয়া ফৌজদারি, দেওয়ানি মোকদ্দমার
ভার তাহার হস্তে দিতে পারেন। শিক্ষাপ্রণালী পূর্ববৎ সরল,
সহজ, স্বাভাবিক করিয়া সম্প্রদায়বিশেষে স্বেচ্ছায় যেরূপ সংস্কৃত
ও আরব্য-ভাষা শিক্ষা দিবার বিধান করিয়াছেন। সেরূপ ছাত্র-
দিগের ধর্মশিক্ষারও বিধান করিতে পারেন। আর পারি আমরা।
পারে একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। পারে ধর্ম ও জাতিবিশ্বেষ-
হীন একটি মাতৃসেবক প্রকৃত সন্ন্যাসিসম্প্রদায়। ইহারা গ্রামে
গ্রামে ঘুরিয়া ধর্মের সঞ্জীবনোন্মুখ্য গ্রামবাসীর হৃদয় আর্জ করিয়া,
আবার সেই ধর্মমণ্ডলী বা পঞ্চায়েত এবং সেইরূপ পাঠশালার
সৃষ্টি করুন, এবং স্বদেশীয় শিল্প শবহার করা এবং এই পঞ্চা-
য়েতের দ্বারা সর্বপ্রকার বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, গ্রামবাসীদের
প্রকৃত ধর্ম বলিয়া শিক্ষা দিউন। আপনার ভাল মন্দ বুঝাইয়া
দিলে বুঝে না, এরূপ মানুষ নাই। এইরূপে গ্রামে গ্রামে বুঝাইয়া

দিলে আমাদের দেশের লোকেও, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, বুঝিবে।

সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অনাথ-নাথের করমর্দন করিয়া বিদায় লইয়া বলিলেন, “অনাথবাবু! বলা বাহুল্য, আপনার সঙ্গে আমি সৎল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। তবে ইহা মুক্তহৃদে বলিতে পারি যে, অনেক বিষয় আমি বুঝিলাম, এবং চিন্তা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয় পাইলাম। ইহার জন্যে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।”

একাদশ অধ্যায় ।

—•—
মহামুনি ।

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পৰিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্শ্বতা-অঞ্চল হইতে গৃহনির্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্রাণবিক্ষমতা বাদ—এ অঞ্চলে তাহাকে “কাঠি” বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্রাণে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্রাণনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন! এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্মিত দ্বিভল কাছারী-বাড়ীর নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাহার একুপ সন্মান। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে একুপ সাহায্য করিয়াছেন, জনরব তাহা বিদ্যুৎবেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ স্মৃতিতে

স্থানান্তর হইতে প্রজা সমাগত হইতেছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইতেছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আনন্দ করিয়াছে। এখন আর জমিদারীতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিত্র এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা— অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর খাওয়া তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত, স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্থতিতে বহুদিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। আত্মগণ্যমবলে অশ্রুসংযবণ করিয়া বলিলেন,—“মা ! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে ? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি ! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শূন্যে শূন্য হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব ? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না ” ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অল্প প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পাতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু হুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ— নবনারী, বালক বালিকা,—তাঁহাকে বিদায় দিতে আদি আর্ন্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়ার্গা

দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাক্ষনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত
ব্লাইয়া কত আশীর্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভাহু মতীর
প্রতি ‘মা’ বা ‘দিদি’ সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে ঝইয়া
গলা জড়াইয়া কাদিতেছে। সকলে বলিতেছে—“তুই মা ।
কোনও দেবকণ্ঠ।। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস্ ।”
অনাথনাথ ও ভাহু মতী গলদক্ষনয়নে তাহাদের নানা রূপে
সান্ত্বনা দিয়া বজ্রায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্রকল্লোল প্লাবিত
করিয়া, তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস ; পূর্ণ
বসন্ত। বজ্রায় ষ্ঠেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল ;
তরলী পক্ষপ্রসারিতা বাজহংসীর আয় সমুদ্রের নীলগর্ভ বিদারিত
করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণকুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী
গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকা-
খচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে
বৃক্ষবাক্সিসজ্জিত শ্রামবপু উখিত হইয়াছে। তাহার সর্বোচ্চ
শেখরে বৃক্ষপল্লবাস্তবালে অর্কলুকাযিত, অর্কপ্রকাশিত, মনোহর
অট্টালিকা। বিস্তীর্ণ কর্ণকুলীর

—“পড়ি জল নীলে ধবল সোধ ছবি,

অলুকাবিছে নভ অঙ্গন ও।”

এক দিকে নদী। অত্র দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে
সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনিয় মহাক্ষেত্র।
নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের চূড়া গগনে উখিত
হইয়া অপূর্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের
অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দুই
দিন পূর্ব হইতে এখানে প্রকৃতিত নাগেশ্বরবনে পর্বত ও সমতল-
বাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। অনাথনাথ বাটী

ফিরিবার কিছু দিন পরে এই মেলায় আরম্ভ হইয়াছে । এই মহামেলার কথা আমি চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া “বঙ্গবাসী”র এক জন বিদেশীয় প্রবন্ধলেখকের ভাষায় বলিব ;—

“মহামুনি চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদিগের একটি প্রসিদ্ধ মেলা । অতি বৎসর বিবৃৎসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে । এ দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী মগনের বসতি, এবং সমতল উপত্য-কায় নানা স্থানে বৌদ্ধ-ভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে । ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ণ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে । বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি হৃৎকের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতরপ্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন । সকল জালা সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়বে !

* * *
“মরি । মরি । কি প্রাণারাম স্থান । কি মনোহর দর্শন । এমন ত জীবনেও দেখি নাই । এ দৃশ্য যে করন্যরও অতীত । অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল । সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি স্কুলতায় আচ্ছন্ন । মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত । নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর । বসন্ত পূর্ণমুর্ত্তিতে বিরাজিত । অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন । বিলাসিনী বাসস্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মুর্ত্তি ; এ মুর্ত্তি ধারণায় আইসে না । সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায়, উত্তেজনা কুরায়, দেহগ্রস্থি শিথিল হইয়া পড়ে । আজ সেই বসন্তের নির্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ । সকল

দোকানেই মহা ভিড় ; এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয় । এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান । চতুর্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বাবেণ্ডা আছে । মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিবাহটমূর্তি । ইহারই অর্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলার অসংখ্য যুগের সমাগম হইয়া থাকে । মূর্তিটি লম্বে ১০-১২ হাত, এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা । বিরাট-রূপে অর্কনির্মীলিতমন্ডে ঘোগাসনে উপবিষ্ট । কি প্রশান্ত মূর্তি ! কি গভীর ভাব ! দেখিলাম, ৭৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন । তাঁহাদের মস্তক মুড়ান—দাঁতি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেক্কা বসন ।”

অনাথনাথ হিন্দুধর্মাবলম্বী হইলেও অত্র ধর্মের প্রতি ও ধর্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তিপরায়ণ । তিনি এই মেলায় সাহায্যার্থ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সেবার্থবহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন । তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্নে মেলাস্থলে আসিলেন । উভয়ে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন । প্রশান্ত উপবন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে । ষত দূর দেখা যাইতেছে, নানা পার্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত ; তাহাদের গীতে, হাস্তে ও বংশীধ্বনিতে সুখারত । মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, ‘বউ কথা কও’ নাগেশবরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনির্নাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে । পার্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কাস্তি । পুরুষের মস্তকে সশ্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘনকৃষ্ণ কেশের চূড়া । সেই বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

“সকলেরই এক বেশ । মগপুরুষের মাথায় বেশমী রুমাল, গায়ে কুর্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধূতি হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙুটি । তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না । মগমহিলাদের খোপা প্রকৃত কুলের ত্রায় কৃত্রিম কুলের তোড়ায় সুশোভিত ; বক্ষঃস্থল একটি বেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে বেশমী শাড়ী, গলায় টাকার মালা ; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গয়না । ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুকুল পুরু রোপাখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয় । মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রসাদে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী । সকলেই বেশ সুশ্ৰুপুষ্ট । তাহাদের দেহমন সততই প্রকুল । মগ পুরুষেরা সকলেই বলশালী ও কৰ্ম্মঠ ; কিস্তি খৰ্ব্বাকৃতি । স্ত্রীপুরুষ সকলেরই নাসিকাটি চাপা । মগেরা বড় আশ্রয়প্রিয় ! নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য । শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুল্যের আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে ; অথচ মুখে নির্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ ।”

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বৃদ্ধদেবকে পূজিতে বাইতেছে । অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জাহ্নু রাখিয়া লগাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল । তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে । আল্লায়িতকুস্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাকরণা স্বর্ণপ্রতিমাস্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল । কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল, অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখ

হঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসব ক্ষেত্রের এক নির্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলায় কোমল মকমলদগ্নিভ শ্রাম দুর্কাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন; হিন্দুর কি মহগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা। এই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ সকলেই কি আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যেখানে ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি ব্রহ্মের দমন ও সাধুদের পরিভ্রাণ করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।' ঠিক এই অবস্থায় ভগবান ত্রিকূক্ষ মথুরাধ, বৃহদেব বপিলবস্ত্রতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্তে হিন্দুরা সকল ধর্মে বিদেবহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। শিষ্কার্ণের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত-হঃখ-নির্কারণ উপাদ-উদ্ধাবনের

জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ণ নিক্কান-ধর্ম-
প্রচার, তিরোধান, ভক্তিরূপ তর্কে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিত-
হৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সাক্ষ্য
নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাক্ষনয়নে সেই তিরোধানকাহিনী
বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ
নীরবে বসন্তের সাক্ষ্য আকাশপটে আঁকিত দেখিল। বহুক্ষণ
পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—“বাবা! আমার পূজনীয়
বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।
তিনি আমাকে বাঙ্গালা গ্রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের
ব্রজলীলা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত
পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।”

• অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই।
কিন্তু হায়! এখানকার শিক্ষাপ্রণালী কেবল আমাদের বালকদের
মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান
দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম;
শিখে,— না ধর্ম, না কর্ম; যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী,
দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও
কুল্লনলিনী। রমণীরা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের হৃৎ উচ্চ শিক্ষা
বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভি-
মান, স্বার্থপরতা ও পতিপ্রতি যোগিতা যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা
প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম
ত্রিশ বৎসর কি কাঁরাইছিলেন, কেহই জানে না। তার পর
২০ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দু বৈরাগী ভূমি আমার
গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছি, তিনিও একজন কোপীন-উত্তরীয়-

পরিহিত বৈরাগী যাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেকূপ স্থানে যেকূপ সময়ে, যেকূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দ্রুততের দমন, সাধুদের পরিভ্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্রুততের দমনের জন্তে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খুষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দ্রুততেরা তাঁহাকে “ক্রশে” নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতোই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না; শ্রীভগবান এক,—কেবল সাধনার পথ প্রকৃতি-ভেদে স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি যা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে বড় রসের কথা কি শুনিয়াছ?

ভা। শাস্ত্র, বাৎসল্য, দাস্ত, সখ্য, কাস্ত, মধুর।

অ। তাত্ত্বিক হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রসংশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতামাতার মত প্রেম করে। হিন্দু বেব দেবীরা পিতা মাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্তরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতা মাতার দাস কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখ্য। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দঘনোদা শ্রীকৃষ্ণকে যেকূপ

প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস।
 শ্রীদাম জুদাম যেরূপ করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজ-
 গোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎ-
 পতিকে . সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম
 করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপেক্ষাও
 শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ
 প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও
 গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয়
 ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে
 করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়া-
 ছিল। এই অবস্থা হিন্দু যোগীর ‘সোহহং’ এবং বুদ্ধের
 ‘নির্ঝাণ’। এক্ষেপে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, মানুষ তদনুরূপ রস
 বা ধর্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম একটি সাধনার পথমাত্র—
 গন্তব্য স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি,।
 তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্মপথ,
 অপর ধর্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সন্ধ্যা আরম্ভি বাজিয়া উঠিল।
 বাসন্তী জ্যেষ্ঠর নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্তী পর্বত ও
 প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত
 হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন ;—

“দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকের
 শ্রামল গিরিবাজি দূর সুনীল প্রাচীরের তায় দেখা যাইতে
 লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার
 কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু
 নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের এক বিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং
 সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও

উঠিয়া উঠিল । শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জলিয়া উঠিল । ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন ৬ শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল । মগ-মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় লজ্জিত হইয়া দলে দলে চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল । একি ! একি ! আমি স্বর্গে ! এরা কি দেব-বালা ! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অম্বরী ! এদের চতুর্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে । লাবণ্য চলিয়া পড়িতেছে । পূর্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি ? বেশভূষাই বা কোথায় ? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল । আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি,—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ-মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে ।”

“যুগ্মগীত যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালকগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাশিত মন্দিরের প্রশস্ত বাবাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্তন করিতে লাগিল, আর একবার আনন্দে উন্নত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক নীংকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ বারংবার কাঁপাইতে লাগিল ।

“যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গণে বাস্তা ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে ? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে । এ মেলায় এমনই মহান ভাব ।”

“যাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে গাইল, গাচের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তোমরা মাটিতে শুইলে কেন ? হাসিমুখে
উত্তর হইল,—‘প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা ; এমন
শয্যা আর কোথায় পাব ?’

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ব্রজলীলা ।

সুন্দর বৈশাখ মাস, সুন্দর সুনীলাকাশ,

কি সুন্দর বহিছে মলয়,—

শান্ত সুশীতল !

কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা

উপত্যকা তরুণোভাময়,—

সুন্দর শ্রামল !

সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে

নীলাকালে শ্রামল ধরায়,—

কি হাসি সুন্দর ।

বুবতী পার্কসতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,

সরলার হাসি নিরমল,—

প্রাণ স্নিগ্ধকর ।

সে বৃথিকা হাসি মাখি শোভিতেছে কর্ণকুলী

পার্কসতীর পদপ্রান্তে,

মালা মালতীর ।

পার্কটীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী

কি তরল সুখা নিরমল,—

কি শাস্ত গভীর !

অনাথনাথ ও ভাষ্কর্য্যময়ী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুলচন্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাভূমির শীর্ষস্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষ-অন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণলোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে গুল্ম ও ভূগণ সমাবৃত্ত পার্কটা ও সমতলভূমি জ্যোৎস্নালোকে 'কি মনোহর শ্রামশোভা ধারণ করিয়াছে। এই শ্রামক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্রাপ্ত কণকুলীর কি নয়নানন্দকর বন্ধিমগতি ! শ্রামার ও খেতভূজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে। গিবিশেষেবে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উজ্জান চন্দ্রকের ঋণ-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণবসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সেই কোমল-প্রোক্তাসিত শোভা বল্লনাঙ্গভ। অট্টালিকার ছাদের টবে নানাজাতীয় ফ্রোটন, ফুল ও লতার মনোহর উজ্জান ও নিকুঞ্জ স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নাধি একটি স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে উথিত হইয়া, মানবকে নির্বাণের পথ দেখাইতেছে, যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যবস্ত্রের দ্বারা মানব-

হৃদয় তাহার মৃত জ্যোৎস্নাবিধৌত শ্বেতনির্মলকান্তি ধারণ করিলে তবে নিরীক্ষণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি ‘লাউঞ্জ চেয়ারে’ এবং ভানুমতী তাঁহার পদভলে আরক্তমকমলমণ্ডিত ‘ফুটষ্টুলে’ বসিয়া স্থিরচিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সন্নিঃসাগিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও দিগন্ত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়। উভয়ের মুখ প্রশান্ত; অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিবাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছুক্ষণ স্থির নয়নে এই শোভা দেখিয়া, এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—“মা! আমি স্থির করিয়াছি” তোকে আমার কল্যায়ের গ্রহণ করিব।”

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কল্যায়ের গ্রহণ করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা। বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণে শাস্ত্রমতে গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের মেয়ে নও, বৈরাগীর মেয়ে। সকলে বলিতেছে, তুমি কোনও শাপ-ব্রষ্টা দেবকর্তা। এত রূপ, এত গুণ, এরূপ চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের পুণ্যলোক শাস্ত্রকারেরা ত্রিভুগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে বাহ্যিক সামাজিক ভাষায় জাতিব্রষ্ট, তাহাদিগকে

পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্য হইতে পারে না। এই নিশ্চয়ম বিবেচনামূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে হ্রাস করিয়াছে, এমন নহে; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোণার ভিত্তিকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে, শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে গুরু করিয়া সমাজে লইবার জন্য “গুড্‌লিডা” স্থাপিত হইয়াছে। মাড়গয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্থী ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খুঁটান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি, যখনবের সিদ্ধনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা ‘স’ উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিদ্ধ নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশ-বাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম? যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচ্ছন্ন গাছারে যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছন্ন এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী

সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের নীৰ্ব্বাহনীয় বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্তির পূজা আছে, ভারতের অন্তর্গত তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নিগূঢ় নিরাকার,— বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পূরণ ও তত্ত্বের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার। পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্মের মূল নহে। ঘোরতর মত্তমাংসাপীও হিন্দু এবং মত্তমাংসবিদ্বেষী নিষামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্মের মূল কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়া পদ্ধতিসহ দশকর্মপদ্ধতি ও বর্ণভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায়নির্কিংশেষে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং’ বলিয়া পূজিত। সর্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত; সর্বত্র ঔদ্ধ পদ্ধতি এবং বর্ণধর্মীভূতাবে অস্বাধিক পরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল ঔদ্ধ পদ্ধতি ও বর্ণধর্মীভূতাবে কর্মের দ্বারা সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্মীভূতাবে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তীর্থ ছেলে যেরূপ কাপড় বুনবে, একজন মহাপণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করি-

যাও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামুখ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই বৌদ্ধধর্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু তাহা হইলেও কোনও রূপ সামাজিকপদ্ধতি যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্মের মূল এই ত্রিনীতি বা মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আশ্রয় নহে?

অ। আমি এ কথা এক দিন নরনারায়ণ ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎ-কর্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনের জন্তে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু এক জন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতিনীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্মকে বিকৃত করা বই নহে আর দেশে থাকিয়াই কোন হিন্দু ইংরাজ

মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না ? যাহা দশ বৎসর পূর্বে অখণ্ড বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে ? যাহারা বৃদ্ধাক্রমে খাইতেছে, কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না ? আর যাহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন ?

ভা। কিন্তু বাবা ! আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে ?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্রমশানসদৃশ এই পূর্বাতে অঙ্গিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনত মুখে বলিল,—“তাহা হইগেই বা কি হইবে ?”

অ। তুমি সুখী হইবে ; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা ? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

সুখ যাহা বল কথার কথা,
দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন ?

আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম !

এই আকাশের নীলিমার মত
হৃৎ(ই) জীবনের স্থিতি ও বিস্তার ;

সুখ যাহা বল বিজ্ঞান মতন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিয়া তাহার !

আচ্ছা ! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা সুখ কি তাহা কখনও জানে নাই,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে ত সেরূপ কোনও ভাব নাই।

সে স্থির গভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্নাপ্রোভাসিত নির্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । তখন তাঁহারও মুখ গভীর ও চিন্তাবিশেষের ভাব ধারণ করিল । তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,— “বড় কঠিন প্রশ্ন । তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে ; গৌরবে নহে, বিভবে নহে ; ধনে নহে, জনে নহে । পদে পদের আকাজ্জা, সম্পদে সম্পদের আকাজ্জা বাড়ে মাত্র । ক্ষণিক ভূষ্টির পর অতৃপ্তি বাড়ে মাত্র । সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয়, করিয়া আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাদিয়াছিলেন ! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই । ইহার। রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল ! কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে, কেহ তৃপ্ত হইয়াছে, সুখী হইয়াছে,—একথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই ।”

ভা । আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মই সুখ ।

অ । তোমার মুখে ধর্ম্মপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও এক জন পরম সাধু ছিলেন । ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ । ইহার দ্বিতীয় পথ নাই । থাকিবার কথাও নহে । আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে । এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ । যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সদল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে । তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম । তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ । এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ তাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ ।

তা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজি-ওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিলাম। বাবুরা ক্রোধের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার অবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের সময়ে 'নবযৌবনের' মেলায় দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জলস্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উজ্জ্বল আবার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি বোডেশী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—“আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।” তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে, তাহার ভক্তির উজ্জ্বল আবার কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম,—“তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।” কিন্তু তাহার বাহুজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—“আমি বড় হতভাগিনী। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না।” এক জন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞামতে আমার গ্রীবের গল্ফাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে ধরৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে

লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত হি়র নির্ণিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অর্চনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহুজ্ঞানের উদয় হইল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া কান্দিতে লাগিল, এবং পরিচয় বিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে স্বজন-গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অবেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্তিদর্শনের জন্ত ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী একপভাবে এক জন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পুড়িতে পারে, তবে ব্রহ্মকিশোরীরা অদ্বৈতকর্ম্ম ও দৈব-শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শাস্ত্র-বিক বলি এত অশ্রুয়ের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই ‘সজল-জলদ-সিদ্ধ-কাস্তি’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে অধীরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুষন করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধবেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্তদেব কি শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? তবে সরলা ব্রহ্মগোপীরা স্বয়ং কে শ্রীভগবানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার অস্ত্রে পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে এক জন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে

গুলিগে গ্রামবাসিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না ? বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোর মাত্র ; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ ।

আর একদিন আমি কার্যস্থান হইতে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসি-শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন । তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে । তখন আমার মনে হইল যে, একটি মুখ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা একরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে ? কালে যমুনাতীরভিনীত এই সরল ও সহজ, যমুনার সলিলের মত নির্মল, নীতল ও মধুর ধর্ম্ম ও আবিল ও পঙ্কিল হইল বোক, খুঁটায়, মহামদীয় ও গোরাইয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে । ইইবারই কথা ; শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে ? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চেতনের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল । তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণ নামে ও কৃষ্ণপ্রেমাক্রান্তে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন । আহা ! কি করুণ মধুর লীলা ! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে ? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দবশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুধামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই

যড়রসভোগের অভিনয় বেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জগতের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বড় কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে “সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।” ব্রজের গোপীরাই সর্বধর্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, এক্ষেপে তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম, কঠিন বন্ধ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্মপথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্মপথের প্রকৃত পথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম সে প্রেম শিক্ষা দিবার ক্ষেত্রে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে প্রভুর মত, পিতার মত পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। যা! তুমি একবার সেই গানটী গাও না।

জানুয়ারী তখন বংশীবিনিমিত্ত সুমধুর কণ্ঠে হৃদয়লীল সুখরিত করিয়া মধুর কীর্তন গাহিতে লাগিল,—

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয় ।

রাসে তোরা কে নাচিবি আয় ।

ওরে চক্রে নাচে তারা নাচে,

ধরা নেচে নেচে যায় ।

২

কার্তিক পূর্ণিমা নিশি

• গ্রহে গ্রহেতে ভাসি,

বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশী, প্রাণ-উদাসী

বুকু হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায় ।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার

ছাড়ি, বুকু অবতার,

ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,

পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধু আয় বে আয় ।

পত্নী পুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায় ।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,

হুই নেত্র ছল ছল,

মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল

নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়,—

নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায় ।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,

প্রেমে হাসে যমুনা,

প্রেমে হাসে বন্দাবন,—নাহি উপমা ।

নীলমণিধারা প্রেমে যমুনা উছলি যায় ।

৬

আহা আছেন জৈশ্বর

বিবাজিত নিরস্তর

সর্বভূত-জগদেতে, ঈশ্বর বাসেশ্বর ।

রাসচক্রে সর্বভূত প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,

প্রেমের গোপী আমরা,

কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা ;

জন্মে জন্মে কর্মফলে ভ্রমি ভব রাসলালার,—

(নাথ!) নবীনের নাহি হুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়!

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী বৈশাখী জ্যোৎস্নায়

পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাইতেছে, এবং তাহার কপোল-

বৃগল বহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তি বিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

অনাথনাথ ভাবিলেন আমি কি তবে ভ্রান্ত ?”

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিজয়া।

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নির্মমের জন্তেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্তিক ঝটিকাসম্মুল মাস; তথাপি জ্যৈষ্ঠ পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জামিনারী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদাক্ষণ

শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তিছায়া পাইয়াছেন ;
কি যেন এক সঙ্কল মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন ।
তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না ; শোকের
কথা কেহ শুনিল না । অতি প্রত্যাঘে গাত্রোত্থান করিয়া
তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন । ইহা তাঁহার চির
অভ্যাস । তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া গুরোদ্যানে ভ্রমণ
করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন । সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ
লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা
করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং
যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার
চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে কিরেন । ভানুমতী ইহাতে তাঁহার
এক জন প্রধান সহায় । অনাথনাথ গৃহে কিরিয়া গেলেও
সে অনেককাল গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখ-
দুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত । সে যেন তাহাদের
পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়িয়াছিল । শিশুরা তাহাকে দেখিলেই
আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন
আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর
বর্ষণ করিত । সকলের মুখে সেই এক কথা, “মা ! তুই কোন
দেবকন্তা ?” সেও জাতিনির্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে
বাবা ও মা, ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত
এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্তার মত আদর করিত । তাহাকে
দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয় ।

অনাথনাথ গৃহে কিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য
করিতেন । তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের
সহিত জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন পূর্বে এরূপ দেখেন নাই ;
কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত অংশগ্রহণ করিয়া সেবস্তার

কাগজপত্র গোছাইয়া লইতেছেন ; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ গতিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উত্তানে, নদীতীরে, কিংবা পর্বতে পর্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোনবৃক্ষতলায় কি গিরিশেখরে উপলব্ধিতে "কি উত্তানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্কার, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে; সে পূর্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সন্ধ্যাকীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত ; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন ; ইহা শ্রীকৃষ্ণদেবের জন্ম ও জিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাজি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুবৃষ্ণ অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাইতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

“জাম পরশমণি, কি দিব তুলনা ।

সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা ।

হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন ;

কর্ণের ভূষণ আমার সো নাম শ্রবণ ।

নয়নের ভূষণ আমার রূপদর্শন ;

বদনের ভূষণ আমার সে নাম কীর্তন ।

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর, সে যেন উজানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে ; ফুলজ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্রায়নামে সুধীরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে ; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । তিনি যুদ্ধস্থলয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন । কিছু ক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল ; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বুঝিলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু । এ কি ? তিনি উঠিয়া উদ্‌বাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উজানের দিকে দেখিলেন । নির্মল ধবল জ্যোৎস্না-লোকে পত্র-পুষ্পশোভিত উজান হাসিতেছে । কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই ! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদর্শনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গ গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন । কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে । ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রৎ অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন । প্রত্যুষে উঠিয়া উজানে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু কই, অল্প দিন বেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজও নাই । তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে ; তিনি পুরগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই । তিনি তখন মনে করিলেন, বাসিকা কাল-অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই । তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন । বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ

সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিজাহার তীরে উহা
 আরও কত সুন্দর ! অবহার পর্ত্তজাল ভেদ করিয়া, ভক্তিশ্রোতের
 মত কর্ণকুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক
 সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে,
 বসন্তের বালস্বর্ষাকিরণে কর্ণকুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে।
 দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাধনাথের হৃদয়ের একটি প্রতিচ্ছবি। গত
 সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি
 তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্তসলিল ভক্তিশ্রোত সেই 'জাম'
 পরশমণির দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল ; কই ভানুমতী
 আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল।
 তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে
 শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাধনাথ একখানি পুষ্ক কাগজ
 ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

“মা ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল
 সম্পত্তি তোমার। এই পূণ্যাতিথিতে আমার পূর্বপুরুষের এই
 পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।” ভানু-
 মতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত শরীর ঘেন কল্পিত
 হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ
 বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল
 অশ্রুসিক্ত করিল। অনাধনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে
 ভুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন, শিশিরসিক্ত শতনলের
 তায় সেই সুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না।
 অনাধনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দাশ্রনয়নে শয়নকক্ষে
 প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে
 হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত ব্যক্তি জাগিয়াছে,
 তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কৰ্মচারী আসিয়া বলিলেন, “বে কৰ্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবার প্রতিপালনের আপনি সে দিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্তে তাহার একটি বাস খুলিলে তাহাতে আপনার নামাক্তিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।” কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি “ভুলট” কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

“শ্রীহরিঃ শরণং ।

মহামহিমার্গ

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্গবেষ্ণু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্বক নিবেদন।
১২৮৮ সনের কার্তিক মাসের মহা ঋড়ে রাজধানী গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিনী বে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছ দিয়া একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বন্ধের মধ্যে রাখিয়া বাজি অভিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার হুই বৎসর বয়স্ক কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সে বিষয়ে ৮ পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাহার

দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জীবিত করেন। আমার বৈরাগিনী কান্দিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাজিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অশেষে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, হৃটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিনীর জীবনসর্ব্ব্ব হইয়া। এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিনীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। ৮পুত্রী গোস্বামীও নিবেদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি ত্রিভুগবতীর অংশসম্পূর্ণ। কোনও মহৎ কার্য সাধনের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কটি মুখে জীবৎ হস্ত করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই ত্রিভুকের লীলা,—আমি মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। যা আমার স্বয়ং সেই ব্রহ্মকিশোরী কৃষ্ণপ্রোমাদুর্বাগিনী শ্রীবাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিপ্লবিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিনী আমার পূর্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রীহরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তত্ত্বের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২০৮ সন।

শ্রীত্রিভুকের দাসদাস

শ্রীমোরদাস বৈরাগী।”

পত্রপাঠ শেষ করিয়া “ভানুমতী আমার আমিরা !” বা
 আমিরা ! মা আমিরা !” বলিয়া আনন্দে উঠেঃস্বরে বোদন
 করিতে করিতে উন্নতের মৃত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে
 প্রবেশ করিলেন । অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়নকক্ষের
 পার্শ্বের একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে
 থাকিতে দিয়াছিলেন । কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব ।
 কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই । সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত
 উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অব্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে
 পাইলেন না । পুরীতে মহা আনন্দের কলবর পড়িয়া গেল ।
 কর্মচারী, দাস দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি দিকে অব্বেষণে
 ছুটিল । সকলেরই মুখেই—“ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে
 আমিরা !” সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল,
 “ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে আমিরা !” সমস্ত উদ্যান ও
 উপবন আনন্দে পত্রের মর্শ্বরে বলিতে লাগিল, “ভানুমতী
 বাবুর হারাণ মেয়ে আমিরা !” শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ হবে,
 পার্শ্বত্যা পক্ষিগণ কল কলরবে বন্ধিতে লাগিল, “ভানুমতী বাবুর
 হারাণ মেয়ে আমিরা !” কর্ণকুলী আনন্দে তর তর শ্রোতে বহিয়া
 যাইতে যাইতে বলিতেছিল, “ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে
 আমিরা !” উপত্যকাহ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল,
 “ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে আমিরা !” কিন্তু ভানুমতী কোথায় ?
 এ আনন্দ-উজ্জ্বলের সময় ভানুমতী কোথায় ? বাহাকে বুকে
 লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন অগৎ আকুল হইয়াছে,
 সে ভানুমতী কোথায় ? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান,
 নদীতীর, সর্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন,
 ভানুমতীকে পাইলেন না । তিনি ভয়ঙ্কর গলদগ্রনয়নে
 গৃহে কিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন । শূন্য

গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,
 “ভানুমতী কোথায়?” তিনি বাতায়নপথে পুরোস্তান,
 নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবন
 সদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই
 যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—“ভানুমতী কোথায়?”
 তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বন্ধ
 রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের
 বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্তহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে
 লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার লিখিবার মেজের উপর তিনি
 যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া
 দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর হৃদয় হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং
 শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিহ্বলবেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন
 করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

“বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব।
 সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায়
 ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা
 ও বৈরাগিনী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তখন আমার
 নাম ছিল স্বর্ণ। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান
 গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার
 স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিনী মাতা আমাকে বন্ধে লইয়া
 ককনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। তাহাতে আমার
 হৃদয় হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্য, কি
 ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার
 সময়—কাদিতাম, পিতার সমুদয় সাক্ষ্য এই শোকশ্রোতে ভাসিয়া
 যায়। এই শোকের শাস্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও
 পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি

দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান; বলিয়াছিলেন,—যা। তুই আমাদের মেয়ে নহিন্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেবকণ্ঠা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বজ্রায় আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিস; আমরা মহাপাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যাৰ্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান। বৈরাগিনী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অৰ্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুদ্ধি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন। আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীন হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে একরূপ অভিভূত হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুহুমের উপর পার্কৃত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলাট বেকরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া, আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে এক দল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোন গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার আতি যাইবে। অতএব তুমি বেদেরের সঙ্গে চলিয়া যাও।' অগৎ অন্ধকার

দেখিলাম । আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না । আমি
এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্ডা হইলাম । মেনিনী মাতা কিছু
ঔগ্রপ্রকৃতি হইলেও, বেদে পিতা বড় ভালমানুষ । তখন আমার
নাম হইল—আশা । সর্বশেষ তাহাদের শিশু পুত্র গোপাল—
(এখানে পক্ষে এক ফৌটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা ।
আমার কোথায় গেল । তাহার আদরে আমি সকল দুঃখ
ভুলিয়াছিলাম । এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় ।
তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শনলাভ করি । দর্শনমাত্রাই
কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, ‘অভাগিনী । এই তোমার
পিতা, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতা । হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া
গিয়া তোমাদের চরণতলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ
আকুল হইল । কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি ;
কত লোক কতরূপ স্নেহমমতা দেখাইয়াছে ; কিন্তু মনের এমন
ত ভাব কখনও হয় নাই ; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া
মনে হয় নাই । তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও
করুণা । তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড় । মাকে হারাইলাম,
ভাইকে হারাইলাম । আমার গোপালকে হারাইলাম । সেই
দরিদ্র আশ্রয়দাতা হুটিকে হারাইলাম । (এখানে অশ্রুতে লেখা
ভাসিয়া গিয়াছে ।)

কিন্তু বাবা । শ্রীভগবানের কি লীলা । যে ঝড়ে পৃথিবী
দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুল-
টিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল ! যে
ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার হস্ত কি এই
স্বর্ণের স্রষ্টা করিল । আমি এই করেক মাগ তোমার হৃদয়ে কি
স্বর্ণ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্ণের সংবাদ শুনিলাম,
তোমার, সেহে কি স্বর্ণ ভোগ করিলাম । সর্বশেষে আমি

পথের তিথ্যগিণী, রাজনন্দিনী ;—একটি বিপুল রাজ্যের
উত্তরাধিকারিণী ।

কিন্তু বাবা ! বৈরাগিণী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে ?
তোমার ওই উত্তানের লতাটি যে ভাবে তরুটিকে অবলম্বন
করিয়া উঠিয়াছে, বলপূর্ব্ব তাহার সেই ভাবের, সেই গতির
কি পরিবর্তন করিতে পার ? সে জীবনগতা বৈরাগ্য-বৃক্ষ অবলম্বন
করিয়া এত দূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া সংসার-
বৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে ? বাবা এই
কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাই-
লাম । কিন্তু কই ? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার
এই বিস্তীর্ণ রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই
আমার চক্ষে পড়িল না । তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই
দেব-হৃদয়ে, তোমার দেব-হৃদয় জ্ঞান । তোমার পাদপদ্মে মাথা
রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভাহুমতী সুখী । তাহার
অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে
না । বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন,
তুমি এই কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত
করিয়াছ । তুমি কি তাহার ফল ফল হইতে দিবে না ?
বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত
করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ । তোমার সুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান,
কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া
পড়িয়াছে । সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিট বড়ই মহিমান্বয় হইয়াছে ।
এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে
পারিলেই আমার সুখ । এ হৃদয়ে অল্প সুখ স্থান পায় না ।

“হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,

কর্ণের ভূষণ আমার সে নামশ্রবণ ।

নয়নের ভূষণ আমার রূপদর্শন,

বদনের ভূষণ আমার শ্রামশৃঙ্খলান।

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ
কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও থাকে
দেখিলাম, সে দিন বুঝিলাম, দেব দেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি!
বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন।
আমি তাঁহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা
হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাগী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের
পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ
ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন
অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই
বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু
তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব?
এখন যে পাথরের বাল-গোপালটি আমার বুকে আছে, আমি
তাঁহাকে আমার সেই হাথাগ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি।
তাহাবাই কালে সেই যশোদার ছলনাকে আমার বুকে আনিয়া
দিবে। তুমি যে ছয় বৎসর ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার
মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। তাঁহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি
তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি
সেই যশোদার ভাবে বিজোর হই। তবে তুমি এক ব্রহ্মে
যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান
করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। শুক্লদেব ৮পুত্রী গোদাম্বারী
আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহার
কাছে আধিনাথে গিয়াছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্তন
করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন, আমার

দ্বারা কোন মহৎ কার্য হইবে বলিয়া । অমিয়কে বাচাইলেন না ; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্যের বিঘ্ন হইবে । সেই মহৎ কার্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি । এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে । তাহার নাম হইবে ‘অনাথ-ভাণ্ডার’ । উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে ।

১। যে সকল তীর্থযাত্রী মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে ।

২। কয়েক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি পূর্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে । এবং ইহাদের দ্বারা বাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ববৎ পঞ্চায়ত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তি-বিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের প্রবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।

৩। বাহাতে অল্প শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, বালকবালিকাগণের অস্ত্রে সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই ভোমার ও জননী নামে স্থাপিত হইবে, এবং ‘অনাথনাথ’ ও ‘রাজবাহুবলী’ নামে ভোমাদের হরগৌরী মূর্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি সন্ন্যাসী ও আত্মনিরন্তর দেবী হইবে ।

৫। আদিনাগের পশ্চিমে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার শুকদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । তাহার আদেশমতে সেই

পবিত্র স্থানে মহামহীকহ অর্থের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরু-
দেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি । সেখানে ‘অমিয়গোপাল’
নামে একটি বালগোপালমূর্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে,
এবং ‘অমিয়াশ্রম’ নামে আদিনাথ-শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর
আশ্রম স্থাপিত হইবে । উহা ঠিক ভারতের পূর্বকালীন আশ্রমের
মত হইবে, যেন সাধু বৈরাগী সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে
তপস্তা করিতে পারেন । সেখানে একটি টোল ও বিজালয় স্থাপিত
হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা
হইবে । সমুদ্রপ্লাবনের সময় দীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয়
পাইবে, এবং সেই ‘অমিয়ভাণ্ডার’ হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য
পাইবে । সেই আশ্রমের মান্দরে তোমার ও জননীর প্রতিষ্ঠা
থাকিবে ।

বাবা ! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না । আমরা
পিতাপুত্রের,—মাতাপুত্রের,—আশ্রমের স্থান শ্রীভগবানের চরণা-
বৃত্ত । আমি সেই আশ্রমে চলিলাম । তুমিও আসিও ।
বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত
হইব । তপস্তা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী ‘অমিয়াশ্রমে’ আসিয়া তাহার
দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব ।

তোমার মেয়ের কন্যা

“ভাহুমতী ।”

অনাধনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন ।
পড়িতে পড়িতে অকস্মাতে পত্রখানি সিদ্ধ হইল । শেষবার পাঠ
সমাপন করিয়া বলিলেন, “মা ! ভাহাই হইবে । কুই একত
মায়ের কাজ করিলি ; তোমার এই পণ্ডিত পুত্রকে ঠিকার করিলি ।”
তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, “আমার সমস্ত বিষয়
স্বর্ণমুদ্রার হস্তে অর্পণ করিলাম । দেশের প্রধান ব্যক্তিদের

দ্বারা একটি সুমিতি গঠিত হইবে, এবং তাহাদের অধিকাংশের মতে এক জন সাধু কার্য্যার্থ্যক নিয়োজিত হইয়া আমার কন্তা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পুত্রের গিথিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। ‘অমিয়াশ্রমে’ ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে ‘অমিয়গোপাল’ মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।”

কক্ষে আলনার উপর ভানুমতীর ছইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত ।

উৎসর্গ।

বাঁহার উদ্দেশে প্রবাস হইতে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল,—
তাঁহার নামে এই প্রবাসের পত্র উৎসর্গ করা হইল।

বিজ্ঞাপন।

প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ আমার “সাহিত্যে” প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুণা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতবর্ষীয় চিত্র, এই তিন খানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।

কবিবর নবীন বাবু, আমার অনুরোধে, পত্রগুলি মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন, সেখানে হইতে সহস্রখিনীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা, হয় ত রেলওয়ে ট্রেনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে। সাহিত্যের অনেক পাঠক প্রবাসের পত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রবাসের পত্র, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, আশা আছে, সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

২রা আশ্বিন

১২৩৩

} শ্রীম্মরেশচন্দ্র সমাজপতি।

প্রকাশক।

প্রবাসের পত্র ।

—*—
দার্জিলিং ।

ঈশ্বরের রূপায়, আমার এই বিপদসঙ্কুল জীবনের একটি সুখস্বপ্ন অংশতঃ সফল হইল,—আমি দার্জিলিং দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্তি হিমাচল দেখিলাম। বাল-সূর্য্য-কিরণে প্রদীপ্ত, তপ্ত-কীৰ্ত্তনাভ কাকনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বৃষ্টি এমন মহান দৃশ্য আর নাই। হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সান্নিহিত, শৈবিমালায় পুষ্পিত, নীতল-পাদপ-শ্রেণীতে উপবনীকৃত, দার্জিলিংয়ের মনোহারী চিত্র-খানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। ততোধিক সুখের কথা, আমার শৈশবস্মৃদ্ধ অভিন্নহৃদয়, সহৃদয়তায় কামিনী-কোমল, উমেশকে দেখিলাম। আর দেখিলাম তাহার উমাকে! স্বামী উমেশ, ভার্য্যা কেদার-কামিনী! “অথগুপ্তগানং কলমিব” না হইলে, বোধ হয়, পতি এমন পত্নী, ও পত্নী এমন পতি লাভ করিতে পাবেন না।

শৈশব হইতে প্রকৃতির মহাপ্রদর্শনভূমি পার্বত্য-মাতার (চট্টগ্রাম) অঙ্কে যে বিরাজ করিয়াছে, দার্জিলিং তাহার পক্ষে দেখিবার অভিনব দৃশ্য তত কিছুই নাই। গিরিপার্শ্ববাহী ‘রেল-ওয়েট’ বেক্সপ ঘুরিয়া কিরিয়া,—তবে তবে, পর্বতের পাদমূল হইতে উর্কে মেঘমালা ভেদিয়া উঠিয়াছে, নগরাজ যেন বক্ষে

স্তরে স্তরে উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—উহাই কেবল দেখিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে যখন মেঘজাল ভেদ করিয়া উজ্জ্বল উষ্ণ-
লাস, তখন স্থানে স্থানে নীচে কিছুই দেখা বাইতেছিল না।
জগৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! কেবল হিমাদ্রি,
আকাশের সীমা দেখাইয়া, হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও আতঙ্ক জন্মা-
ইতেছিল। আর দেখিবার যোগ্য প্রভাত-অরুণালোকে সুবর্ণ-
মণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

উমেশের উমা সম্বন্ধে আর হুঁচকার কথা না লিখিলে, তুমি
বিরক্ত হইবে। হিমালয়ের অঙ্কে, উমা-উমেশ-শোভা, এই
শব্দকালে সন্দর্শন, আমি আমার জীবনের একটি প্রকৃত
হৃর্গোৎসব বলিয়া চির দিন মনে রাখিব। দার্জিলিং আজ
আমার চক্ষে একটি পুণ্যতীর্থ। ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথম
আমাদের মধু বাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়। কিঞ্চিৎ মনো-
নিবেশ করিয়া দেখিলে, এ ফুলেশ্বরী সম্বন্ধে বলিতে হয়,—

“ওরে প্রিয় ফুল তুলনা যে নাই,

কি তুলনা দিব ?

মিছে কি বলিব ?

অতুলন তোরে বলিছে সবাই।”

এ ফুলেশ্বরীর গান্ধীর্ঘ্যমাখা ঈষৎ হাসিটুকু,—জ্যোৎস্নার কোলে
ঈষৎ বিজুলী সঞ্চার,—মধুমাখা রেহটুকু, বৈশাখী জ্যোৎস্নার
অমৃতভরা ভাবটুকু, বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই। তাহার
অঙ্কে দুইটি পুত্র কুহুম বিবাজিত। ঈষৎ নিকটে প্রার্থনা কর,
তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মাতার উজ্জল মুখ আরো উজ্জল
করুক! আমারও দুই বন্ধু বাদ্য সমান। আর একটি পুত্র,
অল্প পুত্র করিয়া, মাতার ঐ দেবীমূর্তিতে বিহাদের ছায়া মাণাইয়া

দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পতি-পত্নীর ভালবাসায় আজ দার্জিলিং আমার চক্ষে যথার্থই কৈলাস,—দুইটি দিন স্বর্গস্থলে অতিবাহিত করিতেছি।

বৈদ্যনাথ।

পথে কয়েক ঘণ্টা কাল বৈদ্যনাথে ছিলাম। শ্রীক্ষেত্র যে দেখিয়াছে, তাহার কাছে বৈদ্যনাথে দেখিবার কিছুই নাই। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের অনুকরণে একটি প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে বৈদ্যনাথ। বলিতে হইবে না যে, তিনি লিঙ্গরূপী। প্রাঙ্গণের চারি দিকে, মন্দিরে নানা দেব দেবী। অধিকাংশই বুদ্ধদেবের মূর্তি, যেখানে বুদ্ধ-মূর্তি কোনও মতে লুকাইবার যো নাই, সেখানে তাঁহার নাম “কাল-ভৈরব” হইয়াছে। বৈদ্যনাথ, দেওঘর বা দেবঘর, অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু আমার তত ভাল লাগিল না।

বৈদ্যনাথে, “অমৃতবাজার পত্রিকা”র সম্পাদক শিশির বাবু ও তাঁহার সহোদর মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা বশো-হরের বন্ধু—বেশ আদর করিলেন। প্রাতে তাঁহারা আহার করাইলেন। সেই ঘোরতর ব্রাহ্ম দুই ভাই এখন ঘোরতর বৈরাগী; এখন প্রত্যহ তাঁহারা পূজা আত্মিক করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া, শিশির বাবু বৈদ্যনাথে আশ্রমবাসী হইয়া, সন্ন্যাসী নির্জনে থাকেন। দেখিলাম,—আমার জীবনের সেই স্বপ্ন, শিশির বাবু কার্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার জী বাধেন, তিনি পার্শ্বে বসিয়া “অমৃতবাজারের” সম্পাদকীয় কার্য নিৰ্বাহ

করেন। বৈরাগ্য এত দূর যে, ঘরে বসিবার আসন স্থান পর্যন্ত নাই। খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া, অতি তৃপ্তির সহিত, তিন জনে আহার করিয়া। তাঁহারা এক জন বৈরাগী সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিন জনে মিলিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের সেই কবিতা গাইলেন। কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, হাস্য গলিয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ভায়ে ভায়ে মিলিয়া এ কীর্তন, আমি ত জীবনে ভুলিব না। বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি যে প্রেমামৃত আছে, তাহা যত পান করা যায়, কিছুতেই পিপাসা মেটে না। তাঁহারা গাইলেন,—

“দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমায়ে নয়নে দেখি,

বেড়াইয়া ভুজ্জলতা স্বপ্নে ছদয়ে রাখি।”

প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় দেওঘর ছাড়িয়া।

প্রয়াগ।

“স্থানীয় ভ্রাম্যন্তাল কংগ্রেস” সভার দুইটি অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলাম। কোট-ছাট-ধারী বান্ধালী ঝাড়কাকগুলির মধ্যস্থলে,—যরি! যরি!—কি একটি মুক্তি দেখিলাম। মাথায় উকীষ, গলায় উড়ানি, পায়ে চাপকান, পরিধানে ধূতি। ইহার নাম—মদনমোহন মালবী। এই ত জাতীয় বেশ। কিন্তু যখন লোকটি কথা কহিতে লাগিলেন, আমার ভ্রম হইল, পশ্চাৎ হইতে বুঝি খাতনামা উদ্‌লিউ, সি, বনার্জি,—হায় যে বান্ধালী নামের জগতি—ইংরাজি বলিতেছেন। লোকটির প্রতি আমার বড় প্রজ্ঞা হইয়াছিল। কাল হরিমোহনকে সঙ্গে করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি হরি-

মোহনদেবের সহপাঠী ছিলেন । প্রায় দুই ঘণ্টা কাল দুই জনে আলাপ করিলাম, যেন দুই জনের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল । ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী । তাহা ছাড়া অল্প অল্প ভাষাও জানেন ; বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বুঝেন । আমার ধাম পূর্বে জানিতেন । তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী, সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে প্রস্তুত । আমি যখন গীতার উল্লেখ করিলাম, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, তিনি প্রায়ই প্রাতে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন । আমাদের উভয়ের হৃদয়ের গতি এক । সেই মহাভারতীয় মহানীতির । কেন্দ্রস্থলে যেমন মদনমোহন, পশ্চিমভারতের বর্ত্তমান নীতি-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে—তেমনই এই মদনমোহন । ইংলণ্ডের “ওকবুক”—অতিশয় সারিবান বৃক্ষ, কিন্তু ভারতের চন্দনবৃক্ষের সৌরভ তাহাতে নাই । আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমি তাঁহাতে ইংলণ্ডের “ওকের” সারবত্তার সঙ্গে, ভারতের চন্দনের সুগন্ধ দেখিবার প্রত্যাশা করি ।

কানপুর ।

আজ আমি কানপুরে । সৌজ্ঞাত্যের প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তোপাধ্যায়, কানপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার, আমাকে স্টেশন হইতে সাদরে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসেন । তিনি দাসক-শৃঙ্খল চরণে ঠেলিয়া, এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেছেন, কানপুরে তাঁহার মিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা । তাঁহার গৃহের নিম্নতল ডাক্তারখানা উপরের প্রকোষ্ঠ সকল আবাসগৃহ । ডাক্তারখানা শুনিয়া ভ্রমি হয় ত কেষ্ঠার-অয়েল, চিরতা ও কুইনাইন মনে

করিয়া নাক সিটকাইতেছে। এ তাহা নহে, মহেন্দ্র বাবুর ডাক্তার-খানা একটি ক্ষুদ্র ইজ্ঞালয়। এমন সুন্দর সুসজ্জিত বান্ধালীর ডাক্তারখানা কোথাও দেখিনাই। ডাক্তারখানার মধ্যে তাঁহার বসিবার কক্ষটির গবাক্ষ সকল সুসজ্জিত চিত্র দৃশ্যাবলির দ্বারা সুসজ্জিত। কক্ষের প্রাচীরে চীনদেশীয় নরনারীর বিচিত্র চিত্র শোভিতেছে। কক্ষস্থিত শ্রব্যাদি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তাঁহার সঙ্গে অল্প কণ আলাপের পর এতদূর সমপ্রাপ্ততা হইয়াছে, এবং তিনি এত আদর করিতেছেন যে, আমার কানপুর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অন্য প্রাতে কানপুর পরিদর্শনে বাহির হই। প্রথমতঃ গঙ্গার পয়ঃপ্রণালী দর্শন করিয়া নগ্নন তৃপ্ত করি। হরিদ্বারে গঙ্গার গর্ভে বাঁধ দিয়া একটি জল-স্রোত সোপানে সোপানে উর্দ্ধ হইতে এই কানপুরে আসিয়া আবার গঙ্গায় পড়িয়াছে। জগৎপ্রাণ হইতে যেন একটি মানব-জীবন-স্রোত উৎপন্ন হইয়া, আবার জগৎ-প্রাণ-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এক সোপান হইতে সোপানান্তরে জলবাণি গর্জন করিয়া খেত-কুহুম-নিভ কেশমলায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্য অতি সুন্দর। তবে ভূমি যখন উড়িবার 'কেনাল' দেখিয়াছে, তখন জোয়ার ইহা তত নুতন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইবার কথা নহে। এই 'কেনেলের' স্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া, স্থানে স্থানে যে সকল ময়দার কল চলিতেছে, তাহা কিন্তু ভূমি দেখে নাই।

কক্ষের একটি মধুমাখা নাম 'কানাই' বা 'কান', তাহা ভূমি জান। বোধ হয়, 'কান' হইতেই এ স্থানটির নাম কানপুর হইয়াছে। একুশ পরিভ্রমণ আজ একটি শোকসিদ্ধ। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ঘেরা নৃশংস দৃষ্ট সকল এখানে অভিনীত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। বিদ্রোহ আরম্ভ

হইলে, স্থানীয় ইংরাজকর্মচারী ও সৈন্যগণ যে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া, একবিংশতি দিবস অতুল সাহসে বিজ্রোহীদের প্রতি-
কূলে আত্মরক্ষা করেন, সে স্থানটি আজ একটি মনোহর পুষ্পো-
তান । তাহার মধ্যস্থলে, উচ্চ সৌধ-চূড়ায় শোভিত, কারুকার্য-
শোভিত—একটি গির্জা । তাহার প্রাচীরে খেত ও কৃক মর্ম্মর
প্রস্তরে, আত্মরক্ষায় ধাঁহারা প্রাণ বিসর্জন করেন, তাঁহাদের
অস্থায়ী ও সহযোগীরা, তাঁহাদের স্মরণলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন ।
মাতা পিতা পুত্রের জন্যে কাঁদিতেছেন, ভগিনী ভ্রাতার জন্যে
কাঁদিতেছেন, অনাথিনী বিধবা পতির জন্যে কাঁদিতেছেন ।
এ সকল শোকলিপি পড়িবার সময়ে, অশ্রুসংবরণ বড় কঠিন হইয়া
পড়ে । একজন সৈনিক, দুর্গাবদ্ধ, প্রপীড়িত ও পিপাসাতুর
রমণী ও শিশুদের জন্যে, পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল আনিতে
গিয়া, আহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন । তাঁহার শোকলিপির
নিম্নে একটি কৃত্রিম কূপ গির্জার মধ্যে নির্মিত হইয়াছে । ইহার
পবিত্র জলে খুঁটখুঁটে দীক্ষিত করা হইয়া থাকে । আমার ইচ্ছা
হইল, এই আত্মবিসর্জনের পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হইয়া জীবন
সার্থক করি । বেদীর উর্দ্ধে গবাক্ষ শ্রেণীতে নানাবর্ণের কাচে
খুঁট-জীবনের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে । অথচ আমরাই
পৌত্তলিক ! কেন্দ্রস্থলে মহর্ষি খুঁটের ক্রুশে মৃত্যুর সেই শোকাবহ
দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে । এমন পবিত্র শোকচিত্র বৃষ্টি আর নাই ।
চিত্রতলে একটি খেতপ্রস্তরের ক্রুশ, তিনটি রক্তবর্ণ রক্তে খচিত
হইয়া শোভা পাইতেছে । গির্জার বাহিরে একটি স্থলর সমাধি ।
যে সকল ইংরাজেরা কানপুরের শেষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন,
তাঁহাদের অস্থিরাশি এখানে প্রোথিত রহিয়াছে । যে কূপ
হইতে উক্ত সৈনিক জল আনিতে গিয়া বিজ্রোহীদের হস্তে
প্রাণত্যাগ করেন, সে কূপটি এখনও সেইরূপ অবস্থায় আছে ।

তাঁহার দুই স্থানে এখনও তোপের গোলায় চিহ্ন বর্তমান
রহিয়াছে।

২১ দিবস যুদ্ধের পূর্ব, ইংরাজগণ অনাহারে, ও যুদ্ধের উপকরণ
সমভাবে আত্মবক্ষায় অসমর্থ হইলে, বিদ্রোহনায়ক নানার হস্তে
আত্মসমর্পণ করেন। নানা তাঁহানিগকে লক্ষ্যে ষাইবার অনুমতি
দিলে, তাঁহারা নৌকারোহণ করিবারাত্র, বিদ্রোহিগণ তীর
হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া, সমস্ত তরঙ্গী দল ও জলমগ্ন
করিয়া দেয়। যে ঘাটে তাঁহারা নৌকায় উঠেন, তদবধি
উহা “বধঘাট” বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই ঘাটে শিব-শূনা
একটি মন্দির এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। মানুষ যখন হিংসা-
প্রণোদিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন, এক্ষণ পবিত্র স্থান,—
মাতা ভাগীরথীর বক্ষ পর্যন্ত কলুষিত করিতে শক্তি হয় না।
মানুষ-পশুর মত এমন হিংস্র পশু জগতে নাই। এই বধঘাটে
দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইল, যেন আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য
নয়নে দেখিতেছিলাম। সেই শত শত নর-নারীর ও কুসুমার
শিশুর বোদননিলাদে যেন গুণ্যতোয়া জাহুরীর বক্ষ প্রাবিত
করিয়া, আমার বর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। পার্শ্বে রক্তকেরা
সারি বাধিয়া কাপড় খুইতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম,
ভারতমাতার বক্ষ হইতে কি কেহ এ কলঙ্ক এইরূপে খুইয়া
কেনিতে পারে না?

সেখান হইতে সৈন্যানিবাসমালা অতিক্রম করিয়া, ‘সবেদা’
কুঠি দেখিতে যাই। এটি নানার কানপুরস্থ আবাস-গৃহ ছিল।
গৃহটি এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার পার্শ্বে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে
ইংরেজদের কানপুরের শেষ যুদ্ধ হয়। তিন দিক হইতে তিন
জন খ্যাতনামা সৈন্যধ্যক্ষ আক্রমণ করিলে, ত্রিবেণীর তরঙ্গ-
অড়িত। হৃদয়শির ভায়, সৈন্যধ্যক্ষবিহীন বিদ্রোহীরা গলায়

সেহু বাহিয়া পলাইতে আরম্ভ করে । তখন প্রতিহিংসা-মত্ত ইংরাজেরা তোপের দ্বারা সহস্র সহস্র নর-নারীকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন । কেবল এক পক্ষেই নৃশংসতার অভিনয় হয় নাই ।

তাহার পর, মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, কানপুরের শীর্ষঘাট দেখান । ইহাতে এক দিকে পুরুষ ও অল্পদিকে স্ত্রীলোকের স্নান করিবার স্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে । অসংখ্য নর-নারী—আজ একাদশী—গঙ্গায় অবগাহন করিতে-ছিল । তুমি কাশীর ঘাট দেখিয়াছ । কানপুরের শীর্ষঘাট তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর । সন্ধ্যার মিউনিসিপাল উদ্যানের উপর দিয়া ঘাটের খিলান-শ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর ।

তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিব না । একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া, অসংখ্য নর-নারী ও শিশুগণকে নানাসাহেবের অলুচরেরা বধ করিয়া, হত ও আহত অবস্থায়, তাহাদিগকে পার্শ্বস্থিত একটি কূপে নিক্ষেপ করে । গৃহটি এখন নাই । এরূপ পাপটিহু না থাকাই ভাল । তাহার স্থানে একখানি মার্বেল-কলক মাত্র আছে ; তাহার বক্ষে 'বধ-গৃহ' এই কথাটি মাত্র লেখা আছে । আর যে কূপে হত ও আহতদের নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার উপর কি বিবাদময়ী মূর্তিই স্থাপিত হইয়াছে । একটি অনিন্দ্যসুন্দরী, স্নেহপ্রসূরনির্মিতা, যুগলপক্ষবিশিষ্টা স্বর্গীয় দেবী, বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া, করে ছুইটি তালের অক্ষট শাখা ধরিয়া, অধোবদনে কূপের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন ! মূর্তিটি জীবন্ত শোক ! দেখিলে হৃদয়ে কি শোক, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়, তাহার ভাষা বুঝি নাই । চারি দিকে উচ্চ প্রস্তরের "রেলিংয়ের" মধ্যে মূর্তিটি বসিত হইয়াছে । মহেন্দ্র

বাবুর রূপা ভিন্ন আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। সমস্ত স্থানটি ব্যাপিয়া, এখন একটি বিস্তৃত, পুষ্পরুক-শোভিত উদ্যান। এমন হৃদয়স্পর্শী স্থান বুঝি আর জগতে নাই।

লক্ষ্মী।

কাল সকালের ট্রেনে লক্ষ্মী গিয়া, একজন ইংরাজের হোটেলে ছিলাম। তাঁহাকে আড়কাটি করিয়া, কাল সমস্ত দিন, নগর দর্শন করিয়াছিলাম। আজ আবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পত্র লিখিলাম।

ভগবান্ বিষ্ণুরূপ, তাঁহার বিশ্বও বহুরূপী। কাল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার রূপান্তর করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যের নাম কোশল ও রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। কালে, রাজ্য ও রাজধানী, উভয়ই মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়ায় বিলীন হইয়া যায়। ক্রমে, সেই মোগলসাম্রাজ্যে কালের ছায়া পতিত হইলে, রামরাজ্যে যিনি দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি তাঁহার মন্তকোপরি স্বাধীনতার ছত্র উড়াইলেন। তাঁহার রাজ্যের নাম হইল অযোধ্যা, রাজধানী লক্ষ্মী। তাঁহার রাজপ্রাসাদশিবে, স্বর্ণছত্র উড়াইয়া, তাহার নাম রাখিলেন “ছত্র-মঞ্জিল।” কালে আবার বৃটিশসিংহ কবলে করিয়া, সেই ছত্রধারীকে ‘মেট্রো-বুর্জ’ বন্দী করিয়া রাখিলেন,—তিনি সেই কারাগার হইতে ‘লক্ষ্মী টপ্পার’ কাঁদিলেন। ভারত কাঁদিল, সেই হৃদয়ঙ্গবকারী শোক-সঙ্গীতে চিরদিন কাঁদিবে। বন্দী ওয়াজিদ আলি সাহাব বৃত্ত হইয়াছে; তাঁহার সকল যজ্ঞপত্র শেষ হইয়াছে। লক্ষ্মী

লহর, আজ অযোধ্যার নবাবদিগের সমাধিমাত্র। কালে সেই রাজ্যের নাম হইয়াছে “আউড্” রাজধানীর নাম “লখনাও”। ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-ছত্রের ছায়াতে “ছত্র-মঞ্জিলের” ছত্র বিমলিন হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্মৌও একটি কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। চারি দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্রোহী লক্ষ্মৌতে সমবেত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ-প্রতিনিধি বা ‘রেসিডেন্ট’ বাস করিতেন, তাহা আক্রমণ করে। এই আবাসস্থানের নাম “রেসিডেন্সি।” স্বল্প সৈন্ত এবং এ অঞ্চলের ইংরাজ নবনারী সমবেত হইয়া, ছয়মাস কাল এ স্থান রক্ষা করেন। তাঁহার পর, বহির্ভাগ হইতে ইংরাজ-সৈন্ত আসিয়া, বিদ্রোহীদেরকে পরাজয় করিয়া, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই ছয় মাসের দারুণ অবরোধের ইতিহাস, স্থানটির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোপের গোলাঘাতে সমস্ত গৃহাদির ছাদ ধসিয়া গিয়াছে। যে সকল দেওয়ান এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও তোপের ও বন্দুকের গোলা গুলিতে বাহির দিক্ বোলতার বাসার মত হইয়াছে। ভিতরের দিক্ নয়-শোণিতে রঞ্জিত রহিয়াছে। স্রীলোকদিগকে মাটির ভিতরে ‘তন্নখানাতে’ রাখা হইয়াছিল। তাহার ভিতর পর্য্যন্ত একটি গোলা গিয়া, একটি রমণীর মস্তক উড়াইয়া লইয়া যায়। সেই গোলার দাগ, রমণীর শোণিতচিহ্ন, এখনও দেয়ালে আছে। ইংরাজ-জাতির মধ্যে ‘হেনরি লরেন্সের’ মত দেবতুল্য ব্যক্তি ভারতে কখন আইসেন নাই। তাঁহার হৃদয় ভারতের হৃদয়ে নিরন্তর ছুঁখী ছিল। তাঁহার মত-অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হইলে, বিদ্রোহ ঘটিত না। তিনি লক্ষ্মৌ হইতে পলায়ন করিলে, আজ ভারতে ইংরাজ থাকিত কি না, সন্দেহ। কর্তব্যের অহরোধে তিনি ‘রেসিডেন্সি’ ছাড়েন না। যেখানে তিনি

আহত হন, যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, উভয় স্থান এখনও চিহ্নিত
রহিয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর এই কয়েকটি কথা লেখা
আছে—“এখানে সার হেনরি লরেন্স নিজা ঘাইতেছেন, যিনি
আপন কর্তব্য সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।” কি হৃদয়গ্রাহী
কথা! গৃহ সকল সেইরূপ ভয় অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে।
স্থানটি একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার
রক্ষণায় কত বীৰ ও বীরাক্সনা নিজা ঘাইতেছেন।

পত্রখানি এই পর্যন্ত লেখা হইবার পর, মহেন্দ্র বাবু বাড়ী
ফিরিয়া আইসেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হন;
সুতরাং আর লেখা হইল না; পর দিবস বিঠুর বাই, সায়াফে
অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আবার কানপুরে ফিরিয়া আসি। কাল কানপুর
হইতে রওনা হইয়া, এইমাত্র ১৯এ মে তারিখে ১টার সময়ে,
হরিদ্বার পহুছিলাম। কাল রাত্রি হইতে আহার হয় নাই। এ
দিকে আমার হৃর্ভাগাবশতঃ এখানেও কাস্তিকী পৌর্ণমাসীর মেলা
হইয়া থাকে। পথে ঘাটে ভারতবর্ষের নানাস্থানীয় কুসুমরাশি
ফুটিয়া যেমন মন মোহিত করিতেছে, অন্যদিকে, বাড়ী ঘর সকল
এত অপরিষ্কার করিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত ভিত্তিতে ইচ্ছা করিতেছে
না। অতি কষ্টে, একটি বাড়ীর ভিতলে, একটি অষ্টকোণ
পায়রার খোপ-বিশেষ কক্ষ পাইয়াছি। নিয়ে সুনীলা ক্ষীণ-
কলেবরা মাতর্গঙ্গা, কুলু কুলু রবে বহিয়া ঘাইতেছেন, সংখ্যাতীত
নরনারী তাহাতে অবগাহন করিতেছে। অপর পারে হিমাচল,
নাট্যশালার যবনিকার মত শোভা পাইতেছেন। শরীর অবসন্ন,
হৃদয়ও তোমাদের পক্ষ না পাইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে; অতএব
এইখানেই শেষ করিলাম। লাহোরে পহুছিলাম, লঙ্কো, বিঠুর ও
হরিদ্বারের বর্ণনা করিয়া, দীর্ঘ পত্র লিখিব।

লক্ষ্মী ।

•
—•—

২

আজ আবার লক্ষ্মীর কথা লিখিব। কিন্তু কি লিখিব? লক্ষ্মী মুসলমানদের শোকসিন্ধু। বেসিডেন্সির কথা পূর্বে লিখিয়াছি। তাহার পার্শ্বে ই কিঞ্চিৎ দূরে ‘কেশরবাগ’। একটি প্রকাণ্ড প্রাক্ষণ করনা কর। তাহার চারি পার্শ্বে সারি সারি দ্বিতল ইষ্টকনির্মিত গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে গোল ও অস্ত্রবিধ বারান্দা বাহির হইয়াছে। প্রাক্ষণের মধ্যস্থলে একটি অতি পরিপাটি একতল গৃহ। বিস্তৃত খিলানাবলীর উপর স্বরঞ্জিত ছাদ, সারি সারি শোভা পাইতেছে। ইহার নাম ‘বারদারী’। ইহার চারি দিকে পুষ্পোদ্যান। এক দিকে ভগ্ন স্থানের ‘হামাম,’ অন্য দিকে একটি জলপ্রণালী, তাহার উপর এক পোল। চারি দিকের অট্টালিকাতে শেখ নবাব ওয়াজির আলি সাহাব ৩৫০ কি ৪০০ পদ্বী থাকিতেন। তাহাদিগকে লইয়া, নবাব এই ‘কেশর-বাগে’ বাস, দোল ইত্যাদি জীবন্ত লীলা করিতেন। ইহাতে জৌলোক ও নপুংসকগণ ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এক এক কক্ষে এক একটি অতুলনীয় রূপসী। পৃথিবীর যত স্থান রমণীর পুষ্পোদ্যান বলিয়া খ্যাত, সর্বত্র হইতে এ ফুল রাশি, নবাব-বাহাদুরের ইচ্ছাচারিতার্থ করিবার জন্য সঞ্চিত হইত। যখন ‘কেশর-বাগের’ পুষ্পোদ্যানে রমণীগণ প্রভাতে ও সন্ধ্যাবেলায় বিচরণ করিতেন, যেন কর দেখি, তখন ফুলের সঙ্গে জীবন্ত ফুল মিশিয়া কি অপূর্ণ শোভাই হইত। কিন্তু ইহাদের

অনেকের সঙ্গে পতি-প্রবরের জীবনে এক দিনও সাক্ষাৎ হইত কি না, সন্দেহ। আমি ২৪টি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। এক একটি কক্ষ, সম্মুখে একটুকু বারান্দা। আমার কাছে স্থানটি বড় আরামের কি আয়েসের যোগ্য বোধ হইল না। একরূপ নবাবীয় ইঞ্জিয়পরায়ণের রাজ্য থাকিবে কেন? ছলে কোশলে ব্রিটিশ সিংহ বাহাদুর, গরিব নির্দোষ ওয়াজির আলির রাজ্য কাড়িয়া লন। সিপাহিবিরোধের ইহাও একটি প্রধান কারণ। বাহার উপর একরূপ অত্যাচার হইয়াছে, সিপাহিরা মনে করিয়া-
‘হল, সে অবশ্য তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বিরোধের পর, ইংরাজ বাহাদুর, অযোধ্যার তালুকদারগণকে কেশববাগ দিয়া-
ছেন। তাঁহারা কেহ কেহ, স্থানে স্থানে গৃহটি সংস্কার করি-
তেছেন, এবং সামান্য পথিকগণকে ভাড়া দিতেছেন। হায় পার্শ্বি গোরবের পরিণাম। অযোধ্যার হৃদয় নবাব-পত্নীদিগের বিলাস স্থলে আজ কি না পাহনিবাস। এক দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড ‘কেনিং কলেজ’ স্থাপিত করা হইয়াছে। এক দিকে একটি অতি উচ্চ ‘গেট’ রহিয়াছে। ইহার নাম ‘লক্ষ্মী-দর-ওয়াজা’। প্রস্তুত করিতে লাখ টাকা লাগিয়াছিল। তাই নাম ‘লক্ষ্মী’। অনেক দরজের ‘লক্ষ্মী’র মূল্য যে লাখ টাকারও অধিক। টাকায় তাহার মূল্য হইতে পারে না।

তাহার পর ‘বড় ইমামবারা’ দেখিতে যাই। এক পার্শ্বে কম দেশের অল্প করণে একটি প্রকাণ্ড গেট বা তোরণ। তাহার পর, ইমামবারার মূল তোরণ। তাহা পার হইয়া গেলে, এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। চারি দিকে সারি সারি কক্ষসম্বিহিত প্রাচীর। এক পার্শ্বে একটি অতি প্রকাণ্ড, অতি সুন্দর মসজিদ, মধ্যাহ্ন বধিকরে ধক্ ধক্ জলিতেছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে ইমামবারা। মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ কক্ষ। পৃথিবীতে নাকি এত বড় কক্ষ আর

নাই। তাহাতে ইমামবারা-নিখাতা জটনক ভূতপূর্ব নবাব সমাধিস্থ রহিয়াছেন। কক্ষের উপরে বক্তবর্ণ প্রস্তরের বারাগা চারিদিকে শোভা পাইতেছে। তাহাতে বসিয়া নবাব-পুত্র-বাসিনীগণ; নীচে যে কোরাণ পাঠ হইত, তাহা শুনিতে। বারাগার প্রবেশ করিবার দ্বার সকল একরূপ ভাবে নিশ্চিত হইয়াছে যে, একটি গোলক-ধাঁধা বলিলেও হয়। পথপ্রদর্শক এক জন সঙ্গে না থাকিলে পথ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। নবাব-জমীদার, এখানে নাকি নবাব-পতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেন। কথাটা ঠিক! দিল্লী হইতে চুরি করিয়া, তাহার এ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর তাহা লুকাইয়া গিয়াছে। জগতের রাজত্ব ও সম্পদ মাত্রই একরূপ লুকোচুরি। এক জন চুরি করিয়া রাজ্য ও সম্পত্তির সৃষ্টি করে—যুদ্ধই বল, বাণিজ্যই বল, আর ওকাগতিই বল,—তাহা দুই দিন পরে লুকাইয়া যায়। ইহার সূত্র বা গোঁরব যে স্থাপন করে, সে প্রকৃতই দয়ার পাত্র। মনুষ্যত্বই প্রকৃত সূত্র। মানুষের সকলই যায়, মনুষ্যত্ব যায় না। অযোধ্যার রাজ্য নাই। বাস্তবিক কবিত্ব-অমর। তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, শত শত নরনারী প্রতিদিন মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। কি কথায় কি কথা আনিয়া কোললাম! মধ্য কক্ষের দুই পার্শ্বে অষ্ট-কোণ-সমন্বিত আর দুইটি কক্ষ আছে। তিনটি কক্ষই বহুমূল্য ঝাড় ইত্যাদিতে সজ্জিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরেই ছোট ইমামবারা। এটিও ঠিক বড় ইমামবারার মত। তবে আকৃতিতে ছোট হইলেও, দেখিতে এবং কারুকার্যে এটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বড় ইমামবারার শ্রাদ্ধ যক্ষভূমির মত। একটি বৃক্ষচ্ছায়া, একটি ফুলের চাবাও নাই। কিন্তু ইহার প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর উদ্ভান রচিত হওয়াতে, স্থানটি অতীব সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বোধ হয়।

কেশববাগের পাশ্বেই 'ছত্র-মঞ্জিল'। একটি নহে, পাঁচটি গৃহ লইয়া ভূতপূৰ্ণ নবম্বদিগের এই বাসস্থান নির্মিত। প্রধান ভবনটির গীর্ধদেশে একটি স্বর্ণছত্র বিরাজিত। তাই ইহার নাম ছত্রমঞ্জিল। শাহুনির্মিত ছত্রটি এখনও শোভিত রহিয়াছে, নিম্নস্থ গোমতীর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! কিন্তু সেই ছত্রধর এখন কোথায়? তাঁহার রাজ্যের যে একটি ক্ষুদ্র ছায়া মেটিয়া-বুরুজে ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ছত্র-প্রাসাদের নিম্নতলের এক কক্ষ এখন সাধারণ পুস্তকালয়। উচ্চতলের কক্ষ সকল খেতপুরুষদের রুব-ভবন। অল্প একটি গৃহ এখন মিউজিয়াম—এ অঞ্চলের লোক বলে, 'আজাদের ঘর'। আবার বলি, হায় পাখির সম্পদের ও গোরবের পরিণাম!

তার পর, 'দাহা-নিজা' দেখিতে যাই। এটিও একটি প্রকাণ্ড সমাধিভবন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এখানে টোব্রতর বুদ্ধ হয় বলিয়া, এ স্থানটি এখন বিশেষ বিখ্যাত! এতদ্ভিন্ন, (বলা বাহুল্য) লক্ষ্মোত্তে ইংরাজদিগের পার্ক বা পক্ষবটী উদ্ভান আছে। লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণরের বাড়ী আছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ সকল দেখিয়া আসিয়া, উহা দেখিতে ত্রিক ঘন একটি কপোতের বাসা বোধ হয়। ২৪টি ইংরাজকে, যেখানে বিদ্রোহের সময়ে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার উপর অবশ্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। আর, যে শত শত নিরপরাধদিগকে ইংরাজেরা হত্যা করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই!

রুড়কি।

আজ প্রাতে হরিয়ার হইতে ১২টার সময়ে রুড়কি পহুছি। ডাকবাংলাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া নগরদর্শনে যাই। এইমাত্র

ষ্টেশনে আসিয়া, গাড়ীর ঘণ্টা খানিক বিলম্ব দেখিয়া, অপেক্ষা-
কক্ষে বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম । চিরদিনই
তোমাকে পত্রলেখা আমার পক্ষে এক আনন্দ ! তথাপি এ দূর
দেশ হইতে পত্র লিখিতে যে স্তম্ভ বোধ হয়, এমন স্তম্ভ বুঝি
জগতে অল্পই আছে ।

পূর্বদৃষ্ট স্থান সকলের কথা এখন হাতে রাখিয়া, রুড়িকিতে
যাহা দেখিলাম, আজ তাহাই লিখিব । সুলিলস্বরূপা গঙ্গা-
দেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যলোক পূর্ব পুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন ।
তাই সলিলশক্তির পূজা প্রচলিত করিয়াছেন । তাই বলিয়া-
ছেন,— তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল । কিন্তু
আমাদের হৃর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহারা সে শক্তি কার্য্যে পরিণত
করিতে পারিলেন না । মাতার প্রকৃত পূজা আমরা শিখিলাম
না । গীতার কর্ম্মবাদ বুঝিয়া, দেশে বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ
আসিল । সংসার কিছুই নহে, মায়ামাত্র । জীবন কিছুই নহে
নলিনীদলগত জলমাত্র । পড়িয়া গেলেই ভাল । এ শিকাও মহৎ
বটে ; কিন্তু জ্ঞানের এক অঙ্গমাত্র । আমরা এই এক অঙ্কে,
এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকাণ্ডকে সর্ব্বম্ব ভাবিয়া, প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড
ভুলিয়া গেলাম । আমরা তাই ভুলিলাম । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল,
যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের ঢাকা
যুরাণ ঘাইতে পাটবে । ততোধিক দেখিলেন, দেশে জলাভাবে
কৃষি হয় না, হ্রদিক উপস্থিত হয়, অথচ জীবনস্বরূপা ভাগীরথীর
জলরাশি বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে । যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার
জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমালয় হইতে পদতলস্থ সমতল ভূমিতে
পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীর-
তর করিয়া খাল বা কেনেল কাটিয়া,—এ অঞ্চলে “নহর” বলে,
কথাটা বোধ হয় লহর—গঙ্গার স্রোত কিরাইয়া, জলশূন্য স্থানের

মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে নিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্ব স্রোতে ফেলিলেন । ইহাতে অন্তর-বর্তী স্থানসমূহে স্বর্ণ ফলিতেছে । ঝড়কিতে কেনেল আসিয়া সোলানী নদীর পার্শ্বে উপস্থিত । নদীর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে খালের জলও নদীপথে বহিয়া যাইবে । বিজ্ঞান, অদ্ভুত কৌশলে, নদীর বক্ষে প্রায় ৩ মাইল ব্যাপী এক মহাসেতু নির্মাণ করিয়া, সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার লহর বা কেনেল বহাইয়া লইয়াছে । নীচে সোলানী নদী পূর্ব-পশ্চিমে বহিয়া যাইতেছে । সেতুর উপর দিয়া লহর উত্তর দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে । বর্ষাকালে স্থানটির যে কি শোভা হয়, বলা যায় না । ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিলেন । কিন্তু কেনেলের দুই পার্শ্বে দুই বিরাট সিংহমূর্তি ব্রিটিশদিগের জাতীয় চিহ্ন—জুঁকুটী করিয়া স্রোতের দিকে চাহিয়া বহিয়াছে । ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, তাহা উপা-খ্যান । ব্রিটিশ সিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম । ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, যাতা এখন ব্রিটিশ সিংহের সঙ্কেত অহুসরণ করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন । কেনেলের জলের বেগে, স্থানে স্থানে কল ঘুরিয়া ময়লা পিষি-তেছে । এ সকলকে জলের কল বলে । তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাস্ত্র । তাহারাই শাস্ত্রের প্রকৃত পূজা করিতেছে । আমাদের পূজা কেবল পুতুলপূজাই বটে । আমরা সত্যই অস্তঃসারশূন্য পৌত্তলিক ।

জল সিদ্ধ করিলে বাষ্প উঠে, জলপাত্রেয় মুখে আচ্ছাদন থাকিলে, তাহা ঢক ঢক করিয়া বড়িতে থাকে, একবার উঠে, একবার পড়ে—ইহা আবহমান কাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, এ ক্ষুদ্র শক্তিকেও বড় করিয়া মানবের বৃহৎ কার্য সাধিত হইতে পারে । জলপাত্রেয়

আচ্ছাদন ঢক ঢক, করিয়া নড়িতেছে দেখিয়া, জনৈক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, বাষ্পের শক্তির প্রথম আবিষ্কার করেন। আজ তাহার উত্তরাধিকারিগণ, সেই বাষ্পের দ্বারা, বৃহৎ বৃহৎ কলের আচ্ছাদন নাড়িয়া, তদ্বারা চক্রের পর চক্র ঘুরাইয়া, স্থলে শকট, জলে অর্ণবযান চালাইতেছেন। রুড়কিতে ইহা দ্বারা কৰ্ম্মকার ও হস্তধরের কার্য্য করিতেছে। কলে লোহা গলিতেছে, গড়িতেছে, ছেঁচিতেছে, কাটিতেছে, এবং জগতের বাবদীয় লোহার বস্তু নির্মাণ করিতেছে। আবার কলে কাঠ কাটিতেছে, বেদা করিতেছে, এবং এইরূপে কাঠের নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিতেছে। কল-ঘর দেখিয়া, রুড়কির ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ দেখিতে যাই। মধ্যস্থলে একটি গোল কক্ষ, উপরে গুহজ, অতি-পরিপাটী, তাহার দুই পার্শ্বে দুই গলির দুই সীমায়, আবার দুইটি দ্বিষং গোলাকার কক্ষ। অতি সুরঞ্জিত, ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্রাদিতে সজ্জিত। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারদিগের মূর্ত্তি প্রকোষ্ঠ-কেন্দ্রে, এবং চিত্র দেয়ালে, শোভিতেছে। গলির দুই পার্শ্বে, ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গৃহটি অতি সুন্দর। আর না। গাড়ী আসিতেছে। ভরসা করি, কাল লাহোর গিয়া তোমাদের পত্র পাইব। মন আকুল বলিয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

বিঠুর।

আজ বিঠুরের কথা লিখিব। বিঠুরে প্রথমে নানা সাহেবের বাড়ী দেখিতে যাই। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়া, মহারাষ্ট্র-পতি বাজিরাওকে বিঠুরে বন্দী করিয়া রাখেন। নানা মুন্দুপ

বা নানা সাহেব, তাঁহারই পোষাপুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার বৃত্তির লাঘব করেন, এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ অসম্ভাবহার করেন। আজিমুল্লা নামক একজন নীচবংশীয় মুসলমান যুবককে, ইংরাজ, নানার পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি শীঘ্র নানার বিশ্বাসভাজন হয়। তাঁহার পক্ষে উকিল হইয়া বৃত্তি বাড়াইবার জন্যে, বিলাতে দরবার করিতে যায়। বহুতর অর্থব্যয় করিয়া, বিফল হইয়া, দেশে আসিয়া নানাকে বলে যে, ইংলণ্ড একটি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। সে শীঘ্র নানাকে ভারতবর্ষের সম্রাট করিয়া দিবে। এই পাপিষ্ঠই বিদ্রোহের প্রধান কারণ। তাহার দ্বারাই কানপুরে সেই সকল শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হয়। নানা অতি ধর্ম্মাত্মা লোক ছিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদ্রোহের সময়ে, ইংরাজেরা নানার বাড়ী তোপে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের প্রাচীর এবং তোরণটি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দেখিলে, হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও দয়ার উদয় হয়। মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে বহুতর মহারাষ্ট্র এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। আজ তাহার অন্নাতাবে হাহাকার করিতেছে।

তাঁহার পুত্র, ক্রম-ঘাট দেখিতে যাই। এখানে এখানে ক্রম তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্শ্বে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যোত করিয়া, গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখান হইতে ঘাটের সারি লাগিয়াছে। কার্তিকপূর্ণিমাসীয়া মেলা উপলক্ষে, অদ্য গঙ্গাস্নান-বিদ্যোত কামিনীকুসুমবাশির অতুলনীয় শোভা। ব্রহ্মাবর্তের ঘাটে যাই। এখানে একটি লোহার শলাকা প্রস্তর-প্রথিত রহিয়াছে। ইহাকে ব্রহ্মাবর্তের খুঁটা বলে। আৰ্য্যগণ প্রথম যখন ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মাবর্তের সীমা ছিল। তাঁহার পক্ষে আর্ঘ্যাবর্ত। শেষে

যে ঘাটে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া চলিয়া যান, যেখানে মহর্ষি বান্দীকি। তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমে লইয়া যান, সেই ঘাট দেখি। স্থানটি দেখিবামাত্র— যদিও দেখিবার কিছুই নাই, একটি সামান্য ঘাটমাত্র—স্মৃতির উজ্জ্বল্যে আমার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর, জগ-
তেবু কবিগুরু মহর্ষি বান্দীকির আশ্রম। কবিতার জন্মস্থান, মহা-
কাব্যের জন্মস্থান, ভারতের অতুলনীয় রামায়ণের জন্মস্থান, রাম-
সীতার যে চরিত্রবলে তাঁহারা চিরদিন দেবদেবীস্বরূপ পূজিত,
সেই চরিত্রের জন্মস্থান দেখিয়া, যে ভক্তি ও শাস্তির উদ্দেক হইল,
তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। স্থানটি
এখন কথঞ্চিৎ অরণ্য, পিলোয়া বৃক্ষে ও তেঁতুল ইত্যাদিতে
সমৃদ্ধ। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাতে বালুকান্তর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র
পর্বতাকার ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ এইরূপ একটি ক্ষুদ্র
বালুকান্তূপে, মহর্ষির আশ্রম কুটার ছিল। একরূপ পবিত্র স্থানে
কোথায় একটি দেবভূলা মহর্ষিমূর্তি দেখিব, না নিকট লিঙ্গ-
উপাসকেরা এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, তাহার উপর এক
সামান্য মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। পার্শ্বে যেখানে সীতাদেবীর
কুটার ছিল, সেখানে একটি অতি কদম্বা মূর্তি আছে। কিঞ্চিৎ
দূরে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে তাঁহার এবং রামচন্দ্রাদির মূর্তি রক্ষিত
হইয়াছে। সীতাদেবীর খেতপ্রস্তরের মূর্তিটি অতি সুন্দর ও
হৃদয়গ্রাহী। পবিত্র আশ্রমমূল প্রক্ষালিত করিয়া, এখানে শৈল-
স্রুতা প্রবাহিতা হইতেছেন। বান্দীকি যদি ইংরাজদের কেহ
হইতেন, তবে আজ আমরা এখানে বান্দীকির মূর্তিসম্মত
একটি প্রকৃত আশ্রম দেখিতাম, এবং পদে পদে কালিদাসের
আশ্রমের বর্ণনা মনে পড়িত। বান্দীকির হৃদয়, তিনি আমা-
দের বান্দীকি। তথাপি দারভাঙ্গার মহারাজার তাঁহার প্রতি

কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ পড়িয়াছে । তিনি তালার উপর তালী তুলিয়া, একটি কবুতরের বাসার মত অট্টালিকা নির্মাণ করাই-
তেছেন । পার্শ্বে একটু পুষ্পোদ্যানও দেখিলাম । গৃহটি দেখিয়া
আমার বোধ হইল যে, মহারাজের উদ্দেশ্য যে, তাঁহার চূড়া দূর
হইতে দেখা যাইবে, এবং তদ্বারা বাত্মকির না হউক, তাঁহার নাম
ঘোষিত হইবে । বাত্মকি এক অমর অধিতীয় মহাকাব্য লিখিয়াও,
কোথাও আপনার নাম সন্নিবেশিত করেন নাই । আর মহারাজ
যে তাঁহার আশ্রমে সামান্ত একটি গৃহ নির্মাণ করিতেছেন,
তাহাতেও সর্বাগ্রে নামের জন্তে লাগান্নিত । হায় রে আমা-
দের দুর্গতি !

এ অবধি যত স্থান দেখিয়াছি, কোনও স্থান তোমাকে
দেখাইতে ইচ্ছা হয় নাই । কেবল মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে দাঁড়া-
ইয়া, জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া যেনে হইল, তুমি সঙ্গে থাকিলে
কত সুখ হইত ; অথচ, এ পুণ্য তীর্থটি কোনও বিদেশীয় যাত্রিক
দর্শন করে না । এ দিকে ভারতবর্ষে এমন ঘর নাই, যেখানে
রামায়ণ নাই, যেখানে রামসীতার পূজা নাই । কয় জনে বুঝে,
এ পূজা বাত্মকির অদ্বুত প্রতিভার ? মহর্ষির কৃপা ভিন্ন আজ
রামসীতাকে কে চিনিত ?

লাহোর ।

তোমার পত্রের জন্ত ব্যাকুল হইয়া আমি হরিবার কি
কড়কিতে তিষ্ঠি নাই । উল্লাসে আসিয়া আজ প্রাতে লাহোরে
পৌছিলাম । লাহোরে প্রথম নিউজিয়ম দেখি । বিশেষ কিছু বলি-

বার নাই। সম্মুখে বিখ্যাত ঝমঝম তোপ। হিন্দু ও শিখদিগের সম্বন্ধে এইটি সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজদের সঙ্গে চিলেনওয়ালার যুদ্ধেও শিখেরা এই প্রকাণ্ড তোপ ব্যবহার করিয়াছিল। তোপটি পিতলের, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর সার জন লয়েন্সের প্রস্তরের মূর্তি। ইহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা বলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, ইনি পাজাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা ও বুদ্ধিপ্রভাবে, পজাব বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাহাতেই কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয়, শিখদের দ্বারা সিপাহিরা পরাভূত হয়। তাঁহার এক হস্তে কলম, অস্ত্র হস্তে তরবার, বীরভাবে দণ্ডায়মান।

তাহার পর, "সালেমার বাগ" দেখিতে বাই। সম্রাট সাহাজাহান এক দিন স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন। এ তোমার আমার স্বপ্ন নহে, সম্রাটের স্বপ্ন, তাহা বিফল হইতে পারে না। সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট স্বর্গ সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। মুসলমানদের স্বর্গ সপ্তস্তরবিশিষ্ট। তদনুসারে সপ্ত স্তরে সজ্জিত "সালেমার" উদ্যান প্রস্তুত হইল। ইংরাজ বাহাদুর ঘোরতর পার্শ্বা সুরপরা-য়ণ। অতএব স্বর্গের উপরের সিঁড়ী চারি স্তর ভাঙ্গিয়া কেলিয়া, নিম্নের তিনটি স্তরমাত্র রক্ষা করিয়াছেন। মরি! মরি! কি করনা। কি দৃশ্য! স্তরে স্তরে এই তিন স্তর মাটির ভিতর নামি-রাছে। প্রথম স্তরে 'গেট' পার হইলে, তাজমহলের সম্মুখে ঘেরা জল-প্রণালী আছে, সেইরূপ। তাহার দুই পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার দুই দিকে সুকল বৃক্ষের উপবন। তাহার পর একটি সুন্দর বসিবার ঘর, সম্মুখে একটি কৃত্রিম সরোবর। মধ্যস্থলে একটি বসিবার স্থান, অতি সুন্দর। সরোবরের দুই পার্শ্বে উপবন। তৃতীয় স্তরে আবার জলপ্রণালী ও উপবন। প্রণালীতে

ও সরোবরে, সর্বত্র, সংখ্যাতীত কোয়ায়া খেলিতেছে। স্থানটি
কি সুশীতল ও শান্তিপ্ৰদ !

পর দিবস “সাহাদরা” দেখিতে যাই। এটি সম্রাট জাহা-
ঙ্গীরের সমাধিগৃহ। শুনিলাম, হুজুর্জাহান ইহা পতিভক্তির নিদ-
র্শনস্বরূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটি দেখিতে যেন একটি
অতি প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বাড়ী। কোথাও মুসলমানের সমাধির
গুহেজ নাই। চারি কোণে বহুতল কঙ্কবিশিষ্ট, চারিটি উচ্চ স্তম্ভ।
তুমি তাজমহলে এরূপ দেখিয়াছ। তাহার উপর হইতে দূরস্থ
লাহোরের ও নিম্নস্থ রাবীনদীর শোভা দেখিতে অতি মনোহর।
কিরিয়া আসিবার সময়, কয়েকটি মসজিদ ও রণজিৎ সিংহের—
বাহাকে ইংরাজেরা পঞ্জাবের সিংহ বলেন,—সমাধি দেখিলাম।
এটি গৌরবের সমাধি বলিলেও হয়। এই সিংহের ঘরে, হা
বিধাতঃ কি কেবল শৃঙ্গাল জন্মিল ? তাহার শেষটি আজ ক্রিয়াতে
ভিক্ষা করিয়া জীবনধাপন করিতেছেন।

তাহার পর লাহোরের দুর্গ দেখিলাম। যে সকল গৃহে
রণজিৎ থাকিতেন, তাহার সেই শ্রিয় শিখ-মহল এখনও বর্ত্ত-
মান। তুমি হাজারি আয়না দেখিয়াছ। মনে কর, কতকগুলি
কঙ্কের ভিতরের প্রাচীর ও ছাদ, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নার
দ্বারা খচিত। একটি গৃহে শিখদিগের নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত
রহিয়াছে। তাহাদের বর্ম বা বক্ষস্ত্রাণ ও পৃষ্ঠস্ত্রাণ দেখিয়া বিস্মিত
হইলাম। এ গুলি ধাতুময় এবং ওজনে এক একটি ২০।৩০
সেরের কম হইবে না। এই তার অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যবহার
করিয়া, বাহারা সেই বিষয়কর যুদ্ধ সকল করিয়াছিল, জানি না,
তাহারা কি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোকই ছিল। তাহারা কত প্রকা-
রের অস্ত্র, বন্দুক ও তোপই প্রস্তুত করিয়াছিল ! আমার চক্ষে জল
আসিল, আর মনে হইল,—যুবরাজ ! আজি সে জাতি কোথায় ?

লিখিতে ভুলিয়াছি যে, জাহাঙ্গীরের সমাধি দেখিয়া আসি-
বার সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমা মেহের-উন্-নেসা (অর্থ, স্বীকৃতি-
চন্দ্র) বা মুরজাহান (অর্থ, পৃথিবীর আলোক) সুন্দরীর সমাধি
দেখিয়া আসি । তুমি জান, মুরজাহান তখন ভারতবর্ষের অধি-
তায়ী সুন্দরী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রমণী বলিয়া, তাঁহার
স্বামী সের আফগানকে বধ করিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ
করেন । একটা গল্প শুনিলাম । এক জন কবি তাঁহাকে দেখিবার
জন্য, বহুদূর হইতে আসিয়া, রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে ।
যখন তাঁহার গাড়ী চলিয়া যায়, সে বলিয়া উঠিল,—

খোল আবরণ,

বহু দূর হ'তে

এসেছি দেখিতে মুখ ।

মুরজাহান উত্তর করিলেন, তাও কবিতায়,—

খুলিলে; ভূতলে

উদিকে চন্দ্রমা,

তারাগণ পাবে ছথ ।

এ হেন রমণীরূপের সমাধিটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । দেখিয়া
মনে যে কি কষ্ট হইল, বলিতে পারি না । উপরের কবর পর্য্যন্ত
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । নিম্নের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাবীর
বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতেও কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত
ধুইয়া লইয়া গিয়াছে । বন্ধিমবার্ যথার্থই মুরজাহানের মুখে
বলিয়াছেন, 'এ রূপের ছাঁচ কবরের মাটিতে থাকিবে ।' সেই
রূপের, সেই প্রতিভার চিহ্ন বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু,
অবস্থার স্বর্ণচক্রে পড়িয়া, এই ভুবনমোহিনী যে পাপে লিপ্ত
হইয়াছিলেন, রাবীরও সাধ্য নাই যে, তাহা ইতিহাস হইতে
মুছিয়া কেলে ।

অমৃতসার ।

তোমাকে অমৃতসরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি । লাহোর হইতে দিল্লী আসিবার সময়ে, পথে অমৃতসর দর্শন করি । প্রতুল, তাঁহার একজন মুল্লীকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন । আমার গাড়ীস্থিত জনৈক পঞ্জাবী যুবক,—পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি-এ,—উক্ত মুল্লীর কাছে আমার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে । তাহার নাম হরিচন্দ্র । তাহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর, ভ্রাতা অমৃতসরের তলশিলদার, সে নিজেও এবার ডিপুটী-কালেক্টরী পরীক্ষা দিয়াছে । প্রতুলের বাসায় ঠিক যেন আমি কলিকাতায় ছিলাম । বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালী আহার, বাঙ্গালী ব্যবহার । আমি প্রতুলকে বলিতাম যে, ইহার জন্ত আমার পঞ্জাব আসিয়া কি ফল ? কিন্তু প্রতুল-ভাষার সময় নাই যে, আমাকে কোনও পঞ্জাবীর বাড়ী লইয়া গিয়া, পঞ্জাবের আচার ব্যবহার দেখান । অতএব এ যুবকের সহিত আমিও আগ্রহের সহিত আলাপ করিলাম । ফল এই হইল, অমৃতসরে গাড়ী পঁহছিবার পূর্বেই, সে আমাকে পাইয়া বসিল । সে আমাকে সঙ্গে করিয়া, সমস্ত অমৃতসর দর্শন করায়, এবং তাহার বাড়ীতে আহার করায় ;—সে আহারে বেশ নূতনত্ব আছে । গোলাকার এক চৌকির উপর বসিলাম, এবং গোলাকার আর এক চৌকিতে রুটী, ডাল, তরকারী এবং মাংস প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী প্রদত্ত হইল । আমি বড় আনন্দে খাইলাম । লোকটি এত ভালবাসা জানাইল যে, গাড়ী ছাড়িবার সময়েও আমার হাত তাহার হাতে গাঁথা ছিল । অথচ, এ দিকের বাঙ্গালীরা বলেন যে, এ দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে স্পৃহা করে ; তাই তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে মিশেন না ।

অমৃতসরে প্রথমে বিখ্যাত স্বর্ণ-মন্দির দেখিতে যাই। ইহাকে শিখেরা “দরবার সাহেব” বলে। ‘তুমি বেহারের “পাতপুত্রী” দৃশ্যটি অরণ কর। একটি বৃহৎ সরোবর। ইহারই নাম অমৃতসর। তাহার চারি তীরে, সারি সারি দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা। শুনিলাম, একটিতে রোগী ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না; এখানে, রোগী ধনা দিলেই রোগ আরোগ্য হয়।

অমৃতসরোবরের মধ্যস্থলে সলিল-গর্ভে স্বর্ণ-মন্দির, চতুর্থ শিখগুরু রামদাস কর্তৃক ৩০০ শত বৎসর পূর্বে নিৰ্ম্মিত হয়। মন্দিরটি অনতিবৃহৎ হইলেও, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। উহার স্বর্ণে সমাচ্ছন্ন দেহ ও উচ্চ গুণেজ, মধ্যাহ্নরবিকরে প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছিল। অন্তর্ভাগে স্বর্ণ কারুকার্য্যে এবং স্থানে স্থানে মূল্যবান পাশা, মরকত, হীরক ইত্যাদি দ্বারা খচিত। তন্তুসারি দ্বারা শোভিত মধ্যাক্ষে, গুরুগোবিন্দের রচিত গ্রন্থদ্বয় বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং বহুমূল্য চামরে উভয় পার্শ্ব হইতে ব্যঞ্জনিত হইতেছে। এক দিকে বসিয়া দুই জন গায়ক গাহিতেছে। যাজ্ঞী নর-নারী কক্ষের চারি দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। দ্বিতল গৃহে, গুরুগোবিন্দের ষোড়শবেশে অখারুট একটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সেখানে বর্ণজিৎ সিংহেরও একটি চিত্র আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে, গুরু নানকের একটি মূর্ত্তি স্বর্ণে খোদিত রহিয়াছে। এক দিকে মর্শ্বর সেতুর দ্বারা মন্দিরটি সরোবরের তীরের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শুনিলাম, জাহাঙ্গীর ও তাঁহার অধিতীয়া রূপসী পত্নী মুর-জাহানের সমাধি ও সালেমার উদ্যান হইতে বহুমূল্য মর্শ্বর ও রত্ন ইত্যাদি আনীত হইয়া, এই মন্দির নিৰ্ম্মিত ও সজ্জিত

হইয়াছিল। সুবজাহানের সমাধির বর্তমান, হুবহু হইয়াই প্রধান কারণ। অনিয়া আমি দীর্ঘনির্ধাস সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই ধার্মিক ও বীর-পুরুষেরা, কিরূপে যে এতদূশ হৃদয়হীন কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শিখদিগের ধর্ম্মের স্রষ্টা নানক। ইনিই ইহাদের প্রথম গুরু। গুরু গোবিন্দ দ্বিতীয় গুরু। ইনি বোরতর যোদ্ধা ছিলেন। নানক-প্রচারিত ধর্ম্ম ও গীতোক্ত ধর্ম্ম, আমি বড় প্রভেদ দেখিলাম না। শিখেরা জাতিভেদ মানে না, আহারসম্বন্ধে কোনও রূপ ধরা-বাঁধা নাই। তাহারা কোনও ধর্ম্মের বিধেবী নহে, একমাত্র নারায়ণের উপাসনা করে, এবং গ্রন্থ দু'খানির পূজা করে। আমার ধারণা হইয়াছে যে, গুরু নানক, বিলুপ্ত গীতোক্ত ধর্ম্মই প্রচার করেন। নানক শিখদিগের কৃষ্ণ, রণজিৎ সিংহ অর্জুন, এবং "বুদ্ধ বিগত জর"ই ইহাদের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র সাধিয়া, ধর্ম্মবলে কর্ম্মকে বলবান করিয়া, অমিতপরাক্রমে ইহারা পঞ্জাবে মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর, শিখরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রবলেই, শিখেরা ভারতীয় ইতিহাসে, অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মন্দিরদর্শনের পর, আমি 'গোবিন্দগড়' দুর্গ দেখিতে বাই। এ দুর্গ রণজিৎ সিংহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গের মত, ইহা দেখিতে একটি প্রসারিত-দল পক্ষের মত। তাহার পর নগর দর্শন করি। অমৃত-সর নগরও রণজিৎ কর্তৃক স্থাপিত, দেখিতে অতি সুন্দর। একটি দোকানে সিঁদা, কিরূপে শাল প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিলাম। স্বতন্ত্র স্থানে আলোয়ান প্রস্তুত হয়। সেই আলোয়ানের উপর, এই সকল দোকানে কারুকার্য্য করা হয়। এক এক বর্ণের সূতা, এক এক জন

কারীকরের হাতে। এক জন কারীকর, একখানি শালের ফুলের সর্ব্বত্র কাল স্থতার কার্য্য করিতেছে, আর এক জন তাহাতে লাল স্থতার কার্য্য করিতেছে। স্থচের দ্বারা কি স্থানভাবে এবং কি পরিশ্রমের সহিতই কার্য্য করিতে হয়। একখানি ‘দোরোখা শাল’ দেখিলাম। ইহার ছই পিঠেই বোখ। আমি এরূপ শাল দেখিনাই। মূল্য ২০০ টাকা বলিল। এরূপ এক যোড়া শাল লইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। কারীকরদের বেতন ৭।৮ টাকা হইতে ২০ পর্য্যন্ত।

তাহার পর, অমৃতসরের উদ্ভান এবং প্রিন্স অব ওয়েল্সের জন্ম ঘে গৃহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, অমৃতসর দর্শন শেষ করিলাম। আমি এখানে ৬।৭ ঘণ্টামাত্র ছিলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

দিল্লীর কথা তোমাকে আমি আর নুতন করিয়া কি লিখিব? “বিশপ হিবার” হইতে “নীহারিকা”-রচয়িত্রী পর্য্যন্ত, যিনি দিল্লী আত্মা দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তুমিও তাহা অনেক বার পড়িয়াছ। অতএব দিল্লীর কথা আমি আর নুতন করিয়া কি লিখিব? দিল্লী, হিন্দু-সাম্রাজ্যের মহানুশান, মুসলমান সাম্রাজ্যের মহা সমাধি, মহাকালের মহা রক্তভূমি। শ্মশানের ছাই উড়িয়া গিয়াছে, যমুনার পবিত্রজলে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সমাধির প্রস্তরবাশিতে দিল্লী আজ সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান দিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্চ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া, কেবল সমাধির পর সমাধি, তাহার পর সমাধি। যে

দিকে চাহিবে, দেখিতে পাইবে—“ঘোরারাবী, মহারোজী, শ্রশানালয়বাসিনী,” ধ্বংসরূপিণী,—মহাকালী, দিগম্বরীবেশে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। ধ্বংসগত সাম্রাজ্য সকলের ভাস্কর নীরবতার মধ্য হইতে যেন জননীর ঘোর অট্টহাস্ত ভাসিয়া উঠিতেছে। দিল্লীতে পা দিয়াই আমার সেই বাইরণের মহাকাব্য স্মরণ হইল ;—

“দাঁড়াও। চরণ তব সাম্রাজ্য ধুলায়।

“হুইট সাম্রাজ্য নীচে রয়েছে প্রৌথিত।”

দিল্লী যত দেখিতে লাগিলাম, তত অন্য একজন কবির আক্ষেপ মনে পড়িল,—

“বীরত্বের গর্জ আর প্রভুর বিত্তব,

“সম্পদ সংসার সব বাহা করে দান,

অলজ্ঞা মৃত্যুর হায়। মুখাপেক্ষী সব,

‘গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।’”

সর্ব প্রথম হিন্দুর শ্রশানের কথা বলিব, কারণ হিন্দু সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দু সাম্রাজ্য, ভগবান কৃষ্ণের কীর্তি,—যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য,—উপন্যাসের কথা নহে, কাব্যকারের সৃষ্টি নহে। ইঙ্গ্র প্রস্থের রাশি রাশি ভয়াবশের, স্তূপাকারে, বর্তমান দিল্লীর এক কোশ দক্ষিণে এখনও বর্তমান আছে। লোকেরা ইহাকে এখনও ইঙ্গ্রপাট বলে। যুধিষ্ঠিরের রাজপুরীর হুর্গ এখনও বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য, কালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যখন সম্রাটেরা ইহার সংস্কার করেন। হুর্গের এক কোণে ভগ্ন রাজপুরীর প্রস্তরবাশিতে নির্মিত, এক উচ্চ মণ্ডিত এবং তাহার পার্শ্বে আর একটি অতি হৃদয়, গোল, ত্রিতলকক্ষ-সমবিত্ত, স্নায়তন গৃহমাত্র বর্তমান আছে। হিন্দু রাজপুরীর প্রস্তর নির্মিত মুসলমান রাজপুরীও আবার কালে ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে । দ্বিতীয় গৃহের দ্বিতল কক্ষে বসিয়া, যমুনার শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে, প্রথম মোগল সম্রাট হুমায়ুন অধ্যয়ন করিতেন । ইহার তৃতীয় সোণান হইতে পড়িয়া, তাঁহার অপমৃত্যু হয় । মোগল রাজ্য, তাঁহার পুত্র, প্রাণঃস্বরণীয় আকবর আশ্রয় তুলিয়া লইয়া যান । ইঙ্গ্রপ্রস্থের দ্বিতীয়বার কপাল ভাঙ্গিল । ইদানীং ইহাতে একটি গ্রাম বসিয়াছে । বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহও নির্মিত হইয়াছে । যেখানে সেই বিচিত্র রাজপুত্র, সেই অতুলনীয়, ময়দানবের নির্মিত সভাগৃহ ছিল, আজ সেখানে দরিদ্রের কুটীরসমূহ বিরাজ করিতেছে । ভগবানের সেই অমাহুযিক লীলার কেন্দ্রস্থান ইঙ্গ্রপ্রস্থের এই দশা । মসজিদের ছাদের প্রস্তরে বক্ষ রাখিয়া, পুরাতন হুর্গের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া শোকের ও ভক্তির উচ্চ্বাসে আমি কাঁদিলাম । হয় ত, এ স্থানে এখনও সেই নরোত্তমের পদধূলি পড়িয়া আছে,—প্রহ্লাদের মত তাহা অঙ্গে মাখিয়া, এই অকিঞ্চিংকর মানবজীবন সার্থক করি ! সকলই গিয়াছে, কেবল এখনও হুর্গের পদমূল ভক্তিভাবে প্রক্ষালন করিয়া, যমুনা দেবী শোক নীরবে বহিয়া যাইতেছেন । আজ এই পর্য্যন্ত ।

পুরাতন দিল্লী ।

ইঙ্গ্রপ্রস্থের কথা লিখিয়াছি । যে অমাহুযিক প্রতিভাবলে ভারতে মহাত্ম্যত স্থাপিত হইয়াছিল, প্রভাসতীবে অকালে তাহার তিরোধান হইলে, সেই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি একরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মে স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা কিছু কালের জন্যে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্থায়ী হইয়া, ভারতে স্বথ ও শান্তির

বিধান করিয়াছিল। কালে গীতার ধর্ম লুপ্ত হইল। অনন্তজ্ঞান-সম্পন্ন শাস্ত্রকারদের জ্ঞানকে উত্তরাধিকারিগণ, ভারতের শক্তি জাতিভেদ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বাঁধিলেন। ধর্ম কেবল যাগযজ্ঞে এবং নরহত্যা ও জীবহত্যার পরিণত হইল। আবার সেই অবস্থা,—

“যখন যখন ঘটে ভারত ! ধর্মের মানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সজ্ঞি আমি।
সাধুদের পরিজ্ঞান, বিনাশ হৃদয়তদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম-গ্রহণ।”

আবার ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব এক হুৎকারে জাতিবন্ধন উড়াইয়া দিয়া, সাম্যগীতে ভারত প্রাণিয়া, গীতার কর্মবাদ ঘোষণা করিলেন। ভারত নবজীবন পাইয়া নাচিয়া উঠিল। আবার অশোকের ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। অসংখ্য শৈলস্তুভ, বৌদ্ধ ধর্মনীতি বক্ষে ধারণ করিয়া, ভারত ব্যাপিয়া, ধর্মরাজ্য ঘোষণা করিল। কিন্তু জগতের পরিবর্তননীতি অলজ্য। উন্নতি না হইলে অবনতি হইবে। জগৎ স্থির থাকিতে পারে না। আবার জ্ঞানকে বৌদ্ধ যাজকের হস্তে পড়িয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম অন্তঃসারশূন্য হইল। ভগবান্ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈত শৈববাদে ভারত মাতাইয়া তুলিলেন। ভারতে তৃতীয় বার ধর্মশাস্ত্ররাজ্য স্থাপিত হইতে চলিল। চৌহান পৃথ্বীরাজ ইহার শক্তি। ইন্দ্রপ্রস্থের চারি কোশ উত্তরে, যমুনা-তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। তাহারই নাম দিল্লী। পৃথ্বীরাজের দুর্গের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। তাঁহার কীৰ্ত্তিস্তম্ব বা কুতূব মিনার, এখনও বর্তমান আছে। নূতন দিল্লীর বহির্ভাগে, এখনও তাঁহার নীতিস্তম্ব দুইটি বিরাজ

করিতেছে । পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ বলেন, কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিনের
নির্ম্মিত । মোল্লাগণ ইহার সাহুদেশে দাঁড়াইয়া, “আজাহার”
দিবে বলিয়া, নির্ম্মিত হইয়াছিল । হিন্দু বলেন, পৃথ্বীরাজের
কন্তা যমুনা দর্শন করিবেন বলিয়া, এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল ।
এই দুইটি প্রবাদের কোনটিই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না । এই
পর্বতবৎ উচ্চ স্তম্ভে উঠিলে, কথা কহিবার শক্তি থাকে না ! অত-
এবং মোল্লা সাহেবগণ এত সোপান বহিয়া উঠিয়া যে আজাহার
দিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না । বিশেষতঃ পার্শ্বস্থিত
বিপুল কারুকাৰ্য্যখচিত, বিচিত্র, অতুলনীয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন
করিয়া, যে মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই ।
মসজিদের পূর্বে আজাহারের স্থান নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর নহে ।
অন্য দিকে, অনতিপরিষ্কৃতিতা, কুহুমকোমলা, পৃথ্বীরাজ-হুহিতা
যমুনা দর্শনের জন্ত যে এত সোপান বাহিয়া উঠিবে, তাহাও
সহজ বিশ্বাস করা যায় না । আমার বোধ হয়, চিতোরের যেক্রপ
কীৰ্ত্তিস্তম্ভ আছে, ইহাও সেইরূপ কোনও বিরাট যুদ্ধের শেষে,
পৃথ্বীরাজ কর্তৃক বিজয়ের নির্দর্শনস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল ।
কালে ইহা জীর্ণ হইলে, কুতুবুদ্দিন ইহা সংস্কৃত এবং আরবী
অক্ষরে শোভিত করেন । আমার অনুমানের প্রধান কারণ এই যে,
চিতোরের স্তম্ভ ও এই স্তম্ভটি ঠিক একরূপ ।

বলিয়াছি, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতেছিল, কিন্তু
হইল না । অহম্মদীয় ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, মুসলমান
নির্গিজয়ীরা ঘন ঘন ভারতের দ্বারে হানা দিতে লাগিলেন ; অন্যান্য
শব্দে পৃথ্বীরাজের বাহুবলে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ।
কিন্তু হায় ! হায় ! এমন সময়ে ভারতের চিরকলঙ্ক, চিরসর্ব্বনাশের
কারণ অন্তর-বিরোধানল জলিয়া উঠিল । পৃথ্বীশ্রীকান্ত, কুলাঙ্গার,
কান্তকুজপতি জয়চন্দ্র, মহম্মদ বোরীর সঙ্গে যোগ দিল । বীর-

কুলোত্তম পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। ভারতের কপাল
বুঝি চিরদিনের জন্য ভাঙিল; ভারতের শেষ সূর্য্য চিরদিনের
জন্য অস্তমিত হইল।

—*—

বর্তমান দিল্লী ।

পূর্বে তোমাকে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং পৃথ্বীরাজের দিল্লীর
কথা লিখিয়াছি। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীর, বৌদ্ধ সাত্রাজ্যের
একটিমাত্র লৌহ স্তম্ভ, এবং পৃথ্বীরাজের “পিথোরা”-তুর্গের
ভগ্নাবশেষমাত্র বর্তমান আছে। ভারতের রক্ষের উপর দিয়া,
এমনই সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বকৃত দেবালয়ের
প্রাক্ষণে যে লৌহস্তম্ভটি আছে, লোকে তাহাকে “ভীমের গদা”
বলিত। প্রবাদ, কোনও রাজা তাহার মূল দেখিবার চেষ্টা
করেন। তাহাতে স্তম্ভ হইতে রক্ত উঠে এবং স্তম্ভ “দিল্লী” হইয়া
যায়। “টিল্লী” হইতে “দিল্লী” নাম হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের
অঙ্গে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা এখন পুরাতত্ত্ববিৎগণ
পড়িয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, রাজা “ধুব” কর্তৃক, ১,৫০০
বৎসর পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধ রাজা
ছিলেন। “দিল্লীর উপর দিয়া এমন বিপ্লব গিয়াছে যে, এ ঘটনাটি
পর্যন্ত দিল্লীর পরবর্ত্তী অধিবাসিগণ কেহ জানিত না।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। কুতূহলিনী
ঐতিহ্য প্রথম পাঠান সম্রাটেরা, পৃথ্বীরাজের দিল্লীতে রাজধানী
রাখেন। এই ঐতিহাসিক যগশ্রমণে, জৈবের নৈতিক রাজ্যের
প্রমাণ, সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিনের পদ্মিনী-
উপাখ্যান এবং চিতোররক্ষণ প্রবণ কর। আর এখানে দেখ,

সেই আলাউদ্দিন যে প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করিতেছিল, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার রাজবাটী ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । আফগান রাজ্যের জনৈক অধিনায়কের সমাধি, এখনি ইংরাজদিগের “ডাকবাঙ্গলাতে” পরিণত হইয়াছে । তাহার কবরের প্রস্তরখানি বারাতায় পড়িয়া রহিয়াছে । হরি ! হরি ! মানুষ কেমন করিয়া এমন হৃদয়হীনতার কার্য্য করিতে পারে ?

‘টোগলক’ সম্রাটেরা, ইহার কিঞ্চিৎ দূরে, যমুনাतीবে, নূতন দুর্গ ও নগর নির্মাণ করিতেছিলেন । তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । “পৈথোরা”-গড়ে, একদিকে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর অর্থ উপার্জনের জন্ত মন্দির নির্মাণ করিয়া, “যোগমায়া” নাম দিয়া, এক যোগী পূজা করিতেছেন ; পূজার মন্ত্রটিও জানেন না । অন্য দিকে ছুটি পুরাতন গোলাকার কক্ষ, ডাকবাঙ্গলা স্থাপিত হইয়াছে । কালের বিচিত্র গতিতে এই মহা বীরভূমির কি পরিবর্তনই ঘটাইয়াছে । ডাকবাঙ্গলাতে বিশ্রাম করিয়া, বর্তমান বা নূতন দিল্লীতে ফিরিয়া আসি । পথে “সপদর জঙ্গের” দিরাট সমাধিমন্দির । তাহার চারিদিকে, বিচিত্র-কারুকার্য্যখচিত আরও অনেকগুলি বহু পুরাতন সমাধিমন্দির বিবলভাবে দাঁড়াইয়া আছে । এ সকল পার হইয়া আসিয়া নূতন দিল্লী । আফগান সাম্রাজ্যও, কালে মোগল সাম্রাজ্যের ছায়াতে বিলুপ্ত হইল । তুমি পড়িয়াছ যে, মোগল সম্রাটেরা যহবংশের সন্তান । প্রথম মোগল সম্রাট বাবর এবং হুমায়ুন, অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন । বীরত্ব এবং বিজ্ঞা একাধারে সম্মিলিত করিয়াছিলেন । যহবংশের সন্তান বলিয়া হউক, কিংবা মহাভারতের পুণ্য ঐতিহাসিক ভূমি বলিয়াই হউক, তাহারা বিলুপ্ত ইজ্রপ্রদেশে রাজধানী স্থাপন করিলেন হুমায়ুন, শের আফগান কর্তৃক পরাভূত হইয়া মারধারের মরুভূমি

পলায়নকালে অমরকোটে সম্রাটচুড়ামণি আকবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে, হুমায়ুন যে মসজিদ নির্মাণ করিতেছিলেন, সেস তাহা শেষ করেন। তাহার নাম “কিল্লাকোনা” মসজিদ। তাহার পার্শ্বে একটি উচ্চ ত্রিতল ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করেন। তাহার নাম “সের মজিল।” হুমায়ুন সেস শাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর, ইহাতে তাহার পুস্তকালয় স্থাপন করেন। একদা তিনি সর্বোচ্চ কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত মসজিদ-শীর্ষ হইতে, ‘মোয়াজ্জিন’ নামাজের সময় বিজ্ঞাপন করিল। হুমায়ুন ব্যস্ত হইয়া যেমন অবতরণ করিতে-ছিলেন, অমনই পদস্থলিত হইয়া, তৃতীয় সোপান হইতে গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে পড়িয়া পান। তাহাতে তাহার অপমৃত্যু ঘটে।

তাঁহার কুলতিলক পুত্র আকবর, আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানী নির্মাণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও তথার রাজত্ব করেন। সাহাজাহান পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া, নূতন দিল্লীর দুর্গ ও গৃহাদি নির্মাণ করেন। ইহাঁর সময়েই আগ্রা এবং দিল্লীর দুর্গের বিখ্যাত অট্টালিকা সকল ও “তাজমহল” নির্মিত হয়। স্থাপত্যকার্য্য, ইহাঁর সময়ে যেন ভারতবর্ষে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন দিল্লীর দুর্গের মধ্যে চল। প্রথমে “দেওয়ান আম” বা সাধারণ দর্শনগৃহ। বঙ্ক প্রস্তর স্তম্ভ সারির উপর একটি সুন্দর গৃহ। তিন দিক খোলা, এক দিকে প্রাচীর, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কক্ষ। মধ্য কক্ষটির দ্বিতলে, সম্রাটের সিংহাসন থাকিত। এই কক্ষটি বেত মর্শ্বর-প্রস্তরের কারুকার্য্যে খচিত। এখানেই ময়ূরসিংহাসন থাকিত। তাহার নিম্নে একটি বেত মর্শ্বরবেদী আছে। “তাহার উপর উজির বসিতেন। আবেদনপত্রাদি তিনি পাঠ করিয়া এক স্বর্ণপাত্রে

রাখিতেন। এবং তাহা বজ্রতৃষ্ণলে উখিত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইত। তাহার পশ্চাতে, যমুনাভীরে, খেতপ্রস্তরের শ্রেণীবদ্ধ অটালিকা শোভা পাইতেছে। কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত “দেওয়ান” খাস।” ইহারও তিন দিক খোলা। যমুনার দিকে প্রস্তরের ছিন্নবিশিষ্ট গবাক্ষ। ইহার স্তম্ভ সকল এবং উপরের ছাদ, স্তবর্ণে এবং নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। চারি কোণের স্তম্ভের উপর, প্রাচীরে লেখা আছে,—

“যতপি স্বরগ থাকে এই ধরাতলে,

এখানে—এখানে—তাহা এখানে কেবল।”

তাহার বামপার্শ্বে সেইরূপ কক্ষ সারি, সম্রাটের অন্তঃপুর। কক্ষগুলি অতিকুদ্র, কিন্তু অতি মনোহর। যমুনার দিকে একটি গোল প্রাচীরহীন কক্ষ, গৃহের বহির্ভাগে শোভা পাইতেছে স্তম্ভের বিরামস্থানে আয়না বসান রহিয়াছে। কিন্তু এই অন্তঃপুরের কক্ষে, কি অস্ত্র কোথাও কপাট নাই। বহুমূল্য পুঙ্ পর্দা, প্রত্যেক দ্বারে ঝুলান থাকিত। দেওয়ানখাসের অস্ত্র পার্শ্বে স্থানের গৃহ। ইহার কক্ষগুলি অতি মনোহর। প্রাচীর এবং ছাদ কাচে সুসজ্জিত। যে দিকে চাহিবে, তোমার শত শত প্রতিবিম্ব দেখিবে। জানি না, নুরজাহান প্রভৃতি কত সুলতান প্রতিবিম্বই এ সকল কাচকক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। একদিকে একটি কক্ষে জল গরম হইয়া প্রণালীপথে মর্দরনির্মিত কুদ্র কুণ্ডে আসিত। ইহাতে সুলতানীরা অবগাহন করিতেন। চারিদিকে তাহাদের তৈলমর্দনের এবং আরামের কক্ষ রহিয়াছে। যখন শত শত সুলতানীরা সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া স্থান করিতেন, কেহ জলে অর্দ্ধ বা পূর্ণ নিমজ্জিতা, কেহ কক্ষে মদ্যপানে উপবিষ্টা বা অর্দ্ধ-শায়িতা, কেহ জলক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বেড়াইতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, কেহ গাহিতেছেন, কেহ বসলাপ করিছেন, যথি।

যরি ! কি রূপের ফোয়ারাই চারিদিকে খেলিতে থাকিত । সম্মুখে আর একটি কক্ষ । তাহার মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড । তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত হইয়া, গৃহ সুবাসিত করিয়া রাখিত । এরূপ আরও ৩। ৪টি কক্ষ আছে । কে বলিবে, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত । স্নানক্ষেত্র সম্মুখেই “মতিমসজিদ” । শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত । ইহাতে বঙ্গের কার্য্য নাই, কেবল শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য । প্রকৃতই ইহা মসজিদের মধ্যে একটি মতি । গৃহটি কি সুন্দর ! এখানে সম্রাটকে বেঠেন করিয়া, অন্তঃপুরবাসিনীরা নমাজ পড়িতেন ।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে, পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে নিজামদ্দিন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্মিত সমাধি আছে । গৃহটি অতি সুন্দর । তাহার কিঞ্চিদূরে, একই প্রাঙ্গণে, কবি খসরুর সমাধি । ইহাতে ভূমি বুঝিবে, মুসলমান সম্রাটেরা কবিদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন । তাহারই পার্শ্বে যরি ! যরি ! কি সুদয়গ্রাহী দৃশ্য ! যখন যোগলকুলের কংস আবরণজিব, আপন পিতা সাহাজানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কথা জেহানারা চিরকোমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, পিতার সেবার জন্ত, তাঁহার সঙ্গে কায়াবাসিনী হন । তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্যস্থান গ্রামল দুর্দ্বানলে শোভিত । কবরের শীর্ষদেশে, একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে, তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে ;—

“বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত

কবর আমার ।

তুণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা

সম্রাট-কর্ত্তার ।”

পিতৃপরায়ণা জেহানারা, বমণীদিগের জন্ত, পিতৃভক্তির এবং পবিত্র-
তার কি আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন ! আমি আকবরের সমাধিকে
ভিন্ন, আর কোনও সমাধিকে প্রণাম করি নাই। জাহানারার
সমাধিকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। স্থানটি দেখিয়া
আমার কলুষিত হৃদয়ও যেন পবিত্র হইল। স্থানটি একটি মহাতীর্থ।

• সমদর্শিনী নীতিতে মহামতি আকবর যে সাম্রাজ্য স্থাপন
করিয়াছিলেন, নরাদম আরঙ্গজিবের হুর্নীতিতে এবং ধর্মোৎ-
পাদনে, শিবজীর অসিষাতে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুর্গের
বাহিরে প্রকাণ্ড “জুমা মসজিদের” গগণস্পর্শী স্তম্ভ-শিবে দাঁড়াইয়া
দিল্লী দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন মুসলমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস,
চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। হৃদয় কি ঐতিহাসিক স্মৃতিতেই
আন্দোলিত হইতে থাকে। মানবের সম্পদ ও গৌরব কি জনবিধ
ফলিয়াই ধারণা হয় ! ইচ্ছা করে না যে, সেই স্তম্ভশিবে অধিরোধণ
করিয়া আবার নংসারে প্রবেশ করি। পাপমতি আরঙ্গজিবের
সঙ্গে যোগল সাম্রাজ্য ডুবিল। শিবজী তাহার ভিত্তি পর্যন্ত
চঞ্চল করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের অদৃষ্ট ক্ষেত্র পাণিপথ
যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহা নাদের সাহার অসিপ্রহারে টলিয়া পড়িল। নৃশংস
‘নাদের’ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, নগর কেন্দ্রস্থলস্থিত এক মসজিদের
উপর হাতে, দিল্লীবাসীদের বধাজ্ঞা প্রচার করিল। নরশোণিতে
দিল্লী ভাঙ্গাইয়া, যমুনাকে রক্তবর্ণা করিল। দিল্লী বিলুপ্তপ্রায়
হইল। যোগল সাম্রাজ্য শোণিতস্রোতে ভাসিয়া কালসাগরে
চিরদিনের জন্ত বিলীন হইল।

“আহা ! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহ, মোচন হইল না আরও ।

“ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি, লুটি নিল যাহা ছিল সারও ।”

সেই বধভূমি এখন একটি কোয়ারার দ্বারা চিহ্নিত আছে। আজ
আব না। আজ দিল্লী-দর্শন-কাহিনী শেষ করিব। নরপুত্র নাদের

সাহা দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এবং নরহত্যা-স্রোতে দিল্লী ভাসাইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যোগলরাজকন্যাই আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার ছায়া ক্রমে ব্রিটিশ-বৈজয়ন্তী-ছায়াতলে বিলীন হইল। যে ইংরাজ যোগলের ছায়াতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসে, সে যোগলের সিংহাসনে বসিল। আক-বরের উত্তরাধিকারীকে তাহার বৃত্তিভোগী হইয়া, সামান্য ব্যক্তির মত দিল্লী নগরে বসতি করিতে হইল। মরুমসিংহাসন নাদের সাহা লইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস ব্রিটিশ সৈন্ত-নিবাস হইল। ভারত বীরশূন্য, পদতলে দলিত, দেখিয়া ব্রিটিশ সিংহের রাজ্যলিপ্সা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঘোরতর অধর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহার ক্রমে ক্রমে তাঁর ভারতের পঞ্জাব পর্যন্ত উদরসাৎ করিল। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। ভারতের মানচিত্র লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজ্যের উপর একজন মহারাজা, শক্তিমানের উপর একজন মহাশক্তিমান আছেন। তাঁহার রাজনীতি, তাঁহার শক্তি অলঙ্ঘ্য। ঝান্সির বীর-রাণী লক্ষ্মী বাই, সিংহিনীর মত গর্জন করিয়া বলিলেন,—

“মেরা ঝান্সী নেহি দেঙ্গে । সিপাহি-বিক্রোহানল জলিয়া উঠিল, ইংরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল, ব্রিটিশ সিংহাসন টল টল করিতে লাগিল। দিল্লী ভারতের যুগযুগান্তরীন রাজধানী। বিক্রোহিণী চারিদিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইল।” বৃত্তিভোগী বুদ্ধ যোগল সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে, বলে বাড়ির মত দাঁড় করা-ইয়া, যোগল সাম্রাজ্য বিদ্বোধিত করিল। শিখ সৈন্ত সহায় করিয়া ইংরাজ দিল্লী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর চারিদিকে দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। তাহার বিশাল নগর-দ্বার সকল বন্ধ। পার্শ্বস্থিত অহুচ্চ সৈন্য-শেখর হইতে ইংরাজ “কান্দী-বাদের” উপর গোলা বর্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঝান্সীতে দৃঢ় যে, প্রায় চারি মাস কাল

গোলা বর্ষণ করিয়াও তাহা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প করিয়া, কতক সৈন্য বিজোহীদিগের অগ্নিরূপি পার হইয়া আসিয়া, প্রাচীরের তলে স্তূপাকার বারুদ রাখিয়া, অগ্নিসংযোগ দ্বারা প্রাচীরের এক স্থলে সুরঙ্গ করিয়া, অমিতপ্রভাবে সেই সুরঙ্গ দিয়া দিল্লী প্রবেশ করিল। বারুদের নিষ্ঠুরিতে এবং নির্দোষে ভূমিবম্প হইল, দিল্লী কাপিল, বিজোহীরা টলিল, পলায়ন করিতে লাগিল। দিল্লী আবার নরশোণিতে প্রাবিত হইতে লাগিল। বিজোহীদিগের নায়ক কেহই ছিল না, প্রকৃত যুদ্ধবিন্দা কেহই জানিত না। যদি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া না থাকিয়া, তাহারা বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিত, ৪০,০০০ বিজোহী এক ক্ষুৎকারে ক্ষুদ্র ইংরাজ-সৈন্য উড়াইয়া দিতে পারিত। সেনাপতি এবং নীতিশূন্য বিজোহীগণ, কর্ণধারশূন্য অর্ণবানের ভায়, এই ঋতিকায় উড়িয়া গেল। বিজয়ী নিকলসন, নগর প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া পলায়নপর বিজোহীদিগের ধ্বংসাধন করিতেছিলেন, পার্শ্বস্থিত একটি কক্ষে লুকায়িত জনৈক বিজোহীর গুলিতে তিনি গুপ্তিত হইলেন। কান্দীরদ্বারের অবস্থা ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক ভোপের গোলায় দাগে, প্রত্যেক স্তম্ভাংশে, সিপাহিবিজোহীর ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। নিকলসন বিজয়ের সময়ে যেখানে পড়িয়াছিলেন, সেই স্থানটিতে একটি স্মৃতিলিপি আছে। শৈল-মালার যে শৃঙ্গ হইতে দিল্লীতে গোলা বর্ষণ করা হয়, তথায় এখন মনোহর “বিজয়স্তম্ভ” বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধে বীহারা পড়িয়া ছিলেন, তাহাদের নাম তাহার চারি পার্শ্বে স্মৃতিত রহিয়াছে অনতিদূরে, যে “হিন্দু রাওর” অট্টালিকাতে ইংরাজগণ সমবে হইয়াছিলেন, এবং যে গৃহে মহিলাগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, তা একদল বিজয়ান আছে। তাহাদের মধ্যস্থলে ধর্ম্মশোকের ২,০০

বৎসর পূর্বের নিশ্চিত, একটি নীতিসূত্র' উপরি-উক্ত বীরত্বের নিদর্শনের সঙ্গে ধর্মের প্রতিযোগিতা করিতেছে, এবং নীরবে পার্থিব গৌরব ও সাম্রাজ্যের নশ্বরতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে ।

দিল্লীবিজয়ের পর, বৃত্তিভোগী সম্রাটের পুত্রগণ প্রাণভয়ে হুমায়ূনের সমাধিতে পলায়ন করিয়াছিলেন । এই বৃহৎ ও শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ সমাধি, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে অবস্থিত । হুমায়ূনের পত্নী হাজি বেগম ইহা নিশ্চয় করিতে আবৃত্ত করেন, এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট আকবর শেষ করেন । সমাধিটি একটি ক্ষুদ্র চূর্ণ বলিলেও হয় । ইংরাজ সেনাপতি হড্‌সন্ ইহা আক্রমণ করেন, এবং আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত, সম্রাটকুমারদিগের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন । তাঁহাদের প্রাণের কোনও বিয় হইবে না বলিয়া আবৃত্ত করা হইলে, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন । তখন, নৃশংস হড্‌সন্, এই শিশুদিগকে দিল্লীদ্বারের কাছে, ধন্দীভাবে লইয়া গিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করেন । কেবল তাহাই নহে, মৃত কুকুরের স্তায়, তাঁহাদের দেহ দিল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখেন । নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে । অবশ্য হড্‌সনের এই কসাই-কার্যের স্থানঘরে কোন স্বতিলিপি নাই । কিন্তু যত কাল অতীত হইয়া বাইতেছে, যত লোকের মস্তিষ্ক সিংগাহিবিস্ত্রোহ-সম্বন্ধে নৃশংসতাপ্ত হইতেছে, ততই হড্‌সনের নরপততা এরূপ জলন্ত অক্ষরে ইতিহাসের অঙ্গে ভাসিয়া উঠিতেছে যে, তাহার উত্তরাধিকারী ও বঙ্গগণ, এ বলক অপনয়ন করিবার জন্ত এখন যত চেষ্টাই করুন না কেন, হতভাগ্য সম্রাটকুমার-দিগের রক্ত তাহার হস্ত হইতে সর্পগাংগারী অগ্নি কি পরিবারক অপনয়ন করিতে পারিবেন না । এইরূপে হড্‌সন্ আভ্যন্তরীণ হস্তে, অগণিত্যাত যোগল-সাম্রাজ্যের শেষ ছায়াটি

পর্যন্ত বিলুপ্ত হইল। স্বকুমার শিশুর বক্তে, ইংরাজ-রাজ্য দিল্লীতে পুনরভিষিক্ত হইল। মানবের ইতিহাস কি শিক্ষার স্থল। বিশ্বব্ধের বিশ্বরাজ্যের নীতিসমূহ কি দূরদর্শী, কি দ্রুতজ্ঞ ! তাই বলিয়াছি, দিল্লী হিন্দুদিগের মহাপ্রশান ; মুসলমানদিগের পাঁচটি সাম্রাজ্য দিল্লীর ধ্বাংসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একে একে পাঁচটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, পাপের পতন, দুর্বলের ধ্বংস, সবলের উত্থান, কর্মহীনের লয়, কর্মীর বিজয়, নররাজ্যের নশ্বরতা, সৃষ্টিরাজ্যের অবিদ্যমানতা, অধর্মের ক্ষয়, ধর্মের জয়, দিল্লীর অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। পাঁচটি সাম্রাজ্যের ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, দিল্লী আজি কি উদাসীন মুক্তিই ধারণ করিয়াছে। এত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, এত বিপ্লব, পৃথিবীর আর কোনও নগর দর্শন করে নাই, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও দেশ দর্শন করে নাই, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি এত বিপ্লবতরঙ্গাভিঘাতে জীবিত থাকিতে পারে নাই। রোম নাই, গ্রীস নাই, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভারত আছে। সেই রোমজাতি, সেই গ্রীকজাতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা পুরাতন হিন্দুজাতি বঙ্গালাবশিষ্ট হইয়াও এখন আছে। ভারত পড়ে, মরে না। হিন্দুজাতি বলহীন হয়, জীবহীন হয় না। কর্মহীন হয়, ধর্মহীন হয় না। ধর্মের সঙ্গে কর্মের যোগ হইলে, আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে। বাহুবল নশ্বর, ধর্মবল অমর।

আশ্রা ।

পূর্ব-পক্ষে দিল্লীর কথা শেষ করিয়াছি। দিল্লীতে এক দিন হোটেল, এবং দুই দিন বহু পূর্ণচন্দ্র বখোণাখ্যায় কালেক্টর প্রকেন্সরের বাসায় ছিলাম ; আহার যোগাইতেন, দিল্লীর স্বনাম-

খ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেন ৮০ ইহার। ছুটি দিন কি যত্নই করেন ! দার্জিলিংগে যে সর্দি হইয়াছিল, তাহা দিল্লী পর্য্যন্ত ভুগিতেছিলাম । হেম বাবু খাওয়াইলেন, চিকিৎসা করিলেন, আসিবার সময়ে ঔষধ সঙ্গে দিলেন । আমি বলিলাম, আমি ঠিক যেন কবি হেম বাবুর ‘বাক্সালীর মেয়ের’ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম,—

“খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে,

“হায় ! হায় ! ওই যায় বাক্সালীর মেয়ে ।”

দিল্লী হইতে আগ্রায় আসি। আগ্রায় প্রথম সেকেন্দরা দেখিতে যাই। সেবেন্দরা সম্রাট আকবরের সমাধি, আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বাবর ও আকবরের হিন্দুধর্মের প্রতি যে প্রবণতা ছিল, তজ্জন্ত গোঁড়া মুসলমানেরা যে তাঁহাদিগকে কাকের বলিত,—সেবেন্দরা দেখিলে তাহা বিলক্ষণ বলিতে পারা যায়। সেকেন্দরাটি ঠিক যেন একটি হিন্দু দেবালয়। মুসলমান সমাধির সেই গোলাকার স্তম্ভের চিহ্ন-মাত্র নাই। হিন্দু-দেবালয়ের চূড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সকল সমাধিতেই মূল কবর মাটিতে; তাহা মাটির স্তূপমাত্র। এই স্তূপের উপরের গৃহে, ঠিক একটি কবরাকৃতি, প্রস্তর কিংবা ইষ্টকের দ্বারা নির্মিত হয়। এই কবরককটি সেকেন্দরাতে বড় অক্ষকার। সম্রাট আকবরের পোষাক যেমন আড়ম্বরশূন্য ছিল, তাঁহার কবরও সেইরূপ। তাহা কেবল একটি নির্মল খেতপ্রস্তরের বেদীমাত্র। গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রক, এক সহস্র টাকা মূল্যের একখানি ছাফ না কি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাও তনিতাম, মোলাগণ চূরী করিয়াছেন। অট্টালিকার ভিত্তিতে একটি খেতমর্শ্বনির্মিত অতি সুন্দর বক্স আছে। ইহাতেও খেতমর্শ্বের একটি কবরাকৃতি আছে। পূর্বে ঘনতল সুবর্ণে ও অস্ত্র বর্ণে, রঞ্জিত ও চিত্রিত ছিল। তাহা কালে মলিন হইয়া

গলে, পুনঃসংস্কার করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া, ইংরাজরাজ তাহার
 পর চুন-কাম করিয়া দিয়াছেন। সমাধিটি এখন দেখিতে ঠিক
 যেন শ্বেতবসনারতা শোকাতুরা হিন্দুবিধবা। চারি দিকে প্রকাণ্ড
 শ্রাঙ্গণ উদ্ভানে সজ্জিত ছিল। এখনও দুই চারিটি গাছ
 ফল আছে। একটি সুন্দর গোলগৃহ সেই শ্রাঙ্গণের এক পাশে
 এখন ইংরাজদিগের আরামগৃহের কার্য্য করিতেছে। আমি
 দিন দেখিতে যাই, সে দিন বহুতর সৈন্ত ও তাহাদের ক'
 চারবীরা বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। সেকেন্দরা বহুকণ
 বিশিষ্ট। দুই একটি কক্ষে আরও দুই একটি কবর আছে। আ
 বর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার উদার রাজনীতিবলে হিন্দুমু
 ম'নকে মিলিত করিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, এ
 অক্ষয় হইবে। কক্ষে কক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের ব
 হইবে। এতনি ভানিওন না যে, তিন পুরুষ না যাইতে, আ
 জিব সেই নীতির বিপর্য্য ঘটাইয়া, সেই সাম্রাজ্যের ধ্বং
 পথ পরিষ্কার করিয়া যাইবেন। আজ সেকেন্দরার সমুদয়
 শূন্য পড়িয়া আছে। শ্রাঙ্গণের বহির্ভাগে আর একটি প্র
 বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বিতল গুটালিবা আছে। শুনিলাম, আক
 মত্বার পর, তাঁহার পত্নী, যোধপুররাজকন্যা, যোধা বাই ই
 বাস করিতেন। মুসলমানী হইবার পরও, রাজপুত মহি
 হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেন।

অপরাত্নে প্রথমতঃ যমুনা পার হইয়া "রাম বাগ" বা "অ
 বাগ" দেখিতে যাই। এটি যমুনার উপর একটি বৃহৎ উ
 যমুনার গর্ভ হইতে ইহার প্রাচীর সবলভাবে উঠিয়াছে।

তাহার পর এতমাদকৌলা দেখিতে যাই। এটি হুজুর
 মাতার এবং পিতার সমাধিগৃহ। সেই ভুবনমোহিনীর
 জননী পাশাপাশি নিদ্রা যাইতেছেন। সমাধিটি অপেক্ষাকৃত

হইলেও, যেতমস্বর প্রভুরের একরূপ স্ফটিক অটালিকা, যেন আর দেখি নাই। ঠিক যেন একটি ছবি। চারিদিকে সুন্দর ফলপুষ্পের উদ্যান এখনও রক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পর যখন পাব হইয়া আসিয়া, জগদ্বিখ্যাত তাজমহল এ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখিতে পাই। তাজ তুমি দেখিয়াছ, মতএব তাহার কথা আর কি লিখিব? যিনি তাজ দেখিয়াছেন, তিনি যিনিই হউন, মোহিত হইয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন,—

“তাজ প্রকৃতই একটি কবিতা। উহা কেবল স্থাপত্যের একটি বিস্তৃত আদর্শ নহে; উহা একরূপ সৃষ্টি যে তাহাতে কল্পনার পরি-
তৃপ্ত হয়, কারণ সৌন্দর্য্যই উহার বিশেষ লক্ষণ। তুমি কি এখনও আকাশে ভ্রম নিশ্চয় করিয়াছ? এই দেখ, এইটি আকাশ ইতে মর্ত্যে আনীত হইয়াছে, এবং অনন্তকালের বিশ্বঘেরা এক এখানে স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি উহা এমনই লঘু-
ভার, এমনই বায়ু-বোধ হয়, দূর হইতে দেখিলে, উহার গলম্পর্শী চূড়াবলীসহ এমনই শিশির এবং স্বর্ধ্যালোকে নিশ্চিত টালিকা, স্বর্ধ্যাকিরণে ফটনোন্মুখ একটি রক্তবিশ্ব বলিয়া বোধ হয়।

উহাকে স্পর্শ করিবার এবং উহার চূড়াতে চড়িবার পরও, তা প্রকৃত কিনা তোমার সন্দেহ হয়।” স্লীমেন বলেন;—
তাজমহলের পর, আমি আমার স্ত্রীকে অটালিকাসম্বন্ধে তাহার ত বিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি মনে করি, তাহা তোমাকে বলিতে পারি না, কারণ একরূপ একটি অটালিকা মালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আমার হৃদয়ের ব তোমাকে বলিতে পারি। একরূপ একটি সমাধি পাইবার ক্ষেত্রে আমি কাল মরিতে পারি।” তাজ মর্শন করিয়া যে পথে আমাকে লইয়া বেড়াইয়াছিলাম কেবল সেই পথেই বেড়াইলাম। স্থানে তোমাকে লইয়া বসিয়াছিলাম, কেবল সেই স্থানেই

বসিলাম। উঠাউঠনের অল্প পথে যাইতে ক্রি অল্প অংশ দেখিতে আমার প্ররুতি হইল না। সেই পূর্ব-দর্শন-স্মৃতিতে এবং আর একখানি মুখের স্মৃতিতে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তাহার পর আগ্রার দুর্গ দেখিতে গেলাম। এই দুর্গ আকবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বলেন, তিনি এই নগরের নাম এ ক্ষেত্রে আকবরবাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে আগ্রা। হিন্দুরা বলেন, “অগ্রবণ” ইহার পূর্ব নাম ছিল, তাহা হইতেই আগ্রা। দিল্লীর মত আগ্রাতে ঠিক সেইরূপ দেওয়ান-খাম, দেওয়ান-খাস, শিশমহল, মতিমসজিদ, দুর্গের বাহিরে জুম্মা মসজিদ পর্য্যন্ত আছে। তবে আগ্রার অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু দিল্লীর অট্টালিকা আমার চক্ষে অপেক্ষাকৃত সুন্দর বোধ হইয়াছিল। গৃহ সকল ঠিক দিল্লীর মত যমুনার তীরে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ—

“পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি

“অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।”

দেওয়ান-খাসের ও স্নানাগারের মধ্যবর্তী প্রান্ত্রে এক পার্শ্বে একটি কক্ষ এবং অল্প পার্শ্বে আর একটি বেতমর্ম্মর আসন বসিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, প্রথমটিতে স্বয়ং আকবর এবং দ্বিতীয়টিতে তাহার হিন্দুমন্ত্রী খ্যাতনামা বীরবল বসিয়া সাক্ষ্য গগণতলে যমুনার লহরী দেখিতে দেখিতে মত্ততা ও গল্প করিতেন। খাট সূর্য্যমল দিল্লী জয় করিয়া প্রথম আসনে বসিলে, আসন মনোহুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রক্ত উল্লিখিত করে। পাণ্ডা সেই বিদীর্ণ বেখা ও একটি লাল দাগ রক্ত বলিয়া দেখাইলেন। অল্পদিকে অন্তঃপুরকক্ষের সংলগ্ন, রক্তপ্রসূরে নিখিঁত, আর একটি প্রকাণ্ড অন্তঃপুর মহল আছে। এটি রাজপুতকন্যা যোধা বাইয়ের মহল বলিয়া খ্যাত। তিনি মুসলমান মহিষীগণ হইতে স্বতন্ত্র

থাকিতেন এবং এই মুসলমান অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেন।

দেওয়ান-খাসে দাঁড়াইয়া যমুনার দিকে চাহিয়া মনে হইল,—

“তব জল কল্লোল সহ কত সেনা

“নাদিল কোনও দিন সমরে ও।

“তব জল বদ্বন্দ সহ কত রাজা

“পরকাশিল, লয় পাইল ও।

“আজি সব নীরব যে যমুনে। সব

“গত তব বিভব কালে ও।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, স্থললিত ‘যমুনা-লহরী’ বিষাদমগ্ন-হৃদয়ে গাহিতে গাহিতে আগ্রা দর্শন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

জয়পুর।

আগ্রা হইতে আমরা জয়পুর যাই। দিল্লীর ডাক্তর হেম বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁহার মন্ত্রীও এক জন বাঙ্গালী—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহারা উভয়ে জয়পুর স্কুলের শিক্ষক হইতে একরূপ উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। আমরা সংসার বাবুর অতিথি হই। যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে হুর্গাকালী, সেখানে পাঠাবলি, আর সেখানেই দলাদলি।

জয়পুরে পহুছিয়াই আমরা প্রথমতঃ রাজবাটি দর্শন করিতে যাই। একটি প্রকাণ্ড নগরের অষ্টম ভাগ ব্যাপিয়া এই রাজবাটি। অতএব ইহার বর্ণনা কি করিব? ইহা একটি মনোহর হস্ত্যাবলীর উত্তান বলিলেও হয়। এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রাক্ষণের চারিদিকে

সমুদয় বিচারালয় ও কার্য্যগৃহ সজ্জিত রহিয়াছে । রাজাদিগের রাজ্যে উচ্চতম ধর্ম্মচারীরাও ফরাসে তাক্টিয়া চেঁস দিয়া বসিয়া, ষাবতীয় রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য নির্বাহ করেন । এখানে আইনকানুনের তত ঘটানাই, নর-রক্ত-শোষক জলোকা উকিল মোক্তারের হট্টগোল নাই । বিচারকার্য্য একরূপ মোটামুটি সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন করা হয় । বৃটিশ রাজ্যের জায়, ধর্ম্মাবতার-দের স্ববিচার ও হুম্ম বিচারের জালে পড়িয়া, প্রজাদের প্রাণান্ত হয় না । শ্রেয়িক বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

“পরান ছাড়িলে পিরীত না ছাড়ে ।”

বৃটিশ রাজ্যেও তাই,—

“পরান ছাড়িলে উকিলে না ছাড়ে ।”

হিন্দু রাজ্যে বিচারকার্য্য কিরূপ সহজে নিষ্পন্ন হইত, এ সকল হীন দেখিলে কতক বুঝিতে পারা যায় । তবে ক্রমে ক্রমে সকলই “লাল” হইয়া যাইতেছে ।

অত্র প্রান্ত্রে “দেওয়ান-আম,” তৃতীয় প্রান্ত্রে “দেওয়ান-খাস,” স্বৈত মর্য্যর প্রস্তরের হৃৎ ফেণ-নিভ অমল ধবল শোভায় শোভা পাইতেছে । ইহাদের স্তম্ভের অবসরে, নানা বর্ণের পুরু পর্দা ঝুলান রহিয়াছে এবং গৃহ বহুমুখ্য উপকরণে ও স্ফটিক ঝাড়ে সজ্জিত রহিয়াছে । এই দুই গৃহ দেখিলে, দিল্লীর ও আগ্রার দেওয়ান-গৃহ সকল কিরূপ সজ্জিত থাকিত, বুঝিতে পারা যায় । রাজবাটীর কেন্দ্রস্থলে মহারাজার আবাস-ভবন ‘চন্দ্রমহল ।’ একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, বহুমুখ্য ইংরাজী উপকরণে সজ্জিত । তাহার পশ্চাতে প্রশস্ত পুষ্পোত্তান, জলপ্রণালীতে বিভক্ত এবং কোম্বারাতে শোভিত । উত্তানের অপব প্রান্তে ‘গোবিন্দজীর’ মন্দির । বুদ্ধাবন হইতে আনীত হইয়া গোবিন্দজী এই রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত হন । মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত, বড় সুন্দর বলিয়

শুনিলাম। কিন্তু আমি তেমন অসামান্য সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। পূজক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী। এক দল রাজপুতনী বসিয়া কৃষ্ণগীতা কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে একজন অর্ধনগ্ন পুরুষ দাঁড়াইয়া ভক্তিতে নৃত্য করিতেছে। দৃশ্যটি হৃদয়স্পর্শী, অনেত্রকণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম ও শুনিলাম। তাহার পর, মৃত মহারাজ রাম সিংহের বৈঠকখানা দেখিলাম। উহা এখন বিলিয়ার্ড খেলার গৃহ হইয়াছে। উহার উপকরণে এখন ‘চন্দ্র-মহল সজ্জিত হইয়াছে। তাহার পর ‘বাদলমহল।’ ইহা একটি বৃহৎ নীল সলিলপূর্ণ সরসীতীরে শোভিত। সম্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে সরোবর। অট্টালিকা সুন্দর, সুশীতল। বর্ষাকালে মহারাজ এখানে একদিন দরবার করেন। রাজবাটির আর এক প্রান্তে ‘হাওয়াই মহল’ বহু তলায় একটি অতি উচ্চ রথের মত শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই অট্টালিকাতে গ্রীষ্মকালে বেশ বাতাস খেলে বলিয়া, ইহার নাম ‘হাওয়াই মহল।’ ‘মহল হইতে মহলাস্তরে এবং রাজবাটির সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার জন্তে, আবৃত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ সকল খেত লতার মত চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরবাসী অস্থায়ীস্বত্বা রূপসীরা এই সকল পথে সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন। মহারাজ যে রাত্রি যে মহাবীর সঙ্গে অভিবাহিত করিবেন, আদেশ করিলে, তিনি সজ্জতা হইয়া, এই সকল পথে, ‘চন্দ্রমহলের’ অপর পার্শ্বস্থিত অস্তঃপুর মহল হইতে প্রোবিতভর্তৃকা হইয়া অভিসারে উপস্থিত হন। তুমি যদি একজন রাজমহিষী হইতে, তবে কি করিতে বল দেখি? অথচ ইঁহাবাই অম্লানবদনে স্বামীর চিত্তবোহন করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। বর্ত্তমান মহারাজ এক জন বৃন্দাবনের ভিখারী-মাত্র ছিলেন। সে কথা পরে বলিব। তিনি জয়পুরের সিংহাসন পাইবার পর, বোধপুরের রাজকন্যাকে, ইঁহাদের রাজনীতি

অনুসারে বিবাহ করেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার পূর্ব স্ত্রীকে তনিনাম্যে মৃত্যুধিক ভাল বাসেন। একদা রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কিছু যদি বাঞ্ছনীয় থাকে, আমাকে বল তুমি আমার কখনও কিছু চাহ নাই।” পতিব্রতা সতী উত্তর করিলেন ;—“আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। লোকে আশীর্ষ্য করে, ‘তোমার স্বামী মহারাজ হউক।’ বিধাতা-আমার স্বামীকে মহারাজ করিয়াছেন, অতএব আমার আর বাঞ্ছনীয় কি হইতে পারে ?” মহারানী হইয়াও ইহাঁর চরিত্রের কিছুমাত্র রূপান্তর নাই। ইনি রাজার মহিষীভাব গ্রহণ না করিয়া, দাসীভাবে পূর্ব তাঁহার সেবা করেন। এক পাত্রে আহার করেন, ছায়ায় তাঁহার সঙ্গে থাকেন। সতিনী মহাতেজস্বিনী রাজপুত্র-কর গল্প একরূপ যে, মহারাজ এক দিন তাঁহার কি একটি কথা ক বলেন নাই। বীরবালা লক্ষ্য দিয়া প্রাচীর হইতে অসি নিক্ষেপিত করেন, ভয়ে মহারাজ চণ্ডিকার পদানত হন। সপত্নীর ছায়াতে থাকিয়াও, পূর্ব পত্নী যে সতীত্বের ও নারী আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সমস্ত জয়পূর্ব মোহিত।

অপর্যাহে আমরা জয়পূর্বের শিল্প বিদ্যালয় দেখিতে : মৃত মহারাজ রাম সিংহের এটি একটি মহৎ কীর্তি, তিনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে চিত্রের, কাঠের, পিত্তল এবং মাটির পাত্র ও পুতুল ইত্যাদি নির্মাণের কার্য্য শিক্ষা হইতেছে। শিল্পবিদ্যার বেশ উৎকর্ষ দেখিলাম। একটি কিনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তাহা কিনিতে দি বোধ হয়, ভেঁক লইব বলিয়া ভয় হইয়াছিল।

তাহার পর, মহারাজের ‘রামবাগ’ দেখিতে যাই। এবং মনোহর উদ্যান, বুঁবি, আর কোথাও নাই। তাহা পার্শ্বে মিউজিয়ম বা ‘আজবের ঘর’ নিশ্চিত হইতেছে

গৃহটির নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ; ঘর ত নহে, একখানি ছবি । একটি প্রশস্ত দুই তল উচ্চ ‘হল’, তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণ এবং চতুঃপার্শ্বে আবার কক্ষের সারি । -কক্ষ সকল স্বর্ণমিশ্রিত নানা বর্ণে স্বকোশলে চিত্রিত । হলের উপরিস্থ গবাক্ষে, কাচে, নানা বর্ণে কক্ষের ব্রজলীলা চিত্রিত রহিয়াছে । অট্টালিকার প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে মহাভারত ও রামায়ণের নানা দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে । উত্তানে কোয়ারা ছুটিতেছে, চক্রাকারে ঘুরিতেছে ; ব্যাঙ বাজিতেছে ; তালে তালে রাজপুত সর্দারগণের অশ্ব ছুটিতেছে । এখনও তাহাদের পার্শ্বে তরবারি ঝুলিতেছে, অন্তর্মিত বীরহৃদয় ও রাজপুত ইতিহাসের সাক্ষী দিতেছে । গ্যাসের আলোকে, অট্টালিকা ও উত্তান অপূর্ণ শ্রী ধারণ করিয়াছিল । মুহূর্ত্ত সেই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম ।

পর দিবস প্রাতে, হস্তিপৃষ্ঠে, ঐতিহাসিক ‘আশ্বের’ দেখিতে গেলাম । জয়পুরের নগরতোরণ পার ‘ইইয়াই’ আশ্বেরে প্রবেশ করি । প্রাদ, আশ্বেরে মহামারী হওয়াতে, রাজা জয়সিংহ কর্তৃক তাহার পার্শ্বে জয়পুর নগর স্থাপিত হয় । রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরাতন আশ্বেরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । প্রথম একটি প্রশস্ত ঝিল ও তাহার মধ্যস্থলে একটি সুন্দর অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় শোকের মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান দেখিলাম । পশ্চাতে পর্বতশ্রেণী । তাহার পর, আশ্বের-ভূর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া, ভূর্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম । আশ্বের ভূর্গ গিরিশৈথবে । তাহার পাদমূলে আর একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র কলপুষ্পের উত্তান কি শোভাই বিকাশ করিতেছে । এই ঝিলের পার্শ্ব বহিয়া, আমরা খ্যাতনামা আশ্বের-ভূর্গে প্রবেশ করি । প্রথম একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ । তাহার চারি পার্শ্বে অখণ্ডা

ও সৈনিকনিবাস । এক দিকে, দ্বিতলে একটি সুন্দর মন্দিরে, 'যশোরেশ্বরী কালী', বিরাজ করিতেছেন । প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া আনিবার সময়ে, মানসিংহ, জননীকেও বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাঁহার রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন । আমরা যখন দর্শন করি, তখন পূজা শেষ হইয়াছে । প্রত্যহ একটি অজ-মুণ্ড মাতাকে বলিদান দেওয়া হয় । মাতার সঙ্গে বঙ্গদেশের এই নৃশংস জীবহিংসাপাপও এখানে প্রবেশ করিয়াছে । তবে ইহার বীরপুরুষ ! ইহাদের বলিদান পদ্ধতি বঙ্গদেশের মত তেমন নিষ্ঠুর ব্যাপার নহে । মানুষ যত কাপুরুষ হয়, ওতই নিষ্ঠুর হয় । নিতান্তই বন্দিদান দিতে হইবে, তাই যেন অনিচ্ছায়, প্রাঙ্গণের এক কোণে এই কার্য্য সমাপন করা হয় । খানিকটা বালির উপর ছাগলটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, অবশ্যই বজ্রাঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করা হয় । রক্তটা বালির উপর মাত্র পড়ে, এবং প্রাঙ্গণ-ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বেই স্থানান্তরিত হয় । আমাদের দেশের সেই বাত, সেই নৃত্য, সেই মহিষ পাঠার উপর বীরত্ব, সেই ফাঁস, সেই হাড়িকাঠ, সেই টানটানি, সেই পশুত্ব, সেই হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতা এখানে নাই । হরি ! হরি ! ধর্ম্মের নামে জগতে কত অধর্ম্মই সাধিত হয় । মানুষ যখন অজ্ঞানবদনে নরবলি, এমন কি পুত্র কন্যা বলি পর্য্যন্ত দিতে পারে, তখন এই নিক্রাঙ্ক নিরপরাধ পশুহত্যা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন ?

মন্দিরের পর, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, অস্তঃপুর-মহল ইত্যাদি ঠিক দিল্লীর অলঙ্কারগণেই সজ্জিত রহিয়াছে । সকলই খেতপ্রস্তরে নির্মিত, শিশমহলটি যেন দিল্লী আগ্রা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । একটি কক্ষে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানের দৃশ্য প্রাচীরে চিত্রিত রহিয়াছে । চিত্রকর যে বর্তমান শিল্প

বিজ্ঞানে নিতান্ত অপটু ছিল, এমন লোক হইল না । তাঁহারই পার্শ্বে আবার প্রকাণ্ড অন্তঃপুর-মহল । তাহাতে বাবতীয় অন্তঃপুর-বাসিনীগণ বাস করিতেন । আজ তাহা ব্যাঘ্রের বাসস্থান হইয়াছে । কালের ও মানব-অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি ! শুনিলাম, ব্যাঘ্র সম্প্রতি মানুষ মারিয়াছে । তাই বাঙ্গালী বীরমন্ত্রী, অন্তঃপুর-মহলের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অন্তঃপুর-মহলে ব্যাঘ্রদিগের নিষিদ্ধাধিকার করিয়া দিয়াছেন । বীরকুলবর্ভ মানসিংহ এই আশ্চর্য-দুর্গ ও নগর নির্মাণ করেন । যে মানসিংহ কাবুল হইতে বঙ্গদেশে যশোর পর্য্যন্ত বিজয় করেন, যাহার অসির অগ্রভাগে আক্কেরের মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল, যে আশ্চর্যের নামে সমস্ত ভারত আসিদ্ধ হিমাচল কম্পিত হইত, এবং যাহাকে মোগল সম্রাট আকবর পয়ান্ত জীব্যা ও রাগরক্ত নধনে দর্শন করিতেন, আজ সেই আশ্চর্যের, সেই মানসিংহের আশ্চর্যের এই অবস্থা । তাঁহার অন্তঃপুর ব্যাঘ্রপুত্রের পরিণত হইয়াছে । মানসিংহ, তাপের মুখে বীরকুলতিলক প্রতাপসিংহকে অপমানের উত্তর দিয়াছিলেন, তাপের মুখে চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন । আজ চিতোরের য দশা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম আশ্চর্যেরও সেই দশা ! কাল, অনুযাগের ও পাপের কি ভীষণ পরীক্ষক ও দণ্ডবিধাতা । আশ্চর্যের দুর্গস্থিত রাজবাটীর শীর্ষকঙ্ক হইতে, পর্বতমালায় বস্তুত, ভগ্নগৃহপূর্ণ হত গৌরব আশ্চর্য, এবং পার্শ্বস্থিত জয়পুর দখিতে দেখিতে, সন্মুখ কি বিবাদে, কি গান্ধীধোই পরিপূর্ণ হইয়াছিল ! এখনও শৃঙ্গে শৃঙ্গে দুর্গ বিরাজিত । ঠিক যেন পাণশূন্য শব, ঠিক যেন বীরপুরুষের দেহ-কঙ্কাল শৃঙ্গে শৃঙ্গে দখা যাইতেছে । তাঁহার ভিতর ছিল বস্ত্র, ভয় অস্ত্র জিহ্ব, কতকগুলি শৃগালকুকুরাধম সৈন্য আছে । দেখিলে লোকের ঘৃণা হইবে । সেই জনো, এ সকল দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ ।

আমি এই শৃঙ্খলিত হুগলীয়া, গহ্বরস্থিত মৃত নগরের সমাধি এবং
জীবিত নগরের চাকচিক্য দেখিয়া ভাবিলাম,—

ভারতে যেমতি পুরাকালে হয় ।

শোভিত আসন্ন আলোকমালায়

যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,

পুরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায় ।

সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,

কিন্তু কোথা গেল সেই বীৰ্য্যবল ?”

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাবসন হৃদয়ে জয়পুরে কিরিলাম ।
জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান । নগরটি অতি সুচারু-
রূপে নির্মিত ও সজ্জিত । প্রশস্ত রাজপথ সকল জয়পুরকে ঠিক
যেন একটি শতরংগ খেলার ঘরের মত বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়া
রাখিয়াছে । উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে সরাসরি রেখায় রাজপথ
সকল সারি সারি ছুটিয়াছে । হুই দিকে একরূপ বিতল গৃহশ্রেণী ।
কি নগর কি রাজবাটী, হুগলীর বিজ্ঞান নামক জনৈক জ্যোতিষী
ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বপ্রসূত । আজও বাঙ্গালী জয়পুরের মন্ত্রী এবং
রাজসহায়; তাই বলিতেছিলাম, জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের
স্থান । মহারাজ জয়সিংহ এক জন প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতিষবিৎ
ছিলেন । আপন প্রতিভাবলে, নানাবিধ জ্যোতিষ-যন্ত্র নির্মাণ
করিয়া, ইনি জ্যোতিষ অনুশীলনের জন্তে, স্থানে স্থানে মান-মন্দির
নির্মাণ করিয়াছিলেন । দিল্লীর বহির্ভাগে একরূপ একটি অদ্ভুত মন্দির
ছিল । এই অদঃপতনের দিনে লোকে ইহার নাম ‘যন্ত্র-মন্দির’—
‘দিয়াছে । জয়পুর রাজবাটীর এক কোণেও এইরূপ একটি প্রশস্ত
মান-মন্দির আছে । জয়সিংহের সিংহাসনে এমনি শৃগাল সকল
বসিয়া তাঁহার অনির্কটনীয় অংমননা করিয়া আসিতেছেন যে,
তাঁহাদের পূর্বপুরুষের এই অদ্বিতীয় অতুলনীয় গৌরবনিদর্শন সকল

সর্বত্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই হস্তি-মুখের কাছে এতাদৃশ প্রতিভার সম্মান হইবে কেন? যে অর্থ ইহারা প্রতিবৎসর ইংরাজের পদসেবায় ব্যয়িত করেন, যে অর্থ বর্তমান 'রামবাগের' মিউজিয়মে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার তদাংশমাত্রে এ সকল সংস্কৃত ও রক্ষিত হইতে পারে। এ কথাটা মহারাজকে বলিতে আমি সংসার বাবুকে বলিয়াছি। তিনি বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে উত্তান নিশ্চিত হইতেছে, তাহা যদি আশ্বের হর্গের পদমূলে উপত্যাকায় নিশ্চিত হইত, মিউজিয়মটি যদি প্রথমোক্ত বিলের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চিত হইত, তবে পুরাতন আশ্বের পুনর্জীবিত হইত, এবং শিল্পের সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভা মিলিয়া কি অপূর্ব দৃশ্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিত! কিন্তু সে সহায়তা, সে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, দেশীয় রাজাদের থাকিবে কেন? তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় রাজা হইতেন না।

জয়পুরের বর্তমান মহারাজ কায়েম সিংহ সংক্ষেপে গোটা দুই-গল্প বলিব। ইনি জয়পুর রাজ্যের এক জন সামান্য সর্দার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হয়, এবং তিনি রাজবিচার অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ এবং তাঁহার দমনার্থ রাজসৈন্য প্রেরিত হইলে, ইনি পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়া বুনাবনে যান, এবং সেখানে ভিক্ষুর মত সন্ন্যাসী থাকেন। এ দিকে অপূত্রক রাজা রাম সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, এবং কায়েম সিংহের বীরত্বে এবং তেজস্বিতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। কায়েম সিংহ, 'মাধো সিংহ,' নাম গ্রহণ করিয়া, জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অদৃষ্টের আবর্তনে বুনাবনের ভিক্ষুক জয়পুরের মহারাজ হইল। তিনি নির্দাসন সময়ে অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অনেক অদ্ভুত গল্প করেন। এখন বাহারা রাজবাটীর এবং তাঁহার নিজের ভৃত্য ও রাজকর্মচারী, তিনি তাহাদিগকে

দেখাইয়া বলেন, “এই ব্যক্তি ঘুস না পাইলে আমাকে গলায় ধাক্কা দিয়া রাজবাটিতে প্রবেশ করিতে দিত না, এই কৰ্মচারী ঘুস না পাইলে আমার কাঁধাবাসী সহচরদের সঙ্গে সন্মুখ করিতে দিত না। রাজকৰ্মচারীদের সকলের দোষভণ আমি জানি এবং রাজনীতি সকল কি কৌশলে ব্যর্থ করিতে পারা যায়, আমি তাহাও জানি,” অথচ তিনি সিংহাসনে বসিয়া একটি কৰ্মচারীকেও কৰ্মচ্যুত করেন নাই।

একদিন সংসার বাবুকে দেখাইয়া, তাঁহার পরিচারকবর্গের সমক্ষে, সংসার বাবুর ছোট ভাই পূর্ণ বাবুকে বলেন—“তোমার যে এই দাদাটি দেখিতেছ, ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন। ইনি স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্ত বলিতেন, “কায়েম সিংহ! হাত লাও।’ আরে! মার খানেকে ওঘাতে কোই ক্যা হাত লাভায়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না, এবং উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। উনি তাড়াইয়া তাড়াইয়া আমাকে মারিতেন। আমি এক এক বার মনে করিতাম, ধরিয়া হাড় ভাঙা করিয়া দি। এখন করবোড় করিয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। আর এখন যদি আমি বলি, ‘হাত লাও।’—বাপ! কি মাঝটাই আমাকে মারিয়াছে।” সকলে হাসিতে লাগিল। সংসার বাবুও হাসিয়া বলিলেন—“মহারাজ! আমি যদি জানিতাম, তুমি জয়পুরের মহারাজ হইবে, আমি তোমাকে আরও বেশী করিয়া মারিয়া শিক্ষা দিতাম।” দেখিলে, যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু কিনা? এখন তিনি সংসার বাবুকে ছায়ার মত সন্ধে রাখে, এবং এক জন সামান্য লোকের জ্ঞান যখন তখন কান্দি বাবুর নাকী ঘান। এই দুই গল্পে তুমি লোকটি কি প্রকার চতুর, তেজস্বী ও সহৃদয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আমি কত লিখিব। জয়পুরে ছ'দিন রাজভোগ খাইয়াছি, রাজার গাড়ীতে ও হাতীতে রাজার মত সম্মানে রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছি। মহারাজ যদিও তখন জয়পুরে ছিলেন না, তথাপি রাজ্য সংসার বাবুর বাড়ীতে রাজার পাকশানা হইতে আহারীয় আসিত। রান্নাতে ঝালটুকু যেন বেশি। ভারতীয় রাজারা দিন দিন ইংরাজ পলিটিকেল দ্বারা ঘেরাপ অপরমানিত হন, ঝাল খাইয়াই সেই ঝাল নিবারণ করেন। এক দিন মহারাজ গবর্ণরজেনেবলের ইভিনিং পার্টিতে গিয়াছেন। আমাদের দেশের এক জন বিলাসী, ইংরাজপছন্দ, সাহেবী ধরণের মহারাজকে, সেখানে সুরাপান করিতে ও কেক খাইতে দেখিয়া, সংসার বাবুকে বলিলেন, “ইহার বাড়ীতে কি খাওয়া মেলে না? এখানে বুটা খাইয়া বেড়াইতেছে কেন?”

পুষ্কর ।

কাল প্রাতে আজমীর পহুছিয়া পুষ্কর দেখিতে বাই। পুষ্কর যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন কিছুই নহে। গোবর্দ্ধনের মত একটি নৈসর্গিক সরোবর মনে কর। গোবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিৎ বড় হইলেও, দেখিতে তেমন মনোহর নহে। সেইরূপ একটি ঝিল। তাহার ছই পার্শ্বে সারি সারি অটালিকা। ঐক্য ছই দিকে অটালিকাশ্রেণী কিছু বিয়ল। কিঞ্চিৎ দূরে, চারি দিকে রাজগিরের পাহাড়ের মত পাহাড় ভরসিত ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জলের

বর্ণ নীল, কিন্তু এত ময়লা যে, ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞের উপযোগী মনে করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা কোনও মতে স্পর্শ করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলাম না । তারাচরণ পাঁচ ডুব দিয়াছেন, যদি কিছু পুণ্য হইয়া থাকে, অবশ্য আমি তাহার অংশ পাইব । কারণ তারাচরণ আমাকে যেক্ষণ ভালবাসে, স্বর্গের ভাগ দিতেও কখন কাতর হইবে না । পুষ্করের মধ্যস্থলে, একখানি উপলথণ্ডের উপর, জনৈক মকর মহাশয় নিদ্রা ঘাইতেছিলেন, কি তপত্তা করিতেছিলেন, বলিতে পারি না । যজ্ঞ-জলে তাঁহারও যেন অতৃপ্তি হইয়াছে, কারণ আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল ছিলেন ; একটি বারও জলে নামিলেন না ।

পুষ্কর দর্শন করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র খাটুলি চড়িয়া, সাধিব্রতী দেবীর দর্শনলাভ করিতে পার্শ্ববর্তী পর্বতে আরোহণ করি । খাটুলি সামান্য দড়ির বন্ধন, স্থানে স্থানে ঠক ঠক করিয়া পাথরে লাগিতেছিল, আর আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতভ্রমণ ব্যুৎ এই খানেই শেষ হইল । প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণ করিবার পর, আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম । একটি ক্ষুদ্র মন্দির । ছুটি স্বেত প্রস্তরের মূর্তি—সাধিব্রতী ও সরস্বতী । ছুটি মূর্তিই যেন জৈন বলিয়া বোধ হইল । পর্বতশেখর হইতে দৃশ্যটি মনোহর, কিন্তু কঠোর । শ্রেণীর পর শ্রেণী বাঁধিয়া বন্ধুর পর্বতমালা শোভা পাইতেছে । মধ্যে মধ্যে মাড়োয়ালের বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ও শতক্ষেত্রে বিচित्रিত । পাদমূলে পুষ্কর ও বাপীতীরস্থিত নগর, স্বেত পুষ্পে সুস্পিত, একটি মনোহর উদ্যানের মত শোভা পাইতেছে । কিন্তু, চন্দ্রশেখরের দৃশ্যের কাছে ইহা কিছুই নহে ।

অবতরণসময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি । লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না, তাঁহারও গুরুপক্ষের ও বৃক্ষপক্ষের হই

বনিতা। সাবিত্রী দেবীর যজ্ঞে আসিতে কিকিং বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নবযৌবনসম্পন্ন 'বালকী' গায়ত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চড়িয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নব দম্পতীকে অভিষেক দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহার মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজায় কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরিব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার খেত প্রস্তরের চহুমুখ মূর্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী। বুড়া এত চোটের পরও নব যৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই!

মোট কথা, পুঙ্কর সত্যযুগে বোধ হয় একটি অতি মনোজ্ঞ ও অতি পবিত্র স্থান ছিল। শৈলমন্ডালে উঠিত একখণ্ড গভীর নির্মল সলিল মৰ্পণ, তাহার চারি পার্শ্বে বৃক্ষলতাশোভিত, নানাবিধ পক্ষীর কলগানে সুধরিত, এবং যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন, আশ্রমাবলী হইতে বেদধ্বনি সমুখিত হইতেছে; দৃশ্যটি না জানি কি পবিত্র, কি হৃদয়গ্রাহী ছিল। যদি ইউরোপীয় কোন জাতির তীর্থ স্থান হইত, তবে পুঙ্কর আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইতাম। সেই দৃশ্যটির সৃষ্টি করা বড় বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে। ইহার চারিদিকে এখনও কত হিন্দু রাজা আছেন। কিন্তু তাঁহারা একরূপ মহাপাতক করিবেন কেন?

কিরিয়া আসিয়া, সম্ভ্যার কিকিং পূর্বে, আজমীরস্থ বিখ্যাত ককিরের দরগা দেখিতে যাই। ইনিই কুক্ষণে আমাদের ভারত-বর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম প্রচার করিবার জন্তে প্রথম প্রবেশ করেন পার্শ্বে জৈনদিগের একটি অতি বৃহৎ, অতি প্রশস্ত, এবং মনোহর কারুকার্যে খচিত দেবালয় ছিল। মহম্মদ ঘোরি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, এই মন্দিরে তিনি জুয়ার নমাজ পড়িবেন। জুয়া ২৥ দিন বাকি। ২৥ দিবসের মধ্যে হিন্দুর দেবালয় তত্ত্ব করি

কথঞ্চিৎ মসজিদের আকৃতি করা হয় । ইহার নাম সেই জন্ত ২৥ দিনের ঝোপরা । সেই দেবালয়ের প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ, কার্কা-কার্যে এখনও শোভা পাইতেছে । বোধ হয়, এই দেবালয়ের প্রস্তরের দ্বারা পার্শ্বস্থিত দরগা নির্মিত হয় । কবরের চারিদিকে রূপার রেলিং । প্রশস্ত প্রাক্ষণের এক সীমাতে বাদসাহ আকবর ও সাহাজান নির্মিত মসজিদ, দেওয়ান-খাস ইত্যাদি গৃহ বর্তমান আছে । প্রবাদ, সমস্ত একটি শিবালয় ছিল । কাপুরুষের দেবতাও কাপুরুষ হইয়া থাকে । কালা পাহাড়ের ভয়ে শিব পাতালে প্রবেশ করেন । মুসলমানেরা বলেন, ফকির এই পথে তিরোহিত হইয়াছিলেন । এই দরগাতে দুটি প্রকাণ্ড তামার ডেক, দুটি ষ্টকনির্মিত চুল্লির উপর বিরাজ করিতেছে । দেখিতে যেন এক একটি ক্ষুদ্র পুরুষী । ১৫০০ এবং ২০০ টাকা ব্যয় করিলে, ইহার এক একটিতে খিচুড়ী পাক হয়, এবং লোকেরা কবল হুড়াইয়া কাপ দিয়া পড়িয়া তাহা লুটিয়া খায় ।

একটি শৌক-ইতিহাস ইহার সঙ্গে জড়িত আছে । আলা-উদ্দিন চিতোর জয় করিয়া, এক ঘোড়া বজ্রত-খচিত চন্দনের প্যাট, একটি পিত্তলনির্মিত প্রদীপের বৃক্ষ বা ঝাড়, এবং দুইটি নাকাড়া এখানে আনিয়া, তাহার বিজয়পতাকা চিহ্ন-স্বরূপ প্রকাশ্য স্থানে রাখে । তাহা এখনও আছে । অপমানে, অভি-মানে, চিতোরাধিপতি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহা উদ্ধার করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত মেবারের আরাজমীরে প্রবেশ করিবেন না । তিনি বহু যুদ্ধেও এই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন নাই । রাজপুতনার সেই সূর্য্য মন্ত গিয়াছে, তথাপি, উদয়পুরের রাণা একবার ইংরাজ কর্তৃক বাধ্য হইয়া এখানে আসিয়াও নগরের বাহিরে ছিলেন, মধ্যে প্রবেশ করেন নাই ।

রাজপুতানার অধঃপতন, হিন্দুধর্মের এই দুর্গতি, তারাগ নীরবে শৈলসান্ন হইতে চাহিয়া দেখিতেছেন। এ দুর্গ পৃথ্বীর প্রান্তত করিয়াছিলেন। ইহার তোরণে এখন বৃষ্টি বৈজয়ন্তী উড়িতেছে।

অন্ত প্রাতে আনা-সাগর দেখিতে যাই। আনা নামক রাজ নদী স্রোত বন্ধ করিয়া, এই সাগর স্রষ্টা করেন। ইহার তি দিকে শৈলমালা, এক দিকে উচ্চ বাধ এবং তহুপরি ভগ্ন হি রাজত্বের উপর যোগলদিগের রাজপ্রাসাদাবলী বিরাজিত রহি যাচ্ছে। ইহার শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত দেওয়ান-আমে, জাহাঙ্গীর প্রথ ইংরাজ রাজত্ব সার টমাস রোয়ের সঙ্গে কক্ষণে সাক্ষাৎ করেন এইরূপে এইখানে দুইটি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের স্মৃতিপাত হ ভারতের দুইটা মহা কুদিন এখানে আমাদের অদৃষ্টগণনে সঞ্চিত হয়। সেই সকল শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত অট্টালিকাতে এক কমিশনের বিহার করিতেছেন, এবং তাহাতে তাহার আফিস মিউনিসিপাল অফিস বিবাজ করিতেছে। জগতের কি বিচি গতি! বাদসাহরমণীর ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্তে যে “মি: বাজার” ছিল, এখন তাহা উত্তানের কুলির নিবাস।

একটা বড় হুন্দর গল্প শুনিলাম। এই উত্তানের ও সাগরে উপরিস্থ এক অশুভ শিগরে রাজপুতানার এজেন্টের উপনিবাস একদা তিনি এখানে পদার্পণ করিলে, মোঘলুদার তাঁহার বৈয়সী উড়িল। কিন্তু ততোধিক উচ্চ শৈলে, হুম্মানজীর আস্তান তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। রাজপুরুষ তাহা সহিতে পারিলে না। তিনি আস্তানার সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বা প্রতিনিধির বৈজয়ন্তী অপেক্ষা হুম্মানের বৈজয়ন্তী উচ্চ থাকি পারিবে না। সন্ন্যাসী হুম্মানের চেলা, তাহার কক্ষিৎ বী

কল্পস্তী ত উর্দ্ধে উড়িবেই, তাহাতে আবার আশ্চর্য্যের
কি কি ?

চিতোর ।

এ পত্রে চিতোরের কথা লিখিব । কারণ, চিতোরের কথা তুমি
নিতে বোধ হয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ । কিন্তু কি
লিখিব ? চিতোরের নাম করিতেই আমার হৃদয় কি শোকের ও
তিব উজ্জ্বল পূর্ণ হয়, তাহা বলিতে পারি না ।

নিশীথসময়ে চিতোর ষ্টেশনে উপস্থিত হই । আমাদিগকে
গন্ধুবাসীরা দেখাইয়া দিবার জন্ত, ষ্টেশনে একটি লোক চাহি-
গাম । শুনিলাম যে, এই অল্প পথটুকু যাইতেই পথে এত
ভেঁড়িয়া (নেকড়ে বাঘ) যে, গলায় কামড়াইয়া ত ধরেই,
তাহা ছাড়া, “ছোড়তা বি নেহি ।” কেহ প্রাণান্তে যাইতে
স্বীকার করিল না । ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কি বীর-
ভূমি, কি অরণ্য ও কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে । কাষে কাষেই
সে বাত্রি, ষ্টেশনের মেজ্জেতে পড়িয়া কাটাইলাম । প্রাতে চিতো-
রস্থ ‘হাকিমের’ নিকট হইতে হস্তী এবং পাশ লইয়া আমরা দুর্গ
দর্শন করিতে যাই । দুর্গপদমূলে এখনও একটি গ্রাম আছে । এই
গ্রামটী পার হইয়া আমরা চিতোরশৈলে আরোহণ করিতে আরম্ভ
করি । আবাবলী গিরিশ্রেণী হইতে একটি পর্বত স্বতন্ত্র হইয়া
পড়িয়াছে । তাহাই চিতোর দুর্গ । অতি প্রশস্ত পথ, ঘুরিয়া
শৈলশেখরে উঠিয়াছে । পর্বতটী রাজগিরের পর্বতের মত প্রস্তর-
ময় । ক্রমে পদ্মদ্বার, হনুমানদ্বার, কেশবদ্বার, দুটী বুলনদ্বার,

সূর্য্যদ্বার, সর্ব্বশেষে পুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণের পর, সাতুদেশে উপস্থিত হই। সাতুদেশ উত্তর দক্ষিণে মাইল তিন দীর্ঘ, এবং এক মাইল সমতলভূমি। ইহার উভয় পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল জীবৎ নিম্ন। তাহাতে নানী স্থানে জলাশয় নির্মিত হইয়াছিল। এই প্রশস্ত সাতুদেশ বেষ্টিয়া দুর্গ-প্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে লক্ষ বীরপুরুষের পুণ্যধাম চিতোর নগর অবস্থিত ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। চিতোর এখন একটি মহান্মশান। এখনও স্থানে স্থানে তৈল-কুণ্ড, স্নতকুণ্ড ইত্যাদি বর্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা পূর্ণ রাখা হইত। হায় ! হায় ! আজ সেই বীরনগর, সেই বীরপুরুষ সকল কোথায় গেল ?

আমরা প্রথমে মাতা পদ্মিনী দেবীর আবাসস্থান দেখিতে যাই। গুনিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সজ্জন সিংহ এক জন প্রকৃত সজ্জন ছিলেন। তিনি চিতোরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির পুনর্নির্মাণ করিতেছিলেন। তাহার সুরোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সজ্জন সিংহ পদ্মিনীর আবাসস্থানের ভিত্তি খুঁজিয়া কয়েকটি দেওয়াল তুলিয়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। অট্টালিকাশিবে ক্ষটিকের নক্ষত্র, সতীত্বের স্বভাব মত, সূর্য্যালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরোবরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ। পদ্মিনী দেবী তাহাতে ক্রীড়া করিতেন। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বমাত্র দিল্লী উন্নত করিয়াছিল, সেই ঘোরতর শোকনাটক ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্তে এত বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন যে, তাহাদের উপবীত পরিমাণে ৭৪০০ মণ হইয়াছিল; সেই সৌন্দর্য্যের এইমাত্র প্রতিচ্ছবি চিতোরে বিস্তারিত রহিয়াছে।

‘পদ্মিনীর মহাঈ’ দর্শন করিয়া আমরা ‘কালী মাইর’ মন্দির দেখি। একটি খেতপ্রস্তরের মূর্তি, তাহার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্তি। প্রথমটী জৈন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটীও যেন জৈনমন্দিরের প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত বোধ হইল। মূর্তি দুইটির ইতিহাস কেহ কিছুই জানে না। এই কুলদ্বারদের অপেক্ষা চিতোরের ইতিহাস আমরা অধিক জানি। এই মন্দিরেই সেই চিতোরেশ্বরী কালী ছিলেন। তিনিই যন্ন দেখাইয়াছিলেন—“মায় ভুখা হো !” হায় মা ! এখন কি তোমার ক্ষুধা নিবারণ হইয়াছে ? আজ যে চিতোরের কয়েকটা কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে !

তাহার পর, মৌরা বাইয়ের নির্মিত মন্দির ও তাহাতে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মনোহর মূর্তি দর্শন করিয়া, আমরা কুস্তুরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভে আরোহণ করি। এই স্তম্ভটী আমার কাছে সর্বপ্রশংসিত, কুতুব মিনার বা পৃথ্বীরাজের স্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মনোহর বোধ হইল। স্তম্ভটী উপযুগুপরি নয়টী প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্মিত। কুতুব মিনারে ক্রমাগত কেবল সোপান বাহিয়া উঠিতে হয়। এই স্তম্ভের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে উঠিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পর আবার সোপান আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে এক একটা দেব দেবীর মূর্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দিল্লীধরকে উপযুগুপরি পরাজয় করিয়া, মহাবীর কুস্তুরাণা এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে স্থান দর্শন করিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। স্থানটির নাম গোমুখী। গিরিপার্শ্বে দেব দেবীর মূর্তিতে পরিপূর্ণ একটা অতি সুন্দর কক্ষ। তাহার পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া, চন্দ্রশেখরের মন্ডাকিনীর মত, দুইটা নিখরধারা প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রস্থ

প্রস্তরনির্মিত সরোবরে পড়িতেছে। নির্গমপথ বন্ধ করিলে সরো-
বরটীর মুখে মুখে জল হয়। সমস্ত স্থানটী বৃক্ষচ্ছায় সমাচ্ছন্ন।
নীতল, নির্জন এবং শান্তিপ্রদ এমন স্থান আমি যেন দেখি
নাই। রাজপুরী হইতে একটা গুপ্ত পথ, পর্বতের অভ্যন্তর
দিয়া এখানে আদিয়াছে। রাজমহিষীরা এই পথ দিয়া আসিয়া
অবগাহন করিতেন এবং দেব দেবীর পূজা করিতেন। মূৰ্ত্তি স্থান-
দর্শক আমাদিগকে বলিল, এই স্রুঙ্গের মধ্যে “জোহর” হইত;
যুবাবশেষে ইহাতেই বীরনারীরা পুড়িয়া মরিতেন। আমি তাহা
বিশ্বাস করিলাম না। অনেক জিজ্ঞাসার পর বলিল, রাজপুরীর
মধ্যে এই স্রুঙ্গের অল্প মুখ আছে। আমরা উৰ্দ্ধ্বদ্বারে সেখানে
গেলাম। ইহা টড সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিল। এই সেই
পর্বতাভ্যন্তরীণ কঙ্কের পথ, যাহাতে সহস্র সহস্র বীরনারীরা শ্রাণ
বিসর্জন করিয়া, ভগ্নতের বিষমকর সতীত্বের এবং সাহসের
অলস্ত ও জীবন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভিতর
প্রবেশ কঠিন সাধ্য নাই। শুনিলাম, বন্ধ করিয়া দেওয়া
হইয়াছে। আমি এই পবিত্র স্থানকে ভক্তিতরে প্রণাম করিলাম
এবং ললাটে ইহার ধূলা মাখিলাম। এইটী আমাদের একটা
প্রকৃত মহাতীর্থ।

হায়! হায়! কি কুলাঙ্গারেরা, কি কুলদহীন নরাধমেরা, কি
শৃগালেবাই সিংহদিগের আসনে বসিয়াছে। যদি এই চিতোর
ইরাজদিগের কোনও রূপ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হইত, আজ সেই
পদ্মিনীর পবিত্র আবাসগৃহ, সেই রাজপুরী, আমরা একটা বৃহৎ
উজ্জানে বিবাজিত দেখিতাম। সেই পবিত্র জোহর-কঙ্ক, আজ
শত আকাশ-গবাঙ্কে আলোকিত হইত, কঙ্কটী ঐতিহাসিক
চিত্রে সজ্জিত হইত। আমরা চিত্রে দেখিতাম, সময়ে সময়ে
কিরূপে বীরনারীরা সহস্রে সহস্রে অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন,

খিতাম, একস্থানে চিতোরেশ্বরী কাণপুরস্থ সেই স্বর্গীয়া দেবীর
 ষা দাঁড়াইয়া, অধোবদনে রোদন করিতেছেন। চিতোরের
 সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐতিহাসিক গৌরব সকল স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত
 কিত। তুমি জান, প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,
 ত দিন দিল্লী জয় করিয়া তিনি চিতোর অধিকার করিতে না
 য়িবেন, তত দিন তিনি তুণে ভিন্ন শয়ন করিবেন না, পত্রে
 জ্ঞ আহার করিবেন না। শুনিলাম, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধি-
 ষিগণ এখনও স্বর্ণশয্যার নীচে তুণ রাখিয়া শয়ন করেন, স্বর্ণ-
 ত্রের নীচে পত্র রাখিয়া আহার করেন। সেই বীরপ্রতিজ্ঞা
 এখনও তাঁহারা ভুলেন নাই। তথাপি, চিতোরের পদ্মিনীর,
 চিতোরের প্রতাপসিংহের, প্রাণপ্রতিম চিতোরের আজ এই
 বস্থা! এটি যে চিতোর, তাহা পথিককে বলিয়া দিবার জন্ত
 একটা অঙ্গুলি নির্দেশমাত্র কোথাও নাই। আছে—ইতিহাসে
 আছে! তার্ঘাটরগ বলিলেন, “রক্তধমনী-বিশিষ্ট প্রস্তররাশিতেও
 যন সেই বীরপুরুষদের শোণিতধারা বর্তমান আছে।” আছে
 লিয়াই আমি দরিদ্র হ্রস্ব বাঙ্গালী এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে
 যজীবন লালসিত ছিলাম। আজ দেখিয়া জীবন সার্থক মনে
 রিলাম। চিতোর অমর, চিতোর উনবিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র।
 চিতোর ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। সে বীরত্ব, সে সতীত্ব ভিন্ন
 রতের অস্ত্র আশা নাই।

প্রায় ১টার সময়ে অবরোধ করিয়া আসি। উদয়পুরের
 নিক মহারাজ্যীয় কর্মচারীর পাচক মহাশয়, আমাদের জন্যে
 রত্বপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। একদিকে প্রকাণ্ড
 কাণ্ড চাউল; অস্ত্রদিকে তত্ত্বপযোগী কলাইয়ের ডাল। কোন-
 ই সিদ্ধ হয় নাই।

যোধপুর।

ভগবানের কৃপায়, বড় সুখে বড় সম্মানে, যোধপুর দর্শন করিয়া আসিলাম। কাল যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছ, যোধপুরের এলিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পণ্ডিত জীবানন্দের সহিত লাহোর যাইবার সময়ে রেলের সাক্ষাৎ হয়। আর একটি লোক অখালার কমিশরিয়েটর ছিলেন। অর্ধ ঘণ্টার আলাপের পর, তাঁহারা এত প্রীত হন যে, উভয়ে আম'কে অখালা ও যোধপুরে বাইতে নিত্যন্ত অহুরোধ করেন। অখালায় বাইতে পারিলাম না। যোধপুরে পণ্ডিত জীবানন্দের কাছে টেলিগ্রাফ করি। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, রাজার বাঙ্গালী কর্মচারী বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র, মাল্লাজ 'এথিনিয়ম' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, আমার অপেক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতের বাড়ী পহুঁছিয়া দেখি, আমার অভ্যর্থনার জন্তে একটি কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এবং রাজার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরদয়াল সিংহ—ইনি কাউন্সেলেরও মেম্বর—এক বাড়ীতে থাকেন। ইহারা জু'জন যে কি আদর করিলেন, বলিতে পারি না। দুই বেলা পরিপাটি আহার। বসিতে হয় আসনে, কিন্তু খাল থকে একখানি অতি সুন্দর চৌকির উপর। খাল কুপায়, তাহার উপর সমুদ্র রূপার বাটী সাজান রাখিয়াছে। চামচ দিয়া তরকারী লইয়া খাইতে হয়। রান্না পজারী ধরনের। কারণ, ইহারা পজারী।

সন্ধ্যার সময়ে, হরদয়াল সিংহ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাজার ভ্রাতা ও মন্ত্রী কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। আমরা আনিতাম যে, কেবল নরায়ণ সিবিগিয়ানগুলোই বুঝি খোসাবুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে! হরদয়াল সিংহ আমাকে ইহার ইঙ্গিত

করিয়াছিলেন। আমি যদিও এ কার্যে অনভ্যস্ত, তথাপি সেই স্তরে বীণা বাঁধিয়া আলাপ করিলাম। তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অপরাহ্নে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্তের ব্যায়াম দেখিতে বলেন। আমি নূতন রাজবাড়ী দেখিতে যাই। সম্মুখের একটি বাড়ীতে—এটাই শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা—শুনিলাম, রাজার উপপত্নী থাকেন এবং রাজা দিন রাত্রি এখানেই পড়িয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুরমহল। তাঁহার মহিষী কয়েক জন তাহাতে আবদ্ধ আছেন। রাজকার্যের সম্যক ভার প্রতাপসিংহের হস্তে, তিনিই প্রকৃত রাজা। নূতন বাড়ী, আমাদের চক্ষে কিছুই লাগিল না। তবে নূতন যে একটি কার্যালয়বাড়ী হইতেছে, তাহা অতি জাঁকাল রকমের। ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপসিংহের কাছে বসিয়া জ্ঞানকৌড়া দেখি। মাড়ওয়ার রাজ্যের সর্দারদিগের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণে শিক্ষা দিতেছেন। খোকার অপেক্ষা ছোট ছোট শিশুরাও নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইতেছে। প্রতাপসিংহকে দেখিলে, রাজপুতকুলতিলক হিন্দুগৌরবসূর্য্য প্রতাপসিংহকে মনে পড়ে। লোকটা দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তেজ যেন ছুটীয়া পড়িতেছে। শুনিলাম, ইনি জীবন্ত ব্যাঘ্রের দস্ত উৎপাটন করেন। তাঁহার ডান হাতে এক ব্যাঘ্রের এবং ডান পায়ে অন্য ব্যাঘ্রের বাঁধা রহিয়াছে। তদ্রূপ, তাঁহার পারিষদবর্গেরও হস্তে, পদে, চক্ষে, ব্যাঘ্রের শোভা পাইতেছে। সকলেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে যে, ইহারা কিরূপ অশ্বারোহণে ব্রতী। সন্ধ্যার পর, জ্যোৎস্নালোকে আবাসে ফিরিয়া আসি।

পরদিবস প্রাতে বোধপুরের হুর্গ দেখিতে যাই। একটি প্রায় চন্দ্রনাথের মত উচ্চ শৈলের সর্ব্বাঙ্গ এবং এক পার্শ্বের উপত্যকা দ্বারত করিয়া হুর্গপ্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকায়, বোধপুরের গৃহাবলী অলংখ্য হংসমালার মত শোভা পাইতেছে।

শৈলশৃঙ্গ ব্যাপিয়া হুর্গের অট্টালিকা। এই হুর্গ ও নগর, ভূমি জ্ঞান, যোধাসিংহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম যোধপুর। শৈলশেখর বেক্রপ স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই রূপ স্তরে স্তরে অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে; তলার উপর তলা উঠিয়া, গগনস্পর্শী বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া, মনে যুগপৎ ভয় ও বিশ্বস্তের সঞ্চার করিতেছে। ইহার কক্ষগুলি অনতিবিস্তৃত, কারণ তাহারা পুরাতন, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত। তবে ইংরাজি সাজ সজ্জার তত বাড়াবাড়ি নাই। একটা কক্ষে বসন্ত দোলা রক্ত-শৃঙ্খলে হুলিতেছে। তাহাব পশ্চাতে এক বিরাট আরসি। যখন যোধপুরাধিপতি এই দোলায় হুলিতে থাকেন, ভুবনমোহিনী মহিষীগণ কেহ বা অন্ধে বসিয়া আছেন, কেহ বা চন্দ্রকে ঘেরিয়া তারামালার মত চারিদিকে দোলা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা অলঙ্কার-বনংকারে কক্ষ পূর্ণ করিয়া তালে তালে দোলাইতেছেন, হুলিতেছে রূপসী, দোলাইতেছে রূপসী, তখন কি প্রতিবিম্বই না জানি আরসীতে প্রতিভাত হয়! ইচ্ছা হয়, আরসী হইয়া একবার সে রূপতরঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্রও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করি। চটিতেছ না ত? কিন্তু, কি নরকুলাঙ্গারই যোধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এহেন রাজপুরীতে তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কতকগুলো অশ্বশালার মত গৃহ নির্মাণ করিয়া, তাহাতে উপর্ণহী লইয়া বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

হুর্গদ্বারে কি পবিত্র দৃশ্য! রাজপত্নীগণ সহমরণে বাইবার সময় হস্তে যে চন্দন মাখিয়া স্বামীর শবের সঙ্গে হুর্গের বাহিরে অশ্রুধারা বাইতেন, হুর্গের বাহির হইবার সময়ে, তাহার হুই পাখের প্রাচীরে পবিত্র কবপদ্মের চিহ্ন মাখিয়া বাইতেন। আমাদের সঙ্গে ‘পাণিনিয়ারের’ সংবাদদাতা একটা সাহেব ছিলেন।

তিনি গণিলেন, এরূপ ৩২টি কর-চিহ্ন আছে। কিন্তু আহা! কি অযত্নে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহেবটীকে বলিলাম—“তোমার ‘পাণিনিয়ার’ পত্রিকা আমাদেরকে অজস্রধারায় গালি দিতে পারে, কিন্তু এই যে পুরাতন ঐতিহাসিক কীর্তি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এই যে পবিত্র আত্ম-বিসর্জনের নিদর্শন সঙ্কলনের একটি টেবলেট মাত্রও নাই, ইহার প্রতি কি তোমাদের কখনও চক্ষু পড়ে না? কোন্ কোন্ সাধবী এরূপে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটি তালিকা ও ঘটনার কাল, এখানে কি রাখা কর্তব্য নহে? এ স্থানটী একটি পবিত্র ভূমির মত কি রক্ষিত হওয়া উচিত নহে? এই দুর্গে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সঙ্গে কি সে সঙ্কলন লিখিত থাকা উচিত নহে?” সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, যে এরূপে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তিনি ১৩ বৎসর ভারতে কাটাইয়াছেন, কই, কেহ ত এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি এখন ভারত ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ইহা ভুলিবেন না। তিনি এত প্রীত হইলেন যে, বরদার সহকারী মন্ত্রীকে কাছে, আমার সাহায্যের জন্যে, এক পত্র দিলেন, এবং বস্ত্রে গেলে, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিলেন। রাজার জনৈক উচ্চ কর্মচারী, এরূপ কথা শুনিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন, বলিলেন। তাহার পর, সেই তিন সহস্র ফুট উচ্চ শৈলশেখরের উপরে অশ্বপদাঘাতে প্রস্তরে অক্ষিফুলিত ভুলিয়া, আমরা রাজার প্রকাণ্ড একখানি যুড়িতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়ে পণ্ডিত জীবানন্দ, খেত-প্রস্তরের দুই সেট চার পেয়াল ও বেকাবি দিলেন। তাঁহার এবং হরদয়াল সিংহের

কটোগ্রাফ দিলেন। উক্ত সাহেব এবং হরিশ বাবু রাজার ঘড়িতে আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। ট্রেনে আবার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেখা। তাঁহার এক জন শরীররক্ষককে দিল্লীর সৈন্ত-ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্তে পাঠাইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি ঘোষণাপুরে অতি অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, আবার আসিও। আমি বলিলাম, আপনাব অনুরোধ থাকিলে আসিতে পারি। যাহা লিখিলাম, তাহাতে বুঝিবে, কি স্থখে ও সম্মানে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ঘোষণাপুর দর্শন করিয়া গেলাম।

ভার্যচরণ বলিতেছেন, আমি লিখিতে ভুলিয়াছি যে, ঘোষণাপুর জুর্গে এক স্বর্ণরঞ্জিত কক্ষ এবং স্বর্ণ ও রক্ততে নিৰ্ম্মিত সিংহাসন দেখিয়াছি।

বরদা ।

আমরা জয়পুর হইতে আজমীর, পুর, চিতোর, এবং ঘোষণাপুর—ইহাদের বিষয় পূর্বে লিখিয়াছি—দর্শন করিয়া, বরদায় বাই। বরদার সহকারী দেওয়ান বা মন্ত্রী, আমাদিগকে তাঁহার অতিথির মত গ্রহণ করেন। ভার্যচরণ সঙ্গে বলিয়া, আমি আপা সাহেব বোন্ডের ধর্মশালায় অবস্থান করি। সহকারী মন্ত্রী মনিভাই বশোভাই, আমাকে অনেক অনুযোগ করেন যে, পূর্বে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিই নাই। তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্তে যথোচিত বাসস্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন। রাজার গাড়ী, রাজার সিপাহী ও কারকুন, আমাদের জন্তে নিয়োজিত হয়। আমরা অতি সম্মানের সহিত বরদা দর্শন করি।

বরদায় দেখিবার জিনিস হই। রাজবাড়ী এবং গুজরী।
 গুজর ও গুজরাটের কামিনীকুম্মের সৌন্দর্য্যের গীত সমযান্তরে
 লিখিব। বরদার মহারাজকে 'গাইকোয়ার বলে। অর্থ, গাভী-
 রক্ষক। গৌ ব্রাহ্মণ এক। অতএব রাজার উপাধি গাভীরক্ষক
 বলিয়া এক জন ব্যাখ্যা করিলেন। আমার বোধ হয়, মহারাজ
 ভূপতির গাভীরক্ষক ছিলেন বলিয়া, গাইকোয়ার নাম হইয়াছে।
 তেমনি তাঁহার মন্ত্রী বা পেশকার ছিলেন বলিয়া সেতারা এবং
 পুণার রাজার নাম পেশোয়া ছিল। শিবজীর উত্তরাধিকারীরা
 হীনবল হইলে, পেশোয়া এবং গাইকোয়ার স্বাধীন নরপতি
 হন। আমার এ অনুমান কত দূর সত্য, জানি না। বর্তমান
 রাজার নাম জিয়াজী গাইকোয়ার। ভূতপূর্ব গাইকোয়ার
 জনৈক 'পলিটিকেল'র বিষয়কে পড়েন, এবং তাঁহার চক্রান্তে
 রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার দূরসম্পর্কীয় একটি দরিদ্র বালককে
 ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনিই
 বর্তমান গাইকোয়ার। বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা'
 রাজবাড়ী নামক এক বৃহৎ রাজপুরী আছে। খাণ্ডেরাও গাই-
 কোয়ার এখানে পাশাপাশি দুইট অট্টালিকা নির্মাণ করেন।
 বর্তমান গাইকোয়ার তাহার পার্শ্বে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া
 আর একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন।
 নগরের মধ্যে আর এক রাজবাড়ীতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস
 করেন। মাখনপুরার তিনটা অট্টালিকা এক শৃঙ্খলে গাঁথা, এবং
 আবৃত্ত এক গৃহপথ দিয়া নূতন অট্টালিকা হইতে পুরাতন অট্টা-
 লিকাতে যাইতে পারা যায়। পুরাতন দুটি বৈঠকখানমাত্র, এবং
 নূতনটি অস্তঃপুর। বহুমূল্য ইংরাজী উপকরণের দ্বারা সকল
 অট্টালিকা সজ্জিতা, বিশেষতঃ ; অস্তঃপুরমহলের সজ্জা কল্পনাভীত।
 যে সকল রাজবাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার তুলনায় কিছুই

নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মহারাজ সুলীক শৈলবিহারে গিয়াছিলেন। সমুদায় গৃহ জনশূন্য। সহকারী মন্ত্রীরা আদেশে, আমরা মহারাজার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। দেখিবে কি, যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, চক্ষু বলসিয়া যাইবে। বোধ হইল, মহারাজা ইউরোপীয়ের মত থাকেন। নানাপ্রকার পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মণ্ডরের ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জিত। নরচক্ষে যাহা দেখে নাই, তাহাও আমরা দেখিলাম। একটা কক্ষের প্রাচীরে এক বৃহৎ তৈলচিত্রে কি ভুবনমোহিনী মূর্তিই দাড়াইয়া রহিয়াছে। ইনি মহারাজার মৃত্যু রাণী লক্ষ্মীবাই। এই চিত্রখানির প্রতি আমরা বহুক্ষণ নিমেষশূন্য চিত্রবৎ চাহিয়া ছিলাম। চিত্রখানি মাতুষের বলিয়া ত বোধ হইল না। কি সুখ, কি চোক, কি শরীরের দীর্ঘগঠন, কি চম্পক কোরক-নিভ বর্ণ, কি অকুলনৌয়া অঙ্গভঙ্গী, কিছুই যেন মাতুষের বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের বোধ হইল, যেন একটা রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। মহারাজীয় বেশে চিত্রময়ী ভূমিতা। সম্মুখের কুক্ষিত কোঁচাগ্র, সম্মুখ হইতে বক্ষিমভাবে পদ মধ্য দিয়া অসাবধানে পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া কি শোভারই বিকাশ করিতেছে! জমপুত্রের আয় ৬০ লক্ষ, বোধপুত্রের ৪০ লক্ষ, এবং বরদার ১১ কোর। যদি বিধাতা আমাদের বলিতেন, তুমি এ স্বক্ষরীকে চাহ, কি বরদার সিংহাসন চাহ, আমি অগ্নানবদনে এই পার্শ্বব রাজ্য না চাহিয়া, এই অপার্শ্বব রূপরাজ্য ভিক্ষা চাহিতাম। ভূত্যেরা বলিল, চিত্রে কিছুমাত্র অত্যাঙ্কি নাই। তাহার্য্য তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আমার যেমন রূপ, তেমনই মন, তেমনই স্বপ্ন। ভূত্যাগণ এখনো তাঁহার জন্তে হাহাকার করিতেছে। তিনি একটামাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুটিরও তৈলচিত্র অন্য কক্ষে দেখিলাম। যদিও যার সম্পূর্ণ রূপ পা

নাই, তথাপি যরি । যরি । কি রূপ ! শিশু ত নহে, ঘেন একটি স্বর্গীয় কুসুমকোরক । কক্ষান্তরে মহারাজার বর্তমান মহিষীর একখানি অসম্পূর্ণ চৈতলচিত্র দেখিলাম । তিনিও কিছু কুংসিতা নহেন । তথাপি, এই মোহিনীর ছায়াতে তাঁহাকে কি কুংসিতই দেখাইল । ভৃত্যেরাও আমাদের মতের প্রতিপোষণ করিল । এই রমণীরত্নের দৃষ্টিতলে, এবং তাঁহার শিশুপুত্রের মুখখানি দেখিয়া, মহারাজ যে কি প্রকারে দ্বিতীয় রমণীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি ত বুঝিতে পারি না । কর্মচারীরা বলিলেন, রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম নিবন্ধন গাইকোয়ারের শিরোরোগ হইয়াছে ! তাই তিনি বারংবার ইউরোপে ও শৈলে শৈলে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন । মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন । আমার মতে, কার্য্যাদিকা ইহার কারণ নয়, এই স্ত্রীবিধোগই ইহার কারণ ।

কিন্তু এ হেন ইন্দুপুরীতেও মহারাজার সাধ মিটিল না । আর একটি কি অপূর্ণ রাজবাটীই প্রস্তুত হইতেছে ! ইহাতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে । সম্পূর্ণ হইতে আরও ২৫ লক্ষ লাগিবে । যে ইহার কল্পনা করিয়াছিল, সে এক জন অদ্ভুত কবি । মহাদানব তাহার শিষ্য হইবার যোগ্য নহে । আমি ইহার কি বর্ণনা করিব ? প্রথম একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল । তাহার পর প্রাক্ষণ বেষ্টিয়া গাইকোয়ারের বহির্মহল, তাহার পর অন্তঃপুরমহল । এই উভয় মহল, হলের সমান উচ্চ, ত্রিতল । মহলে মহলে প্রাক্ষণ বেষ্টিয়া অসংখ্য কক্ষ । এক একটি কক্ষ, এক একটি গৃহ বলিলেও চলে,—এত প্রশস্ত । চিতোরের 'কীর্তি-স্তম্ভ'র মত একটি স্তম্ভ, ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া কি অপূর্ণ শোভাই ধারণ করিয়াছে ! স্তম্ভটী দশ কি দ্বাদশ তল । তবে, চিতোরের তলায় তলায় মধ্য কক্ষে এক একটি

দেবদেবীর মূর্তি আছে। এখানে শুজারোহী রমণীদিগের বসি-
বার জন্তে তাহা শূত্র রাখা হইয়াছে। বোধ করি, উপযোগী
উপকরণে সজ্জিত হইবে। এই বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত কক্ষ-
গুলি—এমন কি প্রবেশপথ পর্য্যন্ত—সুবর্ণামিশ্রিত বর্ণে বিচিত্র
কৌশলে চিত্রিত হইতেছে। বিলাত হইতে শিল্পকর আনিয়া,
ইহার চতুর্দিকে উত্তান সৃষ্টি করিবে, এবং উপযোগী সজ্জা ও
উপকরণ প্রস্তুত করিবে। কাণ্ডখানা কি বুঝিতে পারিলে কি ?
এই রাজবাটীর নাম “লক্ষ্মীমহল”। কিন্তু যে লক্ষ্মীর জন্তে এই
অহুলনীয় পার্থিব স্বর্ণ সৃষ্ট হইতেছিল, তিনি আজ কোথায় ?
প্রজারাও, তাঁহার স্মরণার্থ, নগরমধ্যে একটি ‘ঘটীকান্তস্ত’ প্রস্তুত
করিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে ।

বোম্বাই ।

বরদায় এক দিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। বোম্বাই
নাম সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্বে যখন পর্তুগি-
সেরা এ স্থানটি অধিকার করে, তখন ইহার ‘বুয়ন বাহিয়া’—
উৎকৃষ্ট বন্দর—নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হুয়। দ্বিতীয়
প্রবাদ—‘মম্বাই’ বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে
ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনও বোম্বাই সহরের
একটি অংশের নাম মম্বাই দেবী আছে। আর একটি অংশের
নাম কামদেবী। বোম্বাইর অংশবিশেষ প্রকৃতই কামদেবীর
স্থান। সে কথা পরে লিখিব।

বোম্বাই আমার কাছে স্লামা ভায়তমাতার জিহ্বা বলিয়া
বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া, উত্তর দক্ষিণ

ঘাট গিরিমালা হ্রদজ্বা প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে। এই গিরি-
শ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার সম্বল 'মলয়াচল'। এই শৈল
সমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটা ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে
ভাসমান। গ্রামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। গ্রামা ভারতমাতার জিহ্বা
গ্রামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উজ্জানবৎ শোভিত।
গ্রামার জিহ্বার চারিদিকে রক্ত-ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে।
এ গ্রামা জিহ্বার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি
নীল সমুদ্রগর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি
মনোহর উপদ্বীপ? ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিধার মত বেটন
করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জন
নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি
পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন
এক একটা স্নানর ফুলের মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইর উভয়
পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ
সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্মিত হইয়াছে।
গাড়ী এই সলিলরাশির উপর দিয়া, উভয় পার্শ্বে স্থপরি, তাল,
নারিকেল, ধর্ম্মর বৃক্ষশোভিত গিরিমালায় মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে,
কি চকল চিত্ত-বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণ মন মোহিত
করিয়া দেয়।

আমরা প্রথমেই জিহ্বার অগ্রভাগস্থ পর্বতস্থিত ইংরাজি
বসতিস্থান দেখিতে যাই। এই পর্বতটীর নাম "মেলেবার হিল,"
তাহার প্রান্ত সীমাগ্রে শৈবালগম্যাবৃত হংসের ভায়, বোম্বাইয়ের
গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্বতটী ইংরাজ-
দিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বে সমুদ্র সকল গৃহ
হইতে দেখা যায়; পর্বতটীর সর্বত্র পঞ্চমালা একরূপ বিচিত্র
কৌশলে নির্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায়।

যজ্ঞবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবাহহারাবল।ক মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্ভানমালা, এবং তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল-কান্তি দর্শন করিয়া শকট-ভ্রমণ কি মনোহর ।

ফিরিবার সময়ে এই পর্বতস্থিত পার্সিদিগের “নীরব মন্দির” বা সমাধিস্থান দর্শন করি। মূল সমাধিস্থানটী একটা গোলাকার প্রাচীর মাত্র। তাহার অন্তর্কর্ত্তী স্থানটী চক্রাকারে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটা কূপ; তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণী-দিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে একটা গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মী-য়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থ হই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অস্ত্র কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটীর বসন মোচন করিয়া, উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অন্নকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে, ভৃত্যেরা অস্থি সঙ্কল মধ্য কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে এরূপ শকুনের আহাৰ্য্য করা আপাততঃ শুনিতে বড়ই নিষ্ঠুরতা বোধিয়া বোধ হয়। তবে চক্ষের উপর পোড়াইয়া ফেলা, কিংবা ভূমিগর্ভে অসংখ্য কীটের আহাৰ্য্য করিয়া দেওয়াই কি নিষ্ঠুরতা নহে? যখন আৰ্য্যজাতিরা কেবল বৈদিক অগ্নির উপাসক মাত্র ছিলেন, তখন হই ভাগ হইয়া উত্তর কুরু হইতে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন, অস্ত্র শাখা পারস্য দেশে গমন করেন, ইহায়াই পার্সি। ভারতীয় আৰ্য্যদিগের ধর্মের অনন্ত রূপান্তর ও উন্নতি হইয়াছে।

পার্সিরা এখনও অগ্নি-উপাসক। উত্তর কুক শীতপ্রধান দেশ, যতএব অগ্নি তীক্ষ্ণ মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন, প্রধান দেবতা। শবদাহ করিতে অগ্নির ও ইন্ধনের অপব্যয় বৃদ্ধি-বিয়ল শীতপ্রধান দেশে সম্ভব নহে। সেই জন্তে উত্তর কুকতে শব এক্রপে পশু পক্ষীর আহাৰের জন্যে ফেলিয়া রাখা হইত, ইউরোপে এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পার্সিরা সেই পূৰ্ব্ব নিয়ম রক্ষিত করিয়া আছেন। ভারতে কাষ্ঠের অভাব নাই, কাষেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম পরিবর্তিত হইয়াছে। এক্রপে দেশ, কাল ও অবস্থাই মানুষ্যের জাতীয় আচার ব্যবহারের রূপান্তরের মূলভূত কারণ।

তত্ত্বিন্ন আর একটা গভীর তত্ত্ব পার্সী ও হিন্দুদিগের অস্ত্রোষ্টি-ক্রিয়ার ভিত্তরে নিহিত আছে। উভয় জাতির ধৰ্ম্মনীতির মূল—সৰ্বভূতহিত। শবটী পোড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারও হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি, জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া, শস্তাদি উৎপন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে সে বহুকালসাপেক্ষ এবং তত্ত্বটী জটিল। পার্সীদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহাৰ হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে, এবং অস্থিও কালে ভূমির উৰ্দ্ধরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি ; অতএব, আমার লোষ্ট্রবৎ জীবশূণ্য দেহটী আহাৰ করিয়া যদি কয়টি প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি ? দেহটি ধ্বংস করা ও ভূগর্ভে পাচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এক্রপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে ?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খাতনামা 'হস্তিগুফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এমত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিশূর্ণ। প্রত্যেক

গৃহ নানারূপ বাবাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট । আতৃতিবৈচিত্র্য
বড় মনোহর । বোম্বাই নগরের ছইটি বিশেষ লক্ষ্য । অধিকাংশ
অট্টালিকার সর্বোচ্চ ভলার ছাদ খোলায়, এবং ফুল অতি বিরল ।
সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয় । সমুদ্রানিল
মলিনসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই, এবং
লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই । এই শৌৰ মাসের মধ্য-
ভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না । এ জন্তেই
কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,
এবং এই জন্তেই মলয়ানিলের এত গুণগান । তবে এ বসন্ত
পুষ্পহীন বোধ হইল, এবং এ মলয়াচলে চন্দনবৃক্ষ ও ভূঙ্গল নাই
বলিয়া তারাররণের দৃঢ় বিশ্বাস,—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে । জানি
না, সেই চিরবসন্তের দেশে থাকিয়া তোমার ভায়া কি দারুণ বিরহ-
যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন ।

আমরা একখানি 'জালিঘোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ
এলিফেণ্টা বা হস্তিশূক্ষা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম । এই সমুদ্রবিহার
আমি এ জীবনে ভুলিও না । স্থানে স্থানে ষণ্ড-পর্বত সমুদ্রগর্ভে
যেন এক একটা দোল কিংবা এক একখানি বধের মত ভাসি-
তেছে । তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া
যাইতেছে । কোনো ষণ্ড-শৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই স্বরূপ র্থ
অস্ত্রাগার, কোথাও বা বাকুবাগার নির্মাণ করিয়াছেন । যেত
অট্টালিকাটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটা রাজহংস
গিরিশিখরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে । স্থানে স্থানে যুদ্ধযান
এবং বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় যান সকল সগর্বে ভাসিতেছে । আমা-
দের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনার মত তাহার পার্শ্বে জীড়া করিতে
করিতে চলিয়াছে । বহু দূর গিয়া পশ্চাৎ কিরিয়া দেখিলাম—
অহো ! কি দৃশ্য !

“দূরে চক্ৰনিভ তরী, তমাল তালের লীলা,

কলক রেখার মত শোভে লবণাঙ্ক বেলা।”

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-বনরাজি-মণ্ডিতা, সৌখ্যমালায় বিচিঞ্জিতা বোম্বাই, নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাঙ্কৃতীয়ে খুলিয়া রাখিয়াছে, এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর সুগমগুলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে, এই ‘মলয়াধারের তীর সুবন্ধিম’ এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে “মলয়াচলের-উজ্জল-নীলিমা” নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা • দ্বীপের পর্বতটী বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্বতের কটীদেশে ‘হস্তিগুফা,’ তাহা হইতে ইহার নাম ‘এলিফেণ্টা’ হইয়াছে। এই গুফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্র-তীর হইতে গুফা পর্যন্ত স্রোপানশ্রেণী উঠিয়াছে। জনৈক খেতাজ পুরুষ ও তাঁহার খেতাদিনী প্রিয়া এখন গুফার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ লইয়া, গুফা দর্শন করিতে হয়। হুইটিই বেশ ভদ্রলোক। যদিও বহুতর খেতাজ ও খেতাদিনীরা তখন গুফাদ্বারে বিয়াজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় হুলিতেছেন, তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্বতের প্রস্তর বক্ষ কাটিয়া, ‘ব্রাহ্মণের’ শোনভাঙার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা বড়, একটী কক্ষ নির্মিত হইয়াছে। কক্ষ, প্রাচীর বড় সুচারুরূপে নির্মিত নহে। ‘বরাবরের’ গুফা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে সুখ দেখা যায়, এমনি মন্থণ। তবে কক্ষটীর প্রাচীরের পায়ে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্তি স্থাপিতা রহিয়াছে। মূর্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্য-

পূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২১০ টী ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুম্ফা বৌদ্ধ-দেয় কর্তৃক তপস্তার ভজ্ঞে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর, হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, দুই স্থানে দুইটী শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অত্ৰ কোনও মূৰ্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্তটী লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পৰ্ব্বত হইতে চতুর্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্কৃত্য দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্র-শোভা দেখিলে চোক ফরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকূল বাতাস নিবন্ধন অন্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল; পটপরিবর্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোভাসিত, পৰ্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন জ্ঞাননি হৃদয় উজ্জ্বলিত করিয়া বহিতেছে, ভরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূৰ্ব্ব দিন মলয়-পৰ্ব্বত-শিবে দাঁড়াইয়া, এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বন্ধে ;

বোম্বাই সমুদ্র তীরে ;

ওধা দাঁড়াইয়া একা দেখিছ স্বপনে;—

ভারতের সুখস্বৰ্গ আসিবে যে ক্রমে।

বাইরণের স্বপ্ন বলিয়াছে ;— গ্রীষ্মের সুখের দিন কিরিয়াছে।

আমার স্বপ্ন বলিবে কি ?

পূনা ।

কাল প্রাতে বহু ছাড়িয়া অপরাহ্ন টোয় সময়ে পূনা পহছি ।
 বহু ২টা দিন কি কষ্টে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না । তার-
 চরণের হিন্দুয়ানীর কল্যাণে যে এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু হোটেলে
 উঠিয়াছিলাম, তাহার বিচিত্র নাম পূর্বে লিখিয়াছি । ইনি
 মহারাষ্ট্রীয় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দম্যপ্রবৃত্তির একটি জীবন্ত
 মূর্তি । সে মূর্তিধারি দেখিয়াই আমার চমক লাগিয়াছিল । আমি
 তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, আমরা এক ব্যাধের ফাঁদে পড়িয়াছি ।
 তিনি আমাদের অর্থ শোষণ করিবার জন্যে জাল পাতিতেছিলেন ।
 আর একটি ভুক্ত-ভোগী বান্দালী, তাহার হোটেলে ছিলেন,
 ইহার রূপায় আমরা রক্ষা পাই । যাহা হউক, অর্থ না হউক,
 দুই দিন বাবৎ আমাদের শোণিত শোষণ, ইনি ৭।০ লইয়া
 আমাদেরকে ছাড়েন । লইলেন ৭।০ আনা, খাইতে দিয়াছিলেন
 ছটাক দুই চাউল, আর বনিকটা মুলার শাক । তাহার বিচিত্র
 হোটেলে যদি আর ঘণ্টা কালও থাক, তবে সমস্ত দিবসের ভাড়া
 দিতে হয় । কায়ে কায়ে আমাদেরকে কাল অনাহারে ছাড়িতে
 হয়, এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয় । বাহা হউক, সেই
 “নারায়ণ-ভোজন-বস্তি-গৃহ” বা গ্রহ হইতে উদ্ধার পাইয়া, আমি
 নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম । হোটেল কর্তার নাম নারায়ণ ।
 তিনি আমাদেরকে ভোজন না করিয়া যে গ্রাসযুক্ত করিয়াছেন,
 তাহা দুইটি বমণীর এয়োস্তির জোর বলিতে হইবে ।

‘কল্যাণ’ স্টেশন হইতে আমরা ঘাট পূর্বত বা মলয়াচল
 আবোহণ করিতে আরম্ভ কর । গরজাট স্টেশন হইতে দুই খানি
 এঞ্জিন ট্রেনের অগ্রে ও পশ্চাতে সংযোজিত হয় । কখন বা
 পশ্চাতের এঞ্জিনে টানিয়া আমাদেরকে দেখিতে দেখিতে

পর্বতসামুদ্রদেশে, অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূল হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলে। এই গগণবিহার বিজ্ঞানের একটি চরম গৌরব। কখন বা উচ্চ সেতুর উপর দিয়া, কখন বা গিরিপার্শ্ব, বহিয়া, ট্রেন নক্স বেগে ছুটিতেছে। যদি এক পা এ-দিক ও-দিক হয়, তবে সহস্র সহস্র ফিট গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হইবে। আর কখন বা গিরিগর্ভ ভেদ করিয়া, হুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অন্ধকারে ছুটিয়া যাইতেছে। একপে ২৫টি হুড়ঙ্গ পার হইয়া আসি। গাড়ীতে আলো দেওয়া আছে, হুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে ঠিক যেন বাজি। এক একটি হুড়ঙ্গ এত দীর্ঘ যে, ট্রেন ২৩ মিনিট তাহার ভিতরে থাকিয়া যায়। রেলপথের দুইদিকের দৃশ্যই বা কত মনোহর। অনন্ত গিরি-শ্রেণী স্তবকের পর স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে। হৃদয়ে কোন্‌ও শৃঙ্গে, পুরাতন মহারাষ্ট্র ছর্গের ভগ্নাবশেষ শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নিম্নর স্রোত নীল-মণি-হাবের মত দেখাইতেছে।

সেই যে ২০০০ ফিট উপরে উঠিয়াছি, আর আমরা নামি নাই। উপরে উঠিলে রেল প্রায় সমস্রুতে পূনা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অতএব বুঝিতে পারিতেছি যে, পূনা নগর সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই আকাশের উপর মহারাষ্ট্রের কি বিশাল রাজ্যই অবস্থিত ছিল।

এলাহাবাদের অনেক ডাক্তার, পূনার জন্তে একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। আসিয়া মেথিলাম, বাহার নামে পত্র, তিনি এক জন ছাত্র। ইহারা কয়েক জন বাকালী ছাত্র এখানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছেন। তাঁহাদের ছাত্র-আবাসে বসিয়া ভোমার কাছে পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা আমাদের বড় বন্ধ করিতেছেন। একটি ছাত্র ভিন্ন এখানে আর বাকালী নাই।

অন্ত প্রান্তে প্রথমে পার্কটীর পর্বত আরোহণ করি। বাই-
বার পথে পর্বতের পাদমূলে একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থানে একটি
দ্বীপ। ঝিল এখন শুক, দ্বীপ এখন জঙ্গল। পর্বতে উঠিয়া
প্রথমেই পার্কটীর মন্দিরে যাই। মধ্যস্থলে রক্তনির্মিত শিব।
“রক্তগিরিনিভং” ধ্যানবাক্যের প্রতিমূর্তি। এক পার্শ্বে স্বর্ণ-
পার্কটী “তপ্তকাঞ্চনাতা,” অন্য দিকে সোণার গণেশ। উভয়কে
অঙ্কে লইয়া, মহাদেব বিবাহ করিতেছেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র
বেশ, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি। আমার বোধ হইল—সিদ্ধি,
শক্তি এবং নিকামতা, যেন একাধারে এই ত্রিমূর্তিতে বিবাহ করি-
তেছে। এই ত্রিমূর্তির বা ত্রিশক্তির সাধনা দ্বারা শিবজী মহারাষ্ট্র
রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মোগল রাজ্যের অঃপতন ঘটাইয়া-
ছিলেন। এই মহাসাধনা ভুলিয়া, তাঁহার কাপুরুষ উত্তরাধিকারী
বাক্সিরাও, সেই সাম্রাজ্য হারাইলেন, ভারতকে ইংরাজ-কবলে
কবলিত করিলেন। ত্রিমূর্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থিত
সৌধস্থিরে আরোহণ করিলাম। এই মন্দিরের পার্শ্বে, শেষ মহা-
রাষ্ট্রাধিপতি পেশোয়া বাক্সিরাওর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্তমান
রহিয়াছে। অনুরে শৈলশেখরে শিবজীর খ্যাতনামা হর্গজয়—
সিংহগড়, রাজগড় এবং দ্বায়গড়—আকাশের গায়ে চিত্রপট
দেখাইতেছে; চারিদিকে গিরিশ্রেণী আকাশে তরঙ্গ খেলিয়া
নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাবের প্রান্তের অঙ্গে অঙ্গে মহা-
রাষ্ট্রদিগের গোববের ও অঃপতনের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে,
একটি পর্বতের কক্ষদেশে “চতুঃসিংহ” মন্দির একটি খেত কুহুমের
মত শোভা পাইতেছে। ইহাতেও হরপার্কটীর মূর্তি আছে।
দশমী বিবসে মহারাষ্ট্রীগণ তাঁহাদের পূজা করিয়া, দেশভ্রমণে এবং
যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। আমার কর্ণে যেন সেই বীরকণ্ঠ, সেই “বম
বম বম হর হর” বর স্বপ্নপ্রসূত শব্দের জ্বাল প্রবেশ করিতে লাগিল—

“হর হর হর বলে ; কি কাণ্ড করিকে বলে ;

সেই সিংহনাদ আজি হয়েছে স্বপন ।

মহারাত্রি ইতিহাস অদ্ভুত যেমন ।”

শিব-শক্তির মন্দিরের পদমূলে, সেই কিকির যুদ্ধক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রে পেশোয়ার রাজদুকুট খসিয়া পড়ে । কাপুরুষ বাজিরাও, প্রাণভয়ে পার্শ্বতীর মন্দিরের একটি কক্ষে বসিয়া, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্টের পরীক্ষা দেখিতেছিল । ইংরাজদিগের জয় হইলে, সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করে, এবং ধৃত হইয়া বিঠুরে বন্দী হয় । নানা সাহেব তাহারই পোষাপুত্র । সেই হরপার্কতীর, সেই শিবশক্তির মন্দির এখনও বিজয়মান রহিয়াছে । কিন্তু মহা-রাত্রিদিগের শিব (মঙ্গল) ও শক্তি (বীরতা) চিরদিনের জন্তে অন্তমিত হইয়াছে । আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, হর-পার্কতীর মন্দিরের ছায়াতলে, বহুর সর্গরের বাকী এবং সৈন্ত-গৃহাবলী শোভা পাইতেছে । ইহাদের এত দূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, মন্দিরের পূজক শিবের ধ্যানটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, এবং পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, মৃত ভাষা সংস্কৃত তিনি কি জ্ঞাত শিখিবেন । তিনি ইংরাজিতে আমাদের কাছ হইতে কিছু উত্তম কবিতার জন্তে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন । এমন অর্থগুরু নরশিষ্য আমি যেন আর দেখি নাই । সে তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছুই জানে না । আমি তাহাকে সেই জন্তে ১০ আনা পরগা মাত্র দিয়া আপনাব ইতিহাসখানি পড়িতে বলিলাম ।

ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া, পার্শ্বস্থিত এক মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত কার্তিকের ও অস্ত্র মন্দিরে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শন করি । দেবতারা সকলেই এখন ইংরাজ রাজ্যের রক্ত-ভোগী । বিহ্বল মন্দিরে অতি সুন্দর সজীত হইতেছিল । পূজক ব্রাহ্মণও একটি অতি সুন্দর ধ্যান বলিলেন । আমি লিখিয়া গইয়াছি ।

পার্কটীর পূর্বত হইতে অববোহণ করিয়া, পূনার 'শিল্প প্রদর্শনী' দেখিতে যাই। প্রদর্শনী কাল বন্ধ হইয়াছে। কর্মচারিগণ প্রথম বলিলেন, আমাদিগকে না দেখিতে দিবেন, না কোনও জিনিস কিনিতে দিবেন। হুই এক কথা বলিলে বলিলেন, কি করিবেন, নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। নিতান্ত পক্ষে সম্পাদকের মত চাহি। তাহার পর ছ'চার কথা তাঁর বিজ্ঞপ্তি নিয়াই নিয়মও লঙ্ঘন করিলেন, দেখিতেও দিলেন, কিনিতে দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর সহর দেখি। দেখিলাম, পেশোয়ারদের পুরাতন রাজবাটীর একটিতে বৃটিশদিগের পুলিশ স্টেশন বিরাজ করিতেছে। তাহার পর দুর্গ দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে আমাদের জনৈক পুলিশ প্রভু বিরাজিত। বলা বাহুল্য যে আর দেখা হইল না। ভিতরে, দেখিবারও কিছু নাই। তাহার পর, বাজার দেখিয়া গৃহে আসিলাম। শিবজী, আগুন গুরুকে দান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানটির নাম—শুনিলাম—পূনা হইয়াছে। আজ সেই পূনা নগর, মহারাষ্ট্রীয়দের একটি ঐতিহাসিক মহা-শ্রমশ্রম। পূনা 'সার্কজনিক' সভাগৃহে, পেশোয়ারদিগের জনৈক গাভতনামা মন্ত্রীর একখানি চিত্র দেখিলাম। এখন সেই বীর রাজা নাই, সেই গভীর রাজনৈতিক মন্ত্রীও নাই। মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে, ভারতের ভাগ্যে, আবার সে মণিকাকনের সংযোগ হইবে কি না, কে বলিবে ?

দণ্ডকারণ্য ।

পূর্বেই লিখিয়াছি, বোম্বায়ে "নারায়ণ-ভোজনবলি গৃহ" হইতে দুই দিনে উদ্ধার হইয়া পূনার যাই। পূনার কথা লিখি-

যাছি। পূনা হইতে 'নাসিক' যাই। পূনার মত, নাসিকও মধ্য-ভারতের অধিত্যকায় ২০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কল্যাণ ষ্টেশন হইতে ক্রমশঃ ১৩টি গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া গাড়ী এই অধিত্যকায় আরোহণ করে। কিন্তু একবার উঠিলে অনন্ত সময়ের ভূমি। ভূমি এত উচ্চ স্থানে উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে না। শুধু তাহা নহে, অধিত্যকাটি স্বর্ণপ্রস্থ। চারিদিকে সুন্দর শস্ত-ক্ষেত্র এবং নিবিড় আশ্রয়ন দেখিলে, ঠিক যেন বঙ্গ দেশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার জল বাতাস এত উৎকৃষ্ট যে, একবার নাসিককে ভারতের রাজধানী করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। লক্ষণ এখানে সূর্যপথার নাসিকা কাটিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানটির নাম "নাসিক" হইয়াছে বোধ হয়। ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে নাসিক নগর। টোকার যাইতে হয়। এখানকার টোকাগুলি এক নূতন জিনিস। দেখিতে যেন কেনভাসের ছাদওয়ালা টম-টম। লাকলে যেক্রমে গঙ্গা জুতিয়া থাকে, ইহাতে সেইরূপ ছাট ঘোড়া বুড়িয়া দেয়। কিন্তু নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়।

আমরা অপর্যাহে নাসিকে গিয়া, পাণ্ডা অমৃতরাম অনন্তরাম সিকরিয়ার বাড়ীতে অতিথি হই, এবং তাহার ভ্রাতৃ-বধু আশা দেবী আমাদের অন্নপূর্ণার কার্য করেন। পর দিবস প্রাতে, প্রথমে গোদাবরী দর্শন করি। গোদাবরীর গর্ভ প্রস্তরময়। তাহা কাটিয়া, দীর্ঘাকৃতি কুণ্ডবাশি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুণ্ডের হই পার্বে জলের বহু রাখা হইয়াছে। তাহার দ্বারা কুণ্ড হইতে কুণ্ডান্তরে গোদাবরী প্রোত বহিয়া যাইতেছে। উপর দিয়া লোক এ পার হইতে ও পারের যাত্রায়াত করিতেছে। তাহাচরণ গকাটক আবৃত্তি করিতে করিতে, "হৃদয়নান্দানিত" জলে স্নান করিলেন। তাহার সঙ্গে ত এক ডুব দিলেনই। তাহার পিতা, মাতা, সর্বশেষ আশ্রয় পতিবিরহিনী পত্নীর সঙ্গেও এক ডুব

দিবেন । আমার মাটা নাই, পিতা নাই । তাঁহার উভয়ে বৈকুণ্ঠে ;
বহুদিন এই অযোগ্য পুত্রের পাপ পুণ্যের অতীত হইয়াছেন ।
আছেন পত্নী, কিন্তু তাঁহার স্বামী অবগাহন করিলে, সেই স্বামীর
পুণ্যের ভাগী তিনি হইতে পারিবেন কি না, আমার সে বিষয়ে
অনেক সন্দেহ আছে । সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জন্তে
কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই । গোদাবরীতে ডুবিয়া কি
পারিব ? তত্ত্বিন্ন, এ স্থানের জলের একরূপ বর্ণ যে, তাহা কেবল
নিমজ্জিতা স্ত্রীমূর্ত্তির “ভূমি স্তন” মাত্র আফলিত করিয়া
আসিতেছে বলিয়া ত আমার বোধ হইল না । চক্ষুর উপর
দেখিলাম, কতরূপ ময়লাই এ স্থানে প্রক্ষালিত হইতেছে ।
এখানে স্নান করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না ।

গোদাবরীর অপর পারেই ‘দণ্ডকাবণা ।’ এখন তাহা একটি
ক্ষুদ্র গৃহায়ণ্য । গোদাবরী পার হইয়া আমরা প্রথম একটি
বৃহৎপ্রাঙ্গণসম্বলিত মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন
করি । প্রবাদ আছে যে, এখানে রামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া
বনবাস করিয়াছিলেন । এই সেই রামায়ণের আয়ণ্যশোভাপূর্ণ
পঞ্চবটী । প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ঈদরসর্ব্ব্ব সম্মানী বলিয়া রহিয়াছে ।
এক জন আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ বসিকতা করিলেন । তাহার
পর আর একটি মন্দিরে বাই । এখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে ।
পাণ্ডা বলিলেন, ‘এ মন্দিরে বাহা মানস করিব, তাহা পাইব ।
আমি বলিলাম, আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই । নারায়ণ আমাকে
বাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সুখী । তারাত্রণ বলিলেন,
কিছু আমাকে প্রার্থনা করিতে হইবে । তখন আমি প্রার্থনা
করিলাম—প্রভো । আমার নির্মল তোমার কার্যের উপযোগী
হউক । মনে মনে আর একটি প্রার্থনা করিলাম—তাহা বলি
না । তাহার কিঞ্চিৎদূরে, ভূগর্ভে, একটি ক্ষুদ্র সীতা দেবর্বা

একটি মূর্তি স্থাপিত আছে। আমি ইহার ভিতর কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যেন নিখাস বন্ধ হইয়া আইসে। তারাতরনের সাহস হইল না। মুখ পাণ্ডা বলিল, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে সীতাকে এইখানে লুকাইয়া রাখিতেন। তাহার রামায়ণের জ্ঞানও এই পর্য্যন্ত। সীতা এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবরুদ্ধ থাকিলে, রাবণ সবংশে মরিত না, বান্দ্রাকিকেও 'এত শ্রম করিতে হইত না। তিনি এখানেই মরিতেন।

তাহার পর, প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে তপস্তা করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-বধের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটির মত এমন শাস্তিপ্রদ স্থান আমি আর দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, এইটাই প্রকৃত বান্দ্রাকি-কল্পনার লীলাভূমি 'পঞ্চবটী'। এখনও পাঁচটি বট গাছ একস্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও তাহার চারিদিকে নানাবিধ বনরুক রহিয়াছে, এবং দেখিলে এককালে যে এই অধিত্যাকাটি সম্যক অরণ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনতিদূরে আবাবলীর শেখরমালা এক পার্শ্বে আকাশের গায়ে চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। অত্র দিকে রামায়ণের বর্ণনার সার্থকতা করিয়া, এখনও গোলাবরী নদী গদগদ রবে শিলা হইতে শিলাস্তরে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জলপ্রপাত পুষ্পরশ্মি করিতেছে। এক পার্শ্বে নিরিঙ্ক অরণ্যময় ভাবে নানাবিধ বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; অত্র পার্শ্বে তৃণশূভ্র বহুব পর্বতশ্রেণী দৈত্য-বাহের মত ভীমবেশে দাঁড়াইয়া আছে। এক স্থানে জল কিকিৎ গভীর। পাণ্ডা বলিলেন, লক্ষ্মণ এখানে সূর্যপথার নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর এক বিদ্যাবাসীণ। তিনি এক ক্ষুদ্র গর্ত সমূখে কবিয়া বসিয়াছিলেন। তাহার মতে, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে আসল সীতাকে এই কাঁকড়ার গর্ত দিয়া পাতালে

পাঠাইয়াছিলেন ।' বামাযণের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া একটি পয়সা চাহিলেন । এখানে একটি জলপ্রপাতে আমি বড় প্রীতিভরে স্নান করিলাম । জননী শৈলসুতা, নীলমণিহারনিভ সুশীতল বারিধারা আমার মানব দেহে ঢালিয়া দিয়া মন প্রাণ, শবিত্ত করিলেন ।

নর্মদা ।

এক দিন মাত্র নানিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা বেলে কাটাইয়া, আমরা অবসন্ন প্রাণে জব্বলপুর পহছি । সেই রাত্রিতেই তারারচরণ চলিয়া আইসেন । পর দিন প্রাতে আমি নর্মদা দর্শন করিতে যাই । জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান ; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমচ্ছন্ন । প্রথমেই নর্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই । স্থানীয় লোকেবা ইহাকে 'ধুমধারা' বলে । উচ্চ হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া বে জল-কণা উৎকর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয় । সেই ক্ষণে এই জলপ্রপাতের নাম ধুমধারা হইয়াছে । উত্তর পার্শ্বে ষেত শৈলশ্রেণী । তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্মদা প্রগাহিতা । দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্ব-পূর্ণ চরণটি মনে পড়ে ।

“যেবাং ব্রহ্মস্থাপনবিষমে বিজ্ঞাপাদে বিশীর্ণাম্ ।”

অর্থ.—

“বিষম উপল মাঝে—

বিজ্ঞাপাদে শীর্ণা বেবা করিও দর্শন ।”

নন্দদার অস্ত্র নাম বেবা, তাহা তুমি জান। অমুমান পঞ্চাশ
হস্ত উর্দ্ধ হইতে, বহু ধারায় গর্জন করিয়া, নন্দদা ভীষণ বেগে
পতিত হইয়া এই অপূর্ণ জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নন্দদা যেন
অবিচ্যাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুম্বকুম্ভম রাশি বর্ষণ করিয়া বিক্ষাপাদ
পূজা করিতেছেন। জল তুমাববৎ নীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক
কবিত্বশ্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না।
প্রপাতের নীচে, নামিবার সাধ্য নাই। উপরিভাগে বসিয়াও
স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রোতের
বেগ এত প্রখর, কিন্তু চারি অঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা
নাই।

কিরিবার সময়ে, গৌরী-শঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে
এই মন্দির পর্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেগ ও নানাবিধ
বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্র-
মের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখি-
লাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ
করিয়া দেখিলাম—কেশবচন্দ্রের নববিধান। মধ্যস্থলে বৃষাক্রান্ত
হরপার্কর্তী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে
বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারি
দিকে, প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ ককমালা। প্রত্যেক ককে এক
একটি মূর্তি বিরাজিত। অন্ন বেশী সকলেরই ভয়াবহা। পাণ্ডা
ঠাকুর বলিলেন, চৌরটি বোম্বিনী। কিন্তু আমি তাহাতে বোম্বি-
নীর গন্ধও দেখিলাম না। আমি দেখিলাম, অধিকাংশই মাহেশ্বরী
প্রভৃতি বক্তবীজবধের মহাবিদ্যা ছববস্থাপনা হইয়া পড়িয়া আছেন।
মন্দিরটি এক সময়ে গৌরবাগর ছিল, সন্দেহ নাই। এ পর্বতের
সাপ্রদেশ হইতে নন্দদার উত্তরতীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার
শোভা মনোমুগ্ধকর।

• পক্ষত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মার্কলবক' বা মর্শ্বর পক্ষত দেখিতে যাই। এখানে নর্শ্বর উভয়তীরস্থ পক্ষতই মর্শ্বর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-শুল্ক-সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল খেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলধ্বন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব ? গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গলা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরঙ্গী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি। ডিক্টাইট বাঙ্গলাটি এত সুন্দর, এবং স্থানটি এত হৃদয়মুগ্ধকর যে, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে তোমাকে লইয়া যদি কিছুদিন থাকিতে পারি। আমি একখানি জালিবোটে নর্শ্বর গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব ? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের, মর্শ্বরশৈলশ্রেণী উজ্জ্বল পার্শ্ব সর্বল ভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাগূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল তরল অমৃত-খণ্ডের মত নর্শ্বর গর্ভস্থ সর্বসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্ব নানাবর্ণের মর্শ্বর প্রাচীরের ছায়া সেই নীলমপর্ণে প্রতিজাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত এক খণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্শ্বর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর ককই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। ককপ্রাচীর খেত মর্শ্বরের ; ককতল নর্শ্বর সলিলে নীল-রশ্মির। স্থানে স্থানে মর্শ্বরও নর্শ্বর প্রস্রাব অববোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আমার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্শ্বর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নির্মাণ

করিয়া রাখিয়াছেন । এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম । আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপরূপারূপ দেখিতেছি । সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল । সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা । আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিজ্ঞানচলের হৃদয় । বিজ্ঞানতা নশ্বরা হ্রিতা-প্রেমাদ্বিতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কলু কলুরবে কাদিতে কাদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন । অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখন হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ ! অথবা যেন কোন সতী সাক্ষী আকুল হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢানিতে চলিয়াছেন । সতী যে পথে বাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর-রাশিও যেন নির্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া বাইতেছেন । বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, এ এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাসপূর্ণ । নশ্বরের নৌকাবিহার, সে অস্ত দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বাণিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর উজ্জ্বল । একটা বীর পুত্রের বিরাট হৃদয়, অস্ত্রী বাণিকানবোচ্চা বধুর ক্ষুদ্র বুক !

প্রাণ ভরিয়া নশ্বরের এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈল-শেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদনমহল' দেখিয়া আসি । দুর্গাবতীর নাম হুবি 'পলাশিতে'ও পড়িয়াছে ।

"তথালি সময়ে যেন রাণী দুর্গাবতী ।"

ইনি পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া বীররাজা ছিলেন । স্বয়ং যোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন । স্বয়ং অশ্বাচোহিনী হইয়া সমুদ্র সময়ে অদ্বুত বীররূপ দেখাইয়া ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্তিতে পুণ্ডিত করিয়াছিলেন । এই দানবদলনীর দুর্গটির একটা দ্বার অট্টালিকা এখনও বর্তমান আছে । উক্ত শৈলশৃঙ্গের উপরে একখানি

প্রকাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ স্কন্দর দেখায়। পর্বতটীর চতুর্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা কিল ফটিকখণ্ডের মত 'শোভা' পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটীর নাম গড়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিরুপমা স্কন্দর, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিবন্ধিনী 'বীরনারী' আজ কোথায়। বিংশতি কোটী নবাবমে আজ ভারতমাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটি বীরনারী, একটি দুর্গাবতী থাকিত, জননী কি দুর্গোৎসবই হইত। হায়! হায়! দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জগ্রে বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিভাগয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরাগ্ধে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণহত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারাও তাহাদের সম্মানেরা এই জব্বলপুরে আধাঙ্গ থাকিয়া, অপূর্ণ শিল্প কার্য্য সকল করিতেছে। এই বিভাগয় হইতে আমাদের তাঁবু শতরফি ইত্যাদি যাইয়া থাকে। যে হস্ত ২৫০০ বৎসর পূর্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। হহা অপেক্ষা ইংরাজ রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে? ইহার বতই দোষ থাকুক না কেন, আজ ভারতবর্ষে যে সার্ব্ব শতবৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসন্ন-গিরি বিবাক করিতেছে, ভারতমাতা ইহা কখনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ-সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক!

সেই স্বাক্ষিতেই এলাহাবাদ বণনা হই। "পরদিন প্রাতে এখানে পঁহুছিয়া, ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্তবাদ দিলাম। আমার ভাব ভ্রমণযুক্তান্ত শেষ হইল।" কাল প্রাতে 'কলিকাতা' যাইতেছি। যদি সময় পাই, তোমার স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে একখানি পত্র কলিকাতা হইতে লিখিব। স্থানবর্ণনায় সে সকল কথা কিছু লিখিবার অবসর পাই নাই।

ভারত-রমণীর চিত্র।

তুলনায় সমালোচনা।

তোমাকে আমার উত্তর-ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একখানি পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে ২১১ কথা অংশ অন্তে চাহিবে। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কুস্তোদরীদের তুমি দেখিয়াছ, তাহাদের বেশ-ভূষার কথা অবগত আছ। দিল্লী পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ। তবে সে অঞ্চলের রূপসীরা কাপড় একেবারে নাক্তির নীচে নগ্নতার শেষ-সীমায় পড়েন না। কিঞ্চিৎ উপরে কিঞ্চিৎ কসিরা পড়েন। উন্নতি তত তানপুরার অথো-ভাগের মত দেখায় না। তাহার পর পঞ্জাব। পঞ্জাবিনীরা বেশ সুন্দরী। প্রকৃত আৰ্য্য আকৃতি ইহাদেরই আছে। বং যেন হুটিয়া পড়িতেছে। নাসিকা প্রকৃতই গৃধ্রিনীগজিত। তবে মুখের বেথা-বলী আমাদের চক্ষে কিছু অধিক তীক্ষ্ণ বোধ হয়। তাহাদের

পোষাক—পায়জামা, পিরাগ এবং চাদর। পায়জামা হাঁটু হইতে পা পর্যন্ত পায়ের সঙ্গে আট। হাঁটুর উপর টিলা। পিরাগটি প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পড়ে। ওনিলাম, সুনদরীরা শয়ন করিবার সময় পায়জামা একেবারে খুলিয়া ফেলিয়া কেবল পিরাগটি মাত্র অঙ্গে ধারণ করেন। পিরাগটি ইংলণ্ডীয় ললনাদের নাইট সার্জের কার্য্য করে।

বঙ্গ সুনদরীদের মত ইহাদের পর্দা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত ইহারা স্বাধীন এবং সে স্বাধীনতায় কিঞ্চিৎ বীরত্ব আছে। একটি গল্প বলিব। হরিদ্বার হইতে গাড়ী আসিয়া লুঙ্গর ষ্টেশনে পহঁছিল। এখানে অল্প গাড়ীতে ঘাইতে হয়, এবং তাহা আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হয়। আমি গাড়ীর পার্শ্বে প্লাটফর্মের বেড়াইতেছি। এক জন মধ্যবয়স্ক পঞ্জাববাসিনী আমাকে অধিবাসন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পার্শ্বে অসন্ত অধিশিখানিত একটি পূর্ণকিশোরী কস্তা। মুখখানি কি লালগুঁটনোমুখ কমলকোরকের শোভার স্তায় নয়ন মোহিত করিতেছে। অর্দ্ধবয়সী আমার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে আলাপ করিলেন। * * * এই নবীন পরিচিতার সঙ্গে বহুকণ বেষ কোতুকে কাটাইলাম। তাহার পর অল্প গাড়ী আসিয়া পহঁছিল। আমার গাড়ীতে ত্রিনিষ তুলিয়া আমি দ্বারের কাছে প্লাটফর্মের দাঁড়াইয়া আছি ; পিঠে কি কোমল হাত লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, মাতা ও কস্তা। যুবতী বলিলেন,—সাহেব! আমাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া দেও। আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। তখন হকুম হইল,—“আমার বৃদ্ধ পিতাকেও তুলিয়া দিয়া আইস।” আমি বলিলাম, “আমি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে কি একবারে চিনিব ?” এমন সময়ে বৃদ্ধ আসিয়া জীলোকের গাড়ীতে একটা মোট দিয়া ছুটিল। কোনও গাড়ীতে স্থান নাই। বৃদ্ধ,

লোকের গোলে পড়িয়া গেল। যুবতী চীৎকার। করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, “তুমি আমার বাপকে উঠাইয়া দেও।” আমি দেখিলাম, আমার মন্দ হাকিম জোটে নাই। গাড়ীতে স্থান নাই। ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একখানি গাড়ী জুড়িয়া লইলাম। তখন বহুতর অস্ত্র লোকের সঙ্গে বৃদ্ধ উঠিল। সন্দেহী আবার আমাকে তলপ দিলেন। বলিলাম, “তোমার বাপ উঠিয়াছে।” প্রশ্ন—“তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?” উত্তর—“দেখিয়াছি।” তখন তিনি আমাকে ছাড়িলেন। শুনিলাম, তিনি একজন মহাজনের বনিতা। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমি বেড়াইবার সময় আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। তিনি জলন্দরে নামিয়া গেলেন, আমি লাহোরে চলিয়া গেলাম।

আমি কাশ্মীর যাইবার অবসর পাই নাই। নীতে যাইবারও সুবিধা নাই। অতএব কাশ্মীরকুহুমবাশি আমি বড় এড়াই দেখি নাই। তবে যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহাতে তাঁহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। তাঁহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পুরুষে পুরুষে ভাব, যদিও রং অতুলনীয়, এবং শুনিলাম, তাঁহারা নিতান্ত অপরিষ্কার। সকলে বলিলেন, ইহাদের অপেক্ষা শিম্লা-অঞ্চলবাসিনী হিমালয়কন্তারাষ্ট স্নন্দরী। ইহাদিগকে পাহাড়িয়া বলে। তাহার একটিমাত্র আঁখি দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রভুলের বাড়ীর পার্শ্বে একটি পাহাড়িয়া গৃহস্থ বাস করেন। তাহার একটি কন্তা সর্বদা প্রাচীরের সে পাশে দাঁড়াইয়া, প্রভুলের দাসীর সঙ্গে কথা কহিত এবং প্রায়ই সে ও তাহার মাতা, নানী কাষ কর্তৃক করিয়া বেড়াইত। যরি। যরি। কি রূপ। আমি অমন রূপ যেন কখনও দেখি নাই শুনিলাম, তাহার নাম পার্কতী এবং সে রূপেও ঠিক আমাদের পার্কতী। তাহাকে দেখিয়া আমি বুলিলাম, আমাদের

শাস্ত্রকার খেন আমাদের উমাকে হিমালয়ের কস্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাহাকে অম্বর এবং সিংহের পিঠে চড়াইয়া দিলে, সে একটি জীবন্ত পার্কতী হইবে। রূপে, লাবণ্যে, বর্ণে, শরীরের দৈর্ঘ্যে, সে যেন দক্ষ শিল্পকরের নির্মিত একটি অপূৰ্ণ প্রতিমা। দূর হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছিল, তাহার এই প্রথম যৌবন; একে যে ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে আমার বোধ হইত,—সে একটি ফুল অপেক্ষা ভারি হইবে না। মরি। মরি। কি মুখ, কি চোক, কি নাসিকা, কি বর্ণ, কি ক্ষুদ্র অবয়ব, সর্বশেষ কি মধুমাখা দ্বিবে হাসি। তাহাকে আমি যতবার দেখিতাম, আমার বোধ হইত, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার পোষাক পঞ্জাবী রমণীদিগের মত। তবে কখন কখন হিন্দুস্থানীদের মত সাড়ীও পরিতে দেখিতাম।

০ তাহার পর রাজপুতানা যাই। কি জয়পুরের, কি ঘোষপুরের, কি আজমীরের, কোন স্থানের রাজপুতানা আমি সন্ধানী দেখি নাই। কেবল চিতোরের রমণীরা একরূপ ইহার ব্যতিক্রম। মাড়ওয়ারের রমণীরা সৰ্ব্বাপেক্ষা রূপহীন। রাজপুতানীদের পরিধান ঘাঘরা, কাঁচুলী ও ওড়না। ঘাঘরাটিও আবার এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, এবং ঊলঙ্গ না হইয়া যতদূর সাধ্য, তত দূর নাভির নীচে ঘাঘরার সম্মুখটি নামাইয়া পরিয়া থাকে। অতএব কুশাঙ্গিনীরা ছাঁড়া, অল্প মহিলারা বেহার-অঞ্চল-বাসিনীদের ন্যায় মহোদরী। কাঁচুলীও একরূপ ভাবে পরেন যে, ভারতচন্দ্রের কদম্বের ও দাড়িম্বের নিম্নের এক তৃতীয়াংশ তাহার বাহিরে থাকে, এবং তাহাতে বন্ধনের দাগ থাকে।

তাহার পর গুজরাটে চল। বরদার গুজরাীদের রূপ বর্ণনীয় নহে। যে দিক চাহিয়া দেখ, টেশনের মেথরাণী পর্যন্ত নয়ন আকর্ষণ করিয়া দিবে। গুজরাতির “উবজবজন” ত আছেই তাহা

ছাড়া, ইহাদের মধ্যে, 'তম্বী শ্রামা' প্রায় দেখিতে পাইবে না। গাইকোয়ারের মৃত্যু মহিষী লক্ষ্মীবাই হইতে পথের ভিখারিণী পর্যন্ত সফসই হুন্দরী। ইহারা বোহারের জীলোকদের মত সাড়ী পরে, তবে শ্রাক্টি তত নীচে গড়ায় না। কেবল ভারতচন্দ্রের কামদেবের প্রবেশার্থ, 'নাভিকূপ' মাত্র অনাবৃত থাকে। মুসলমান সাত্ত্বাজের তরঙ্গ রাজপুতানার দক্ষিণে বড় আইড়ে নাই। মাঝ-ওয়ার ছাড়িয়া আসিলে অবগুষ্ঠন আসিয়া পড়ে; তখন আর বমণী, অবগুষ্ঠন মধ্যে বদনচন্দ্র ঢাকিয়া, দর্শকের কোতূহল বৃদ্ধি করে না। জীস্বাধীনতাও ক্রমশঃ এখান হইতে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, দেখা যায়! আর এক-পা অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে একেবারে চাঁচের হাট। মহারাষ্ট্রমহিলারা এখন 'কাম-রঙ্গ পরিহারি রণরঙ্গে নাই বা মাতুন, তবে সেই পশ্চাৎ-কোঁচা-আঁটা বসন পরিধান, সেই অবগুষ্ঠনশূন্য প্রফুল্ল পদ্মমুখ, সেই অসঙ্কোচ গমন দেখিলে, ইহারা এক কালে যে রণরঙ্গে মাতি-তেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। মস্তকমুণ্ডিত, পর্কতবৎ-পাগড়ী-সজ্জিত, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষদিগকে দেখিতে বড় ভাল দেখায় না, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গনারা পরম রূপসী। তাঁহাদের কেবল কপোলদেশটার অস্থিটা ঘেন কিঞ্চিৎ বেশী পরিদৃশ্যমান। তাঁহাদের বসনপরিধানের নিয়মটাই কেবল স্বতন্ত্র; একরূপ নহে; তাঁহাদের কবরীবন্ধনেও কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। কবরী এক-বেণীবদ্ধ করিয়া তাহা চক্রাকারে পশ্চাৎ দিকে বাধা হয়। মাথার পশ্চাতে ঘেন একটা চাঁচর চক্র,—প্রেমকাসির গ্রন্থি। প্রাণে প্রাণে যে কিরিয়া আসিয়াছি, সে কেবল ভোমার কপালের জোরে। মহারাষ্ট্রীয় হুন্দরীরা সর্বত্র অধলীলাক্রমে বিবাজ করেন; কি উজ্জানে, কি বাস্তহানে, তাঁহারা সমুখ কোঁচার অগ্রভাগ বাম-হস্তে লীলা করিয়া শরিয়া, পাছকাশূন্য চরণে বিচরণ করিয়া

বেড়ান। সঙ্গে কিন্তু একটি পুরুষ মানুষ থাকেন। এ দৃষ্ট ঘোমটা মধ্য হইতে উঁকি-বিক্ষেপিনী বঙ্গমহিলাদের ও তাঁহাদের আড়োঁঠারে-দৃষ্টি-সঞ্চালনকারী রসিক পুরুষদিগের দেখিবার যোগ্য, শিখিবার যোগ্য। এই পুণ্যবতীদের দর্শনেও মনে কি এক অনির্বচনীয় আনন্দ এবং পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। রাজস্থান ছাড়িয়া গেলে আমার বোধ হইল, যেন সম্পূর্ণ একটি সৌন্দর্য্যপূর্ণ নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। কবি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল। কথাটা বড় গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসিশূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহহীন, এত আনন্দশূন্য। যখন রাজ্য আমাদের আর যে সকল অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। নিপীড়িত হিন্দুধর্ম্ম মাথা তুলিয়াছে, ব্যক্তি গত নিপীড়ন সমাজহনন স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে এই দ্বী-অবরোধস্বরূপ যে অর্দ্ধজ বা পক্ষপাত রোগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার উপসর্গে সমাজ এই ৭০০ বৎসর পুরেও মাথা তুলিতে পারিল না।

কেবল মহারাজ্যীদের মধ্যে বলিয়া নহে, পার্শীদের মধ্যেও এই পাপ প্রবেশ করে নাই। তাহাদের রমণীরাও রূপে চারিদিক আলোকিত করিয়া সর্বত্র বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হিন্দু-মুল্লারীরা চম্পকবরণী। পার্শী রূপসীদের বর্ণ সত্ত্বঃপ্রস্ফুটিত শিশিরসিক্ত পদ্ম ফুলের মত। ইহুদীরা ভিন্ন ইহাদের তুলনায় স্থান আর নাই। ইহাদের সাদীই বোম্বাই সাদী। সাদীর উপর একটি মলমলের আঁজানুলম্বিত পিরাণ; তাহার উপর জ্যাকেট্। ইহারা মাথার চুল ঢাকিয়া একখানা সাদা কুমাল বাঁধিয়া তাহার উপর খোঁপা মাত্র ঢাকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন। পিরাণের দৈর্ঘ্য এবং কাল চুলে সাদা কাপড়ের বন্ধনটা যেমন আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে পৌছি। যে পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উঠি, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পাঁচ সহোদর। পাঁচটি স্ত্রীই সুন্দরী। আমি মাথা ধুইয়া উপরে যাইতেছি, নীচে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় একটা বালিকা বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ডাকিলে সে এক লক্ষ দিয়া আমার বুকে উঠিয়া পা ত্রুখানি দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কি বলিতে লাগিল। বুলিলাম একটি কথা দক্ষবীণা (দক্ষিণা)। তাহার নাম ভগ্না। বয়স ৬৭ বৎসর; বিবাহ হইয়াছে তিন বৎসর। বালিকা দিনে শস্তরবাড়ীতে, রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকে। আর এখানি জৈবংশ্রাম বদন পাশের কক্ষ হইতে উকি মারিতেছিল। ভগ্নাকে তাহাকে ডাকিতে বলিলাম। সে হিহি করিয়া হাসিয়া, বীণার পঞ্চমে ডাকিল—“রুকু! ইকি আ।” রুকু আসিল। তাহার বয়স ৮ কি ৯ বৎসর হইবে। বড় সুন্দরী। তাহাকে আমার কাছে ডাকিয় আনিলে সে বিক্ষিপ্ত সগজ্জভাবে দাঁড়াইয়া, অমনি হাত বাড়াইয়া বলিল—“দক্ষবীণা”। অমনি তাহার হাতুড়ী আসিতেছে বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি উপরে গেলে আবার যাইয়া বলিল “দক্ষবীণা”। যাইবার সময় দিব বলিলে বলিল, তাহার হাতুড়ী দেখিবে, সে আসিতে পরিবে না। তাহার পর দুটিতে সিঁড়ির উপর বসিয়া কত গান গাহিতে লাগিল। আমি কাছে গেলে ভগ্নাটী গলায় জড়াইয়া ধরে, রুকু পালায়। সে এ বাড়ীর পুত্রবধু। অতএব দেখিলে, ইহাদের মধ্যে বালা-বিবাহ যেরূপ ভাবে প্রচলিত; শুনিলে সমাজসংস্কারগণ মুচ্ছা যাইবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জাতি-সংস্কার না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে স্বামীর সংস্কার হয় না। ইহাড়া পাকান ব্যাপার আমাদের বঙ্গদেশের লোকে যেমন যোক মনে করেন, ইহাটা সেরূপ মনে করেন না। এই জন্তই বঙ্গদেশের রমণীরা অকাল-

কুস্মাণ্ড হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভে বৃক্ষা, ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই বরিষা পড়ে।

পতিপত্নীর জীবনের সুখ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়; তাহা ছাড়া সন্তানেরা ক্ষীণপ্রাণ, ও রোগগ্রস্ত হইয়া, পিতা মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ভগবান কতদিনে সমাজকে এ পাপের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে আহার করিতে বসিলাম। সম্মুখে পাতা দেখিয়া আমি হাঁসিতেছি দেখিয়া, সুন্দরী তাহা উঠাইয়া লইয়া আমাকে একখানি থালা দিলেন। আমরা খাইতে বসিলাম। সুন্দরী পরিবেশন করিয়া সম্মুখে বসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। এ আলাপ—

“সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা।”

তিনি হিন্দু বুঝেন না, আমি মহারাষ্ট্রীয় বুঝি না। প্রেমিক খুড়া গাইয়াছেন—

“নয়নে নয়নে যদি হৃদয়ে হৃদয়ে,

বাণির বাঁধে রোধে কি হে অসীম সলিলে ?”

হৃদিমানব হৃদয় যদি কথা কহিতে চাহে, ভাষা তাহার প্রতি-বন্ধকতা করিতে পারে না। আমরা নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। ঠাকুরাণীটির নাম অম্বা। সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “নারায়ণ না দিলে কি করিব ?” আমি বলিলাম, নারায়ণের দিবার এখনও বিস্তর সময় পড়িয়া আছে। তিনি আমার নাম শাম, সর্ব শেষ লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া আসিয়াছি কেন, তাহারও কৈকিয়ৎ চাহিলেন। পুত্র-টির কথাও অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পা ছড়াইয়া সম্মুখে বসিয়া একপে ভ্রমৎ হাসিয়া হাসিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত-

নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, বীণার কোমল স্বর-মালা সংমিলিত করিয়া, আলাপ করিতেছিলেন, আর সময়ে সময়ে আমাকে “গাউল দে। ওয়ারণ দে” (ভাত দি, ডাল দি) বলিতেছেন। যদিও খাইবার কিছুই ছিল না, তথাপি সে ডাল ভাত কি আনন্দেই আহাৰ করিলাম।

শুইলাম। পূনা হইতে দীর্ঘকাল বেলবিহারে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুইবামাত্র নিদ্রা আসিল। রাত্রি ১০।১১টা হইবে। নীচে রমণীকণ্ঠেরও হাসির মিশ্রিত ভরঙ্গ উঠিয়াছে। আমি উঠিয়া একটা প্রয়োজনে নীচে গেলাম। মরি—কি দৃশ্য! ইহারা আমাকে “ধনী” বলেন। কথাটা সার্থক। এরূপ রূপরত্ন বাহাদেব, তাহারা ধনী বই কি? সংসারের সারস্বত রমণীস্বত। বাহাদেব “ধনী” বাড়ী আছেন, তাঁহারা আপন আপন কক্ষে গিয়া ধনভোগ করিতেছেন। তিন স্তম্ভর “ধনী” বাড়ী নাই। ইহারা এক প্রদীপের আলোকে বসিয়া, হাঁটু হইতে পায়ে এ রাত্রিতে তৈল মাখিতেছেন, হাসিতেছেন, গল্প করিতেছেন। রূপ, আনন্দ, বীণার স্বর ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া এই আনন্দবাজার দেখিলাম, চলিয়া গেলাম। তাঁহারা কোনও সঙ্কোচই মনে করিলেন না। তারাতরগেরও নিদ্রাতঙ্গ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে অম্বাদেবী, তাঁহার পশ্চাতে প্রদীপ হস্তে অন্য এক স্তম্ভরী, আমাদের কক্ষদ্বারে আসিয়া হাসিতে লাগিলেন। না বুদ্ধি হাসি, না বুদ্ধি ভাষা। মহা বিপদে পড়িলাম। তারাতরগের মুখ শুকাইয়া গেল। অম্বাদেবী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, আমার বিছানা শুকাইতে বলিলেন। আমি শুকাইতেছি, তিনি বিছানা-বৎ ছুটিয়া যাইতে শ্রীচরণ একখানিতে তড়িহিত হইলাম। তিনি একটা চোরকুঠারি খুলিলেন, এবং সেখান হইতে একটা বিছানার তড়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন। লোপা-

নের শীর্ষ-দেশস্থা স্বীপহস্তা স্তম্ভরীও হাসিতেছেন। উভয়ের সে উচ্চ হাসি, সেই উচ্চ রসিকতাপূর্ণ কথা, হৃর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বুঝিতেছি না। তাবাচরণ ভয়ে কাঁপুক, আমি ভাবিলাম, মেয়ে মানুষের কাছে অপ্রস্তুত হইব কেন, দাঁড়াইয়া সে হাসিতে যোগ দিলাম। তাবাচরণ চীৎকার করিতে লাগিল,—“আরে ও বাবু বৈস!” আমি বলিলাম, “ভয় নাই; হরনেন্ত্রানল নহে, আমরা কামদেবের মত ভয় হইব না।” রমণীদের রঙ্গরসও কিছুই বুঝিতেছি না, কিন্তু তাবাচরণ যেন ঠিক হই কাসিকাঠের মধ্যে অবস্থিত। হই দিকে হই স্তম্ভরী। পলাইবারও পথ নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব কাটিয়া যাইতেছিল। বোধ হয় রমণীরাও তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমাদের একতরফা সমাজের কল্যাণ ভদ্ররমণীর কাছে পড়িলে বাকালীকে কি বিভ্রাটেই পড়িতে হয়। দেবীরা একটি বালিশ লইয়া, বাকি বিছানা ছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম,—“কেমন তারা। ইহাদের ‘ধনীদেব’ আজ বাড়ী না থাকাকাটা ভাল হয় নাই।” এতক্ষণে তাহার মুখে হাসি আসিল, বিপ্লব কাটিয়া গেল। স্তম্ভরীরা নীচে গেল বোধ হয়, এক জন পুরুষ আসিয়া, অতিথি বাড়ীতে আছে, তথাপি এইরূপ হৈ-বৈ করিতেছেন বলিয়া ভৎসনা করিল। তাহার পর গৃহ নীরব হইল। পর দিন অম্বাদেবী আরি বড় কাছে ঘেসিলেন না। একবার বিষন্ন ভাবে দূর হইতে দেখা দিয়া, যেন নয়নের ভাবে বলিলেন, “পোড়ার মুখ! তুমি আমাকে গাল খাওয়াইয়াছ।” এ বেলা প্রদীপধারিণী আমাদের অন্নপূর্ণা হইলেন। তিনি অম্বাদেবী অপেক্ষা প্রাচীন। আহা করিতেছি, আহা কি দৃশ্য! নীচে একটা বকুলবৃক্ষের তলায় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া, একটা গৃহলক্ষ্মী তাহা প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকবার ঘুরিয়া

আসিয়া, গ্রন্থকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম যৌবনের উত্তম ওৎসাহিত রূপ, তাঁহার সেই ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ, মুখশ্রী, সেই চক্রাকার ভ্রমণ, সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই কঙ্ক-আন্দোলন, সেই পদসঞ্চালন, আমি এ জীবনে ভুলিব না। তিনি সঙ্ক-জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহধর্মিণী, গৃহের শ্রেষ্ঠ বন্দী। তুনিলাম, প্রতি-দিন এ পরিবারের মঙ্গল কামনা করিয়া, এক্রূপে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করেন। বুঝিলে কি একবার কাণ্ডখানা কি? বঙ্গদেশে এ প্রভৃতি দৃশ্য একদিন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন সে স্বর্গ বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবন্দীদের স্বামী এখন গুরু নহে, দেবতা নহে, একটি সামান্ত শাসনের বস্ত। স্বামীর পরি-বার পরম শত্রু। তাঁহার ধর্ম এখন স্বামীশাসন, * * * কিংবা স্বামীর চরিত্র সমালোচন করিতে করিতে ২৪ বার অঙ্গুলীভঙ্গী, ২৪টি সাপের মস্তের মত মস্তশাঠ! এক্রূপ ভাবে যদি কাহাকেও একখানি ধর্মগ্রন্থ ২৪ বার প্রদক্ষিণ করিতে বল, তখনই ডাক্তার ডাকিতে হইবে; মাথায় বরফ ঢালিতে হইবে। আমরা সভ্য হইতেছি, উন্নত হইতেছি, এবং অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি। এই স্বামীর এই প্রদক্ষিণরত দেখিয়া, সন্দেহ আমার কি পবিত্র, কি মহিমাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের এ সকল সীতা সাবিত্রী কোথায় গেল?

আহার করিয়া আমরা রওনা হইলাম। কাপড় পরিতেছি, প্রদীপধারিণী বড় কোমল স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমরা কি সভ্য সভ্য আজই যাইবে? আমি বলিলাম,—“তোমাদের স্নেহের জন্ত ধন্যবাদ, আজিই যাইব।” তাহাদের শাণ্ডীর হস্তে বধূদের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া, আমরা বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি দোকানে একটি ঘাটী কিনিলাম।

যখন গাড়ীতে উঠিতেছি,—অপরদিকের দোকানে দাঁড়াইয়া কে ?—সেই প্রদীপবারিণী !

তাহার পর নন্দনা । এখান হইতে অবরোধপ্রথার আরম্ভ হইয়াছে । যে পাণ্ডার বাড়ীতে আহার করিলাম,—ঘরখানি কুটীর, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন !—পাণ্ডা বলিলেন, আমি সঙ্গীক থাকিলে ব্রাহ্মণীরা বাহির হইতেন ।

নন্দনা হইতে প্রয়াগ, প্রয়াগ হইতে উষায় হাবড়া পহুছিয়া, সেহু বাহিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, দুই ধারে উষাস্বরূপিণী বঙ্গদিগ্বরীণণ অবগাহন করিতেছেন । তখন মনে হইল,—

“কে চাম্র থাইতে মধু বিনা বঙ্গকুহমে ?

কোথা হেন শতদল,

বুকে করি পরিমল,

থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?

বঙ্গকুল বধু বিনা মধু কোথা কুহমে ?”

সম্পূর্ণ !

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও দেবীমাহাত্ম্যচণ্ডী সম্বন্ধে

পূর্বভাষ ।



গীতা ও দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডীর মূল এখন চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছে । আমরাও বহু পূর্বে এই দুই খানি পুস্তকের মূল সংস্কৃত অংশ অনুবাদসহ উপহার দিয়াছিলাম । সুতরাং এখন আর মূলের পুনঃ প্রচার আবশ্যক বোধ করি না । বিশেষতঃ কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ কতদূর মূলানুযায়ী তৎপ্রদর্শনের কিছুমাত্র প্রয়োজন অল্পভূত হয় না । এ অবস্থায় আমরা মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া শুদ্ধ নবীনচন্দ্রের রচনা অর্থাৎ তাঁহার অনূদিত কবিতাগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম । যদি কাহারও কৌতূহল জন্মে নির্দিষ্ট অঙ্ক-সংখ্যানুসারে অনায়াসে মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন ।

প্রকাশকতা ।

সর্বোপনিষদোগীবোদোক্তা গোপালমন্দনঃ ।

পার্শ্বোবৎসঃ স্বধীৰ্ত্তোক্তা দুষ্কং গীতামৃতং মহৎ ॥

গীতামাহাত্ম্যম্ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

—*—

আমি মূখ, ভগবদ্গীতার মৰ্ম্ম কি বুঝিব ? গীতা জগতের
অদ্বিতীয় ধৰ্ম্মগ্রন্থ ? গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

“আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল

সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন ;”

তেমনি জগতের বাবদীয় ধৰ্ম্মগ্রন্থগণি এই গীতা সাগরে বিলীন
হইয়া যায় । কাব্যংশেও গীতা অতুলনীয় । ইহার অভিনেতা স্বয়ং
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শারতের অদ্বিতীয় ধৰ্ম্মদ্বয় অজ্ঞান । স্থান—
ধৰ্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র । সময়—মহাভাবত-যুদ্ধের পাবস্ত । দৰ্শক—
ভাবতের সৰ্ব্বজ্ঞ যুদ্ধার্থী নৃপতিমণ্ডল । বিষয়—কর্তব্য-পরামর্শ
অর্জুনের কর্তব্য কৰ্ম্মে বত করা । ইহা গীতার গোণ উদ্দেশ্য ।
অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মহিম করিয়া জ্ঞানবজ্রাতির অস্ত্র পরম ধৰ্ম্মামৃত বা
চরম মনুষ্যত্ব ইষ্টাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য । কাব্যে এবং
ধৰ্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই
উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য । গীতোপনিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের
নাম—নিকায় ধৰ্ম্ম ।

এই নিভামত্ব বা কামনার নির্কারণই বোদ্ধ ধর্মের—নির্কারণ ।

কি প্রণালীতে এই মহৎ ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, কি যুক্তি গীতোক্ত তত্ত্বরত্নরাশি গ্রথিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কোন কোনটী সর্বপ্রধান, তাহা একবার সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

১ম অধ্যায়—সৈন্যদর্শন ।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কোঁরব পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন । ভাবতবর্ষের সমগ্র নৃপতিমণ্ডল ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছেন । এ ত সময়ে অর্জুনের ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ লইয়া গেলে অর্জুন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদায় আত্মীয়স্বজন-যুদ্ধার্থে উপস্থিত । তিনি বলিলেন—

“হই বা নিহত যদি ইহাদের কেহে আমি, হে মধুসূদন !

তুচ্ছ মহা, ইহাদেবে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে বধিতে কখন ।” ৩৫

তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া ধনুর্কোণ ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে রথে বসিয়া রহিলেন ।

২য় অধ্যায়—সাহচর্য্যযোগ ।

ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন যে, এক্ষণ সহটসময়ে তাঁহার এক্ষণ মোহ ও ক্লীবত্ব আর্য্যে অযোগ্য । কিন্তু অর্জুন বলিলেন, তিনি গুরুগণ বধ না করিয়া বরং তিত্তা করিয়া থাকিবেন । তাঁহার এই ইন্দ্রিব-শোষক শোক ধরার রাজ্যে, কিংবা সুর-রাজ্যেও বিমোচন করিতে পারিবে না । অতএব—

“পরস্তপ ধনঞ্জয় কহিলেন পদ্মনাভে—

করিব না যুদ্ধ আমি, রহিলেন মৌনভাবে ।” ৩৬

তখন ভগবান্ সহাস্তবদনে তাঁহাকে আদৃত গীতোক্ত ধর্ম প্রবাহিতে আরম্ভ করিলেন । এইখানে গীতা আরম্ভ হইল ।

তিনি বলিলেন, অৰ্জুন জ্ঞানী হইয়াও, যে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহাতে শোক করিতেছেন। এ কথাটি তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। তিনি প্রথমতঃ বুঝাইলেন যে, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, কেবল দেহ মাত্র অস্থায়ী হয়। অতএব আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আত্মাও কৈবাহকে বধ করেন না। মানুষের দেহে ঘেরূপ কোমার, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র।

“যথা জীর্ণ বাস করি পরিহার,

করে নব নব বসন গ্রহণ ;

তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ,

করে অল্প নব শরীর ধারণ ।” ২২

দ্বিতীয়তঃ, যদি মনে কর, আত্মা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, তথাপিও শোক অনুচিত। কারণ—

“জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু মরিলে জন্ম নিশ্চিত,

অপরিহার্যের তরে শোক তব অনুচিত ।” ২৩

তৃতীয়তঃ—

“আদিতে অব্যক্ত থাকে, মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত ;

নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ; তার তরে কিবা বেদনা ভারত ?” ২৪

বুঝাইলেন, আত্মা নিত্য। তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। আর দেহ আদিতে অব্যক্ত থাকে বলিয়া ত কেহ শোক করে না। তবে নিধনে অব্যক্ত হয় বলিয়া শোক করিবে কেন ?

তৃতীয়তঃ, অল্প কারণে না হইলেও নিতাস্ত—

“অধর্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,

ধর্মযুক্ত হ’তে শ্রেয় করিষের নাহি আর ।” ৩১

কুক্কেত্রেয় যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ । ইহার উদ্দেশ্য পরমহরণকারী
জ্বাচারের দমন ।

ভগবান্ বলিলেন—

“আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্মরণ,
হারা’য়ে স্বধর্ম, কীর্তি, পাশে হবে নিমগন ।” ৩৩

ইহার নাম সাধ্যাযোগ বা জ্ঞানযোগ । তিনি বলিলেন, ভোগ
ঐশ্বর্য ইত্যাদি ফল কামনা করিয়া যে কর্মাদি করা যায়, তাহাতে
চিত্ত বিষ্মতে সমাহিত বা স্থিরীকৃত হয় না ।

“সকাম সকল বেদ, অর্জুন । হও নিকাম,—

যোগী, নিত্য ব্রহ্মে স্থিত, বন্দ্যহীন, আশ্রয়ান্ ।” ৪৫

কারণ, কর্ম হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ—

“বহু কূপে হয় যাহা, পারে এক পারাবাহে সাধিতে সকল ।

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান পারে তত্ত্ব প্রদানিতে সর্ব বেদফল ।” ৪৬

তবে কি কর্ম করিব না ? করিব ।

“কর্মে তব অধিকার, নহে কলে কদাচিত ।

তেনাগিবে কর্মফল, কর্মত্যাগ অমুচিত ।” ৪৭

অতএব—

“শ্রব হঃখ সমজ্ঞানে, লাভালাভ, অসাজয়,

কর যুদ্ধ তুমি, পাপ হইবে না ধনজয় ।” ৩৮

এরূপ যোগ অবলম্বন করিলে ভোমার জ্ঞান ব্রহ্মতে স্থিত
হইবে, অর্থাৎ তুমি স্থিত প্রজ্ঞা লাভ করিবে ।

তখন অর্জুন বিজ্ঞাসা করিলেন “স্থিতপ্রজ্ঞ” ব্যক্তির লক্ষণ কি ?
ভগবান্ বুঝাইলেন—

(১) “মনের কামনা সর্ব করি পার্থ । পরিহার,

আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার । ৫৫

(২) “কুর্শ্বের অঙ্গের মত, কবিবাবে সঙ্কুচিত,

যে পারে ইন্দ্রিয়গণ, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৫৮

(৩) “সংযত-ইন্দ্রিয় হও মৎপর ও যোগস্থিত ।” ৬১

অর্থাৎ (১) নিকাম, (২) জিতেজ্রিয় এবং (৩) ঈশ্বরপদায়ণ
যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ ।

“আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল,

সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন ;

তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,

সেই পায় শান্তি, নহে কামীজন ।” ৭০

৩য় অধ্যায়—কর্মযোগ ।

• অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্মযোগ হইতে জ্ঞান-
যোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এ ঘোর কর্মে নিয়োজিত
করিতেছেন ?

• ভগবান্ কহিলেন, কর্ম না করিয়া লোক নৈকর্ম্য লাভ করিতে
পারে না । বিশেষতঃ—

“অকর্ম্মা থাকিতে কেহু নাহি পারে কদা চিত ।

স্বভাব গুণেতে সবে হয় কর্মে নিয়োজিত ॥” ৫

অতএব প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম করিতে হইবে ।

• “কিন্তু আত্মাতেই বস, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,

আত্মাতে সমুপ্ত সদা, তার কার্য্য নাহি আর ।” ১৭

যতদিন সে অবস্থা না হইবে তত দিনে নিকামভাবে কর্ম
করিতে হইবে । তত্ত্বিন্ন লোকশিকার জন্তে নিতান্ত তোমার
কর্ম করা উচিত । কারণ—

“যাহা আচরিবে শ্রেষ্ঠ করে তা ইত্যর জন ।” ২১

স্বয়ং জৈত্ব কৰ্ম করিতেছেন—

“আমার কর্তব্য পার্থ ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিৎ—

অপ্রাপ্ত, প্রাপ্ত্য নাহি, তবু আমি কৰ্ম্মাবিত।” ২২

কেন ?

• “আমি কৰ্ম্ম না করিলে হবে সব উৎসাদিত।” ২৪

অতএব সকলেরই কৰ্ম্ম করা উচিত। তবে অজ্ঞানীরা যে কৰ্ম্ম সন্ধ্যাভাবে করে, জ্ঞানীরা তাহা নিকামভাবে করিবে।

ভগবান্ কহিলেন—

“আমাতে সকল কৰ্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে করি সমর্পণ,

নিকাম, মমতা-হীন হয়ে, নির্বিকারচিত্তে কর তুমি রণ।” ৩০

তুমি যে হৃষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ করিতেছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছ না, তাহা কল্লিষের ধর্ম্ম নহে। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তাহা ভাল হইলেও—

“সত্ত্বং স্ন-অহুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ’তে শ্রেয় স্বধর্ম্ম বিত্ত্বং।

স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ তথাপি, অর্জুন !” ৩৫

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত-বিকার জন্মাইয়া পুরুষকে কে অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে ? উত্তর—কাম এবং ক্রোধ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিবে।

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞানকৰ্ম্ম-বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব হই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং কৰ্ম্মযোগ বুঝাইয়া ভগবান্ এই অধ্যায়ে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতেছেন। বৃথালাভ, ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ জৈত্বের কৰ্ম্মকল সমর্পণ করিয়া কৰ্ম্ম করাই কৰ্ম্মযোগ। কিন্তু কোনটী স্নকৰ্ম্ম, কোনটী হকৰ্ম্ম, এবং কৰ্ম্ম-হীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব ? যখন লোকের

‘একরূপ হরকথা হয়, যে স্বকর্মে হৃৎকর্মে প্রভেদ বুঝিতে পারে না,
অর্থাৎ সংসার হইতে ধর্মজ্ঞান তিরোহিত হয়—

“যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্মের গ্লানি,

অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি । ৭

“সাধুদের পরিভ্রাণ, বিনাশ হৃৎকৃতদের কঠিতে সাধন,

স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ ।” ৮

তখন ভগবান্ শরীর গ্রহণ করিয়া মানব-জাতিকে প্রকৃত ধর্ম
অথবা প্রকৃত কর্তব্যজ্ঞান শিক্ষা দেন । আর যদি বল যে, তাহা
লাভ করা বহু জ্ঞান এবং তপস্যার ফল, তথাপি—

“যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি ।”

কারণ—

“পার্থ ! সর্বরূপ নর মম পথ অমুগামী ।” ১১

লোকে দ্রব্যাদি দ্বারা নানারূপ বাগ যজ্ঞ করে এবং যোগ
সাধন করে । কিন্তু—

“‘দ্রব্যময় যজ্ঞ হ’তে জ্ঞানযজ্ঞ প্রেরাবিত ;

সর্বরূপ কর্ম, পার্থ ! জ্ঞানে হয় সমাপিত ।” ৩৩

সে জ্ঞান কিরূপ—

“যে জ্ঞান লভিলে পুনঃ না হয় মোহ, পাণ্ডব !

আত্মার আত্মাতে যাহে দেখিবে সংসার সব ॥” ৩৫

কিরূপ হইলে তাহা পাওয়া যায় ?

“তৎপর, সংযতেজিষ, শ্রদ্ধাবান্ লভে জ্ঞান ।

লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি নিদান ।” ৩৯

৫ম অধ্যায়—কর্ম-সম্যাসযোগ ।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভার্থ কর্ম-ত্যাগের নাম সম্যাস । ঈশ্বরে ফল
সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ফল-কাযনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করার নাম

কৰ্মযোগ। অৰ্জুন জিজ্ঞাসা কৰিলেন, এ দুটীৰ কোনটো শ্রেয় ?
ভগবান্ কহিলেন, উভয়ই শ্রেয়স্কৰ, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা
কৰ্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাধ্যযোগ ও কৰ্ম-যোগ পৃথক্ নহে—

“সাধ্যো পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে যায় ;

অভিন্ন সাধ্যা ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তায় ।” ৫

কৰ্মযোগ-বিহীন সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ। কেননা
কৰ্মযোগী সৰ্বভূতে পরমাত্মাকে দেখে, এবং সে মনে করে,
ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্যবিষয়ের জন্তে ইন্দ্রিয়েরা কৰ্ম কৰিতেছে।
অতএব সে কৰ্ম কৰিয়াও সন্ন্যাসীর মত কোন কৰ্মে লিপ্ত হয় না।—

“ব্রহ্মে সমর্পিষ্য কৰ্ম, নিকাম যে কৰ্ম্মবত ;

না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্বপত্রে জল মত ।” ১০

সে কেবল আত্ম-তৃষ্ণার নিমিত্ত কৰ্ম কৰে মাত্র। সে জানে—

“নবের কর্তৃক, কৰ্ম, কৰ্ম্মকল, কদাচিত

না স্বজেন বিতু ; জীব স্বভাবেতে প্রবর্তিত । ১৪

“না লন স্রুতি, পাপ, কারো বিতু কদাচন ।”

তবে লোকে সেরূপ মনে করে কেন ?—

“অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুখ জীবগণ ” ১৫

সে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কৰিয়া শান্তি লাভ করে।

“যজ্ঞ-তপ-কল-ভোক্তা, অৰ্জুন ! সৰ্ব লোকের আমি মহেশ্বর,
স্বহৃদ সৰ্বভূতের,—আমাকে জানিয়া শান্তি লভে সেই নয় ।” ২৯

এত অল্প কথায় পরমেশ্বরের এমন একটি মহৎ ও পূ চিত্র অল্প
কোনও ধৰ্মগ্রন্থে আছে কি না জানি না।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—অভ্যাসযোগ ।

এই অধ্যায়েও সন্ন্যাস এবং কৰ্মযোগ বা যোগের কথা। ভগ-
বান্ কহিলেন—

“করে' যে কর্তব্য কর্ম কর্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী, নহে নিঃশি নিষ্ক্রিয় ।” ১

যে ব্যক্তি যোগাকাজী, কর্ম তাহার অবলম্বন। আর যে ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইয়াছে তাহার অবলম্বন শাস্তি। তাহার আর কর্ম নাই। যোগাক্রুত বা যোগসিদ্ধের অবস্থা কিরূপ ?—

“জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার,-জিতেন্দ্রিয়,
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ সমশ্রিয় ।” ৮

* * * * *
“নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জুন ! সংযতচিত্ত যোগী আত্ম-যোগবত ” ১১

* * * * *
“আত্মাকে সমস্ত ভূত, আত্মাতে সমস্ত ভূত
সর্বত্র সমান-দর্শী যোগী করে অনুভূত ।” ২১

* * * * *
“সর্বত্র সমান দেখে আত্মাৎ যেই জন.

স্থখে দুঃখে, মম মতে সে জন যোগী পরম ।” ৩২
তখন অর্জুন কহিলেন—

“হে কৃষ্ণ ! চঞ্চল মন দৃঢ়, মত্ত শক্তিদয় ;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত্ত হুঙ্কর ।” ৩৪

উত্তর—

“হৃদয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো ! নিশ্চিত ।
অভ্যাसे, বৈরাগ্য, শিষ্ট হয় তাহা নিগৃহীত ।” ৩৫

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাহবা মমের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য হয়, তাহাবা কি “ছিন্ন মেঘের মত” উভয় লোক ভ্রষ্ট হয় ? ভগবান কহিলেন—

“ইহলোকে পরলোকে না হয় সে বিনাশিত ।

দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত ।” ৪০

সে ব্যক্তি পরজন্মে

“লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্বজন্মার্জিত ধন,

সিদ্ধি তরে বহু যত্ন করে সে, কুরুনন্দন ।” ৪৩

সে একরূপ যত্ন করিয়া,

“বহু জন্মে হ’য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমগতি ।” ৪৫

৭ম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ ।

সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি বা পরমব্রহ্মের প্রকৃতি
কিছু? ভগবান্ কহিলেন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,
বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার—এই আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতি । ইহা-
দিগকে অপরা প্রকৃতি কহে । জীবভূত অস্ত্র যে পরা প্রকৃতি
আছে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয় ।

“আমা হ’তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু হে ভায়ত !

আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত ।” ৭

রাসিক, তামসিক ও সাত্বিক ভাবে জগৎ বিযুক্ত । কেবল
চাতুর্বিধ পুণ্যবান্ ভগবানের ভজনা করে—পীড়িত, তব-জিজ্ঞাসু,
অর্থাকাজী, এবং জ্ঞানী । ইহাদের মধ্যে

“লভি বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—‘কৃষ্ণ সৎ,’

যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ ।” ১২

আর বাহারা দেবতার পূজা করে ?

“লভে কণ-হারা কল সেই অন্নজ্ঞানিগণ ;

দেবযাজী পায় দেব, আমাকে মত্তক জন ।” ২৩

আর,

“অধিভূত, অধিদেব, অধিষক্ত সহ জানে যাহারা

আমাকে সে যোগিগণ, প্রয়াণকালেও পার্থ ! জানিবারে পায় ।” ৩০

৮ম অধ্যায়—ব্রহ্মযোগ ।

অধিভূতাদি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া ভগবান্ বলিলেন—

“সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,

রাত্রিযুগ সহস্রান্ত,—জানে দিব্যরাত্রিবিৎ । ১৭

“অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন ।

সে রূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্ততে হয় লীন । ১৮

“ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয় ।

রাত্রিতে অবশ থাকে, দিবসেতে হয় লয় ।” ১৯

সংক্ষেপে এমন বিজ্ঞানসঙ্গত সৃষ্টি-প্রকরণ কি আর কোনও ধর্মগ্রন্থে আছে ? সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিলাম । তবে ভূতগণের এই বিন্যাস অব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন কি আর কিছু নাই ?

“ব্যক্তাব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,

সর্বভূত হ’লে নষ্ট না হয় বিনাশ যার ।” ২০

“অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি প্রধান ।” ২১

তাহাকে বিজ্ঞপে পাওয়া যায় ?

“সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্ত ভক্তিতে লাভ,

সর্বত্র অন্তঃস্থ যার, সবে যার আবির্ভাব ।” ২২

ভগবান্ কহিলেন—

“জানিলে এ পথ যোগী নহে মুখ কদাচিত ।

অতএব সর্বকালে হও তুমি যোগাধিত ।” ২৩

তুমি যোগাধিত হইয়া যুদ্ধ কর ।

২য় অধ্যায়—রাজগুহযোগ ।

ভগবান এ অধ্যায়ে ঐশ্বরিক রাজগুহ ভাব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগূঢ়।
তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

“অব্যক্ত মূর্তিতে মম জগত সর্বব্যাপিত ।

আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নহি তাহে স্থিত ।” ৪

সে আবার কিরূপ ?

“যথা আকাশেতে নিত্য সর্বগাম্য মহা বায়ু কবে অবস্থান,

সেই রূপে সর্বভূত, আমাতেই অস্থিত, জানিও প্রমাণ ।” ৬

কি সুন্দর ও বিশদ উপমা । সেই সর্বভূতের অষ্টা কে ?

“কল্পক্ষেয়ে সর্বভূতে আমার প্রকৃতি পায় ।

কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি আমি পুনবায় ।” ৭

কি প্রকারে ?

“প্রকৃত অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর ।

এই হেতু জগতের বিপর্বাৎ বীরবর ।” ১০

কিন্তু ভগবানই জগতের সর্বসর্গ, এবং লোকেরা এতদে বা
পৃথক্বে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে । আর,—

“যাষা প্রজ্জ্বলিত হয়ে পূজে অস্ত দেবতায়,

তারাও অবিধিমতে, কোন্তেয় । পূজে আমায় ।” ২৩

ভক্তের অতি সামান্য উপহারও তিনি গ্রহণ করেন ।

“ভক্তিতে যে জন দেয় পত্র, পুষ্প, কল, জল,—

লই আমি পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল ।” ২৬

আর পাপী হরাচারও যদি তাঁহার ভজনা করে,—

“ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পায় সে শান্তি পরম ।

কোন্তেয় । জানিও নষ্ট নাহি হয় ভক্ত মম ।” ৩১

অতএব—

“মদন্তক, মদন্ত-চিত্ত, হও মম উপাসক, কর নমস্কার !

যুক্তাত্মা মৎ-পরায়ণ একরূপ হইলে, পাবে একত্ব আমার ।” ৩৪

১০ম অধ্যায়—বিভূতিযোগ ।

অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কহ সে অশেষ দিবা আপন বিভূতি চম,

করিতেছে অবস্থিতি ব্যাপি যাহে লোকত্রয় । ১৬

“হে যোগি ! কি ভাবে চিস্তি পাব আমি তব জ্ঞান ?

চিস্তিষ তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান ?” ১৭

ভগবান্ কহিলেন, তাঁহার বিভূতি বা গুণ অনন্ত । জগতের দে
জাতীয় দ্রব্যো যাহা সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাঁহার বিভূতি । যথা—

“আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে প্রভাকর,

মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর ।” ২১

* * * *

“বেগগামী মধ্যে বায়ু, শত্ৰীগণে দাশরথী,

মৎস্তেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী ।” ৩১

* * * *

“বৃষ্টিগণে বাহুদেব, পাণ্ডবে ষেতবাহন,

কন্নিগণে গুজ্জরাচার্য্য, মুনিগণে দৈপায়ন ।” ৩৭

মোটামুটি,

“যে সত্ত্ব ঐশ্বর্য্যাবিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,

জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ সমুদ্ভূত ।” ৪১

সর্বশেষ বলিলেন—

“কিংবা এত, পার্থ ! তব কিবা প্রয়োজন জানি ?

একাংশে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছি আমি ।” ৪২

১১শ অধ্যায়—বিশ্বরূপ দর্শন ।

অৰ্জুন সেই বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্যরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান তাঁহাকে “দিব্য চক্ৰ” দিয়া বলিলেন—

“দেখ পার্থ ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার—

নানাবিধ, নানাবর্ণ, আমার দিব্য আকার । ৫

“দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, মরুত, অগ্নিনীলুত,

অনেক অদৃষ্টপূৰ্ণ, ভারত ! দেখ অদ্ভুত । ৬

“এক স্থানে সমুদায় দেখ বিশ্ব চরাচর—

দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর ।’ ৭

শ্রীকৃষ্ণ পরমযোগী । ষাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, ষাঁহারা বিশ্বাস করেন, আত্মা “মহিমাসিদ্ধির” দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিতে পারে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপে কিছুই বিশ্বস্তের বিষয় দেখিবেন না । ষাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এরূপ বুঝিলেই হইবে, যে ভগবান অৰ্জুনকে উপরোক্তমতে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলেন, আমরা বিশ্বের দ্বারাই একমাত্র বিশেষরূপে জানিতে পারি। ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বিশ্বই তাঁহার রূপ,—তিনি বিশ্বরূপ ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত “দিব্যচক্ৰ” বা জ্ঞানের দ্বারা অৰ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিলেন । দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিলেন । কি ঈশ্বর-মাহাত্ম্য, কি কবিত্ব, এই ধ্যান অপূর্ণ । বিস্ত্রিত পুলকিত, যোমাক্তিত অৰ্জুন প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞালিঙ্গুটে করিলেন—

“বহু বাহুদয় বদন নয়ন,

দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ ;

নাহি অন্ত মধ্য, নাহি তব আদি,

দেখিতেছি, বিশেষর । বিশ্বরূপ ।” ১৬

আবার—

“হ্যালোক, ভূলোক, অস্তরীক্ষ, ভূমি

বাণিষাহ্ এম দিক্ সমুদয় ;

দেখিয়া অদ্ভুত উৎকরণ তব

হ’তেছে মহাশ্মা । ভীত লোকত্রয় ।” ২০

বিশ্বের দ্বারা বিশ্বকর্তাকে দেখিতে গেলে তাঁহার ধ্বংস কার্য্যই
নশ্বর মানবের দৃষ্টিগ্রে নয়নগোচর হয় ।

তাই—

“করাল দশন বদনে তোমার

দেখি কালানল-দগ্নিভ প্রকাশ ।

নাহি জাণি দিক, নাহি পায় শান্তি,

হুগ্নস্র হও, হে জগন্নিবাস !” ২৫

আবার,

“যথা নদীদেব বহু অশ্রুবেগ

সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে,

তথা এই নরলোক বীরগণ

পশিছে জলন্ত বদননিকরে ।” ২৮

এই সর্ব-সংহারক মূর্তি দেখিয়া অর্জুনের বীর-হৃদয়ও সন্ত্রস্ত
হইল ।

তিনি বারংবার কঁাতর হইয়া বলিলেন—

“প্রসাদ দেবেশ ! জগন্নিবাস ।”

তিনি বার বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন—

“তোমাকে সহস্র করি নমস্কার

পুনঃ নমস্কার করি বহুবার । ৩৯

“সম্মুখে, পশ্চাতে, করি নমস্কার,

সর্বদিকে, সর্ব প্রণাম আবার ।” ৪০

ভগবান্ প্রথমে বুঝাইয়াছেন যে, এই কালগ্রাস বা মৃত্যু
প্রাণীমাত্রেয়ই অপরিহার্য্য অনৃষ্ট-লিপি । তখন অৰ্জুনকে ডাকিয়া
বলিলেন—

“অতএব উঠ, লভ তুমি যশ ।

কর রাজ্যভোগ জিনি শত্রুদল ।

পূৰ্বেই করেছি হত আমি সব,

সব্যসাচি ! তুমি নিমিত্ত কেবল ।” ৩৩

১২শ অধ্যায়—ভক্তির্যোগ ।

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানকে যাহারা একরূপ সাকার-
ভাবে উপাসনা করে আর যাহারা অব্যক্ত নিরাকারভাবে উপা-
সনা করে, এই দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে কাহারো উত্তম ।
ভগবান বলিলেন, নিরাকার উপাসকই শ্রেষ্ঠ । যাহারা একরূপ
ভাবে অব্যক্তের উপাসনা করে—

“সংযমি ইন্দ্ৰিয়গণ, সমজ্ঞান সমুদায়,

সৰ্বভূত হিতে রত,—তাহাই আমাকে পায় ।”

কিন্তু নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন ।—

“অগত্য আসক্তদের ক্রেশ সমধিক তব,

দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর ।” ৫।

সেই ভক্ত—

“আত্মাতে স্থাপিত স্থির চিত্ত যদি নাহি তব,

পাইতে অত্যাগ যোগে ইচ্ছা কর, ধনজয় ।২

“অত্যাগে অশক্ত যদি, হও মৎ-কৰ্ম্মপর ;

করি কৰ্ম্ম মম তরে পাবে সিদ্ধি, বীরবর ।১০

“তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,

যতদ্বা হইয়া ত্যাগ কর কৰ্ম্ম-কলাশয় ।” ১১

তাহার পর ভগবান্ কহিলেন, যে সৰ্ব্বভূতে সমদর্শী, যাহার
স্বধ হৃৎখাদিতে সমজ্ঞান, যে জিতেন্দ্রিয়, যে—

“ওচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যাধ, নিম্প্ৰহ,
সৰ্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী, মন্ত্ৰজ্ঞ, সে মম প্রিয়।” ১৬

১৩শ অধ্যায় ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ ।

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়,
কি ? ভগবান্ কহিলেন, শরীর ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং ক্ষেত্র
ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান । তাহার পর তিনি ব্যাখ্যাইলেন,
ভূতগণের সাধারণ প্রকৃতি যাহা তাহা ক্ষেত্রের বিকৃতি, এবং
পূৰ্বোক্ত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সকলের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান । আর—

“তব জ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—

ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্তথা ।” ১২

জ্ঞেয় স্বয়ং ভগবান্—

“অবিভক্ত ভূতগণে বিভক্ত রূপেতে স্থিত ;

সৃষ্টি স্থিতি গ্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অতিস্থিত।” ১৭

এই জ্ঞেয় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় অনাদি, এবং গুণ ও
বিকার মাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত ।

“কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহে,

স্বধ হৃৎখ ভোগ হেতু প্রকৃতি পুরুষ নহে । ২১

“হইয়া প্রকৃতি স্থিত, পুরুষ প্রকৃতি-জাত ভূজে গুণগণ,

এই গুণ-সম্বন্ধ, পার্থ । অসং সং ঘোনিতে জনম কারণ ।” ২২

কিন্তু পুরুষ তাহাতে লিপ্ত হন না ।

“নির্লিপ্ত হৃদ্ব্যভা হেতু সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বগত, আকাশ যেমন ;

সৰ্ব্বদেহে অবস্থিত নির্বিকার পরমাত্মা নির্লিপ্ত তেমন ।” ৩৩

১৪শ অধ্যায়—গুণত্রয় বিভাগযোগ।

পূর্ব অধ্যায়ে গুণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ভগবান এই অধ্যায়ে গুণের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। গুণরাশি তিন ভাগে বিভক্ত—সৎ, রজঃ এবং তম।

“নির্মলত্ব হেতু সৎ,—প্রকাশক, অনাময়,—

স্ব স্ব সঙ্গ, জ্ঞান সঙ্গ, করে বন্ধ, ধনঞ্জয়।

“তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাদ্বয়ক রজঃগুণ,

দেহীকে কৰ্ম্মের সঙ্গ করে বন্ধ, হে অর্জুন। ৭

“সৰ্বদেহী-মোহকারী জ্ঞান অজ্ঞানক তমঃ,

প্রমাদ ও নিদ্রাগস্তে করে বন্ধ, অরিন্দঃ।” ৮

তাহার পর এই তিন গুণে মানুষকে কি প্রকার কৰ্ম্মে আবৃত করে, ইহারা বর্জিত হইলে কিরূপ হয়, সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে কি গতি হয়, এবং তাহার ফলাফল কিরূপ ভগবান তাহা বিস্তারিতরূপে বুঝাইলেন।—

“স্বকৃত কৰ্ম্মের, পার্থ। সাত্বিক ফল নির্মল;

রজসের ফল হঃখ, তমের অজ্ঞান ফল।” ১৬

কিন্তু এই ত্রিগুণ অতিক্রম না করিলে মুক্তি নাই।

“দেহ সমুদ্ভূত এই গুণত্রয় অতিক্রমি আস্ত্রা দেহধারী,

কন-মৃত্যু-জরা-হঃখ-মুক্ত হ’য়ে, অমৃতের হয় অধিকারী।” ২০

এই ভাব নিবাকরণ করিবার জন্যেই ভগবান বুদ্ধদেব সংসার-ভাগী হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপূর্ণ জীবনের মূল মন্ত্র। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণ অতিক্রমকারীর দক্ষ কি? ভগবান বুঝাইলেন, যে দ্বিভোজিয়, সমজ্ঞানী, এবং নিকাম—

“উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত ;
গুণ কার্যে রত জানি, রহে যে অচলিত । ২৩

সে ব্যক্তিই গুণাতীত । আর—

“অনন্য ভক্তিব্যোগেতে যে জন সেবে আমার,
হ’য়ে সৰ্ব গুণাতীত সে ব্রহ্ম ভাব পায় ।” ২৬

১৫শ, অধ্যায় ।—পুরুষোত্তম যোগ ।

সেই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ, তাহা একটা “উর্দ্ধ মূল-অব্যয়-অস্থখ” বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি সুন্দর রূপ বর্ণনা হইয়াছে ।

“অধে-উর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্জিত, বিষয়ে পত্রিত ;
অধ অমুগামী বাসনার মূল,—
নরলোকে কৰ্ম-বন্ধন নিশ্চিত ।” ২

বৈরাগ্য দৃঢ়ত্রে ইহাকে ছেদন করিয়া পরমধাম অবেষণ কাম্রতে হইবে । সে কিরূপ ?—

“চক্ষু সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তি দান,
বধা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম ।” ৬

মৃত্যু ও জন্মসময়ে এই গুণভোগী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায় ?
“দেহ প্রাপ্তিকালে, আর দেহ পরিত্যাগ কালে করেন ঈশ্বর
গ্রহণ ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ’তে বধা গন্ধ লয় সমীরণ ।” ৮

ত্রিগুণাবৃত ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত ভূতগণ ক্ষর এবং ভূতস্থ পুরুষ অক্ষর । তবে পরমেশ্বর কি ?

“ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ’তে উত্তম
এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম ।” ২৮

১৩শ অধ্যায়—দৈবাসুর সম্পাদ-বিভাগ যোগ ।

ভগবান্ এই অধ্যায়ে বুঝাইতেছেন যে, দ্বিগুণাবিত এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত লোক দুই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । যাহারা দৈব সম্পদেতে অভিজাত অর্থাৎ দৈবগুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা এই গীতোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লাভ করে, আর যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরায়ণ তাহারা আশুরী সম্পদে অভিজাত ।

“অসত্য, অপ্ৰতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগত,—আশুরীরা কহে,
কাম-হেতু-পরস্পর-সমুদ্ভূত ভিন্ন ইহা আর কিছু নহে ।” ৮

আমাদের শিবলিঙ্গ পূজা কি তবে ইহাদের দ্বারাই প্রচলিত ? এই অশুর জন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের আধুনিক সমাজের একটা জীবন চিত্র । বর্ণনাটা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু গায়ে লাগিবার কথা ।

“আমরণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ক্রম করে পরমার্থ জ্ঞান । ১১

“শত আশা-পাশে বদ্ধ, কাম ক্রোধ পরায়ণ,
কামার্থ সন্ধিতে অর্থ অজ্ঞায় করে বতন ।” ১২

এইরূপে বুঝাইয়া ভগবান্ কহিলেন—

“দেষ্টা, ক্রুর, মলকারী, সংসারে সে নরাধম,—
অশুর যোনিতে আমি অজস্র করি কেশণ ।” ১৩

পরলোক বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাই সচরাচর পুরুষাত্মকমে যোগীর সন্তান যোগী, পাণ্ডীর সন্তান পাণ্ডী এবং পুণ্যাচার সন্তান পুণ্যাচারী, হইয়া থাকে । আত্মশাস্ত্রানুসারে পতি পত্নীর গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন । এক্ষণে পত্নীর নাম জামা ।

“মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ, আহুযী বন্ধন তরে।

বেন কর শোক তুমি দৈবী জন্ম লাভ করে।” ৫

১৭শ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ।

মাহুষের দুই প্রকার প্রকৃতি বুঝাইয়া এখন ভগবান বুঝাইতে-
ছেন, মাহুষের শ্রদ্ধা তিন ভাগে বিভক্ত।—সাহিত্তিক, রাজসিক,
এবং তামসিক। এ তিন শ্রদ্ধারূপারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ
এবং তপ সকলই তিন প্রকার। তন্মধ্যে—

“স্থখ্যাতি-মান-পূজার্থ দন্তে অমুক্তিত তপ—

চঞ্চল, অক্লব,—তাহা রাজসিক, পরজপ।” ১৮

তেমনি দানও তিন প্রকার—

“দাতব্য মাত্র জানিয়া অনুপকারীকে দান

যথা দেশে কালে পাত্রে—সাহিত্তিক তাহার নাম।” ২০

আর—

“প্রতি-উপকার তরে, কিংবা কল কামনায়,

ক্লিষ্টভাবে দেয় যাহা,—রাজস কহে তাহার।” ২১

অর্কশেষ—

“অদেশে অকালে, যাহা অপাত্রোতে হয় দান

অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা সহ,—তামস তাহার নাম।” ২২

১৮শ অধ্যায়—মোক্ষ যোগ।

.. ভগবান কহিলেন, উপরোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ, কর্মাদির দ্বারা
মনীষিয়া পবিত্রিত হইয়া থাকেন, অতএব তাহা কদাচিত্তি ত্যাগ
করিতে নাই।

তবে—

“তাজিয়া আসক্তি, ফল, কর্তব্য এ কর্ম সব।

নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব।” ৬

কেন?—

“কর্মের ত্রিবিধ কল,—অনিষ্ট ইষ্ট, মিশ্রিত,—

ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিৎ।” ১২

কর্মের হেতু পাচটা—দেহ, কর্তা, ইচ্ছাশক্তি, চেতনা এবং বৈব।
কর্মের প্রবর্তক তিন—জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও পরিজ্ঞাত। কর্মের আশ্রয়ও
তিন—করণ, কর্ম, ও কর্তা। জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, স্থিতি, এবং
সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক।

“নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত ঘেই জন।” ৪০

“ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদেব, ধর্মবর্ষত।

অভাব-সম্পন্ন গুণে প্রভিত্ত কর্ম সব।” ৪১

এই আভাবিক কর্ম করিলে কদাচ পাপ হয় না। এমন কি—

“সদোষ হ’লেও নাহি কদাচ সহজ কর্ম, করিবে বর্জিত ;

ধুমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব কর্ম রত থাকে দোষে আবর্তিত।” ৪২

ভগবান্ কহিলেন—

“করিব না যুদ্ধ—ইহা ভা। ছা যে অহংকার করিয়া সহায়,

মিথ্যা সে সত্ত্ব তব, প্রকৃতিই নিয়োজিত করিবে তো মায়।” ৪৩

“সর্বভূত-কদয়েতে বিদ্রাজিত, হে অর্জুন। আছেন ঈশ্বর ;

যন্ত্রাঙ্কত সর্বভূত ম’দা-বলে প্র’ম্যমান করি নিবস্তর।” ৬১

অতএব—

“তেষাংগিরা সর্ব ধর্ম, লও তুমি এক মাত্র শরণ আমার।

করিও না শোক, পার্থ। সর্ব পাপ হ’তে আমি করিব উদ্ধার।” ৬৬

গীতা শেষ হইল। “লও তুমি একমাত্র শরণ আমার” এইটি

গীতার মূল-মন্ত্র, চরম-শিক্ষা। বুদ্ধিলাভ, ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই

নাই। তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির বাক্য ভাবই পরিদৃশ্যমান
 জগৎ। তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট, তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা
 জগৎ বর্জিত ও পালিত এবং তাঁহার প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন
 হইয়া যায়। তিনি সর্বভূতস্থ আত্মা। অতএব আত্মা অমর ;
 বৃত্তা দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মেব নাম
 স্বধর্ম। অভ্যাসেব দ্বারা ইচ্ছয় সংযত করিয়া এবং কলকামনা
 পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্মফল ভাবনেন সমর্পণ করিয়া, নিকাম
 ভাবে স্বধর্ম পালন করিলেই চরম মনুষ্যত্ব বা পরম সুখ লাভ হয়।
 ভগবান সর্বভূতস্থ ; অতএব সর্বভূতকে আশ্রয়ম জান করিয়া,
 সর্বভূত হিতার্থ কর্ম করিলেই কর্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়।

এই অপূর্ব ধর্মগীতা শেব করিয়া ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন ।

“এবাগ্র চিত্তে কি পার্থ ! করিলে ইহা শ্রবণ ?

অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোহন ।” ৭২

ভাবিতমাতার কি এমন দিন হইবে যে আর্য্যসন্তানেরা এই
 ভগবদ্গীতা পাঠে স্বধর্ম শিক্ষা করিয়া অর্জুনের মত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে
 বলিবে —

“নষ্ট মোহ, স্মৃতিলাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,

গত হ্রাস্তিমম ; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব ।” ৭৩

যিনি “মনোনিবেশ পূর্বক এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে
 ভগবৎপ্রদত্ত মত বলিতে হইবে—

“কৃষ্ণার্জুন এ সংবাদ অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,

অবিদ্যা অবিদ্যা দূষ্ট হইতেছি বারংবার ।” ৭৬

“হরির অদ্ভুতরূপ অবিদ্যা অবিদ্যা আর

হ’তেছে বিস্ময় মহা, দূষ্ট চিত্ত বারংবার ।” ৭৭

সঙ্গর যে ভবিষ্যৎগী অকস্মিককে বলিয়া গীতা-আবৃত্তি শেষ
করিয়াছিলেন, অক "ভবত-হিতৈষিগণকে" তাহা উপহার দিয়া
এই সমালোচনা শেষ করিব—

“যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পৃথ্বীধরুর্দ্বজ,

তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি প্রা, নৃপবরঃ” ৭৮

ভারতের হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহ্যেত পৃথ্বী অধিষ্ঠিত না হইলে,
ভারতের শ্রী, বিজয়োন্নতি, ও প্রা নীতির আশা নাই

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

—*—

প্রথম অধ্যায় ।

—•—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুদ্ধাশ্রম
মম পুত্র, পাণ্ডবেরা কি করিল, হে সঞ্জয় । ১

সঞ্জয় কহিলেন ।

বাহিত পাণ্ডব সেনা নিরখিয়া হর্ষোদ্বিগ্ন,
আচার্য্য সমীপে রাজা করিলেন নিবেদন । ২
দেখ পাণ্ডুপুত্রদেব, আচার্য্য ! সেনা অপার,
গৃহিভ্যঃ পুত্রৈঃ ধীমান্ শিষ্য তোমাং । ৩
ভীমার্জুন সমযোদ্ধা, দেখ, শূর, ধনুর্ধর,
মহারথী যুধুধান, বিরাট পঞ্চালেশ্বর । ৪
ধৃষ্টকেশু, চেকিতান, ক-শীরাজ বীর্য্যধার,
পুরুজিত, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য আর । ৫
যুধামন্যু পরাক্রান্ত উত্তমোজা বীর্য্যবান,
সুভদ্রা-জ্যোতসী-পুত্র মহারথী ধাতনাম । ৬
বিশিষ্ট আমার পক্ষে যে সেনা-নায়কগণ ।
কহিতেছি, বিজ্ঞাতম । তাহাদের বিবরণ । ৭

আপনি, ও ভীষ্ম কর্ণ, কৃপ বণজয়ী চিব,
 বিকর্ণ ও অস্থখামা, সোমদত্ত সূত বীর । ৮
 অন্তান্ত অনেক শূর সজ্জিত আমার তব্রে ভাজিতে জীবন,
 সবে যুদ্ধবিশারদ, ধরে সবে নানা শস্ত্র, নানা গ্রহরণ । ৯
 অপৰ্য্যাপ্ত মম সৈন্ত করেন ভীষ্ম বক্ষণ ;
 পর্য্যাপ্ত পাণ্ডব সেনা বক্ষিছে ভীষ্ম তেমন । ১০
 সৰ্ব্বত্র ব্যূহের মুখে যথাভাগে অবস্থিত
 হইয়া, করুন সবে ভীষ্মদেবে সংরক্ষিত । ১১
 জন্মা'তে তাঁহার হর্ষ, কুরু বৃদ্ধ পিতামহ
 প্রতাপী, ধ্বনিলা শব্দ উচ্চে দিগ্‌হনাদ সহ । ১২
 তখন পণব, ভেরী, আনক, গোমুখ, শব্দ,
 সহসা বাজিল, শব্দে হইল তুমুল আতঙ্ক । ১৩
 তখন ষেতায়-যুক্ত মহতি বধেতে স্থিত
 মাধব, পাণ্ডব, শব্দ করিলেন বিধ্বনিত । ১৪
 জয়ীকেশ—“পাঞ্চজন্ত,” “দেবদত্ত”—ধনঞ্জয়,
 ভীষ্মকর্ষা ভীষ্ম—“পৌণ্ড্র,” ধ্বনিলেন শব্দ দ্বয় । ১৫
 বাজাইলা শব্দ রাজ্য কুন্তিপুত্র বৃষিষ্ঠির,—“অনন্ত বিজয়,”
 নকুল ও সহদেব—“বৃষোষ,” “মলিপুলক,” মহাশব্দদ্বয় । ১৬
 ধনুর্ধর কাশীরাজ, শিখতি রণ পণ্ডিত,
 ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিবাতেশ, সাত্যকি অপরাধিত । ১৭
 দ্রুপদ, দ্রোণদীপুত্র, হস্তদ্রাব মহাবাহু পুত্র বীরমতি,
 পৃথক্ পৃথক্ শব্দ, তখন ধ্বনিলা সবে,
 হে পৃথিবী-পতি । ১৮
 ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদেব, বিদারিয়া অস্তঃস্থল,
 আকাশ পৃথিবী ব্যাপী উঠিল সে কোলাহল । ১৯
 কপিধ্বজ, যুদ্ধে স্থিত দেখি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,

নিষ্কেপ করিতে অস্ত্র তুলি নিঃশব্দে শরাসন ।

কহিলেন, মহাপতে । হৃষীকেশে এই মত । ২০

অর্জুন কহিলেন ।

উভয় সেনার মধ্যে হে অচ্যুত ! বাথ বধ । ২১

বাবত নিরখি আমি, যুদ্ধকামী বীরগণে

কাহারি আমার সনে যুঝিবেক এই রণে ; ২২

হুই ধার্ত্তরাষ্ট্রদের সাধিবারে শ্রিয়ব্রত,

কাহারি আমার রণে হইয়াছে সমাগত । ২৩

সঞ্জয় কহিলেন ।

এ রূপে কহিলে পার্থ, হৃষীকেশ, হে ভারত ।

উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিয়া উত্তম বথ, ২৪

কহিলেন,—দেখ পার্থ ! সমবেত কুরুগণ

ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখীন মহাপতি সর্বজন । ২৫

পাণ্ডব দেখিলা চাহি, পিতৃ পিতামহ, গুরু, মাতুল তথায়,

ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, স্বগুরু, সুহৃদগণ, উভয় সেনায় । ২৬

দেখিয়া কোস্তেয় তথা সর্ব বন্ধু অবস্থিত,

কহিলেন এইরূপে রূপাবিষ্ট বিদ্যাদিত—২৭

অর্জুন কহিলেন ।

দেখিয়া স্বজন, কুরু ! সমবেত, বণোৎসুক,

অবসর গাত্র মম, বিতুক হতেছে মুখ । ২৮

কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে যোমাক্ষিত,

পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত । ২৯

নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন,

হে কেশব ! হ্রস্বমিত্ত করিতেছি দরশন । ৩০

বধিয়া স্বজন রণে নাহি দোষ প্রেমমুখ ;

না চাহি বিজয়, কৃষ্ণ । নাহি চাহি রাজ্য, সুখ । ৩১
কি কাজ রাজ্যে, গোবিন্দ । কি কাজ ভোগে, জীবনে ?

বাদের কারণ,
চাহি রাজ্য, ভোগ, সুখ, তারা উপস্থিত যুদ্ধে

ত্যাগিতে জীবন । ৩২

বয়েছে আচার্য্য তথা, পিতা, পুত্র, পিতামহ,
মাতুল, শশুর, পৌত্র, শ্যালক, সম্বন্ধিসহ । ৩৩
হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি,

হে মধুসূদন ।

তুচ্ছ মহী, ইহাদেয়ে না ইচ্ছি ত্রৈলোক্য তবে

বধিতে কখন । ৩৪

বধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে কিবা প্রীতি জনাৰ্দ্দন

হইবে উদয় ?

এই আততায়িগণে বধিলেও পাপাশ্রয়

ঘটিবে নিশ্চয় । ৩৫

করিব না হত্যা কভু ধার্ত্তরাষ্ট্রে সবার্দ্ধব ;

কিরূপে স্বজন বধি হইব সুখী । মাধব ? ৩৬

যদিও না দেখে এরা, লোভেতে হয়েছে মোহ
কুলক্ষয় কি যে দোষ, কি পাতক মিত্রদ্রোহ । ৩৭

আমরা জানিয়া, নাহি নিরন্ত হইব কেন,

দেখিতেছি জনাৰ্দ্দন । কুলক্ষয় পাপ হেন ? ৩৮

কুলক্ষয়ে হয় নষ্ট কুল ধর্ম্ম সনাতন,

ধর্ম্ম নষ্টে হয় কুল অধর্ম্মেতে নিগমন । ৩৯

অধর্ম্মেতে করে হুট কুলনারী অতঃপর,

হুটী নারী হতে, কৃষ্ণ ! জনমে বর্ণগুরু । ৪০

করে কুলঘাতীদের কুল সহ পিতৃলোক

সঙ্কর নরকপায়ী, লুপ্ত করে পিণ্ডোদক । ৪১
 বুঝে কুলঘাতীদের, এ বর্ণ-সঙ্কর পাপ,
 সনাতন কুলধর্ম জাতিধর্ম অপলাপ । ৪২
 মনুষ্যের, জনাধীন ! কুলধর্ম হ'লে নাশ,
 অনিয়াছি ঘটে তাহে নিয়ত নরক বাস । ৪৩
 অহো ! কি যে মহাপাপ করিতে হইছে রত,
 রাজ্য-স্বপ্ন লোভে, হায় ! স্বজন করিয়া হত ! ৪৪
 প্রতিহিংসা পরাজয়, অশস্ত্র, আমাকে বণে
 মশস্ত্র কোরবে বধে, মঙ্গল ভাবিব মনে । ৪৫

সঞ্জয় কহিলেন—

কহি পার্থ বণস্থলে কহিলেন রথাসনে,
 তেজাগি ধনুর্ধার, শোকেতে উদ্বিগ্ন মনে । ৪৬

ইতি অর্জুন বিষদ যোগনাম

প্রথম অধ্যায় । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—*—

সঞ্জয় কহিলেন ।

কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ আকুলিত হনয়ন,
 বিষাদিত, ধনঞ্জয়ে কহিলা মধুসূদন—১
 ভগবান্ কহিলেন ।

বিষম শকটে তরু কেন হ'লো, বীরবর !

আর্যের অযোগ্য মোহ, অশ্রুগা অকৌটিক ? ২

পেও না ক্রীষত, তব নহে যোগ্য কদাচন,
হৃদয় দৌরব্যয় ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ, অরিন্দম । ৫

অর্জুন কহিলেন ।

পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণ সহ রণে, জনর্দন !

কেমনে করিব প্রতিযুদ্ধ, হে অরিন্দম ! ৬

না বাধিয়া গুরু, ওহে মহাত্মন ! ভিক্ষায় ভোজন মঙ্গল আমার
ভুগিতে হইবে, গুরু বরি হত, কাম, অর্থ, দিগ্ধ শেণিতে সমারা । ৭
না জানি আমরা কি যে গরীমান—অথ পরাজয়, দেবকী-কুমার !
বদেহে বধিয়া না চাণি বঁচিতে, সেই কোথাবেবা সম্মুখে আমার । ৮
কাতরতা দোষে অচ্ছন্ন স্বভাব, বিজ্ঞানি তেঁর স্বর্গ-মুখ মন,
বিশ্বস্ত বা প্রের কহ, শিবা অমি, শিবা অমি, লইলু শরণ । ৯
ইন্দ্রিয়-শোষণ—শোক গিমোচন করিবে কি আছে না দেখি এমন,
ধরার সমুদ্র রাজ্য বিকটক, সুররাজ্য, নাহি পারিবে কখন । ১০

সজ্ঞ কহিলেন ।

পরম্পর বনজ্ঞ কহিলেন পদ্মনাভে—

“করিব না যুদ্ধ আমি,” রহিলেন মৌনভাবে । ১১

তখন সহাস্তে কৃষ্ণ কহিলেন, কুরুপতি !

উভয় সেনার মধ্যে অর্জুনে বিহগমতি । ১২

ভগদানু কহিলেন ।

বধা কহ জ্ঞানীমত, তবে কেন অশেঃকেতে হও শোকাবিত ?

মৃত কি জীবিত তবে, নাহিক অমুশোচনা করেন পণ্ডিত । ১৩

অগ্নি নাই তুমি, আমি, কিংবা নরপতিগণ,

কিংবা জাগ্রব না পরে,—অর্জুন ! নহে এমন । ১৪

দেহীর এ দেহে বধা, বৌদায়, যৌবন, জরা, হয় সংঘটন,

দেহান্তরপ্রাপ্তি তথা ; তাহাতে বিমুগ্ধ নাহি হয় ধীরজন । ১৫

ইন্দ্রিয়-সংযোগ শীত, উষ্ণ, শূথ, হৃৎ যত ;
 অনিত্য, আইসে যায় ; সহ তাহা হে ভারত ! ১৪
 যে জন ব্যথিত নহে তাহাতে, পুরুষবর ।
 হৃৎথে শূথে সমজ্ঞান, অমর সে ধীর নর । ১৫
 না থাকে অসৎ, সৎ নাহি হয় তিরোধান ;
 তত্ত্বদর্শী উভয়ের দেখেছে এ পরিণাম । ১৬
 জেন তুমি অবিনাশী যেই আত্মা সর্বময় ,
 নাশিতে অবায় আত্মা, কেহই সমর্থ নয় । ১৭
 অমর অচ্ছেদ্য নিত্য শরীরীর দেহ যত
 ক্ষুণ্ণশীল—অতএব যুদ্ধ কর, হে ভারত ! ১৮
 যে ইহাকে ভাবে হস্তা, যে ইহাকে ভাবে হত,—
 উভয় অজ্ঞানী, আত্মা না হস্তা, হত, ভারত । ১৯
 নাহি জন্মে, নাহি মরে, পুনঃ পুনঃ সমুৎপন্ন
 কভু নাহি হয় ;
 অজন্ম, অক্ষয়, নিত্য, পরিণামহীন, হত
 দেহ সহ নয় ॥ ২০
 অবিনাশী, নিত্য, অজ, অবায় বলিয়া আত্মা
 জানে যেই জন,
 কেন সে পুরুষ, পার্শ্ব । করিবে বা করাইবে
 কাহারো নিধন ? ২১
 যথা জীর্ণবাস করি পরিহার,
 করে নর নব বসন গ্রহণ ;
 তথা পরিত্যজি দেহী জীর্ণ দেহ,
 করে অস্ত্র নব শরীর ধারণ ॥ ২২
 না পাবে ছেদিতে অস্ত্র, দহিবার হতাশন,
 সলিলে করিতে আর্দ্র, শুকাইতে প্রভঞ্জন । ২৩

অচ্ছেদ্য, অদাহ্য আত্মা, নাহি ক্লেদ, বিশেষণ,
 নিত্য সৰ্ব্বময়, স্থাণু, অচল ও সনাতন । ২৪
 অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, পরমাত্মা নির্মিকার,—
 জানিয়া, তাহার তরে করিওনা শোক আর । ২৫
 মনে কর যদি আত্মা নিত্য জাত, নিত্য মৃত ;
 তথাপিও, মহাবাহো ! শোক তব অমুচিত । ২৬
 জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে ক্রম নিশ্চিত
 অপরিহার্যের তরে শোক তব অমুচিত । ২৭

আদিতে অব্যক্ত থাকে,

মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত ভূতগণ যত,

নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ;

তার তরে কিবা বেদনা, ভারত ১২৮

আশ্চর্য্য স্বরূপ দেখে আত্মা কেহ,

আশ্চর্য্য স্বরূপ কহে অন্তজন,

আশ্চর্য্য স্বরূপ শুনে অন্ত কেহ,

শুনিয়াও কেহ না জানে কখন । ১২৯

দেহী নিতা, অবিনাশী, সৰ্ব্ব দেহে অবস্থিত ;।

তাহা হতে সৰ্ব্বভূত ;—শোক তব অমুচিত । ৩০

স্বধর্ম্মেরো পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,

ধর্ম্মবুদ্ধ হ'তে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর । ৩১

যথা ইচ্ছা উপস্থিত উদ্ঘাটিত-স্বর্গদ্বার ;

সুখী সে ক্ষত্রিয় হয় হেন বুদ্ধলাভ যার । ৩২

আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্ম রণ,

হারায়ে স্বধর্ম্ম, কীর্তি, পাপে হবে নিমগ্ন । ৩৩

অকর অকীর্তি তব ঘোষিবেক সৰ্ব্বদিক,

সক্ষম জনের পার্শ্ব । অকীর্তি মরণাধিক । ৩৪

ভয়ে রণ-পরাজুখ, তোমাঘ
 ভাবিবে মনে মহাবীর্যী সব ;
 মাগ্ন্য বাহাদেব কাছে, তাহাদের
 কাছে তুমি হইবে লাঘব । ৩৫
 কহিবে অকথ্য কথা অহিত-আকাজ্জী সবে ;
 নিশ্চিবে সামর্থ্য, আছে হঃখতর কিবা ভবে ? ৩৬
 হত হও পাবে স্বৰ্গ ; পৃথিবী, হইলে জয় ;
 উঠ তবে, হে কোন্তেয় ! যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় । ৩৭
 হুখ হুঃখ সমজ্ঞানে, লাভালাভ, জয়াজয়,
 কর যুদ্ধ তুমি ; পাপ হইবে না ধনজয় । ৩৮
 অভ্যুত সাংখ্য যোগে এই বুদ্ধি শুন আর
 বুদ্ধিযোগযুক্ত জন কর্মবদ্ধ হয় পায় । ৩৯
 প্রায়শ্চ নিফল নহে, বিষ কিছু নাহি হয়,
 স্বপ্ন মাত্র এই ধর্ম, জ্ঞান করে মহাভয় । ৪০
 বিজ্ঞানাত্মক বুদ্ধি একই, কুরুনন্দন ।
 অনন্ত বহুধাবুদ্ধি ধরে অবিশ্বাসিগণ । ৪১
 না জানে অস্তিত্তি অন্ত, সদাবেদবাদরত,
 কামী, স্বর্গপরায়ণ, বিবেকবিহীন যত । ৪২
 জন্মকর্মফলপ্রদ কহে কথা মনোরম,
 বহল ক্রিয়াতে পূর্ণ, ভোগৈশ্বর্য্যপরায়ণ । ৪৩
 ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তের তাহে চিত্ত অপহৃত,
 বিজ্ঞানাত্মক বুদ্ধি নাহি হয় সমাহিত । ৪৪
 সকাম সকল বেদ, অর্জুন হও নিকাম,
 যোগী, নিত্য ব্রহ্মে স্থিত, দন্দহীন, আত্মবান্ । ৪৫
 বহু কুপে হয় বাহা, পাবে এক পারাবারে
 সাধিতে সকল ।

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান পারে তথা প্রদানিতে

সর্ব বৈদ্যকল । ৪৬

কর্মে তব অধিকার, নহে কলে কদাচিত ।

তেরাগিবে কর্মফল, কর্ম ত্যাগ অনুরিত । ৪৭

যোগস্থ, নিঃশঙ্কভাবে কর কর্ম, ধনঞ্জয়,

সিদ্ধাসিদ্ধে সমভাবে,—সে সমস্ত যোগ কর্ম । ৪৮

বুদ্ধি যোগ হ'তে কর্ম বহু দূরে ধনঞ্জয় ।

কর বুদ্ধি যোগাশ্রয়, ফলাকাজ্জা নীচাশয় । ৪৯

করে বুদ্ধিবৃত্ত জন কি স্মৃত্ত কি হৃত্ত

বর্জন উভয় ;

অতএব যোগতরে কর যুক, কর্মমধ্যে

যোগ শুভময় । ৫০

বুদ্ধিবৃত্ত মনীষীরা তেরাগিরা কর্মফল,

লভে জন্মবন্ধমুক্তি, নির্ঝিন্ন সে পদতল । ৫১

মোহের গহন ভূমি বুদ্ধি যোগে-অতিক্রম

করিবে যখন,

হইবে উদয় তব শ্রোতব্য, শ্রুত, বিষয়ে

বৈরাগ্য তখন । ৫২

শ্রুতি দ্বারা বিক্ষেপিত না হইয়া বুদ্ধি তব

ধাকিবে নিশ্চল,—

অচল সমাধিগত,—তখন তোমার যোগ

হইবে সফল । ৫৩

অর্জুন कहিলেন ।

সমাধিহ হিতশ্রদ্ধঃ করে কহে জনাৰ্দ্দন ।

কি ভাষা হিহবুদ্ধির, গমন, উপবেশন,

ভগবান कहিলেন ।

মনের কামতা সৰ্ব করি, পার্থ । পরিহার,
 আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার । ৫৫
 হঃখে অমুষ্টিগমন, স্তখেতে নিঃস্পৃহ যেই,
 নাহি রাগ, ভয়, ক্রোধ,—স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি সেই । ৫৬
 যে সৰ্ব্বত্র বীতশেহ ; শুভাশুভে কদাচিত
 না করে আনন্দ, দ্বেষ ;—তার আত্মা প্রতিষ্ঠিত । ৫৭
 কুশ্মের অন্ধের মত, করিবাস সঙ্কচিত
 যে পারে ইন্দ্রিয়গণ—প্রজ্ঞা তার প্রতিষ্ঠিত । ৫৮
 বিষয় নিবৃত্ত মাত্র হয় নিরাহারিগণ,
 বিষয়-বশনা ত্যাগ করে ব্রহ্মদশা জন । ৫৯
 পুরুষ হওও পার্থ । জ্ঞানী মোক্ষপরায়ণ,
 প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ বলে হরি লয় মন । ৬০
 সংযত-ইন্দ্রিয় হও, মৎপর ও যোগস্থিত ;
 ইন্দ্রিয় বশেতে যাব, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৬১
 চিন্তিলে বিষয় নর, উপজে আসক্তি বোধ ;
 কামনা আসক্তি হ'তে, কামনা হইতে ক্রোধ ; ৬২
 ক্রোধ হ'তে জন্মে মোহ, মোহে হয় স্মৃতিভ্রম,
 স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশে বিনাশন । ৬৩
 আত্মবশ ইন্দ্রিয়েতে—রাগদ্বেষ-বিরহিত—
 ভুক্তিঘা বিষয়, শাস্তি লভে বশীভূত চিত । ৬৪
 আত্মপ্রসাদেতে হয় সৰ্ব্ব হঃখ বিনাশিত ;
 প্রসন্নচেতার হয় আত্ম বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ।
 নাহি বুদ্ধি, আত্মচিন্তা, ইন্দ্রিয় অজিত যাব,
 কোথা শাস্তি বিনা চিন্তা, শাস্তি বিনা স্বখ আর ? ৬৬
 মন যাব স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়েতে হয় রত,
 লুপ্ত হয় প্রজ্ঞা, ঝড়ে সঙ্কটে তরলী মত । ৬৭

অভাব মহাবাহো ! সর্বরূপে নিগৃহীত
হয়েছে ইন্দ্ৰিয় যার, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৬৮
সকলের নিশা যাহা, সংঘমী তাহে জাগ্রত,
বাহাতে জাগ্রত সব, মুনি দেখে নিশা মত । ৬৯

আকুল পুরিত, স্থির, অচঞ্চল
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন ;
তেমতি কামনা প্রবেশে বাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন । ৭০

তাজিয়া কামনা সর্ব্ব যেই হয় স্পৃহাহীন,
নির্দ্বন্দ্ব নিরঙ্কর—পায় শান্তি চিরদিন । ৭১
পার্থ । ব্রহ্মে স্থিতি এই, নহে বাহে মুগ্ধজ্ঞান,
তাহাতে মরিলে হয় ব্রহ্মপদে নিরবাণ । ৭২

ইতি সাক্ষ্যযোগ, নাম
দ্বিতীয় অধ্যায় । ২।

তৃতীয় অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন ।

কর্ম্ম হ'তে বুদ্ধি-যোগ প্রেষ্ঠ যদি, জনাৰ্দন !
আমাকে এ যৌব কর্ম্মে কর কেন নিয়োজন ? ১
বিমিশ্র বাক্যেতে মম হইতেছে বুদ্ধিব্রম,
নিশ্চিত করিয়া কহ বাহে প্রেয় হয় মম । ২

ভগবান কহিলেন ।

লোকের দ্বিবিধ নিষ্ঠা বলেছি পূর্বে, অনঘ !
জ্ঞানযোগ সাধ্যাদের, যোগীদের কৰ্ম্মযোগ । ৩
নাহি আরম্ভিয়া কৰ্ম্ম না পায় নৈকৰ্ম্ম্য নর,
বিহনে সন্ন্যাস-যোগ সিদ্ধি নাহি, বীরবর ! ৪
অকৰ্ম্মা থাকিতে কেহ নাহি পারে কদাচিত,
স্বভাব গুণেতে সবে হয় কৰ্ম্মে নিয়োজিত । ৫
সম্মরিয়া কৰ্ম্মেজিয় ইজিয় বিষয় ধ্যান
করে মনে যে বিমূঢ়, মিথ্যাচার তার নাম । ৬
ইজিয় সম্মরি মনে, করে পার্থ ! অকুষ্ঠান
কৰ্ম্মেজিয়ে কৰ্ম্মযোগ, সে জন শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম । ৭
কৰ্ম্ম, অকৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠ ; কর কৰ্ম্ম নিয়মিত,
না হয় দেহবাত্মাও অকৰ্ম্মেতে নিকাহিত । ৮
যজ্ঞার্থ করিবে কৰ্ম্ম, অস্ত্র কৰ্ম্ম মানুষের বন্ধন কারণ,
অতএব হে কৌন্তেয় । অনাসক্ত হ'য়ে

কৰ্ম্ম কর আচরণ । ৯

• যজ্ঞ গৃহ সৃজি প্রজা বলেছিল প্রজাপতি—

“হউক ইহাতে তব ইষ্টসিদ্ধি, ক্রমোন্নতি । ১০

“ইহাতে দেবের বৃদ্ধি, দেবগণে বৃদ্ধি তব ;

“বৃদ্ধি করি পরস্পরে পরম কল্যাণ লভ । ১১

“যজ্ঞেতে বর্জিত দেব তোমাদের ইষ্টভোগ

করিবে অর্পণ ।

“চোর সে, তাঁদের দ্রব্য না দিয়া তাঁদের, ভোগ

করে যেই জন ।” ১২

যজ্ঞশিষ্টভোগী হয় সৰ্ব্ব পাপে বিমোচন,

যে রাখে আপনা তবে, সে করে পাপ ভরণ । ১৩

অন্ন হতে ভূতগ্রাম, পর্জন্ত হইতে অন্ন,
 পর্জন্যের যজ্ঞ হ'তে, কৰ্ম হ'তে যজ্ঞোৎপন্ন । ১৪
 ব্রহ্ম হ'তে কৰ্ম, ব্রহ্ম অক্ষরেতে উপজিত ;
 তাই সৰ্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত । ১৫
 হেন প্রবর্তিত চক্র যে না করে অনুসার,
 সে পাপী ইন্দ্রিয়পর বুধায় জীবন তার । ১৬
 কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
 আত্মাতেই সমুপে সদা, তার কার্য নাহি আর । ১৭
 কৃত কি অকৃত কার্য নাহি তার কদাচন ;
 সৰ্বভূতে নাহি চায় আশ্রয় কারো কখন । ১৮
 অনাসক্ত কৰ্ম তুমি কর সদা আচরণ,
 অনাসক্ত কৰ্মাচারী পুরুষ লভে পরম । ১৯
 কৰ্ম্মেতে লভিলা সিদ্ধি জনকাদি মহোদয়,
 নিতান্ত লোকের ভবে কর কৰ্ম, ধনজয় । ২০
 বাহ্য আচরিবে শ্রেষ্ঠ, করে তা ইতর জন ;
 শ্রেষ্ঠ বাহ্য মানে, লোক করে তা অনুসরণ । ২১
 আমার কর্তব্য, পার্থ । ত্রিলোকে নাহি কাকত,—
 অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি ; তবু আমি কৰ্ম্মাবিত । ২২
 নিবলস কভু যদি কৰ্ম নাহি করি আমি,
 পার্থ । সৰ্বরূপে নব হবে যম অনুগামী । ২৩
 আমি কৰ্ম না করিলে, হবে সব উৎসাদিত ;
 সঙ্কর্যে, মলিন্যে, হবে প্রজা কলঙ্কিত । ২৪
 সকাম অজ্ঞানী কৰ্ম করে বধা, হে ভারত !
 করিবে সমাজহিতে নিকাম জ্ঞানী তেমত । ২৫
 কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীঃ না জ্ঞানীয়ে বুদ্ধিহয়,
 নির্যোজিবে সৰ্ব কৰ্ম্মে, করি কৰ্ম্ম জ্ঞানিগণ । ২৬

হয় প্রাকৃতিক গুণে নর্য কৰ্ম সম্পাদন

“আমি কৰ্ত্তা”—ভাবে মনে অহঙ্কারী মূঢ়জন । ২৭

মহাবাহো ! গুণ-কৰ্ম-বিভাগের তত্ত্বজ্ঞানী,

হয় না আসক্ত গুণে, ইন্দ্রিয়কে ভোগী জানি । ২৮

প্রকৃতির গুণ মূঢ় গুণকর্মে হয় বত ;

হেন মল্লবুদ্ধিগণে চালাবে না জ্ঞানী যত । ২৯

আমোতে সকল কৰ্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে করি সমর্পণ

নিকাম, মমতা-হীন, হয়ে নির্লিপ্যচিহ্নিত কর তুমি বরণ

যারা মম এই মত করে নিত্য অনুষ্ঠান, —

প্রজাবন্ত, অনহয়—পায় কৰ্ম হ’তে ত্রাণ । ৩১

অহুয়াতে মম মত, না করে পালন যারা,

জেনো তুমি, নষ্টমতি সর্বজ্ঞানমূঢ় তারা । ৩২

জ্ঞানীরাও করে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসার,

প্রাণীরা প্রকৃতিগামী, নিগ্রহ কি করে আর ? ৩৩

ইন্দ্রিয়ার্থে ইন্দ্রিয়ের আছে দ্বেষ, অনুব্রাগ ;

এ পথের প্রতিকূল উভয়, করিবে ত্যাগ । ৩৪

সত্ত্ব গুণ-অনুষ্ঠিত পরধর্ম হ’তে শ্রেয় স্বধর্ম বিগুণ ।

স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভগবৎ তথাপি, অর্জুন !

“ অর্জুন কহিলেন ।

কে করে পুঙ্খমে বল এই পাপে প্রবর্তিত

অনিচ্ছায়, বাহুদেব । বলে করি নিয়োজিত ? ৩৬

ভগবান্ কহিলেন ।

এই কাম, এই ক্রোধ, বজ্রোত্তপে সমুদাত,—

মহাভোগী, মহাপাপী,—জানিবে শত্রুর মত । ৩৭

ধূমেতে আবৃত বহি মুকুট মনেতে যথা,

অবায়ুতে গর্ভ, জ্ঞান ইহাতে আবৃত তথা । ৩৮

আবৃত সত্য জ্ঞান, জ্ঞানীদের শত্রু প্রায়,
 কোন্সেধ। হৃদয়বীথ, অগ্নিতুলা, কামনায়। ৩৯
 ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন, ইহারই অধিষ্ঠান ;
 ইহাতে মোহিত করে দেহীকে, আবরি জ্ঞান। ৪০
 তাই ইন্দ্রিয়াদি আগে করি পার্শ্ব। নিয়মিত,
 বিজ্ঞান-জ্ঞান-নাশক কর এ পাপ ধ্বংসিত। ৪১
 ইন্দ্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ উক্ত, তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মন,
 মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তা হ'তে পরমান্বন। ৪২
 একুণ জানিয়া, আত্মা আত্মাতে নিশ্চল করি,
 মহাবাহো। ছরাসদ নাশ কামরূপ অরি। ৪৩

ইতি কর্ম যোগ নাম

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন।

এ অব্যয় যোগ আমি বলেছিহু বিবস্থানে।
 বিবস্থান্ মন্থকে কহে, মন্থ ইচ্ছাকুব স্থানে। ১
 একুণে পরম্পরায় জানিলা বাজবিগণ
 কালে এই মহাযোগ নষ্ট হলো অরিন্দম। ২
 কহিহু তোমার আকি সেই যোগ পুরাতন,—
 উত্তম বহুত এই, তুমি তত্ত্ব সখা মম। ৩

অর্জুন কহিলেন ।

বিবশ্বান্ জন্মিলা পূর্বে, পরে জন্ম হলো তব ।

তুমি বলেছিলে আগে, জানিব কিসে, কেশব । ৪

ভগবান্ কহিলেন ।

তোমার আমার জন্ম হয়েছে বহু অতীত ।

আমি তাহা জানি সব, নহে তা তব বিদিত । ৫

যদিও অজন্মা আমি, অব্যয়াত্মা, সর্বেশ্বর ;

আপন মায়ায় জন্মি আপন প্রকৃতি-পব । ৬

যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্মের যানি,

অধর্মের অত্যাখান, আপনাকে সজ্জি আমি । ৭

সাধুদের পরিজ্ঞাপ, বিনাশ চক্ৰভেদের

করিতে সাধন,

স্থাপন করিতে ধর্ম,

করি আমি যুগে যুগে

জনম গ্রহণ । ৮

এই দিব্য জন্ম, কর্ম, যে জন জানে আমার,

আমাকে সে পায়, পার্থ । পুনর্জন্ম নাহি তার । ৯

রাগ-ভয়-ক্রোধশূন্ত, মনুষ্য মম-আশ্রিত,

বহুজ্ঞানভূত পুত্ৰ হয় মমভাবে হিত ॥ ১০

যে যথা আমাকে চাহে, তাকে তথা ভজি আমি,

পার্থ ! সর্বরূপে নর মম পথ অনুগামী । ১১

পূজে দেবগণে পার্থ । কলসিদ্ধাভাজী নর,

পরলোকে কর্মফল হয় সিদ্ধি শীঘ্রতর । ১২

শুণ কর্ম অনুসারে সৃষ্ট চতুর্কর্ণ চয়,

যদিও তাদের কর্তা, অকর্তা আমি অব্যয় । ১৩

কর্মের নাহি হই লিপ্ত, নাহি চাহি কর্মফল ;—

যে আমাকে জানে হেন, মুক্ত সে কর্মশৃঙ্খল । ১৪

পূর্বে যুযুত্বরা কৰ্ম করিলা জানি এমত ।
 অতএব কর কৰ্ম ভূমি প্রাচীনের মত । ১৫
 কিবা কৰ্ম কি অকৰ্ম, পণ্ডিত (৩) তাহে মোহিত ।
 কহিতেছি কৰ্ম ঘাহে অন্তত হবে মোচিত । ১৬
 কৰ্মও জ্ঞাতবা, আর জ্ঞাতবা কৰ্মবিরতি,
 জ্ঞাতবা কুকৰ্ম কিবা,—হুজুৰ কৰ্মের গতি । ১৭
 কৰ্মে যে অকৰ্ম নেপে, অকৰ্মে যে কৰ্মভোগী,
 মনুষ্য সে বুদ্ধিমান, সৰ্বকৰ্মকাৰী যোগী । ১৮
 যার সৰ্বকৰ্মাবস্ত কাম-সংকল্প-বজ্জিত,—
 জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কৰ্ম,—জ্ঞানী কহে সে পণ্ডিত । ১৯
 তাজি কৰ্মকলাসক্তি নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রিত,—
 কৰ্মে রত হইলেও নাহি করে সে কিঞ্চিৎ । ২০
 নিরাশী, সংযত-চিত্ত, সৰ্বপরিগ্রহ-হীন,
 শরীরার্থ করি কৰ্ম নাহি হয় পাপে লীন । ২১
 বদ্বৈতানাভে সন্তুষ্ট, বিমৎসর, দন্দুভীত,
 সিন্ধাসক্তি সমজ্ঞানী, কৰ্মে নহে নিবদ্ধিত । ২২
 জ্ঞানে স্থিরতরচিত্ত, নিকাম বন্ধন-হীন,
 বজ্জার্থ আচর্য কৰ্ম, সমগ্র করে বিলীন । ২৩
 ব্রহ্ম-হবি ব্রহ্মাগ্নিতে, ব্রহ্মহোতা, ব্রহ্মার্পণ ;—
 ব্রহ্মকৰ্ম করি ধ্যান ব্রহ্মেতে করে গমন । ২৪
 করে কোন কোন যোগী দেব-বজ্জ অলুষ্ঠান ।
 কেহ কেহ বজ্জাহতি করে ব্রহ্মাগ্নিতে দান । ২৫
 ক্রতি ইন্দ্রিয়াদি অন্তে সমর্পে সংযমানলে,
 শব্দাদি বিবর অন্তে ইন্দ্রিয়-অনলে বলে । ২৬
 অপরে ইন্দ্রিয় কৰ্ম গ্রাণকৰ্ম সমুদায়,
 সমর্পে জ্ঞান-গ্রন্থীপ্ত সংযমযোগনিধায় । ২৭

দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ সেই মত
 'করে অস্ত্রে, জ্ঞান-যজ্ঞ করে বতী দৃঢ়ব্রত । ২৮
 অপরে অপানে প্রাণ, অর্পিয়া প্রাণে অপান,
 প্রাণ অপানের গতি বোধি, করে প্রাণায়াম ।
 অস্ত্র স্বরাহারী করে প্রাণে—প্রাণেন্দ্রিয় দান । ২৯
 যজ্ঞ দ্বারা পাপক্ষয় করি যজ্ঞবিদগণ,
 করি যজ্ঞামৃত ভোগ, লভে ব্রহ্ম সনাতন । ৩০
 ইহলোক (৬) নাহি পায় অযাজ্ঞিক, কুরুসত্তম ! ৩১
 এইরূপ নানা যজ্ঞ প্রকাশিত ব্রহ্মমুখে ;
 কৰ্ম্মজ্ঞ জানিয়া লব, মোক্ষ লাভ কর মুখে । ৩২
 দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়াবিত ;
 সৰ্ব্বদা কৰ্ম্ম, পার্থ । জ্ঞানে হয় সমাপিত ।
 শরণাপাত প্রতিশ্রব্ধে, সেবায়, তোমাকে জ্ঞান
 তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ করিবেন শিক্ষা দান । ৩৩
 যে জ্ঞান লভিলে পুনঃ না হবে মোহ, পাণ্ডব !
 আমার আত্মাতে যাহে দেখিবে সংসার সব । ৩৪
 সৰ্ব্বপাপী হ'তে যদি কর তুমি পাপাচার,
 জ্ঞান-তরুণীতে হবে সৰ্ব্বপাপার্ণব পার । ৩৫
 যথা কাষ্ঠ 'করে ভস্ম প্রজ্জলিত হতাশন,
 সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ভস্মসাৎ জ্ঞানাগ্নি করে তেমন । ৩৬
 অগতে কিছুই নাই পবিত্র জ্ঞানের মত ।
 যোগসিদ্ধ যথাকালে হয় তাহা অবগত । ৩৭
 তৎপন্ন, সংযতেন্দ্রিয় প্রজ্ঞাবান, লভে জ্ঞান ।
 লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি-নিদান । ৩৮
 প্রজ্ঞাহীন, সন্দেহান্বিত, অজ্ঞ হয় বিনাশিত ।
 ইহলোক, পরলোক, নাহি লুপ্ত কদাচিত । ৪০

২০১৮

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

যোগে সমর্পিত কর্ম, জানেতে ছিন্ন সংশয়,
আত্মবস্ত্রে, নাহি করে কর্মে বন্ধ ধনজয় । ৪১
অতএব হৃদয়ের এ সংশয় অজ্ঞানতঃ
কাটি জ্ঞান-খর্জের, উঠ, যোগস্থ হও ভারত !

ইতি জ্ঞান কর্ম বিভাগ যোগ নাম
চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন ।

কর্মত্যাগ, কর্মবোগ কহিলে, কৃষ্ণ । উত্তরঃ
এ উত্তরে যেটা শ্রেয় আমাকে কহ নিশ্চয় । ১

ভগবান কহিলেন ।

সন্ন্যাস ও কর্মবোগ উভয়ই শ্রেয়কর ।

তথাপি সন্ন্যাস হ'তে কর্মবোগ শ্রেষ্ঠতর । ২

কেনো সে নিত্যসন্ন্যাসী নাহি ঘোঁসাকাজ্ঞা বার,
নির্বন্দ সে হয় হৃদে সকল বন্ধন পার । ৩

পণ্ডিতে না, মূর্খে কহে পৃথক সাংখ্য ও যোগ ।
এক অহুষ্ঠিলে হয় উভয়ের কলতোপ । ৪

সাধ্যো পার যেই স্থান, যোগেও সেখানে বার ।
অভিন্ন সাধ্য ও বোগ, যে দেখে সে দেখে তার । ৫

হৃদয়ের কারণ, পার্ব ! সন্ন্যাস-বোগ-বিহীন ।
অন্যসকল মনি হয় অচিরে ব্রহ্মে বিলীন । ৬

যোগযুক্ত বিগুহ্যাত্মা, বিজিতাত্মা জিতেজিয়, আপন আত্মায়
 দেখে সৰ্বভূত—আত্মা,—সে কৰ্ম্য কৰিয়া নাহি লিপ্ত হয় তায় । ৭
 “কিছু নাহি কৰি আমি”—ভাবে যোগী তত্ত্ববিৎ, “দৰ্শন, শ্রবণ
 আহার, গমন, নিদ্রা, ভ্রাণ, শ্বাস, পরশন, কথন, গ্রহণ,
 “নিমেঘ, উন্মেঘ, ত্যাগ,”—তাহার ধারণা হয়,
 ইঞ্জিয়ার্থে ইঞ্জিয়ের। রত মাত্র সমুদয় । ৮-৯
 ব্রহ্মে সমর্পিয়া কৰ্ম্য, নিকাম যে কৰ্ম্য-রত,
 না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্বপত্তে জল মত । ১০
 কেবল ইঞ্জিয়, বুদ্ধি, দেহ, মন দ্বারা করে
 সজত্যাগী যোগী কৰ্ম্য,—তুধু আত্মগুহি তরে । ১১
 যোগী, কৰ্ম্য-কলত্যাগী, পায় শান্তি প্রদায়িত ;
 যোগহীন ফলাসক্ত কামে হয় বিবর্তিত । ১২
 যশী সৰ্ব কৰ্ম্য দেখে করে মন সমর্পিত ।
 নব-দ্বার তাহে দেহী না করে কৰ্ম্য কিঞ্চিৎ । ১৩
 নরের কর্তৃত্ব, কৰ্ম্য কৰ্ম্মকল, কদাচিত
 না সৃঞ্জন বিভূ . স্বভাবেতে প্রবর্তিত । ১৪
 না লন সৃষ্টি, পাপ, কৰো বিভূ কদাচন ।
 অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুখ্য জীবগণ । ১৫
 আত্মার অজ্ঞান এই জ্ঞানে যাবা করে হত,
 তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান একাশে আদিত্য মত । ১৬
 তত্ত্বজ্ঞি, তদাত্মা, আৰ তন্নিষ্ঠা, তৎ-পরায়ণ,
 জ্ঞানে ধোত-পাপ,—করে পুনর্জন্ম অতিক্রম । ১৭
 কি গো, হস্তী, কি ব্রাহ্মণ বিনীত ও জ্ঞানবান,
 কুকুর, চণ্ডাল, সব—জানীয়া দেখে সমান । ১৮
 সাম্যে স্থিত মন যাবি ইহ লোকে স্বর্গজিত,
 —নির্দোষ সমস্ত ব্রহ্মে—হয় তাহে ব্রহ্মে স্থিত । ১৯

শ্রিয় প্রাপ্তে নহে হৃষ্ট, অশ্রিয়ে নহে হৃঃখিত,
 স্থিরবুদ্ধি, অসংমূঢ়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মে স্থিত । ২০
 বাহু স্পর্শ অনাসক্ত, আত্মাতে যে স্থখী হয়,
 সে ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা, লভে সে স্থখ অক্ষয় । ২১
 পরশ-জনিত ভোগ হৃঃখের কারণ যত,—
 আদি-অন্ত-শীল, পার্থ । জ্ঞানীতাহে নহে রত । ২২
 শরীর মোচন পূর্বে যে হয় সহিষ্ণু-পর
 কাম-ক্রোধোদ্ভব-বেগ,—সেই যোগী, স্থখ নর । ২৩
 বাহ্যর অন্তরে স্থখ, অন্তরে ক্লোতি, আরাম ;
 সেই যোগী ব্রহ্মস্থিত, ব্রহ্মেতে লভে নির্বাণ । ২৪
 লভে ব্রহ্মে নিরবাণ পাপহীন স্থবি যত,
 দ্বিধাহীন, জিতেন্দ্রিয়, সৰ্বভূত-ভিতে রত । ২৫
 কামক্রোধ-বিরহিত, সন্ন্যাসী, স-চিৎ,
 নির্বাণ উভয় লোকে লভে ব্রহ্মে আশ্রয়িত । ২৬
 ত্যজিয়া ইন্দ্রিয়-কার্য্য, উভয় ক্রমধ্যে চকু
 করিয়া স্থাপন,
 করি সমভাবাপন্ন নাসক্তচর্য্যী প্রাণ
 অপান তেমন । ২৭
 জিতেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি, মূনি-মোক্ষ-পরায়ণ,—
 নাহি ইচ্ছা ভয় ক্রোধ,—সেই যুক্ত সৰ্ব্বকণ । ২৮
 যজ্ঞ-তপ-দান-গোষ্ঠা, অৰ্জুন । সৰ্ব্বলোকের
 আমি মহেশ্বর,
 সূর্য্য সৰ্ব্ব ভূতের, আত্মাকে জানিয়া শান্তি
 লভে সেই নর । ২৯
 ইতি কৰ্ম্ম সন্ন্যাস যোগ নাম
 পঞ্চম অধ্যায় । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

—*—

ভগবান্ কহিলেন ।

করে যে কর্তব্য কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী ; নহে নিরগ্নি, অক্ৰিয় ।
যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাই যোগ নিশ্চিত ।
সকল অত্যাগী, যোগী নাহি হয় কদাচিত । ২
যোগারোহী সেই মুনি, কৰ্ম্মই কারণ তার ।
যোগাক্রুত সেই জন, শাস্তিই কারণ সার । ৩
ইচ্ছিয় কি কৰ্ম্ম তার নহে যবে অহুষ্ঠান—
সকল সকল-ত্যাগী—যোগাক্রুত তাঁর নাম । ৪
উদ্ধারবে আপনাকে, অবসন্ন নাহি করি,
আপনি আপন বন্ধু, আপনি আপন অরি । ৫
সেই আপনার বন্ধু, সেই জন আত্মজিত ।
আত্ম অরি-জয়ী তথা আপন শত্রু নিশ্চিত । ৬
প্রশান্ত বিজিত—আত্মা রহে পরব্রহ্মধ্যানে,—
শীত উষ্ণে, সুখ দুঃখে,, কিবা মান অপমানে । ৭
জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার, জিতেজিয়,
সেই যোগী, যার লোভ, শিলা, স্বর্ণ, সমস্তিষ । ৮
মধ্যস্থে, দ্বৈধ্য-বন্ধুতে, শত্রুমিত্রে,
উদাসীনে—পক্ষ-বিরহিত,
সাদুতে, পাপীতে আর, সৰ্ব্বত্রে
সমান জ্ঞান, বিশিষ্ট নিশ্চিত । ৯

সতত নির্জনে যোগী করে আত্ম-সমাহিত,—
 একাকী; সংযত, তৃষ্ণা-পরিগ্রহ বিরহিত । ১০
 শুদ্ধস্থানে আপনার স্থিরাসন প্রতিষ্ঠিয়া,
 —নাতি উচ্চ, নাতি নীচ, চেল্যজিন কুশাসন,—
 করিয়া একাগ্রমন, সংযত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া,
 আত্মশুদ্ধি তরে যোগ করিবেক আচরণ । ১১-১২
 সমান করি অচল স্থির কায, গ্রীবা, শির,
 দেখিয়া নাসিকা অগ্র, নাহি দেখি অন্ততর,
 প্রশান্তাত্মা, ভয়হীন ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থির,
 জিতাত্মা, মচ্ছিত, যোগী আসীন হবে মৎপর । ১৩-১৪
 করি আত্ম সমাহিত একপে জিতা হই যোগী,
 পরম নির্বীণ শাস্তি, মৎস্থিতি, হয় ভোগী ॥ ১৫
 নহে অত্যাহার যোগ, নহে যোগ অনাহার,
 নহে অতি নিদ্রা, নহে অনিদ্রা, অর্জুন । আর ॥ ১৬
 নিয়মিত চেষ্টা, কৰ্ম্ম, আহার, বিহার, যাব,
 তথা নিদ্রা, আগরণ—হঃসহারী যোগ তার ॥ ১৭
 যখন সংযতচিত্ত আত্মাতেই স্থিত —
 সৰ্ব্ব-কাম-স্পৃহাহীন ; সেই যোগী অভিহিত ॥ ১৮
 নিবাত স্থানেতে স্থিত নিকম্প প্রদীপ মত,
 অর্জুন । সংযত-চিত্ত যোগী, আত্মযোগ রত ॥ ১৯
 যোগেতে নিরুদ্ধ চিত্ত যাহাতে হয় বসিত,
 আত্মাতে দেখি আত্মায় হয় যাতে সন্তোষিত,—২০
 বৃদ্ধি-গ্রাহ অতি সুখ যাহাতে ইন্দ্রিয়াভীত,
 যাতে আত্মতত্ত্ব হতে নাহি হয় বিচলিত,—২১
 যাহা পেনে অল্প লাভ অধিক না হয় জ্ঞান,
 যহৎ হুঃখেও যাতে না হয় বিকল প্রাণ,—২২

- জানিবে তাহাই যোগ, হৃৎ-সংযোগরহিত,
অনির্বেদ চিত্তে তুমি করিবে তাহা সাধিত । ২৩
কামনা সকল জাত অশেষ করি বর্জিত,
ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা করি পূর্ণ-নিয়মিত । ২৪
ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিবলে নিবৃত্ত হইবে ক্রমে,
আত্মাতে স্থাপিয়া মন, চিন্তা করিবে না মনে ॥ ২৫ ॥
অস্থির চঞ্চল মন, করে বাতে বিচরণ,
তা'হতে নিবৃত্তি করি, রাখিবে বশে আপন ॥ ২৬ ॥
একুপে প্রশান্তমনা যোগীর ব্রহ্ম উত্তম
হয় লাভ, বজোহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মজীবন ॥ ২৭ ॥
এইরূপে আত্মযুক্ত পাপহীন যোগিজন,
অসমরাসে মহাস্বপ্ন লভে ব্রহ্ম-পরশন ॥ ২৮ ॥
আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত,
সর্বত্র সমান-দশা যোগী করে অনুভূত ॥ ২৯ ॥
যে আমাকে দেখে সর্বত্র, সর্বত্র আমাতে আর,
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার ॥ ৩০ ॥
সর্বময় জানিয়া যে অভিন্ন ভজে আমায়,
সর্বত্রৈ থাকিয়াও সে আমাতেই স্থিতি পায় ।
• সর্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
স্বপ্নে হৃৎ-মম মতে সে জন যোগী পরম । ৩১

অর্জুন কহিলেন ।

যেই সামাযোগ তুমি কহিলে, মধুহৃদন !
নাহি দেখি স্থিতি তার চঞ্চলতা নিবন্ধন । ৩২
হে কৃষ্ণ । চঞ্চল মন, দৃঢ়, যত্ন, শক্তির ;
তাহার নিগ্রহ করা বায়ু যত সহকর । ৩৩

ভগবান্ কহিলেন ।

দুর্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো । নিশ্চিত ।
অভ্যাসে, বৈরাগ্যে, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত । ৩৫
অসংযত পক্ষে যোগ হুপ্রাপা, মত আমার ;
উপায়েতে পায় কিন্তু যত্নে আস্র। বশে যায় । ৩৬

অর্জুন কহিলেন ।

শ্রদ্ধাবান অধভাস্রা, যোগেতে চঞ্চল-মতি,
না পাইয়া যোগ-সিদ্ধি লভে কৃষ্ণ । কিবা গতি ? ৩৭
হবে কি উপায়-ভ্রষ্ট, নষ্ট, ছিন্ন মেঘ মত,
ব্রহ্মপথ মূঢ় জন, হইয়া অসিদ্ধব্রত । ৩৮
তুমিই ছেদিতে, কৃষ্ণ ! পার মম এ সংশয়,
তুমি ভিন্ন ছেদিবার আর কারো সাধ্য নহস্য ? ৩৯

ভগবান্ কহিলেন ।

ইহলোকে পরলোকে নাহি হয় সে বিনাশিত,
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কনাশিত । ৪০
যোগভ্রষ্ট, পুণ্য-লোকে বহু বর্ষ করি বাস,
পবিত্র ধনীর গৃহে লভে জন্ম মহেদ্বাস । ৪১
বীমান্ যোগীর কুণে অথবা লভে জনম,—
নরলোকে জন্ম আর দুর্লভ নাহি এমন । ৪২
লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্বজন্মার্জিত ধন,
সিদ্ধিতরে বহু যত্ন করে সে, কুরুনন্দন ! ৪৩
পূর্বাভাসে করে কন্ম অনিচ্ছায় নিয়োজিত,
যোগ-জিজ্ঞাসুই হয় বেদব্রহ্মে প্রবর্তিত । ৪৪
যত্নে যোগাচারী যোগী,—পাপমুক্ত, শুদ্ধমতি,—
বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমা গতি । ৪৫

তপস্বীর শ্রেষ্ঠ যোগী, জানিদেবও শ্রেষ্ঠ হয়,
কর্যাদেবও শ্রেষ্ঠ যোগী, হও যোগী, ধনজয় ! ৪৬
মম মতে যোগি-মধ্যে মঙ্গলত যাহার, মন,—
শ্রদ্ধায় আমাকে ভজে,—সেই যোগী শ্রেষ্ঠতম । ৪৭

ইতি অভ্যাসযোগ নাম

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায়

—*—

ভগবান কহিলেন ।

অনুষ্ঠানে ~~আমি~~ পার্থ ! লইয়া মম আশ্রয় মনাসক্ত মন,
অসংশয় যেই রূপে আমাকে জানিতে পারে, করহ শ্রবণ । ১
সবিক্তান এই জ্ঞান কহিব সম্পূর্ণ, যার
জ্ঞানোদয়ে ইহলোকে জ্ঞাতব্য থাকে না আর । ২
সহস্র মনুষ্য মধ্যে যতনে কচিৎ কেহ সিদ্ধির কারণ,
যত্নশীল সিদ্ধ মধ্যে, যথার্থ আমাকে কেহ জানে কদাচন ।
ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, বুদ্ধি ও মন,
অহঙ্কার,—এই ভিন্ন অষ্টধা প্রকৃতি মম ।
ইহাও অপরা ; অস্ত প্রকৃতি পরা আমার,
জীবভূত, মহাবাহো ! ধারণ করে সংসার । ৫
ইহাতেই সর্বভূত লভে জন্ম বারংবার,
আমি সর্ব জগতের প্রভব-প্রলয়াধার । ৬
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু, হে ভাবত !
আমাতে গ্রথিত বিশ্বস্থজে মণিগণ মত । ৭

সলিলেতে রস আমি, প্রভা শশি-বিভাকরে,
 বেদেতে প্রণব, শব্দ আকাশে, পৌকষ নবে । ৮
 অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্য ভ্রাণ,
 তপস্তা তপস্বিগণে, আমি সৰ্বভূতে প্রাণ । ৯
 সকল ভূতের, পার্থ ! আমি বৌদ্ধ সনাতন,
 জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি, তেজস্বীর তেজ মম । ১০
 বলীদের বল আমি,—কামরাগ-বিবর্জিত,
 ভারত । জীবের আমি কামনা ধর্ম-বিহিত । ১১
 রাজসিক, তামসিক, সাত্বিক যে সব ভাব,—
 আমি নাহি তাতে, সব আমা হতে আবির্ভাব । ১২
 এ ত্রিগুণ ভাবে মুক্ত সৰ্ববিশ্ব চরাচর ;
 অব্যয়, এ হ'তে ভিন্ন না জানে আমাকে নর । ১৩
 এই দৈবী, গুণময়ী মম মায়া মুছন্তু^১ ;
 বাহারা আমাকে ভজে, তবে তারা নিরন্ত^২ । ১৪
 আমাকে চক্ৰ মূঢ় নাহি পায় হবাচার,
 মায়াতে বিলুপ্ত জ্ঞান, আনুগমিক ভাবাধার । ১৫
 চতুর্বিধ পুণ্যবান আমাকে ভজনা করে—
 পীড়িত, গুহ-জিজ্ঞাসু, আর্ধকাজী, জ্ঞানী নবে । ১৬
 ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী একভক্ত মম,
 হেন জ্ঞানী প্রিয় আমি, সেও মম প্রিয় জন । ১৭
 ইহারা সকলে শ্রেষ্ঠ, সিন্ধু মম
 মতে জ্ঞানী স্বরূপ আত্মার ।
 হইয়া মদেকচিহ্ন লভে অদ্বৈতম গতি,
 অশ্রয় আমার । ১৮
 লভি বহু জন্ম অস্তে এই জ্ঞান—“কৃষ্ণ সব,”
 যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা মুছন্তু । ১৯

কামে হতজ্ঞান বারং পূজে অস্ত্র দেবগণ,
 আপন্ন প্রকৃতি মতে নিয়ম করি পালন । ২০
 যে ভক্ত যে মূর্তি মম শ্রদ্ধায় করে আর্জিত,
 অশ্রু তাহার শ্রদ্ধা তাহাতে করি স্থাপিত, ২১
 কদর আরাধনা তার হয়ে দৃঢ় শ্রদ্ধাবিত,
 পায় পরে আমি হ'তে বাঞ্ছিত বিহিত হিত । ২২
 লভে ক্ষণস্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানিগণ ।
 দেবযাজ্ঞী পায় দেব, আমাকে মদন্তজ্ঞান । ২৩
 অব্যক্ত আমাকে বাক্ত ভাবে বুদ্ধিহীনগণ ;
 না জানে পরম ভাব অধ্যায় ও অন্ততম । ২৪
 প্রকাশ সর্বত্র নহি যোগমায়া সমাবৃত ;
 অজ্ঞান অব্যয় আমি, মুখ লোকে অবিন্দিত । ২৫
 জানি আমি ব্রহ্মান, পার্থ ! ভবিষ্যত, ভূত ;
 আমাকে না জানে কেহ, জানি আমি সর্বভূত । ২৬
 হে ভারত ! বন্দ মোহে ইচ্ছা-দেহ-সমুখিত
 সৃষ্টিতে, হে পরম্পর । সর্বভূত সম্মোহিত । ২৭
 সেই পুণ্যকর্মীদের হইয়াছে পাপ গত,
 বন্দ-মোহ-মুক্ত, ভজে আমাকেই দৃঢ়ব্রত । ২৮
 জরা-মরণ-মোক্ষার্থ যতনে যে মমপ্রিত,
 হয় সে অধ্যায়-ব্রহ্ম, অখিল কর্ম বিদিত । ২৯
 অস্থিত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ জানে,
 যাহারা আমায়,
 আমাকে সে যোগিগণ, প্রমাণ কালেও পার্থ !
 জানিবারে পায় । ৩০
 ইতি বিজ্ঞানযোগ নাম
 সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

—*—

অৰ্জুন কহিলেন ।

কি সে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম কি, কৰ্ম কি, পুরুষোত্তম ?
 অধিভূত, অধিদেব, কাৰে বলে, অনাদিন ? ১
 অধিযজ্ঞ কিবা রূপ ? কে দেহে, মধুসূদন ?
 কিরূপে মরণকালে জানে তা সংযমিগণ ? ২

ভগবান্ কহিলেন ।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম—স্বভাব তাঁর ।
 ভূত জন্ম বুদ্ধি-প্রাণ বিসর্জন—বর্ষসার । ৩
 অধিভূত,—ক্ষর-ভাব ; পুরুষ,—আধিদেবত,
 অধিযজ্ঞ আমি দেহে, হে দেহিশ্রেষ্ঠ ভারত ! ৪
 অন্তকালে আমাকেই স্মৃতি দেহযুক্ত হয়,
 যে জন, আমার ভাব প্রাপ্ত হয় অসংশয় । ৫
 যে যে ভাব স্মরি মনে ত্যজে অস্তে কলেবর,
 সে সে ভাব পায়, পার্থ ! সে ভাব-ভাবিত নর । ৬
 অন্তএব সর্বকালে আমাকে স্মরিয়া, যুদ্ধ কর, ধনঞ্জয় !
 আমাতে মানস বুদ্ধি হইলে অর্পিত পাবে আমাকে নিশ্চয় ।
 অভ্যাস-যোগেতে যুক্ত হইয়া অনন্তমন,
 চিন্তি, পার্থ ! হয় লাভ পুরুষ দিব্য পরম । ৮
 কবি ও অনাদি, নিরস্তা বিখের,
 হৃদয় হ'তে হৃদয়, করে যে স্মরণ,—
 সকলের খাতা, অচিন্ত্য স্বরূপ,
 ভয়ঃ হ'তে শ্রেষ্ঠ আদিত্য বরণ । ৯

করি মৃত্যুকালে চিত্ত অবিচল

ভক্তিবৃদ্ধ, যোগবলে যেই জন

ক্রমধ্যে করিয়া প্রাণ সমাবেশ

চিন্তে, পায় দিব্য পুরুষ পরম । ১০

কহে বেদবিৎ অক্ষর বাহার,

পুণে যাতে বীতরাগ ব্যক্তিগণ ;

করে ব্রহ্মচর্য ইচ্ছিয়া বাহার,

কহিব সংক্ষেপে সে পদ কেমন । ১১

করি ব্রহ্ম সৰ্বদ্বার, হৃদয়ে নিরুদ্ধ মন,

মন্তকে নিবেশি প্রাণ, করিয়া যোগ ধারণ । ১২

উচ্চারি ওঁ কার ব্রহ্ম, আমাকে করি স্মরণ

যে যা ত্যজিয়া দেহ, সে পায় গতি পরম । ১৩

সত্ত্ব অনন্তচিত্ত আমাকে যে নিত্য স্মরে,

সুশ্রুতে আমাকে পায় নিত্যযুক্ত যোগিবরে । ১৪

আমাকে পাইলে সিদ্ধ পরম মহাত্মাগণ,

অনিত্য হুঃখালয়ে পুনঃ না লভে জনম । ১৫

অব্রহ্ম-ভুবন লোকে, সকলই পুনঃ পুনঃ হয় আবর্তিত ।

আমাকে পাইতে কিন্তু, পার্থ ! পুনর্জন্ম নাহি হয় কদাচিত্ত । ১৬

সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,

• যাত্রি যুগ সহস্রান্ত,—জানে দিব্যরাত্রিবিৎ । ১৭

অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন,

সে রূপ আসিলে যাত্রি অব্যক্ততে হয় লীন । ১৮

ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়,

যাত্রিতে অবশ থাকে, দিবসেতে জন্ম হয় । ১৯

ব্যক্তাব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,

সর্বভূত হ'লে নাশ, না হয় বিনাশ যাব । ২০

অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি-প্রধান,
 যাহা পেলে নাহি জন্ম—আমার পরম ধাম । ২১
 সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্তভক্তিতে লাভ,
 সর্বত্র অস্তঃস্থ যার, সবে যার আবির্ভাব । ২২
 যেই কালে যোগীদের হয় জন্ম, নাহি হয়
 মরণান্তে, সেই কাল কহিতেছি ধনজয় ! ২৩
 অগ্নি সম শুক্ল দিন, যথাস উত্তরায়ণ,—
 সেকালে মরিলে, ব্রহ্ম পায় ব্রহ্মজ্ঞানিগণ । ২৪
 ধূম্র কৃষ্ণংর্ণ রাত্রি, যথাস দক্ষিণায়ন,—
 পাইয়া চন্দ্রের জ্যোতি করে যোগী নিবর্তন । ২৫
 জগতের নিতারূপে শুক্ল কৃষ্ণ গতিদ্বয়,
 এক হতে অনাবৃতি, অস্ত্রে পুনর্জন্ম হয় । ২৬
 জানিলে এ পথ যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিত,
 অতএব সর্বকালে হও তুমি যোগাধিত । ২৭
 কিবা বেদে, যজ্ঞে কিবা তপস্যায়,
 দানে, পুণ্যকল যাহা আদেশিত ।
 ইহা জানি, লভে সেই সব ফল,
 শ্রেষ্ঠ আন্ত হানে, যোগী যোগাধিত । ২৮

ইতি অক্ষয় ব্রহ্মযোগ নাম

অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

—*—

ভগবান্ কহিলেন ।

অস্বাভাবিহীন তুমি, কহিব তোমাকে এই কথা শুহতম,—

বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান,—যাহাকে জানিলে হবে, অন্তত মোচন । ১

শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, শুহশ্রেষ্ঠ, পবিত্র ইহা উত্তম,

প্রত্যক্ষ, ধর্ম্মানুগত, সুখ-সাধ্য, সনাতন । ২

এই ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষেরা কোন মতে

না পেয়ে আমাকে, ত্রমে মৃত্যুসংসারের পথে । ৩

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্বব্যাপিত ;

আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নাহি তাতে স্থিত । ৪

দেখ ঐশ্বরিক যোগ—অর্জুন ! আমাতে নহে

স্থিত ভূতগণ ।

ধারক, পালক আমি—মম আত্মা ভূতস্থিত নহে

কদাচন । ৫

যথা আকাশেতে নিত্য সর্বগামী মহাবায়ু করে অবস্থান,

সেইরূপে সর্বভূত আমাতেই অবস্থিত,

• জানিও প্রমাণ । ৬

কল্পকয়ে সর্বভূত আমার প্রকৃতি পায় ।

কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি আমি পুনরায় । ৭

অবিলম্বি স্বপ্রকৃতি সৃষ্টি আমি বারংবার ।

প্রকৃতি-বশে অবশ অধিল ভূতসংসার । ৮

সেই সব কর্ম্মে বদ্ধ নহি আমি, হে ভাবত !

অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত । ৯

প্রকৃতি অধ্যক্ষে যম স্বজে এই চরাচর ।

এই হেতু জগতের বিপর্যয়, বীরবর । ১০

আমাকে ভাবিয়া দেহী অবজ্ঞে বিনুচরণ ।

না জানে পরম ভূত—মহেশ্বর শিব মম । ১১

বৃথা আশা, বৃথা কৰ্ম, বৃথা জ্ঞান,

তাহাদের চিত্ত বিচলিত,

মোহিনী রাক্ষসী আর আহুিক

প্রকৃতি হইয়া আশ্রিত । ১২

মহাপ্রাণ কিস্তি, পার্শ্ব দিয়া দৈব

প্রকৃতিকে কনিদা আশ্রয়,

আমাকে অনন্তমনে ভাজে,

জানি ভূতদেব আমি তাই পায় । ১৩

সতত কীৰ্ত্তন বরি যত করি দৃঢ়ভক্তি

সভক্তি প্রণাম করি, পূজা করে নিত্য ভক্তি । ১৪

জ্ঞানযজ্ঞে অপমোহে বা আমাকে বিধিত মুখ করিয়া রাজনা,

একমেব বা পৃথক্বে, বহু প্রকারেতে যম করে উপাসনা । ১৫

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, স্বপ্ন ও ঔষধ আমি,

আমি মন্ত্র, আমি আজ্ঞা, আমি অগ্নি, হত আমি । ১৬

পিতা আমি জগতের, মাতা, ধাতা, পিতামহ ।

পবিত্র ওকার-জ্যেষ্ঠ ঋক, সাম, যজুঃ সৎ । ১৭

পাতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, রক্ষী, বন্ধ, ভোগস্থান.

ঔৎপত্তি প্রলায়, স্থিতি, অব্যয় বীজ নিধান । ১৮

আমি দিই তাপ, বর্ষা আকর্ষি বর্ষি, পাণ্ডব !

অমৃত ও মৃত আমি, সৎ অসৎ আমি সব । ১৯

ক্লেবেদিক সোম-পানী পূতপাপ

যজ্ঞেতে আমাকে পূজি স্বর্গ চাও ।

পেয়ে পুণ্যে তারা স্বর ইন্দ্রলোক,
ভূপে দিব্য দেব ভোগ অমবায় । ২০
ভূমি বিশাল সেই অর্গলোক
আমো, মর্ত্যে পুনঃ পুনঃ পুণ্যক্ষয়,
এইরূপে হয় ত্রিধর্ম আচারী
সকামীর গতাগত, ধনঞ্জয় । ২১

ঐপাসনা করে যারা করি এক মনে ধ্যান,
সেই নিত্যযুক্তদেব যোগ-সিদ্ধি করি দান । ২২
যারা প্রকাষিত করে পূজ্যে তত্ত্ব শ্রেষ্ঠতায়,
তারা অবিশিষ্টে, কোন্দেশ ! পূনে আমায় । ২৩
সকল কল্মষ আশিষ্যে, তুমি শুভ নিশ্চিত,
আমাকে না জানি তুমি হয় পুন আবর্তিত । ২৪
দেবরাজী পারি পুনঃ, পিতৃহত্যী পিতৃগণ,
ভূতযাগী ভূতগণ, আমাকে বদ্যাজী জন ।
কর্তব্যে যে জন দেয় পাত্র, পুষ্প, ফল, জল,—
যদি আমি, পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল ॥ ২৬
তোমার সকল কৰ্ম্ম, আহুতি, দান, ভোজন,—
কৌন্তেয় । তপস্তা তব,—আমাতে কর অর্পণ ।

যুক্ত হয়ে শুভাশুভ কৰ্ম্মফলবন্ধনের এইরূপ দায়,
দয়াল যোগেতে হ'য়ে যুক্ত-আত্মা, জন্মনুক্ত পাইবে আমায় । ২৮
• সর্বভূতে সম আমি, নাহি দ্বৈত, প্রিয় মম ।
আমি তাতে, সে আমাতে, ভক্তিতে ভজে যে জন । ২৯
আমাকে অনন্তভাবে ভজে যদি হুবাচার,
সেও সাধু, সত্যপথে, পার্থ । অহুষ্ঠান তার । ৩০
ধর্মীয়া হইয়া শাস্ত্র পায় সে শান্তি পরম;
কৌন্তেয় । জানিও, নাহি নষ্ট হয় ভক্ত মম । ৩১

আমাকে আশ্রয় করি পাপজন্মা ছরমতি,
নারী, বৈশ্য, তথা শূদ্র প্রাপ্ত হয় শ্রেষ্ঠ গতি । ৩২
তখন, ব্রাহ্মণভক্ত পুণ্যবান রাজর্ষির

কথা কি আবার ?

অনিত্য, অসুখপূর্ণ, পেয়ে ইহলোকে, কর

ভজনা আমার । ৩৩

মদ্রক্ত, মদগত-চিত্ত, হও মম উপাসক,

কর নমস্কার ।

যুক্তায়া যৎপরায়ণ এক্রুপে হইলে, পাবে

একত্ব আমার । ৩৪

ইতি রাজাবতী রাজগুহ্য যোগিনাম

নবম অধ্যায় । ২ ।

দশম অধ্যায়

ভগবান্ কহিলেন

কহিব পঞ্চম কথা, মহাবাহো ! পুনরায়
—প্রীত হইতেছ তুমি—তব হিত-কামনায় । ১

না জানে প্রভাব মম মহর্ষি কি সুরগণ ।

সর্বরূপে তাহাদের আমি আদি সনাতন

যে জানে অনাদি আমি সর্বলোক মহেশ্বর,

হয় সর্বপাপযুক্ত সেই মোহ-হীন নর । ৩

বুद्धি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্রমা, সত্য, দয়, শম,

স্বয়ং দ্রুত, ভাবাতাব, ভয়ভয়, অরিন্দম । ৪

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান যশোযশ,—
 আমা হতে ভূতগণ হয় ভিন্ন ভাববশ । ৫
 পূর্বে সপ্ত ঋষি, পরে চারি মহু, হে পাণ্ডব ।
 আমার মানসজাত,—যাহা হতে প্রজা সব । ৬
 মম এ বিভূতিযোগে হয় যাব জ্ঞানোদয়,
 নিশ্চয় সে যোগযুক্ত, তাহাতে নাহি সংশয় । ৭
 আমি সর্বস্রষ্টা, সর্ব আমা হ'তে প্রবর্তিত,—
 ইহা জানি আমাকেই ভজে জানী ভাবায়িত । ৮
 যচ্ছিত, মদগতপ্রাণা, দিয়া জ্ঞান পরম্পরে ;
 কহি নিত্য মম কথা, তোষণ রমণ করে । ৯
 সপ্রেম ভজনাকারী সেই নিত্যযুক্ত গণে,
 সেই বুদ্ধিযোগ, যাতে পায় আমি- সনাতনে । ১০
 নাশি অহঙ্কা করি আত্ম ভাবে হ'য়ে স্থিত,
 তাদের অজ্ঞান তম, জ্ঞানদীপে প্রজলিত । ১১

অর্জুন কহিলেন ।

পরম পবিত্র তুমি, পরব্রহ্ম, পরধাম ;
 নিত্য ব্রহ্ম, দিব্য, অজ, আদিদেব ভগবান—
 কহেন ঋষিরা সর্বে, দেবর্ষি নারদ মুনি,
 অসিত, দেবল, ব্যাস,—স্বয়ং কহিলে তুমি । ১২—১৩
 মনে হয় সব সত্য কহিলে বা, হে কেশব !
 ভগবন্ ! তব কাক্সি না জানে দেব দানব । ১৪
 আপনাকে আপনিই জ্ঞান, হে পুরুষোত্তম !
 দেবদেব ! জগৎপতে ! ভূতেশ ! ভূতভাষন ! ১৫
 কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতিচয়,
 করিতেছ অবস্থিতি ব্যাপী যাহে লোকজয় । ১৬

হে যোগিন্ ! কি ভাবে চিন্তি, পাব আমি তব জ্ঞান ?
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান্ ? ১৭
বিভূতি ও আশ্রয়োগ সবিস্তাবে, জনাৰ্দ্দন !
কহ পুনঃ সে অমৃত শুনি তৃপ্ত নহে মন । ১৮

ভগবান্ কহিলেন ।

অনন্ত, অসংখ্য, মম দিব্য আশ্রয়বিভূতির
কহিব প্রধান যাহা তোমাকে, হে কুরুবীর ! ১৯
আমি আশ্রা, গুড়াকেশ ! সর্বভূত-অন্তর্ধ্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, ভূতদের অন্ত আমি । ২০
আদিভ্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানে শ্রীভাক্ষর,
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর । ২১
বেদ মধ্যে সাম বেদ, দেবতা মধ্যে বাসব,
ইন্দ্রিয়েতে মন, ভূতে চেতনা আমি, পাণ্ডব । ২২
শকর রুদ্রের মধ্যে, যক্ষে রক্ষে বিত্তেশ্বর,
স্বমেক শিখরিগণে, বহু মধ্যে বৈশ্বানর । ২৩
পুরোহিত মধ্যে, আমি বৃহস্পতি, ধনুর্ধর ।
কার্ত্তিক সেনানী মধ্যে, সরসী মধ্যে সাগর । ২৪
মহর্ষিতে আমি ভৃগু, বচনে আমি ওঁকার,
যজ্ঞে আমি জপ-যজ্ঞ, স্থাবরে হিমাঙ্গি আর । ২৫
অশ্বথ সকল বৃক্ষে, আরদ দেবর্ষিগণে,
গন্ধর্ব্বেষু চিত্রবথ, কপিল সংস্কৃত জনে । ২৬
অশ্বগণে উচ্চৈঃশ্রবা অবৃত সাগর-জাত,
গজেন্দ্রেতে ত্রিবাযত, নবগণে নরনাথ । ২৭
যেহু মধ্যে কামধেহু, অঙ্গগণে আমি বাজ ;
আমি কাম্যকারী কাম, বিষধরে নাগরাজ ;

নির্দ্বিষ নাগে অনন্ত, জগত্রে পাশী আমি ;

• অৰ্য্যমা পিতৃগণেতে, জিতেজিবে মৃত্যুস্বামী । ২৮-২৯

দৈত্যেতে আমি প্রহ্লাদ, কাল সংখ্যাকারিগণে ;

পশুগণে আমি সিংহ, বৈনতেয় বিহঙ্গবে । ৩০

বেগগামী মধ্যে বায়ু, শক্তিগণে দাশরথি,

মৎস্তেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী । ৩১

• সকল সৃষ্টির আমি আদি, অন্ত, মধ্য পার্থ ।

বিদ্যায় অধ্যাত্ম বিজ্ঞা, বাদ্যের আমি বাদ্যার্থ । ৩২

অক্ষরে আমি অকার, সমাসেতে দ্বন্দ্ব আমি ;

আমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ বিশ্বস্বামী । ৩৩

আমি সৰ্ব্বহর কাল, ভবিষ্যৎ কল্পাদির

উদ্ভব কারণ,

স্বায়ী মধ্যে কীৰ্ত্তি, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা,

রূপ অরূপম । ৩৪

সামবেদে বৃহৎসাম, ছন্দেতে গায়ত্রী বর,

মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে কুহুমাকর । ৩৫

ছলনাকারীর দ্যুত, তেজোর তেজ, অর্জুন ।

জয়, ব্যবসায়, আমি সান্ত্বিকের সব্বগুণ । ৩৬

বৃষ্টিগণে বায়ুদেব, পাণ্ডবে স্নেহবাহন,

কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন । ৩৭

দমনকারীর দণ্ড, জিগীষুর নীতিবল,

শুষ্ক বিষয়েতে মোন, জ্ঞানীদের জ্ঞানোজ্জল । ৩৮

সৰ্ব্বভূত বীজ যাহা, তাও আমি, বীৰ্য্যবান ।

নাহি চরাচর ভূত আমা বিনা বর্তমান । ৩৯

মম দিবা বিভূতির নাহি অন্ত, মহাব্রথ ।

বিস্তর বিভূতি মম,—কহিলাম সংক্ষেপত । ৪০

যে সব ঐশ্বর্য্যাবিত, শ্রীমৎ বা প্রভাবুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত । ৪১
কিংবা এত, পার্থ ! তব কিবা প্রয়োজন জানি ?
একাংশে সমগ্র দ্বিখ বাপিয়া রয়েছি আমি । ৪২

ইতি বিভূতি-যোগনাম

দশম অধ্যায় । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন ।

কৃপা করি আধ্যাত্মিক বিষয় শুহ পুরম
কহিলে যা, তাহে মোহ হইল বিগত মম । ১
শুনিলাম বিভাবিত ভূতদেব সৃষ্টি লয়,
তব কাছে, কমলাক্ষ ! মাহাত্ম্য তব অব্যয় । ২
এরূপে যে আশ্ররূপ কহিলে, পরমেশ্বর ।
ইচ্ছা সেই ঐশী রূপ দেখি তব, নরবর ! ৩
দেখিতে সক্ষম আমি যদি, প্রভো ! মনে হয়,
আমাকে, হে যোগেশ্বর ! দেখাও আত্মা অব্যয় । ৪

ভগবান্ কহিলেন ।

দেখ, পার্থ ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার,—
নানাবিধ, নানাবর্ণ, আমার দিব্য আকার । ৫
দেখ সূর্য্য, বহু, কল্প, মরুত, অশ্বিনীহৃত,
অনেক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, ভায়ত । দেখ অহৃত । ৬

একস্থানে সমুদায় দেখে বিশ্ব চরাচর—

‘দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর ! ৭

‘আমাকে দেখিতে নাহি পাবে তব এ নয়ন,

দিব দিব্য চক্ষু, দেখ ঐশ্বরিক বোণ মম। ৮

সঞ্জয় কহিলেন ।

মহা বোণেশ্বর হরি এত কহি, হে রাজন !

দেখাইলা ধনঞ্জয়ে ঈশ্বর-রূপ পরম ।

অনেক-বদন-নেত্র অদ্ভুত-দর্শন কত ;

বহু-দিব্য-আভরণ দিব্য অস্ত্র-সমুদ্যত । ১০

দিব্য-মালা-বস্ত্র-ধর, দিব্য-গন্ধে সুচর্চিত,

সর্দাশচর্য্য-ময়-দেব, অনন্ত বিশ্ব-ব্যাপিত । ১১

আকাশে সহস্র সূর্য্য হয় যদি সমুখিত,

সেই প্রভা মহাত্মার প্রভা সম কথকিত । ১২

একত্রে সমগ্ৰ বিশ্ব বিভক্ত অনেক রূপ,

দেখিলেন দেবদেব-দেহে পার্থ অপরূপ । ১৩

তখন বিস্মিত পার্থ,—পুলকিত রোমাবলি,—

প্রণমিয়া দেবরূপ কহিলেন কৃতাজলি—১৪

অর্জুন কহিলেন ।

দেখি দেবগণ তব দেব-দেহে,—

তেমতি সকল স্থাবর অঙ্গম ;

পদ্মাসন-স্থিত ব্রহ্মা প্রজাপতি,

ঋষিগণ, আর দিব্য নাগগণ । ১৫

বহু বাহুদয়, বদন, নয়ন,

দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ ;

নাহি অন্ত মধ্য, নাহি তব আদি,

দেখিতেছি, বিশেষ্বর । বিরূপ । ১৬

কিরীট-শোভিত, গদাচক্রধারী,
 তেজোবাণি, সর্বরূপে দীপ্তিমান ;
 দেখি সর্বরূপে হুনিরীক্ষ্য তুমি,
 দীপ্তানল অর্ক-জ্যোতিঃ অবিরাম। ১৭
 তুমিই জ্ঞাতব্য, পরম, অক্ষর,
 তুমিই বিশ্বের পরম নিধান ;
 তুমিই অব্যয়, নিত্য ধর্ম্মাশ্রয় ;
 ময় মতে নিত্য, পুরুষপ্রধান। ১৮
 আদি-মধ্য-অন্ত-বিহীন, অনন্ত-
 বীৰ্য্য বাহু নেত্র সূর্য্য শশধর ;
 দেখিতেছি, মুখ দীপ্তহতাশন
 করিতেছে তেজে তপ্ত চরাচর। ১৯
 স্থানলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ, তুমি
 ব্যাপিয়াছ একা দিক সমুদয় ;
 দেখিয়া অদ্ভুত উগ্ররূপ তব,
 হতেছে, মহাত্মা। ভীত লোকত্রয়। ২০
 এই স্বরূপ পশিছে তোমাতে,
 কেহ ভীত স্তম্ভ করে ঘোড়কর ;
 কহি স্তুতি বাক্য, কবি সিদ্ধগণ
 করে স্তব, স্তুতি কবি বহুতর। ২১
 কজ্জাবিত্য, ইন্দ্র, সাধা দেবতারা,
 অরিনীকুমার, বায়ু, পিতৃগণ,
 গন্ধর্ব্ব ও মরু, অশ্বর-সকল
 করিতেছে লবে বিষয়ে দর্শন। ২২
 মহৎ স্বরূপ, বহু মুখ নেত্র,
 এক বাক্য উক্ত পদ অগণিত ;

হৃদয় বহু কুরাল দশন,
ত্রিলোক ও আমি দেখিয়া ব্যথিত । ২৩
ভঃস্পর্শী, দীপ্ত অনেক-বরণ ।

বিশুভাত্ম, দীপ্ত বিশাল নয়ন,
দধি আস্তরাত্মা হতেছে ব্যথিত,
নাহি পাই ধৈর্য্য, শান্তি, নারায়ণ ! ২৪

কুরাল দশন বদনে ভোমার,
দেখি কালানলসন্নিভ প্রকাশ,
নাহি জানি দিক, নাহি পাই শান্তি,
স্বপ্নসন্ন হও, হে জগন্নিবাস । ২৫

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দেখিতেছি সব,
ভীষ্ম, দ্রোণ, এই সূতের নন্দন,
সকল অবনিপালের সহিত,

সহ স্বর্গীয় মুখ্য যোদ্ধৃগণ । ২৬
পশিতেছে বেগে বদনে ভোমার,
কুরাল দশন-মালায় ভীষণ,
কেহ বা বিলগ্ন দশন অন্তরে,
চূর্ণিতমস্তক, হতেছে দর্শন । ২৭

যথা নদীদেব বহু অব্যবেগ
দিক্-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে ;
তথা এই নরলোক বীরগণ

পশিছে অলস্ত বদন নিকরে । ২৮
যেমতি প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গ

পশে দ্রুতবেগে যবিরারে তরে,
পশিছে নাসার্থ তথা প্রাণিগণ,
দ্রুতবেগে তব বদন-বিবরে । ২৯

করিছ লেহন সর্ব লোকগণ,—

সমগ্র অলস্ত বদনে গ্রাসিত ;

তেজ গুণ করি সমগ্র জপত

উগ্র ভ্রুতি তব করিছে তাপিত । ৩০

উগ্ররূপ তুমি কে আমাকে কহ,

সুপ্রসন্ন হও, নমি দেবধর !

আদ্য তুমি, আমি ইচ্ছি জানিবারে ;

প্রব্রুতি তোমার না হি জানি নর । ৩১

ভগবান্ কহিলেন ।

আমি বৃদ্ধ কাল লোক-সংহারক,

লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন ।

বিনা তুমি আর থাকিবে না কেহ

শ্রুতি-মৈত্রহিত অস্ত্র যোদ্ধৃগণ । ৩২

অতএব উঠ । লভ তুমি বশ ।

কর রাজ্য ভোগ জিনি শত্রুদল ।

পূর্বেই করেছি হত আমি সব,

সব্যসাচি । তুমি নিমিত্ত কেবল । ৩৩

ক্রোধ আর ভীষ, কর, জয়দ্রথ

তেমতি অন্তান্ত বীর যোদ্ধৃগণ,

আমা হ'তে হত, না হবে ব্যথিত,

বৃদ্ধ কব, কর রণে শত্রু জয় । ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন ।

তিনি কেশবের একুশ বচন,

কৃতান্তলি করে স্মিরাটী কল্পিত

কহিলেন, ক্রোধে নমি পুনঃ পুনঃ,

গদগদ করে নমি ভয়ে ভীত । ৩৫

অৰ্জুন কহিলেন ।

উচ্চিত, হে কৃষ্ণ ! তোমার কীৰ্ত্তনে

কয় অঙ্কুরস্ত, হৃষ্টে যে সংসার ;

পলায়ে যে দিগন্তরে বক্ষগণ,

সৰ্ব্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার । ৩৬

কেন না নমিবে, মহাত্মা ! তোমায় ?

ব্রহ্মারও যে আদি-কর্ত্তা গুরুতর ;

অনন্ত, দেবেশ, হে জগন্নিবাস ।

সদসৎ হতে যে শ্রেষ্ঠ, অক্ষর । ৩৭

তুমি আদি দেব, পুরুষ পুরাণ,

তুমি এ বিশ্বের নিধান স্বরূপ,

তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, তুমি মোক্ষধাম,

তুমি বিশ্বব্যাপ্ত, হে অনন্তরূপ । ৩৮

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক,

প্রপিতামহ, ও তুমি ব্রহ্মা আর ;

তোমাকে সহস্র করি নমস্কার,

পুনঃ নমস্কার করি বহুবার । ৩৯

সম্মুখে পশ্চাতে, করি নমস্কার,

সৰ্ব্বদিকে, সৰ্ব্ব । প্রণাম তোমায় ।

তুমি মহাবীৰ্য্য, অমিতবিক্রম,

সৰ্ব্বব্যাপ্ত তুমি, সৰ্ব্ব তুমি তায় । ৪০

সখা জ্ঞানে আমি বলিয়াছি ব'লে—

“হে কৃষ্ণ ! যাদব ! হে সখে আমার !”

প্রমাদে, প্রণয়ে; হইয়া মোহিত,

না জানিয়া তব মহিমা অপার ; ৪১

করেছি অবজ্ঞা করি পরিহাস

আসনে, ভোজনে, বিহারে, শয্যা,
পরোক্ষে, সমক্ষে, অচূত তোমার,—

তুমি অপ্রমেয় কৃষ্ণ সমুদায় । ৪২

লোক চর্যচর সকলের পিতা,

পূজা তুমি, গুরু হতে গণীয়ান,

অতুলপ্রভাব । নাহি তিন লোকে

অন্ত কেহ শ্রেষ্ঠ তোমার সমান । ৪৩

অতএব নমি প্রণত শরীরে

আরাধ্য জৈশ্বেরে, কৃষ্ণ দোষ বত,—

পিতায় পুত্রের, সথায় সথায়,

প্রিয় প্রেমসীর সহে যেই মত । ৪৪

হুই আমি দেখি অদৃষ্ট স্বরূপ,

ভয়েতে ব্যথিত মানস আমার,

দেখাও আমাকে তব দেব-রূপ,

দেবেশ ! প্রসন্ন হও, বিখ্যাত । ৪৫

কিরীট-ভূষিত, গদাচক্ষুধারী,

ইচ্ছা যম দেখি তব সেই রূপ,

ধর চতুর্ভুজ স্বরূপ তোমার,

হে সহস্রবাহো । ওহে বিশ্বরূপ । ৪৬

ভগবান্ কহিলেন ।

প্রসন্ন হইয়া দেখা'রু অর্জুন ।

আত্মবোনে এই শ্রেষ্ঠ রূপ যম,

ভেকস্বী, অনন্ত, আত্ম, বিশ্বরূপ ;

তুমি তিন্ন অস্ত্রে দেখেনি কখন । ৪৭

নাহি বেদে, যজ্ঞে, দানে, অধ্যয়নে,

নাহি ক্রিয়া-বলে, উগ্র তপস্যায়,

নৃপোকে একরূপ, তোমা বিনা আর কুরুশ্রেষ্ঠ !

অন্তে দেখিবারে পায় । ৪৮ .

না হও ব্যথিত, মূঢ়ভাবাপন্ন,

হেন ঘোর রূপ দেখিয়া আমার ;

মম পূর্বরূপ কর দরশন,

ভয়হীন, প্রীতচিত্ত পুনর্বার । ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন ।

বাহুদেব ইহা কহিয়া, অর্জুনে

দেখাইলা স্বীয় রূপ পুনর্বার ।

কবিশ্রী আশ্বস্ত ভীত ধনঞ্জয়ে.

ধরি সোমা বপু মহাত্মা আবার । ৫০

অর্জুন কহিলেন ।

এই মাহুযিক রূপ দেখি তব, জনাৰ্দ্দন ।

হইলু প্রকৃতিগত, এখন প্রসন্ন মন । ৫১

ভগবান্ কহিলেন ।

যেই সূহৃদর্শনীয় নিরখিলে রূপ মম,

দেবগণও নিস্ত্যা কাজ্জী করিবারে দরশন । ৫২

বেদে, তপে, দানে, যজ্ঞে, নাহি পারে কদাচন

দুষ্কিতে একরূপ মম, দেখিলে হুমি যেমন । ৫৩

অনন্ত ভক্তিতে পাবে, অর্জুন ! এ রূপ মম

জানিতে, দেখিতে, তব্ধে প্রবেশিতে, অরিন্দম । ৫৪

মম কৰ্ম্মকারী, অতি যত্নক, কামনাহীন,

সর্বভূতে অহিংস যে, সে হয় আমাতে লীন । ৫৫

ইতি বিশ্বরূপ দর্শননাম

একাদশ অধ্যায় । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন ।

এরূপে সতত যোগে করে তব উপাসনা যেই ভক্তগণ,
অক্ষর অবাক্তে আর পুঞ্জে যারা,—যোগবিৎ কাহারো উত্তম ?

ভগবান্ কহিলেন ।

আমাতে নিবেশি মন, যারা নিত্যযুক্ত করে উপাসনা মম,
পরম শ্রদ্ধার সহ,—ধনঞ্জয় ! মম মতে তারা যুক্ততম । ১

পুঞ্জে যারা ক্ষরহীন, অনির্দেহ, চিন্তাতীত,
সর্বজগামী, অব্যক্ত, জ্বব, স্থিৰ, কুটস্থিত । ৩

সংঘমি ইন্দ্রিয়গণ, সমজ্ঞান সমুদায়,
সর্বভূতহিতে রত,—তারাই আমাকে পায় । ৪

অব্যক্তে আসক্তদের ক্লেশ সমধিকতর,
হৃৎখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর । ৫

মৎপর, আমাতে যারা সর্ব কর্ম করি দান,
অনন্তযোগেতে করে মম উপাসনা ধ্যান, ৬

আমাতে অর্পিত চিত্ত, তাহাদেবে করি পায়
অচিরেতে মৃত্যু যুক্ত সংসারের পারাবার । ৭

আমাতে স্থাপিত মন, কং বুদ্ধি নিবেশিত,
আমাতে দেহান্তে বাস পাইবে তবে নিশ্চিত । ৮

আমাতে স্থাপিত হিঁর চিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয় ! ৯

অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎ-কর্মপর ;
করি কর্ম মম ভবে, পাবে সিদ্ধি, বীরবর । ১০

তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
 যতঃশ্রা হইয়া ত্যাগ কর কৰ্ম-কলাশয় । ১১
 অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হ'তে ধ্যান, শ্রেয়ঃ ;
 ধ্যান হ'তে কলত্যাগ, ত্যাগে শান্তি, হে কোন্ডেয় । ১২
 সৰ্বভূতে ঘেবহীন, মিত্র, সৰুৰূপ-প্রাণ,
 নিৰ্ম্ময়, নিরহঙ্কার, দুঃখ মুখ সমজ্ঞান, ১৩
 কৰ্মী, সদা হুই, যোগী, দৃঢ়ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়,
 মদপিপিত-মন-বুদ্ধি যে ভক্ত, সে মম প্রিয় । ১৪
 না দেয় উদ্বেগ লোকে, নহে যে উদ্বেজনীয়,
 হর্ষ-ক্রোধ-ভরোদ্বেগ-যুক্ত যে, সে মম প্রিয় । ১৫
 শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যাধ, নিস্পৃহ,
 সৰ্বস্বান্ত-পরিত্যাগী ভক্তভক্ত, সে মম প্রিয় । ১৬
 নহে হর্ষ-দেব-যুক্ত ; নাহি শোক-বাজ্বলীয়,
 শুভাশুভ পরিভাঙ্গী ভক্তিমান, মম প্রিয় । ১৭
 শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, তথা মান অপমান,
 অনাসক্ত, শীত উষ্ণে, দুঃখে সমজ্ঞান, ১৮
 তুলা নিকা স্ততি, মোদী, অগ্নে তুই, শূন্য-গৃহ,
 হিরমতি, ভক্তিমান, সেই নর মম প্রিয় । ১৯
 এইরূপ ধৰ্ম্মামৃত বাহাদেব ভজনীয়,
 শ্রদ্ধাযুক্ত মহাভক্ত, তারা মম অতি প্রিয় । ২০

ইতি ভক্তিযোগ নাম

দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

— * —

অর্জুন কহিলেন ।

প্রকৃতি পুরুষ, আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সব,
জানিতে বাসনা করি জ্ঞান ও জ্ঞেয়, কেশব । ১

ভাবানু কহিলেন ।

এ শরীর, হে কৌন্তেয় ! হয় ক্ষেত্র অভিহিত ;
ইহাকে যে জানে তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে পণ্ডিত । ২
ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জান সৰ্ব্বক্ষেত্রে, হে ভারত !
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান—সেই জ্ঞান, মম মত । ৩
সে ক্ষেত্র যাহা, যে রূপ, বিকাশ উৎপত্তি যাহা,
ক্ষেত্র যে, প্রভাব যাহা,—সংক্ষেপেতে কুন তাহা । ৪
বহুযতে, নানা ছন্দে, গাইয়াছে ঋষিগণ,
ব্রহ্মসূত্রপদে, করি হেতুবোগে নিরূপণ । ৫
মহাভূতগণ, বুদ্ধি ঐক্য, ও অহঙ্কার,
দশেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-গোচর স্থাবর, ৬
ইচ্ছা, দোষ, স্বপ্ন, হংস, শরীর, চেতনা, ধৃতি,—
কহিলাম সংক্ষেপেতে এই ক্ষেত্র সবিকৃতি । ৭
প্লাবিত-দম্ব-বিহীনতা, কমা, সরলতাসহ,
আচার্য্যের সেবা, শৌচ, হৈর্য্য, আশ্রম-বিনিগ্রহ, । ৮
ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্যতা, অহঙ্কারহীন মন,
জ্ঞান-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-হংস-দোষ দর্শন, । ৯
আসক্তি সহানুভূতি পুত্র-দারাদি-গৃহে হীন,
ইষ্টে কি অনিষ্ট লাভে সমস্তি চিরদিন, । ১০

আমাতে অনন্ত যোগে ভক্তি ব্যাচীর-হীন,
 শুদ্ধদেশে রমে, জনসংসর্গে রতিবিহীন, ১১
 তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিভাতা,—
 ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্তথা । ১২
 কহিতেছি জ্ঞেয় যাহা—যেই জ্ঞানে মোক্ষ হয়,—
 অনাদি পরম ব্রহ্ম, সৎ অসৎ কিছু নয় । ১৩
 পাণি, পদ, অঁখি, শির, মুখ, শ্রুতি সর্বস্থান,
 আবরিয়া সর্বলোক করিছেন অধিষ্ঠান । ১৪
 সর্বেন্দ্রিয়প্রকাশক, সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত,
 নিঃশব্দ, শব্দের ভোক্তা, অনাসক্ত, সর্বভূত । ১৫
 চরাচর ভূতদের অন্তর বহিরাধার,
 হৃদয় হেতু অবিজ্ঞেয়, দৃশ্য, অন্তরে আর । ১৬
 অবিভক্ত, ভূতগণে বিভক্তরূপেতে স্থিত ;
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রাসকারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত । ১৭
 জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ, তমের পরম তিনি,
 জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য তিনি সর্ব অন্তর্যামী । ১৮
 এই ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়, কহিলাম সংক্ষেপতঃ,
 মম ভক্ত ইহা জানি, হয় মম ভাবগত । ১৯
 উভয় অনাদি জ্ঞান, প্রকৃতি, পুরুষ আর ;
 প্রকৃতি-সমুৎপত্ত সব জানিবে,—শুণ, বিকার । ২০
 কার্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহ,
 স্রষ্টা হঃস্ব ভোগে হেতু পুরুষ,—

প্রকৃতি নহে । ২১

হইয়া প্রকৃতিস্থিত, পুরুষ প্রকৃতিজাত ভুঞ্জে শুণগণ ;
 এই শুণ-সকল, পার্থ ! অসৎ সৎ বোনিতে
 জনম কারণ । ২২

সাক্ষী ও অহুমোদক, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর—
 পরমাত্মা অভিহিত এ দেহে পুরুষধর । ২৩
 এক্রূপে পুরুষে আর প্রকৃতিতে গুণ সহ জানে যেই জন,
 সৰ্ব্বরূপে কর্মরত হইলেও পুনঃ পুনঃ না লভে জনম । ২৪
 কেহ ধ্যানে আপনাতে করে আত্মা দরশন,
 কেহ দেখে সাংখ্য যোগে, কর্ম্যযোগে অস্ত্র জন । ২৫
 না জানিয়া এইরূপ, গুনিয়াই উপাসনা করে অস্ত্র জন,—
 সেই শ্রুতি-পরায়ণ—তারাও অচিরে করে মৃত্যু
 অতিক্রম । ২৬

যাহা কিছু লভে জন্ম, স্থাবর জঙ্গম সব,—
 ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের যোগে, জানিবে, ভরতর্ষভ । ২৭
 সর্ব ভূতে সমভাবে আছেন পরমেশ্বর,
 ভূতনাশে অবিনাশ, যে দেখে সে দর্শী নর । ২৮
 সর্বত্র সমান দেখে জীবের অবস্থিতি,
 না হিংসে আত্মার আত্মা, লভে তাতে শ্রেষ্ঠ গতি । ২৯
 ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সব সর্বথা প্রকৃতিগত
 যে দেখে, সে আপনাকে অকর্তা দেখে সর্বতঃ । ৩০
 যখন পৃথক ভূত একস্থ করে দর্শন,—
 তা হতে উৎপত্তি দেখে,—ব্রহ্মহ লভে তখন । ৩১
 র্নাদি নিগুণ হেতু পরম-আত্মা অব্যয়
 হইয়াও পরীরহ না করে, না লিপ্ত হয় । ৩২
 নির্লিপ্ত হস্ততা হেতু, সর্বব্যাপী সর্বগত আকাশ যেমন
 সর্ব দেহে অবস্থিতি নির্লিপ্তার পরমাত্মা
 নির্লিপ্ত ভেমন ।

যথা একমাত্র ববি প্রকাশে সর্ব জগত,
 তেমতি সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে কেন্দ্রী, ভারত ! ৩৪

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের ভেদ জ্ঞান-নয়নেতে যারা করে দরশন,
ভূতের প্রকৃতি, সৃষ্টি, জানে যারা, করে লাভ
তাহারা পরম । ৩৫

ইতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজবিভাগ যোগ নাম
ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

— * —

ভগবান্ কহিলেন ।

জ্ঞানে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, কহিতেছি পুনরাহ ;
জানি যাহা মুনিগণ সিদ্ধি পরমার্শ পায় । ১
এ জ্ঞান আশ্রয় করি যারা মম ধর্ম্মাশ্রিত,
কৃষ্টি কালে নাহি জন্মে, প্রলয়ে নহে ব্যাধিত । ২
যোনি মম মহদ্বক্ষ, করি তাতে পর্জাদান,
তাতে জন্ম, হে ভারত ! লভে সর্ব্বভূতগ্রাম । ৩
সকল যোনিতে হয় যেই মূর্ত্তি সম্ভাবিতা,
মহদ্বক্ষ যোনি তার আমি বীজপ্রদ পিতা । ৪
সব বক্ষঃ তমঃ গুণ প্রকৃতি-সম্ভব নব,
অব্যয় দেহীকে দেহে নিবদ্ধ করে, পাণ্ডব ! ৫
নির্ম্মলত্ব হেতু সব — প্রকাশক, অনাময়, —
স্ববসঙ্গে, জ্ঞানসঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয় ! ৬
তুষা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাত্মক বজ্রোত্তম,
দেহীকে কর্ণের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জুন ! ৭

সৰ্ব-দেহি-মোহকারী জ্ঞান অজ্ঞানজ তমঃ,
 প্রমাদ ও নিজ্ঞালস্ত্রে করে বন্ধ, অরিন্দম। ৮
 সত্ত্ব স্তবে, রজঃ কর্ণে করে, পার্শ্ব ! সংশ্লেষিত ;
 আবরিয়া জ্ঞান, তমঃ প্রমাদে করে পাতিত। ৯
 জন্মে সত্ত্ব, রজঃ তমে করি, পার্শ্ব ! অভিতূত ;
 রজঃ—সত্ত্ব তমে ; তমঃ—সত্ত্ব রজঃ, কুন্তিত। ১০
 এই দেহে সৰ্বদ্বারে হয়, পার্শ্ব ! প্রকাশিত
 জ্ঞান যবে, তখনই সত্ত্বগুণ বিবর্তিত। ১১
 প্রবৃত্তি, লোভ, উদ্যম, কৰ্ম্মেতে অশাস্ত-স্পৃহা,
 রজোগুণে হয় বৃদ্ধি, হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! ইহা। ১২
 অবিবেক, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ তেমন,
 তমোগুণে হয় সব বর্জিত, কুরু-নন্দন। ১৩
 যখন বর্জিত সত্ত্ব,—যবে যদি দোহিগণ,
 সে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা করে নির্মল-লোকে গমন। ১৪
 রজোগুণে হ'লে লয়, জন্মে কৰ্ম্মাসক্ত যবে ;
 মূঢ়মোহি হয় প্রাপ্ত, তমোগুণে যদি মরে। ১৫
 অকৃত কৰ্ম্মের, পার্শ্ব ! সাধিক ফল নির্মল ;
 রজসের ফল দুঃখ, তমেব অজ্ঞান ফল। ১৬
 সত্ত্ব হ'তে জন্মে জ্ঞান ; রজঃ হ'তে লোভোদয় ;
 প্রমাদ, অজ্ঞান, মোহ, তমঃ হতে, ধনজয় ! ১৭
 সাধিকেরা যায় উর্দ্ধে ; রহে মথো রাজসিক ;
 করে অধোগতি লাভ হীনবৃত্তি তামসিক। ১৮
 যখন না দেখে স্রষ্টা গুণভিন্ন কৰ্ত্তা আর,
 জানে গুণভিন্ন ব্রহ্ম—পায় সে ভাব আমার। ১৯

দেহ-সমুদ্ভূত এই গুণত্রয়

অতিক্রমি আত্মা দেহধারী,

জন্ম মৃত্যু জরা হঃখ-মুক্ত হ'য়ে,

অমৃতের হয় অধিকারী । ২০

অর্জুন কহিলেন ।

কোন লক্ষণেতে, প্রভো ! হয় এ ত্রিগুণাতীত ?

কি আচরে, কিসে হয় ত্রিগুণ অতিক্রমিত ? ২১

• ∴ ভগবান্ কহিলেন ।

প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহে প্রবৃত্ত হইয়া ঘেষ

না করে, নিবৃত্ত হ'য়ে না করে আকাজ্জা লেশ ; ২২

উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত ;

গুণকার্যে রত জানি, রহে যে অচঞ্চলিত, ২৩

সম স্নেহ হঃখ, স্থির, সম লোভ্রীশ্রকাক্ষন,

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়, তুল্য স্তুতি নিন্দা, ধীর মন, ২৪

তুল্য শত্রু-মিত্র পক্ষ, তুল্য মান অপমান,

সর্ববস্ত-পরিত্যাগী, গুণাতীত তার নাম । ২৫

অনন্তভক্তি-যোগেতে যে জন সেবে আমার,

হ'য়ে সর্বগুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায় । ২৬

অমৃত-অব্যয়-রূপ ব্রহ্মের আমি আধার,

স্বাক্ষত ধর্মের, পার্থ ! একান্ত স্নেহের আর । ২৭

ইতি গুণত্রয় বিভাগযোগ নাম

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

— ৩ —

ভগবান্‌ কহিলেন ।

অব্যয় অখণ্ড-রূপী এ সংসার উর্দ্ধমূল,

অধঃ শাখাঘ্নিত ;

বেদ বার পত্রাবলী, তাহাকে যে জন জানে,

সেই বেদবিৎ । ১

অধে উর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,

শুণেতে বর্জিত, বিষয়ে পত্রিত ;

অধঃ অমুগামী বাদনার মূল,—

নবলোকে কর্ম-বন্ধন নিশ্চিত ; ২

আদি, অন্ত, রূপ প্রতিষ্ঠা তাহার,

নাহি উপলব্ধ হয় কদাচিত্ ;

অদৃঢ় শিকড় এই অখণ্ডকে

বৈরাগ্যাদৃঢ়তায় করিয়া ছেদন, ৩

পরে অব্রেষণ করিবে সে পদ,

যথা গেলে নাহি পুনঃ আবর্তন,—

“যা হ’তে বিস্তৃত প্রবৃত্তি, পুরাণ,

লইলু সে আদি পুরুষশরণ ।” ৪

মান মোহ হীন, জিত সঙ্গদোষ,

নিভ্য আধ্যাত্মিক, নিকাম হৃদয়,

স্বখহুঃখরূপ বন্দনানমুক্ত

অমতেবা পায় সে পদ অব্যয় । ৫

চক্রে সূর্য্য অগ্নি তথা নাহি করে দীপ্তি দান,
 বধা গেলে নাহি জন্ম, সে মম পরম ধাম । ৬
 মম অংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন,
 প্রকৃতিস্থ যষ্টেন্দ্রিয়ে, মনে, বসে আকর্ষণ । ৭
 দেহ প্রাপ্তি কালে, আর দেহ
 পরিত্যাগ কালে, করেন গ্রহণ
 জীব ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ লয় সমীরণ । ৮
 চক্ষু, কণ, স্পর্শ, শ্রাব, রসনা, মন, ভারত !
 আশ্রয় করিয়া ভোগ কবেন বিষয় যত । ৯
 উৎক্রামী, স্থিত, ভোক্তা কিংবা এই গুণাশ্রিত,—
 না দেবে বিমূঢ় ; দেখে জ্ঞান-চক্ষু-সমশ্রিত । ১০
 স্নেহবান্ যোগী দেখে অগ্নিতেই অবস্থিত ;
 অকৃতান্না অবিরেকী নাহি দেখে কদাচিত । ১১
 যে আদিতা-ভেজ করে বিভাসিত ত্রিভুবন,
 চক্রেতে অগ্নিতে যাহা, জানিবে সে তেজ মম । ১২
 প্রবেশিয়া পৃথিবীতে ভূতগ্রাম করি আমি বলতে ধারণ
 হ'য়ে রসাতলক সোম করি আমি ঔষধিব

পুষ্টি সম্পাদন । ১৩

হ'য়ে বৈশ্বানর আমি প্রাণীদের দেহগত,
 প্রাণাপান যোগে করি পাক অন্ন চারিমত । ১৪
 সকলের হৃদে সন্নিবিষ্ট আমি,
 আমি স্মৃতিজ্ঞান, অভাব তাহার ;
 সর্ব বৈদ দ্বারা আমি মাত্র জেয়,
 বেদান্তকারী ও বেদবিদ আর । ১৫
 জানিও গুরুব হই লোকেতে— অক্ষর, কব ;
 সর্বভূতগণ কর, কুটস্থ মাত্র অক্ষর । ১৬

উত্তম পুরুষ অত্র পরমায়া অভিহিত ;
 নিত্য ব্রহ্ম বিধে পশি করেন তাহা পালিত । ১৭
 ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম,
 এই হেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম । ১৮
 যে জানী আমাকে জানে এরূপ পুরুষোত্তম,
 সৰ্ব্বভাবে আমাকে সে ভজে সৰ্ব্ববিদ জন । ১৯
 এই গুহ্যতম শাস্ত্র কহিলাম সংক্ষেপতঃ
 বাহা জানি বুদ্ধিমান কৃতার্থ হয়, ভারত । ২০

ইতি পুরুষোত্তম যোগনাম

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

ভগবান্ কহিলেন ।

জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, অস্তর, সবিশুদ্ধতা,
 দান, দম, বজ্র, তপ, স্বাধ্যায় ও সরলতা, ১
 অহিংসা, অক্ৰোধ, সত্য, ত্যাগ, শাস্তি, অপৈশুন,
 দয়া, অলোভতা, লজ্জা, মৃদুতা স্থিরতা গুণ, ২
 তেজ, ক্রমা, ধৃতি, শৌচ, অস্ত্রোহ, অনভিমান,—
 পায় দৈবী-সম্পদেতে অভিজাত পুণ্যবান । ৩
 দম, অভিমান, ক্রোধ, কৰ্কশতা, জ্ঞানাত্যব,
 আত্মবিক সম্পদেতে অভিজাত করে লাভ । ৪

মোক্ষার্থ দৈবী-সম্পদ আশ্রয়ী বন্ধন তরে,
 কেন কর শোক তুমি দৈবী জন্ম লাভ ক'রে ? ৫
 ইহলোকে দেবাসুর সৃষ্ট ভূত ঐহ মত,
 কহিলাম দৈব যাহা ; আসুর গুন, ভারত । ৬
 প্রযুক্তি নিবৃত্তি নাহ জানে আসুরিকগণ,
 নাহি শৌচাচার সত্য তাহাদেব, অরিন্দম । ৭
 অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগত, আশ্রয়িয়া কহে,
 কামহেতু পরস্পর-সমুদ্ভূত ভিন্ন, ইহা আর কিছু নহে । ৮
 অন্ন বুদ্ধি, নষ্ট আত্মা এতাদৃশ দৃষ্টি, পার্থ করিয়া আশ্রয়,
 উগ্রকর্ষা, জগত-অরি, জগতের স্বয়ংহেতু জন্মে, ধনজয় । ৯
 দন্তমানমদাঘিত, কামনা হৃৎস্পর্শী
 করিয়া অশ্রয় ।

সে অশুচি রতিগণ করে মোহে অনুষ্ঠান
 অশুভনিচয় । ১০

আমরণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অপরিমাণ,
 কাম-উপভোগ ক্রব করে পরমার্থ জ্ঞান । ১১
 শত আশাপাশে বদ্ধ, কামক্রোধ-পরায়ণ,
 কামার্থ সন্ধিতে অর্থ অন্বেষণ করে ঘটন । ১২
 “আজ পাইলাম ইহা,—পাব এই মনোরথ,—
 “এই আছে,—পুনঃ ধন ভবিষ্যতে হবে কত । ১৩
 “বধিয়াছি ঐ শত্রু,—অপর করিব হত,—
 “আমি প্রভু ভোগী, সিদ্ধ, বলবান, সুখী কত । ১৪
 “ধনাঢ্য, সজ্জনবান, কে আছে আমার মত ?
 “করিব আমোদ, যজ্ঞ, দান”—কহে মুখ বত । ১৫
 বহুধা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহ-জালে সমাবৃত,
 কামাসক্ত, কামভোগে নবকে হয় পতিত । ১৬

অনন্ত, আত্ম-গর্বিত, ধন-মান-মদাষিত,
 দন্তেতে অবৈধ হয় নাম মাত্র যজ্ঞাবিত । ১৭
 অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধ সমাশ্রিত,
 আত্ম-পর-দেহে ঘেষে আমাকে অসুয়াবিত । ১৮
 ঘেষ্ঠী, ভ্রূণ, মন্দকারী, সংসারে যে নরাধম—
 আত্মরী যোনিতে আমি অজ্ঞান করি ক্ষেপণ । ১৯
 পাইয়া 'আত্মরী' যোনি জন্মে জন্মে মূঢ়মতি
 না পেয়ে আমাকে, পার্শ্ব । পায় ক্রমে অধোগতি । ২০
 নরকের এই তিন আত্মবিনাশক দ্বার,—
 কাম, ক্রোধ, আর লোভ, করিবে তা পরিহার । ২১
 এই তিন তমোহাব বিষুক্ত হইয়া নর,
 আচরিয়া আত্মশ্রেয়ঃ পায় গতি শ্রেষ্ঠতর । ২২
 শাস্ত্রবিধি কবে ত্যাগ যেই কামাগারী জন,
 নাহি পায় সিদ্ধি সুখ, না পায় গতি পরম । ২৩
 কার্য্যাকার্য্য ব্যাংহ্য শাস্ত্রই তব প্রমাণ ;
 শাস্ত্রবিধি মতে কৰ্ম্ম জানি কর অনুষ্ঠান । ২৪

ইতি দৈবান্দ্রবসম্পদ্বিভাগযোগ নাম

যোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন ।

শাস্ত্রবিধি ত্যজি যারা পূজে শ্রদ্ধাবিত মন,
 তাহাদের নিষ্ঠা কৃষ্ণ ! সত্ত্ব, রজঃ, ত্রিবা তমঃ ১৭

ভগবান্ কহিলেন ।

দেহীদের স্বভাবজ সেই শ্রদ্ধা তিন মত,—

সাত্বিকী, রাজসী, আর তামসী, শুন, ভারত ! ২

সৰ্ব্ব অনুরূপী শ্রদ্ধা সকলের, হে ভারত !

শ্রদ্ধাময় নর,—যাব, বাহা শ্রদ্ধা, সে সে মত । ৩

সাত্বিক দেবতা পূজে যক্ষ রক্ষঃ রাজসিক,

ভূত প্রেতগণ অস্ত্রে পূজে যারা তামসিক । ৪

অশান্ত্রবিহিত ঘোর তপে যারা তপাবিত,

দন্ত-অহঙ্কার-যুক্ত, কাম রাগ বলাবিত,

শরীরস্থ ভূতগণ, মূঢ়েরা করে ক্লেশিত—

অস্তরস্থ আমাকেও—আনুরী তারা নিশ্চিত । ৬

আহারও সকলের তিনরূপ প্রিয় পুনঃ,

তথা যজ্ঞে, তপে, দানে আছে এই ভেদ, শুন । ৭

• আয়ুঃ-সৰ্ব্ব বলারোগা-স্বখ প্রীতি-বর্জনীয়.

বস্ত্র, স্নিগ্ধ, হৃদগ্রাহী আহার সাত্বিক-প্রিয় । ৮

অতি-উষ্ণ, কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ,

কৃষ্ণ, বিদাহক, লবণাক্ত আর,

দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ, রাজসিক

জন-প্রিয় এ সব আহার । ৯

গত-বাস, গতরস, পুতি, বাসি দিনাস্তর,

উচ্ছিষ্ট অশুদ্ধ বাহা, তামসের প্রিয় বড় । ১০

নিষ্কর্মীর দ্বারা যজ্ঞ বিধিমতে অনুষ্ঠিত ভাবে যে সাত্বিক,

“মন সমাধান তরে কহিতেছি মাত্র যজ্ঞ,”—

সে যজ্ঞ সাত্বিক । ১১

কল দন্ত তরে হয় অনুষ্ঠিত যেই সব,

রাজসিক যজ্ঞ তাহা জানিবে ভৎসনীয় । ১২

বিধিহীন, অস্বীয় দক্ষিণ-মন্ত্র-বহিত,
 শ্রদ্ধাহীন যেই যজ্ঞ, তামস তাহা কথিত । ১৩
 দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজা, শৌচ, সৰলতা,
 শারীরিক তপ ইহা—ব্রহ্মচর্যা, অহিংস্রতা । ১৪
 অনুবেগকর বাক্য, গতা, প্রিয়, হিতকর,
 স্বাধায়া যজ্ঞাস, —তপ বাধ্য, হে বীদবর । ১৫
 চিত্ত-প্রশন্নতা, সৌম্য, মোন, আত্ম-নির্ঘাতন,
 শুদ্ধভাব,—এই তপ মানস, কুরুনন্দন । ১৬
 শ্রদ্ধাসহ অনাসক্ত যোগিগণ-অনুষ্ঠিত
 এই তিন রূপ তপ, সাধিক নামে কথিত । ১৭
 সুখ্যাতি-মান-পূজার্থ দস্তে অনুষ্ঠিত তপ,—
 চঞ্চল অগ্রব,—তাগা রাজসিক, পরন্তপ । ১৮
 মূঢ়কৃত আত্ম-পীড়া দ্বারা তপ অনুষ্ঠিত,
 কিংবা পর-বিনাশার্থ,—তামসিক অভিহিত । ১৯
 জানিয়া দাতব্য মাত্র অনুপকারিক দান
 যথা দেশে, কালে পাও, —

সাধিক তাহার নাম । ২০

প্রতি-উপকার তবে, কিংবা ক্ষণ-কামনায় .
 ক্রিষ্টভাবে দেয় যাহা,—রাজস কহে তাহার । ২১
 অদেশে, অকালে, যাহা অযত্নেতে হয় দান
 অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা সহ,—তামস তাহার নাম । ২২
 ও তৎসং—ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ নাম আছে নির্দেশিত,
 পুরাকালে তাহা হ'তে বেদ যজ্ঞ প্রাক্কণেবা

হয়েছে বিহিত । ২৩

সে যেহু উচ্চারি "ঐম্" তপঃক্রিয়া যজ্ঞদান
 হের ব্রহ্মবাদীদেব সত্তত যথাবিধান । ২৪

উচ্চারিয়া “সৎ” ফল-অভিসন্ধি ভোগ্যগিয়া,
মোক্ষার্থীরা করে নানা যজ্ঞ তপ দান ক্রিয়া । ২৫
সন্তোষে বা সাধুভাবে হয় “সৎ” প্রযোজিত,
প্রশস্ত কর্ণেতে তথা হয় তাহা নিয়োজিত । ২৬
যজ্ঞে তপে দানে নিষ্ঠা হয় “সৎ” উচ্চারিত ;
তদর্থ কর্মও হয় “সৎ” শব্দে অভিহিত । ২৭
অশ্রদ্ধা হত, দত্ত, কৃত, তপ অমুষ্ঠিত,
না ঐহিক, পারত্রিক ; অসৎ তাহা বিদিত । ২৮
ইতি শ্রদ্ধাক্রিয়বিভাগযোগ নাম

সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

—•—

অর্জুন কহিলেন ।

ত্যাগের ও সন্ন্যাসের, মহাবাহো । ইচ্ছা মম
জানিতে পৃথক তত্ত্ব, হে কৃষ্ণ কেশিনন্দন । ১

ভগবান্ কহিলেন ।

কান্নাকর্ষ-ত্যাগ কহে সন্ন্যাস স্নকবিগণ ;
সর্বকর্ষ-ফল ত্যাগ, কহে ত্যাগ বিচক্ষণ । ২
কহেন মনীষী কেহ, কর্ষ মাত্র দোষবৎ কর পরিহার
অপরে কহেন পুনঃ, যজ্ঞ দান তপ কর্ষ
অত্যাঙ্গা তোমার । ৩

সেই ত্যাগে অম মত, ভারত । শুন নিশ্চিত ।
বীরেন্দ্র ! জিবিধ ত্যাগ হইয়াছে প্রকীর্ণিত । ৪

যজ্ঞ দান তপ কৰ্ম ত্যজিবে না কদাচিত,
 যজ্ঞ দান তপে হয় মনীষীরা পবিত্রিত । ৫
 ত্যজিয়া আসক্তি, কল, কৰ্তব্য ও কৰ্মসব ।
 নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব । ৬
 নিয়ত কৰ্মের ত্যাগ, অৰ্জুন ! নহে উচিত,
 মোহেতে তাহার ত্যাগ তামস নামে কীর্তিত । ৭
 কায়-ক্লেশ তয়ে কৰ্ম হুঃখ ভাবি পরিহার,—
 নাহি তাহে ত্যাগকল, রাজাসিক নাম তাঁর । ৮
 “ইহাই কৰ্তব্য”—ভাবি যে কৰ্ম করে নিয়ত,
 ত্যজি ফলাসক্তি,—ত্যাগ সাধিক তাহা, ভারত । ৯
 না ঘেবে অশুভ কৰ্মে, শুভে অহরজ্ঞ নয়,
 ত্যাগী, তত্ত্বভাবাপন্ন, মেধাবী, ছিন্ন-সংশয় । ১০
 সম্পূর্ণ ত্যজিতে কৰ্ম না পারে দেহী কখন,
 যে কৰ্ম-কলের ত্যাগী, সেই ত্যাগী, বীরোত্তম । ১১
 কৰ্মের ত্রিবিধ ফল—অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্রিত,—
 ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিত । ১২
 মহাবাহো । এই পঞ্চ কারণ হও বিদিত,
 সৰ্বকৰ্ম-সিদ্ধি ওবে কৰ্মাস্ত্র সাংখ্যে কথিত । ১৩
 অধিষ্ঠান—দেহ, কৰ্তা, করণ—ইন্দ্রিয়গণ,
 নানাবিধ চেষ্টা, দৈব, এই পঞ্চ, অরিন্দম । ১৪
 শরীরে, বাক্যেতে, মনে যেই কৰ্ম করে নর,—
 জ্ঞাযা, কি অজ্ঞাযা—হেতু এই পঞ্চ, কুরুবর । ১৫
 তথায় আত্মাকে মাত্র দেখে কৰ্তা যেই জন,
 অকৃতবুদ্ধি বশতঃ—নাহি দেখে সে হুৰ্জন । ১৬
 নাহি অহঙ্কার-ভাব, নহে বুদ্ধি লিপ্ত যার,
 বধি নাহি বধে লোক, নহে নিবদ্ধিত আর । ১৭

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিস্ফুট, — কৰ্ম্ম প্রকর্তক ত্রয় ;
 কাৰুণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা, — এই তিন কৰ্ম্মাশ্রয় । ১৮
 জ্ঞান, কৰ্ম্ম, কৰ্ত্তা, পার্থ । গুণ-ভেদে তিন মত
 গুণ-সংখ্যা শাস্ত্রমতে, — গুন তাহা ষথাবত । ১৯
 সৰ্ব্বভূতে যাতে দেখে একই ভাব অব্যয়, —
 বিভক্তিতে অবিভক্ত, — সে জ্ঞান সাত্বিক কয় । ২০
 পৃথক্বিধ মানাতাব পৃথক্বে যেই জ্ঞান
 জানে সৰ্ব্ব ভূতদেব, — রাজস তাহার নাম । ২১
 বাহ্য সৰ্ব্বেসৰী জানি অহেতুক অর্থার্থ
 এক অন্ন কার্যাসক্ত, — তাহাই তামস, পার্থ । ২২
 নিম্নত, আসক্তিহীন, অরাগ-অদ্বৈত-কৃত,
 নিকামীর কৃত কৰ্ম্ম, — সাত্বিক তাহা কথিত । ২৩
 অহঙ্কারে কামেচ্ছায় হয় যেই কৰ্ম্ম কৃত
 বহল আশাস সহ, — রাজস সে অভিহিত । ২৪
 পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা, সামর্থ, না করি জ্ঞান,
 মোহে প্রবর্তিত কৰ্ম্ম, — তামস তাহার নাম । ২৫
 নিকাম, অনহঙ্কার, ধৃতিযুক্ত, উৎসাহিত,
 সিন্ধাসিন্ধে নিৰ্দ্ধিকার, — সাত্বিক কৰ্ত্তা কথিত । ২৬
 রাগী, কলাকাজী, লোভী, অশুচি ও হিংসাপর,
 হর্ষ-শোকান্বিত, — কৰ্ত্তা রাজস, হে বীরবর । ২৭
 অসভ্য, অসমাহিত, শঠ,
 পর-অপকারী, অনন্ন, অলস,
 কৰ্ত্তব্যে বিবাদ-পর, দীৰ্ঘশ্রদ্ধী যেই জন,
 — সে কৰ্ত্তা তামস । ২৮

বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ গুণতঃ ত্রিবিধ হয় ;

পৃথক অশেষ রূপে কহিতেছি, ধনঞ্জয় ! ২৯

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভব, অভয়,
 বন্ধ, মোক্ষ জানি যাহে,—সে বুদ্ধি সাত্বিকী কয় । ৩০
 যাহাতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য আর,
 হয় জ্ঞান অসম্পূর্ণ,—রাজসী নাম তাহার । ৩১
 অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ভাবে যেই বুদ্ধি তমাবৃত্ত,
 বুঝে সব বিপবীত,—তামসী তাহা কথিত । ৩২
 মন প্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া যে ধৃতি করে ধারণ
 একাগ্র যোগেতে, ধৃতি সাত্বিকী তা, অরিন্দম । ৩৩
 যে ধৃতি করে ধারণ ধর্ম্মকাম অর্থ পুনঃ
 প্রসঙ্গতঃ ফলাকাজী,—রাজসী তাহা, অর্জুন । ৩৪
 যার বলে স্বপ্ন, ভয়, শোক, হুঃখ, অহংকার,
 নাহি ছাড়ে মূঢ়—ধৃতি তামসী নাম তাহার । ৩৫
 এখন ত্রিবিধ সুখ শুভ, যাতে, হে পাণ্ডব !
 অভ্যাসেতে হয় রতি, অঃ হয় দুঃখ সব । ৩৬

যাহা অগ্রে বিষয়ং পরিণামে হয়
 জ্ঞান অমৃত অধিক,
 আত্ম-বিষয়িনী-বুদ্ধি প্রসাদেতে উপজিত,—

সে সুখ সাত্বিক । ৩৭

বিষয়ে ইন্দ্রিয় যোগে অগ্রে যাহা সুখাধিক,
 পরিণামে বিষয়ং,—সেই সুখ রাজসিক । ৩৮
 কিবা অগ্রে, পরিণামে বাহা আত্ম-মোহকর—
 নিজ্ঞানস্ত-শ্রম-জাত,—তামস সে, বীরবর । ৩৯
 নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে দেবগণে, কদাচন
 প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন । ৪০
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের, বীরবর !
 বতাব-সমুত্ত গুণে প্রবিভক্ত কর্ত্তব্য সব । ৪১

শম, দম, তপ, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা-ব্রত,
 যান্ত্রিক্য, বিজ্ঞান, জ্ঞান,—ব্রহ্মকৰ্ম স্বভাবতঃ । ৪২
 শৌৰ্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, দাক্ষ্য, যুদ্ধেতে স্থির নির্ভীক,
 দান, ধৰ্ম্মভাব,—কৰ্ম কত্রিয়েব স্বাভাবিক । ৪৩
 গোবক্ষ্য, কৃষি, বাণিজ্য,—বৈশ্বকৰ্ম স্বভাবতঃ ।
 পরিচর্যাগ্নক কৰ্ম শূদ্রদেব সেই মত । ৪৪
 স্ব স্ব কৰ্মে যত নর পায় সিদ্ধি, হে অৰ্জুন !
 স্বকৰ্মনিরত সিদ্ধি পায় যথা বলি, শুন । ৪৫
 প্রাণীর প্রবৃত্তিদাতা, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
 স্বকৰ্মে পুজিয়া তাঁকে সিদ্ধিলাভ করে নর । ৪৬

সঙ্গ-হ-অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্ম হ'তে

শ্রেয়ঃ স্বধৰ্ম্ম বিশৃণু ;

স্বভাব-নিয়ত কৰ্ম করিলে,

কদাচ পাপ না হয়, অৰ্জুন ! ৪৭

সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ

সহজ কৰ্ম করিবে বর্জিত ;

ধূমাবৃত অগ্নি মত, সৰ্ব কৰ্ম্মারম্ভ

থাকে দোষে আবরিত । ৪৮

সৰ্বত্র অসজ্জবুদ্ধি, জিতাশ্রা, নিস্পৃহ জন,

সন্ন্যাসেতে করে লাভ নৈকৰ্ম্মসিদ্ধি পরম । ৪৯

শিদ্ধি প্রাপ্ত যেই রূপে পায় ব্রহ্ম, হে অৰ্জুন !

জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা যাহা, সংক্ষেপেতে শুন । ৫০

শুদ্ধবুদ্ধি, ধৃতিবলে আশ্রা যার নিয়মিত,

শব্দাদি বিষয়ভাগী, বাগ-বৈষ-বিবর্জিত,

নিরঞ্জনবাণী লঘু-আহারী,

সংযত যার বাক্য, কায়, মন,

নিত্য ধ্যান-যোগ-পর, বৈরাগ্য

সম্যক্ বার হয়েছে গ্রহণ,

অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ, পরিগ্রহ, কাম

ত্যাগিয়া,—নির্জন্ম, শান্ত, ব্রহ্ম করে অবস্থান । ৫১—৫৩

ব্রহ্মভূত, প্রেমদ্বারা, না করে আকাজ্জ শোক,

সর্বসমদর্শী, লভে মত্তক্তি—পরম লোক । ৫৪

ভক্তিতে দ্বৈত জানে,—আমি সর্ব চরিত্র ;

জানি তবে আমাকেই করে লাভ অনন্তর । ৫৫

করিলেও সর্ব কর্ম সদা মমাত্রাগত,

মম প্রসাধেতে পায় অব্যয় পুণ শান্ত । ৫৬

চিত্ত দ্বারা সর্ব কর্ম আমাতে অর্পি মৎপর,

বুদ্ধি যোগাশ্রয়ে হও মৎচিত্ত নিরন্তর । ৫৭

মচ্চিত্ত, প্রসাদে মম হও সর্ব হুঃখ পায় ;

হবে নষ্ট, নাহি গুন যদি করি অহঙ্কার । ৫৮

“করিব না যুদ্ধ”—ইহা ভাবিছ যে

অহঙ্কার করিয়া সহায়,

মিথ্যা সে সঙ্কল্প ভব, প্রকৃতিই

নিয়োজিত করিবে তোমায় । ৫৯

যতাবল্য স্বীয় কর্মে নিবদ্ধ হ’য়েও তাহা

করিতে মোহে অনিচ্ছু, অবশে করিবে তাহা । ৬০

সর্বভূত-স্বয়ংতে বিবাদিত,

হে অর্জুন ! আছেন ঈশ্বর ;

যত্নাকৃত সর্ব ভূত মায়াবলে

ভ্রাম্যমাণ করি নিরন্তর । ৬১

তাঁহার শরণ লও সর্বভাবে, হে ভারত !

তাঁহার প্রসাদে পাবে শান্তি ও হান শান্ত । ৬২

গুহ্য হ'তে গুহ্যতর কহিহু জ্ঞান, পাণ্ডব !
 বুঝিয়া অশেষ মতে কর যাহা ইচ্ছা তব । ৬৩
 পুণঃ গুহ্যতম কথা শুন মম, বীরবর্ষভ !
 তুমি অতি শ্রিয় মম, কহিড়েছি হিত তব । ৬৪
 মন্ত্ৰজ্ঞ, মদন্ত-চিন্ত, হও মম উপাসক,
 কর নমস্কার ।

আমাকে পূজাবে সত্য,—প্রিয় তুমি, তব কাছে
 প্রতিজ্ঞা আমার । ৬৫

তেয়াগিয়া সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম লও তুমি
 একমাত্র শরণ আমার ।
 করিও না শোক, পার্থ ! সৰ্ব্বপাপ
 হ'তে আমি করিব উদ্ধার । ৬৬

তপস্যা-শুশ্রূষা-ভক্তি-বিহীন নিন্দকে মম,
 আমার এ কথা তুমি কহিবে না কদাচন । ৬৭
 এ পবন গুহ্য তব, যে মম ভক্তকে কয়
 পরম ভক্তিতে, পাবে আমকে সে

অসংশয় । ৬৮

তাহা হ'তে মনুষ্যেতে নাহি মম শ্রিয়কারী,
 নাহি হবে শ্রিয়তর এ ভবে, গাণ্ডীব-ধারি । ৬৯
 আমাদের এ ধৰ্ম্মকথা যে করিবে অধ্যয়ন,
 জ্ঞান-যজ্ঞে আমারে সে পূজিবে,—

এ মত মম । ৭০

শুনে ইহা যেই নর, অনন্যদ্বন্দ্ব, অন্ধাবান,
 সেও মুক্ত, পায় পুণ্যকারীদের শুভধাম । ৭১
 একাগ্রচিত্তে কি, পার্থ ! করিলে ইহা শ্রবণ ?
 অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন ? ৭২

অৰ্জুন কহিলেন।

নষ্ট মোহ, স্মৃতি-লাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,—
গত ভ্রান্তি মম ; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব। ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণের আর পার্থের, হে নৃপোত্তম !
শুনিলাম এ সংবাদ অদ্ভুত, লোমহর্ষণ। ৭৪
শুনিলু বাস-প্রসাদে এ গুহ্য যোগ পরম,
সাক্ষাৎ ধৌগেশ্বর কৃষ্ণ কহিতে পার্থে স্বয়ম। ৭৫
কৃষ্ণাৰ্জুন এ সংবাদ, অদ্ভুত ও পূণ্যধার,
স্মরিয়া, স্মরিয়া হুট হইতেছি বারংবার। ৭৬
হবিব অদ্ভুত রূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর
হতেছে বিস্ময় মহা, হুট চিন্ত বারংবার। ৭৭
যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুর্ধর,
তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ক্রব, নৃপবর ! ৭৮

ইতি মহাভারতাস্তম্যুত্তর-ভীষ্মপর্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন
সংবাদে মোক্ষযোগ নাম অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

বড় অদ্ভুত গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডী খানি । শূকর-
ভোজীদের হাতে সমস্ত ক্রিতিমণ্ডলের রাজা সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র লাভ
করিয়া বনে বাইতেছিলেন—পথে সমাধি নামক বৈষ্ণব সঙ্কে
সাক্ষাৎ হইল । তিনিও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কাছে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া
একই পথ অনুসরণ করিতেছেন । চন্দ্রনেই মোস ঋষির আশ্রমে
গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর ! একপ অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াও আমার
রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্যজের এমন আদর্শ স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা
•••হইতেছে কেন ?”

তখন ঋষি ঠাকুর, একটি দিগ্‌গজ দার্শনিক, উত্তর দিলেন—

“পতিত মমতাবর্তে, মোহ-গর্তে জীব যত

সংসার স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ ।” ১ মা ৪০

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন মহামায়াটা কে ?

উত্তর—

নিত্য সে জগত মূর্তি বাপ্ত আছে চরাচর ।” ১ মা, ৪৭
আবার—

“সেই নিত্য অভিহিতা হন আবিলুতা যবে

ষেবকার্য্য সিদ্ধি তবে, উৎপন্ন কহে তবে ।” ১ মা, ৪৮

তখন এই কথা বুঝাইতে যেখান ঠাকুর কতকগুলি আবাতে
গল্প ছাঁদিলেন ।

সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান নিজার শেষশব্দ
শ্রুতি। তাঁহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক
দুই অম্বর জন্মিয়া তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মপ্রজ্ঞাপতিকে বধ
করিতে উত্তত হইল। তখন প্রাণের দ্বায়ে ব্রহ্মা নিজাদেবীর
কাছে মহা কাত্য আবেশ করিলেন। ধোমামুদ্রিটি কেবল হালে
প্রচলিত হয় নাই। তিনি নিজাদেবীকে জগৎসংসারের সর্বসর্কা
বলিয়া স্তব করিলেন, নিজাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর
আর কি হইতে পারে? দেবী নারায়ণের সর্ব-শরীর হইতে
নির্গত হইলেন। “নিজাযুক্ত জগন্নাথ” ছবাত্মা মধু-কৈটভের সঙ্গে
পক্ষসহস্র বৎসর বাহ্যরূপ করিলেন। অম্বর দুটা বড় Noble
fellows ছিল। যখন দেখিল যে নারায়ণ কিছুতেই কাণ্ডটার
কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে
লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাহারা বলিল—“আচ্ছা বর
লগ্ন।” নারায়ণ বলিলেন—“আর কি ছাই বর লইব।
আমার বধ্য হও।” একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান—তখন
অম্বর দুটা কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূটনীতি) খাটাইয়া
বলিল—“জল নাই এমন স্থানে আমাদেরকে বধ করা।”
সর্বত্র জল, অতএব হরি নিজ উরুর উপর রাখিয়া তাহাদের
মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চতুর্থ প্রথম মাহাত্ম্য
শেষ হইল।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

অম্বররাজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরুষে শতাব্দী ব্যাপিয়া
যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, দেবরাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ
অবস্থায় তাহাদের উপাসকেরা বেরূপ Political agi-
tation বা রাজনৈতিক আন্দোলন অবলম্বন করেন

দেবতাবাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা এক Deputaion (দল) বাধিয়া জৈশান এবং বিষ্ণুর কাছে গিয়া এক emorial বা দরখাস্ত করিলেন। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে, গ্রাহণীর সান্নিধ্যে, কেবল আমরা, বাকালীরা যে মহাতেজস্বী, তাহা নহে—আমাদের দেবতাদেরও তখন তেজ উধলিয়া পড়ে। সকল দেবতাদের অঙ্গ হইতে এক একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া একটি অতি জ্বালন্ত তেজের তিলোত্তমা সৃষ্টি হইল। দেবতারা সকলে তাঁহারই স্ব স্ব অস্ত্র অর্পন করিলে, তিনি সিংহে চড়িয়া প্রথমে চিকুরাখা বিড়ালখা মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুরের Monster সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

[তৃতীয় মাহাস্ম্য]

তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিষাসুর যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, সে সভ্য সতাই একটা প্রকাণ্ড মহিষ—হুণ্ডে, খুবে, লেজের তোলপাড় করিয়া ফেলিল। মহাতল খুবক্ষুণ্ণ করিল, শূন্যেতে উঠ অচল ছুড়িয়া মাঝিল, লেজের বাড়িতে সমুদ্রের সম্যক জল ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিল, শূন্যে যেবসকল থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিল। মহিষটা আবার বহুরূপীও সাজিল। মাথা কাটিলে থড়গ-পাণি মহাবীর হইয়া দেখা দিল। তার পর মহাগজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তার পর নিজ মহিষমূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী একেবারে exhausted বা অসম্মান হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মেয়ে মানুষ। তখন কিঞ্চিৎ Stimulent বা সুরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন—

“গর্জ গর্জ মুঢ় ! মধু পান করি যতক্ষণ।

তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জিবেন দেবগণ।” ওয়া, ৩৬

তার পর একেবারে হুর্গোৎসব—

ইহা কহি এক লক্ষ্যে আরোহিয়া ক্রোধাকুল
 অশ্রুতে আক্রমি, পদে কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭
 তখন সে পবাক্রান্ত হ'লে অর্দ্ধ বিনিষ্কৃত
 নিজ মুখ হ'তে হলো, দেবীর বীৰ্য্যে সংবৃত। ৩৮
 মুখিলেক মহাপ্রব হইয়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
 অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত। ৩৯
 দেবতারা তখন খুব নাচ গান করিয়া বান্ধালীর Inaugurate
 বা হুগোৎসব প্রচলিত করিলেন।

[চতুর্থ মাহাত্ম্য]

দেবতারা মহা সমারোহে একটি লম্বা চোড়া Thanksgiving
 service বা ধন্যবাদপূর্ব সন্মানন করিলে, দেবী বিপদের সময় দেখা
 দিবেন বলিয়া পেট ভরিয়া খোসামুদি খাইয়া গা-ঢাকা দিলেন।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

দেবতাগণের আবার বিপদ : শুভ নিশ্চয় হই ভাই অশ্রুব,
 তাঁহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আবার
 একটি Monster Meeting করিয়া Resoluion (প্রতিজ্ঞা)
 করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিকুব কাছে একেবারে Di-
 rectly না গিয়া সেই বিকুম্বা ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন।
 নাপেশ্বর হিমাচলে—তখনও সময়টা দার্জিলিং তবে ছিল—Her
 Excellency বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা আর
 একটি দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। এইটী
 আশ্বিনের পাট লবণেরে ধরণের—আলা গোড়া খোসামুদি ও
 সেলাম। “নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমোনমঃ”—খোসামুদিটা
 অমোঘ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। কবিরা যে রমণীগণকে
 ভূজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, কথাটা নিতান্ত কবি-কল্পনা

নহে । দেবী আপনার দেহ-কোষ হইতে কালিকা ঠাকুরাণীকে
'বিনিঃসৃত' করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল দেওয়াইবার জন্ত
নিযুক্ত করিলেন । তিনি একটুকু Humourous Procedure
বা রসিকা কার্য্যপ্রণালী করিলেন । কালোৰূপে হিমাচলটা
আলো করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । দেখিয়া চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড
ঘুরিল । তাহারা যাইয়া শুভ্রকে বলিল—“প্রভো তোমরা
দেবতাদের—

“এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ,?”

কল্যাণী স্বীরত্ন কেন কর না তবে গ্রহণ ” ৫৩

“স্বীরত্নঃ হৃদ্বলানপি”—শুভ্র তাহা জানিতেন । প্রীতিতে
মেঘে মাহুবকে আনিতে স্বগ্রীব দূতকে প্রেরণ করিলেন ।
ঠাকুরাণীট হাসিকা । তিনি বলিলেন—কথাটি ঠিক । শুভ্র ও
নিশ্চিন্ত এমন বীণাবান্ধই বটে । কিন্তু পূর্বে অত্যন্তবুদ্ধিহেতু
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

“যে আমাকে জিনে বণে, করে দর্প চূর্ণ মম,

যে আমার প্রতিযোগী—ভর্তা হবে সেই জন ।” ৬৯

শুভ্র নিশ্চিন্তের সঙ্গে লড়াই ! স্বগ্রীব বুদ্ধিগ মেঘে মাহুবটা
পুাপল । সে তখন কিঞ্চিৎ গরম হইয়া ধমকাইল । মিষ্টি মুখে
ন বান, ত চূলে ধরিয়া নিবে । কিন্তু ঠাকুরাণীট তাহাতে
টলিলেন না ।

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য]

শুভ্র ওনিয়া চাটিয়া লাল । ধুম্রলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন—

“হে ধুম্রলোচন ! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্ত গণে

আনি বলে সে হুট্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে । ৩

পরিজ্ঞাপকারী তার থাকে যদি কোন জন,
হউক অমর, বক্ষ, পক্ষ—করি' হনন।” ৪

তখন ধূম্রলোচন দেবীর কাছে গিয়া কহিল—“ওগো ভাল
মানুষের মেয়ে ।

“শ্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি, অংলা,
নিব তবে যদি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা ।”
দেবী বলিলেন, তাহা হইলে নাগর—
“বলে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি ।”

ধরিতে হাত বাড়াইবামাত্র ধূম্রলোচন এক হকায়ে, ধূম্র
হইয়া গেল । তখন দেবীর নিঃস্বপ্ন বহান্না যথেষ্টরূপে উদরপূরণ
করিলেন । গুনিয়া প্রফুরিতাধর শুভ চণ্ড-মুণ্ডকে হকুম
দিলেন—“সিংহটাকে মাঝিয়া ত্রীলোকটিকে চুলে ধরিয়া আন ।”
বামাঙ্গিনীদের চিরকালই চুল লইয়া দ্বর্ষতি ।

[সপ্তম মাহাত্ম্য

চণ্ড মুণ্ড আপনার কানে আপনি পড়িয়া বুদ্ধে অগ্রসর
। তখন

“অধিকা করিয়া অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসৌর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি । ৪
ললাট কলক হ’তে ক্রুটি-কুটিগাননী
করালবদনা কালী কন্দিয়া সসিপাশিনী । ৫
চিত্তাকাষ্ঠ করে ধরি, নবমালা বিহ্বলা,
ব্যাজচর্চাপরিধানা শুক মাংস
কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা মুখ বিজারিত,
নিমগ্ন বক্ষ নয়ন দিম্বুখ নাদে পূরিত । ৭

ইনি মাহুত ও যোধঘণ্টাসম্বিত আস্ত হাতীগুলো গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শুধু ভীহা নহে, হাতি তবু খাও—কাঠের রথগুলো পর্যন্ত খাইতে লাগিলেন। অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভবলীলা শীঘ্র শেষ হইল। তিনি তাহাদের মুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপদোকন দিলে, চণ্ডিকা তাহাকে চামুণ্ডা Title বা উপাধি দিলেন। আমাদের গবর্ণমেন্টও যদি রাজ্যশূন্য ব্যক্তিগণকে রাজা ও রাণী উপাধি না দিয়া চামুণ্ড ও চামুণ্ডা উপাধি দেন, তাহা হইলে, উপাধিটা উভয়বিধ অর্থ ও শাস্ত্রসঙ্গত হয়।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

শুভ্র তখন নানাজাতীয় বিকৃতনামা দৈত্য-সৈন্য-সহ রক্ত-বীজকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এমন সময় আবার দেবী-দেহ হইতে “শতশিবা নির্নাদিনা” আর এক সংস্করণ নির্গত হইল। নাম শ্বেদুদী। তখন দেবতাদের শরীর হইতেও ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বাগাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী নির্গত হইয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংস্করণ প্রসবে রক্তবীজ দেবতাদের অপেক্ষাও পটু। তাহার এক একটি রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জন্মায়। বড় বিল্বাটেই কথা। তখন এ বন্দবস্ত হইল যে, রক্ত মাটিতে না পড়িতে কালীঠাকুরাণী গিলিয়া ফেলিবেন। চণ্ডিকা এইরূপে এই পৌরাণিক পুরুভূজকে ধ্বংস করিলেন।

[নবম মাহাত্ম্য]

ধবর জিনিয়া শুভ্র নিশুভ্র অতুল কোপ করিলেন। দেবতার দেবীকে In anticipation of জয়—বা জয় হইবার পূর্বেই জয় উপাধি দিলেন। ভয়সা করি উপাধিব্যাধিগ্রস্তেরা এই নুতন

২০৭৬ নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

প্রণালীটা গবর্ণমেণ্টের গোচর করাইবেন। চণ্ডিকা শুলে
নিওন্তের বুক বিদ্ধ করিলে—

“শূল-ভিন্ন বক্ষ হ’তে জনমি’ পুরুষ আর—

মহাবল মহাবীৰ্য্য কহে ‘তিষ্ঠ’ বারংবার ।” ৩৩

দেবী সেই “নিজ্জান্ত ও শঙ্কায়িত শির” কাটিয়া ফেলিলে আর
পাঁচ ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ফা দিলেন ।

[দশম মাহাত্ম্য]

শুভ তখন বলিল যুদ্ধটা কিছু Unfair (অত্যাচার) হইতেছে—

“বলোন্মত্তা ছুটে ! ছুর্গে ! হইও না গরবি ।

অস্ত্র বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী । ২

দেবী একটু Diplomacy বা কূটনীতি খাটাইয়া বালিলেন—

“বা ! অস্ত্র বল কোথায় ?”—

“এ জগতে একা আমি, কে ধম দ্বিতীয় আর ?

আমাতে পশিছে নেথ বিভূতিচয় আমার ।” ৩

তখন ঠাকুরাণীরা সকলে গা-ঢাকা দিলেন। দেবী শুলে
দ্বারা শুভেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিলে—

“মরিল সে পক্ষি ভূমে—দেবী-শূলগ্র-বিক্ষত ।

কাঁপিল সরল পৃথ্বী সসিদ্ধ স্বাপ-পর্জত । ২৩

হত হ’লে ছরান্না প্রসন্ন হইল ভব ।

জগত লভিল স্বাস্থ্য, নিশ্চল হইল নভ । ২৪

উদ্ধা সহ মেঘোৎপত্তি হ’ল, সব প্রশমিত,

নিরাপন্ন নদী পথ চইলে সে নিপাতিত । ২৫

বহিল গুণ্য-বাতাস, অধঃপ্রভ অধঃল,

অলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল । ২৬

বাং। কি কাণ্ডখানা ! বলা বাহুল্য যে ভীক দেবতাগুলো তখন খুব নাচ গান আরম্ভ করিল। তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য গৃহিণীদের দ্বারা নির্বাহ করাইতেনই, নাচ বাদ্যটো ও গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরার উপর বরাদ্দ ছিল। আমাদের মত সে শ্রমটুকুও তাঁহারা নিজে স্বীকার করিতেন না।

[একাদশ মাহাত্ম্য]

তার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া আর একটি লম্বা চোড়া Thanks giving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব নির্বাহ করিলেন। এই কাপুরুষ দেবতারা একটা মুস্কিলে পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইলেন।

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

তখন তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটা দীর্ঘ বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার উপর্যুক্ত চরিতাবলী পাঠের যেক্রম ফল ব্যাখ্যা করিলেন তাহার কাছে হৃৎকণ্ঠে বটিকা কোথায় লাগে ? সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই, তাহা ছাড়া ভুভারতে এমন কিছু নাই, যাহা তাহার দ্বারা নাওয়া যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলে, দেবতারা অবশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া—তখনও Transportation ছিল—আপন আপন অধিকার দখল করিলেন।

মেঘল ঋষি কহিলেন—

“এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বকাল

অগত-পালন তরে লভেন, ভূপ । জনম ।

বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাহাতে বিশ্ব মোহিত,

করেন পূজিতা হ’লে জানোন্নতি প্রদানিত ।

মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাধি মহা কালে নৃপবর ।
তিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টিপ্রসবিনী,
রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই সনাতনী ।
নবের উন্নতি-কালে লক্ষ্মী-বুদ্ধি-প্রদায়িনী ।
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী ধ্বংসকারিণী ।
পুষ্প, ধূপ গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত পুত্র, ধর্মমতি শুভ আর ।” ৩৫—৪১

বেশ কথা ! কিন্তু চর্গাপূজার সময়ে যে মহিষাসুরের এবং
অজ্ঞানদের গরিব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা হয়, কই
তাঁহার ত কোনও বিধান এখানে নাই। উপরে একস্থানে পশু
কথাটা আছে বটে, তেমন আর এক স্থানে চণ্ডমুণ্ডকে “মহাপণ্ড”
বলা হইয়াছে। পশুহননের কথা কোথাও নাই।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

এই সকল গল্প শুনিয়া স্বরূপ রাজা আর বৈজ্ঞানিক—

“দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি পুণিলে সৃজি উভয়ে,
দেবী সূক্ত জপি’ তপে রহিলেন লীন হ’য়ে ।
কভু মিভাহার করি, কভু নিরাহার-ব্রত
সাধি’ থাকিলেন তাঁর ধ্যানে মগ্ন অবিরত ।
পুষ্প-ধূপ-হোম-দানে করিলেন পূজা তাঁর

স্ব স্ব দেহজাত রক্ত দিয়া বলি-উপহার ।” ১৩মা, ১০

ও হরি ! তবে ‘বলি’ শব্দের অর্থ অন্ন ও মহিষ মুণ্ডচ্ছেদন
নহে ? আর আমরা কি “নিজ গাত্ররক্তের” পবিত্রতা পাঠার
রক্ত দিয়া থাকি ? এই সমশ্রেণীকতা তবে অজপুত্রদের গৌরবের

স্বরথ রাজা ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অস্ত্র দ্বয়ে অকর রাজ্য
চাহিলেন, আর—

“হৃৎকিত্ত মানসে বৈশ্র মাগিলেন বরদান

আমার কি ? আমি কি ? আসক্তি নাশক জ্ঞান ” ১১

রাজজাতীয় লোকগুলো কি ত্রিকালই বোরতর স্বার্থ-
পরায়ণ ? দেবী উভয়কে বর দিয়া চলিয়া গেলেন । স্বরথ অস্ত্র
কল্পে সাবর্ণি মনু হইলেন । চণ্ডীমাহ আ এখানে শেষ হইল ।

এখন কথাটা হইতেছে, মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে নিতান্ত গজিকা
দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন বোধ হয় না ।
তিনি স্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব
দেখাইয়াছেন । তিনি ইচ্ছা করিলে যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর
উপন্যাসলেখকের ভাষাও একটি গল্প ছাঁদিতে পারিতেন না, এখনও
বোধ হয় না । তবে এরূপ আঘাতে গল্প লিখিলেন কেন । ইহার
ভিতর কি আর কোন অর্থ আছে ? আজ কালের দিনে বাহাবা
পুঁরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, মনে
করিলাম তাঁহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইব ।
এমন সময়ে এক অপূর্ণ মূর্তি উপস্থিত, আমি মেজাজটা পঞ্চমে
চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কে ?” সে মেজাজটা একেবারে
মগ্ধমে তুলিয়া উত্তর করিল—“মহামহোপাধ্যায় শ্রীমশ্রীকান্ত
চক্রবর্তী—উপাধি তর্কভিন্দিপাল ।”

প্র । মহাশয়ের নিবাস ?

উ । আপাততঃ তোমার বাড়ীতে ।

প্র । প্রয়োজন ?

উ । তিকা ।

আমার হার হইল । আমি ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া

ব্রা। তোমার সঙ্গে শ্রী শ্রীমান কমলাকান্ত চক্রবর্তীর
আলাপ আছে ?

উ। ষংকিঞ্চিৎ।

ব্রা। আমি তাহার নাতি।

আমি মনে করিলাম, সে ত আক্ষিপথের—এ গুলিথোর না
হইয়া যায় না। তখন একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“ভিন্দি-
পাল ঠাকুর! চণ্ডী আপনার পড়া আছে?”

পশ্চীর স্বরে উত্তর হইল—“শরীর পড়া না থাকে, এ
ভূতায়তে কোন মূর্খের পড়া আছে?”

আ। ভাল ভাল, অস্ত্র মূর্খের পড়া না থাকুক, আপনার
থাকিলেই হইল। আচ্ছা ঠাকুর। এমত আঘাতে গল্পের অর্থ কি?

ব্রা। বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে। উহা কি আঘাতে
গল্প নহে?

আ। উহা যে Theory of evolution—বিবর্তনবাদ।

ব্রা। বাপু হে। ইহাও সেই বিবর্তন, আবর্তন, সংবর্তন,
পরিবর্তনবাদ।

একথা কয়টি পাখও এমনি গুরুচিরক্ক মুখতঙ্গির সহিত
ও হাত নাড়া দিয়া বলিল যে আমি তাহাতে কতই চট্টলাম।
বলিলাম—“সাবধান ঠাকুর, বেয়াদপি কর ত তাড়াইয়া দিব।”

ব্রা। মুখে সর্বত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে।
তাহাতে হুঃখ নাই। কিন্তু কথাটা আগে তন। দশ অবতার
বাদের মূলে যে বিবর্তনবাদ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ ?

আ। তনিয়াছি।

ব্রা। চণ্ডীর মূলেও তাই। তুমি গীতা পড়িয়াছ ?

আ। এই গীতা যুগে কেমন করিয়া বলিব পড়ি নাই ?

ব্রা। তবে একবার গীতার সৃষ্টি প্রকরণটা মনে কর—

‘কল্পক্ষয়ে সর্বভূত অমার প্রকৃতি পায় ।
 কল্পারম্ভে তাহাদের সৃষ্টি আমি পুনরায় । ৭
 অবলম্বি’ স্ব প্রকৃতি সৃষ্টি আমি বারংবার ।
 প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার । ৮
 সেই সব কর্ণে বদ্ধ নহি আমি হে ভারত ।
 অনুরক্ত সেই কর্ণে থাকি উদাসীন মত । ৯
 প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর ।
 এই হেতু জগতের বিপর্যায় বীরবর ।” ১০
 এখন চণ্ডীর প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ ।
 “বিশ্ব একাকর্ষক করি যখন শেষে শয়ান
 ভজিলেন যোগনিদ্রা কল্প-অস্ত্রে ভগবান্, ৪০
 বিপ্যাত যধু-কৈটভ তখন অম্বর দ্বয়,
 বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি’ ব্রহ্মা বোধোত্ত হয় । ৫০
 বিষ্ণু-নাভিপদ্মেস্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
 দেখিল। অম্বর উগ্র, জনার্দন স্তম্ভ অতি । ৫১
 স্তম্ভিল। যোগনিদ্রায় হরি-নেত্র-নিবাসিনী
 বিম্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী’ স্থিতি-সংহার-কারিণী, ৫২
 বিষ্ণুর তেজে অতুলা নিদ্রাদেবী ভগবতী,
 হরির চেতনা তরে এক চিন্তে প্রজাপতি ।” ৫৩

অহো কি মহাদৃশ্য ! কল্পারম্ভে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে ।
 ভগবান্ স্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া অখিল-
 সংসার সৃষ্টি করিতেছেন । জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে । বিশ্ব
 একাকর্ষক—ঐশ্বর্য্য সেই অমর সলিল ব্যাপিয়া বিবাজিত ।
 ভগবান্ অনন্ত-শয়ান শয়িত—তিনি “প্রকৃতির বশে অবশ”
 বা যোগনিদ্রাগত উদাসীন ।

“জন্মে সব রজ তমে করি পার্শ্ব! অভিতূত,

রজ—সব তমে; তম—সব রজে কুণ্ডিত।

গীতা ১৪ অ-১০

ভগবানের সৃষ্টি ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা বা রৈজোগুণ তাহার নাতিপন্নস্থিত। কিন্তু সমুদ্রমহানে বা বিবর্তনে মধু ও কৈটভ সব ও তম, অমৃত ও বিষ, অন্নজান ও জগজ্জান সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহার প্রবল। তাহাদিগকে অভিতূত করিতে না পারিলে রজঃ শক্তির কার্য হইতে পারে না—সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভগবান প্রকৃতির বশে অবশ বা নিদ্রাগত। ব্রহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন। ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভরূপী সব তমঃ গুণকে অভিতূত করিলেন। তখন সৃষ্টি-কার্য্য রজোগুণের দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সগিলে মৎস্ত, কৰ্দ্দমে কূৰ্ম্ম ও পরে কৰ্দ্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় হইলে বরাহ সৃষ্টি হইল। চণ্ডীকার কেবল চিকুরাখা বিভালাখা মহাহনু প্রভৃতি বাক্স সৃষ্টির দ্বারা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সৃষ্টির এই তিন যুগের পর একবারে চতুর্থ যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর মহিষাসুর অবতারবাদের নবসিংহ—নন্দাদ্ব পশু, উপরি অর্ক নব। বানর হইতে বা পশু হইতে মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

তাহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যদিকে নিমজ্জ গুপ্ত। দেহ মানবের, হৃদয় পশুর। বিবর্তননীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি হইল। বর্তমান যুগ আরম্ভ হইল। চণ্ডী এখানে শেষ হইয়াছে।

এখন বুলিলে বৈজ্ঞানিকত্ব অনেক সময়ে আঘাতে পন্ন। চণ্ডীকার একরূপ গল্পের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিবর্তনবাদ বুঝাইতে বুঝাইতে Illustration বা উদাহরণের দ্বারা গীতার আরও

কৃষ্ণেকটি মহান তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন । হৃদীর উল্লেখ করিব ।
ভগবানের সেই মহদ্ভাক্য শ্রবণ কর—

যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্মের গ্লানি,
অধর্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে হৃদ্রি আমি ।
সাধুদের পরিভ্রাণ, বিনাশ হৃদ্রতদের
করিতে সাধন,

স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে

জনম গ্রহণ । গীতা, ৪ অ, ৭।৮

চণ্ডীতে দেখি হৃদ্রত দানবেগ সাধু দেবতাদিগের নিগ্রহ
করিলে ভগবানের প্রকৃতি ‘মহামায়া’ রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ
করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করিতেছেন । গীতার ভগবানের
ভাষা বাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও তাহা—

“ঐক্যে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন,

অবতীর্ণা হ’বে আমি বিনাশিব শক্রগণ ।” ৫.

দ্বিতীয়তঃ—

“সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।”

আবার—

• “মন্নিশ্পর্কমিদং প্রোক্তং হৃদ্রে মণিগণা ইব ।”

গীতার এ সকল মহদ্ভাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, পঞ্চম ও
একাদশ মাহাত্ম্যের স্থলনিত অমৃতসান্দিনী স্তবমালা পাঠ কর,
এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগ একাদশ অধ্যায়ের
বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ । গীতার উপযুক্ত জটিল
দার্শনিক তত্ত্বটি চণ্ডীকার তিনটি দীর্ঘ স্তবের দ্বারা জলের মত
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । গীতার সেই—

“প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস ।”

আর চণ্ডীর—

প্রসীদ বিবেচয়ি পাহি বিম্বঃ
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরন্ত ।”

গীতার সেই—

“নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে ।
নমঃ পূরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে
নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।”

আর চণ্ডীর—

“যা দেবী সর্ব ভূতেষু বিকৃণাষেতি শক্তি তা ।
নমস্তস্তৈ ১৪ নমস্তস্তৈ ১৫ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥ ১৬
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেতাভিধীয়তে ।
নমস্তস্তৈ ১৭ নমস্তস্তৈ ১৮ নমস্তস্তৈ নমোনমঃ ॥” ১৯

আবার—

“সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমবিশিতে ।
ভষেতাস্ত্রাহি নো দেবি হর্গে দেবি নমোহস্ততে ॥” ২৪

গীতার সেই—

“কিরীটিনং পদিনং চক্রিণং চ
তেজোরশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।”

আর চণ্ডীর—

শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গং গৃহীতে পবনায়ুধে ।
প্রসীদ বৈকরীকপে নারায়ণি নমোহস্ততে ॥ ১১ যা, ১৬

এখন বুঝিলে কি চণ্ডীগানি গীতার কয়েকটা স্থলতত্ত্বের স্থল
ব্যাখ্যা মাত্র । স্থলবুদ্ধি লোকের জন্তে—অগতে তাহাদের
সংখ্যাই অধিক—এরূপ আবারে গল্পের দ্বারা অটল তত্ত্বের স্থল
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । বেলা হইল—এখন আমার বিদায় দেও ।

মাকণ্ডেয় চণ্ডী ।

আমি বলিলাম কিছুই হইল না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল কই ? এই দেখ শাস্ত্র প্রকরণেব তর্কভূষণ মহাশয় কি বলিতেছেন—“অত্র পার্থিব পরার্থেব সাহায্য বাতিবেকে, তখন (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বক) কত শত গৃহস্থ কেবল দেবীমাহাত্ম্যেব কৃপায়, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত তাহা গণিয়া উঠা যায় না। আর অজ সজ্জাতভিমানী হিন্দু, দেবীমাহাত্ম্য কাহাকে বলে জানেন না—যাষের সম্বন্ধ হইয়া যাষের পরিচয় জানেন না, ও জানিতে চিহ্না করেন না। হিন্দু বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু কাহাকে বলে বুঝেন না। ছুংথে পড়িলে, কাদিয়া দিন কাটাইবেন, তবু একবার সর্বসম্বাপহারিণী জননীকে ডাকিবেন না। না ডাকিবার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ইংরেজী স্কুলে পঠিত হয় না—সাহেবী রুচির বিমল জলে ইহার কোন পংক্তিই খোঁত নহে।”

পাঠ সমাপন করিয়া বলিলাম—“তোমার এই |সাহেবী রুচির বিমল জলে ধৌত” অর্থ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে কি কেহ “ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ?”

ভিন্দিপাল ঠাকুর তখন তিন গ্রাম বাসিণী সপ্তম্বরে একটি Sartor Resartus গোছেব হাসি আৰম্ভ করিলেন। নানাবিধ মূর্খতা খেলিয়া হাসি প্রায় ১৫ মিনিট পরে শেষ হইলে, বেল্লিকটা বলিল—“কথাটা ঠিক। হিন্দু কাহাকে বলে বুঝি না ? হিন্দু তর্ক-ভূষণ মহাশয় কোন অভিধানে পাইয়াছেন, কোন ব্যাকরণ মতে হিন্দু শব্দ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অর্থ বখিয়াছেন তাহা বুঝা বড় সহজ নহে। যবনবিপ্লব হইতে তর্কভূষণ মহাশয়েরা হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি যাবনিক ভাষায় তাহার অর্থ গোলাম। তর্কভূষণ মহাশয়েরা ধর্মগ্রন্থের একরূপ “ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন” অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আর্ধ্যস্থানকে, হিন্দুস্তান

২০৮৬

নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ।

বা গোলামের স্থান এবং সনাতন আৰ্য্যধৰ্ম্মকে হিন্দুধৰ্ম্ম বা গোলামের ধৰ্ম্মে পরিণত করিয়াছেন ।”

একজন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারকের নিগূঢ় অর্থপূর্ণ কথার প্রতি একটা শ্লেষ তুলিয়া, আমি ভয়কর চটিয়া বলিলাম—
“ঠাকুর আমি তোমাকে কিছুই দিব না ।” বেঙ্গিকটা বলিল—
“না দেও ক্ষতি নাই । আমার ব্যাখ্যাটি ছাপাইব ।”

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ।

দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী ।

প্রথম মাহাত্ম্য

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

মার্কণ্ডেয়, কহিলেন,

সার্বর্গি স্বর্ঘ্যাতনয়, অষ্টম মনু কথিত ।
তাহার উৎপত্তি তন মম মুখে বিস্তারিত । ১
মহামায়া প্রভাবেতে বধা মনন্তরপতি
হইলা মহাভাগ, সার্বর্গি স্বর্ঘ্য-সন্ততি । ২
চৈত্র-বংশ সমুদ্ভূত স্বারোচিষ মনন্তরে
আছিল স্বরথ রাজা সমস্ত অবনী পরে । ৩
সমাক প্রজাপালক গুরস পুত্রের মত
ভূপতির ছিল শত্রু কোলা* বিধবংসীরা যত । ৪
সে প্রবল দণ্ডী সহ হলো তাহাদের বশ
নান হয়ে তবু জয়ী হলো কোলধ্বংসিগণ । ৫
হইলে সুপুত্র আসি নিজ দেশ অধিপতি
আক্রান্ত সে অরিগণে হইলেন মহামতি । ৬

* কোলা—শুকরী ।

অপুরেও বলি ছুটে চরাচর অমাত্য ঘর,
 করিল সে হুর্কলের ধন বল অশ্রুত । ৭
 তখন যুগয়াছিলে হুতবাজা নৃপবর
 পশিলা গহন বনে অধিপুষ্ঠে একেশ্বর । ৮
 বিজশ্রেষ্ঠ মেধসেব, রেবিলেন পুণ্যশ্রম
 প্রশান্ত স্বাপদপূর্ণ, মুনি-শিষ্যে স্মশোভন । ৯
 থাকি কিছুকাল তথা সৎকার করি গ্রহণ
 সেই মুনিবরাশ্রমে, ইতস্তত বিচরণ ১০
 করিয়া, চিন্তিলা তবে হইয়া মমতাবীন—
 পূর্ব পুরুষের পুর আমি করিলাম হীন । ১১
 ধর্মতঃ পালিছে কিনা অসম্বৃত্ত ভৃত্যগণ
 নাহি জানি, সে প্রধান সদা মদহস্তি মম
 মম বৈরি বশে গিয়া কি ভোগ পায় এখন । ১২
 প্রসাদে, ধনে, ভোজনে ছিল দ্বারা অমুচর
 তারা সেবিতেছে অল্প ক্রয় অল্প নৃপবর । ১৩
 অসমাত্যবশীল সতত করিয়া বাদ,
 সে অতি দুঃখে সঞ্চিত ঘোষ করিতেছে ক্ষয় । ১৪
 নৃপতি চিন্তিলা সদা একুপ নানা বিষয় । ১৫
 বিশ্রাম কাছে করি বৈশা এক দরশন
 জিজ্ঞাসিলা—“কেহে তুমি ? কোন হেতু আগমন ?
 কিহেতু সশোক আর হর্ষনা করি বর্ণন ? ১৬
 ভূপতির প্রীতি মাথা গুনিয়া বচন চয়,
 নৃপতিকে সেই বৈশা উত্তরিল সপ্রিয় । ১৭

বৈশা কহিলেন,

সমাধি নামক বৈশা বনিকুলে উপস্থিত,
 ধন-লোভি হুঁপুয় দ্বারাহতে নিগৃহীত । ১৮

হয়ে ধনদারাশীন হুত ধন পূজগণে,

• নিরন্ত বন্ধুর হস্তে, হুঃখী আসিয়াছি বনে । ১৯

• নাহি জানি পূজদেব কুশল ও অকুশল,

না জানি কেমন আছে স্বজন দারী সকল । ২০

• মঙ্গল কি অমঙ্গল তাদের গৃহে এখন,

সদৃক্ত হৃদয় কিবা হইয়াছে পূজগণ । ২১

• রাজা কহিলেন,

ধনলুপ্ত যে জ্ঞী পূজে নিরন্ত তুমি এমন,

তাহাদের প্রতি কেন স্নেহবন্ধ কর মন ? । ২২

বৈশ্য কহিলেন,

তাই বটে, কহিলেন আপনি কথা যেমন,

কি করিব নিষ্ঠুর ত নাহি হয় মম মন । ২৩

তাজি পিতৃ পতি স্নেহ যেই ধনলুপ্তগণ

• ঋণায়েছে বনে, স্নেহ তাহাদের করে মন । ২৪

জানিয়াও মহামতি । আমি কি তা নাহি জানি,

হতেছি যে প্রেমাসক্ত বিগ্ণ বন্ধুতে আমি । ২৫

নিশ্বাস তাদের তরে বহিছে করি হর্ষন,

কি করি তাদের স্নেহে নিষ্ঠুর না হয় মন । ২৬

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,

তখন হে বিপ্র ! হ'লো মুনি কাছে উপস্থিত

• সুরথ নৃপসত্তম, সমাধি বৈশ্য সহিত । ২৭

উভয়েতে ষথাবিধি করি পূজা সন্তোষণ,

বসিয়া বৈশ্য পাখিব করিলেন নিবেদন । ২৮

রাজা কহিলেন ।

ভগবন ! ইচ্ছা মম জিজ্ঞাসি এক বচন,

চিহ্ন আয়ত্ততা বিনা বাহাতে হুঃখিত মন, ২৯

জানিয়া অজানী মত অখিল রাজ্যাক্ষে মম
 কি হেতু মমতা মম হতেছে, ধ্বনিসত্তম ? ৩০
 ইনিও স্বী পুত্র ভৃত্য হয়ে গৃহ নির্বাসিত—
 স্বজনে সংত্যক্ত,—কেন তবু হেন দেহাবিত ? ৩১
 এই রূপে ইনি, আমি, অতি দুঃখী দুইজন,
 দৃষ্ট দোষ বিষয়েতে মমত্রে আকৃষ্ট মন । ৩২
 জ্ঞানীরা এমন মোহ মহাভাগ ! হই কেন ?
 জ্ঞানাক্ষের বিমূঢ়তা হয় আমাদের হেন ? ৩৩

স্বামি কহিলেন।

সমস্ত জন্তুর আছে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান,
 পৃথক্ পৃথক্ আছে বিষয়ও, জ্ঞানবান ! ৩৪
 দিবা-অন্ধ কোন প্রাণী, রাত্রি-অন্ধ কেহ আর,
 কেহ দিবা-রাত্রি অন্ধ, তুলা দৃষ্টি পূরঃ কার । ৩৫
 নর জ্ঞানী সত্য, কিন্তু তাহারা নহে কেবল,
 পশু পক্ষী মৃগগণ যেহেতু জ্ঞানী সকল ।
 বাহা পশু পক্ষীদের, সেই জ্ঞান মানুষ্যের,
 মানুষ্যের বাহা, তুলা তথা অস্ত্র উভয়ের । ৩৬
 স্নেহ মোহে দেখে জ্ঞানে ক্ষুধাতুর পক্ষিগণ
 শাবক চক্ষুতে করে মুখস্থ কণা অর্পণ । ৩৭
 মানুষ্য, হে নরব্যাত্ত । অভিলাষী স্ত্রুত প্রতি
 প্রত্যাশার লোভে, দেখনা কি, নরপতি ? ৩৮
 পতিত মমতাবর্তে, মোহ গর্ভে জীব যত,
 সংসার স্থিতিকারীর মহামাদি প্রভাবতঃ । ৪০
 এ নহে বিষয় কার্য্য, হরিয় ইহা নিশ্চিত
 যোগনিজা মহামাদি, অগত তাহে মোহিত । ৪১

জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলে সেই দেবী ভগবতী
আকর্ষি, ঘটায় মোহ মহামায়া হে নৃপতি । ৪২
তাঁহা হ'তে সৃষ্ট বিশ্ব এ জগত চরাচর ।
সে প্রসন্ন বরদাই নরের মুক্তি-আকর । ৪৩
সে পরমা বিজ্ঞা, মুক্তি-প্রদায়িনী সে অমরী,
সংসার বন্ধন হেতু সেই সর্বৈশ্বরেশ্বরী । ৪৪

রাজা কহিলেন,

ভগবন ! কে সে দেবী মহামায়া নাম যার ?
কিরূপে উৎপন্না তিনি হে দ্বিজ ! কি কর্ম তাঁর ? ৪৫
যে স্বভাব, যে স্বরূপ, যাঁহা হ'তে সম্ভাবিত,
শুনিতে সব ইচ্ছা, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ । ৪৬

ঋষি কহিলেন,

নিত্যা সে জগন্মূর্তি ব্যাপ্ত তাহে চরাচর ।
তঁহাপিও শুনু তার সমুৎপত্তি বহুতর । ৪৭
যেই নিত্য্য অতিহিতা ; হন আবির্ভূতা যবে
দেব-কার্য্য সিদ্ধি তবে, উৎপন্না কহে তবে । ৪৮
বিশ্ব একাধ্ব কবি, যখন শেষে শয়ান
ভাজিলে যোগ নিদ্রা কল্প অন্তে ভগবান, ৪৯
বিখ্যাত মধুকৈটভ তখন অহর হয়
বিষ্ণু-কর্ণমূলে জগি, ব্রহ্মা বশোত্তত হয় । ৫০
বিষ্ণু নাভিপদ্মে স্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অহর উগ্র, জনার্দন সৃষ্ট অতি । ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি নেত্র-নিবাসিনী,
বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংসারকারিণী, ৫২
বিষ্ণুর ভেজে অহুলা, নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হকির চেতনা তবে এক চিত্তে প্রজাপতি । ৫৩

ব্রহ্মা কহিলেন,

ভূমি বাহা, ভূমি স্বধা, ভূমি স্বর, বসুটকার * .
 হে অক্ষরে । নিতো । ভূমি স্বধা তিন মাঝা আর । ৫৫
 অর্ধ মাঝা স্থিরা, নিত্য। অহুচাৰ্য্য মাঝা আর,
 ভূমিই সাধিজী দেবী জননী ভূমি সবার । ৫৬
 ধারণ কর সকল, জগৎ কর সৃজন,
 ভূমিই কর পালন, অস্তিম্বে কর ভরণ । ৫৭
 সৃষ্টি স্থলে সৃষ্টিক্রপা, স্থিতিক্রপা সংরক্ষণে,
 জগন্ময়ে ! জগতে সংস্থিতিক্রপা ধ্বংসনে । ৫৮
 মহাবিজ্ঞা, মহামায়া, মহামেধা মহাস্বতি,
 মহাদেবী, মহাস্বরী, মহামোহা, মহাস্বতি । ৫৯
 প্রকৃতিস্থ সকলের গুণত্রয় প্রদায়িনী,
 কালরাজি, মহারাজি, মোহর ত্রি সংহারিণী । ৬০
 ভূমি শ্রী, ঈশ্বরী লজ্জা, বুদ্ধি ও বোধলক্ষণা,
 পৃষ্ঠি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি হুমি লজ্জা নিরুপমা, ৬১
 খড়্গিনী, শূলিনী, ঘোরা, গদিনী চক্রধারিণী,
 শঙ্খিনী, চাপিনী বাণ-ভূষণী পরিঘ-পাণি, ৬২
 সোম্যা, সৌমাতরা, সোম্য হ'তেও অতি সুন্দরা,
 শ্রেষ্ঠার পবন শ্রেষ্ঠা, ভূমিই পরমেষ্ঠরী । ৬৩
 বিশ্বময়ি । সং অসং বাহা কিছু আছে সব,
 তাহাদের শক্তি ভূমি, কি করিব তব গুণ ? ৬৪
 তোমা হ'তে জগতের স্রষ্টাপাতা ধ্বংসকারী
 তিনিও নিমিত্ত,—আমি কি স্তুতি করিতে পারি ? ৬৫
 আমি ও ঈশান, বিষ্ণু হইয়াছি দেহ ধারী
 তোমা হ'তে আমি তব কি স্তুতি করিতে পারি ? ৬৬

মহৎ প্রভাবে তব, হে দেবি ! হইয়া স্তব,
 হৃদয় মধুকৈটভে কর তুমি মোহভূত । ৬৬
 বিশ্ব আমি অচ্যুতকে কর শীঘ্র জাগরিত
 বধিতে এ মহাপ্রব, কর তুমি প্রার্থিত । ৬৭
 বধিতে মধুকৈটভ, জাগাইতে নারায়ণ,
 এক্ষণে তামসী দেবী হইয়া স্তব, তখন ৬৮
 নেত্রান্ত, নাসিকা, বাহু, হৃদয়, বক্ষহতে
 বাহিরি, হইলা স্থিত ব্রহ্মার নয়ন-পথে । ৬৯
 এ চার্নব-নাগ-শয্যা হ'তে উঠি জনার্দন,
 নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ করিলেন দরশন । ৭০
 ছরাত্মা মধুকৈটভ অতি বীৰ্য্য পরাক্রম,
 ব্রহ্মাকে ভক্তগোষ্ঠত ক্রোধেতে বজ্রনয়ন । ৭১
 সুমিলা তাদের সহ, উঠি ভগবান হরি,
 বৎসর পঞ্চ সহস্র, বাহু প্রহরণ করি । ৭২
 তারা অতি বলবন্ত, মহামায়া-বিমোহিত,
 কহিল কেশবে — “মাগ ভোমার বর বাঞ্ছিত ।” ৭৩

ভগুবান কহিলেন ।

তুই যদি আজি, হও মম বধ্য হইজন ।
 কি কাষ অন্ত বয়েতে ? এই মাত্র বর মম । ৭৪

ঋষি কহিলেন ।

সর্ব জলময় বিশ্ব দেখিয়া বঞ্চিতব্রহ্ম
 কহিল কমলেক্ষণ ভগুবানে সে সময়—
 “বধ আমাদের যথা নহে ধরা জলময় ।” ৭৫
 “তাই হ'ক—বলি হরি শঙ্খ চক্র গদাধর,
 চক্রে কাটিলেন শির, রাখি নিজ উরুপর । ৭৬
 এই রূপে সমুৎপন্ন, ব্রহ্মা স্তুতি করে ধার,

সে দেবী প্রভাব আমি কহি গুন পুনর্বার । ৭৭
ইতি মধুটেকটক বধনাম প্রথম মাহাত্ম্য । ১ ।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

দেবাসুরে হ'ল যুদ্ধ পূর্ণ-অশ্ব-শত ধ'রে,
অশ্ব-রাজ মহিষে, দেবরাজ পুরন্দরে । ১
মহাবীৰ্য্য অশ্বরেয়া পরাজিল দেববল ;
জিনিল মহিষাসুর ইন্দ্র ও দেব সকল । ২
প্রজাপতি আগে করি, পরাজিত দেবগণ,
যথায় ঈশান বিষ্ণু, করিলা তথা গমন । ৩
মহিষাসুরের কার্য্য আবৃত্তি করিয়া সব
কহিলেন দেবগণ, বিস্তর সে পরাভব । ৪
“সূৰ্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ষমের আর,
করেছে গ্রহণ নিজে অস্ত্র দেব অধিকার । ৫
দুৰাশ্রয় মহিষ দ্বারা স্বর্গচ্যুত দেবগণ,
মর্ত্যে মাসুকের মত করিতেছে বিচরণ । ৬
অমর শত্রুর কার্য্য এ রূপে হল কথিত ;
লইল শরণ ; হও তার বধে বিচিন্তিত । ৭
এই রূপ দেববাক্য শুনিয়া মধুসূদন
কুপিল। করিলা শঙ্কু ভ্রুকুটী কুটিলানন । ৮
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের অতিশয় কোপাধিত,
হইল বদন হ'তে মহাতেজ নিঃস্রাৱিত । ৯

ইন্দ্র আদি দেবদেব দেহ হ'তে বিনিঃসৃত
সু মহৎ তেজোরশি হইল তাহে মিলিত । ১০
অতিশয় তৈজোরশি, জলন্ত পৰ্বত যত,
জালা-ব্যাগ্ধি দিগন্তর, দেখিলেন সুর যত । ১১
একত্র হইয়া সেই দেবতেজ অতুলিত

লা বয়ণী তেজে ত্রিলোক করি ব্যাপিত । ১২

শম্ভু-সমুদ্ভূত তেজে হইল তার বদন,
বর তেজে হ'লো কেশ, বিষ্ণু তেজে বাহুগণ । ১৩
সৌম্য তেজে স্তনযুগ, চন্দ্র তেজে মধ্য চাকু,
পৃথিবী তেজে নিতম্ব, বরুণেতে জঙ্ঘা উরু । ১৪
ব্রহ্মা তেজে পদদ্বয়, পরাজুলি প্রভাকর,
বসুগণে করাজুলি, কুবেরে নাসিকাবর । ১৫

• প্রজাপতি তেজে তাঁর জনমিল দন্তচয়,
পাবক তেজেতে আর জন্মিল নয়নত্রয় । ১৬
সন্ধ্যা তেজে ক্রয়ুগল অনিলে শ্রবণ কিবা !
অন্ত দেব তেজে আর সমুদ্ভূত হইলা শিবা । ১৭
দেখি তাঁকে সৰ্বদেব তেজোরশি সম্ভাবিত,
হর্ষিত হইল সৰ্ব অমর মহিষাদিত । ১৮
শূল হ'তে সৃজি শূল দিলেন পিনাকধারী,
স্বচক্র হইতে সৃজি দিলেন চক্র কংসারি । ১৯
বরুণ দিলেন শঙ্খ দিলা শক্তি বৈশ্বানর,
মারুত দিলেন চাপ সহ তুণ-পূর্ণ শর । ২০
বজ্র হ'তে সৃজি বজ্র দিলেন অমরেশ্বর,
ঐরাবত হ'তে ঘণ্টা দিলা আর পুরন্দর । ২১
দিলা কালদণ্ড যম, দিলা পাশ জলপতি,
কমণ্ডলু অক্ষমালা দিলা ব্রহ্মা প্রজাপতি । ২২

সৰ্ব্ব যোগকূপে দিলা নিজরশ্মি দিবাংকর,
 নির্মল চন্দ্রের সহ দিলা কাল অসিধর । ২৩
 কৌরোদ অজীর্ণ বাস যুগল, অমল হার,
 কুণ্ডল ও কটিহুত্ৰ, দিবা চূড়ামণি আর । ২৪
 কেয়ূর সকল ভূজে, অর্ধচন্দ্র শুভ্র শোভা,
 বিমল নুপুর আর, গ্রীবাপত্র মনোলোভা । ২৫
 সৰ্ব্ব অঙ্গুলিতে দিয়া অঙ্গুরীয় বস্ত্রোজ্জ্বল,
 বিশ্বকর্মা প্রদানিলা পরশু অতি নির্মল । ২৬
 অস্ত্র অস্ত্র বহুরূপ অভেদ্য কবচ আলা,
 মস্তকে ঊরসে দিলা অগ্নান পঙ্কজমালা । ২৭
 জলধি পঙ্কজ দিলা অতিশয় শ্বেশোভন,
 হিমবান নানা রত্ন সহিত সিংহবাহন । ২৮
 ধনেশ দিলেন পাত্ৰ, সুরায় চিব-পূরিত,
 সৰ্ব্বনাগেশ্বর শেষ মহামণিবিভূষিত, ২৯
 দিলা নাগহার, যাহে পৃথিবী করে ধারণ ।
 অস্ত্র স্বরগণ দিলা আয়ুধ তথা ভূষণ । ৩০
 পূজ্যা নিনাদিলা উচ্চে মুহূর্ধ্ব অট্টহাসি,
 সে ঘোর নিনাদ নভঃ পূরিয়া উঠিল আসি । ৩১
 হ'ল মহৎ প্রীতিশব্দ করি অমা বিধ্বনিত,
 কোঙিত সকল লোক, পারাবার প্রকম্পিত । ৩২
 চঞ্চলিত বজ্রকরা চঞ্চল ভূধরচয়,
 গাইল দেবেরা হর্ষে সিংহবাহিনীর জয় । ৩৩
 ভ্রুতি করিলেন শান্ত ভক্তিনন্দন হুনিগণ ।
 ত্রৈলোক্য অমর-অরি-নিরখিল ক্ষুর মন
 বুদ্ধার্থী অধিল সৈন্ত, সমুখিত অস্ত্রগণ । ৩৪

যুদ্ধার্থী অখিল সৈন্য, সমুখিত অস্ত্রগণ,
 “আঃ একি !”—ইহা কহি মহিষাসুর ক্রোধিত । ৩৫
 ছুটিল সে শব্দ শ্রুতি, অশেষ অস্ত্রাবৃত,
 দেখিল সে দেবী তেজে ব্যাপী লোকত্রয় সব, । ৩৬
 পদভরে নত ধরা, কিরীটী পরশি নঃ,
 ধনুর্ভাণ নিষনেতে পাতাল সমস্ত ভীত, । ৩৭
 ভুজ সহস্রেতে দিক আচ্ছাদিয়া দেবী স্থিত, ।
 দেবী সহ অস্ত্রেরা হ’ল যুদ্ধে প্রবর্তিত ” ৩৮
 করিল বহুধা শস্ত্রে, অস্ত্রেদীপ্ত দিগন্তর,
 মহিষাসুর সেনানী চিকুরাখ্য বীরবর । ৩৯
 যুঝিল চামর আর, চতুর্দশ বলাঘিত,
 বঠায়ুত রথ সহ উদগ্ৰাখ্য ছবীজিত । ৪০
 অযুত সহস্র সহ মহাহনু করে রণ,
 পঞ্চাশ নিযুত সহ অসিলোমবীরোত্তম । ৪১
 ছয় শ অযুত সহ ব্যুত্কল যুঝিছে রণে,
 অনেক সহস্র গজ বাজি সহ পরাক্রমে । ৪২
 গিড়ালাক্ষ করে যুদ্ধ কটি রথ সমাবৃত,
 ষাশ অযুত সৈন্তে সহিত রথ অযুত । ৪৩
 বৃক্ষে যুদ্ধে অস্ত্রে আরো, রথগণে পরিবৃত,
 অযুত অযুত রথ গজ অশ্ব সমায়ুত । ৪৪
 করিল দেবীর সহ যুদ্ধ মহাসুর বত
 রথ হস্তিগণ সহ, কোটি কোটি শত শত । ৪৫
 যুঝিল মহিষাসুর অস্ত্রাবৃত বীৰ্য্যাধার,
 তোমর ও ভিন্দিপালে শক্তি ও যুঝলে আর । ৪৬
 “যুদ্ধে দেবী সহ বড়ো পরশ পড়িল করে,
 নিকৈপিল শক্তি কেহ, কেপিল পাশ অপরে । ৪৭

দেবীকে কাটিতে খড়্গে কেহ করে উপক্রম,
 হাসিয়া চণ্ডিক। দেবী সেই অস্ত্র শস্ত্র গণ । ৪৮
 কাটিল। লীলায় কবি নিজ অস্ত্র বরিষণ,
 অন্নান বদনা দেবী হ'য়ে স্তম্ভিত স্বরগণে । ৪৯
 দ্বৈতরী অস্ত্র দেহে হানিলেন অস্ত্র রণে,
 কম্পিত-কেশর জ্বল করিল দেবী-বাহন । ৫০
 বনে ছত্ৰাশন মত শস্ত্র-সৈন্য বিচরণ,
 বুদ্ধমানা অধিকায় নিরাসিতে সেইক্ষণ । ৫১
 জয়িল শত সহস্র সত্ত্ব গণদেবগণ,
 পরশু পটিল আর ভিন্দিপালে করি রণ । ৫২
 বর্জিত দেবীর বলে নাশিল অস্ত্রবগণ,
 গণেরা পটাহ শস্ত্র বাজাইল ভীমংগে । ৫৩
 মুদ্রা বাজায় অস্ত্রে সেই যুদ্ধে মহোৎসবে,
 তখন ত্রিশূল, গদা, শক্তিদেবী বৃষ্টি করি । ৫৪
 খড়্গে শত শত হত করিলা অস্ত্র অরি,
 মুর্ছিত বন্টার শব্দে দিল কেহ গড়াগড়ি । ৫৫
 পাশে বীধি অস্ত্র কেহ করিলেন আকর্ষণ,
 তীক্ষ্ণ খড়্গে দুই খণ্ড করিলেন অস্ত্রজন । ৫৬
 গদাঘাতে নিপাতিত করিল ভূমে শয়ন,
 মুঘল আঘাতে কেহ করিল রক্ত বমন । ৫৭
 শূলে বন্ধে ভিন্ন কেহ দিল ভূমে গড়াগড়ি,
 রণক্ষেত্রে নিরস্তর শব বরিষণ করি । ৫৮
 সেনাপতিগণ প্রাণ ত্যাগিল জিহ্ম অরি,
 কারো বাহুঘ্ন ছিন্ন কেহবা গ্রীবা বহিত । ৫৯
 অস্ত্রের পতিত শির অস্ত্র মধ্য-বিদারিত,
 ছিন্ন জন্ম অস্ত্রস্থর ভূমিতলে নিপতিত । ৬০

একবার, অঁধি, পদ, কাটিয়াছে দেবী কার,
 ছিন্ন শির নিপতিত, উঠিতেছে পুনর্বার । ৬১
 ধরিয়া পরমাধ্ব কবন্ধ করিছে বণ,
 নাচিছে তুরীর বরে অপর অম্বর গণ । ৬২
 ছিন্ন শির কবন্ধেরা খজা, শক্তি, ঋষ্টি, ধবি,
 দেবীকে কহিছে ডাকি “তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ” করি । ৬৩
 পড়িয়া অম্বর, বথ, হস্তী, অশ্ব, ভূমিকল,
 অগম্য হইল তথা যথায় সে বণস্থল । ৬৪
 শোণিতের মহানদী হ’লো সদা প্রবাহিত,
 হস্তী অশ্ব অম্বরের সেনা মধ্যে নিপতিত । ৬৫
 কণেকে সে মহা সৈন্য অধিকা করিল ক্ষয়,
 অম্বরের, যথা বহি তৃণ দারু স্তূপ চয় । ৬৬
 কম্পিত কেশব সিংহ করিল ছাড়ি গর্জন,
 অম্বর-অরির প্রাণ দেহ হ’তে বিমোচন । ৬৭
 করিল অম্বর সহ দেবীর গণেরা বণ,
 দেবেরা করিলা স্তুতি, আকাশে পুষ্পবর্ষণ । ৬৮
 ইতি মাহাশ্বর—সৈন্ত—বধনাম দ্বিতীয় মাহাত্ম্য । ২ ।

[তৃতীয় মাহাত্ম্য]

চণ্ডি সঙ্কট নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

নিহত সকল সৈন্ত নিরখিয়া মহাশ্বর,
 ব্যথিতে অধিকা সহ আসিল কোপে চিকুর । ১

অস্থির দেবীকে রণে বরষিল শব গগন,
 যথা মেরু-শৃঙ্গে করে তোয়দ তোয় বর্ষধ । ২
 লীলার কাটিয়া দেবী শবজালে সে সুকা,
 তুরঙ্গ-চালক সহ বধিলা তুরঙ্গ দল । ৩
 কাটিলেন সন্ত ধনু, কাটিলেন উচ্চ ধ্বজ,
 ছিন্ন ধনুর্জারী-পাত্রে বিধিলেন বাণ ধ্বজ । ৪
 ছিন্ন ধনু, বথহীন, নিহত অশ্ব সারথী ;
 খড়্গ চর্ম্ম ধরি বেগে ধাইল দেবীর প্রতি ।
 তীক্ষ্ণ খড়্গে আঘাতিয়া কেশরীর শীর্ষস্থান,
 দেবীকে ও সবা ভূজে আঘাতিল বেগবাণ । ৫
 লাগি খড়্গা সেই ভূজে ভাঙ্গিল, নৃপনন্দন !
 তখন লইল শূল কোপে অরুণ লোচন, ৬
 তদ্রকালী প্রতি তাহা নিক্ষেপিল মহাবরধ ।
 অসম্ভব অশ্ব পথে তেজে বহি বিষমত, ৮
 পড়িছে দেখিয়া শূল, দেবী তেয়াগিলা শূল,
 সে শূল শতধা কবি বধিলা অস্থিরাতুল । ৯
 মহিষের সেনাপতি মহাবীরা হ'লে নাশ,
 আসিলেক গজারূঢ় চামর ত্রিশ শুল্কাস । ১০
 সেও নিক্ষেপিল শক্তি, ক্রত তাহা হুবেশ্বরী
 হস্তাঘি আঘাতী ভূমে ফেলিলা নিশ্চত করি । ১১
 ভয় শক্তি নিপতিত দেখি, ক্রোধ সমন্বিত
 চামর হানিল শূল, হইল বাণে ছেদিত । ১২
 লক্ষ দিয়া উঠি সিংহ পক্ষ কুন্তলস্তর স্থিত,
 আরঙিল বাহ যুদ্ধ জিহ্ম-অরি সহিত । ১৩
 তাহাদেব যুদ্ধে হস্তী ভূমিতলে নিপতিত,
 দাক্ষ প্রহায়ে যোব গর্জি হ'লো যুদ্ধাঘিত । ১৪

বেগে লক্ষ দিয়া শূন্তে, পড়ি যুগশক্রবীর
 করাঘাতে চামরের পৃথক করিল শির । ১৫
 শিলা বৃক্ষাঘাতে বনে উদগ্ৰ হইল হত,
 দণ্ড মুষ্টি আঘাতেতে করাল হইল গত । ১৬
 ক্রুরা দেবী গদাপাতে চূর্ণিত সমরোত্তত
 বাকুল ; অন্ধক, তাম্র, ভিন্দিপালে হ'ল হত । ১৭
 উগ্র আশ্র, উগ্রবীৰ্য্য, মহাহনু, স্বৈর-অরি
 বিনাশিল। ত্রিশূলেতে ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী ! ১৮
 কায়া হ'তে বিভালের অসিতে কাটিলা শির,
 শরে গেল যমালয় হৃদ্বর্ষ হৃদ্বুগ্ধ বীর । ১৯
 এক্রপে হইলে ক্ষয় সসৈন্তে মহিষাসুর
 মহিষ স্বরূপে গণে করিলেক ত্রাসাতুর । ২০
 করিল কাহাকে ভুণ্ডে, কাৰে খুবে আঘাতিত,
 লাজুলে তাড়িত কাৰে, কাৰে শৃঙ্গে বিদারিত । ২১
 কাৰে বেগে, কাৰে নাদে, কাৰে ভ্রমণের বলে
 নিশ্বাস পবনে অন্তে কেলিতেছে ভূমিতলে । ২২
 নিপাতি প্রমথ সৈন্ত, খাইল মহিষ বীর
 বধিতে দেবীর নিঃশ ; অধিকা কোপে অধীর । ২৩
 সেও করিলেক ক্রোধে খুর-ক্ষুর মহীতল,
 নিনাদিল, নিকপিল শূন্তেতে উচ্চ অচল । ২৪
 তার বেগ ভ্রমণেতে ক্ষুণ্ণ মহী হ'লো শীর্ণ,
 লাজুলে আহত সিদ্ধ করিল ভ্রগতাকীর্ণ । ২৫
 কম্পিত শূর আঘাতে খণ্ড খণ্ড যেষ সব
 ধ্বানিলে হ'ল 'ক্ষণ্ড গিরিমালা হ'তে নভঃ । ২৬
 আসিতেছে মহাসুর ক্রোধেতে উন্মত্ত প্রায়,
 তাহাকে বধিতে ক্রোধ করিলেন চণ্ডী কায় । ২৭

বাধিলেন মহাস্বর পাশাঙ্গ করি কেপণ ;
 সে ত্যজি মহিব রূপ আরস্তিল মহারণ । ২৮
 হইল কেশরী সত্ত্ব বাবত আস্থিকা শির
 কাটিলেন, দেখা দিল খড়্গপাণি মহাবীর । ২৯
 কাটিল তাহাকে শীঘ্র প্রহারি সায়কব্রজ
 খড়্গ চর্খ ধরি দেবী, হইল সে মহাগজ । ৩০
 তত্ব দ্বারা মহাসিংহ করিল গর্জিল আর,
 কাটিল সে গুণ দেবী করিয়া খড়্গ প্রহার । ৩১
 তখন ধরিল পুনঃ মহিষের কলহর,
 কোভিত করিল তাহে ত্রৈলোক্য ও চরাচর । ৩২
 তখন জগতমাতা করি পান পানোক্তম,
 হাসিলেন পুনঃ পুনঃ ক্রোধে অরুণ নবন । ৩৩
 নাদিল অস্ত্র সেও বলবীৰ্য্য সদোদ্ধত,
 শূন্যে চড়ি কব প্রতি নিক্ষেপি ভূধর কত । ৩৪
 দেবী শরজালে তাহা করিলেন বিচূর্ণিত,
 করিলেন সুখরাগ—মনোদ্ধত আকুলিত । ৩৫

দেবী কহিলেন ।

“গর্জ গর্জ মৃঢ় ! মধু পান করি ততক্ষণ ।
 তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জিবেন দেবগণ ।” ৩৬

ঋষি কহিলেন ।

ইহা কহি একলক্ষে আবোহিয়া ক্রোধান্বুল,
 অস্ত্রের আক্রমি পদে, কঠে হানিলেন শূল । ৩৭
 তখন সে পদাক্রান্ত, তুলে অর্ধ বিনির্গত,
 নিঃস্ব হ’তে, হ’ণো দেবীর বীৰ্য্যে সংবৃত । ৩৮
 যুদ্ধিলেক মহাস্বর হ’য়ে অর্ধ বিনির্গত,
 অগ্নিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত । ৩৯

দৈত্য সৈন্ত হ'লো নাশ করি তবে হাহাকার,
 হইল পরম হর্ষ সমুদয় দেবতার । ৪০
 কাম্বিকা দেবীর স্তুতি দেব ঋষি তপোধন,
 গাইল গন্ধর্ব্বপতি নাচিল অঙ্গবোগণ । ৪১
 ইতি মহিষাসুর বধনামক তৃতীয়মাহাত্ম্য । ৩

[চতুর্থ মাহাত্ম্য

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

চরাঙ্গা সুরারি বল অতি বীৰ্য্য নিপাতিত
 হলে দেবী পরাক্রমে, শত্রু আদি সুরগণে
 করিল তাঁহার স্তুতি,—চারুদেহ রোমাঞ্চিত,—
 প্রণত নম্র মস্তকে, অধরে, অংগে, বচনে । ১
 জগতের আত্ম-শক্তি, সৰ্ব্বদেব শক্তিরূপা,
 যে দেবীর দ্বারা ব্যাপ্তা এই বিশ্ব চরাচর
 অখিল দেব-মহর্ষি-পূজিতা সে অধিকার,
 ভক্তভরে নমি সবে, মঙ্গল বিধান কর । ২
 ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মা হর নাহি পাবে
 বর্ণিতে অতুল বল, অতুল প্রভাব যার ;
 পালিতে অখিল বিশ্ব, নাশিতে অশুভ, তর
 সে ঋষিকা মহাদেবী কর মতি অনিবার । ৩
 হুকৃত ভবনে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী হুকৃত ঘরে,
 ধীমান্ জদয়ে বুদ্ধি স্বয়ং যে মহেশ্বরী,

স্রজনগণের অঙ্কা, লজ্জা কুল-জননী,
 পাশহ হে দেবি । বিশ্ব তোমাকে প্রণাম করি । ৪
 কি আর বর্ণির এই অচিন্ত্য রূপ তোমার ?
 অসংখ্য অস্তুর নাশী কিংবা অতিবীৰ্য্য তব ?
 কিংবা সৰ্ব্ব দেবী সুরগণদের আহবেতে,
 তোমার চরিত ঘাহা, কি আর আমরা কর ? ৫
 সমস্ত জগত হেতু, ত্রিগুণা, না জানে দোষী
 হরি হর দেবগণ, না পার তোমার পার ;
 পরমা আদ্যা প্রকৃতি অখিলের সৰ্ব্বাশ্রয়া,
 তুমি এই জগতের অংশভূতা অবিকার । ৬
 ধীর নাম উচ্চারণে সমুদায় দেবগণ
 সকল যজ্ঞেতে সদা তৃপ্তি লাভ করে, দেবি !
 তুমি স্বাধা ; পিতৃদের তৃপ্তি হেতু সমুচ্চাৰ্য্য,
 বধাও তুমিই দেবি । সৰ্ব্বজন গণ সেবী । ৭
 অবিচিন্ত্য মুক্তি হেতু যেই দেবী-মহাব্রতা,
 জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানী করে নিত্য ধ্যান ধীর,—
 করে ধ্যান মুনিগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পাপহীন,
 তুমি বিদ্যা, ভগবতি । পরমা হে দেবি । আর । ৮
 সুবিমল শঙ্খাঙ্কিকা ঝঙ্ক ও যজু নিধান,
 পঠিত সাম বেদের গীত বাণি মনোহরা,
 জিবেষ স্বরূপা দেবী, প্রবৃতি সৃষ্টির তবে,
 তুমি সৰ্ব্ব জগতের হঃখ হরী শ্রে তরা । ৯
 যেথা তুমি তুমি দেবি ! অখিল শাস্ত্রের সার
 হুগা তুমি, সজহীন ভব সাগরের তরী,
 তুমি লক্ষ্মী কৈটভাবি হৃদিপদ্মনিবাসিনী,
 তুমি গৌরী, তুমি দেবি । প্রতিষ্ঠা শশীশেখরী । ১০

পরিপূর্ণ চন্দ্র-বিশ্ব-অনুকারী মনোহর
 কনক কান্তি উত্তম, ক্রিয়ৎ অমল হাসি,—
 নিম্নাধি বদন হেন, তথাপি মহিষাসুর
 প্রহারিল ক্রোধে শীঘ্র অতীব অদ্রুত বাসী ১১
 দেখিয়া কুপিত তব ভ্রুকুটী কবাল মুখ,
 উদিত শশাঙ্ক ছবি, নাহি যে সদ্যজীবন
 ত্যজিল মহিষাসুর, অতীব বিচিত্র তাঁহা,
 কে পারে বাঁচিতে, করি কুপিত যম দর্শন ? ১২
 এসমা হইলে হও পরমা সৃষ্টির হেতু,
 কোপবতী হ'লে কর সদ্য কুল বিনাশিত,
 জানিহু এখন ইহা, যে হেতু হইল তাহে
 মহিষাসুরের বল সুবিপুল অন্তরিত । ১৩
 খ্যাত্তা তারা জন পদে, হয় তাহাদের ধন,
 হয় তাহাদের যশ, ধর্ম, বর্গঃ ক্ষত্রহীন,
 ধন্য তারা, সুপালিত পুত্র কন্তা ভ্রাতা দারা,—
 এসমা, অভ্যদয়দা, যাহাদেবে চির দিন । ১৪
 হে দেবি ! সকল ধর্ম, কর্ম, সে সৃষ্টি নর
 করে সদা প্রতিনি আদরেতে আচরণ ;
 পায় স্বর্গ অনন্তর তোমার প্রসাদে তাহে,
 হও তিন লোকে দেবি ! ফলদাতৃ অমূল্য । ১৫
 হে ভূর্গে ! স্মরিলে হর অশেষ অন্তর ভয়,
 স্মরিলে সৃষ্টির চিন্তে কর শুভ মতি দান,
 দারিদ্র ও ক্ষুধা-ভয়-হাবিগী কে তোমা বিনা ?
 সর্বরূপ উপকার করিতে সর্দার প্রাণ ? ১৬
 ইহাদের মুক্তা হ'তে হ'লো জগতের সুখ,
 কি পাপ করিতেছিল চির নরকের ভয়ে !

সংগ্রাম মৃত্যুর লজ্জা প্রদানিতে দিব্যালোক
 বিনাশিলে তাহাদেবে হে দেবি । সময় করে । ১৭
 দৃষ্টিমাত্র পারিতে না করিতে কি ভয় সব,
 অম্বরগণে যে অস্ত্র প্রহারিলে, ভগবতি ! ?
 শত্রুগণো হৃৎক প্রাপ্ত শত্রু পুত্র পুণ্যলোক,
 অতি সাধবী তুমি, তাহে হ'লো তব হেন মাত । ১৮
 শূলাগ্র উগ্র কান্তিতে খড়্গ প্রভাবিস্করণে,
 না হইল হত রণে যে সব অম্বরগণ,
 হইল বিলম্ব সব, দেবি ! বিলোকন করি
 তব এই অংশুপূর্ণ ইন্দু খণ্ড নিভানন । ১৯
 হর্ষিত দমনকারী হে দেবি । চরিত্র তব,
 অস্ত্রের অচিন্তনীয় রূপ তব অতুলিত ;
 দেব-পরাক্রম-হারী অম্বরনাশক বীৰ্যা,
 বৈরিতেও এইরূপে দয়া তব প্রকটিত । ২০
 তব এ পরাক্রমের আছে কি উপমা ভবে ?
 শত্রুভয়-কার্য-হারী কাথায় রূপ এমন
 চিন্তে কৃপা, সময়ের নিষ্ঠুরতা, ত্রিভুবনে
 হে দেবি বরদে ! করি তোমাতেই দর্শন । ২১
 ত্রৈলোক্য অবিল এই রিপুনাশে করি আশ,
 বধিয়া সময় ক্ষেত্রে পাঠাইলা যত অবি
 দিব্যালোকে ; আমাদের উন্নয়ন সুপ্রাণিতম
 করিলে সন্দ্বীকৃত;—তোমাকে প্রণাম করি । ২২
 শূলে রক্ষ আমাদেবে, বক্ষ খড়্গে, ত্রু অধিকে !
 ঘণ্টাধনে কব বক্ষা, বক্ষ ধনুর্গণে,
 বক্ষ পূর্বে, পশ্চিমে, চতুর্দিকে বক্ষ দক্ষিণে,
 ওতবে বক্ষ উত্তরি নিম্ন শূল আশ্রয়নে । ২৩ । ২৪

যেই সৌম্যরূপে কর ত্রিলোকেতে বিচরণ—
অতি ঘোরা, তাহে বক্ষ সৰ্বরূপে সুবাদিকে,
খড়্গা শূল গদা অস্ত্র কর-পল্লব শোভন,—
সৰ্বরূপে আমাদেবে বক্ষ তাহে, হে অম্বিকে । ২৫।২৬

ঋষি কহিলেন ।

করি স্তুতি সুরগণ নন্দন কুমুদগণে
পূজিলা ভগত ষাট্রী সুগন্ধ অনুলেপনে । ২৭
দেব দ্বারা ভক্তিতা ধূপেতে হয়ে ধূপিতা,
কহিলা প্রণত হরে সুমুখী সুপ্রসন্নিতা । ২৮

দেবী কহিলেন ।

কহ সৰ্ব দেবগণ তোমাদের কি বাঞ্ছিত ?
দিব আমি হয়ে স্তবে সুপূজিতা, অতি প্রীত । ২৯

দেবতারা কহিলেন ।

করিলেন ভগবতী সব, কিছু নাহি আর
যখন মহিষাসুর হত শত্রু দেবতার । ৩০
তবু যদি দিবে বর আমাদের মহেশ্বরি !
নাশিও পরমাপদ যখন আমরা স্মরি । ৩১
যে নর এ স্তবে তোমা তুষিবে অমলাননে !
সমৃদ্ধি বিভবে তাকে, সম্পদ স্ত্রী পুত্র ধনে, ৩২
বাড়াও অম্বিকে ! তুমি প্রিয়দা যে দেবগণে । ৩৩

ঋষি কহিলেন ।

ভগবতী দেব তবে একুপে হ'য়ে প্রার্থিতা,
“তাই হ'উক”—বলি কালী হইলেন অস্তহিতা । ৩৪
কহিলাম যথা পূর্বে হইলা সঙ্কুতা তিনি
দেব-দেহ হ'তে দেবী, ত্রিজগত-হিতৈষিনী । ৩৫

যেই রূপে হইলেন গৌরী দেহা পুনর্বার,
 বধিতে নিশ্চিন্ত শুভ হুই দৈত্য হরাচার, ৩৬
 সাধিতে দেবের হিত রক্ষিবারে লোকগণ—
 আখ্যাত করিব আমি শুন সেই বিবরণ । ৩৭
 ইতি শক্রাদি স্ততি নামক চতুর্থ মাহাত্ম্য । ৪ ।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার

ঋষি কহিলেন ।

হরিল ইন্দ্রের পূর্বে শুভ ও নিশ্চিন্তদায়
 ত্রৈলোক্য ও বসু ভাগ করি মন বশাশ্রয় ১
 সূর্য্যত, চন্দ্র, তারা সেই রূপে অধিকার
 করিলে, ও কুবেরত, যাম্য, বরুণত আর ২
 লইল পবন-ঋদ্ধি, বহ্নি-কর্ম্ম হুর্কিনীত,
 ব্রহ্ম রাজ্য দেবগণ নিকাসিত, পরাজিত । ৩
 হতরাজ্য, মহাসুর হন্তে, লতি নিকাগন,
 সে দেবী অপরাজিতা স্মরিলেক দেবগণ । ৪
 দিলা বর,—“আপদেতে স্মরিলে অমরগর্গ,
 নাশিব পরমাপন্ন তোমাদেয় সেইকণ” ।
 ইহা মনে করি গিয়া নগেশ্বর হিমাচলে,
 দেবী বিষ্ণু-মারা স্ততি করিল দেব সকলে । ৫

দেবগণ कहিলেন ।

দেবী, মহাদেবী, শিবা প্রণাম তাঁকে সতত
 প্রকৃতি ভদ্রাকে আর প্রণাম করি নিয়ত । ৭
 কৈজা, নিত্যা, গোরী, খাত্রী, প্রণাম তাঁকে প্রণাম,
 জ্যোৎস্না, চন্দ্রকপিলী, স্বধাকে সদা প্রণাম । ৮
 নমস্কার বুদ্ধি, সিন্ধি, কল্যাণীকে নমস্কার
 নৈঋতী ও রাজলক্ষ্মী, সর্বাণীকে নমস্কার । ৯
 তুর্গা, তুর্গা-পারা, সারা সর্বাধারীকে আর,
 খাতা, কৃষ্ণা, ধূতাকেও করি সদা নমস্কার । ১০
 অতি সৌম্যা, অতি রোজা, করি তাঁকে নমস্কার ।
 জগত প্রতিষ্ঠা দেবী তাঁকে করি নমস্কার । ১১
 যেই দেবী সর্বভূতে বিষ্ণু-মায়া খ্যাত নাম,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১২
 যে দেবীর সর্বভূতে চেতনা এ অভিধান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৩
 যে দেবীর সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৪
 যে দেবীর সর্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৫
 যে দেবীর সর্বভূতে ক্রুরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৬
 যে দেবীর সর্বভূতে, ছায়ারূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৭
 যে দেবীর সর্বভূতে, শক্তিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৮

যে দেবীর সর্বভূতে তৃষ্ণা রূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৯
 যে দেবীর সর্বভূতে কান্তিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২০
 যে দেবীর সর্বভূতে জাতিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২১
 যে দেবীর সর্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২২
 যে দেবীর সর্বভূতে শক্তিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৩
 যে দেবীর সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে সংস্থাপন,
 প্রণাম প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৪
 যে দেবীর সর্বভূতে কান্তিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৫
 যে দেবীর সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৬
 যে দেবীর সর্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৭
 যে দেবীর সর্বভূতে, স্মৃতিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৮
 যে দেবীর সর্বভূতে, দয়ারূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২৯
 যে দেবীর সর্বভূতে তুষ্টিরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে, প্রণাম । ৩০
 যে দেবীর সর্বভূতে, মাতৃরূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ৩১

যে দেবীর সৰ্বভূতে ভাস্করূপে সংস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ৩২
 সৰ্বভূত ইন্দ্রিয়েতে যে দেবীর অধিষ্ঠান,—
 যাঁহা সৰ্বভূতে ব্যাপ্তা—প্রণাম পুনঃ প্রণাম । ৩৩
 চিত্ররূপে সৰ্ব বিধ ব্যাপী যার অবস্থান,
 প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ৩৪
 পূৰ্বেশ্বরগণে স্তুতা ইষ্ট তরে,
 স্নেহে সেবিতা নিত্য অবিরাম,
 বিনাশি আপদ শুভ বিধায়িনী !
 কর আমাদের মঙ্গল বিধান । ৩৫
 উদ্ধৃত অশ্বরে তাপিত আমরা,
 যেই জৈম্বীকে নমিস্থ এখন
 ভক্তি নম্র দেহে, স্মরিলে যাঁহাকে
 সঙ্গল আপদ নাশেন তখন । ৩৬

ঋষি কহিলেন ।

এক্রূপে করিলে স্তুতি দেবেবা, তবে পার্শ্বভী
 গেলেন জাহ্নবিজলে স্নান হেতু নরপতি । ৩৭
 কহিল সে স্কন্ধ দেবে—“করিছ স্তুতি কাহার”
 উত্তরিল শিবা দেহ-কোষ-সমুদ্ভূত-তীর,—৩৮
 “করিছে আমার স্তুতি শুভ নৈত্য নিরাকৃত
 দেবেবা, নিশুভ-সহ সমবেতে পরাজিত ।” ৩৯
 পার্শ্বভী-শরীর-কোষ-নিঃসৃত সে অম্বিকায়
 ‘কৌষিকী’ আখ্যাতি দিয়া সমস্ত লোকেতে গায় । ৪০
 হ’য়ে বিনির্গত কৃষ্ণা হইলা দেবী অম্বিকা
 চলি গেল হিমাচলে হইয়া খ্যাতা কালিকা । ৪১

করিল সে অধিকার কুম্ভর রূপ পরম
 শুভ নিমন্ত্রণ ভূতা চণ্ড মুণ্ড দরশন । ৪২
 কহিল শুভেবে তারা — “মনোহরা, মহাবল
 কেহা-নারী নিকপমা” দীপিতেছে হিমাচল । ৪৩
 দেখি নাই কারো কভু তাদৃশ রূপ উত্তম ;
 জান কে সে দেবী, কর অমৃতবেশ্বর ! গ্রহণ । ৪৪
 স্ত্রীর রূচক অঙ্গিনী তেজে দিক্ উজ্জলিত,
 বিরাজে, ঐতোল্ল তাকে দেখা তব সমুচিত । ৪৫
 আছে প্রভো ! যেই রত্ন মাণি গজ অম্বগণ
 ক্রৈলোক্যোতে, সবে এবে দীপিছে তব ভবন । ৪৬
 আনিয়াছ ইন্দ্র হ’তে গজরত্ন ঐরাবত,
 পারিজাত তরু, অম্ব উচৈঃশ্রবা সেই মত । ৪৭
 হংসযুক্ত বধ তব অঙ্গনেতে বিরাজিত,
 আছিল ব্রহ্মার বাহা অদ্বুত রত্ন-ভূষিত । ৪৮
 কুবের হ’তে আনিত মহাপদ্ম নিধি আলা,
 কিঙ্করিনী দিলা সিদ্ধ অন্নান পঙ্কজমালা । ৪৯
 তব গেহে বরুণের স্বর্ণশ্রাবী ছত্র ছায়া,
 তেমতি স্তম্ভনবর, ব্রহ্মার আছিল বাহা । ৫০
 মহাশক্তি উৎক্রান্তিবা যমের হয়েছে হত,
 করেছে পাশীর পাশ তোমার ভ্রাতা গৃহীত । ৫১
 নিমন্ত্রণ সিদ্ধান্তে সমুদয় রত্নগণ ;
 অনল দিলা তোমাকে অগ্নিশোচ দিবসন । ৫২
 একপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ ।
 কল্যাণি স্ত্রীরত্ন কেন কয় না হুমি গ্রহণ ?” ৫৩
 কহি কহিলেন ।
 শুভ সে চণ্ড মুণ্ডের বচন করি শ্রবণ,

একুপ কহিবে গিয়া যাতে সে বচনে মম
প্রতীতে আইস শীঘ্র, কব তথা আচরণ । ৫৫
দেবী যে শোভন শৈলে তথায় করি গমন,
মুহূৰ্ত্ত মধুব ভাষে করিল সে নিবেদন ৫৬

দূত কহিল ।

দেবি । দৈত্যেশ্বর শুভ্র ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বর,
তঁাহার প্রেরিত দূত তব কাছে এ কিল্লর ৫৭
সকল দেবভাগণে বীর আজ্ঞা অবগাহত,
কহিল অখিল জয়ী দৈত্য শুন যেই মত । ৫৮

"অখিল ত্রৈলোক্য মম, দেবগণ বশে মম,
পৃথক পৃথক আমি ভুক্তি যজ্ঞভাগ গণ । ৫৯
ত্রৈলোক্যেতে শ্রেষ্ঠ বর অশেষ বশেতে মম,
হরিয়াছি গজবর তথা দেবেন্দ্র বাহন । ৬০
ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর,
সমর্পণ প্রণিপাত করিয়া যত অমর । ৬১
যাহা ছিল অল্প দেবে, গন্ধর্ব্ব, উরগগণে
বররূপ সেই সব আমাতে আছে, শোভনে ! ৬২
তোমাকে দ্বীপবৃত্ত ত্রিলোক আমরা মানি,
তুমি আমাদের কাছে এস বরভোগী জানি । ৬৩
আমাকে, বা মমাহুজ নিশ্চুস্ত মহাবিক্রম,
ভজ হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! বরভূত নারী ধন । ৬৪
অতুল পরমৈশ্বর্য পাইবে করি বরণ ।
ইহা আলোচনা করি আমাকে কর গ্রহণ । ৬৫

ঋষি কহিলেন ।

তুমি গভীরা দেবী হাসিলেন মনে তিনি,—
হুগা, ভগবতী, ভদ্রা, অগত ধারিণী যিনি । ৬৬

দেবী कहিলেন ।

কিছু নহে মিথ্যা, সত্য कहিলে এ কথা যত,
 ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুভ নিশ্চিন্তও সেইমত । ৬৭
 ক'রেছি প্রতিজ্ঞা কিছু মিথ্যা কিসে করি পুনঃ?
 অন্ন বুদ্ধি হেতু পূর্বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি শুন । ৬৮
 যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
 যে আমার প্রতিযোগী ভর্তা হবে সেই জন ৬৯
 করি শুভ কি নিশ্চিন্ত মহামুখ আগমন
 আমাকে জিনিয়া শীঘ্র করুক পাণিগ্রহণ । ৭০

দুত कहিল ।

নিশ্চয় প্রলাপ দেবি! कहিতেছ মম কাছে
 শুভ নিশ্চিন্তের আগে তিষ্ঠে কে ত্রিলোকে আছে ? ৭১
 অত্র দেভাদেবও আগে নাহি তিষ্ঠে দেবগণ
 একাগ্নী নারী তুমি পুনঃ কি করিবে রণ ৭২
 যাহাদের যুদ্ধে নাহি তিষ্ঠে ইন্দ্র দেবগণ,
 সেই শুভদেব আগে করিবে নারী গমন ? ৭৩
 শুভ নিশ্চিন্তের কাছে যাও তুমি রাখ কথা ;
 অগৌরবা কেশাকৃষ্টা অতথা যাইবে তথা । ৭৪

দেবী कहিলেন ।

এমনই বলী শুভ, নিশ্চিন্ত, ও বীৰ্যবান ।
 কি করি প্রতিজ্ঞা মম कहিয়াছি, নহে আন । ৭৫
 যাও তুমি মম কথা এইরূপে সর্বাদৃত
 কহ গিয়া অম্বরেস্তে করুক যাহা বিহিত । ৭৬
 ইতি দুত সংবাদ নামক পঞ্চম যোধ্যা । ৫ ।

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য ।]

— * —

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি তরিলেন ।

• দেবীর বচন শুনি সে দূত ক্রোধ পূরিত
দৈত্যরাজ কাছে গিয়া কহিলেন বিস্তারিত । ১
তিনিয়া অম্বর রাজ দূত বাক্য সেইক্ষণে
সক্রোধে কহিলা দৈত্য-অধিপ ধুম্রলোচনে । ২

শুভ্র কহিলেন ।

হে ধুম্রলোচন ! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্ত গণে
আন বলে সে দৃষ্টীকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে । ৩
পরিজীর্ণকারী তার থাকে যদি কোন জন—
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,—করি হনন । ৪

ঋষি কহিলেন ।

হইয়া অজ্ঞাপ্ত শীঘ্র সে দৈত্য ধুম্রলোচন
অম্বর সহস্র ষষ্টি সহ বোল সেইক্ষণ । ৫
• তুহিন-অটল-স্থিতা দেবীকে করি দর্শন,
শুভ্র নিশ্চেষ্টের কথা কহিল উচ্চে তখন । ৬
• প্রীতিতে প্রভুব কাছে না যাও যদি অবলা,
নিব তার ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা । ৭

দেবী কহিলেন ।

বলবান্ বলযুত পাঠাইলা দৈত্যস্বামি,
বলে যদি নেও হুমি, কি আর করিব আমি ? । ৮

কামি কহিলেন ।

ইহা শুনি দেবী প্রতি খাইল ধূলোলোচন ।

হৃদয়ে অধিকা, ভস্ম করিলেন সেইক্ষণে ।

অম্বরের মহাসৈন্ত ক্রোধে অধিকার প্রতি,
বর্ষিল পরশ শক্তি, সায়ক স্তম্ভ অতি । ১০

দেবীর বাহন সিংহ, কম্পিত কেশর সব,
পড়িল অম্বর সৈন্তে করিয়া ভৈরব বব । ১১

কাহাকে কর প্রহারে, অপব দৈত্য বদনে
আক্রমি অধরে অস্ত্রে নাশিল অম্বরগণে । ১২

বিদীর্ণ উদর কারো হলো নখে কেশরীর
চল প্রহারেতে কারো হইল পৃথক শির । ১৩

বিচ্ছিন্ন মস্তক বাহু হইল তাহে অপর ।

অন্যের উদর রক্ত খাইল ধৃতকেশর । ১৪

দেবীর বাহন সেই কেশরী অতি কোপন,
কণেকে সকল সৈন্ত বিনাশিল মহাম্বন । ১৫

শুনিয়া, করিল দেবী নিহত ধূলোলোচন,

নাশিল সকল সৈন্ত কেশরী দেবী বাহন, ১৬

কোপিল দৈত্যাধিপতি শুভ প্রক্ষুরিতাধর,

চণ্ড মুণ্ড মহাম্বরে আজ্ঞা দিল অতঃপর । ১৭

“হে চণ্ড ! হে মুণ্ড ! সৈন্ত লয়ে সঙ্গে বহুতর,

“যাও তথা, গিয়া তাকে আন হেতা শীঘ্রতর । ১৮

“কেশে ধরি, বান্ধিয়া বা যদি ভব গয় মনে

“যুদ্ধেতে অশেষ অস্ত্রে আঘাতি অম্বরগণে । ১৯

“হুট্টাকে আহত করি, বিনাশিয়া সিংহবর,

“বাধিয়া লইয়া এস অধিকাকে শীঘ্রতর ।” ২০

ইতি ধূলোলোচন বধনামক ষষ্ঠ মাहाত্ম্য । ৬

[সপ্তম মাহাত্ম্য]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

আজ্ঞা পেয়ে দৈত্যগণ চণ্ড মুণ্ড পুরঃসর,
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ চলিল উদ্যত শর । ১
দেখিল ঈষদ হাস্যে স্থিতা দেবী অতঃপর,
মহতী কান্ধন শৃঙ্গে শৈলেন্দ্রেতে সিংহোপর । ২
দেখিয়া হলো উত্তত করিতে তাঁকে গ্রহণ,
আকর্ষিয়া চাপ, অসি ধরি গেল অস্ত্র জন । ৩
অস্ত্রিকা কবিলো অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসির্বর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি । ৪
ললাট ফলক হতে—ক্রকুটি কুটিলাননৌ,—
করাল বদনা কালী অগ্নিলা অসি পাশিনী । ৫
বিচিত্র খট্টাঙ্গ-ধরা, নরমালা বিভূষণা,
বাস্ত্র চৰ্ম্ম পরিধানা, শুক মাংসা বিভাষণা । ৬
কি ভীষণ লোল জিহ্বা ! কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিম্বুখ নাদে পূরিত ৭
বেগে পড়ি নাশিত্তেছে এবল অহরগণ,
সুরারির সৈন্তে পড়ি করিছে সৈন্ত ভক্ষণ । ৮
পাশি ও অক্লুশগ্রাহী বোধ-ঘণ্টা-সমধিত
হস্তিগণ, একহন্তে করে মুখে নিক্ষেপিত । ৯
যোদ্ধা সহ অশ্ব, বধ সহিত সারথীগণ,
নিক্ষেপিয়া মুখে, নষ্টে করিছে ভীষ চৰ্ক্ষণ । ১০

কাহাকে ধরিয়া কেশে গ্রীবা ধরি অশ্রুজন,
 আক্রমিয়া কাকে পদে, বক্ষে, করে নিপতন । ১১
 তথা অশ্রুরেব নিক্ষেপিত মহা অঙ্গ শস্ত্র যত,
 গ্রাসিতেছে ক্রোধে, দন্তে পরিতেছে বিমথিত । ১২
 মহাবলী, মহাবীর, অশ্রুরেব সৈন্তগণ,—
 মর্দিয়ে ভঙ্কিছে কাকে, করিছে কাকে তাড়ন । ১৩
 অসিতে নিহত কেহ, কেহ গড়াগড় তাড়িত,
 দস্তায়ে আহত হ'য়ে হইতেছে বিনাশিত । ১৪
 কণেকে সকল সৈন্ত অশ্রুরেব নিপাতিত
 দেখি চণ্ড, হ'লো ভীমা কালিমা প্রতি ধাবিত । ১৫
 সুভাশ্রবণ ভীমাকীকে বর্ষি মহা ভীম শর,
 সহস্র সহস্র চক্রে ছাইল সে কলেবর । ১
 সে সব অনেক চক্রে তাঁর মুখ ভষ্মকর,
 হ'লো বধা বহু অর্ক-বিষ-পূর্ণ ঘনোদর । ১৭
 ভৈরব নাদিনী ভীমা হাসিলেন ধল ধল ;
 কালীর করাল মুখ হৃদর্শ দশনোজ্জল । ১৮
 আরোহিয়া মহা সিংহ, হুঙ্কার করি গভীর,
 কেশেতে ধরিয়া তার খড়্গে কাটিলেন শির । ১৯
 পাইলেক সুগু তবে দেখি চণ্ড বিনাশিত,
 তাহাকে করিল খড়্গে ভূমিতলে নিপাতিত । ২০
 হতশেব সৈন্তগণ দেখি হত চণ্ডাশ্রব
 মহাবীৰ্য্য সুগু হত, পলাইল ভয়াতুর । ২১
 চণ্ড ও সুগুেব শির লয়ে কবে কালিকায়,
 হাসি মহা অট্টহাসি, কহিলেন চণ্ডিকায়,—২২
 “মহাপণ্ড চণ্ড সুগু বধিয়াছি, অন্তঃপর
 বৃদ্ধ যজ্ঞে বয়ঃ তন্ত্বে নিতন্ত্বে হনন কর ।” ২৩

ঋষি কহিলেন ।

চণ্ড মুণ্ড অস্ত্রের দেখিয়া শিব আননিত,
কুল্যাণী চণ্ডিকা-বাণী কহিলেন সুললিত—২৪
“চণ্ড মুণ্ড বধি তুমি হইয়াছ উপস্থিত,
চামুণ্ডা নামেতে তুমি হইবে লোকে পূজিত ।” ২৫
ইতি চণ্ড মুণ্ড বধ নামক সপ্তম মাহাত্ম্য । ৭ ।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

—::—

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

হ’লে চণ্ড বিনিহত, মুণ্ড ও বিনিপাতিত,
বহু বল বহু সৈন্ত হইলে সৰ্ব্ব কষিত, ১
তখন প্রতাপী শুভ ক্রোধেতে অধীর মন,
আদেশিল দৈত্য সৈন্ত সাজিতে করিতে রণ । ২
“দৈত্য ষড়শীতি সহ সৰ্ব্ব-বল শস্ত্রোপ্তিত,
“চৌরানী কষু-কুলজ যাক হ’য়ে সৈন্তাবৃত । ৩
“কোটি বীৰ্য্য নামধারী পঞ্চশত কুলগণ
“ধোত্র নামা শত কুল, যাউক আজায় মম । ৪
“কালক, দোহুগা, ঘোষণা, কালকেয়, বীর ।
“সাজিয়ে যুদ্ধের সাজে যাউক আজায় মম ।” ৫
আজ্ঞা দিয়া অহরপতি শুভ ভৈরব-শাসন,
বহুল সহস্র সৈন্তে করিল যুদ্ধে গমন ।

দেখিয়া চণ্ডিকা সৈন্ত আসিছে অতি ভীষণ,
 ধনুৰ টকাবে পূৰ্ণ করিল। ধরা গগণ । ৭
 করিল ভীষণ নাদ নূৰ্ণ । সিংহ মহাকায়,
 ঘণ্টাস্বনে নেই নাদ বাড়াইলা অধিকায় । ৮
 ধনু, সিংহ, ঘণ্টা শব্দে অপূৰিত দিগ্‌মণ্ডল ।
 নিনাদে জ্বিনলা কানী বিস্তারিয়া সুখোজ্জ্বল ৯
 দৈত্য সৈন্ত চতুর্দিকে সে নিনাদ হয়ে শ্রুত
 দেবীসিংহ আর কালি সরোষেতে পরিবৃত । ১০
 এমন সময়ে ভূপ ! স্বর-শব্দ নাশিবাবে
 অতি বীৰ্য্য অমরের শুভ কার্য্য সাধিবাবে, ১১
 বাহিরি শরীর হতে গেল কাছে চণ্ডিকাব,
 ব্রহ্মার বিষ্ণুর শক্তি, কাক্তিক ইন্দ্রের আর । ১২
 যে দেবের যেই রূপ ভূষণ যথা বাহন
 সেইরূপে শক্তি তাঁর করিল যুদ্ধে গমন । ১৩
 অক্ষয়জ কমণ্ডলু করে, হংস-যুক্ত ধ্বজে,
 আসিল ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী খ্যাত জগতে । ১৪
 মাছেখরী বুঝাকড়া ত্রিশূলবর ধারিণী,
 মহতি বলদা যুতা চক্রেখেদা বিশোভিনী । ১৫
 ময়ূর-বন বাহনা কোমারী শক্তিধারিণী,
 দৈত্যযুদ্ধে আসিগেন অধিকা গুরুপণী । ১৬
 তেমতি বৈকব শক্তি গরুড় উপার স্থিত,
 শব্দ-চক্ৰ গদা-পদ্ম-খড়্গ-হস্তা উপনীতা । ১৭
 হরিষ অহুল যজ্ঞ-বহাহ রূপে রূপিণী,
 সে শক্তিও গেল তথা বারাহী তরুধারিণী । ১৮
 গেল নারসিংহী দেহ নৃসিংহ সদৃশ ধরি,
 কঙ্কেব গোম-কোপে নক্ষত্র বিকিণ্ড করি । ১৯

- বজ্র-হস্তা তথা ঐন্দ্রী আরোহিণী ঐরাবত,
 সহস্র নয়না গেল যথা ইন্দ্র সেই মত । ২০
 দেব, শক্তি পরিবৃত্ত কহিলা জিশান, তবে
 চণ্ডিকায়—“কর প্রীতি বধিয়া অম্বর সবে ।” ২১
 বাহিরিল দেবী দেহ হইতে ভীষণানিনী
 চণ্ডিকা, অত্যাশা শক্তি শত শিবা নিনাদিনী । ২২
 জিশানে ধূম-জটিল অপরাজিতা তখনে
 কহিলা নিমন্ত শস্ত্র কাছে যাও ভগবন্ ! ২৩
 “কহ শস্ত্র নিমন্তকে দানব অতি গর্জিত,
 “অস্ত্র যে দানব আছে যুদ্ধ তরে উপস্থিত, ২৪
 “ত্রৈলোক্য লভুক ইন্দ্র, হবিভূজ দেবগণ
 “পাতালে প্রমাণ কর ইচ্ছহ যদি জীবন । ২৫
 “বলুর মত্ততা হেহু ইচ্ছা কর যদি বণ,
 “তেমিদের মাংসে তৃপ্ত হ’ক মম শিবাগণ !” ২৬
 কহিলা দোতেন্দ্রে দেবী স্বয়ং শিব নিয়োজিত,
 ‘শিব দূতী’—এই খ্যাতি হ’ল লোকে প্রচলিত । ২৭
 শিব যুখে দেবী বাক্য শুনি মহাশ্বরগণ,
 গেল কাত্যায়নী যথা অমর্যপূরিত মন । ২৮
 শর, শক্তি, ঋষ্টি বৃষ্টি করিয়া সর্ব প্রথম,
 দেবী সহ যুঝে ক্রোধে যত অমরাগণ । ২৯
 সেই বাণ, শূল, চক্র, ধ্বনিত ধনুক ধরি,
 পরশু কুঠার সব, কাটিলেন লীলা করি । ৩০
 অগ্নেতে ক্রিয়া কালী শূলপাতে বিদারিত
 ক্রিয়িলেন বিচরণ খট্টায়ে করি পাতিত । ৩১
 কমণ্ডলু জলক্ষেপে হত বারী হত বল
 কহিল ব্রহ্মাণী শক্তি, ধাইতেহে যে সকল । ৩২

বৈষ্ণবা চক্রেতে, তথা ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী
 কোপনা কোমারী দৈত্য, বধিলেন শক্তি ধরি । ৩৩
 ঐন্দ্রী বজ্রাঘাতে দৈত্য পড়িলেক অগণন
 ভূমিতলে, বিদারিত কৃষির করি বমন । ৩৪
 তুণ্ড প্রহারে বিকট, বক্ষ দংষ্ট্রাগ্রেতে ক্ষত,
 চক্রে বিদারিত করি বারাহী ফেলিলা কত । ৩৫
 ভাকিয়া বিদারি নখে অস্ত্র মহাসুর দল
 নারসিংহী ভ্রমে রণে নাদে পূরি বিড়ম্বণ । ৩৬
 চণ্ডাট্ট হাসিতে করি শিবদূতী আঘাতিত,
 খাইছে অমৃতগণ ভূতলে করি পাতিত । ৩৭
 করিতেছে মাতৃগণ অমৃত ক্রোধে, মর্দন,
 দেবি নানামতে নাশে দেবারি সৈনিকগণ, ৩৮
 মাতৃগণাদিত দৈত্য দেবি পদায়ণপর,
 যুদ্ধার্থে আসিল কুহ রক্তবীজ বীরবর । ৩৯
 দেহ হতে হয় যদি রক্তবিন্দু ভূমি গত,
 মেদিনী হইতে জন্মে মহাসুর সেইমত । ৪০
 যুঝে উন্ন শক্তি ধরি মহাসুর গদাপানি,
 আঘাতিলা রক্তবীজে ঐন্দ্রী নিজ বজ্রহানি । ৪১
 কুলিশ মাঘাতে শীঘ্র শোণিত হয়ে পতন,
 সমুখিত হ'লো বোদ্ধা তদ্রূপ তদুপবাক্ষম । ৪২
 দেহ হতে রক্তবিন্দু বাবৎ হলো পতিত,
 তাবৎ জন্মিল বীর তদ্ব্যবীর্ণ তদ্বলাবিত । ৪৩
 পুরুষ রক্তসমুত যুঝে মাতৃগণ সনে
 অত্যাগ্র শত্রু নিক্ষেপ অতীব ভীষণ রণে । ৪৪
 পুনঃ বজ্রাঘাতে ক্ষত করিলে শির তাহার,
 বহি রক্ত জনমিল পুরুষ সহস্র আর । ৪৫

করিল চক্রেতে হত বৈষ্ণবী সময়ে পরে,
 করিল গদায় ঐন্দ্রী তাড়িত অম্বুবেশ্বরে । ৪৬
 বৈষ্ণবীর্ষ চক্রে ভিন্ন কথির আব সম্ভব
 সহস্র সহস্রাস্তরে ব্যাপিত করিল ভব । ৪৭
 কোমারী-শক্তিতে, অসি বারাহী প্রহার করি,
 আঘাতিল রক্তবীজে ত্রিশূলেতে মাংস্বরী । ৪৮
 রক্তবীজ মহাস্রব কোপ সমাবিষ্ট মন
 করিল গদায় দৈত্য আহত মাতৃকাগণ । ৪৯
 বহু শক্তি শূলাহত হইয়া, ভূতলে তার
 পড়ি রক্ত, শত শত জন্মিল অস্রব আর । ৫০
 রক্তজাত সে অস্রবে হইল পৃথিবীময়
 তাহাতে হইল ভীত দেবগণ অতিশয় । ৫১
 চণ্ডিকা বৈবিধ্য সেই স্রবগণ বিবাদিত,
 কহিলা—“চামুণ্ডে ! তুমি কর মুখ বিস্তারিত,—৫২
 “মম শস্ত্রপাতে রক্তবিন্দু-জাত দৈত্যগণ,
 “বেগেতে সকল তব বদনে কর গ্রহণ । ৫৩
 “বিচরণ কর রণে ভঙ্কি মহাস্রবচয়,
 “ক্ষীণ রক্ত ঠৈত্য তবে এইরূপে হবে ক্ষয় । ৫৪
 “তব উগ্র ভক্ষণেতে পুনঃ না জন্মিবে আর ।”
 ইহা কহি দেবী তাকে কবিলা শূল প্রহার । ৫৫
 শোণিত রক্তবীজের লইয়া মুখে কালিকা,
 হইলেন আঘাতিত গদায় তার চণ্ডিকা । ৫৬
 হইল না কাণ্ড্যমাত্রি গদাপাতে আবির্ভাব ।
 আহত হ’লে অস্রব, হইল শোণিতআব । ৫৭
 চামুণ্ডা সকল রক্ত করিলা মুখে গ্রহণ,
 বদনে আদিল যেই রক্ত-জন্মা দৈত্যগণ । ৫৮

খাইলা চণ্ডিকা, রক্ত পান করি সেইরূপ,
 গ্রহাব্রিয়া দেবী শূল, বজ্র, অসি, ঋষ্টি, বাণ । ৫০
 আঘাতিল রক্তবীজ, শোণিত করিলা পান,
 পড়িল ধরণী পৃষ্ঠে, শব্দজালে সমাহত । ৬০
 রক্তবীজ মহাস্বর, রক্তহীন, হে স্বরথ ।
 তখন অতুল হর্ষ লভিলা সর্ব দেবতা,
 নাচিলেন মাতৃগণ শোণিত-মদ উরুতা । ৬১
 ইতি রক্তবীজ বধনামক অষ্টম মাহাত্ম্য । ৮

[নবম মাহাত্ম্য]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

রাজা কহিলেন ।

করিলেন, ভগবন ! মম কাছে আঘাতিত
 রক্তবীজ বধ কথা—বিচিত্র দেবী চরিত । ১
 পুনঃ ইচ্ছা শুনি, হলে রক্তবীজ নিপতন
 কি কাজ করিল শুভ্র নিশুভ্র অতি কোপন । ২
 ঋষি কহিলেন ।

রক্তবীজ আহবেতে এইরূপে হ'লে কর
 করিল অতুল কোপ শুভ্র ও নিশুভ্রবয় । ৩
 মহা সৈন্ত দেখি হত ক্রোধেতে আক্ৰা মন
 খাইল নিশুভ্র তবে লয়ে মুখ্য সেনাগণ । ৪
 অগ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, লয়ে গেল মহাস্বরগণ,
 দেবীকে বধিতে ক্রোধে অধর করি দংশন । ৫

আসিল ও মহাবীৰ্য্য শুভ স্বসৈন্তে বেষ্টিত,
 বধিতে চণ্ডিকা, যুঝি মাতৃকাগণ সহিত । ৬
 শুভ নিশ্চিন্তের সহ দেবীর হইল বণ,
 মেঘ মত অতি উগ্র কঠিয়া শর বর্ষণ । ৭
 কাটিল সে শরজাল চণ্ডিকা তাঁহার শরে,
 আহত করিলা শস্ত্রে যুগল অনুরোধে । ৮
 নিশ্চিন্ত নিশিত খড়্গ লইয়া চন্দ্র ভাস্বর
 উত্তম বাহন সিংহে আঘাতিল শিরোপর । ৯
 বাহন তাড়িত দেখি ক্ষুব্ধে দেবী তখন
 অষ্টচক্র চন্দ্র সহ কাটিল অসি উত্তম । ১০
 ছিন্ন চন্দ্র খড়্গা, শক্তি, নিক্ষেপিল সে অনুর,
 আগত সে শক্তি চক্রে কাটি করিলেন দূষ । ১১
 গর্জিষ্য ক্রোধে নিশ্চিন্ত করিল শূল গ্রহণ,
 তাণ্ড চূর্ণ মুষ্টিপাতে করিলা দেবী তখন । ১২
 ঘুরাইয়া গঙ্গা সেও ক্ষেপিল চণ্ডিকা প্রতি,
 ত্রিশূলেতে ভিন্ন ভঙ্গ করিলেন তাহা সতী । ১৩
 আসিয়া দৈত্যপুংগব তখন পরশু করে,
 আঘাতিল, দেবী বাণে ফেলিলেন মহাপরে । ১৪
 ভূমিতে পড়িলে ভ্রাতা নিশ্চিন্ত ভীম বিক্রম
 ক্রোধেতে আসিল শুভ অস্ত্রিকা বধ কারণ । ১৫
 সরথ উঠিয়া উচ্ছে লইয়া আঘুধ সব
 অষ্ট ভূজে অতুলিত, ব্যাপ্ত করিল নভঃ । ১৬
 দেবী ব্যাজাইলা শঙ্খ দেখি তাকে উপস্থিত,
 ধনুর টঙ্কার শব্দ করিলা সহনাতীত । ১৭
 নিজ ঘণ্টাস্বনে দেবী পূরিলেন দিগ্‌মণ্ডল,
 হতভৈরব বরি তাহে সমস্ত দানব বল । ১৮

সিংহ ছাড়ি মহানাদ, মহামদ করিগণ
 পরিপূর্ণ দশদিক্ করিল পৃথ্বী গগণ । ১৯
 লক্ষ দিয়া কালী করে করিলেন বিতাড়িত,
 গগণ পৃথিবী করি পূর্বনাদ তিরোহিত । ২০
 হাসিলেন শিবদূতী অশির অট্টাট্ট হাসি ।
 সে অস্তুর ত্রাস শব্দে শুভ্র কোণে অগ্নিরাশি । ২১
 “তিষ্ঠ তিষ্ঠ”—হুয়ান্নাকে কহিলা অধিকা যবে,
 “জয়া” নাম দিলা তাঁকে আকাশহু দেব সবে । ২২
 শুভ্র নিক্ষেপিত শক্তি বিভীষণা প্রজলিত
 বহি আভা, হলো মহা উজ্জ্বল অস্ত্রে নিবারিত । ২৩
 শুভ্র সিংহনাদে ব্যাপ্ত করি লোকত্রয়ান্তর
 নিশ্বন—নির্ধাত ঘোরে জ্বিনিল, ৫৫ পৃথ্বীধর ! ২৪
 শুভ্র তাক্ত শর দেবী, শুভ্র তাঁর শরগণ,
 কাটিল স্ব উগ্রশবে শত শত অগণন । ২৫
 তখন চণ্ডিকা ক্রোধে করিলা শূল গ্রহণ
 আহত মূর্ছিত ভূমে পড়িল সে হুয়ান্নার । ২৬
 নিশুন্ত চেতনা পেয়ে কার্ষুক করি গৃহীত,
 কালীকেশরীকে শরে করিলেক আঘাতিত । ২৭
 পুনশ্চ অব্যত গাহ স্বজিয়া দনুজেশ্বর,
 চণ্ডিকার চক্রায়ুধে ছাইল দ্বিভিজ্বর । ২৮
 তবে ক্রুদ্ধ ভগবতী হুর্গা হুর্গাঙ্গিনী শনী,
 সে চক্র সাহক সব কাটিল শরে তখনি । ২৯
 দৈত্যসেনা সমাবৃত নিশুন্ত তখন ধায়
 সবেগে লইয়া পদা বদিবারে চণ্ডিকায় । ৩০
 কাটিল চণ্ডিকা শীঘ্র সেই পদা নিক্ষেপিত
 শিরধার খড়্গে, শূল হইল তবে গৃহীত । ৩১

আসিতেছি শূল হস্তে নিস্তম্ভ অমরার্দন,
 চণ্ডিকা বিধিলা বেগে ছদয় শূলে তখন । ৩২
 শূলে ভিন্ন বক্ষু হ'তে জনমি পুরুষ আর—;
 মহাবল মহাবীৰ্য্য কহে "তিষ্ঠ" বারংবার । ৩৩
 সহস্র আশ্রিতে খড়্গে কাটিলেন শির তার,
 হইল তখন সেই ভূমিতলে নিপতিত । ৩৪
 তখন খাইল সিংহ উগ্রদন্তে শিরোধর,
 খাইল অশ্বরে কালী, শিবদূতী তথাপর । ৩৫
 কোমারী শক্তিতে ভিন্ন করে মহাশ্বরচয়,
 মস্তপূত জলে অগ্রে ব্রহ্মাণী করিল জয় । ৩৬
 অপর ত্রিশূলে ভিন্ন করিলেন মাহেশ্বরী ।
 ফেলিল বারাহী ভূমে তুণ্ডাঘাতে চূর্ণ করি । ৩৭
 চক্রে খণ্ড খণ্ড করে বৈষ্ণবী দানব যত,
 ঐক্ষাণী হস্তাগ্র-মূৰ্দ্ধ বজ্রে অগ্রে করে হত । ৩৮
 বিনষ্ট অশ্বরংকহ, কেহ যুদ্ধে পলায়িত,
 কালী শিব দূতী সিংহে হইল অস্ত্র ভক্ষিত । ৩৯
 ইতি নিস্তম্ভ বধ নামক নবম মাহাত্ম্য । ২

[দশম মাহাত্ম্য ।]

—*—

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

কবি কহিলেন ।

হত প্রাণনম ভ্রাতা নিস্তম্ভ কবি দর্শন,
 হত সৈন্তগণ,—কুরু কহিল শুভ তখন ।

“বলোনভা ছুটে ! জর্গে ! হইওনা গরবিনী ।”

অন্ত বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অতি মানিনী । ২

দেবী কহিলেন ।

এ জগতে একা আমি কে মম দ্বিতীয়া আর ?

আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার । ৩

ব্রহ্মাণী প্রমুখ তবে সমস্ত সে দেবীগণ,

গেল দেবী দেহে, বৈ'ল অধিকা একা তখন । ৪

দেবী কহিলেন ।

বহু বিভূতির রূপে ছিন্ন ঘাহে, অতঃপর

হরিলাম, একা আমি, যুদ্ধে থাক স্থিরতর । ৫

ঋষি কহিলেন।

দেবীর শুভেয় তবে হইল দাক্ষণ রণ ।

বুঝিল সকল দেব সকল অশ্বর গণ ।

শিত শস্ত্রে দাক্ষণাস্ত্রে, বরিষণ করি শর,

হলো যুদ্ধ পুনঃ পুনঃ সর্বলোক ভয়ঙ্কর । ৬

দিব্য অস্ত্র শত শত বর্ষিলা অধিকা বাহা,

অস্ত্র প্রতিঘাতে সব ভাঙ্গিল দৈতেজ্ঞ তাহা । ৮

তার কর-মুক্ত যত দিব্যাস্ত্র পরমেস্বরী

ভাঙ্গিল লীলায়, উগ্র হুহুকার শব্দ করি । ৯

করিল দেবীকে শরে সে অশুরে আচ্ছাদন,

কাটিলা কুপিতা দেবী অস্ত্রে তার শরাসন । ১০

ছিন্ন হ'লে ধনু, দৈত্য করিল শক্তি গ্রহণ,

কাটিলেন চক্রে দেবী তাও করে সেইরূপ । ১১

শত-চন্দ্র-ভাঙ্গু-প্রভা-লইয়া বজ্রা তখন,

বাইল দেবীর প্রতি দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ মন । ১২

চণ্ডিকা কাটিল শীঘ্র সেই খজ্জা আপতিত,
 ধনুর্মুণ্ড-শিতবাণে—চন্দ্র-অর্ক-প্রভাবিত । ১৩
 হত অশ্ব, বিসারথী, ছিন্ন ধনু দৈত্যবরে
 লইল মুদার ঘোর, অশ্বিকা নিধন তরে । ১৪
 মুদার পতনোন্মুখ কাটিল নিশিত শরে,
 তথ্যপি ধাইল দৈত্য তুলি মুষ্টি বেগবরে । ১৫
 দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহারিল দৈত্যনীথ,
 দেবী উরসেতে তার করিল চপেটাঘাত ।
 সে প্রহাবে অভিহত মহীতলে নিপতিত
 হ'য়ে দৈত্যবান শীঘ্র হইল পুনঃ উত্থিত । ১৭
 দেবীকে আকাশে লক্ষ্য করিল সে উত্তোলন,
 তথাপি সে নিরাধারা চণ্ডিকা করিল রণ । ১৮
 দৈত্য চণ্ডিকায় যুদ্ধ আকাশেতে পরস্পর
 হলো সিদ্ধ মুনিদের প্রথমে বিস্ময়কর । ১৯
 অশ্বিকার সহ যুদ্ধ করি তবে মহাবলে,
 লক্ষ দিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপিল মহীতলে । ২০
 পড়িলে ধরণী পৃষ্ঠে, তুলি মুষ্টি বেগভাবে
 ধাইল দুষ্টাশ্রা ক্রোধে অশ্বিকা নিধন তরে । ২১
 দেখি সমাগত দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বর
 শূলে বিদারিয়া বক্ষ ফেলিল অবনীপর ২২
 মরিল সে পড়ি ভূমে দেবী শূলগ্র বিক্ষত ।
 কাপিল সকল পৃথ্বী সসিদ্ধ-দ্বীপ-পর্বত । ২৩
 হত হ'লে হরান্ন প্রসন্ন হইল ভব ।
 জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্মল হইল নভঃ । ২৪
 উদ্ধাসহ মেঘোৎপাত হলো সব প্রশমিত,
 নিরাপন্ন নদী, পথ হইলে সে নিপতিত । ২৫

সর্ব দেবগণ তবে হলো হর্ষাবিত মন,
 আনন্দে ললিত বাস্ত, হইলে তার নিধন,
 বাজাইল গন্ধর্বেরা ; নাচিল অপর্যোগণ । ২৮
 বহিল পুণ্য বাতাস সুখ প্রভা আখণ্ডল,
 জলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল । ২৭
 ইতি শুভ বধ নামক দশম মাহাত্ম্য । ১০ ।

[একাদশ মাহাত্ম্য ।]

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

মহ অম্বরেস্ত্র হত হলে, তবে ইন্দ্র সহ
 বহি পুরোগামী স্বরগণ,
 করে স্তুতি কাত্যায়নী,—হর্ষ বিকশিত আশা,
 ইষ্ট লতি প্রকুল বদন । ১
 দেবি চঃগহরা হয়ে ! প্রসীদ,—প্রসীদ মাতঃ !
 হে অখিল জগত জননি !
 প্রসীদ হে বিশ্বেশ্বর, বক্ষ বিশ্ব ভূমি লোক
 চরাচর জৈয়গী আপনি । ২
 একা ভূমি জগতের হইয়া আধারভূতা
 মহীক্ষেপে আছ অবস্থিত,
 জলক্ষেপে করি স্থিতি, অলঙ্ঘ্য বীৰ্য্যোতে তব
 কর সর্ব বিশ্ব আপ্যায়িত । ৩

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ।

২১০১

তুমি হে বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্ত বীৰ্য্যশালিনী,
 • মায়া বিশ্ববীজ সনাতন,
 সকলি মোহিত দেবি ! তোমা হ'তে, তব কৃপা ।

জগতের মুক্তির কারণ । ৪

হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমার বিভিন্ন রূপ
 তুমি জগতের স্ত্রী সকল ;

• তোমায় পূরিত একা ; তুমি ভিন্ন আছে কিবা
 তব স্তব অহ্যাক্তি কেবল । ৫

সর্বভূতা যবে দেবী স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী,
 তুমি স্ততা আর কেবা পরমোক্ত স্বরূপিণী । ৬

সকলের বুদ্ধিরূপে হৃদয়ে স্থিতি তোমার
 স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়িনি । নারায়ণি ! নমস্কার । ৭

• পরিশ্রম প্রদায়িনী, কলাপল রূপ যাব,
 বিশ্বের পরমশক্তি, নারায়ণি নমস্কার । ৮

সর্বার্থ সাধিকে শিবে ! হে সর্ব মঙ্গলাধার ।

শরণো ! আশ্রকে ! গোবি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ৯

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিভূতা মূলধার,

ঊণাশ্রয়া গুণময়ী নারায়ণি ! নমস্কার । ১০

শরণাগত দীনার্ভ তুমিই কর উদ্ধার,

সর্ব হুঃখ হরে দেবি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ১১

ব্রহ্মাণী রূপ ধারিণী হংসযুক্ত বথ যাব,

কুশা-জল-বরষিণি । নারায়ণি ! নমস্কার । ১২

শূল-চন্দ্র-অহি-ধরে । বৃষক বাহন যাব,

মাহেশ্বরী স্বরূপেতে—নারায়ণি ! নমস্কার । ১৩

মম্বর কুকুটারতা মহাশক্তি নির্বিকার,

কোমারী রূপ ধারিণী, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৪

শজা, চক্র, গদা, শাঙ্গ, পবন আয়ুধ ধার,
 প্রণীদ বৈষ্ণবী-রূপে ! নারায়ণি ! নমস্কার । ১৫
 উগ্র মহাচক্র ধরা, ধরার দন্তে উদ্ধার
 করিলে ববাহ রূপে, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৬
 উগ্র নৃসিংহের রূপে করিয়া দৈত্য সংহার
 ত্রৈলোক্য করিলে জাগ, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৭
 কীরীটিনি ! মহাবজ্রে ! সহস্র নয়ন ধার,
 বৃদ্ধ-প্রাণ-হরা-ঐজি । নারায়ণি ! নমস্কার । ১৮
 শিবদূতী স্বরূপেতে বধিলে দৈত্য অপার,
 ঘোবরূপা, মহারাবা, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৯
 দংষ্ট্রা-করাল-বদনে ! শিরোমালা অলঙ্কার,
 চামুণ্ডে ! মুণ্ডমথিনি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ২০
 লক্ষ্মি, লজ্জা, মহাবিজা, শ্রদ্ধা, সৃষ্টি, স্বধা, সার,
 মহাবাজি, মহাদিবা, নারায়ণি ! নমস্কার । ২১
 মেধে ! সন্ন্যস্তি । বরে ! সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস আর,
 নিয়তি ! প্রসন্ন হও, নারায়ণি ! নমস্কার । ২২
 সর্বরূপা, সর্বৈশ্বরী, সর্বশক্তি মা তোমার ;
 ভয়ে জাগ কর দুর্গে ! নারায়ণি ! নমস্কার । ২৩
 লোচন-ত্রয় ভূষিত বদন সৌম্য তোমার,
 রক্ষ সর্ব ভূত হ'তে কাত্যায়িনি । নমস্কার । ২৪
 অত্যাগ্র-জালা-করাল, অশেষ দৈত্য সংহার—
 ত্রিশূলেতে রক্ষ ভীতে, ভদ্রকালি । নমস্কার । ২৫
 নাশিল যে দৈত্যতেজ, জগত পূরিয়া ধনে,
 সে ঘটায় পাপ হ'তে রক্ষ দেবি । স্তুতগণে । ২৬
 দৈত্য-রক্ত-বলা-পঙ্কে-চর্চিত খড়্গে উজ্জল
 কর শুভ হে চণ্ডিকে । আয়রা নমি সকল । ২৭

তুষ্টা হ'লে, রোগ বিনাশ সকল ;

কুষ্টা হ'লে, সর্ব কামনা বিফল ।

তব আশ্রিতেবা অবিশ্বাস সदा ;

তব আশ্রিতে পুষ্ট আশ্রয় কেবল । ২৮

দেবি ! ধর্মধেয়ী মহাস্বরগণ,

এই ভূমি অন্য কবিলে সংহার

অনেক রূপেতে, বহু মূর্তি ধরি,—

হে অশ্বিকে ! অস্ত্র কেবা পারে আর । ২৯

শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আদ্যজ্ঞান দীপে,

বাকোতেও অস্ত্র আছে কেবা আর ?

মমতা গুহায়, মোহ অন্ধকারে,

ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার । ৩০

রক্ষ যথা উগ্রবিষ নাগগণ,

যথা অস্বিগণ, যথা দ্বন্দ্বা বল ।

দাবানল যথা, তথা সিন্ধু গর্ভে,

রক্ষ কর ভূমি এ বিশ্বমণ্ডল । ৩১

বিশ্বেশ্বর ! তুমি পাল এই বিশ্ব,

বিশ্ব আত্মা, কর এ বিশ্ব ধারণ ;

বিশ্ব-ঈশ্বরের বন্দনায় তুমি,

বিশ্বের আশ্রয় তব ভক্তগণ । ৩২

অবিভীত আমরাদেবে প্রসন্ন হইয়া ,

রক্ষ নিত্য, যথা দৈত্য বধিয়া এখন ।

সর্ব জগতের পাপ কর প্রশমিত,

ঈশপাতজনিত মহা অমঙ্গলগণ । ৩৩

প্রণতে প্রসন্ন হও, বিশ্ব-ত-ব-বিনাশিনি ।

হৈলোক্য-বাসী-আবাস্যো ! ত্রিলোক বর দায়িনী । ৩৪

দেবী কহিলেন ।

দিব বর, সুরগণ যেই বর মনে ধরে
ইচ্ছা কর, দিব আমি জগত হিতের তবে । ৩৫

দেবগণ কহিলেন

ত্রৈলোক্য-অখিলেশ্বর । সর্ব বাধা প্রশমিত
কর, এইরূপে করি সুরবৈরি বিনাশিত । ৩৬

দেবী কহিলেন ।

অষ্টাবিংশতি যুগেতে, বৈবস্বত মন্বন্তরে,
শুভ নিমন্তের জন্ম হ'বে যবে নামান্তরে, । ৩৭

রন্দ গোপ গৃহে জন্মি পুণ্যগর্ভে যশোদার,
বিক্যাচল নিবাসিনী, করিব সব সংহার । ৩৮

পুনরপি অ'ত যৌত্র রূপেতে পৃথিবী তলে
অ'তরি বিনাশিব বৈশ্ণবচিত্ত দৈত্যদলে । ৩৯

বিশ্ণুচিহ্ন বংশোদ্ভব ভক্তি মহা সুরগণ

হব আমি রক্তদস্তা দাড়িষ-কুহুমোপম । ৪০

তখন দেবতা স্বর্গে মর্ত্যোতে মানব যুত,

কহিবে রক্ত-দস্তিকা আমার পুঞ্জ সতত । ৪১

শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে আবার যবে

মুনিম্বতা হয়ে জন্ম লব অবোনিজা তবে । ৪২

শত নেত্রে আমি তবে নিরখিব মুনিগণ,—

শতাকৌ বলিয়া নর গাইবেক কীর্তি মম । ৪৩

জীবন-ধারক শাকে—আপন দেহ-সম্ভব—

আবৃষ্টিতে দেবগণ । পালিব অখিল-ভব । ৪৪

শাকম্বরী নামে খ্যাতি ভূতলে লভি তখন,

হুর্গমাখা মহাস্বর বিনাশিব করি রণ,—

হুর্গাদেবী নাম তবে হইবে বিখ্যাত মম । ৪৫

যাব ভীম রূপ ধরি হিমাচলে পুনর্দ্বার
মুনিদের জ্ঞান হেতু করিব বক্ষ সংহার, । ৩৬
তুঘিবে আমায় সবে নম্রমূর্ত্তি মুনিগণ,—
ভীমাদেবী নাম মম হইবে খ্যাত তখন । ৪৭
অরুণাখ্য মহাবাধা ত্রিলোকে করিবে যবে
ষট্‌পদ ভ্রমর রূপ গ্রহণ করিব তবে । ৪৮
ত্রিলোকের হিত তব বধিব অসুরগণ,
ব্রাহ্মী নামেতে তবে তুঘিবেক সর্জন । ৪৯
এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন
অবতীর্ণা হয়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ । ৫০
ইতি নারায়ণী-স্ততি—নামক এ দ্বাদশ মাহাত্ম্য । ১১

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

দেবী कहিলেন ।

এই স্তবে আমাকে যে নিত্য তোবে সমাহিত,
তাহার সকল বিঘ্ন বিনাশি আমি নিশ্চিত । ১
মধু কৈটভের নাশ, মহিষাসুর-বাতন,
শস্ত্র নিগুন্তের বধ তথা, যে করে কীর্ত্তন, ২
অষ্টমী কি চতুর্দশী নবমীতে একমন
গুনে সেই ভক্তগণ মাহাত্ম্য মম উত্তম, ৩
তাদের হৃদয় কিছু, আপদ হৃদ্যতোষিত,
না ঘটে, ইষ্ট-বিয়োগ, দয়িত্বতা কদাচিত । ৪

শক্রভয় নাহি তার, নাহি দম্বা-বাজ-ভয়,
 অজ্ঞানলে, জলে, কভু আহত সে নাহি হয়। ৫
 মঙ্গল মাহাত্ম্য মম করি চিত্ত-সমাহিত,
 পড়িবে, শুনিবে সদা ইয়ে ভক্তি-সমাহিত। ৬
 মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ বিপদচয়,
 ত্রিবিধ উৎপাত, মম মাহাত্ম্যে শমিত হয়। ৭
 যে ইহা সমাক্ষ পড়ে নিত্য নিজ নিকেতনে,
 না ছাড়ি তাহাকে, থাকি সতত তার সদনে। ৮
 বলিদানে, অগ্নিকার্য্যে, পূজায় বা মহোৎসবে
 সদা মম এ চরিত কহিবে শুনিবে সবে। ৯
 বলি পূজা করি দান, জানত কি অজ্ঞানত,
 প্রীতি ইচ্ছে করি মম বহি হোম সেই মত, ১০
 শরৎকালে মহাপূজা বার্ষিক করে যে জন,
 তথা এ মাহাত্ম্য মম শুনে ভক্তিপরায়ণ, ১১
 সর্ব বিয় বিনিমুক্ত ধন ধাতু হুতাবিত
 হয় নরগণ সবে প্রসাদে মম নিশ্চিত। ১২
 শুনি এ মাহাত্ম্য মম, উৎপত্তি মঙ্গলময়,
 লভে যুদ্ধে পরাক্রম পুরুষশ্রেষ্ঠ নির্ভয়। ১৩
 ত্রিপুগণ ক্ষয়প্রাপ্ত, কল্যাণ হয় বর্ধিত,
 শুনিলে মাহাত্ম্য, কুল সমৃদ্ধি হয় নিশ্চিত। ১৪
 সর্ব শাস্তি কর্ষে, হলে দুঃস্থপন দরশন,
 উগ্র-গ্রহ পীড়াকালে শুনিবে মাহাত্ম্য মম। ১৫
 নিদারুণ গ্রহপীড়া, শাস্তি হয় রোগচয়,
 নরেন্দ্র দুঃস্থপ যুচি সুস্থপ উদয় হয়। ১৬
 শিশুদের বালগ্রহ রোগ করে প্রশমন,
 বুচিয়া শক্রতা ঘোর মিত্রতা হয় উত্তম। ১৭

মহা বলহানিকর অশেষ চরিত্রম্,

ব্রহ্ম, ভূত, পিশাচেরা, পঠনেই নষ্ট হয়। ১৮

সর্বত্রো মাহাত্মা এই সুখ-বিধায়ক মম

পুণ্ড্রপুশ্প, অর্য্য, খুগ, সুগন্ধ দ্বাপে-উভয়। ১৯

বিশ্রেষ্ট ভোজনে, হোমে, দিবানিশি শুদ্ধতম,

পাইলে বৎসর ভোগ হয় যেই প্রীতি মম, ২০

সে প্রীতি শুনিলে হয় বারেক এ সূচরিত।

শুনিলেই হরে পাপ, হয় রোগ প্রশমিত। ২১

ব্রহ্ম করে ভূত হ'তে আমার জন্ম-কীর্তন,

বুদ্ধে রক্ষে এ চরিত্র ছষ্ট-দৈত্য-বিনাশন,

শুনিলে তা বৈরি-ভয় নাহি ঘটে কদাচন। ২২

তোমরা ও ব্রহ্মবিরা করিয়াছ স্তুতি মাহা,

যে স্তুতি করেছে ব্রহ্মা দিবে শুভমতি তাহা। ২৩

অযুগো, প্রাস্তরে কিবা দেবাগ্নি পরিবেষ্টিত,

দহাতে বেষ্টিত শূন্তে, কিবা শত্রু করে মৃত ২৪

সিংহ, ব্যাঘ্র, ববুহস্তী করে যদি বিতাড়িত,

বাস্ক-ক্রোধে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় বধ্য কি বন্দীত। ২৫

বাতে বিঘূর্ণিত কিবা, মহার্ঘবে পোতে স্থিত ;

সংগ্রামে দারুণ শস্ত্রে হয় যদি নিপতিত ; ২৬

ঘোর সৰ্ক বিপদেতে ব্যথিত, হলে পীড়িত ;—

হয় বিঘ্ন-মুক্ত সব স্মরিলে মম চরিত। ২

আমার প্রভাবে সিংহ দম্ব্য কিংবা বৈরিগণ,

স্মরিলে চরিত্র মম, দূরে করে পলায়ন। ২৮

শ্রী কহিলেন।

ইহা কহি ভগবতী দর্শক দেবতা স্থান,—

চণ্ডিকা চণ্ড-বিজয়া,—হইলেন অন্তর্দান। ২৯

নিরাতঙ্ক দেবগণ যথা-পূর্ব অধিকার,
 যজ্ঞভাগ্য বহুর ভোগ হইলে আরি সাহসি । ৩০
 দেবরিশু, বিশ্ব-করসী, অকুল উগ্র-বিক্রম,
 মহাবীৰ্য্য-শুভ্র আর নিশুভ্র হলে নিধন
 দেবী করে, পাতালেতে গেল শেষ দৈত্যগণ । ৩১
 এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্বক্ষণ
 ভগ্ন পালন তবে লভেন, ভূপ ! জনম ৮৩২
 বিধেব প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
 করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত । ৩৩
 মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
 করেন সকল ব্যাপ্ত মহাকালে, নৃপবর ! ৩৪
 তিনি কালে মহামারী তিনি সৃষ্টি-জলবিনী,
 রক্ষণ সকল ভূত, কালে সেই সনাতনী । ৩৫,
 নরের উন্নতি কালে লক্ষ্মী-বুদ্ধি-প্রদায়িনী
 বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী-করস-কারিণী । ৩৬
 পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদিতে করিলে, পূজা তাঁহার,
 প্রদানেন বিত্ত, পুত্র, ধর্ম্ম যতি শুভ আন । ৩৭
 ইতি শুভ্র-নিশুভ্র-বধ—নামক দ্বাদশ মাহাত্ম্য । ১২ ।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

চণ্ডিকাকে নমস্কার ।

ঋষি কহিলেন ।

কহিহু তোমায় ভূপ ! দেবী মাহাত্ম্য উত্তম,
 এক্রপ প্রভাবা তিনি, করেন বিশ্ব ধারণ ;—
 বিষ্ণু মায়ায় বিভ্রা করেন সৃষ্টি তেমন । ১

